মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

অজিতকুমার চক্রবর্তী

জি জ্ঞা সা
কলিকাতা ৯ · কলিকাতা ২৯

ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ হইতে

প্রথম প্রকাশ ১৯১৬ খৃস্টাব্দ

প্রকাশক শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড

জিজ্ঞাসা

১এ এবং ৩৩ কলেজ রো। কলিকাতা ৯

১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। কলিকাতা ২৯

মুদ্রক শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস

ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড

২৮ বেনিয়াটোলা লেন। কলিকাতা ৯

উৎসর্গ

যেখানে

মহর্ষি

তাঁহার "প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি"কে

লাভ করিয়া

জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানবের জন্য

ভূমার সহিত তাঁহার সেই মিলন-তীর্থটিকে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন,

যেখানে দশ বৎসর কালের অকৃতার্থ বাসে

তাঁহার বিদেহী অধ্যাত্মমূর্তির কিছু পরিমাণ পরিচয় লাভ করিয়া

এবং সেই পরিচয়েরি ক্ষীণ দীপ-শিখা ধরিয়া

তাঁহার দেহী মানব-মূর্তির বিচিত্র জ্ঞান, ভাব ও কর্ম -লীলায়িত জীবনের

সমগ্র পরিচয় লাভের জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে,

সেই শান্তিনিকেতন-আশ্রমের যত যত অধিবাসী—

যাঁহারা আজ জীবলীলা সাঙ্গ করিয়া পরলোকগত হইয়াছেন,

যাঁহারা সেখানে বাস করিয়া ধন্য হইতেছেন,

অনাগত কালে যাঁহারা সেখানে আসিয়া মহর্ষির সাধনাকে অগ্রসর করিয়া দিবেন,

তাঁহাদের সকলের হাতে

আমার এই গ্রন্থ

সাদরে

সমর্পণ

করিলাম।

গ্রন্থকারের নিবেদন

প্রায় দেড় বছরব্যাপী পরিশ্রমের পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই চরিত-কাহিনীটি শেষ করিয়া পাঠকদিগের হাতে দিতে গিয়া আমার মনের ভয় ও সংকোচ কিছুতেই বারণ মানিতেছে না। এত বড়ো কাজের পক্ষে নিজের অনুপযুক্ততা ও অক্ষমতা স্মরণ করিয়া কেবলি মনে হইতেছে, এ চরিতকথা যেমনটি হওয়া উচিত ছিল, তেমনটি হয় নাই।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় থাকার কোনো সম্ভাবনা ছিল না— তাঁহাকে যখন আমি দেখিয়াছিলাম তখন আমি বালক। আমি যে তাঁহার পবিত্র সঙ্গলাভ করি নাই, তাঁহার চরণতলে বসিয়া তাঁহার অমৃত উপদেশ শুনিয়া জীবনকে সার্থক করিবার সুযোগ যে আমার ঘটে নাই, এ আপশোষ জীবনচরিত লিখিবার বেলায় পদেপদেই মনের মধ্যে জাগিয়াছে। সাক্ষাৎ পরিচয় থাকিলে এ জীবনচিত্রের রেখাগুলি আরো স্পষ্ট হইত, রঙ আরো উজ্জল হইত, সন্দেহ নাই। তবু বোধ হয় সাক্ষাৎ পরিচয় থাকার যেমন অনেকগুলি সুবিধা আছে, তেমনি অনেকগুলি অসুবিধাও আছে। খুব কাছে হইতে কোনো জিনিসকে দেখিলে তাহার খুঁটিনাটিগুলাই অত্যন্ত বেশি নজরে পড়ে; কোনো জিনিসের সমগ্র রূপটি দেখিবার পক্ষে বোধ হয় একটুখানি দূরত্বের দরকার আছে। সেইজন্য মনে হয়, কোনো মহাত্মা যে-কালে বাস করিয়াছেন ও কাজ করিয়াছেন, সে কালটা শেষ হইয়া গেলে, তাহার পরবর্তী কালের লোকের পক্ষেই তাঁহার কালের ভিতরকার অভিপ্রায় ও সেই অভিপ্রায় সেই মহাত্মার জীবনে কিভাবে ফলিয়াছে তাহা বোঝা সহজ হয়। একটা কালের চেহারাকে সমগ্রভাবে দেখিবার জন্য যে একটি দূরত্বের দরকার হয়, সে দূরত্বটি না থাকিলে অনেক ছোটো জিনিস বড়ো হইয়া উঠিতে পারে এবং যাহা যথার্থ বড়ো তাহা ছোটো হইয়া যাইতে পারে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাল এ কাল নয়; সেই কারণেই সে কাল সম্বন্ধে এ কালের লোকের চিন্তা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহাদের কালে তাঁহাদের কী আশা ও আকাঙ্ক্ষা ছিল, ভবিষ্যতের জন্য তাঁহারা কী দিয়া গেলেন —তাহার একটা সুস্পষ্ট হিসাব এখন খাড়া করিয়া তোলা দরকার। তবেই আমরা বুঝিতে পারি, আমাদের কাল আবার কোন্ নূতন পথে চলিবে এবং কোন্ ভবিষ্যৎকে সামনে আনিবার জন্য চেষ্টা করিবে।

তাঁহার কালে তাঁহার যাঁহারা বন্ধু ও অনুচর ছিলেন, আমাদের একটি দাবি তাঁহাদের প্রতি ছিল। তাঁহাদের মধ্যে কাহারো না কাহারো বস্‌ওয়েলের কাজ করা উচিত ছিল। তাঁহার জীবনের ছোটো বড়ো সব ঘটনাগুলির কথা, তাঁহার কালের ছোটো বড়ো সব উদ্যোগ-অনুষ্ঠানগুলির কথা যদি কেহ লিখিয়া রাখিতেন, তবে পরবর্তী কালের চরিতলেখক কিংবা ঐতিহাসিকের পক্ষে সে-সকল উপকরণ অমূল্য হইত। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সেই বস্‌ওয়েল ছিলেন। তাঁহার প্রায় সমস্ত জীবনের ডায়ারি ছিল, তাঁহার লিখিত একখানি ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত ছিল, ও সকলের চেয়ে মূল্যবান, মহর্ষি তাঁহাকে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া যে-সকল চিঠি লিখিয়াছিলেন, সেই-সমস্ত চিঠি তাঁহার কাছে সযত্নে রক্ষিত ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ডায়ারিগুলি সবই প্রায় পোকায় কাটিয়াছে, শেষ জীবনের ডায়ারির চারিখানি মাত্র খাতা অক্ষত ও অদষ্টভাবে পাওয়া গিয়াছে। ইতিবৃত্তখানি হারাইয়াছে। মহর্ষির প্রায় ছয় শতের উপর চিঠি প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় পড়িতে লইয়াছিলেন। ছয় শতের উপর চিঠির মধ্যে মাত্র আটানব্বইখানি চিঠি তিনি 'পত্রাবলী'তে ছাপেন। সমস্ত চিঠিগুলি তিনি যদি প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে মহর্ষির জীবনীর কী চমৎকার উপকরণ পাওয়া যাইত! বাকি চিঠিগুলি শাস্ত্রীমহাশয়ের মৃত্যুর পরে কোথায় বিলুপ্ত হইয়াছে কে জানে! তাঁহার পুত্রদের কাহারো কাছে কোনো চিঠি নাই—যে দু-একখানি চিঠি ছিল তাহা 'পত্রাবলী'তেই ছাপা হইয়াছে।

তাহা হইলেও মহর্ষির কালের নানা কাগজে পত্রে, বিশেষভাবে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাগুলিতে তাঁহার কালের ইতিহাস বাঁধা পড়িয়া আছে। কেবলমাত্র তত্ত্ব-বোধিনীগুলি যত্নপূর্বক পড়িলে তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত অনেক সংগ্রহ করিতে পারা যায়। তার পর ৪১ বছর পর্যন্ত তাঁহার স্বরচিত জীবনচরিতই আছে এবং সৌভাগ্যক্রমে রাজনারায়ণবাবুরও আত্মচরিত প্রকাশিত হইয়াছে। তার পরে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পর্ব। সে পর্বের নানা ইতিহাস নানা গ্রন্থে, নানা কাগজে পত্রে ছড়াইয়া আছে। মহর্ষির পুত্রকন্যাগণ পিতার সম্বন্ধে স্মৃতিলিপি লিখিয়াছেন। শেষ বয়সের কথা তাঁহাদের নিকট হইতে, এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় প্রভৃতি তাঁহার ভক্ত ও অনুগত বন্ধুদিগের নিকট হইতে পাওয়া যায়। অতএব এইখানে আমি এ জীবনচরিত রচনায় যাঁহাদের যাঁহাদের কাছে সাহায্য পাইয়াছি তাঁহাদের কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

মহর্ষির পুত্রকন্যাগণের মধ্যে পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীমতী সৌদামিনী দেবীর নিকটে আমি অনেক সাহায্য পাইয়াছি ও সেজন্য তাঁহাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাঁহার পৌত্রগণের মধ্যে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী; তাঁহার একান্ত উৎসাহ ও আগ্রহ ভিন্ন এ চরিত-গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়াই দুঃসাধ্য ছিল। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত স্বর্গীয় গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকটে লিখিত মহর্ষির অনেকগুলি চিঠি আমাকে ব্যবহার করিতে দিয়া আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। রাজনারায়ণবাবুর অপ্রকাশিত ডায়ারি ব্যবহার করিবার জন্য শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞ এবং স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অপ্রকাশিত ডায়ারি হইতে কতক কতক স্থান উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহার পুত্রকন্যাগণের কাছেও আমি ঋণী আছি। শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় তাঁহার পিতা স্বর্গীয় বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের কাছে লিখিত মহর্ষির অনেকগুলি চিঠিপত্র আমাকে ব্যবহার করিতে দিয়াছেন; অনেক পুরাতন গ্রন্থও আমাকে ব্যবহার করিতে দিয়াছেন— এজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। মহর্ষির জীবন সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহের জন্য ভক্তিভাজন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, পরলোকগত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, নব্বই বছরের বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহর্ষির ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীযুক্ত সিতিকণ্ঠ মল্লিক, ডাক্তার ডি. রায় ও অন্যান্য অনেক লোকের কাছে আমি যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি। তাঁহার মসূরী ও দেরাদুন পাহাড়ে চারি বছর বাসের একটি বিবরণ তাঁহার ভক্ত শিষ্য শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ মহাশয় শারীরিক অসুস্থতা-সত্ত্বেও আমাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন এবং আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার তাঁহার পিতামহ রাখালদাস হালদার মহাশয়ের ডায়ারি ও চিঠিপত্র দিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। এ গ্রন্থ রচনায় আদি ব্রাহ্মসমাজ ও শান্তিনিকেতন আশ্রমের গ্রন্থাগারও আমাকে কম সাহায্য করে নাই।

কিন্তু এ গ্রন্থরচনায় বিশ্ববিখ্যাত মনীষী ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহোদয়ের কাছে আমি যেমন সাহায্য পাইয়াছি, এমন আর কাহারো কাছে নয়। তিনি মহর্ষির সকল গ্রন্থগুলি আগ্রহের সঙ্গে পড়িয়া তাঁহার ধর্মতত্ত্বের ক্রমপরিণতি সম্বন্ধে, ধর্মতত্ত্ববিৎ হিসাবে তাঁহার স্থান সম্বন্ধে, এবং তাঁহার মানসিক বিকাশ সম্বন্ধে আমার সঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সেই

আলোচনা আমি যথাশক্তি লিপিবদ্ধ করিয়া লইয়াছিলাম। পরিশিষ্টভাগে মহর্ষির ধর্মতত্ত্বের ক্রমপরিণতি সম্বন্ধে যে অধ্যায়টি আছে, তাহা তাঁহারি আলোচনার সারমর্ম যাহা লিখিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা অবলম্বনে লিখিয়াছি। ইহা ছাড়া এ গ্রন্থের গোড়ার অধ্যায় "জীবনচিত্রের খসড়া" ও প্রথম খণ্ডের দশম অধ্যায় "ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি—ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ" সম্বন্ধেও তাঁহার পরামর্শ ও সাহায্য যথেষ্ট পাইয়াছি। তাঁহার এই সাহায্য আমার পক্ষে অমূল্য, ইহা জানিয়া আমি তাঁহার নিকট অপরিশোধ্য ঋণে বাঁধা রহিলাম।

বাঁকিপুর রামমোহন সেমিনারির অধ্যক্ষ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী এম. এ. আমাকে হাফেজ ও হাফেজের প্রভাব মহর্ষির জীবনে কিভাবে কাজ করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইয়া সাহায্য করিয়াছেন—পরিশিষ্টভাগে সে প্রবন্ধটিও গেল। পারস্য ভাষায় সতীশবাবুর বেশ অধিকার আছে। দীবান্ হাফিজ গ্রন্থ হইতে মহর্ষির আত্মচরিতে যে-সকল উদ্ধৃত অংশ আছে সেগুলি তিনি বাংলা অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছেন এবং উচ্চারণ-সংকেতও সেইসঙ্গে লিখিয়া দিয়াছেন। হাফেজ সম্বন্ধে তাঁহার এই রচনা মহর্ষিকে বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিবে। তাঁহার কাছেও আমি এজন্য কৃতজ্ঞ রহিলাম।

পরিশেষে আমার আর-একটি নিবেদন আছে। আধ্যাত্মিক জীবনের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা আমার নাই; সুতরাং এত বড়ো একজন সাধকের অধ্যাত্ম-জীবনের কথা কেবলমাত্র মনস্তত্ত্বের দিক হইতে আলোচনা করিতে গিয়া হয়তো নানা গলদ করিয়াছি। যাঁহারা সাধক তাঁহারা সে-সকল কথা লিখিলে যে সরসতা প্রকাশ পাইত, আমার রচনায় তাহার অভাব দেখিয়া তাঁহারা হয়তো ক্ষুণ্ণ হইবেন। কিন্তু মহর্ষিকে কেবলমাত্র একজন ধর্মনিষ্ঠ সাধকরূপে দেখিলে এ জীবনচরিত লিখিবার সংকল্প আমার পক্ষে ধৃষ্টতা হইত। তাহা হইলে ইহাতে আমি হাতও দিতাম না। মহর্ষিকে আমি কেবলমাত্র একজন ধ্যানপরায়ণ সাধকহিসাবে দেখি নাই— তাঁহার অসাধারণ মনীষা ছিল, তাঁহার চিত্তক্ষেত্রের বিশ্বব্যাপী প্রসার ছিল। ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে, সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার সেই চিত্তশক্তির, তাঁহার মনীষার ক্রিয়া বেশ ভালো করিয়া লক্ষ করা যায় এবং দেখা যায় যে পূর্ব ও পশ্চিম সভ্যতার ধারার মোহানায় যাঁহারা এযুগে যুগসমন্বয়প্রতিষ্ঠাতা ও যুগসমস্যামীমাংসক হইয়া সকল তত্ত্বকে সার্বভৌমিক তত্ত্ব করিয়া বিশ্বমানবের অখণ্ড স্বরূপবোধে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একজন প্রধান। অথচ সেই বড়ো জায়গাটিতেই তাঁহার এই মনীষা

ও চিত্তশক্তির শেষ পরিচয় হয় নাই—তাঁহার মধ্যে দেশাত্মবোধ যথেষ্ট প্রবল ছিল। দেশের শিল্প, সংগীত, ভাষা, সাহিত্য, ধর্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, অনুষ্ঠান, বেশভূষা, আচার-ব্যবহার সমস্তই বড়ো করিয়া বিশুদ্ধ করিয়া পরিপূর্ণ করিয়া তিনি গড়িয়া গিয়াছেন। এ সমস্তেরই তিনিই জন্মদাতা বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। বিশ্বমানবের বিস্তৃত ভূমিতে তিনি দেশাত্মবোধের পত্তন করিয়াছেন। কিন্তু এইখানেও আবার তাঁহার মনীষার শেষ পরিচয় হয় নাই। নদী যেমন সংসারের বিচিত্র প্রয়োজন সারিয়া চলে কিন্তু তাহার আসল লক্ষ থাকে সাগরের দিকে—তেমনি তিনি যুগসমন্বয়প্রতিষ্ঠাতা হইয়া, দেশাত্মবোধের জন্মদাতা হইয়া তত্ত্বে, সাহিত্যে, সমাজের নানা অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানে নানা কাজ করিয়া গেলেও তাঁহার শেষ লক্ষ্য ছিল ব্রহ্মসমুদ্র। আর সমস্তই সেই লক্ষ্যসাধনের সহায়। সেই ব্রহ্মসমুদ্রের প্রতি মনের টান, সেই সমুদ্রের মধ্যে নিমগ্ন নিবিষ্টতার কথা যদি এ গ্রন্থে খুব বেশি করিয়া না বলিয়া থাকিতে পারি, তবে এ গ্রন্থ অসম্পূর্ণ হইয়াছে ইহা মানিতেই হইবে। কিন্তু সেই লক্ষ্যসাধনের পথযাত্রার ইতিহাস, পাথেয়ের ইতিহাস, যদি কিছু পরিমাণে দাঁড় করাইতে পারিয়া থাকি, তবেই আমি আমার সমস্ত শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

এ গ্রন্থে অনেক ভুল থাকার সম্ভাবনা। সহৃদয় পাঠকপাঠিকারা সেগুলি আমায় সংশোধন করিয়া দিলে পরবর্তী সংস্করণে গ্রন্থখানি অপেক্ষাকৃত নির্ভুল হইতে পারিবে।

এ গ্রন্থের চিত্রসংগ্রহের জন্য আমি প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে ঋণী। তিনি যত্ন করিয়া ছবি সংগ্রহ করিয়া না দিলে এ গ্রন্থ চিত্রশোভিত হইয়া বাহির হইতে পারিত না।

[১৯১৬] শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্তী

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্ম : ৩ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার ১২২৪, ১৫ মে ১৮১৭

মৃত্যু : ৬ মাঘ বৃহস্পতিবার ১৩১১, ১৯ জানুয়ারি ১৯০৫

জীবনচিত্রের খসড়া

কোনো মানুষের জীবনচরিত আলোচনা করিতে গেলে গোড়ায় আমাদের চোখে পড়ে, কতগুলি ঘটনা। জীবনের নাটবেদীর উপরে এক-একটা ঘটনা আলোয় আসিয়া কিছুকালের মতো খেলিয়া যায় এবং তার পরে অন্ধকারের নেপথ্যে লুকায়— তাহার কোনোটার মুখে বা হাসির সোনালি আলো, কোনোটার মুখে বা কান্নার কালো ছায়া। এই হাসিকান্নায় গাঁথা ঘটনাগুলির আসা-যাওয়ার কোনো মানে খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত হইতে পারে। এগুলিকে ছায়াবাজীর মতো ফাঁকা বলিয়াই মনে হওয়া অসম্ভব নয়।

কিন্তু এই জীবননাট্যের যে অধিকারী নেপথ্যে থাকিয়া সমস্ত নাটকটিকে জমাইতেছে, ঘটনাগুলি তাহার কাছে তো ছায়াবাজীর মতো খাপছাড়া নয়। তাহার অখণ্ড জীবনের মধ্যে সমস্ত ঘটনাগুলি মিলিয়া গিয়া একটি আশ্চর্য তাৎপর্যকে খুলিয়া দেখায়। একজন মানুষের নানালোকের সঙ্গে নানানতর সম্বন্ধ, পারিবারিক, বৈষয়িক ও সামাজিক দিক, তাহার ভাবনাচিন্তা, ধর্মকর্ম— এ সমস্তই তাহার বিচিত্র সাজের মতো। অথচ এই-সব সাজের পিছনে আসল মানুষটি। সেই আসল মানুষটি যে লোকে বাস করে, সে একটি ভাবলোক ; আর যাহাকে আমরা বাস্তব লোক বলি, সে তাহার প্রকাশের ক্ষেত্র — সেইখানে তাহার জীবননাট্যের অভিনয় চলিতেছে। বাস্তব লোকের পিছনে সেই নিগূঢ় ভাবলোকের পর্দা যে তুলিয়া দেখিতে ও দেখাইতে পারে, তাহাকেই বলি মনস্তত্ত্ববিৎ। কারণ সে ঘটনাকে দেখায় না, সে মনকে দেখায়। সেই তো যথার্থ জীবনচরিত লেখে।

অথচ বাস্তব ঘটনালোকের পিছনে, এই অদৃশ্য মানসলোককে বাহির করাই যে জীবনচরিত-লেখকের প্রধান কাজ, তাহা মনে করিলেও ভুল হইবে। মানুষের মনটাকে পাইলে তবে তাহার বাহিরের ঘটনাগুলির তাৎপর্য বুঝা যায়, ইহা সত্য। কিন্তু মানুষের মনটা তো একটা আধার-শূন্য, অবলম্বন-শূন্য, হাওয়ায়-ঝোলানো পদার্থ নয়। তাহার চারি দিকে একটা অদৃশ্য কালশক্তি নিয়ত কাজ করিয়া চলিয়াছে। সেই কালের ঘূর্ণায়মান চক্র হইতে কত পুরাতন উৎক্ষিপ্ত হইতেছে, আবার কত নূতন সৃষ্টি সেখানে স্ফুলিঙ্গ হানিতেছে। কালের এই সুদর্শন চক্রটি যাঁহার হাতে পড়ে তাঁহার মধ্যে সংহার এবং সৃষ্টির যুগপৎ লীলা দেখিতে পাওয়া যায়।

কোনো বড়ো লোকের জীবনের মধ্যে সেই সৃজন-লীলাকেই তো আমরা বিশেষ ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। তাঁহার কালের একটি বড়ো অভিপ্রায় তাঁহার জীবনীশক্তির মধ্যে সংহত হইয়া তাঁহার সমস্ত জীবনের সকল সৃষ্টির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইবার চেষ্টা করে। আতস কাচের পিঠে কোনো জিনিসকে রাখিয়া এবং কতকটা সূর্যকিরণকে সেখানে সংহত করিয়া যেমন অগ্নিকাণ্ড দেখানো যাইতে পারে, তেমনি কালের অভিপ্রায়কে একটা বড়ো জীবনের মধ্যে যখন সংহত আকারে দেখিতে পাওয়া যায়, তখনি সেই জীবন যে কোথা হইতে এত শক্তি লাভ করে, তাহার অর্থ বুঝা যায়।

এই কালের অভিপ্রায় যাহাকে বলা হইতেছে, তাহা একটি বিশ্বশক্তি। এই বিশ্বশক্তি যখন একটি বিশিষ্ট জীবনের মধ্যে প্রকাশ পায়, তখনই সেই জীবন আপনার বিশেষের গণ্ডী ডিঙাইয়া বিশ্বের জিনিস হইয়া উঠে। তখনি তাহার জীবন আলোচনার বিষয় হয়। এমন অনেক জীবন পৃথিবীতে আছে, যাহাদের মধ্যে অনেক সদ্‌গুণ অনেক সৌন্দর্য দেখিতে পাওয়া যায়— কিন্তু সে-সকল জীবন এইজন্য বড়ো জীবন হয় না যে তাহাদের ভিতর দিয়া এই কালশক্তি আপনার সুদূর ভবিতব্যতাকে অগ্রসর করিয়া আনিবার জন্য কাজ করে না। তাহাদের ভিতর হইতে কোনো সজীব ভাব-বস্তু (Idea) নদীর মতো আপনার খাত কাটিয়া আপনার তট বাঁধিয়া বহিয়া আসে না এবং সমস্ত মানুষের সমাজের জন্য সোনার ফসল দুই তীরে তীরে ফলায় না। সেইজন্য সে-সকল জীবনের কথা মানুষ কীর্তন করিয়া বেড়ায় না। তাহারা বিশেষের সীমানার মধ্যে চিরদিনই নজরবন্দী হইয়া থাকে।

কিন্তু শুধু বাহিরের এই কালশক্তির দ্বারাই যে বড়ো জীবন তৈরি হইয়া উঠে, এ কথা মনে করা আবার ভুল। তাহা হইলে তো বড়ো জীবন কখনোই দেশ-কালের খণ্ডতাকে কাটাইয়া চিরন্তন সত্যকে ধরিতে পারিত না। দেশকালকে অতিক্রম করিবার মতো একটি শক্তি অন্তর্নিহিতভাবে বড়ো জীবনের মধ্যে থাকে। তাহাই দেশকালের ভিতর দিয়া তাহার ভাবী অভিপ্রায়কে সার্থক করিবার জন্য সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই কথাটিকে লক্ষ্য করিয়া জার্মান দার্শনিক অয়কেন বলিয়াছেন— "There is a definite transcendental principle in man ... It is the core of personality. There God and man initially meet." মানুষের মধ্যে সমস্ত খণ্ডতাকে অতিক্রম করিবার মতো

একটি বিশিষ্ট নিয়ম আছে। ইহাই তাহার ব্যক্তিত্বের মর্ম। এইখানেই জীব এবং ভগবানের মিলন-স্থান। আমাদের অবতারবাদের দেশে এ কথা কিছুমাত্র নূতন নয়। আমরা দেশ-কালের ভিতর দিয়া বড়ো জীবনকে দেখিবার চেষ্টা বড়ো একটা করি না, দেশকালের অতীত করিয়াই দেখি। কিন্তু দুই দিক দিয়া দেখিলে যথার্থ পূর্ণ দেখা হয়।

কারণ, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কোনো বড়ো জীবন হইতে যে ভাব-বস্তুটি আমরা পাই, তাহা সমস্ত বিশ্বের জিনিস এবং চিরন্তন কালে তাহার স্থান হইলেও খণ্ড দেশকালের মধ্যেই তাহার উদ্‌ভব ও প্রকাশ। বিশ্বমানব এই যে বিশ্বদেশ বিশ্বজাতির মধ্য দিয়া যুগে যুগে রূপে রূপে বৈচিত্র্যে বৈচিত্র্যে প্রকাশ পান, ইহাতে তাঁহার বিশ্বত্ব কিছু খর্ব হয় না, কিন্তু বিশেষত্ব বাড়িয়াই চলে। অথচ যেমন করিয়া পথিক তাহার রাত্রের বিশ্রামের পান্থশালাকে পিছনে ফেলিয়া সকাল বেলায় নূতন যাত্রাপথে নবোদ্যমে চলিতে থাকে, তেমনি এই রূপের পর রূপ, অনুষ্ঠানপ্রতিষ্ঠানের পর অনুষ্ঠানপ্রতিষ্ঠান, বিশ্বমানবের বিরাট্‌ যাত্রাপথে পিছনে পরিত্যক্ত হইয়া কোথায় পড়িয়া থাকে। বিশ্বমানবের সম্পূর্ণ ভাবটিকে কোনো রূপই পুরা প্রকাশ করিতে পারে না। এইজন্য চলিতে চলিতে তাহাকে এক-একটা আশ্রয় গড়িতে হয় বটে, কিন্তু আবার সেই আশ্রয়কে বিসর্জন দিয়া চলিতে হয়। প্রতিযুগেই বিশ্বমানবের এই সৃজনপ্রলয়লীলা যুগপৎ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতিযুগের মধ্যে একটি দিক সেইজন্য থাকে নূতন, আর-একটি দিক থাকে সনাতন। এবং যুগের অভিপ্রায় যে মানুষের জীবনে সার্থক, তাহার মধ্যেও এই দুই দিকের প্রকাশই আছে। তাহার মধ্যেও এমন অনেক জিনিস আছে যাহা কালের স্রোতে ভাসিয়াই যাইবে এবং এমন অনেক জিনিস আছে যাহা কালকে অতিক্রম করিয়া শাশ্বত ও সনাতন হইয়া বিরাজ করিবে। দেশ-কালের মধ্যেই যে দেশকালাতীতের প্রকাশ আছে, এ কথাটা বিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে শক্ত হয়। কিন্তু কোনো বড়ো জীবন যখন আলোচনা করি, তখনি এ কথা যে সত্য তাহা বুঝিতে পারি।

ম্যাট্‌সিনি তাঁহার "Faith and the Future" নামক একটি প্রবন্ধে এই কথাটিই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "যে-সকল লেখক যুগগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে— একটাকে বলে organic বা সজীব ও অখণ্ড এবং অন্যটাকে বলে critical বা বিশ্লিষ্ট ও খণ্ডিত— তাহারা ইতিহাসকে ভুল করিয়া

দেখে। প্রত্যেক যুগ বস্তুতই অখণ্ড, প্রত্যেক যুগই সজীব।" তার পরে তিনি বলিয়াছেন, "আমরা যদি ব্যক্তিগত জীবনের রহস্য বা নিয়ামক তত্ত্ব অবধারণ করিতে চাই, তবে আমাদিগকে বিশ্বমানবের (Humanity) 'আইডিয়া'য় উঠিতে হইবে।" অর্থাৎ যুগকে সজীব ও অখণ্ড ভাবে দেখিতে গেলেই, যুগ-প্রবর্তক মহাত্মাদিগকে বিশ্বমানবের চিরন্তন সভায় হাজির করা চাইই চাই। তাঁহাদিগকে খণ্ডকালের মধ্যে খণ্ডদেশের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া দেখিলে যুগের অখণ্ডতা ও সজীবতার ভাবই নষ্ট হইয়া যায়।

এ কথা মনে করা ভুল যে একটা যুগের সমস্ত অভিপ্রায় কোনো একটি ব্যক্তির জীবনের ভিতর দিয়া কখনো চরিতার্থ হইতে পারে। যুগভাবটি মধুঋতুর মতো; বিচিত্র ফুলের স্ফুটনের ভিতর দিয়া তবে তাহার সার্থকতা। আমরা যদি মধুপের মতো কোনো একটি ফুলের মধুকেই উজাড় করিতে বসিয়া যাই, তবেই যাহার মধুসংগ্রহ করি, তাহাকে রিক্ত করিয়া তিক্ত করিয়া ছাড়িয়া দিই। সেইজন্য ভল্টেয়ারের উপর রাগ হয় না, যখন দেখি খৃস্টের নাম শোনা মাত্র তিনি বলিতেন, "দোহাই তোমার, ও লোকটার নাম আর আমায় শোনাইয়ো না।" পৃথিবীতে যাহা-কিছু আধ্যাত্মিকতা তাহা ঐ এক খৃস্টেই আছে, এমন সত্যবিকারের যদি সৃষ্টি করা হয়, তবে তাহার প্রতিবাদ না করিয়া মানুষ বাঁচে কেমন করিয়া? বিশ্বপ্রকৃতি যেমন তাহার কেন্দ্রানুগ বা কেন্দ্রাতিগ কোনো শক্তিকেই একমাত্র শক্তি হইতে দেয় না, কারণ তাহা হইলে প্রলয় উপস্থিত হয়, ঠিক তেমনি বিশ্ব-মানব কখনোই কোনো যুগের একজন মানুষকে আর-সকলের চেয়ে বড়ো করিয়া খাড়া করিয়া রাখিতে পারে না। কারণ তাহাতেই ভল্টেয়ারের মতো বিতৃষ্ণার ও অবজ্ঞার সূত্রপাত হয়।

জীবনচরিত-লেখকের পক্ষে এইজন্য মহা মুশকিল। যাহার চরিত সে লেখে, তাহাকে ফুলচন্দন দিয়া পূজা না করিলে তাহার চরিত চরিতামৃত হয় না, অথচ সেই চরিতামৃত বিশ্বমানবকে পরিবেশন করিতে গেলেই সে তাহা আবর্জনা বলিয়া দূরে ফেলিয়া দেয়। শ্রদ্ধার উত্তাপ ও আবেগ না থাকিলে চরিতকথা অস্থিবিদ্যাজাতীয় নীরস ইতিহাস হইতে পারে, তাহাতে রক্তমাংসের সজীবতা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। অতিভক্তি এবং ভক্তির অভাব— এই দুইই চরিত-লেখকের পক্ষে সমান বিপদের কারণ।

এই উভয় সংকট হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার একমাত্র রাস্তা— কোনো মানুষের

অন্তর্নিহিত শক্তি হইতে স্ফূর্ত হইতেছে যে তাহার জীবনচরিতটি— যুগের ইতিহাসের অভিপ্রায়ের মধ্যে তাহাকে মেলিয়া ধরা। তাহার জীবনে সে অভিপ্রায় কি পরিমাণে সার্থক হইয়াছে এবং কি পরিমাণে হয় নাই চরিতালোচনার সময়ে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করা। তাহা দেখাইতে গেলেই জীবনের ভিতরকার মনঃশক্তি এবং বাহিরের বিশ্বশক্তির ঘাত-প্রতিঘাতের নাট্যলীলার ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে। অঙ্কে অঙ্কে সেই নাটক জমিয়া উঠিতেছে এবং অবশেষে আপাতোব্যর্থতায় হৌক বা রমণীয় সার্থকতায় হৌক একটি পরিণামে আসিয়া সমাপ্ত হইতেছে, ইহা দেখা যাইবে। জীবনের ভিতরকার শক্তি কোথায় তাহার খোঁজ করিতে গেলে মনস্তত্ত্বের রীতিমত বিশ্লেষণ চাই। বাহিরের বিশ্ব-শক্তির কি প্রভাব তাহার উপরে পড়িতেছে তাহার খোঁজ করিতে গেলে কালের ইতিহাসের দৃশ্যপট তুলিয়া ধরা চাই। তার পর এই দুয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে জীবনের যে নাটক জমিল, তাহাকে দেখাইতে হইবে। জীবনচরিত লেখার ইহাই একালের আদর্শ।

এমন করিয়া জীবনচরিত লিখিবার চেষ্টা করিলে কোনো একজন মানুষ— হোন্ তিনি ঋষি, খৃস্ট বা বুদ্ধ— এমন অস্বাভাবিক রকম বড়ো হইয়া উঠেন না যে তাঁহাকে লইয়া একদল মানুষ প্রতিমা পূজা করিতে বসিয়া যাইতে পারে। বরং তখন দেখা যায় যে মহৎজীবনের ইতিহাস কতকটা নামতা মুখস্থ করার তালিকার মতো— এক যুগের মহাপুরুষ পূর্ববর্তী অন্য পাঁচটা যুগের মহাপুরুষের গুণফল। পৃথিবীতে কোনো শক্তিই যে মরে না কিন্তু রূপান্তরিত হয় মাত্র, বিজ্ঞানের এই তত্ত্ব তখন জীবনে খাটানো যাইতে পারে এবং দেখানো যাইতে পারে যে পৃথিবীতে কোনো যুগশক্তিই মরে না বা কোনো যুগের কোনো মহাপুরুষের জীবনই নষ্ট হয় না, কিন্তু রূপান্তর লাভ করে এবং ভাবী কালের নব নব সম্ভাবনাকে সম্ভাবিত করে।

২

এ যুগের ভিতরকার অভিপ্রায় কি? এবার ইতিহাসের যবনিকাখানি তুলিয়া তাহাই দেখিবার চেষ্টা করা যাক।

প্রায় একশো বছর হইতে চলিল, আমাদের দেশে একটা নূতন যুগের পত্তন হইয়াছে। এ যুগের যদি কোনো নাম দিতে হয়, তবে ইহাকে রামমোহন যুগ

বলা যাইতে পারে। ইতিহাসে সাধারণত ইহাকে ব্রিটিশ যুগ বলা হয়— অবশ্য ইহা ঠিক যে ব্রিটিশ অধিকারে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-দীক্ষা পাইয়াই আমাদের দেশ সকল দিক হইতে বিশ্বের পরিচয় লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারায় পুরাতনের অনেক প্রাণহীন বালুকারাশি বাঁধ বাঁধিয়া তাহার স্রোত বন্ধ করিয়াছিল। বিশ্বের জোয়ার ভাঁটা আর তাহাতে খেলিতেছিল না। এ যুগে যে সে-সকল বাঁধ ভাঙিতে আরম্ভ করিয়াছে, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাই তাহার কারণ। এ দেশে ইংরাজী শিক্ষার গোড়াকার ইতিবৃত্ত পড়িলে বেশ দেখা যায় যে ১৭৮৯ খৃস্টাব্দের ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের ঢেউ সমুদ্র পার হইয়া আসিয়া এক সময়ে এ দেশেও একটা ছোটোখাটো বিপ্লব জাগাইয়াছিল। হিন্দুকালেজের গুরু ডিরোজিয়োর শিষ্যেরা এক-একজন ছোটোখাটো রব্‌স্‌পিয়ের ও ড্যাণ্টন বিশেষ ছিলেন বলিলেই হয়। তাঁহারা নিজের দেশকে, দেশের ইতিহাসকে, সমাজকে, ধর্মকে, রীতিনীতিকে অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা করিতে শুরু করিয়াছিলেন এবং খড়্গ ও শাবল হাতে সমস্ত ভাঙিয়া চুরিয়া ধূলিসাৎ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। অথচ হিন্দু-কালেজ প্রতিষ্ঠার 'প্রধান উদ্যোগী রামমোহন রায় হিন্দুকালেজ খোলার বছর-দুই পূর্বে বেদান্তশাস্ত্র, বেদান্তের ভাষ্য সকল বাংলায় ও ইংরাজীতে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তার পর হইতে আমাদের সকল শাস্ত্র যে নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনাকে শ্রেষ্ঠ উপাসনা বলিয়াছে এই কথা নানা পণ্ডিতের সঙ্গে বিচারে বিতর্কে প্রমাণ করিবার জন্য তিনি প্রাণপণে লাগিলেন। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা এ দেশে আনিবার জন্য রামমোহন রায়ের মতো কেহই লড়ে নাই; আবার হিন্দু-সভ্যতার সার ধন যে তাহার ব্রহ্মজ্ঞান— সর্ব শাস্ত্র মন্থন করিয়া তাহা দেখাইবার জন্যও কেহই অমনতর পরিশ্রম করে নাই। অতএব এ দেশে যখন ফরাসীবিপ্লবের ছোটোখাটো অভিনয় চলিতেছিল, তখন নূতন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব রামমোহন রায় যদি না মিটাইতেন, তবে ডিরোজিয়োর দলই একদিন জয়লাভ করিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এইজন্য এ যুগকে ব্রিটিশ যুগ নাম না দিয়া রামমোহন যুগ বলাই সংগত হয়।

অনেকে মনে করেন যে বোধ হয় ফরাসী দেশীয় এন্‌সাইক্লোপিডিস্ট্‌দের রচনার সঙ্গে রামমোহন রায়ের তেমন পরিচয় ছিল না। কারণ, সমস্ত ইউরোপ এক সময়ে যেমন সকল বন্ধন হইতে মুক্ত এক ভাবী যুগের কল্পচ্ছবি দেখিয়া মাতিয়া উঠিয়াছিল— রামমোহন রায় কেন সে রকম মাতিয়া উঠিলেন না?

কিন্তু রামমোহন রায়ের যে "এক হাতে কৃপাণ ছিল, আর এক হাতে হার"। তাঁহার কৃপাণ তিনি ভল্টেয়ার প্রভৃতির অস্ত্রশালা হইতে সংগ্রহ তো করিয়াছিলেনই। তাহা ছাড়া আরব দেশীয় যুক্তিপন্থী মতাজাল ও মওয়াহেদ্দীন -সম্প্রদায়ের দার্শনিক গ্রন্থ হইতেও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মজ্ঞানের যে জ্যোতির্ময় হারটি তাঁহার হাতে ছিল, তাহার স্নিগ্ধ স্থির প্রভায় কৃপাণের চঞ্চল বিদ্যুদ্দীপ্তি ম্লান হইয়া গিয়াছিল। সেইজন্য তিনি ফরাসী এন্‌সাইক্লোপিডিস্ট্‌দের মতো ঐতিহাসিক বোধকে বিসর্জন দিয়া প্রাচীনের সমস্তই দুষ্ট ও নষ্ট বলিয়া একেবারে অভিনব উপায়ে সব নূতন করিয়া তৈরি করিবার কল্পনায় মাতেন নাই। অবশ্য সকল কুসংস্কারের দুর্গকে ভাঙিতে হইবে, অলৌকিক অভ্রান্ত শাস্ত্রকে দৈবলোক হইতে নামাইয়া তাহাকে লৌকিক ও ভ্রান্ত প্রমাণ করিতে হইবে এবং কেবলমাত্র বিশ্বপ্রকৃতির সজীব গ্রন্থটিকে নিজের যুক্তি ও জ্ঞানের সাহায্যে পড়িতে হইবে—ভল্টেয়ার প্রভৃতির এই বিদ্রোহের ভাব যে রামমোহন রায়ের মনকে ঘা দেয় নাই তাহা নয়। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে এ কালের এই মন্ত্র—এই স্বাধীনতার মন্ত্র। অথচ কি আশ্চর্য, যে শাস্ত্রের উপরে তিনি শেষ পর্যন্ত ভরসা হারান নাই। হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান প্রভৃতি সকলের ধর্মশাস্ত্র খুব গভীরভাবে আলোচনা করিয়া তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে শাস্ত্রের সবই সত্য না হইলেও, কালের অনেক জড় ভার তাহার মধ্যে জমা থাকিলেও নিত্য সত্যের বাণী কোনো-না কোনো আকারে তাহার মধ্যে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে। হীরা যেমন কয়লারই রূপান্তর, তেমনি শাস্ত্রের মধ্যে নানা অর্থবাদ ঘাঁটিয়া সত্যের হীরা কোথাও-না কোথাও পাওয়া যাইবেই যাইবে। ভল্টেয়ার প্রভৃতির কৃপাণ তিনি শাস্ত্রের জঙ্গল সাফ করিবার কাজে কসিয়া ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি জানিতেন যে শাস্ত্রে সত্যের ফুলের বাগানই ভ্রান্তির জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে, শাস্ত্রের আগাগোড়াই জঙ্গল নয়।

ফরাসী এনসাইক্লোপিডিস্ট্‌দের একটা ধারণা ছিল যে, কতকগুলি চালাক ও স্বার্থপর পুরোহিত এবং রাজারা মিলিয়া ধর্মশাস্ত্র অভ্রান্ত, পোপ ঈশ্বরের প্রতিনিধি, রাজার অধিকার স্বর্গীয় অধিকার ইত্যাদি বিস্তর অন্ধ সংস্কার সাধারণ লোকদের মনে বদ্ধমূল করিয়া দিয়া তাহাদের উপরে চিরকাল জুলুম করিয়াছে। অতএব মানুষের সমাজে যাহা-কিছু অন্যায় ও অত্যাচার হইয়াছে, তাঁহারা সে সমস্তেরই দায় ঐ পুরোহিত এবং রাজা বেচারীদের ঘাড়ে চাপাইয়া নিশ্চিন্ত

হইয়াছিলেন। এইজন্যই তাঁহারা পুরোহিত, চর্চ্, ধর্মশাস্ত্র—কোনোটাকেই শ্রদ্ধা করিতেন না। কিন্তু ইতিহাসকে এমন একদল মানুষের চাতুরীর ক্ষেত্র বলিয়া দেখা যে কতখানি ভুল দেখা তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমরা এখন ভাবিয়া অবাক হই যে কেমন করিয়া সমস্ত ইতিহাসকে মানুষ এমন বিকৃত চোখে এক সময়ে দেখিয়াছিল। রামমোহন রায় যদিও পরবর্তীকালের বিবর্তন-বাদী (**Evolutionist**) লেখকদের কোনো রচনা পড়েন নাই, তবু তাঁহার ঐতিহাসিক বোধ যথেষ্ট তীক্ষ্ণ ছিল। এমন এক-তরফা বিচার তিনি কোনো-মতেই করিতে পারিতেন না। হব্‌স্, লক্, রুশো প্রভৃতির মতো তিনি কখনোই মনে করিতে পারিতেন না যে জনসমাজের উৎপত্তি হইয়াছে কতগুলি মানুষের বিশেষ বিশেষ শর্তে (Contract) বাঁধা পড়ায় জন্য— যেন কোনো এককালে কতগুলি মানুষ জটলা করিয়া মন্ত্রণা করিয়া জনসমাজের সৃষ্টি করিয়াছে। রামমোহন রায় যেমন শাস্ত্রের মধ্যে কতগুলি নিত্য সত্যের পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন, তেমনি সমাজতত্ত্বের মধ্যেও কতগুলি মূল বিশ্বাস যে সমাজের ভিত্তিতে থাকিয়া তাহাকে গড়িয়াছে, ইহাও তিনি স্পষ্টই দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি মনে করিতেন, আত্মায় বিশ্বাস এবং পাপ-পুণ্যের ফলভোগে বিশ্বাস— এই দুইটি মূল বিশ্বাস সমাজতত্ত্বের ভিত্তির মতো। ইহা ছাড়া শুচিতা অশুচিতা খাওয়া ছোঁওয়া প্রভৃতি ব্যাপারের যে-সকল অযৌক্তিক বিশ্বাস সমাজে আছে, রামমোহন রায় তাহাদিগকে সমাজের পক্ষে অত্যন্ত অমঙ্গলজনক মনে করিতেন।

রামমোহন রায়ের পূর্বে আমাদের দেশে কোনো জ্ঞানী বা সাধক ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে সমাজতত্ত্বের এমন-কি আইন প্রভৃতি লোকবিধিতত্ত্বের এমন যে ঘনিষ্ঠ অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে, তাহা বুঝিতে পারেন নাই। সেইজন্য বরাবর দেখা যায় যে, আমাদের দেশের ধর্মপ্রবর্তকগণ সমাজকে কোথাও ঘাঁটান নাই। সমাজকে একপাশে ঠেলিয়া রাখিয়া আধ্যাত্মিক সাধনার কৈলাসশিখরে তাঁহারা ভক্ত-বৃন্দকে লইয়া গিয়াছেন। রামমোহন রায় যেমন ধর্মের জঙ্গল সাফ করিতে লাগিয়া গেলেন, তেমনি সমাজের সঙ্গে ধর্মের সেতুবাঁধার কাজেও তাঁহার বিশেষ উৎসাহ দেখা গেল। এ কাজ শুধু ভারতবর্ষে কেন, পশ্চিম দেশেও কোনো ধর্মপরায়ণ লোকের দ্বারা হয় নাই। এ একেবারে আধুনিক কালের ভাব। সকলেই জানে যে রামমোহন রায় সতীদাহ নিবারণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে চেষ্টা বিদ্যাসাগর যেমন করিয়া বিধবা-বিবাহ প্রচলন করিবার চেষ্টা করিয়া-

ছিলেন বা কেশবচন্দ্র যেমন অসবর্ণ-বিবাহ চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে-রকমের কেবলমাত্র একটা সামাজিক প্রথা বদলাইয়া তার জায়গায় আর-এক প্রথা দাঁড় করাইবার চেষ্টা নয়। 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সংবাদ' (১৮১৮) এবং 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সংবাদ' (১৮১৯) নামে যে বই রামমোহন রায় এ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, তাহাতে সহমরণ যে ভয়ানক নিষ্ঠুর ও নৃশংস প্রথা এ রকমের কোনো হা-হুতাশ বা বিলাপ-পরিতাপ ছিল না। কাম্য কর্ম সমস্ত শাস্ত্রে নিন্দার বিষয় হইয়াছে কি না, ইহাই ছিল সে-সব বইয়ের বিচারের বিষয়। সকাম কর্মের যে-সকল ফলশ্রুতি শাস্ত্রে আছে, রামমোহন রায় সেগুলিকে কেবলমাত্র অর্থবাদ বলিলেন— সে কেবল যথেচ্ছাচার হইতে লোককে নিবৃত্ত রাখিবার উপায় মাত্র। তার পর দেশাচার ও কুলাচার যে শাস্ত্রবিধির স্থান লইতে পারে না, ইহাও রামমোহন রায় স্মৃতিপুরাণ হইতে প্রমাণ করিয়া দিলেন। তাই বলিতেছি যে রামমোহন রায়ের সতীদাহ নিবারণের চেষ্টা তো সমাজসংস্কার নয়— সে যে ধর্মসংস্কারও বটে! রামমোহনের কাছে এ দুয়ের সম্বন্ধ একেবারে ঘনিষ্ঠ— একটিকে ছাড়িয়া অন্যটির প্রতিষ্ঠা নাই। হিন্দু স্ত্রীলোকের দায়াধিকার সম্বন্ধে রামমোহন রায় যে-সব চটি বই লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও আইনশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার যে কতদূর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও প্রবেশ ছিল, তাহা দেখিয়া অবাক হইয়া যাইতে হয়। শাস্ত্রমতে পত্নী মৃত পতির সম্পত্তিতে পুত্রের মতো সমান অধিকার পাইবার যোগ্য, রামমোহন এ-কথা প্রমাণ করিয়া বেশ পরিষ্কার করিয়া দেখাইয়া দেন যে এই অধিকার না পাওয়ার জন্য সমাজে সহমরণ, বহুবিবাহ প্রভৃতি কত কুপ্রথার সৃষ্টি হইয়াছে। স্ত্রীলোকের সমাজে কোনো স্বাধীন অধিকার নাই; সে আজন্ম পরাধীন হইয়া আছে। সমাজে যে একটি কুপ্রথা আর-একটির সৃষ্টি করে— এমনি করিয়া শৃঙ্খল যে বাড়িয়াই চলে রামমোহন রায় ইহা যেমন বুঝিয়াছিলেন এমন আর কেহই নয়। অথচ সেই সমস্তের মূলোচ্ছেদ করিতে গেলে ধর্মের সংস্কার গোড়ায় দরকার, কারণ ধর্ম ও সমাজের যোগ একেবারে অবিচ্ছেদ্য যোগ। এই কথাই মনে করিয়া রামমোহন রায় শাস্ত্রীয় বিচারে চিরজীবন লাগিয়া রহিলেন। ভল্টেয়ার, ভল্‌নি, রুশো প্রভৃতির মতো শাস্ত্রকে উড়াইয়া দিলেন না। কাঁটার দ্বারা কাঁটা উদ্ধারের মতো শাস্ত্রের দ্বারাই শাস্ত্রের উদ্ধার সাধনে মন দিলেন।

রামমোহন রায় ফরাসী এনসাইক্লোপিডিস্টদের মতো প্রখর যুক্তিবাদী

হইয়াও কেমন করিয়া আবার শাস্ত্র মানিলেন এবং ধর্মের বিচারকে ঐতিহাসিক বিচারের মতো বিশুদ্ধ তর্কের বিষয় করিয়া তুলিলেন না, ইহার একমাত্র কারণ আমার মনে হয়— রামমোহনের অসাধারণ চিত্তশক্তির নানা বৈচিত্র্যের কেন্দ্র ছিল তাঁহার আধ্যাত্মিকতা। তিনি পণ্ডিত ছিলেন, নানা শাস্ত্রে তাঁহার অধিকার ছিল সত্য। তিনি ঘোর কর্মী ছিলেন, সমাজ-সংস্কারক ছিলেন সত্য। কিন্তু তিনি আসলে ভিতরে ভিতরে বিশ্বমানব-প্রেমিক অধ্যাত্মযোগযুক্ত মানুষ ছিলেন। তাঁহার সেই দিকটা 'একান্তে রহসি স্থিতঃ'। কিন্তু তাহাই ছিল তাঁহার পাণ্ডিত্য, তাঁহার লোকহিত, তাঁহার তত্ত্বালোচনা— সমস্তের মূল। তাঁহার এই অধ্যাত্ম-বোধের উৎস ছিল তাঁহার মানবপ্রেম। সমস্ত মানুষকে এমন অখণ্ড করিয়া অনুভব করিবার শক্তি তাঁহার মতো এ যুগে আর কাহারো মধ্যে দেখা যায় নাই। এইখানেই তাঁহার শাঙ্কর অদ্বৈতমতের সঙ্গে আর 'লোকশ্রেয়ে'র আদর্শের সামঞ্জস্যের কারণ। এইখানেই তাঁহার খৃস্টান ধর্মের প্রতি অমন গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগের কারণ। সমস্ত মানুষকে এক করিয়া ভাবিবার জন্যই সকল দেশে একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন তিনি অনুভব করিয়াছিলেন। কারণ মানুষকে এক ও অখণ্ড ভাবে উপলব্ধি করিতে গেলে মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে, ধর্মে ধর্মে যে-সকল বিচ্ছেদের বাধা জমিয়া আছে, সেগুলি দূর করা চাই। রামমোহন রায় যদি এই মানবপ্রেম-উৎসারিত অধ্যাত্মদৃষ্টিটি না পাইতেন, তবে অত বৈচিত্র্যকে তিনি আপনার মধ্যে ধারণ করিতে কি পারিতেন? হয় শঙ্করাচার্যের মতো বা আরিস্টটলের মতো দর্শন আলোচনায় চিরজীবন কাটাইতেন, নয় লুথার ক্যালভিনের মতো সংস্কারকার্যেই তাঁহার সময় যাইত। কিন্তু তিনি নাকি এ যুগের প্রবর্তক; তাই ধর্মসাধনা যে আর আর সমস্ত সাধনার কেন্দ্রীভূত সাধনা— এই সত্য তিনি তাঁর জীবনের ভিতর দিয়া আমাদের চোখের সামনে জাজ্বল্যমান করিয়া রাখিয়া গেলেন। সুতরাং রামমোহন রায়ের চির-জীবনের সকল সাধনার অমর ফল— তাঁহার বিচারগ্রন্থও নয়, তাঁহার Appeals to Christian Publicও নয়, তাঁহার 'তুহফাতুল মওয়াহেদ্দীন' গ্রন্থও নয়, সে তাঁহার ব্রহ্মোপাসনা। এই ব্রহ্মোপাসনাটিকেই এ দেশে দান করিবার জন্য তিনি অত শাস্ত্র নাড়াচাড়া করিয়াছেন, অত বিচার-বিতর্ক করিয়াছেন, অত সামাজিক আন্দোলন করিয়াছেন, শিক্ষার জন্য অমন প্রাণপণ শ্রম ও যত্ন করিয়াছেন। এই হারটিকে দেশের গলায় দিবার জন্য তিনি যুক্তির কৃপাণ হাতে সেই

অন্ধ সংস্কারের জঙ্গলাকীর্ণ যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এইটিকে তিনি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অসাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া দেশকে দিয়া গিয়াছেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহন রায় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "যে সময় তিনি উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সে সময় তিনি ভিন্ন আর কেহই ব্রাহ্মধর্মকে এই সংসারে আনিতে পারিত না— তাঁরই প্রখর জ্ঞানাস্ত্রে কুসংস্কাররূপ অরণ্য ছিন্নভিন্ন হইল, তাঁরই বুদ্ধির কিরণে প্রথম আলোক তাহাতে প্রবিষ্ট হইল।" কিন্তু কুসংস্কাররূপ অরণ্য বলিতে কেবল তখনকার দেশপ্রচলিত কুসংস্কারগুলি বুঝায় না, ধর্মসম্বন্ধে যত রকমের কুসংস্কার থাকিতে পারে সমস্তই বুঝায়। কারণ এ-সমস্তই রামমোহন রায়কে একাকী উচ্ছেদ করিয়া বিশুদ্ধ ভিত্তির উপর তাঁহার ব্রহ্মোপাসনাটিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইয়াছিল। সাকার উপাসনা সত্য কি না, বৈদিক বহু দেববাদ সত্য কি না, অমূর্ত ঈশ্বরের পক্ষে ইচ্ছা করিলে মূর্তি ধারণ করা সম্ভব কি না, সগুণ ঈশ্বর মানিলে সাকার ঈশ্বর মানা হয় কি না, ব্রহ্ম ভিন্ন যখন অন্য বস্তু নাই তখন যে-কোনো বস্তুর সাহায্যে ব্রহ্মের উপাসনা চলে কি না, শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার কি না, জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ কোন্ মার্গ শ্রেষ্ঠ, গৃহস্থের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে কি না, মধ্যবর্তিবাদ, গুরুবাদ ও অলৌকিকত্ব মানা চলে কি না —ইত্যাদি প্রত্যেকটি প্রশ্নের বিচার করিতে গিয়া রামমোহন রায়কে একেবারে বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত দর্শনশাস্ত্র, তন্ত্রশাস্ত্র, পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্র, সকল শাস্ত্রের অর্থবিচার করিতে হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ যে বলিয়াছেন যে তাঁহার জ্ঞানাস্ত্রে কুসংস্কাররূপ অরণ্য ছিন্নভিন্ন হইল— সে সামান্য ছোটোখাটো অরণ্য নয়। সে একেবারে যুগযুগান্তব্যাপী কত বিচিত্র ধর্মসম্প্রদায়ের শাখা-প্রশাখায় বিস্তারপ্রাপ্ত নানারকমের সংস্কারের অরণ্য। এত অরণ্য কাটিয়া কুটিয়া তিনি ব্রহ্মোপাসনার পুষ্পকাননটিকে দেশের মর্মের মধ্যে রাখিয়া গেলেন; এ কাজ তিনি ভিন্ন আর কাহার দ্বারা সম্ভাবনীয় ছিল? এখনই কি সে-সকল সংস্কারের জড় মরিয়াছে? তাহাদের মূল যে গভীরভাবে এ দেশের মাটির মধ্যে নিহিত। আবার জঙ্গল হইতেছে, আবার নব নব জ্ঞানাস্ত্রের প্রয়োজন দেখা যাইতেছে।

বেদে যে বহু দেববাদ দেখা যায়, নানা দেবতাকে যে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, রামমোহন রায় দেখাইলেন যে তাহা কেবল ব্রহ্মের সর্বব্যাপিত্ব বুঝাইবার জন্য। কারণ বেদেই ব্রহ্মকে আবার নির্বিশেষ ও এক বলিয়াছে। বেদান্তে তেমনি আবার ব্রহ্মকে অরূপী বলা হইলেও, তিনি যে নামরূপাদির আশ্রয়, ইহা বলা

হইয়াছে। ব্রহ্মের এই নির্গুণ ও সগুণ দুই দিককেই রামমোহন রায় স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিনি শাঙ্কর ভাষ্যকেই অবলম্বন করিয়া বেদান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, শঙ্কর যদিচ নির্গুণ ব্রহ্মবাদের দিকে ষোলো আনা ঝোঁক দিয়াছেন। সেই কারণে সাধারণের মধ্যে এই সংস্কার চলিয়া আসিতেছে যে তিনি শঙ্করের চেলা, ঘোর বৈদান্তিক। জ্ঞানের পন্থায় এ যেমন তিনি করিয়াছেন, তেমনি ভক্তির পন্থায় সাকারবাদ ও অবতারবাদ সম্বন্ধে ভক্তিপন্থীদের যত রকমের জ্ঞান-বিরুদ্ধ যুক্তি থাকিতে পারে, সমস্তই তিনি খণ্ডন করিয়াছেন। 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচারে' তিনি লিখিয়াছেন, "ভট্টাচার্য ও তাঁহার অনুচরেরা যাহাকে উপাসনা কহেন সেরূপ উপাসনা সুতরাং পরমাত্মার হইতে পারে না, অর্থাৎ উপাসনা কখনো মনেতে কখনো হস্তেতে উপাস্যকে নির্মাণ করিয়া সেই উপাস্যের ভোজন-শয়নাদির উদ্‌যোগ এবং তাহার জন্মাদি তিথিতে ও বিবাহ দিবসে উৎসব করা এবং তাহার প্রতিমূর্তি কল্পনা করিয়া সম্মুখে নৃত্য করান সুতরাং এরূপ উপাসনা পরমাত্মার সম্ভব হয় না।"— অবতারবাদ সম্বন্ধে তিনি দেখাইয়াছেন যে, বেদে, স্মৃতিতে, পুরাণে কোথাও বলা হয় নাই যে পরমাত্মার অবতার আছে। পুরাণে কেবল দেবতাদের অবতার হওয়ার কথা আছে। এক গৌরাঙ্গীয় বৈষ্ণবগ্রন্থেই পরমাত্মার অবতারের কথা পাওয়া যায়। ভক্ত বৈষ্ণবেরা বলেন যে, ভগবানের আনন্দনির্মিত কৃষ্ণমূর্তি, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, কেবল ভক্তের চক্ষুগোচর হয়, আর কাহারো নয়। বৈষ্ণব গোস্বামীর সঙ্গে এ-বিষয় লইয়া বিচারে রামমোহন রায় এই-সব অলৌকিক ব্যাপারকে একেবারে উড়াইয়া দিয়াছেন। প্রাকৃত বস্তু ছাড়া যে আর-কোনো জিনিস কখনোই মানুষের চক্ষুগোচর হইতেই পারে না এবং সেই কারণে আনন্দমূর্তির ব্যাপারটা যে নিছক রূপকমাত্র, এ কথা তিনি গোস্বামীকে বেশ ভালো করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

এমনি করিয়া বৈদান্তিক সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব ভক্ত, পৌত্তলিক সকল সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গে লড়াই করিয়া রামমোহন রায় ১৮২৮ খৃস্টাব্দে তাঁহার অসাম্প্রদায়িক বিশ্বজনীন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিলেন। রামমোহন রায় তাঁহারি ব্রাহ্মসমাজের যে ট্রস্টডীড নিজে লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার মতো এমন উদার অসাম্প্রদায়িক ধর্মভাবের একখানি লিপি আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। তাঁহার ধর্মমন্দিরের উপাস্য দেবতা— বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, পাতা, অনাদি, অনন্ত, অগম্য, অপরিবর্তনীয় ঈশ্বর। তাঁহার উপাসক— যে ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত উপাসনা

করিতে আসিবেন তিনিই— যে জাতি, যে সম্প্রদায়, যে ধর্মেরই লোক তিনি হৌন্ না কেন। তাঁহার উপাসনা-প্রণালীতে কোনো জীব, পদার্থ, ছবি, মূর্তি, এ-সকলের স্থান নাই। যাহাতে নিরাকার, অনন্তস্বরূপ ঈশ্বরের ধ্যান-ধারণা হয়, প্রেম নীতি, ভক্তি দয়া ও সাধুতার চর্চা হয় এবং সকলের চেয়ে বড়ো কথা— সকল সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে ঐক্যবন্ধন বেশ দৃঢ় হয়— সেই রকমের উপদেশ, বক্তৃতা গান ও প্রার্থনা হওয়ার নির্দেশ আছে।

কিন্তু রামমোহন রায় এমন অসাম্প্রদায়িক ও সার্বভৌমিক হইয়াও জাতীয় ভাব ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার সমাজকে তিনি হিন্দু আকার দিয়াছিলেন। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, "স্বজাতির মধ্য দিয়াই সর্বজাতিকে এবং সর্বজাতির মধ্য দিয়াই স্বজাতিকে সত্যরূপে পাওয়া যায়" এবং "আপনাকে ত্যাগ করিয়া পরকে চাহিতে যাওয়া যেমন নিষ্ফল ভিক্ষুকতা, পরকে ত্যাগ করিয়া আপনাকে কুঞ্চিত করিয়া রাখা তেমনি দারিদ্র্যের চরম দুর্গতি।" এ জায়গায়ও আবার— তিনি যদি কেবলমাত্র সার্বভৌমিক ধর্মতত্ত্বের আলোচনা করিতেন, তাহার সঙ্গে সমাজতত্ত্বের যোগ কোথায় তাহা তলাইয়া না দেখিতেন, তবে তিনি জাতীয়-ভাবে সার্বভৌমিক হইতে পারিতেন না। এবং এইখানেই আবার ফরাসী এন্‌সাইক্লোপিডিস্ট্‌দের সঙ্গে তাঁহার পার্থক্য। কারণ, তাঁহাদের সার্বভৌমিকতা জাতীয়তার ঐতিহাসিক বিকাশের পথে ফোটে নাই, সেই বিকাশের পথটি তাঁহাদের চোখেই পড়ে নাই। তাঁহারা সমাজ, ধর্ম প্রভৃতি সকল বিষয়ে ব্যক্তি-তন্ত্রতাকে (Individualism) অধিনায়ক করিয়াছিলেন। রামমোহন সেই ব্যক্তিতন্ত্রতার কর্তৃত্বের জন্য জাতীয় শাস্ত্রের একটা শাসনের প্রয়োজন অনুভব করিতেন। কিন্তু শাস্ত্রকে তিনি যুক্তির কষ্টিপাথরে কষিয়া তবে গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন।

অতএব, এই নবযুগের প্রবর্তক রামমোহনের ভিতর হইতে আধুনিক যে যুগভাবটি ফুটিয়া উঠিল, তাহার প্রধান লক্ষণ সংক্ষেপে বলিতে গেলে দুইটি—

ক. ধর্মের সঙ্গে সমাজের যোগ অবিচ্ছেদ্য যোগ। সেইজন্য আত্মতত্ত্বের অনুশীলন বা শ্রবণমননাদি জ্ঞানযোগের সাধন কিংবা লোকশ্রেয়ঃ প্রভৃতি কর্ম-যোগের সাধন, এ কোনো সাধনই নিরপেক্ষভাবে ধর্মসাধন নয়। ব্রহ্মোপাসনাই সকল সাধনার উৎস বা কেন্দ্রের মতো। সেই উৎসে পৌঁছিলে, কি কর্মে, কি জ্ঞানে, কি প্রেমে ব্রহ্মই সর্বময় হন। তখন আর-কিছুই বাহিক থাকে না, সমস্তই

আন্তরিক হয়। রামমোহন রায় তাঁহার 'ব্রহ্মোপাসনা' নামক একটি চটি বইয়ে এই কথাই বলিয়াছেন— "পরমেশ্বরেতে নিষ্ঠার সংক্ষেপ লক্ষণ এই যে তাঁহাকে ···সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা এবং প্রীতিপূর্বক তাঁহার নানাবিধ সৃষ্টিরূপ লক্ষণের দ্বারা তাঁহার চিন্তন করা এবং তাঁহাকে ফলাফলের দাতা এবং শুভাশুভের নিয়ন্তা জানিয়া সর্বদা তাঁহার সমীহা করা, অর্থাৎ এই অনুভব সর্বদা কর্তব্য যে যাহা করিতেছি, কহিতেছি এবং ভাবিতেছি তাহা পরমেশ্বরের সাক্ষাতে করিতেছি, কহিতেছি এবং ভাবিতেছি।"

খ. জাতীয়ভাবে সার্বজনীন বা সার্বজনীনভাবে জাতীয় হইতে হইবে। ধর্ম যেমন দেশকালের অতীত, তেমনি দেশকালের ভিতর দিয়া ইতিহাসের ভিতর দিয়াই তাহার প্রকাশ। ধর্ম স্বরূপত সার্বভৌমিক, কিন্তু ইতিহাসের মধ্য দিয়া তাহার বিশেষ প্রকাশ বলিয়া ধর্ম ক্রমাগতই নানা অবস্থার ভিতর দিয়া আপনার সার্বভৌমিক স্বরূপটিকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছে। ধর্মের ভিতরে যেমন এই চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়, সমাজেরও ভিতরে তেমনি এই চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়; কারণ ধর্মে ও সমাজে অবিচ্ছেদ্য যোগ। দেশকালের সঙ্গে ইতিহাসের সঙ্গে সম্বন্ধবিচ্ছিন্ন সার্বজনীন ধর্ম বা সমাজ আকাশকুসুম মাত্র; আবার যে ধর্মে বা সমাজে সার্বজনীনতার দিকে লক্ষ্য নাই, তাহাও সংকীর্ণ ও প্রাণহীন।

৩

কবি বলেন যে, কেন্দ্রের অভিমুখী ও কেন্দ্রের প্রতিমুখী— এই দুই শক্তির একটি ছন্দ যেমন বিশ্বসৃষ্টিতে লক্ষ্য করা যায়, মানুষের ইতিহাসেও তেমনি একটি সংকোচন ও প্রসারণের সামঞ্জস্যের তত্ত্ব আছে। তবে "বিশ্বের গানে তালটি সহজ মানুষের গানে তালটি বহু সাধনার সামগ্রী।" মানুষের ইতিহাস "অনেক সময়ে দ্বন্দ্বের একপ্রান্তে আসিয়া এমনি ঝুঁকিয়া পড়ে যে অন্যপ্রান্তে ফিরিতে বিলম্ব হয়, তখন তাল কাটিয়া যায়, প্রাণপণে ত্রুটি সারিয়া লইতে গলদ্‌ঘর্ম হইয়া উঠিতে হয়।"

আমার মনে হয় যে, বাংলাদেশের অত্যন্ত কোমল মাটি, ভিজে আবহাওয়া অজস্র শ্যামল গাছপালা এবং অসংখ্য নদীনালা এ দেশের মানুষের মানসিক প্রকৃতিকে বড়ো বেশি রসপ্রবণ, কল্পনাপ্রিয় ও বেদনাশীল করিয়াছে। তাহার উপর যদি মিস্টার বাকল সাহেবের ভূতত্ত্বের সিদ্ধান্ত মানিতে হয়, তবে তো বাঙালী জাতি

অনার্য দ্রাবিড় জাতি হইতে উৎপন্ন, এই কথা বলিতে হয়। কিন্তু তাহা হইলে দেখা যায় যে, দ্রাবিড় জাতির মানসিক প্রকৃতির ঠিক উপরি-উক্ত বিশেষত্বগুলিই ছিল। দ্রাবিড় দেশে দক্ষিণাপথেই ভক্তিধর্মের উৎপত্তি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে গীতার শ্রীকৃষ্ণকে বা শ্রীকৃষ্ণের উপদিষ্ট সমন্বয়তত্ত্বকে দেখিবার জো নাই। অনার্য গোপজাতির কৃষ্ণরাধালীলার নানা কথা জীব ও ভগবানের সম্বন্ধে রূপকের হিসাবে সেই ধর্মে গ্রহণ করা হইয়াছে। বোধ করি সেইজন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মে জ্ঞানের সঙ্গে রসের তেমন সংযোগ হয় নাই। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কবীর-নানকপন্থীদের ধর্মে যেমন জ্ঞানের সঙ্গে রসের একটা চমৎকার যোগ দেখা যায়, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে তাহা দেখা যায় না। কবীর, নানক, দাদূ প্রভৃতির ধর্মপন্থায় মুসলমান ধর্মের তত্ত্ব ও সাধনার সঙ্গে বিশেষত সুফী সাধনার সঙ্গে আর ভারতবর্ষীয় রসতত্ত্ব ও রসসাধনার একটা জৈব সংযোগ ঘটিয়াছে। এমন-কি, বেদান্তের বিশুদ্ধ অদ্বৈত তত্ত্বও সেই আধ্যাত্মিক রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বাদ পড়ে নাই। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে সে রকমের আদানপ্রদানের কোনো কার-কারবারই নাই।

সুতরাং কবির ভাষায় বলিতে গেলে, বাংলার ইতিহাসে এই আত্মসংকোচন ক্রিয়া বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে অত্যন্ত বেশিদূর পর্যন্ত গিয়াছিল বলিয়াই বোধ হয় রামমোহন রায় অন্য প্রান্তে বিশ্বের অভিমুখে আত্মপ্রসারণের দিকে আবার একেবারে চরমতম সীমা পর্যন্ত গিয়াছিলেন। 'গোস্বামীর সহিত বিচার' গ্রন্থে রামমোহন রায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম এবং বিশেষতঃ বৈষ্ণবশাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য ঈশ্বর যে একেবারে সাকার, এ কথা প্রমাণ করিয়া দেখাইয়া দিতে ত্রুটি করেন নাই। ভাগবতের তেত্রিশ অধ্যায়ে চতুর্দশ শ্লোকে আছে যে, নৃত্যের দ্বারা দুলিতেছে কুণ্ডল দুইটি আর তাহার শোভাতে সাজিয়াছে যে গণ্ড— সেই গণ্ডকে শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডদেশে যে গোপী অর্পণ করিতেছেন, তাঁহার মুখ হইতে শ্রীকৃষ্ণ চর্বিত তাম্বূল গ্রহণ করিতেন। এই রকম সব শ্লোক তুলিয়া রামমোহন রায় প্রশ্ন করিয়াছেন যে এ বর্ণনা কোন্ বেদান্তে পাওয়া যায়? যাহারা শ্রীমদ্ভাগবতকে বেদান্তের ভাষ্য বলিতে চায়, তাহারা বেদান্তে ঈশ্বর সম্বন্ধে এ-সকল রূপগুণের বর্ণনা কোথায় পাইয়াছে? "প্রার্থনাপত্র" নামক পুস্তিকায় রামমোহন গুরু নানকের সম্প্রদায়, কবীরপন্থী, দাদূপন্থী এবং সন্তমতাবলম্বীদিগকে নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসকশ্রেণীর মধ্যে ফেলিয়াছেন। অথচ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে ধরেন নাই।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রামমোহন রায়ের পরে আমাদের সমাজের আত্মপ্রসারণের শক্তি সকল দিক হইতে জাগিয়া উঠিল। রামমোহন রায়ের চিত্ত যে একটা বিশাল বিশ্বব্যাপক ক্ষেত্রে সঞ্চরণ করিত, সে ছিল তাঁহার ধ্যানের ক্ষেত্র। সমস্ত জাতীয় চিত্তের পক্ষে সে জায়গায় পৌছিতে দীর্ঘকালের সাধনার দরকার আছে। ধ্যানদৃষ্টিতে তিনি সবটা যেন দেখিয়াছিলেন, এ যুগের সমস্তটা ভাব এবং ভাবীকালের সমস্তটা রূপ। যেমন করিয়া চিত্রকর তাহার টুলের উপর বসিয়া তাহার সামনের পটের উপর তুলি চালায়, তিনি যেন তেমনি করিয়া সমস্ত গোটা পৃথিবীটাকে তাঁহার টুলের মতো ব্যবহার করিয়া ভাবীকালের পটের উপর তুলি চালাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি যতটা ধ্যানে দেখিয়াছিলেন, ততটাকে উপলব্ধিতে প্রত্যক্ষ করিয়া তোলা তাঁহার পরবর্তী কালের কাজ ছিল। সেই কাজ করিতে আসিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

রামমোহন রায়ের ভিতর হইতে আধুনিক যে যুগভাবটি ফুটিয়া উঠিল তাহার প্রধান দুইটি লক্ষণ আমি বলিয়াছি: ১. ব্রহ্মোপাসনাই সকল সাধনার মূল বা কেন্দ্রস্বরূপ, ২. জাতীয়ভাবে সার্বজনীন বা সার্বজনীনভাবে জাতীয় হওয়া এ কালের আদর্শ। এই দুইটি লক্ষণই দেবেন্দ্রনাথের জীবনে ফুটিয়াছিল। ব্রহ্মোপাসনার যে অবস্থায় পৌছিলে জ্ঞানে, প্রেমে, কর্মে ব্রহ্মই সর্বময় হন, কিছুই আর বাহ্যিক থাকে না—সে অবস্থা রামমোহন রায় তাঁহার অপূর্ব অধ্যাত্মদৃষ্টির সাহায্যে ধ্যান মাত্র করিয়াছিলেন। কিন্তু সে অবস্থায় তিনি নিজে পৌছিতে পারেন নাই। কারণ, সে অবস্থার কথা শেষাশেষি তাঁহার চিত্তের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনের মধ্যে জাগিয়াছিল। তখন বেদান্ত অদ্বৈতবাদের প্রভাব, মতাজাল ও মওয়াহেদ্দীন সুফীদের প্রভাব, ইউরোপীয় ডীস্ট্ ও এনসাইক্লোপি-ডিস্ট্‌দের প্রভাব অনেকটা পরিমাণে কাটাইয়া ধর্মের দার্শনিক ভিত্তিই যে তাহার মূল ভিত্তি নয়, মূল ভিত্তি যে ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রহ্মের সহিত নিবিড় মুখোমুখী যোগ (communion), এ কথাটা তিনি বুঝিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের চিত্তের প্রসার কখনোই রামমোহন রায়ের মতো অমন ব্যাপক ছিল না। রামমোহন রায়ের মতো বিশ্বমানবপ্রেম তাঁহার অধ্যাত্মবোধের উৎসও ছিল না। কিন্তু ঐ ব্রহ্মের সহিত নিবিড় মুখোমুখী যোগ তাঁহার চিরজীবনের সাধনার বিষয় ছিল। উপনিষদের ভাষায় বলিতে গেলে ব্রহ্ম ছিলেন তাঁহার এক লক্ষ্য এবং তাঁহার আত্মা শরবৎ সেই ব্রহ্মেই প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাতেই তন্ময় হইয়াছিল। ভিতরের

দিক হইতে দেখিতে গেলে তাঁহার সমস্ত জীবনের ইতিহাস এই ব্রহ্মের সহিত যোগের ইতিহাস। কিন্তু বাহিরের দিক হইতে দেখিতে গেলে বিশ্বমানবপ্রেম তাঁহার সকল কর্মের উৎস ছিল না বলিয়া তিনি ধর্মে, সমাজে, নীতিতে, সকল দিকে মানুষের সমস্যাকে বড়ো জায়গায় দেখিতেও পান নাই, বিচার করিতেও পারেন নাই। ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারার বাঁকে বাঁকে বিশ্বমানবের তটস্থ রূপ যেমন করিয়া রামমোহন রায় দেখিয়াছিলেন, তেমন করিয়া দেবেন্দ্রনাথ দেখেন নাই। সুতরাং তাঁহার জীবনের ইতিহাস বাহিরের দিক হইতে দেখিতে গেলে ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হইয়া জাতীয়ভাবে সার্বজনীন এবং সার্বজনীনভাবে জাতীয় হওয়ার আদর্শকে সমাজে অনুষ্ঠিত ও প্রতিষ্ঠিত করিবার নানাবিধ কর্মচেষ্টার ইতিহাস। আমি এ পরিচ্ছেদের আরম্ভেই বলিয়াছি, এই বাহিরের ইতিহাসটি সমস্ত যুগের ইতিহাসের ভিতর হইতে দেখানো সহজ। কিন্তু ভিতরের অধ্যাত্ম সাধনার ইতিহাসটি দেখাইতে গেলে যে বিরল ভাবলোকের পর্দার পর পর্দা খুলিয়া দেখাইতে হয়, তাহা সকলের চেয়ে কঠিন কাজ।

দেবেন্দ্রনাথের মনে ছেলেবেলা হইতে পৌত্তলিক দেবদেবীর প্রতি ভক্তির সংস্কার যেমন সুদৃঢ় ছিল, এমন রামমোহন রায়ের মনে কোনো সময়েই ছিল কি না সন্দেহ। তাঁহার দিদিমার কাছে তিনি মানুষ, দিদিমার ধর্মনিষ্ঠার একাগ্রতার ছবি তাঁহার চোখের সামনে দিনরাত্রি জাজ্বল্যমান ছিল। শুধু তাহাই নয়। তাঁহার পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর খুব বিলাসী মানুষ ছিলেন, অথচ তাঁহার বিলাসিতার মধ্যে নিছক ধনাড়ম্বর ছিল না। তাহার মধ্যে সৌন্দর্যপ্রিয়তা ছিল, সংগীত চিত্র প্রভৃতি সুকুমার শিল্পের রসগ্রাহিতা ছিল। দেবেন্দ্রনাথ নিশ্চয় তাঁহা হইতেই এই সৌন্দর্যবোধ এই শিল্পরসবোধটি পাইয়াছিলেন। পৌত্তলিক পূজার মধ্যে এই সৌন্দর্যবোধের স্ফূর্তিলাভের কতকটা সুযোগ যে নাই এ কথা বলা যায় না। বাস্তবিক অনার্য দ্রাবিড়দের রূপোদ্ভাবনী শক্তির প্রধান নিদর্শনই এই পুত্তলিকাগুলি। 'আর এই পূজাব্যাপারে কলাকাণ্ডের যে বৈচিত্র্য আছে তাহার মধ্যেও শিল্পরসবোধের বেশ পরিচয় মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। রামমোহনের চিত্তের আর যত বড়ো বড়ো শক্তিই থাক্, তাঁহার মধ্যে এই সৌন্দর্যবোধ, কলাবোধ জিনিসটা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। তাঁহার গদ্যরচনায় যুক্তির প্রখরতা খুব, তাহা একেবারে দার্শনিক রচনার মতো শৃঙ্খলাবদ্ধ। কিন্তু শিল্পের রসবৈদগ্ধ্যগুণ, প্রসাদগুণ, তাঁহার রচনায় নাই। তাঁহার

গানগুলিতে কোথাও রসের বাষ্পমাত্র নাই। এমন মোহমুদ্গরজাতীয় গান বোধ হয় আর কোনো ধর্মসংগীত-রচয়িতার রচনায় পাইবার জো নাই। রামমোহন রায় দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, বিধিশাস্ত্র এ-সব প্রচুর আলোচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সাহিত্য-শিল্পের কোনো আলোচনা করিয়াছিলেন বলিয়া তো জানি না। দেবেন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধ ও রসবোধ তাঁহার রচনা, কথাবার্তা, আদবকায়দা, গৃহসজ্জা সমস্তের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইত। তাঁহার ভাষার মধ্যে কি লালিত্য, কি সংগীত, কি সংযত কলাবন্ধন- - এমন তাঁহার সময়ে আর কাহারো রচনায় দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার 'আত্মজীবনী' বা 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানে'র মতো সুন্দর রচনা বাংলাভাষায় অতি অল্পই আছে। বিশুদ্ধ সংগীত ও শিল্পের প্রতিও তাঁহার আশ্চর্য অনুরাগ ছিল। লোকব্যবহার, এমন-কি খাওয়া-দাওয়ায় পর্যন্ত তাঁহার সৌন্দর্য-বোধের প্রকাশ ছিল— সব সুছাঁদ, পরিপাটি রকমের হওয়া চাই। সেইজন্য তাঁহার পক্ষে পৌত্তলিক পূজার সংস্কার কাটানো বিশেষ কঠিন ছিল।

তাহার প্রকৃতিতে যদি এই কল্পনাশক্তি, রসপ্রবণতা ও সৌন্দর্যবোধশক্তিই সব হইত, তবে তিনি হয়তো চিরকাল প্রতিমাপূজক একজন শিল্পী হইতে পারিতেন। অন্তত তাঁহার অধ্যাত্মজীবনের কোনো বিকাশ দেখা যাইত না। কিন্তু তাঁহার মধ্যে ঈশ্বর রসবোধ ও কল্পনাশক্তির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানান্বেষণ ও জ্ঞানানুরাগও যথেষ্ট পরিমাণে দিয়াছিলেন। তত্ত্বজ্ঞানের দিকে তাঁহার একান্ত ঝোঁক ছিল। তাই যখন প্রতিমাপূজাব অসারতা তিনি বুঝিলেন, তাহার পর হইতে তাঁহার সৌন্দর্যমুগ্ধ চিত্ত বিশ্বপ্রতিমায়— প্রকৃতির সৌন্দর্যে— সেই পরম-সুন্দরের ধ্যানে মগ্ন থাকিত এবং সেইজন্য তাঁহাকে পর্বতে, প্রান্তরে, নদীতে নদীতে ঘুরিয়া বেডাইতে হইত। আর সেইসঙ্গে এ দেশের এবং পাশ্চাত্ত্য দেশের দর্শন ও বিজ্ঞান -শাস্ত্র হইতে অনন্তের তত্ত্ব একান্ত যত্ন ও অভিনিবেশের সঙ্গে তাঁহাকে সংগ্রহ করিতে হইত। রামমোহন রায়ের মতো শুধু জ্ঞানানুশীলনে তাঁহার কুলাইত না; আবার কবি বা শিল্পীর মতো শুধু বিশ্বসৌন্দর্যে ডুবিয়া থাকাতেও তাঁহার সব মন ভরিত না। বিধাতাপুরুষ যদি তাঁহার চিত্তটি নির্মাণের সময় জ্ঞানের অংশ রসের চেয়ে একটুখানি কম করিয়া দিতেন, তবে তিনি বৈষ্ণবভক্তদের মতো হয়তো রসোন্মত্ত হইয়া বেড়াইতেন। কিংবা যদি রসের অংশ জ্ঞানের চেয়ে একটুখানি কম করিয়া দিতেন, তবে অদ্বৈতপন্থী সন্ন্যাসীর মতো দণ্ডকমণ্ডলু-হাতে সংসার-বিবাগী হইয়া বাহির হইয়া পড়া তাঁহার পক্ষে

কিছুমাত্র বিচিত্র ছিল না। তাঁহার কালে, তাঁহার চারি দিকে ভাবোন্মত্ততা আধ্যাত্মিকতার চরম বিকাশের নাম লইয়া কখনো থিয়সফির বেশে, কখনো আধ্যাত্মিক রূপকের নামে, নানা বাহ্ ক্রিয়াকাণ্ডের বেশে, কত আকারে এবং কত বিকারেই দেখা দিয়াছিল। কিন্তু এমন নিক্তির মাপে বিধাতাপুরুষ তৌল করিয়া জ্ঞান ও রসের সামঞ্জস্যে দেবেন্দ্রনাথের মানসপ্রকৃতিটিকে তৈরি করিয়াছিলেন যে, এ-সকল সাময়িক উত্তেজনার দ্বারা এক মুহূর্তের জন্যও তাঁহার অনুত্তরঙ্গ, নিবাতনিষ্কম্প ব্রহ্মযোগের ভাবটি নাড়া খায় নাই। তাঁহার স্থিতধী বরাবর এমনি অক্ষুণ্ণ ছিল।

অবশ্য রামমোহন রায়ের মধ্যে আমাদের দেশের আত্মপ্রসারণ শক্তির যে-রকম অসামান্য স্ফূর্তি দেখা যায়, এমন এ যুগে আর-কোনো একজন ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায় না— তাহা তো পুর্বেই বলিয়াছি। রামমোহন রায় তো আর এক মানুষ ছিলেন না, তাঁর এক মানুষের মধ্যে দশটা মানুষ কাজ করিত। গঙ্গা যেমন শতধারায় বিচ্ছিন্ন হইয়া বঙ্গোপসাগরে গিয়া পড়িয়াছে, এ যুগে তেমনি রামমোহন রায়ের জাতীয়তামূলক বিশ্বজনীনতার আদর্শ নানা লোক ও নানা অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া বহিয়া চলিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ সেই ভাবটিকে ঠিকমত ধরিলেও, তাঁহার চিত্তক্ষেত্র ও কর্মক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ ছিল। রামমোহন রায় হিন্দু মুসলমান ও খৃস্টান সভ্যতাব ধর্মতত্ত্ব, সমাজনীতি, আইন প্রভৃতি সকল বিভাগের জ্ঞানলাভ করিয়া যেমন তাহাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যকে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন, এবং যেমন যে গভীরতর মূলে তাহারা এক, সেই অখণ্ড ঐক্যভূমিটিকেও তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ তেমনি করিয়া এক হিন্দুসভ্যতা ছাড়া অন্যান্য সভ্যতার বিশিষ্টতাকে দেখিবার চেষ্টা করেন নাই। বাস্তবিক রামমোহন রায়ের পরে ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির প্রণালী আশ্রয় করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের— শুধু ধর্মের কেন— ভিন্ন ভিন্ন সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, বিধিব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা আমাদের দেশে যথেষ্ট হয় নাই। ইংরাজী শিক্ষার জন্য খৃস্টান সভ্যতা সম্বন্ধে আমরা কতক কতক কথা আজকাল জানিয়াছি; কিন্তু মুসলমান সভ্যতা সম্বন্ধে আমরা সামান্য পরিমাণেই জানি। সুফীধর্ম সম্বন্ধে কোনো আলোচনা, সুফীভক্তদের কবিদের কোনো গ্রন্থ বাংলা ভাষায় প্রকাশ হয় নাই। দেবেন্দ্রনাথ সুফী ভক্তকবিদের গ্রন্থের অনুরাগী ছিলেন; পারস্য ভাষায় তাঁহার সুন্দর অধিকার ছিল। সুতরাং রামমোহন রায়ের পর

মুসলমান সাধনাকে কতক পরিমাণে আত্মসাৎ করার কাজ তাঁহার দ্বারা হইয়াছিল। তার পর খৃস্টান ধর্মতত্ত্ব তিনি আলোচনা না করিলেও পশ্চিমের দর্শন ও বিজ্ঞান -শাস্ত্রগুলি তিনি রীতিমত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। দেকার্ত হইতে কাণ্ট, এবং ফিক্তে ও কুজ্যাঁর দর্শনগুলি তিনি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এ-সকল শাস্ত্র তিনি অধ্যাত্মজীবনের ক্ষুধার তাড়নায় পড়িয়াছিলেন। তাঁহার অধ্যাত্ম-জীবনের পথের সামনে যে-সকল সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল, তিনি তাহাদের মীমাংসার জন্য ভারতবর্ষের এবং ইউরোপের তত্ত্বশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের এই গভীরতর প্রয়োজনের ভিতর হইতেই তাঁহাকে তত্ত্ব সৃষ্টি করিতে হইয়াছে, এবং সেই সৃষ্টির উপকরণস্বরূপ তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের নানা তত্ত্বকে ব্যবহার করিয়াছেন, দেখা যায়। তাঁহার জীবনের ছাঁচে ঢালাই করিয়া তিনি নূতন নূতন তত্ত্বের ও চিন্তার ছাঁচ এ যুগের জন্য গড়িয়া গিয়াছেন— এই হিসাবে তাঁহাকে বর্তমান যুগসমন্বয়ের একজন প্রধান প্রতিষ্ঠাতা স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে। যুগসমস্যাগুলি তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা হইয়া তাঁহার ভিতর হইতে সমাধান লাভের চেষ্টা করিয়াছে।

রামমোহন রায় সকল শাস্ত্র মীমাংসা করিয়া তাহাদের মূলসত্যগুলি আমাদিগকে দিয়া গেলেন— বেদান্তধর্মের মূলসত্য কী তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়া গেলেন। কিন্তু 'ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস' (Dogmas and Beliefs) একটি একটি করিয়া স্থির ভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি যান নাই। তাঁহার পরে দেবেন্দ্রনাথকেই সে কাজ করিতে হইয়াছে। সুতরাং ধর্মতত্ত্ববিৎ (Theologian) হিসাবে দেবেন্দ্রনাথের স্থান সামান্য নয়। এই ধর্মতত্ত্বের মীমাংসা ব্যাপারে, তিনি উপনিষদ্‌-বেদান্তের মূলসত্যগুলিকে মত ও বিশ্বাসের আকার দান করিতে গিয়া পশ্চিমের দেকার্ত হইতে কাণ্টের দর্শন, ন্যাচারল থিয়লজি, প্রভৃতি সকল শাস্ত্রের উপাদান-উপকরণের সাহায্যে ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাসগুলিকে গড়িয়া তুলিয়াছেন। এমনি করিয়া তিনি যে বেদান্ত-উপনিষদের মতগুলিকে একালের ব্যবহারের উপযোগী করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার প্রধান কৃতিত্ব। একদিকে পূর্বদেশের দর্শনের ও সাধনার ধারা, অন্য দিকে পশ্চিমের দর্শনের ধারা— এই দুই বিপরীত তত্ত্ব ও সাধনার ধারাকে জীবনের ভিতর হইতে মিলাইয়া ভাবী যুগের কাছে এক জীবন্ত ধর্মরূপে দান করিয়া যাওয়ার মতো আশ্চর্য ব্যাপার এ যুগে আর কাহারো দ্বারা ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ। তার পরে এ যুগে যে বিজ্ঞানগুলি আসিয়া পড়িয়াছে,

অধ্যাত্মজীবনের মধ্যে তাহাদের কিরূপ স্থান হইবে, ইহা একটা প্রশ্নের বিষয়। দেবেন্দ্রনাথের জীবনে সে প্রশ্নেরও সুন্দর উত্তর দেখিতে পাওয়া যায়। জগৎ-কার্যের পর্যবেক্ষণ ও আলোচনার দ্বারা ঈশ্বরের জ্ঞানময় বিধান ও কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়, সকল বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া সেই পরিচয় তিনি সংগ্রহ করিতেন। জ্যোতিষশাস্ত্র তাঁহার এতই প্রিয় ছিল যে, পারিবারিক উপাসনার পর তিনি বাড়ির ছেলেমেয়েদের কাছে জ্যোতির্বিদ্যার কথা বলিতেন। পদার্থ-বিদ্যা (Physics), ভূতত্ত্ব (Geology), জীবতত্ত্ব (Biology)— এ-সমস্ত বিজ্ঞান-শাস্ত্র তিনি বিশেষ আগ্রহের সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন।

তাঁহার শেষবয়সের আলোচনাগুলি, 'জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি' বইটিতে পাওয়া যায়। সে বই পড়িলে তাঁহার মনের এই বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের দিকটা বেশ দেখা যায়। শুধু বৈজ্ঞানিক কৌতূহল নয়, তাঁহার ঐতিহাসিক অনুরাগেরও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার পড়া বিস্তর ইউরোপীয় ইতিহাস ও অন্যান্য দেশের ইতিহাসের গ্রন্থ বোলপুর শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগারে পাওয়া যায়। অতএব বেশ দেখা যায় যে, পশ্চিমের বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন— এ সমস্তই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, কেবল গ্রহণ করেন নাই পশ্চিমের খৃস্টান ধর্মতত্ত্ব। রামমোহন রায়কে খৃস্টধর্মের আধুনিক আন্দোলনের একজন প্রধান উদ্যোগী বলিয়া আজও পশ্চিম দেশের লোক সম্মান করিয়া থাকে, এবং তাঁহাকে বলে খৃস্টান একেশ্বর-বাদের একজন জনক। অথচ সেই রামমোহন রায়ের পন্থার পথিক হইয়া দেবেন্দ্রনাথ যে কেন খৃস্টধর্মের দিকে মুখ ফিরাইলেন, তাহার কারণ আলোচনা করিয়া দেখা উচিত।

রামমোহন রায়ের সময়ে খৃস্টান ধর্মের আন্দোলন এ দেশে ঠিক জাগে নাই। তখন সবে ডফ্‌সাহেব এ দেশে আসিয়াছিলেন এবং শ্রীরামপুরের পাদ্রি মার্সম্যান প্রভৃতি, যাঁহাদের সঙ্গে রামমোহন রায়ের বাইবেল শাস্ত্র লইয়া তুমুল তর্কবিতর্ক হইয়াছিল, তাঁহারা তেমন করিয়া দেশের উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করিতে তখনো পারেন নাই। ডিরোজিয়োর প্রভাবে হিন্দুকালেজের ছাত্রদের মধ্যে হিন্দু সমাজকে ভাঙিবার জন্য যে তুমুল আন্দোলনের সূত্রপাত হইল, যে ভয়ংকর স্বজাতি-বিদ্বেষ তাহাদের মনকে অধিকার করিল, তাহার ফলে দলে দলে শিক্ষিত যুবকেরা খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল। ১৮৪৫ খৃস্টাব্দে বালক উমেশ সরকারকে তাহার বালিকা স্ত্রীর সহিত মিশনারিরা আশ্রয় দেওয়ায়, তাহার

পিতা তাহাদিগকে ছাড়াইয়া আনিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করে কিন্তু ডফ্‌সাহেব তাহাদিগকে কোনোমতে ছাড়িলেন না। এই ঘটনায় দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁহার বন্ধুগণ খৃস্টান ধর্মের এই বিপ্লবের স্রোতকে বাঁধ দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। দেবেন্দ্রনাথ নিজে বাড়ি বাড়ি গিয়া কলিকাতার ধনীদের সাহায্যে হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় নামে এক স্কুল স্থাপন করেন। হিন্দুবালকেরা যাহাতে খৃস্টানদের স্কুলে পড়িয়া তাহাদের শিক্ষায় সমাজভ্রষ্ট না হয়, সেইজন্য এই উদ্যোগ। তাহার পুর্বেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ভিতর দিয়া ডফ্‌সাহেবদের সঙ্গে খৃস্টান ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার বিষম বাদপ্রতিবাদ চলিতেছিল। খৃস্টান মিশনারি ডফ্‌সাহেব তখন বেদান্তকে যে-সকল যুক্তির অস্ত্র দিয়া আক্রমণ করিয়াছিলেন, খৃস্টান পাদ্রিরা এবং লেখকেরা আজও সেই-সকল যুক্তিই আশ্রয় করিয়া আমাদের ধর্মশাস্ত্রকে বিচার করিতে বসিয়া যান। ব্রহ্ম নির্গুণ ও নির্বিকল্প বলিতে ডফ্‌সাহেব বুঝিয়াছিলেন যে, ব্রহ্ম 'নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই অচেতন।' উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব তাঁহার মাথায় একটুও প্রবেশ করে নাই। বেদান্তধর্মের বিরুদ্ধে তাঁহাদের আর একটি শস্তা যুক্তি ছিল যে, এ ধর্মে নীতির কোনো স্থান নাই। এ কেবল তত্ত্বকথা 'ফিলসফি'। যে ধর্ম মানুষকে নীতিমান করিতে পারে তাহা কেবল খৃস্টানধর্ম। এ-সকল কথা দেবেন্দ্রনাথ সহ্য করেন কেমন করিয়া? তাই খৃস্টানধর্মের ভ্রান্তিগুলিকে রামমোহন রায়েরই মতো তাঁহাকেও দেখাইতে হইয়াছিল। কিন্তু রামমোহনের মতো খৃস্টানধর্মের ভিতরকার তত্ত্বগুলিকে তিনি দেখান নাই। যে তত্ত্ব 'Guide to peace and happiness', শান্তি ও আনন্দের দিকে মানুষকে নীত করে, সে তত্ত্ব তাঁহার মনকে টানে নাই। বিরোধের মধ্যে পড়িয়া তাঁহার দৃষ্টি এ জায়গায় সাময়িকতার দ্বারা বাধাগ্রস্ত হইয়াছিল, এ কথা বলিতেই হইবে। কিন্তু কালের পক্ষে যে তাহার কতখানি দরকার ছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

এ প্রয়োজন আরো ভালো করিয়া বুঝা যায় যখন কেশবচন্দ্রের কালের দিকে চোখ পড়ে। কেশবচন্দ্র যখন ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার মধ্যে অত্যুগ্র পাপবোধ, সংসারবৈরাগ্য, অনুতাপ প্রভৃতি খৃস্টান ধর্মের ভাব পুরামাত্রায় ছিল। বাইবেল তাঁহার ধর্মজীবনের একমাত্র খোরাক ছিল বলিলেও অন্যায় বলা হয় না। তাহা ছাড়া চামার্স, থিয়োডোর পার্কার, নিউম্যান প্রভৃতি লেখকদের রচনা তাঁহার বন্ধুদিগকে লইয়া যে 'সংগতসভা' স্থাপন করেন, দেবেন্দ্রনাথ তাহার

নাম সংগতসভা দিলেও তাহা মেথডিস্টদের ক্লাস মিটিংয়ের মতোই একটা ব্যাপার ছিল। সংগতের আলোচ্য বই ছিল অধিকাংশই খৃস্টানধর্মের বই। সুতরাং সংগতের সভ্যদের মধ্যে খৃস্টীয় ধর্মভাবসকল রীতিমত জোর দখল জানাইয়াছিল। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপনিষদের তত্ত্বমূলক মন্ত্র-আওড়ানো ভক্তির উচ্ছ্বাসহীন উপাসনাপদ্ধতি তাঁহাদের মোটেই ভালো লাগিত না। আর পাপবোধ ও অনুতাপের ভাববর্জিত, কেবল জগৎরচনায় ভগবানের অসীম আনন্দ ও জ্ঞানকৌশল এবং জীবনে তাঁহার প্রেম ও করুণার ভাবের বিশুদ্ধ তালমানলয়সংগত গানও তাঁহাদের মন ভিজাইত না। এ অসন্তোষ অনেক দিন হইতে তাঁহাদের মনে ভিতরে ভিতরে জমিতেছিল। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে বিচ্ছেদের যে একটা প্রধান কারণ এই জায়গায় ছিল না, এমন কথা আমি মনে করি না।

জাতিভেদ ভাঙিতে হইবে, অসবর্ণ বিবাহ দিতে হইবে, স্ত্রীজাতিকে উন্নত ও প্রশস্ত অধিকার দিতে হইবে— ইত্যাদি যে-সমস্ত সামাজিক সংস্কারের আন্দোলন ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে উঠিয়াছিল, তাহার মূলেও খৃস্টানধর্মের একটা বড়ো প্রেরণা ছিল। কারণ খৃস্টের আদর্শ সমস্ত মানুষের যোগে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা। সেই-জন্যই তো খৃস্টের যথার্থ ভক্তশিষ্যেরা পাপী দরিদ্র ও অস্পৃশ্যের উদ্ধার-সাধনব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকেন। সমাজসংস্কারের এই আন্দোলন বাংলাদেশে ঠিক সময়েই আসিয়াছিল। কারণ, এই একই সময়ে সমস্ত বাংলাদেশে সাহিত্যে, রাজনীতিতে সকল দিক দিয়া একটা নবজাগরণের সূচনা দেখা দিয়াছিল। ইহারই কয়েক বছর পূর্বে বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহের আন্দোলন দেশকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়া যায়।

কেশবচন্দ্র তাঁহার কালের এই নূতন জাগরণের চঞ্চলতার নানা লক্ষণ তাঁহার অপূর্ব প্রতিভার বলে বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহার বন্ধুদিগকে বুঝাইতেও পারিয়াছিলেন। একটা সংগ্রাম যে আসন্ন, তাহার অস্পষ্ট আরক্তিম ছায়া তিনি আকাশে যেন ভাসিতেছে, দেখিয়াছিলেন। এ দেশে যে ব্যক্তিত্ব-বোধের একটা বোধনযজ্ঞের নানা আয়োজন চলিতেছিল, এ দেশের হাওয়ায় তিনি যেন তাহার খবর পান। সেই-সকল স্পষ্ট ও অস্পষ্ট আভাসগুলি তাঁহার কল্পনায় মূর্তি গ্রহণ করিয়া তাঁহার মানসলোকে চরিয়া বেড়াইতেছিল এবং তাঁহার সমস্ত শক্তিতে তাহারা ঢেউ তুলিয়া কূল ছাপাইয়া বাঁধ ভাসাইয়া একটা

ভাবী স্বর্গলোকের দিকে ছুটিয়া চলিতেছিল। অমূর্ত স্বর্গরাজ্যের স্বপ্ন তখনই তাঁহার মনের মধ্যে মূর্ত ও স্পষ্ট।

দেবেন্দ্রনাথ যে এই সামাজিক আন্দোলনের জন্য রীতিমত প্রস্তুত হইয়াছিলেন এবং তিনি যে ইহাকে ঠেকাইবার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া ইহাকে অগ্রসর করিয়া দিবার কল্পনাই মনের মধ্যে পোষণ করিতেছিলেন তাহা তাঁহার 'পত্রাবলী' বাহির হইবার পূর্ব পর্যন্ত কেহই জানিতেন না। আমাদের সকলেরই মনে এই ধারণা ছিল যে দেবেন্দ্রনাথ বরাবরই সমাজসংস্কারের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। জাতিভেদ রক্ষা করিয়া চলাই তিনি সংগত মনে করিতেন। এবং সেই কারণেই তাঁহার আর কেশবচন্দ্রের দলের মধ্যে বিরোধ বাধে এবং ব্রাহ্মসমাজে ভাগ হইয়া যায়। কিন্তু এ কথাটা যে সম্পূর্ণ সত্য নয় তাহা আমরা তাঁহার চিঠিপত্র না পড়িলে কোনোদিন বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। বাস্তবিক, দেবেন্দ্রনাথ সমাজসংস্কারে রামমোহন রায়ের পন্থাই অনুসরণ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার মনে সমাজসংস্কারের প্রেরণা খৃস্টানধর্ম হইতে আসে নাই। একে তো তিনি তাড়াতাড়ি কোনো কাজ করিতে পারিতেনই না; অনেকদিন পর্যন্ত ভাবিয়া চিন্তিয়া ধীর ভাবে ভাবী কাজের সমস্ত ছবি প্রথমে মনের মধ্যে পরিষ্কার করিয়া আঁকিয়া লইতেন এবং তার পরে যখন কোথাও আর কিছুই ঝাপসা থাকিত না, তখনই সংকল্পিত কাজে তিনি হাত দিতেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন: "সকল কর্তব্যকার্যই তাঁহার ঈশ্বরের সত্তা ও সান্নিধ্যজ্ঞানের সহিত করার রীতি ছিল।" এমন-কি বিষয়ের কোনো বন্দোবস্ত করিতে গেলেও তিনি কিছুদিনের মতো লোকজন যাতায়াত, দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ করিয়া দিয়া ধ্যানস্থ হইয়া বসিতেন এবং মধ্যে মধ্যে বিষয়সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখিয়া লইতেন— এমনি করিয়া ঈশ্বরের সান্নিধ্যে কর্তব্য নির্ধারণ করিতেন। এজন্য তাঁহার সময় লাগিত। কোনো একটা কর্তব্য স্থির করিতে তাঁহাকে অনেকদিন পর্যন্ত ভাবিতে হইত। এ তো গেল তাঁহার মানসপ্রকৃতির একটা বিশেষত্বের দিক। এ ছাড়া, রামমোহন রায়ের মতো তিনি বিশ্বাস করিতেন যে সমাজের অভিব্যক্তির মধ্যে যে-সকল রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার বহুকাল হইতে দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে সমস্ত জাতির একটা চিত্তগত রূপ ধরা পড়িয়াছে। যদি কোনো সামাজিক রীতিনীতিকে সংস্কার করিতে হয়, তবে জাতীয় সেই চিত্তটিকে আগে ভালো করিয়া বুঝিয়া পরে তাহার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া সংস্কার করিতে হইবে— এক

কথায়, জাতীয় ভাবে সংস্কার করিতে হইবে। এক জাতির আচার-ব্যবহার অন্য জাতির মধ্যে প্রবর্তিত করা যায় না। জাতীয়ভাবে সংস্কার সাধনের আদর্শের একটি সুন্দর রূপ দেবেন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠানপদ্ধতি' বইটিতে দেখিতে পাওয়া যায়। তাই দেখিতে পাই যে, তিনি যখন সমাজসংস্কারের প্রয়োজন অনুভব করিয়া সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন ও 'অনুষ্ঠানপদ্ধতি' রচনা করিতেছেন, এবং যখন কি করিয়া সংকর-বিবাহও এ দেশে প্রবর্তিত করা যায় তাহাও ভাবিতেছেন, ঠিক সেই সময়েই কেশবচন্দ্র প্রভৃতি যুবকদল এক মুহূর্তে সামাজিক পরিবর্তন ঘটাইবার জন্য অধৈর্য হইয়া উঠিয়াছেন। আসল কথা, দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে আদর্শভেদ যথেষ্ট ছিল। সেই ভেদটা ক্রমশ স্পষ্ট হইয়া ব্রাহ্মসমাজের বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছিল।

রামমোহন রায়ের মতো দেবেন্দ্রনাথও মনে করিতেন যে, ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্ম-সমাজ হিন্দুসভ্যতার ধারার মধ্যে একালের প্রয়োজন অনুসারে দেখা দিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজ, হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজেরই একটি স্বাভাবিক বিশ্বজনীন বিকাশ। তিনি বলিতেছেন, "আমরা কিছু নূতন ধর্ম প্রচার করিতেছি না।··· চিরকাল হইতে যে ধর্ম উন্নত হইয়া চলিয়া আসিতেছে তাহাই ব্রাহ্মধর্ম।" অবশ্য এ দেশের ইতিহাসের ধারায় যে ধর্ম উন্নত হইয়া চলিয়া আসিতেছে, তাহারি কথা এখানে তিনি বলিতেছেন। হিন্দুসমাজের পরে তাঁহার একটি গভীর শ্রদ্ধা ছিল বলিয়াই কোনো অন্যায় আচার বা কুপ্রথা, কোনো ভ্রান্ত ধর্মবিশ্বাস যে চিরকাল হিন্দুজাতির নিত্য লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইবে, এ কথা তিনি প্রাণপণে সমস্ত অন্তরের সহিত অস্বীকার করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার সমাজসংস্কারের আদর্শ ছিল—"হিন্দুপ্রথা হিন্দুরীতি ব্রাহ্মধর্ম দ্বারা পরিশুদ্ধ করিতে হইবে" এবং "হিন্দু-সমাজের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন থাকিয়া যাহাতে হিন্দুরীতিনীতি ব্রাহ্মধর্মের অনুযায়ী হয়, চেষ্টা করিতে হইবে।"

কেশবের আদর্শ ঠিক ইহার উল্টা আদর্শ। তিনি মনে করিতেন, ব্রাহ্মধর্ম "অন্যান্য ধর্মের ন্যায় জাতিবদ্ধ ও সম্প্রদায়বদ্ধ নহে।" ভিন্ন ভিন্ন ধর্মবিধানে সত্যের ভিন্ন ভিন্ন দিক প্রকাশ পাইয়াছে। ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে সেই ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের আংশিক সত্যগুলি মিলিবে, ইহাই ব্রাহ্মধর্মের একালের পক্ষে বিশেষ বিধান। সেইজন্য তিনি 'শ্লোক-সংগ্রহ' বাহির করাইলেন—তাহাতে সকল ধর্মশাস্ত্র হইতেই বাছা বাছা বচন সংকলিত হইল। শুধু প্রকৃতিতে ঈশ্বরের প্রকাশ দেখার জন্য

যে-সকল ধর্মমত ও সাধনা দাঁড়াইয়াছে— যেমন বৈদিক যুগে— তাহারা যথেষ্ট নয়। শুধু ব্রহ্মকে আত্মায় গুহাহিত ভাবে দেখার জন্য যে-সকল ধর্মতত্ত্ব ও সাধনা আছে— যেমন বেদান্তের যুগে— তাহাও যথেষ্ট নয়। ইতিহাসের মধ্যে বিশেষ বিশেষ মহাপুরুষকে প্রেরণ করিয়া বিধাতা যে বিশেষ বিশেষ ধর্মবিধানকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেই-সমস্ত বিধানগুলিকে এক জৈব সমন্বয়ে ("Organic synthesis") গাঁথিয়া তুলিতে হইবে। এবং সেই বিধানমালার ("Concatenation of dispensations") ভিতর দিয়া ঐতিহাসিক ব্রহ্মের ("God in History") বিরাট স্বরূপকে উপলব্ধি করিতে হইবে। কোনো বিধানেই সত্যের পূর্ণ প্রকাশ হয় নাই। একালের নূতন ধর্মবিধানে সেই-সমস্ত বিধানগুলির আংশিক সত্যগুলি মেলা চাই। ইহাই কেশবচন্দ্রের নববিধানের বাণী। এ বাণী ক্রমে স্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কুঁড়ির আকারে বরাবরই ইহা তাঁহার মধ্যে ছিল।

ঈশ্বরের বিশেষ বিধান যে এক-একজন মহাপুরুষকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায় তাহা দেবেন্দ্রনাথ স্বীকার করিতেন। ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানে তিনি বলিতেছেন— "তিনি মধ্যে মধ্যে তেজস্বী পুরুষদিগকে এখানে প্রেরণ করিতেছেন। তাঁহার সেই প্রিয়পুত্রেরা তাঁহার মঙ্গলভাবের অনুকরণ কবিয়া তাঁহার প্রেম পৃথিবীর সর্বত্র প্রচার করিতে থাকেন।" কিন্তু কেশবের মহাপুরুষবাদ এই পর্যন্তই থামে নাই। তিনি মহাপুরুষদিগকে না স্বর্গীয় না মানবীয়, দুয়েরি মিশল বলিয়াছেন। ঠিক অবতারবাদ বলিলে যাহা বোঝায় তাহা নয়, অথচ অবতারবাদ-ঘ্যাঁষা কথা। মহাপুরুষদের মধ্যে খৃস্টকে তিনি জগতের পরিত্রাণক্ষম অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। খৃস্টের 'রক্ত এবং মাংস' খাইয়া খৃস্টের বিশ্বাস, আত্মবলিদান, প্রেম ও স্বর্গীয় ভাবকে আমাদের অধ্যাত্ম-জীবনের উপাদান করিতে হইবে বলিয়াছেন। এই রক্ত ও মাংস খাওয়ার ব্যাপাবটা খৃস্টধর্মেব একটি পৌত্তলিক আচার। এক বিশেষ অনুষ্ঠানে রুটি ও মদ্য খাইয়া খৃস্টানেরা মনে করে যে খৃস্টের রক্ত ও মাংস তাহারা খাইতেছে এবং এই-রূপে খৃস্টকে আত্মসাৎ কবিয়া খৃস্টের শরীর ও আত্মার সঙ্গে একাত্ম হইতেছে। অতএব গ্রেটমেন বলিলেও খৃস্টই কেশবের কাছে অদ্বিতীয় গ্রেটম্যান বা গডম্যান —বা স্বর্গীয় মানুষ ছিলেন। এই খৃস্টভক্তি তাঁহার জীবনে ঈশ্বর-ভক্তি ও মানব-সেবার উৎস যেমন করিয়াই খুলিয়া দিক তখনকার ব্রাহ্মসমাজে ইহা যে বিশুদ্ধ

আকারে প্রকাশ পায় নাই সে সম্বন্ধে কোনো সংশয় করিবার কারণ মাত্র নাই।

বিশ্বমানবের ইতিহাসের মধ্যে মহাপুরুষদের ভিতর দিয়া ধর্মবিধান প্রতিষ্ঠিত হইয়া চলিয়াছে, এ কথা দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র দুজনেই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র পূর্ব পূর্ব বিধানের কোনো বিধানের সত্যই পূর্ণ সত্য নয় জানিয়া সেই প্রত্যেক বিধানের আংশিক সত্যগুলিকে মিলাইয়া এক অখণ্ড পূর্ণ ধর্ম-বিধানে পৌঁছিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, বলিলাম। অথচ কেমন করিয়া এই মিলন ঘটানো যাইবে? শুধু কি ধর্মতত্ত্বকে মিলাইতে হইবে? সে তো দর্শনের কাজ, ধর্মের কাজ নয়। কেশবচন্দ্র প্রত্যেক ধর্মবিধানের আচার-অনুষ্ঠান (rituals), বিগ্রহ (symbols) এ সমস্তই মিলাইতে বসিলেন। 'খৃস্টের রক্ত মাংস খাইতে হইবে' এই-সব কথা বলার সময় হইতেই এই চেষ্টার সূত্রপাত এবং নববিধানে এই চেষ্টার পরিণতি। ধর্মের যে অংশ সার্বজাতিক এবং যে অংশ বিশেষভাবে জাতীয় ইতিহাসের অন্তর্গত, এই দুই অংশের মধ্যে যে একটা অত্যন্ত ভেদ আছে, তাহা কেশবচন্দ্র শেষ পর্যন্ত মানেন নাই।

অথচ যেমন রামমোহন রায়, তেমনি দেবেন্দ্রনাথ দুইজনেই মনে করিতেন যে, প্রত্যেক বিধানই ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ইতিহাসের ভিতর দিয়া ক্রমশ পূর্ণতর বিকশিততর হইয়া চলিয়াছে। ইহুদী, খৃস্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, বেদ-বেদান্তের বিধানপরম্পরা সমস্তই ভিন্ন পথে এক মহা পূর্ণ পরিণামকে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছে। ইহারা যদি স্থিতিশীল (Statical) হইত, তবে ইহাদিগকে মেলানো চলিত। ইহারা গতিশীল (Dynamical)। সুতরাং এই বিধানগুলি পরস্পরের বিকাশে পরস্পরের সাহায্য লইতে পারে; কিন্তু ইহাদের বিকাশের পথ বিশেষ বিশেষ ইতিহাসের ভিতর দিয়া। রাজা রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে এক প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন যে এই ভাবেই বিশ্বধর্মবিধানগুলিকে রামমোহন রায় আলোচনা করিয়া তাহাদের ভিতরকার সার্বভৌমিক তত্ত্ব ও লক্ষ্যকে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিলেন। জগতের ধর্মবিধানগুলি তাঁহার কাছে ক্রমপরিণামী, ক্রমোন্নতি-শীল।

যদি তাই হয়, তবে ব্রাহ্মধর্ম যে বেদবেদান্তের বিধানেই ঠেকিয়া থাকিবে, তাহা যে আর উন্নত কোনো আকার ধারণ করিবে না, এ কথা দেবেন্দ্রনাথ কেমন করিয়া বলেন? তাহাকে একালের নানা জ্ঞানতীর্থ প্রাণতীর্থ ধর্মতীর্থ হইতে তীর্থসলিল সংগ্রহ করিয়া তাহার অমৃতভাণ্ডটিকে পূর্ণ করিতে তো হইবে।

ব্রহ্মবিদ্যালয়ের এক উপদেশে তিনি স্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়াছেন, "যত ধর্ম আছে সকল ধর্ম হইতেই সাহায্য পাইয়া তাহাদের উপরে ব্রাহ্মধর্ম স্থাপিত হইয়াছে।" 'ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাসে' এবং 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানে' একদিকে দেকার্ত হইতে কাণ্ট পর্যন্ত পাশ্চাত্ত্য দর্শনের সমস্ত ধারা এবং পাশ্চাত্ত্য ধর্মতত্ত্বের সমস্ত ধারা, অন্য দিকে বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া বেদান্ত দর্শন পর্যন্ত ভারতীয় ধর্ম-চিন্তা ও ধর্মসাধনার সমস্ত ধারা, এই দুই ধারাকে তিনি তত্ত্বজ্ঞান ও অধ্যাত্ম-সাধনা এই দুই দিক হইতে মিলাইয়াছেন। এই গঙ্গা-যমুনার মহাসংগমেই ব্রাহ্ম-ধর্মের নূতন প্রয়াগতীর্থ তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু এই যে চিন্তার নূতন নূতন ছাঁচ (moulds and categories) তিনি রচিলেন, এ ছাঁচ একেবারে এ দেশীয় বলিয়া, অন্য দেশের শাস্ত্রের কাছে যে তিনি কতটা ঋণী সে খবরটি ধরা পড়ে নাই।

আমার মনে হয়, এই জাতীয়তার আদর্শটিকে কি ধর্মে, কি সামাজিক অনুষ্ঠানে, আচারে আচরণে, নব্য ব্রাহ্মেরা কোথাও আমল দিতে চান নাই বলিয়াই তাঁহাদের সার্বজাতিকতার আদর্শ দেশের কাছে অত্যন্ত বৈদেশিক আদর্শ বলিয়া ঠেকিয়াছে এবং আজ পর্যন্ত ঠেকিতেছে। ১৮৭২ সালে ব্রাহ্ম-বিবাহকে বৈধ করিবার জন্য তিন আইনের বিবাহের বিল পাস হয়। সে বিলে বিবাহার্থীকে স্পষ্ট করিয়া স্বীকার করিতে হয় যে, আমি হিন্দুধর্ম মানি না। এ বিল যে নব্য ব্রাহ্মদিগকে বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিতে হইয়াছিল সে কথা সত্য। কারণ আদিব্রাহ্মসমাজ 'ব্রাহ্মবিবাহ-বিল' পাস হওয়ার বিরোধী ছিলেন। তাঁহারা নিজেদের সমাজের অপৌত্তলিক বিবাহকে হিন্দুবিবাহ বলিয়া গণ্য করাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। হিন্দুসমাজ তাঁহাদের বিবাহকে পুরাপুরি স্বীকার করে নাই এবং নব্য ব্রাহ্মদের অসবর্ণ বিবাহকে আরো দশগুণ অস্বীকার করিত, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। গভর্মেণ্টের পক্ষ হইতেও ব্রাহ্মবিবাহকে হিন্দু-বিবাহের অন্তর্গত করিয়া কোনো আইন পাস করানো অত্যন্ত কঠিন হইত। কিন্তু আদিব্রাহ্মসমাজের লোকেরা যেমন করিয়া অপৌত্তলিক বিবাহকে শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, নব্য ব্রাহ্মেরা তেমন একটা আন্দোলন কেন তুমুলভাবে দেশের মধ্যে শুরু করিয়া দিলেন না? যে ভারতবর্ষের জাতিতন্ত্রের মূলে আর্য-অনার্যের স্পষ্ট সংমিশ্রণ আছে, সেখানে অসবর্ণ বিবাহকে অহিন্দু বিবাহ মনে করিবার কোনো কারণ ছিল না এবং বেদ

হইতে পুরাণ তন্ত্র পর্যন্ত সমস্ত শাস্ত্র মন্থন করিয়া জাতি-মিশ্রণের পক্ষ সমর্থন করাও অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল না। আদিব্রাহ্মসমাজ অপৌত্তলিক বিবাহ-সম্বন্ধে পণ্ডিতদের বিধান আনিতেছেন বলিয়া সেই বিধানকে উল্টাইবার জন্যই কেন নব্য ব্রাহ্মেরা সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিলেন? তিন আইনের বিবাহ-বিলে 'হিন্দু নই' এ স্বীকারোক্তি নব্য ব্রাহ্মেরা করিতে প্রস্তুত হইবেন কিনা ইহা লইয়া যখন ব্যবস্থাপক সভার আইনবিভাগের সভ্য ষ্টিফেন সাহেবের মনেও দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে, তখন কেন নব্য ব্রাহ্মেরা সরাসরি এ বিষয়ে তাঁহাদের মত জানাইয়া পত্র পাঠাইলেন, এবং তাহাতে স্পষ্ট করিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন "The term Hindu does not include the Brahmos?"—ব্রাহ্ম কথাটা হিন্দুশব্দের অন্তর্গত নয়? কেশবচন্দ্র নিজে টাউনহলের বক্তৃতায় বলিলেন, "যদি হিন্দুসমাজ হইতে ব্রাহ্মগণকে বিচ্ছিন্ন হইতে হয়, তাহাতে তাঁহাদের ক্ষতি কি!"[১] সুতরাং রাজনারায়ণ বসুর এ আক্ষেপের যথেষ্ট কারণ আছে যে, "যেদিন কেশববাবু বলিলেন, 'আমি হিন্দু নই' সেদিন কি শোচনীয় দিবস!" কারণ সেই দিনই ব্রাহ্মসমাজে হিন্দুসমাজে বিচ্ছেদ হইয়া গেল। তিনি লিখিয়াছেন, "যখন চৈতন্যমতাবলম্বী বৈষ্ণবদিগের কণ্ঠী-বদল বিবাহ এবং অত্যন্ত আধুনিক শিখ-সম্প্রদায় কোকাদিগের বিবাহ আদালতে বৈধ বলিয়া গণ্য হয়, তখন বিশেষ আইন না হইলেও ব্রাহ্মবিবাহ আদালতে বৈধ বলিয়া গ্রাহ্য হইত তাহাতে আর সন্দেহ নাই।" তবেই দেখিতেছি যে, পাছে রাজবিধির সাহায্য না পাইলে কোনো গোলযোগ উপস্থিত হয়, সেজন্য ভয়ে ভয়ে তাড়াতাড়ি ব্রাহ্মেরা অহিন্দু এ কথা কবুল করিয়া লইয়াও অসবর্ণবিবাহকে বিধিবদ্ধ করিবার জন্য যে চেষ্টা করিলেন, সে চেষ্টার মূল কারণ স্বাজাত্যবোধের অভাব। এ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার আমি তো কোনো কারণ দেখি না। বোধ হয় এই অভাবের জন্যই ব্রাহ্মসমাজ ক্রমশ দেশের চিত্তক্ষেত্রের বাহিরে পড়িয়া গেল। ১৮৭২ সালের পর হইতেই ব্রাহ্মসমাজের যুগের অবসান এবং হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের যুগের আরম্ভ। ক্রমে শশধর তর্কচূড়ামণির হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, অল্‌কট ব্লাভাট্‌স্কির থিয়সফি, ভক্ত বিজয়কৃষ্ণের অসাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবী ভক্তিবাদ ও গুরুবাদের আন্দোলন, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অদ্বৈতবাদের ভিতর দিয়া সকল ধর্মের সমন্বয়-

১ গৌরগোবিন্দ রায়, আচার্য কেশবচন্দ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬৪৩।

চেষ্টা ও স্বাজাতিকতার নব 'উদ্বোধন'—এই সমস্ত পরে পরে হিন্দুসমাজের মধ্যেই দেখা দিতে লাগিল। সাহিত্যে বঙ্কিম এবং নবীনচন্দ্র গীতার জ্ঞান-কর্ম-ভক্তিযোগের সামঞ্জস্যের আদর্শ হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ এবং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেই সেই আদর্শের পূর্ণ প্রকাশ, এই ভাবের আলোচনা ও রচনার দ্বারা নব্য হিন্দু-ধর্মকে জাগাইবার চেষ্টা করিলেন।

অথচ সকলের চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এক হিসাবে কেশবচন্দ্রই এই নব্য হিন্দুধর্মেব সকল আন্দোলনেরই মূল। একালে খৃস্টভক্তির ভিতর দিয়াই হৌক বা কীর্তনাদির ভিতব দিয়াই হৌক ভক্তির আন্দোলনকে তিনিই প্রথম জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। একালের গুরুবাদ তাঁহারি মহাপুরুষবাদের পরিবর্তিত সংস্করণমাত্র। তাঁহার নববিধানে বিশেষ বিশেষ দিনে বিশেষ বিশেষ মহাপুরুষের সঙ্গে অধ্যাত্মযোগ (Communion) স্থাপনের যে অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহার ভিতরে যে তত্ত্বটি ছিল গুরুবাদেব মধ্যেও সেই একই তত্ত্ব। যে সাধক ঈশ্বরের সঙ্গে যোগযুক্ত হইয়াছেন, ঈশ্বরের প্রকাশ তাঁর মধ্যেই সব চেয়ে বেশি বলিয়া তাঁহার সঙ্গে অধ্যাত্ম সম্বন্ধ হইলে আমাদের হৃদয়ের বন্ধ দরজা তিনি অনায়াসে খুলিয়া দিয়া অধ্যাত্মলোকে আমাদের প্রবেশ করাইতে সাহায্য করিতে পারেন। গুরুবাদের এই তো ভিতরকার কথা।

তার পরে পুত্তলিকাপূজার যে-সকল আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ক্রমে দেখা দিয়াছিল, তাহারও এক হিসাবে কেশবচন্দ্রই মূল। তিনি যখন সাধু রামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছেন, তখনি পৌরাণিক হিন্দুধর্ম তাঁহার মনকে ও কল্পনাকে আকর্ষণ করিয়াছে দেখিতে পাই। তিনি ঐ "পুত্তলিকাপূজার তত্ত্ব"[২] সম্বন্ধে এক ইংরাজী প্রবন্ধে লিখিতেছেন যে, "ভগবানের অসংখ্য টুকরা হিন্দু পৌত্তলিকতায় আছে, তাহাদিগকে জড় করিলেই অখণ্ড ঈশ্বরে আসা যায়। ...ঈশ্বরের প্রকৃতির এই নানাদিক না দেখিয়া কেবলমাত্র এক অখণ্ড ঈশ্বরে বিশ্বাস করা এক 'অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট' ঈশ্বরে বিশ্বাস করার নামান্তর—তাহাতে মানুষকে যুক্তিবাদ ও অবিশ্বাসে লইয়া যায়। ঈশ্বরের একই স্বরূপে তাঁহাকে পূজা করাও চলে না। তাহাতে পূজা অত্যন্ত নীরস, জীবনশূন্য ও বিস্বাদ হইয়া পড়ে।... কখনো লক্ষ্মী, কখনো সরস্বতী, কখনো মহাদেব, কখনো জগদ্ধাত্রী, এই নানা-

২ 'The Philosophy of Idol Worship', *Sunday Mirror*, 1st August 1880.

ভাবে—কখনো এক নামে, কখনো অন্য নামে হরিকে নিত্য নবীন বেশে দেখিব।"

কেশবের প্রতিভা এবং প্রকৃতির মধ্যে নূতনের পরে এমনি একটি প্রবল টান ছিল যে, পুরানো বাঁধ ভাঙিয়া নূতন বাঁধ তৈরি করিয়া তুলিলেও তাঁহার প্রতিভার প্রবল আবেগ তাহাকে বিপর্যস্ত করিয়া আবার একটা নূতনতরের খোঁজে ছুটিত। এই কারণেই কেশবের নূতন সনাতনকে খাতির করিত না। শিল্পী যেমন করিয়া নব নব শিল্পমূর্তি তৈরি করে, মনের ভাবকে বিচিত্র রসরূপে লীলায়িত করে, ধর্মকেও তেমনি করিয়া নূতন নূতন রূপ, নূতন নূতন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া পাইবার একটা প্রবল আবেগ কেশবচন্দ্রের ভিতরে ছিল। কবি গ্যয়টে ধর্মকে এমনিতর শিল্পের মতো করিয়া ব্যবহার করিয়াছিলেন; নিত্য নূতন ধর্মানুষ্ঠানকে পরীক্ষা করিয়া তাহার রসসম্ভোগে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কতকটা সেই ভাবেই কেশবচন্দ্র ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের বহিরঙ্গ অনুষ্ঠানগুলিকে শিল্পরচনার মতো করিয়া সাজাইয়াছেন। কখনো পঞ্চপ্রদীপের আরতি, কখনো নিশানবরণ, কখনো হোম, কখনো ব্যাপটিজ্‌ম্ বা স্যাক্রামেণ্ট। প্রত্যেক অনুষ্ঠানেরই ভিন্ন ভিন্ন রস এবং কোনো রসকেই তিনি বাদ দিতে চান নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, এ জায়গায় রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের অত্যন্ত প্রভেদ। তাঁহারা কেহই ধর্মের অনুষ্ঠানগুলিকে জোড়া দিতে যান নাই, কারণ তাঁহারা জানিতেন যে, সেগুলি বিশেষভাবে জাতীয় ইতিহাসের জিনিস। এ কথা অবশ্য ঠিক যে, তত্ত্বচিন্তা হইতে অনুভব এবং অনুভব হইতেই অনুষ্ঠানের স্বতঃই উৎপত্তি হয় এবং সেইজন্য সকল ধর্মেই নানা পুজাবিধি, অনুষ্ঠান ও বিগ্রহাদি অবশ্যম্ভাবীরূপেই দেখা দেয়। তবু এই অনুষ্ঠানগুলি অনেক সময়েই ধর্মকে ভারগ্রস্ত করে, তাহার বিশুদ্ধতাকে নষ্ট করে। সকল ধর্মেরই শৈশবকালে, এই ধর্মের অনুষ্ঠানের সূত্রে, tribeদের মধ্যে একটা ঐক্য গড়িয়া উঠে। এমনি করিয়া পরে পূর্ণ বিকশিত সমাজেও সেগুলি আর বিদায় লইতে চায় না, ভার ক্রমশ বাড়িতেই থাকে। রামমোহন রায় ও দেবেন্দ্রনাথ এই জড় ভার পরিষ্কার করিতে চাহিয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ বেদ ও উপনিষদের মধ্যেও কালের অনেক অর্থহীন সংস্কারের জড় ভার দেখিতে পাইয়াছিলেন বলিয়াই তাহাদিগকে গোটাভাবে লইতে পারেন নাই। তিনি শাস্ত্রের মহাবাক্যকেই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই,

"আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিতবিশুদ্ধ হৃদয়ে" যে-সকল শাস্ত্রবাক্য সত্য বলিয়া পরীক্ষিত হইবে তাহাদিগকেই প্রামাণ্য মনে করিয়াছেন। জ্ঞান নিঃসংশয় হওয়া চাই, হৃদয় বিশুদ্ধ হওয়া চাই, তার পর ধ্যানযোগে ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া যে উপলব্ধি হইবে— সেই উপলব্ধির সঙ্গে শাস্ত্রের যে-সকল উপলব্ধির কথার সুর মিলিবে, সেই সেই বাক্য গ্রাহ্য ও প্রামাণ্য। এমনি করিয়াই যাহা নশ্বর এবং অবিনশ্বর, যাহা প্রাচীন এবং চিরনবীন, তাহাদের মধ্যে পার্থক্য রচিয়া তিনি একটি স্থির সত্যের ভূমি তৈরি করিয়া তুলিয়াছিলেন। শাস্ত্রের সেই অবিনশ্বর এবং চিরনবীন অংশকেই তিনি তাঁহার 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থে স্থান দিয়াছেন।

৪

গঙ্গা ও যমুনার দুই ধারায় যেমন কাশী ও বৃন্দাবন দুই মহাতীর্থ দাঁড়াইয়াছে, অথচ এই দুই ধারা যেমন এক মূল ধারার সঙ্গে সংযুক্ত— তেমনি কেশবচন্দ্রের 'ব্রহ্মগীতোপনিষদে' উপদিষ্ট 'যোগ এবং ভক্তি' সাধনের মূল ধারাতে দুইটি উপধারা মিলিয়া এক নূতন কাশী ও নূতন বৃন্দাবনের তীর্থ রচনা করিয়াছে। এই নূতন তীর্থের অধিকারী দুইজন মহাপুরুষ: একজন রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ, অপরজন ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। একজন গিয়াছেন শাঙ্কর অদ্বৈতবাদের দিকে এবং সেই অদ্বৈতবাদের কঠিন দুর্গের আশ্রয়ে পৌত্তলিকতা প্রভৃতি নিকৃষ্ট অধিকারীর ধর্মকেও আশ্রয় দান করিয়াছেন। অপরজন গিয়াছেন শ্রীগৌরাঙ্গের অহৈতুকী ভক্তিসাধনার দিকে এবং সকল জীব ও জড়কে শ্রীভগবানের নিত্যরসলীলার অঙ্গীভূত জানিয়া সকল প্রকারের ধর্ম-মতকে ও ধর্মপন্থাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করিয়াছেন। বিবেকানন্দ ও বিজয়কৃষ্ণ, এ দুজনের আদিই যে কেশবচন্দ্র, এ কথা আমি কেন মনে করিতেছি তাহার কারণ এই যে, কেশবই ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে ভক্তিশিক্ষার্থী বিজয়কৃষ্ণকে উপদেশ দিয়াছিলেন, "প্রমত্ত হওয়া, বিজয়, তোমার জীবনের অতি উৎকৃষ্ট অবস্থা মনে করিবে। সামান্য নাম উচ্চারণ মাত্র তোমার হৃদয়ে প্রেম উন্মীলিত হইবে।" ভক্তিকে তিনিই "প্রগল্‌ভা, উন্মত্ত ভক্তি" বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার ভক্তিশিক্ষার্থী উত্তরকালে তাঁহার 'প্রগল্‌ভা ভক্তি'কে শ্রীগৌরাঙ্গের আত্মবিস্মৃত আত্মবিহ্বল শান্ত-দাস্য-বাৎসল্য-সখ্য-মধুর-রস-সম্ভোগের বিচিত্রতার সাধনার দিকে লইয়া গেলেন। তখন তাঁহার মনে হইল যে, পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ

প্রভৃতি কুসংস্কার দূর করার চেষ্টার দরকার নাই। কারণ, এ সমস্তই পথ। এই পথেই, এই সংস্কারের মধ্যেই এই ভুলভ্রান্তির ভিতর দিয়াই, নরের সঙ্গে নারায়ণের লীলা চলিতেছে। জীবের মুক্তির একমাত্র উপায় সাধুসঙ্গ ও সদ্‌গুরু-লাভ— সদ্‌গুরু যখন শক্তি সঞ্চার করিয়া দেন তখন জীবের এই রসলীলা দেখিবার দিব্যচক্ষু খুলিয়া যায়; তখন তাহার অহংকার থাকে না; তখনি সেই 'অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ!' অতএব সাধুদের শক্তি অলৌকিক, তাঁহাদের সঙ্গ না পাওয়া পর্যন্ত মানুষ প্রকৃত অধ্যাত্ম-জগতের দরজার বাহিরে জ্ঞান আর তর্কযুক্তি লইয়া প্রহরীপাহারাদের সঙ্গে মারামারি করে। ভিতরে যখন যায়, তখন তাহার এই দ্বন্দ্বপ্রিয়তা একেবারে যায়। তখন সে দেখে সবই লীলা। সংক্ষেপে বলিতে গেলে গোস্বামী মহাশয়ের শেষ বয়সের এই মত। সেইজন্য তিনি পৌত্তলিক অপৌত্তলিক সকল বয়সের ও সকল ধর্মসম্প্রদায়ের স্ত্রী-পুরুষকে মন্ত্রদান করিতেন এবং এই এক নূতন ভক্তিযোগের সাধনায় তাহাদিগকে দীক্ষিত করিতেন। কেশবচন্দ্র তাঁহার ভক্তিসাধনায় এতটা দূর পর্যন্ত যাইতে পারেন নাই, কারণ, তাঁহার সাধনায় আবার অন্যান্য দিক ছিল। তবে বীজরূপে ঐ জিনিসটা তাঁহার মধ্যে ছিল বৈকি!

স্বামী বিবেকানন্দ কেশবচন্দ্রের সমাজের একজন উৎসাহী যুবক ছিলেন। কীর্তনের দলের মধ্যে তিনি একজন প্রধান ছিলেন। কেশব ও রামকৃষ্ণ পরমহংস এ দুজনের মিলনের মধ্যে যে পৌরাণিক তত্ত্বটি ফুটিয়া উঠিল, বিবেকানন্দ সেই তত্ত্বটির নীর পরিত্যাগ করিয়া ক্ষীর ভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে তত্ত্বটি "The Philosophy of Idol Worship"— যাহার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। এ তত্ত্বটি কিছু নূতন নয়— আমাদের পুরাণগুলির মধ্যে এ তত্ত্ব পূর্ণ বিকশিত। বস্তুত এই তত্ত্বই পুবাণগুলির প্রাণ। কেশবচন্দ্র শুধু হিন্দু পৌরাণিক বিগ্রহগুলিকেই গ্রহণ করেন নাই, তাহার সঙ্গে খৃষ্টীয় পুরাণের বিগ্রহগুলিকেও মিলাইয়াছিলেন। কিন্তু বিবেকানন্দের মধ্যে জাতীয় ভাব অত্যন্ত প্রবল থাকায়, তিনি কেশবচন্দ্রের খৃস্টানী নীর ভাগ একেবারে বর্জন করিয়াছিলেন এবং শুধু আমাদের দেশের হিন্দু পৌত্তলিকতার ভিতর হইতে যে বডো বড়ো তত্ত্ব সূক্ষ্ম তর্কের দ্বারা টানিয়া বাহির করা যায়, এই ক্ষীরটুকু গ্রহণ করিয়াছিলেন। পৌত্তলিক উপাসনার মধ্যে নিজের গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসের ভিতর দিয়া একটা সরল ভক্তির দিক দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন তিনি ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বিজাতীয়

দিকে অত্যন্ত বেশি মাত্রায় চলিয়াছে দেখিয়া তাহা হইতে সরিয়া পড়িলেন, তখন এই জাতীয় উপধর্মগুলিকে বাঁধিয়া তুলিবার মতো একটা বড়ো রকমের ঐক্যতত্ত্ব তিনি খুঁজিতে লাগিলেন। শাঙ্কর অদ্বৈতবাদে সেই তত্ত্বকে তিনি পাইলেন। এক পিঠে নির্গুণ সকল নামরূপোপাধিবিহীন এক, অন্য পিঠে মায়িক ও ঔপাধিক ত্রিগুণাত্মক বহু—এ দুয়ের মধ্যে তো কোনো বিরোধ হইতে পারে না। এই অদ্বৈতবাদের সঙ্গে পৌরাণিক দেবদেবীবাদের সমন্বয় বিবেকানন্দের ধর্মসমন্বয়। কিন্তু এই সমন্বয়ের মূলমন্ত্র প্রচলিত হিন্দুধর্মের "সব ধর্মই সত্য" এই ঢিলা ঔদার্যের মধ্যেই পাওয়া যায়। কেশবচন্দ্রও এই ঔদার্যবশতই অত্যন্ত আলগাভাবেই বলিয়া বসিয়াছিলেন, "Our position is not that there are truths in all religions, but that all the established religions of the world are true." অথচ এ কথা বলা ঠিক তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় ছিল কি না সন্দেহ। সিকাগো ধর্মমহাসভায় বক্তৃতায় বিবেকানন্দও এই কথাই বলিয়াছেন—"হিন্দু বলেন যে, মানব ভ্রম হইতে সত্যে গমন করিতেছেন না—কিন্তু সত্য হইতে সত্যে—নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে গমন করিতেছেন। হিন্দুর পক্ষে ক্ষুদ্র অজ্ঞানীদের ধর্ম হইতে বেদান্তের অদ্বৈতবাদ পর্যন্ত যাবতীয় ধর্মই অনাদি অনন্ত পরব্রহ্ম উপলব্ধির উপায়স্বরূপ।"

বিবেকানন্দ ব্রাহ্মনাম ত্যাগ করিয়া হিন্দুনামের উপর জোর দিয়া হিন্দুর ধর্ম, হিন্দুর সমাজ, হিন্দুর ক্রিয়াকর্ম সমস্তেরই মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া দেশে স্বদেশ-প্রেমের এক নূতন স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহার সঙ্গে কেশবচন্দ্রের যোগটা দেখিতে পায় না। কিন্তু ঐতিহাসিকের চক্ষে এই দুইজনের ভাবগত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের ব্যাপার ঢাকা পড়ে না।

সকল ধর্মই সত্য, এ কথার বিরুদ্ধে রামমোহন রায় বলিয়াছিলেন যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে-সকল বিরোধী বিধি দেখিতে পাওয়া যায়. সেগুলিকে তো নিত্যবিধি বলিয়া ধরা হইয়াছে। তাহারা তো সাময়িক বিধি নয়। হিন্দু বলিবে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিধি নিত্য বিধি। মুসলমান বলিবে পৌত্তলিকদিগকে সুতরাং ব্রাহ্মণদিগকে নিগ্রহ করাই নিত্যবিধি। অথচ এই পরস্পরবিরুদ্ধ বিধি ঈশ্বরের বিধি হইতেই পারে না; সুতরাং কোনো ধর্মের বিধিই নিত্যবিধি হইতে পারে না। সে সমস্তই আপেক্ষিক। অতএব সকল ধর্মে সত্য আছে, না বলিয়া সকল ধর্মই সত্য বলা যায় কেমন করিয়া?

কিন্তু এ-সকল যুক্তিবাদ কে শুনিবে! কালের পরিবর্তন হইয়াছে। কেন এমন হইল?

রামমোহন রায় ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দুজনেই যে অসাম্প্রদায়িক বিশ্বজনীন উদার ভিত্তির উপর ধর্মের নিত্যসত্যগুলিকে চিরপ্রতিষ্ঠিত দেখিয়াছিলেন, সে উন্নত ভিত্তিতে সমস্ত জাতি কিছু দাঁড়ায় নাই। এ বাংলাদেশের মাটির মধ্যে বৈষ্ণবধর্মের রসভাব একেবারে নিবিড় হইয়া ভরিয়া আছে। দেবেন্দ্রনাথ সেই রসোচ্ছ্বাসকে নানা দিক দিয়া ঠেকাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহা বাঁধ ভাঙিয়া ১৮৬৬ খৃস্টাব্দে দেশময় একটা ভাবপ্লাবন উপস্থিত করিয়াছিল। 'প্রগল্‌ভা ভক্তি'র একটা ঝোঁক আমাদের বাঙালী জাতির মনের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল হইয়া আছে। সুতরাং সেই ঝোঁককে বাধা দিলে তাহা বাধা মানিবে কেন? যদি মনে কর, তাহা ভুল পথে যাইতেছে— যাইবে। যদি রসের তুফানে সকল শুভ-চেষ্টার নৌকাডুবি হয়, হইবে। বিশ্বমানবের পথ একটানা সোজা রেখার সরল পথ নয়। সে "দুয়ের উল্টা টানে গোল রেখার পথ"; সেইজন্যই তো মানুষের সমাজেও এত গোল। মানুষের মধ্যে এই এক দ্বৈত রহস্য চিরকাল দেখা যায়— সে দুয়ের সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়াই একেকে চায়। সেই সামঞ্জস্যটি ঘটাইবার জন্য সে কখনো ছুটিয়া যায় বিশ্বের দিকে, কখনো ফিরিয়া আসে আপনার দিকে। কখনো যুক্তির কৃপাণে মূঢ় সংস্কারের জঙ্গল সাফ করে; কখনো ভক্তির রসানে সংস্কারগুলিকে এমনি রসাইয়া তোলে যে তাহারা সতেজে বাড়িতে থাকে। যুক্তির কাজ এক সময়ে হইয়াছিল, সে বেশ ভালোই হইয়াছিল। কিন্তু যুক্তি যখন ভক্তির বাড়াবাড়ি হইতেছে ভাবিয়া তাহাকে নিজের কঠিন বাঁধে বাঁধিবার উপক্রম করিল, তখনি বাধা পাইয়া সেই বাড়াবাড়িটা দশগুণ বাড়িল বই কমিল না। এমনি করিয়াই যাহার যেটুকু কাজ সে করিয়া যায়; সেটুকু তাহাকে করিতে দিতেই হয়। এবং মহাকাল তাহার চালুনি দ্বারা যাহা অসার অংশ তাহা ছাঁকিয়া লয়, যাহা সার অংশ তাহাই বিশ্বমানবকে পরিবেশন করে। রেফরমেশনের পাশাপাশি যেমন ক্যাথলিক রিভাইভ্যাল; লুথার ক্যালভিনের পাশাপাশি যেমন ইগনেসিয়াস লয়োলা— তেমনি ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলনের পাশাপাশি নব্য হিন্দুর অভ্যুত্থান এবং ভক্তির প্লাবন; কেশবচন্দ্রের পাশাপাশি বিবেকানন্দ। কেশবচন্দ্রের বিশ্বজাগতিকতার আদর্শ স্বাজাতিকতাকে যেখানে আঘাত করিয়াছিল, সেইখানেই বিবেকানন্দের ভিতর দিয়া তাহার প্রতিঘাত

ও প্রতিক্রিয়া আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। সেই প্রতিক্রিয়ার কাল এখনো চলিতেছে।

কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে যে ভক্তিসাধনের দিক ছিল না, এমন কথা মনে করিলে ভুল হইবে। আমার মনে হয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে প্রথমত অবতারবাদ এবং দ্বিতীয়ত যে রূপককে তাহা আশ্রয় করিয়াছে তাহার স্থূলতা তাঁহাকে ঐ ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করিয়াছিল। সেখান হইতে ভক্তিসাধনের কোনো খোরাক তাই তিনি সংগ্রহ করেন নাই। মুসলমান সুফী ধর্মের ভক্তিতত্ত্ব এবং সুফীপ্রভাবে উত্তর-পশ্চিমে কবীর, নানক প্রভৃতির মধ্যে যে ভক্তিবাদ ফুটিয়াছিল— সেই ভক্তিবাদই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুফী ভক্তকবি হাফেজ যে রূপককে আশ্রয় করিয়া গান গাহিয়াছেন, তাহা যে একেবারে বিশুদ্ধ তাহা বলা যায় না। তাহাতেও সংস্কারের (convention) আগল ভাঙার চেষ্টা আছে, বিদ্রোহের সুর আছে। যে সুরা মুসলমানধর্মে নিন্দনীয়, সেই সুরার উপমা হাফেজের গানে একেবারে ছড়াছড়ি গিয়াছে। হাফেজ নিজেকে পৌত্তলিক, দুর্নীতিপরায়ণ ও মাতাল বলিয়া গৌরব বোধ করিয়াছেন— এগুলি প্রথাগত ধর্মের বিরুদ্ধে কবির বিদ্রোহঘোষণা বৈ আর কি হইতে পারে! তবু এ কথা বলিতে হইবে যে, হাফেজের কাব্যে বৈষ্ণব কবিতার মতো শারীরিক উপমার অত বেশি মাত্রায় ব্যবহার নাই। এ একটা তাহার প্রধান গুণ। দ্বিতীয় গুণ, তাহার মধ্যে জ্ঞানের সঙ্গে রসের একটা সংমিশ্রণ হইয়াছে বলিয়া রস এবং তত্ত্ব এমন একটি সুবিহিত ওজন রক্ষা করিয়াছে, যে রূপ অরূপকে আচ্ছন্ন করিয়া একান্ত হইয়া উঠে নাই। তৃতীয় গুণ, প্রকৃতির সৌন্দর্যই ঐ ভক্তিতত্ত্বের রূপকের প্রধান অবলম্বন ; কেবল স্ত্রীপুরুষের যৌনসম্বন্ধ নয়। দেবেন্দ্রনাথের মানসপ্রকৃতির পক্ষে তাই এমন অনুকূল রসসাধনা আর কোথাও মিলিত না।

কবীরের একটি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি— অবতারবাদকে তিনি কেমন করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন পাঠক দেখিতে পাইবেন—

অনগঢ়িয়া দেবা
কৌন করৈ তেরী সেবা ॥
গঢ়ে দেব কো সব কোই পূজৈ
নিত হী লাবৈ সেবা।
পূরণ ব্রহ্ম অখণ্ডিত স্বামী
তাকো ন জানৈ ভেবা ॥

দশ ঔতার নিরঞ্জন কহিয়ে
সো অপনা না হোঈ।
য়হ তো অপনী করণী ভোগৈঁ
কর্ত্তা ঔর হি কোঈ ॥
জোগী জতী তপী সন্ন্যাসী
আপ আপ মেঁ লড়িয়াঁ।
কহৈঁ কবীর শুনো ভাই সাধো
রাগ লখৈ সো তরিয়াঁ ॥

"হে অপ্রতিষ্ঠিত দেবতা, কে করে তোমার সেবা? প্রতিষ্ঠিত দেবতাকে সকলেই পূজা করে, প্রত্যহ তাহাকে সকলে সেবা করে।"

"যিনি পূর্ণ, যিনি ব্রহ্ম, যিনি অখণ্ডিত, যিনি স্বামী, তাঁহার সন্ধানও কেহ লয় না। সকলেই বলেন, দশ অবতারই নিরঞ্জন ব্রহ্ম, কিন্তু অবতার কখনো পরমাত্মা হইতে পারেন না, কারণ অবতার তো আপন কর্মফল ভোগ করেন, কর্তা তবে নিশ্চয় স্বতন্ত্র আর কেহ। যোগী, যতী, তপস্বী, সন্ন্যাসী, সকলেই আপনাদের মধ্যে বিবাদ করিয়া মরিতেছেন। কবীর কহেন, শোনো ভাই সাধু, সেই রাগ যে দেখিয়াছে সেই তরিয়া গিয়াছে।"[৩]

কবীর-নানকের গানে প্রকৃতির সৌন্দর্যের রসানুভূতি যে কেমন জমিয়াছে, তাহার উদাহরণ উদ্ধার করিবার দরকার নাই। নানকের যে প্রসিদ্ধ ভজন দেবেন্দ্রনাথ অমৃতসরের গুরু-দরবাব হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন— 'গগন মে থাল রবিচন্দ্র দীপক বনে'— তাহাই তাহার বিশেষ উদাহরণ। কিন্তু এ-সকলের চেয়েও তাঁহার কাছে হাফেজের কবিতা মিষ্টতর ছিল। তাঁহার রস-সাধনা তাহাতে বেশি পরিতৃপ্তি লাভ করিত। তাহার কারণ বোধ হয় কবীর, নানক প্রভৃতির মধ্যে একটা লড়াইয়ের দিক আছে। লোকাচার, শাস্ত্রবিধি প্রভৃতি তখনকার কালের সমস্ত আবর্জনাকে দূর করিয়া হিন্দু ও মুসলমানের চিরন্তন সত্যসাধনাটিকে উদ্ধার করিবার একটা সজ্ঞান চেষ্টা এই-সব মধ্যযুগীয় গুরুদের মধ্যে দেখা যায়।

৩ শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন-কর্তৃক অনুবাদিত "কবীর" দ্বিতীয় খণ্ড হইতে উদ্ধৃত।

"অরে ইন দুহু রাহ ন পাঈ।
হিঁদুকী হিংদবাঈ দেখী,
তুর্কন কী তুরকাঈ।"

"হায়রে, এই উভয়েই পথ পায় নাই। হিন্দুর হিঁদুয়ানী দেখিয়াছি, মুসলমানের মুসলমানী দেখিয়াছি।"

হাফেজের মধ্যেও বিদ্রোহের সুর যথেষ্ট আছে বলিয়াছি। তবু কবীর প্রভৃতির এই হিন্দুয়ানী ও মুসলমানীর সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য ইঁহাদের মধ্যে রসসাধনার তেমন একান্ত নিবিড় গভীরতা ও তন্ময়তা দেখা যায় নাই, যেমন হাফেজে দেখা গিয়াছে।

"ওহে সাকী, ওঠ ওঠ, পেয়ালা দাও।
কালের দুঃখের মাথার ধুলা ছড়াইয়া দাও।

আমার করতলে মদের পেয়ালা দাও— যেন আমি বুকের উপরকার এই নীলবাস ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারি!"

'কালের দুঃখের মাথার ধুলা' হাফেজের কাব্যে দাগ দেয় নাই। হাফেজের কাব্য তাই দেবেন্দ্রনাথকে ঠিকমত ধরিয়াছিল।

আমি মনে করি যে, জ্ঞান ও ভক্তির এই অপূর্ব সামঞ্জস্যের রাস্তায়, যে রাস্তায় দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার শেষ জীবনে একাকী চলিয়াছিলেন— আবার এ দেশকে ফিরিয়া আসিতে হইবে। এই পথ দিয়াই বিশ্বমানবের সদর রাস্তায় পড়া যায়— নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

১৮৭৮ খৃস্টাব্দে যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগসভা বসে, তখন দেবেন্দ্রনাথ এক চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন যে, সেই সভার মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি আছে। সেই উদ্দেশ্যের সফলতা দেখিয়া যাইবার মতো দীর্ঘ জীবন যদি তিনি পান, তবে তাঁহার মৃত্যুও সুখকর হইবে। ঈশ্বর এবং সত্যকে একমাত্র লক্ষ্যের বিষয় করিয়া তাঁহারা যে সার্থক হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এ চিঠি কেন তিনি লিখিয়াছিলেন? শুধু তাহাই নয়— সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোগী যাঁহারা ছিলেন— পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন

বসু, উমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি— তাঁহারাই আবার দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। শেষ বয়সে তাঁহাদেরি সঙ্গে তাঁহার যোগ ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল। তাঁহারা দেবেন্দ্রনাথকে গুরুর মতো ভক্তি করিতেন এবং তাঁহার কাছে ধর্মোপদেশ লইতেন এবং তিনিও তাঁহাদিগকে শিষ্যের মতোই স্নেহ করিতেন এবং মনের কথা খুলিয়া বলিতেন। এ সম্বন্ধেরই বা ভিতরের কারণ কি?

একমাত্র কারণ আমার মনে হয়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ রামমোহন রায় ও দেবেন্দ্রনাথের জাতীয়ভাবে সার্বভৌমিক বা সার্বভৌমিক ভাবে জাতীয় হওয়ার আদর্শকে স্বীকার করে নাই। কিন্তু এই বাণী লইয়া সে ভূমিষ্ঠ হয় যে, ধর্মে ও সমাজে সকল ব্যাপারে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা চাই। দেবেন্দ্রনাথের জীবনে এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতাই মূলমন্ত্র ছিল।

ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁহাকে এক সময় কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া পাঠান —তাহার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল এই—"মনুষ্য ভ্রমক্রমে সাধু-লোকদিগকে অবতার বলিয়া পুজা করে, তাহাতে সাধুদিগেব অপরাধ কি? ঐ সকল সাধু-জীবনের দৃষ্টান্তে যদি মন নির্মল হয়, তবে ধন্যবাদের সহিত সে দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা উচিত কি না?"

দেবেন্দ্রনাথ এই প্রশ্নেব উত্তরে লিখিয়াছিলেন—"এই প্রশ্নটির উত্তর প্রদানে আমাদিগের অন্তঃকরণে দুঃখ ও কষ্ট যুগপৎ উভয়ই উপস্থিত হইতেছে। যাঁহারা জগতে সাধু এবং অবতার বলিয়া সম্প্রদায়বিশেষের শ্রদ্ধা এবং পুজা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিন্দা করাও দুঃখজনক; অথচ যে-সমস্ত ভ্রম এবং অসত্য ঈশ্বর এবং মনুষ্যের মধ্যে অন্তরায়রূপে দণ্ডায়মান হয়, তৎসমুদায়ের নিরাকরণ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকাও কষ্টজনক। কেহ সাধুরূপেই জগতে জন্মগ্রহণ করেন, অথবা বিশেষ কোনো গূঢ় অর্থে সাধু হন, আমরা আদৌ এ কথাতেই সরল চিত্তে সায় দিতে পারি না। মনুষ্য, চেষ্টা এবং সাধনার বলে, উন্নতির পথে যত কেন অগ্রসর হোক না তথাপি সে মনুষ্যই, তাহাতে আর সংশয় নাই। অপরাপর মনুষ্যেরও যে প্রকৃতি, যে প্রবৃত্তি, যে আত্মা, যে হৃদয়; তাহারও সেই প্রকৃতি, সেই প্রবৃত্তি, সেই আত্মা, সেই হৃদয়। কেবল এইমাত্র প্রভেদ যে, অপরাপর অনেকের হয়ত হৃদয়নিহিত মহদ্‌বৃত্তিনিচয় উপদেশ এবং যত্নের অভাবে নিদ্রিত রহিয়াছে, যাঁহাকে আমরা সাধু বলিয়া বিশেষ পুজা করিতে ইচ্ছা করি,

তাঁহার হয়ত সেই সমস্ত শ্রেষ্ঠ বৃত্তি অবস্থার অনুকূলতায় অধিকতর বিকশিত হইয়াছে; অথবা অধিকতর জাজ্বল্যমানরূপে লোক-লোচনের গোচর হইতে পারিয়াছে। সাধু কে? এই শব্দটি কি আপেক্ষিক না উপমানিরপেক্ষ?...পাপ হইতে সম্পূর্ণ বিবর্তিই যদি সাধুতার অর্থান্তর হয়, তবে সেই শুদ্ধমপাপবিদ্ধং পূর্ণ ব্রহ্ম বিনা জগতে সাধু আর নাই, এবং যদি তাহা না হইয়া সাধুতার অর্থ আপেক্ষিক হয়, তবে জগতে সকলেই অংশতঃ সাধু এবং সকলেই অংশতঃ অসাধু।...

"যাঁহারা পৃথিবীতে অবতাররূপে গৃহীত হইয়াছেন, এবং মনুষ্যের হৃদয়জাত ঈশ্বরপ্রাপ্য ভক্তিকুসুমকে সমানভাগে ভাগ করিয়া ঈশ্বরের সহিত উপভোগ করিয়াছেন, নিজ নিজ অবতারত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত তাঁহারা বাক্য এবং কার্যদ্বারা চেষ্টা করিয়াছেন কি না, তৎসম্বন্ধে আমরা অধিক বাক্যব্যয় করা আবশ্যক মনে করি না। জগতের ইতিহাসই তাহার সাক্ষী; মোজেস, খৃস্ট, মহম্মদ প্রভৃতির জীবনবৃত্তান্তই তাহার প্রমাণ-স্থল। আমরা তাঁহাদিগকে লোকবঞ্চকও বলিতেছি না, অথচ তাঁহাদিগকে ভ্রান্তির স্বয়মিচ্ছু বন্দী না বলিয়াও ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। নিজ নিজ অবতারত্ব সাব্যস্ত না করিলে, তাঁহাদিগের নিজ নিজ প্রচারিত ধর্ম জগতে বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হইবে না, বোধ হয় এই ভ্রান্তির অধীন হইয়াই তাঁহারা মনুষ্যের অন্ধভক্তির অপব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহাদিগের উপদেশ এবং দৃষ্টান্তের মধ্যে আমরা যতটুকু ভাল পাই আদরের সহিত তাহা গ্রহণ করি। কিন্তু অপরাপর মনুষ্যের সহিত তাঁহাদিগকে আমরা কোন অংশেও স্বতন্ত্র এবং সাধুশ্রেণীর মনুষ্য বলিয়া বিশ্বাস করি না এবং ঈশ্বরের নামপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদেরও নামপ্রচার করা, ঈশ্বরপূজার আবশ্যকতা প্রতিপাদনের সঙ্গে সঙ্গে সাধুপূজারও আবশ্যকতা প্রতিপাদন করা, আমরা কখনই ধর্মসম্মত বলিয়াও স্বীকার করি না।"[৪]

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি দেবেন্দ্রনাথের সকল মতের সঙ্গে যে মিলিতেন তাহা নয়। দেবেন্দ্রনাথও তাহা জানিতেন। কিন্তু ইঁহারা যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্যই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিয়াছেন, যাহা সত্য বলিয়া বুঝিবেন তাহাই নির্ভীকভাবে পালন করিয়া যাইবেন এই যে ইঁহাদের

৪ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১৭৯৩ শক (১৮৭১ খৃষ্টাব্দ)।

সংকল্প— শুদ্ধমাত্র এই কারণে তিনি ইহাদিগকে ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার দল ছিল না, শিষ্য ছিল না— তিনি তাহা চান নাই বলিয়াই ছিল না। নহিলে তাঁহার পক্ষে দল বাঁধিয়া তোলা অত্যন্তই সহজ ছিল। তিনি জানিতেন, প্রত্যেকের পথ তাহার নিজের পথ, সে পথে ঈশ্বর এবং শুভবুদ্ধিই তাহার একমাত্র চালক।

ধর্মের ক্ষেত্রে যিনি এইরূপ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন, তিনি পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও কি শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিতেন? তাঁহার পরিবারে তাঁহার কর্তৃত্বপরায়ণতার কথাই তো শোনা যায়। সামাজিক ব্যাপারেও তিনি তো সমাজানুগত্যের আদর্শকেই মানিয়া চলিতেন বলিয়া বোধ হয়।

যেখানে পারিবারিক কোনো ব্যবস্থার ভার তাঁহার হাতে ছিল, সেখানে তিনি কর্তব্যবুদ্ধিতে যে ব্যবস্থা স্থির করিতেন, তাহা সকলকে মানিয়া চলিতে হইত। কারণ এটা ব্যবস্থারই নিয়ম— তাঁহার চরিত্রে এই নিয়মনিষ্ঠার (Discipline) দিকটা খুব প্রবল ছিল। নিয়ম যাহা স্থির হইয়াছে, তাহাকে মানিতেই হইবে। কিন্তু তিনি যখন পরিবারের অন্য কাহারো হাতে ব্যবস্থার ভার দিতেন, তখন সে সম্বন্ধে তাহাকে এমন স্বাধীনতা দিতেন যে, যে ভারপ্রাপ্ত সে কোথাও তাঁহার কর্তৃত্বের লেশমাত্র আঁচ অনুভব করিতে পারিত না। অন্যের স্বাধীনতার উপর এমনি তাঁহার একটি শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার পুত্রদের মতের কত সময় কত পরিবর্তন হইয়াছে, কেহ-বা অদ্বৈতবাদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, কেহ-বা নাস্তিকতার পক্ষ লইয়াছেন— তাঁহার কানে সে কথা আসিলে তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই এবং বাধা দিবার চেষ্টামাত্র করেন নাই। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর তাঁহার যে কতখানি শ্রদ্ধা এবং ভরসা ছিল, ইহা হইতেই বুঝা যায়। তাঁহার পরিবারে কতকাল ধরিয়া পৌত্তলিক পূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠান চলিয়াছে, তিনি ইচ্ছা করিলে বাধা দিয়া বন্ধ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই। স্ত্রী-স্বাধীনতার আন্দোলনে তিনি কোনোদিন যোগ দেন নাই— অথচ তাঁহার নিজের বাড়িতে স্ত্রী-স্বাধীনতার চরম দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার মধ্যম পুত্রবধূই বোধ হয় সর্বপ্রথমে স্বামীর সঙ্গে বড়োলাটের ভবনে গিয়াছিলেন; তাঁহার বাড়ির বয়স্ক ছেলেমেয়েরা একত্রিত হইয়া অভিনয় করিয়াছিলেন। এ-সমস্তই তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আদর্শের ফল। তিনি যে নিজের

পুত্রদিগকে নিজের ছাঁচে গড়িবার চেষ্টা করেন নাই, সেইজন্যই তাঁহাদের প্রত্যেকের শক্তি নিজের নিজের স্বাতন্ত্র্যে বিকাশ লাভ করিয়াছে, অথচ পিতার আধ্যাত্মিকতার আদর্শ অজ্ঞাতসারে সকলেরি ভিতরে ভিতরে কাজ করিয়াছে। পৃথিবীতে অনেক সময় ধার্মিকের পুত্র যে অধার্মিক হয়, তাহার অন্যান্য কারণের মধ্যে একটা কারণ বোধ হয় এই যে, ধার্মিক ব্যক্তি নিজের পুত্রকে ধার্মিক করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকেন। সেই প্রবল চেষ্টা যে দেবেন্দ্রনাথ করেন নাই, ইহার জন্যই তাঁহার পুত্রদিগকে তাঁহার আদর্শের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত জীবন হইতে এই একটি বড়ো শিক্ষা আমরা পাইতে পারি বলিয়া আমার বিশ্বাস। একালের পক্ষে এই শিক্ষারই দরকার। কিন্তু এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আদর্শের সঙ্গে সঙ্গে রামমোহন রায়ের জাতীয়ভাবে সার্বভৌমিক হওয়ার আদর্শটি না আসিলে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কোথাও দানা বাঁধিতে দেয় না, কোনো বড়ো সৃষ্টিক্রিয়ায় সার্থক হইয়া উঠে না।

"One's self I sing— a simple separate person
Yet utter the word Democratic, the word En Mass."

কেবল Democratic কথাটা বাদ দিয়া বিশ্বমানব (Universal Humanity) কথাটি বসাইলে, হুইটম্যানের এই দুইছত্রে একালের আদর্শ পরিষ্কার ব্যক্ত হয়। বিশেষ ব্যক্তি এবং বিশ্বমানব— এ দুয়ের মধ্যে ক্রমাগত একটি আসা-যাওয়ার সম্বন্ধের দরজা খুলিয়া দিতে হইবে। তবেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ফলে দেশের মধ্যে সৃজনী শক্তি ও উদ্‌ভাবনী শক্তি জাগিয়া উঠিবে।

প্রথম খণ্ড

(১৮১৭-১৮৫৮)

প্রথম পরিচ্ছেদ

বংশ ও পূর্বপুরুষ

ঠাকুর-বংশ সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করিবার পূর্বে প্রথমেই আমাদের দেখা উচিত, এই বংশের লোকেরা কোন্ সমাজের অন্তর্গত এবং আমাদের দেশে সেই সমাজের স্থান কিরূপ। সকলেই জানেন, ঠাকুরেরা পিরালী ব্রাহ্মণ-সমাজের অন্তর্ভুক্ত। এ সমাজের সঙ্গে অন্যান্য ব্রাহ্মণ-সমাজের সকল রকমের সামাজিক ব্যবহার একেবারে নিষিদ্ধ। আমাদের সমাজে আচার-বিচারের চাপে মানুষের স্বাধীন ব্যক্তিত্বের উৎসমুখ প্রায়ই রুদ্ধ থাকে। কুলক্রমাগত প্রথা আচারের বাঁধনকে মানুষের মানিতেই হয়। সুতরাং যে সমাজ এই চাপ ও বাঁধনের কতকটা বাহিরে, সে সমাজে ব্যক্তিত্বের বিকাশ সেই কারণেই সহজ হওয়া উচিত। অথচ নীচ ও অস্পৃশ্য জাতিদের সমাজে যে তাহা হয় নাই তাহার কারণ তাহারা স্বভাবতই নীচে এবং সমাজের প্রথা ও আচারের চাপের বাহিরে গেলেও সমস্ত সমাজের অবজ্ঞার চাপ তাহাদিগকে আরো নীচে ফেলিয়াছে। তাহারা যে মানুষ এই বোধটাই তাহাদের মধ্যে উজ্জ্বল নাই। কিন্তু যে বংশ ব্রাহ্মণবংশ, অথচ কোনো কারণে পতিত, তাহার পক্ষে সমাজের চাপের বাহিরে গেলে, সে বংশে ব্যক্তিত্বের বিকাশ বাধাহীন হইবার কথা। আমাদের দেশের সমাজের উচ্চ বংশের লোককে সমাজে উচ্চ হইবার জন্য কোনো পরিশ্রম বা কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না; কুলই তাহাদিগকে উচ্চে তুলিয়া রাখিয়াছে। সেই-জন্য যে বংশের এই কৌলিক মর্যাদাটা পাওনা ছিল, অথচ সে তাহা পায় নাই, তাহার পক্ষে বাধ্য হইয়া নিজের চেষ্টায় নিজের শক্তিতে সেই মর্যাদাটি অর্জন করিয়া লইতে হয়। ঠাকুর-বংশের ইতিহাসে অন্তত এ কথার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। কোনো বিশেষ একটা দিকে এই বংশের লোকেরা যে কৃতী হইয়াছেন তাহা নয়। নানা দিকে ইঁহাদের চেষ্টার দৌড় এবং শক্তির স্ফূর্তি দেখা গিয়াছে এবং সমাজকে তাহা স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে। বনেদি বংশের যেটা সুবিধা— অনেক পুরানো শ্রীসৌন্দর্য ও আচারকে তাজা করিয়া রাখা— তাহা ইঁহাদের মধ্যে আছে। আবার যেটা অসুবিধা— উদ্যমের অভাব, সুতরাং ব্যক্তিত্বের অভাব— সংকীর্ণ ও অবজ্ঞাত সমাজে স্থান পাওয়ার দরুন সে অসুবিধাটা ইঁহাদের মধ্যে আর থাকা হইতে পারে নাই।

শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানে দেবেন্দ্রনাথের পরিবারে পিতৃপুরুষের নাম স্মরণ করিবার যে বিধি আছে, তাহাতে দশ পুরুষের নাম পাওয়া যায়—

ওঁ পুরুষোত্তমাদ্বলরামো বলরামাদ্ধরিহরো হরিহরাদ্রামানন্দো রামানন্দান্মহেশো মহেশাৎ পঞ্চাননঃ পঞ্চাননাজ্জয়রামো জয়রামান্নীলমণির্নীলমণে রামলোচনো রামলোচনাদ্দ্বারকানাথো নমঃ পিতৃপুরুষেভ্যো নমঃ পিতৃপুরুষেভ্যঃ।

ঠাকুরেরা ভট্টনারায়ণের বংশ। আদিশূর কনৌজ হইতে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন বলিয়া এ দেশে একটা কিংবদন্তি আছে সেই পাঁচজন ব্রাহ্মণের মধ্যে সংস্কৃত 'বেণীসংহার' নাটকের রচয়িতা ভট্টনারায়ণ একজন ছিলেন। ভট্টনারায়ণেব পর হইতে এই বংশে সংস্কৃতবিদ্যার চর্চা বরাবর চলিয়া আসিয়াছে। উপরে পিতৃপুরুষের স্মরণ-মন্ত্রে যে দশ পুরুষের নাম পাওয়া গেল, তাহার প্রথম নামটি যাঁহার, সেই পুরুষোত্তম যশোহরের অন্তর্গত দক্ষিণডিহির পিরালী ব্রাহ্মণ রায়চৌধুরী বংশের কন্যা বিবাহ করিয়া পিরালী হন। পুরুষোত্তম সংস্কৃতবিদ্যার জন্য এবং সংস্কৃত ভাষায় নানা গ্রন্থ লেখার জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। পুরুষোত্তমের ছেলে বলরামের চার পুরুষ পরে পঞ্চানন, "ঠাকুর" এই উপাধি পান। পুরুষোত্তমের সময় হইতেই যশোহরে তাঁহার বংশের লোকেরা বাস করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু পঞ্চানন যশোহর ছাড়িয়া হুগলিনদীর তীরে গোবিন্দপুর গ্রামে আসিয়া বাসা বাঁধেন। গোবিন্দপুরে নীচ জাতির বাস ছিল, পঞ্চাননকে সেখানকার লোকেরা তাই স্বভাবতই "ঠাকুর" বলিয়া ডাকিত। পঞ্চাননের পর হইতে তাঁহার বংশধরদের মধ্যে এই "ঠাকুর" উপাধিটা দিব্য কায়েম হইয়া গেল। বোধ হয় উপাধিটার মধ্যে ব্রহ্মণ্যের ছাপ একেবারে নির্ভুল রকমে মারা ছিল বলিয়া এ উপাধিটা ছাড়া শক্ত হইয়াছিল। গোবিন্দপুরে ভারতের ভাবী শাসনকর্তা ইংরাজদের সহিত পঞ্চানন ঠাকুরের বেশ ভাব হয়। ইংরাজেরা তাঁহার ছেলে জয়রামকে চব্বিশপরগনার আমিন করিয়া দেন। কিছুকালের মধ্যে কলিকাতাতে ফোর্ট উইলিয়ম কেল্লা তৈরির সময় ইংরাজেরা পঞ্চাননের বসতবাড়ি ও জমিজমা কিনিয়া লন। তখন জয়রাম, কলিকাতার পাথুরেঘাটাতে নূতন জমি কিনিয়া সেখানে এক নূতন বসতবাড়ি তৈরি করেন। ১৭৫২ খৃস্টাব্দে জয়রামের মৃত্যু হয়। তাঁর চার পুত্র— তাঁহাদের মধ্যে দর্পনারায়ণ ও নীলমণির নামই জানা দরকার। কারণ তাঁহাদের দুজনা হইতেই পাথুরেঘাটা ও জোড়াসাঁকো— কলিকাতার এই দুই ঠাকুরবাড়ি হইয়াছে। এই গৃহবিচ্ছেদের একটুখানি ইতিহাস আছে— কিন্তু গৃহবিচ্ছেদের ইতিহাস বলিয়াই ইতিহাসেরও

তথ্যাবচ্ছেদ ঘটিয়াছে। অর্থাৎ দুই রকমের বৃত্তান্ত শোনা যায়। এমন স্থলে শাস্ত্রে বলে 'অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ'; কিন্তু আমার মনে হয় একার্ধ বলিলেই গোলযোগের সম্ভাবনা আরো বেশি। অতএব দুটা বৃত্তান্তই বলা ভালো। কেহ বলেন, দর্পনারায়ণ দ্বিতীয় ছেলে, নীলমণি তৃতীয়; কেহ বলেন, নীলমণি দ্বিতীয় ছেলে, দর্পনারায়ণ তৃতীয়। নীলমণি ছিলেন, ইংরাজ-সরকারের সেরেস্তাদার; তিনি বাড়ি থাকিতেন না, দর্পনারায়ণকে উপার্জনের টাকা পাঠাইয়া দিতেন। সরকারের কাজ হইতে যখন তিনি অবসর লইলেন, তখন দর্পনারায়ণকে তাঁহার পাওনাগণ্ডা বুঝাইয়া দিতে বলিলেন। কেহ বলেন, দর্পনারায়ণ তাঁহাকে বিষয় দেন নাই, তাই নীলমণি গৃহপ্রতিষ্ঠিত "দামোদর ঠাকুর" শালগ্রাম লইয়া বাহির হইয়া পড়েন। কেহ বলেন, দর্পনারায়ণ তাঁহাকে এক লাখ টাকা দিয়া রফা নিষ্পত্তি করেন। নীলমণির ধার্মিক বলিয়া নাম ছিল। সেইজন্য বৈষ্ণবদাস শেঠ নীলমণিকে জোড়াসাঁকোয় কয়েক বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমি দান করিলেন— শেঠেরা বিখ্যাত ধনী, বড়োবাজারে এখনো তাহাদের ঠাকুরবাড়ি আছে। যাহাই হোক্, বৈষয়িক কোনো গোলযোগ হওয়ায় নীলমণি স্বতন্ত্র হইয়া জোড়াসাঁকোয় এক ভদ্রাসন বাড়ি তোলেন। নীলমণির তিন ছেলে; রামলোচন, রামমণি এবং রামবল্লভ। রামমণির তিন ছেলের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর দ্বিতীয় ছেলে ছিলেন। কিন্তু রামলোচনের ছেলে ছিল না বলিয়া তিনি দ্বারকানাথকে পোষ্যপুত্র লইয়াছিলেন।

ঠাকুর-বংশে সংস্কৃতের চর্চা যে অনেক পুরুষ ধরিয়া চলিয়াছিল তাহা তো বলিয়াছি। বোধ হয় জয়রামের সময় হইতে ইংরাজী শিক্ষা এই পরিবারে প্রবেশ করে। দর্পনারায়ণ ঠাকুরের ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় বেশ দখল ছিল। নীলমণি ঠাকুর ইংরাজী শিক্ষার জোরে আমলা হইতে সেরেস্তাদারের পদ পর্যন্ত উঠিয়াছিলেন। আমার মনে হয়, সংস্কৃত আর ইংরাজী এই দুই শিক্ষা একত্রে মেলার জন্য ঠাকুর-বংশে পুরাতন এবং নূতন দুয়েরি প্রতি টান সমান রক্ষা পাইয়াছে। বনেদি বংশ হইলেই পুরাতনের মমতা নানা আচার-বিচারে তাহার মধ্যে রক্ষা পায়। কিন্তু শিক্ষা না থাকিলে সেই মমতা নূতনকে বাধা দিবার জন্যই শিখা উদ্যত করে।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের ইতিহাস আরব্য উপন্যাসের আলাদীনের প্রদীপের ইতিহাসের মতো রোমান্সে ভরা। কেবল তফাত এই যে, সে প্রদীপ তিনি দৈবক্রমে পান নাই, নিজের চেষ্টায় সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন। পৃথিবীর যে-সকল

দরিদ্র লোক নিজের চেষ্টায় ক্রোড়পতি হইয়াছে এবং তার পর লাখ লাখ টাকা ভালো ভালো কাজে অকাতরে দান করিয়াছে, যেমন একালের কার্নেগি বা রকেফেলারের জীবনে দেখা যায়, ঠিক তাহাদেরি মতো অসাধারণ বৈষয়িক প্রতিভা দ্বারকানাথ ঠাকুরেরও ছিল। বাংলাদেশে দ্বারকানাথের জুড়ি কোনো ধনী তখন ছিলেন কি না সন্দেহ। কিন্তু তিনি যে শুধু পুরাকালের ক্রীসাস বা একালের কার্নেগির মতো ক্রোড়পতি ছিলেন তাহা নয়। বৈষয়িক প্রতিভার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার এমন আশ্চর্য একটা উদারচিত্ততা, লোকহিতকর কাজে উৎসাহ ও মননশীলতা ছিল যে, তাহারি জন্য তিনি রামমোহন রায়ের মতো অমন একজন মহামনা পুরুষের বন্ধু ও সহযোগী হইতে পারিয়াছিলেন। এ দেশের কত মঙ্গল অনুষ্ঠানের যে তিনি সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলে তাঁহাকে কেবলমাত্র সুচতুর বিষয়ী লোক বলিয়া বর্ণনা করিতে মন কোনোমতেই সরে না। ইংরাজী শিক্ষার জন্য হিন্দুকালেজ খোলায় তিনি উদ্যোগী, কলিকাতা মেডিক্যাল কালেজ প্রতিষ্ঠায় তিনি সহায়, সতীদাহ নিবারণের ব্যাপারে তিনি রামমোহন রায়ের সঙ্গে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, ছাপাখানার স্বাধীনতার জন্য তিনি কী-না লড়াই লড়িয়াছেন। ইংলণ্ডে তিনি রানী ভিক্টোরিয়া ও সেখানকার ধনকুলীনদের কাছে যে বিস্তর সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও কেবলমাত্র টাকার জোরে নয়। তাঁহার বদান্যতা, বাক্‌পটুতা ও মননশীলতার দ্বারাই তিনি তাঁহার বিদেশী বন্ধুদিগের মন হরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার চিত্তের এই-সব রকমের লৌকিক সংস্কারের প্রভাব হইতে মুক্তির একটা মস্ত কারণ রামমোহন রায়ের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব। ইংরাজীশিক্ষাও একটা বড়ো কারণ বটে।

চিৎপুর রোডে শারবর্ন্ সাহেবের এক ইস্কুলে দ্বারকানাথ ইংরাজী শেখেন। ইস্কুলে তখন শিক্ষার আয়োজন বেশি কিছু ছিল না। দ্বারকানাথ তাঁহার বাড়ির শিক্ষক রেভাবেণ্ড এডাম্‌সের কাছে ভালো করিয়া ইংরাজী শিখিবার সুযোগ পান এবং তাঁহার সূত্রে বহু ইংরাজ ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁহার আলাপ হয়। ইংরাজীর সঙ্গে সঙ্গে পারসী ও আরবীও তাঁহাকে শিখিতে হয়।

লক্ষ্মীর সোনার পদ্মের একটি আধটি পাপড়িও যে উত্তরাধিকারের হিসাবে দ্বারকানাথের কপালে আসিয়া ঠেকে নাই তাহা নয়। পাবনা জেলায় বিরাহিম-পুর পরগনায় দ্বারকানাথ ঠাকুর সামান্য পৈতৃক জমিজমার অধিকারী হইয়াছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই জমিদারির কাজে তিনি পাকা হইয়া উঠিলেন। তাঁহার এক ব্যারিস্টার বন্ধু কার্গুসন সাহেবের সাহায্যে আইনবিদ্যায় তাঁহার বেশ জ্ঞান

জন্মিল। তখন তিনি স্বচ্ছন্দে রাজা ও জমিদারদের আইনের পরামর্শদাতা হইয়া তাঁহাদের তরফে আদালতে মকদ্দমা চালাইতে লাগিলেন। আইনের এজেণ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাণিজ্যেরও এজেণ্ট হইলেন। তার পরে চব্বিশ পরগনার কালেক্টার সাহেবের অধীনে সেরেস্তাদারের কাজও কৃতিত্বের সঙ্গে ছয় বছর ধরিয়া করিলেন। এইরূপে ক্রমেই নানা বিষয়কার্যে তাঁহার যেমন অভিজ্ঞতা বাড়িতে লাগিল, তাঁহার আর্থিক অবস্থাও তেমনি ক্রমশ উন্নতি হইতে থাকিল। তখন তাঁহার স্বাধীন ভাবে ব্যবসায় করিবার ইচ্ছা হইল। ইংরাজ-বণিকেরা এ দেশের সমস্ত ব্যবসায়গুলি একে একে হাত করিয়া লইতেছে আর দেশী লোকগুলাকে মজুরের মতো খাটাইতেছে, ইহা তাঁহার কাছে অত্যন্ত লজ্জার বিষয় বলিয়া মনে হইত। তিনি কার, ঠাকুর কোম্পানি নামে এক কোম্পানি খুলিলেন। কয়েকজন অংশীদারের সঙ্গে মিলিয়া "ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক" নামে এক ব্যাঙ্কও প্রতিষ্ঠা করিলেন। শিলাইদাতে নীলকুঠি, কুমারখালিতে রেশমের কুঠি, রানীগঞ্জের সমস্ত কয়লার খনি, এবং রামনগরে চিনির কারখানা কিনিয়া এবং যোগ্যতার সহিত চালাইয়া দ্বারকানাথ অল্প সময়ের মধ্যেই বিস্তর অর্থ করিলেন। তখন হুহু করিয়া রাজশাহীতে, পাবনায়, রংপুরে, যশোহরে জমিদারি কিনিয়া তিনি বাংলাদেশের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ জমিদার হইয়া বসিলেন।

অথচ শুধু আয়ের দিকেই যে তাঁর সমস্ত মনটা ছিল, ব্যয়ের দিকে ছিল না, তাহা নয়। দানে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুং আদত্তে হি রসং রবিঃ—তিনি সূর্যের মতন যে রস শোষণ করিতেন তাহার সহস্রগুণ ফিরাইয়া দিতেন। তাঁহার দানশীলতা সম্বন্ধে জনসন বা বিদ্যাসাগরের মতো নানা গল্প এককালে লোকের মুখে মুখে পল্লবিত হইয়া ফিরিত। এখনো সেকালের লোকের স্মৃতিকে নাড়া দিলে একটু আধটু মর্মরধ্বনি শোনা যায়। দু-একটি গল্প এখানে বলি।

একবার বাংলাদেশের এক জেলার জজ সাহেব অসুস্থ হইয়া ছুটি লইয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করিতেছিলেন। তিনি যখন যাত্রা করিতে প্রস্তুত, তখন তাঁহার পাওনাদারেরা তাঁহাকে খবর দিল যে তাঁর লাখ টাকার উপর ঋণ, সে ঋণ শোধ না দিলে তাঁহাকে জেলে যাইতে হইবে। তিনি বিপদে পড়িয়া দ্বারকানাথ ঠাকুরকে চিঠি লিখিয়া তাঁহার অবস্থা জানাইয়া অর্থসাহায্য চাহিলেন। দ্বারকানাথ খোঁজ লইয়া যখন জানিতে পারিলেন যে ভদ্রলোকটি বাস্তবিকই এরূপ বিপদ্‌-গ্রস্ত, তখন তিনি তাঁহার পাওনাদারদের ডাকাইয়া সমস্ত ঋণ শোধ করিয়া খতের

কাগজপত্রগুলি চাহিয়া লইলেন। সেই কাগজপত্র সঙ্গে লইয়া তিনি নিজে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলেন। জজ সাহেব যখন সবিস্তারে তাঁহার বিপদের কথা আলোচনা করিতে শুরু করিয়াছেন, তখন গম্ভীরভাবে দ্বারকানাথ তাঁহাকে কাগজপত্রগুলি ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন যে, তিনি অবিলম্বে ইংলণ্ডে যাত্রা করিতে পারেন। জজ সাহেব তো অবাক! তিনি ঋণস্বরূপ সেই দান গ্রহণ করিয়া খৎ লিখিয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন, দ্বারকানাথ কোনো খৎ লইতে রাজি হইলেন না। দ্বারকানাথের বদান্যতার এই রকম কত গল্পই আছে!

জনহিতকর কাজে তাঁহার কি উৎসাহ! ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেব্‌ল্ সোসাইটিতে তিনি এক লাখ টাকা দান করিয়াছিলেন। কলিকাতা মেডিক্যাল কালেজের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি একজন প্রধান উৎসাহী ছিলেন, সে কথা বলিয়াছি। সেই কালেজের ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণের জন্য তিনি বছরে ২০০০ টাকা দান করিয়াছিলেন। মেডিক্যাল কালেজে হিন্দুছাত্রদের পক্ষে মড়া কাটার ব্যাপার ঘৃণার বিষয় ছিল। সেইজন্য শবব্যবচ্ছেদের ঘরে দ্বারকানাথ নিজে উপস্থিত থাকিয়া ছাত্রদিগকে উৎসাহ দিতেন। জ্ঞানোন্নতির পথে, সামাজিক উন্নতির পথে, কোনো কুসংস্কার অন্তরায় হইবে, ইহা দ্বারকানাথের অসহ্য ছিল।

১৮৩৭ খৃস্টাব্দে দ্বারকানাথ ল্যাণ্ড হোল্ডারস্ সোসাইটি বা জমিদারসভা স্থাপন করেন। যাহাতে জমিদারদিগের সঙ্গে সরকারের অব্যবহিতযোগ থাকে এবং জমিদারগণ খাজনা, কর প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহাদের মতামত স্বাধীনভাবে সরকারকে জানাইতে পারেন, সেইজন্য এই সভার প্রতিষ্ঠা।

ছাপাখানার স্বাধীনতার জন্য দ্বারকানাথের চেষ্টা ও যত্ন এদেশের আধুনিক ইতিহাসে স্মরণীয় থাকা উচিত। যখন প্রেস আইন পাস হয়, তখন তিনি উঠিয়া পড়িয়া তাহার বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তখনকার কালে সরকার যে-সকল আইন পাস করিতেন, বিচারালয়ে সেগুলি রেজিস্টারি করা হইত এবং আদালত সেই আইন সম্বন্ধে জনসাধারণের মতামত শুনিতেন। প্রেস আইন যাহাতে রেজিস্টারি না হয়, এজন্য দ্বারকানাথ প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে ত্রুটি করেন নাই। মারকুইস অব হেস্টিংস, লর্ড আমহার্স্ট, লর্ড বেন্‌টিঙ্ক, এই তিনজন বড়ো-লাটের সময়ে ছাপাখানার স্বাধীনতা লইয়া আন্দোলন চলে। ঐ বিষয়ে ইহারা সকলেই অনুকূল হইলেও সার চার্লস মেটকাফের সময়েই ছাপাখানার স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয় এবং আইনরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ছাপাখানার স্বাধীনতা সম্বন্ধে টাউনহলে যে কয়েকটি সভাসমিতি হয়, তাহাতে দ্বারকানাথ ইংরাজীতে

যে-সকল বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা পড়িলে ইংরাজী ভাষায় তাঁহার আশ্চর্য অধিকার এবং বলিবার ক্ষমতারও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংরাজদিগের সহিত বন্ধুতা করিতেন এবং ইংরাজ সরকারের কাছেও বিশেষভাবে সম্মানিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার দেশহিতৈষা কোনোদিন সেই সম্মান-লুব্ধতার দ্বারা আচ্ছন্ন হয় নাই। দেশের মঙ্গলের জন্য সরকারের কাজের যেখানে প্রতিবাদ করা দরকার মনে করিয়াছেন, সেইখানে তিনি সকলের আগে প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহার এই দেশপ্রীতি তাঁহার পুত্রপৌত্রদের মধ্যে একটি অমূল্য সম্পত্তির মতো তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, ইহা আমরা পরে দেখিব।

ইংরাজ সরকারের সকল কাজেই তিনি সহায় ছিলেন, পরামর্শদাতা ছিলেন। তাঁহারি পরামর্শে সরকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদের সৃষ্টি করেন, ইহা বোধ হয় এখনকার অনেক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট জানেন না। থানার অশিক্ষিত দারোগাদের হাতেই ছোটোখাটো বিবাদ নিষ্পত্তির ভার যাহাতে না পড়ে, এবং সুশাসন ও শান্তি দেশের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, সেইজন্য এই নূতন পদের সৃষ্টি। দ্বারকানাথকে সরকার Justice of the Peace করিয়া দেন— তখনকার কালে ইহার চেয়ে বড়ো সম্মানের পদ কিছু ছিল না। বড়োলাট লর্ড অকল্যাণ্ড দ্বারকানাথের এমন বন্ধু হইয়াছিলেন যে, তাঁহার বারাকপুরের ভবনে দ্বারকানাথ প্রায় নিত্য অতিথির মতো ছিলেন এবং দ্বারকানাথের বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে লাট সর্বদাই যাতায়াত করিতেন। বাগানবাড়িটিকে দ্বারকানাথ একটি ইন্দ্রপুরীর মতো সাজাইয়াছিলেন। সেইখানে তাঁহার বন্ধুদিগকে লইয়া মজলিস বসিত, ভোজ, নাচ গান্ হইত। দ্বারকানাথ যাহাকে বলে 'দরবারী মানুষ', তাহাই ছিলেন। একবার লাট-ভগিনী মিস ইডেনের সম্বর্ধনায় দ্বারকানাথ যে এক নাচ ও ভোজ দিয়াছিলেন, তাহার সমারোহের বর্ণনা দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীতে আছে। এই ইংরাজদের মহাভোজ দেখিয়া কোনো কোনো বিখ্যাত বাঙালীরা বলিয়াছিলেন যে, ইনি কেবল সাহেবদের লইয়া আমোদ করেন, বাঙালীদের ডাকেন না। এই কথা শোনামাত্র, তিনি আর-একদিন প্রধান প্রধান বাঙালীদের লইয়া বাইনাচ ও গানবাজনা দিয়া এক জমকালো মজলিস করিলেন। সেই মজলিস হইতেই তাঁহার পুত্র দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভার অধিবেশনের জন্য পলায়ন করিয়া পিতার বিরাগের কারণ হইয়াছিলেন।

১৮৪২ খৃস্টাব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রথম বার ইউরোপে যাত্রা করেন। রোমে

পোপের সঙ্গে তাঁহার দেখা হয়। ইতালীর শহরগুলির চিত্র, ভাস্কর্য, ও নানা রকমের কারুশিল্প তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। ইংলণ্ডে আসিতে, সেখানকার অভিজাতবর্গ তাঁহার যথেষ্ট সমাদর করেন এবং মহারানী ভিক্টোরিয়া ও তাঁহার স্বামীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। মহারানী তাঁহাকে একাধিকবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথের ঐশ্বর্যে, জাঁকজমকে, রাজপুত্রের মতো চেহারায়, শিষ্ট ব্যবহারে, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় ও হৃদয়ের ঔদার্যে মহারানী হইতে আরম্ভ করিয়া ইংলণ্ডের সকল বড়োলোক একেবারে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডে এই ধনকুবেরের নাম সকলেই "প্রিন্স দ্বারকানাথ" রাখিয়াছিল। কেহ কেহ "প্রিন্স টারাগোনা" বলিত। শুনিয়াছি যে, দেবেন্দ্রনাথ কোনোদিন তাঁহার পিতার সম্বন্ধে বিশেষ কোনো প্রসঙ্গের উত্থাপন করিতেন না। একদিন শুধু বলিয়াছিলেন যে, পিতা ইংলণ্ডে থাকিতে তাঁহার হাতখরচের জন্য মাসিক লাখ টাকা করিয়া তাঁহাকে পাঠাইতে হইত। সুতরাং লোকে যে তাঁহাকে 'প্রিন্স' বলিয়া ডাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি!

ইংলণ্ড ছাড়িয়া দ্বারকানাথ যখন ফ্রান্সে আসেন, তখন ফ্রান্স দেশের রাজা লুই ফিলিপ ও রাজা লুই ফিলিপ ও রানী তাঁহাকে সম্বর্ধনা করেন। সেখান হইতে তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। ১৮৪৪ খৃস্টাব্দে তিনি আবার ইংলণ্ড যাত্রায় সংকল্প করিলেন। বোধ হয় ইংলণ্ডের ধনীসমাজের ভোগবিলাসিতার মোহ তাঁহার মনকে অধিকার করিয়াছিল। তিনি মজলিসি মানুষ ছিলেন; ঐশ্বর্যের আড়ম্বর ভালোবাসিতেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথকে লইয়া তিনি সেই বছরই দ্বিতীয়বার ইউরোপের দিকে ছুটিলেন। পারীতে রাজা লুই ফিলিপের অতিথি হইয়া কিছুকাল বাস করিলেন।

এই সময়ে পারী শহরে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে অধ্যাপক মোক্ষমূলরের পরিচয় হয়। মোক্ষমূলরের *Auld Lang Syne* নামক বইটিতে সেই পরিচয়ের বৃত্তান্ত তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃতে সুপণ্ডিত অধ্যাপক বুর্নুফের সঙ্গে দ্বারকানাথ আলাপ করিতে আসেন। মোক্ষমূলর বুর্নুফের ছাত্র; তিনি শুনিয়াছিলেন যে, এক সুপুরুষ ধনী ভারতবর্ষীয় 'প্রিন্স' পারীতে আসিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকে দেখিবার জন্য তাঁহার স্বভাবতই কৌতূহল হয়। দ্বারকানাথ যখন বুর্নুফের সঙ্গে দেখা করিতে আসেন, তখন বুর্নুফ তাঁহাকে সদ্যপ্রকাশিত ভাগবত-পুরাণের একখণ্ড গ্রন্থ উপহার দেন। তাহার প্রতি পৃষ্ঠায় একদিকে মূল সংস্কৃত ও অন্য দিকে ফরাসী অনুবাদ ছিল। দ্বারকানাথ ফরাসী অনুবাদ-

অংশের উপর আঙুল রাখিয়া বলিলেন, "আঃ, আমি যদি এই ভাষা পড়িতে পারিতাম!"

বুন্‌সেন্ যখন দ্বারকানাথকে মোক্ষমূলরের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া বলিলেন যে, মোক্ষমূলর বেদ পড়িতেছেন এবং বেদের অনুবাদ বাহির করিবার সংকল্প করিয়াছেন, তখন মোক্ষমূলরের সম্বন্ধে দ্বারকানাথের বিশেষ ঔৎসুক্য জন্মিল। মোক্ষমূলরকে তিনি একদিন নিমন্ত্রণ করিলেন। দ্বারকানাথ তাঁহাকে ফরাসী ও ইতালীয়ন সংগীত শুনাইলেন। ইউরোপীয় সংগীতে তাঁহার আশ্চর্য দক্ষতা দেখিয়া মোক্ষমূলর বিস্মিত হইয়াছিলেন। মোক্ষমূলর তাঁহাকে ভারতবর্ষীয় গান গাহিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, "তোমার ভালো লাগিবে না।" কিন্তু পুনঃপুনঃ পীড়াপীড়ি করাতে অবশেষে তিনি গাহিলেন। গান শোনার পর মোক্ষমূলর সেই সংগীতের মধ্যে কোনো রস পান নাই শুনিয়া দ্বারকানাথ ঠাকুর উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিলেন, "তোমরা দেখিতেছি সবাই সমান। কোনো জিনিস যদি তোমাদের অপরিচিত হয়, এবং দেখা বা শোনা মাত্রই ভালো না লাগে, তোমরা অমনি মুখ ফিরাইয়া বোস। আমি যখন প্রথম ইতালীয় গান শুনি, আমার তো তাহাকে সংগীত বলিয়াই মনে হয় নাই। ক্রমে শুনিতে শুনিতে আমার ভালো লাগিল। যেমন সংগীতে তেমনি অন্যান্য সকল বিষয়ে তোমরা বুঝিবার চেষ্টামাত্র কর না। তোমরা বলো আমাদের দেশের ধর্ম ধর্মই নয়, আমাদের কাব্য কাব্যই নয়, দর্শনশাস্ত্র দর্শনশাস্ত্রই নয়। আমরা ইউরোপের সকল জিনিসই বুঝিবার এবং আদর করিবার চেষ্টা করি। কিন্তু তাই বলিয়া এ কথা মনে করিয়ো না যে, ভারতবর্ষের জিনিসকে আমরা অশ্রদ্ধা বা অনাদর করি। আমাদের সংগীতশাস্ত্র যদি তোমরা আলোচনা করো, তবে দেখিবে যে তাহার মধ্যে লালিত্য (melody), ছন্দ (rhythm), এবং স্বরবৈচিত্র্যের সৌষ্ঠব (harmony) ঠিক তোমাদের সংগীতেরই মতো আছে। এবং আমাদের কাব্য, ধর্মশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র যদি পড়ো, তবে দেখিতে পাইবে যে আমরা 'হিদেন' নই। সেই অচিন্ত্য অনির্বচনীয় ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা তোমাদেরই মতো—চাই কি, কোনো কোনো বিষয়ে আমাদের জ্ঞান তোমাদের চেয়েও গভীরতর ও নিবিড়তর।"

মোক্ষমূলর দ্বারকানাথ ঠাকুরের কথাগুলি উদ্ধার করিয়াছেন; আমিও সেই উদ্ধৃত অংশের অবিকল তর্জমা করিয়া দিলাম। যথার্থ স্বদেশপ্রীতি না থাকিলে এমন কথা কাহারো মুখ দিয়া বাহির হইতে পারে না। দ্বারকানাথ ঠাকুরের

আর সমস্ত কৃতকীর্তির গৌরবের চেয়ে এই প্রকৃত দেশানুরাগের গৌরব অনেক বেশি। তাঁহার ছেলের সঙ্গে তাঁহার মানসিক প্রকৃতির আর কোনো জায়গায় মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দ্বারকানাথ বিষয়ী; দেবেন্দ্রনাথ বিষয়-বিরাগী। দ্বারকানাথ সাংসারিক পদমান লাভের জন্য ব্যস্ত; দেবেন্দ্রনাথ সাংসারিক পদমানকে তুচ্ছ করিয়া ঈশ্বরের প্রসাদ লাভের জন্য উৎসুক। একজনের চির-জীবনের সাধনার বিষয় অর্থ; অন্যজনের চিরজীবনের সাধনার বিষয় পরমার্থ। কিন্তু যে স্বদেশানুরাগ বোধ করি দ্বারকানাথের সকল প্রয়াস, সকল আকাঙ্ক্ষার মূলে ছিল, সেই স্বদেশানুরাগ দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম ও সমাজসংস্কারের সকল মঙ্গল-অনুষ্ঠানকে চিরদিন গঠিত করিয়াছে, ইহা আমরা তাঁহার জীবনচরিত আলোচনার বেলায় স্পষ্টই দেখিতে পাইব।

মোক্ষমূলর দ্বারকানাথের আর-একটি কীর্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের পাদ্রিদের সম্বন্ধে নিন্দাবাদ ও কুৎসা যেখানে যাহা-কিছু বাহির হইত, দ্বারকানাথ এক ব্ল্যাকবুকের মতো নোটবইতে সেই-সমস্ত খবর টুকিয়া রাখিতেন। ইংরাজেরা কেবল আমাদের সমাজের ও ধর্মের গ্লানি ও কলুষ টানিয়া বাহির করিবে এবং তাহা লইয়া ব্যঙ্গ করিবে, ইহা দ্বারকানাথের দেশানুরাগকেই বিদ্ধ করিত। বোধ করি সেই কারণেই তিনি এই কুৎসা সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন এবং প্রয়োজন হইলে তাঁহার তূণ হইতে বাণও ঠিক জায়গাতেই পৌঁছিত।

এ যেমন একটা বড়ো দিক মোক্ষমূলর তাঁহার মধ্যে দেখিতে পাইয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান হইলেন, তেমনি তাঁহার বিলাসিতা ও ধনাড়ম্বরের দিকও তিনি যে দেখেন নাই তাহা নয়। তিনি লিখিয়াছেন যে. পারীতে এক সান্ধ্য সম্মিলনে উৎকৃষ্ট ভারতবর্ষীয় শাল দিয়া সমস্ত ঘরটিকে দ্বারকানাথ সাজাইয়াছিলেন। সেই সম্মিলনীতে যতগুলি ফরাসী স্ত্রীলোক উপস্থিত ছিলেন, বিদায়ের সময়ে সকলকেই একখানি করিয়া শাল তিনি উপহার দিয়াছিলেন!

পারী হইতে লণ্ডনে গিয়া সেখানেও রানীর দরবারে এবং ডিউক ও ডাচেস-দের সহবাসে তাঁহার প্রভূত অর্থব্যয় হইতে লাগিল। ১৮৪৬ খৃস্টাব্দে হঠাৎ তাঁহার এক গুরুতর পীড়া হয়। ডাক্তারের পরামর্শে তিনি সাসেক্সশিয়রের অন্তর্গত এক সমুদ্রতীরে গিয়া বাস করেন। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন, "রোগের জ্বালায় বড়ই অশান্তি ছটফটানি হয়েছিল।...তাঁকে দেখবার জন্যে মহিলারা দলে দলে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকতেন। Duchess of Cleveland প্রত্যহ তাঁকে দেখতে আসতেন—Duchess of

Inverness রোজ পত্রদ্বারা তাঁর সংবাদ নিতেন।... এত পীড়ার প্রকোপেও তাঁর ধৈর্যচ্যুতি হয় নি। কখনও কোন বিষয়ে ত্রুটি জানিয়ে কারও প্রতি দোষারোপ করতেন না, সর্বদাই সন্তুষ্টচিত্তে, হাসিমুখে থাকতেন। অতি অকর্মা ভৃত্যও তাঁর অনুগ্রহ ও বদান্যতা হ'তে বঞ্চিত ছিল না। স্বদেশী আচার ব্যবহারের তিনি অনুরক্ত ছিলেন। দেশীয় পরিচ্ছদ পরিধান করতেন। আলবোলার নল সর্বদাই তাঁর হাতে থাকত, তাঁর ভৃত্য হুলি তামাক সেজে দিত। তাঁর একটি (Tortoise shell) কাঁচকড়া মসলার ডিবে ছিল।... তিনি আপনার আসন্ন মৃত্যু আপনি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন। কেমন আছেন কেহ জিজ্ঞাসা করলে মধুর গম্ভীর স্বরে বলতেন, "I am content" আমি শান্তিতে আছি। ক্রমে তাঁর শরীর আরো অবসন্ন হ'তে লাগল—তাঁকে স্থানান্তরিত করা আবশ্যক হ'য়ে পড়ল। অবসর বুঝে সেই স্থান হ'তে জুলাই মাসের ২১ তারিখে Dr. Martin তাঁকে সঙ্গে করে লণ্ডনে নিয়ে যান এবং ১৮৪৬ খৃস্টাব্দে ১লা আগস্টে তিনি পরলোক গমন করেন।" লণ্ডনের এক প্রসিদ্ধ সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার দেহ সমাহিত হয়।

শুধু কেমন পিতার ঘরে দেবেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিলেন, তাহা জানিলেই তাঁহার পরিবেশ (environment) সম্বন্ধে সব কথা জানা হয় না, তাঁহার কালের সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল তাহাও জানা দরকার। সৌভাগ্যক্রমে কৃষ্ণনগরের রাজাদের বংশাবলী চরিত 'ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত' নামে এক প্রকাণ্ড বই বাহির হইয়াছে। তাহাতে কেবল রাজাদের চরিত-কথাই নাই; সেকালের বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থারও বিবরণ আছে। রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল আর একাল' এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ'—এই দুখানা বই হইতেও সেকালের বাংলাদেশের অবস্থা সম্বন্ধে নানা খবর পাওয়া যায়।

কলিকাতা শহরের চেহারাটা তখন অনেকটা পাড়াগাঁয়ের মতো ছিল। গ্রামে যেমন পানাপুকুর দেখিতে পাওয়া যায়, কলিকাতায় তখন প্রত্যেক বাড়ির সঙ্গে লাগাও ঐ রকম পচা পুকুর দেখিতে পাওয়া যাইত। রাজপথের পাশে পাঁক ও কাদায় ভরা নর্দামা ছিল—তাহার দুর্গন্ধে পথ চলা দায় ছিল। এই-সকল কারণে শহরের স্বাস্থ্য তখন নিতান্ত খারাপ ছিল। স্বাস্থ্যের অবস্থা যেমন, নীতির অবস্থাও তেমনি শোচনীয় ছিল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহার রামতনু লাহিড়ীর জীবনচরিতে লিখিয়াছেন—"তখন মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, উৎকোচ, জাল, জুয়াচুরী প্রভৃতির দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিয়া ধনী হওয়া কিছুই লজ্জার বিষয় ছিল না।...

ধনিগণ পিতামাতার শ্রাদ্ধে, পুত্রকন্যার বিবাহে, পূজাপার্বণে প্রভূত ধন ব্যয় করিয়া পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন। সিন্দুরিয়াপটীর প্রসিদ্ধ মল্লিকগণ পুত্রের বিবাহে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া নিঃস্ব হইয়া গিয়াছিলেন। যে ধনী পূজার সময় প্রতিমা সাজাইতে যত অধিক ব্যয় করিতেন এবং যত অধিক পরিমাণে ইংরাজের খানা দিতে পারিতেন, সমাজ মধ্যে তাঁহার তত প্রশংসা হইত। তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে বারবিলাসিনীগণের সহিত আমোদপ্রমোদ করিতে লজ্জাবোধ করিতেন না।... কোন্ ধনী কোন্ প্রসিদ্ধ বাইজীর পশ্চাতে কত সহস্র টাকা ব্যয় করিয়াছেন, সেই সংবাদ শহরের ভদ্রলোকদিগের বৈঠকে বৈঠকে ঘুরিত এবং কেহই তাহাকে তত দোষাবহ জ্ঞান করিত না। এমন কি বিদেশিনী ও যবনী কুলটাদিগের সহিত সংসৃষ্ট হওয়া দেশীয় সমাজে প্রাধান্য লাভের একটা প্রধান উপায়স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল।"

কিন্তু তখনকার কালের এই সামাজিক ছবিটিকে সম্পূর্ণ ছবি বলিয়া গ্রহণ করিতে আমরা কখনোই প্রস্তুত নই। তখনকার কালে মানুষের যে হৃদ্যতা, বদান্যতা বা একটি নিবিড় সামাজিকতা ছিল, তাহা এখনকার কালে দুর্লভ। প্রথমত, তখন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবে এবং এ কালের নানা প্রয়োজনের তাড়নায় একান্নবর্তী পরিবারপ্রথা ভাঙিয়া যায় নাই। আত্মীয়স্বজন, জ্ঞাতিকুটুম্ব, সকলেই তখন এক পারিবারিক বাঁধন-সূত্রে বাঁধা থাকিত এবং গৃহস্থকে একটি বহুবিস্তৃত পরিবারের দায় বহিতে হইত। দ্বিতীয়ত, আশ্রিতকে প্রতিপালন করা, বিশেষভাবে তখনকার বড়োলোকদের একটা সামাজিক কর্তব্যের মধ্যে গণ্য ছিল। দাস দাসী এবং অন্যান্য বহু দরিদ্র আশ্রিতকে তখন সেই বৃহৎ পরিবারের সামিল বলিয়াই ধরা হইত এবং তাহাদের সুখদুঃখ সম্পদবিপদকে গৃহস্বামী নিজের সুখদুঃখ সম্পদবিপদের সমান বলিয়া মনে করিতেন। এজন্য যে ত্যাগস্বীকার, যে সহৃদয়তার প্রয়োজন হয়, তাহা তখনকার কালে এখনকার চেয়ে নিঃসন্দেহ অনেক বেশি ছিল। তখন বড়োলোকদের বৈঠকখানায় যে মজলিস বসিত, তাহার মধ্যে একটা আন্তরিক হৃদ্যতা ছিল—এখন সে-সব মজলিস প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। বস্তুত তখন বড়োলোকের বড়োমানুষীর মধ্যে কোনো কৃপণতা, ঔদ্ধত্য বা সংকীর্ণতা দেখা গেলে তাহা নিন্দার বিষয় হইত। বিবাহ, শ্রাদ্ধ, ক্রিয়াকর্ম, পাল-পার্বণ, আমোদ-আহ্লাদ সকল ব্যাপারেই জাঁকজমক যেমন ছিল, বদান্যতা তেমনি ছিল। সে সমস্তই সকলেরি জন্য অবারিত ছিল। এমন-কি, যে-সকল নৈতিক কুপ্রথা এখন আমাদের কাছে অত্যন্ত কুৎসিত

বলিয়া মনে হয়, তাহাদিগকেও তখন সামাজিকতার, হয়তো-বা শোভনতার অঙ্গ বলিয়া ধরা হইত। সেইজন্য এ-সব ব্যাপারে লজ্জার বা গোপনতার কোনো কারণ ছিল না। অতএব সেকালের নৈতিক অবনতির ছবির সঙ্গে সঙ্গে এই অন্য দিক্‌কার ছবিটি মিলাইয়া না দিলে, সেকালকে নিতান্তই কালো করিয়া দেখা হইবে।

দুর্গতি যে নানা দিক দিয়াই তখন দেখা দিয়াছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। তখন ইংরাজীশিক্ষাও ভালো করিয়া দেশে চল্‌তি হয় নাই, প্রাচীন শাস্ত্র রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিরও আলোচনা প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বারো মাসে তেরো পার্বণ লইয়াই লোকে ব্যস্ত—মেলা, স্নানযাত্রা, দোল, রথযাত্রা প্রভৃতি উৎসবের আমোদে মাতাই প্রধান ধর্মকর্ম ছিল। এই-সকল আমোদ যে বিশুদ্ধ ছিল তাহা নয়। নানা দুর্নীতি ও কুৎসিত ব্যাপার ইহাদিগকে দূষিত করিয়াছিল। ধর্মানুষ্ঠান সকল যেমন কলুষিত হইয়াছিল, সাহিত্য, সংগীত প্রভৃতিও সেই রকম অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ ও গ্রাম্যতাদুষ্ট হইয়াছিল। কবির লড়াই ও পাঁচালী ছিল প্রধান সাহিত্য। কবিওয়ালারা যে যত অশ্লীল ব্যঙ্গোক্তি করিতে পারিত, সে ততই প্রতিষ্ঠা পাইত। পাঁচালী সাহিত্যে দাশরথি রায় তো স্বনামধন্য; তাহার অনুপ্রাসের প্রলাপ শুনিলে এখন হাসি পায়, অথচ সেকালে লোকে তাহাই বিশেষ করিয়া তারিফ করিত।

সমাজের এমনি দুর্দশার ও অবনতির সময়ে রামমোহন রায় বাংলাদেশের বন্ধন মোচনের জন্য ১৭৭৪ খৃস্টাব্দে রাধানগরে জন্মগ্রহণ করিলেন। মুসলমান-রাজত্বকালে আরবী ও পারসী ভাষা তো কত লোকেই শিখিয়াছিল, কোরানের বচনও যে এ দেশের লোকে জানে নাই তাহা নয়। কিন্তু রামমোহন রায় অল্প বয়সেই সেই কোরান পড়িয়া প্রচলিত পৌত্তলিক উপাসনার প্রতি বিদ্রোহী হইলেন। সে বিদ্রোহকে ঘরের লোক থামাইবে, এমন সাধ্য তাহাদের ছিল না। ঘরের লোক কেন, সমস্ত বাংলাদেশেও তাঁহাকে কুলাইল না। ঘর হইতে তাড়িত হইয়া ষোলো বছর বয়সে সেই বালক অজানা বিশ্বজগতে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং একাকী উত্তুঙ্গ হিমগিরি লঙ্ঘন করিয়া তিব্বত পর্যন্ত চলিয়া গেলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া কাশীতে সংস্কৃত শাস্ত্র পড়িলেন এবং বাইশ বছর বয়সে ইংরাজী শিখিতে শুরু করিলেন। সংস্কৃত শাস্ত্র ভালো করিয়া পড়িয়া বেদান্তের ব্রহ্মবিদ্যাকে তিনি শাস্ত্র-সমুদ্রের গর্ভস্থিত শ্রেষ্ঠমণি স্থির করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিলেন এবং যে দেশ গ্রাম্য খেলাধুলা লইয়া ব্যস্ত ছিল, তাহাকে

ডাক দিয়া বলিলেন— তুমি দরিদ্র নও, তুমি রাজসম্পদের অধিকারী। তুমি বিশ্বকে অসংখ্য পরিমিত দেবদেবীর দ্বারা শাসিত জানিয়া তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিয়াছ এবং তাহাদের ভয়ে ভীত হইয়া তাহাদের তুষ্টির জন্য কত কদর্য অনুষ্ঠানের আচরণ করিতেছ। অনেক দেবদেবী এই বিশ্বের অধিপতি নহেন; এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর এই বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্তা। তিনি পরিমিত নহেন; তিনি অসীম। তিনি দেশকালে বদ্ধ ক্ষুদ্র দেবতা নহেন; তিনি অনন্ত দেশ ও অনন্তকালব্যাপী বৃহৎ দেবতা, পরব্রহ্ম।

'ভাব সেই একে
জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে।'

আমরা ছিলাম গ্রামে; রামমোহন রায় আমাদিগকে শুধু বড়ো রাজ্যের রাজধানীতে লইয়া গেলেন যে তাহা নয়। তিনি একেবারে বিশ্বের চৌমাথায় দাঁড়াইলেন— যেখানে বড়ো বড়ো সভ্যতার পথ দিকে দিকে প্রসারিত। যেমনি তিনি নিজের দেশের প্রাচীন ধর্মের মধ্যে সার্বভৌমিকতার আদর্শকে আবিষ্কার করিলেন, অমনি তাঁহার উদার দৃষ্টি হইতে সমস্ত সংস্কারের আবরণ দূর হইয়া গেল। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, মুসলমান ও খৃস্টান ধর্মের মধ্যেও সার্বভৌমিক আদর্শ বিরাজ করিতেছে। মুসলমান মৌলবী সে কথা মানিল না; খৃস্টান মিশনারি সে কথা স্বীকার করিল না। রামমোহন রায় ধর্মের সাম্প্রদায়িক গণ্ডী ভাঙিয়া তাহার বিশ্বজনীনতার যে উদার চৌমাথায় গিয়া দাঁড়াইলেন, সেখানে কোনো সম্প্রদায় পৌছিতে না পারিয়া তাঁহাকে নিজেদের শত্রু মনে করিয়া লাঞ্ছিত করিবার চেষ্টা করিল।

সহমরণপ্রথা দূর করিবার জন্য যখন রামমোহন রায় তাহার বিরুদ্ধে শাস্ত্র-প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া ইংরাজীতে ও বাংলাতে চটি বই সকল বাহির করিতেছেন এবং আন্দোলন করিতেছেন, তখনই দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহার প্রধান সহায় হইয়া দাঁড়াইলেন। রামমোহন রায়ের সঙ্গে বন্ধুতায় দ্বারকানাথের মন সেকালের সমাজের বহু সংস্কারকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল, তাহা তাঁহার জীবনচরিতের যেটুকু পরিচয় আমরা দিয়া আসিয়াছি, তাহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু সেকালের ধনীসমাজের যে-সকল বিলাসিতা, আড়ম্বরপ্রিয়তা প্রভৃতি দোষ ছিল, তাহা হইতে দ্বারকানাথ নিজেকে মুক্ত করিতে পারেন নাই। রামমোহন রায়ের সংসর্গে তাঁহার অন্তরে প্রকৃত দেশানুরাগ জাগিতে পায়। দেশের সকল হিতকর অনুষ্ঠানে সেইজন্য তাঁহার উৎসাহ ও দানের কিছুমাত্র কার্পণ্য ছিল না। পাশ্চাত্ত্য

জ্ঞানবিজ্ঞান, পাশ্চাত্ত্য দেশহিতৈষণাকে তিনি অনুকরণযোগ্য মনে করিতেন বলিয়া ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন ব্যাপারে তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী হইয়াছিলেন।

অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, দেবেন্দ্রনাথের জীবনের পরিবেশ তৈরি হইয়াছিল এই ভালোমন্দ নানা জিনিসের দ্বারা। তাঁহার চারি দিকে যেমন সেকালের বিলাসিতা ও ধনাড়ম্বর ছিল, তেমনি বদান্যতা, সামাজিকতা, প্রভৃতি সেকালের ভালো দিকও ছিল। নিজের দেশের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতি একটা স্বাভাবিক প্রীতি ও হৃদয়ের টান তিনি তাঁহার পিতার ভিতরে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু এ-সকলের চেয়েও আর-একটি বড়ো জিনিস তাঁহার জীবনটিকে ঘিরিয়া ছিল—রাজা রামমোহন রায়ের মূর্তি ও আদর্শ। ছেলেবয়সে আমরা কোনো বড়োলোকের সংসর্গে আসিয়া যখন তাঁহাকে ভক্তি করিতে শিখি, তখন না বুঝিয়াই ভক্তি করি বটে, তবু সেই অবুঝ ভক্তির স্বচ্ছ দর্পণে সেই বড়োলোকের ভিতরকার প্রতিকৃতিটি এমনভাবে প্রতিবিম্বিত হয় যে তাহা আর কোনো কালে মন হইতে মোছে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জন্ম বাল্যকাল শিক্ষা

১৭৩৯ শকের ৩রা জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ইংরাজী ১৮১৭ খৃস্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার পৈত্রিক জোড়াসাঁকোর বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন।

দেবেন্দ্রনাথ দ্বারকানাথ ঠাকুরের বড়ো ছেলে। দেবেন্দ্রনাথের আর চারজন ছোটো ভাই ছিলেন— গিরীন্দ্রনাথ নরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ।

দেবেন্দ্রনাথের শৈশব সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তাঁহার স্বরচিত জীবনচরিত তাঁহার আঠারো বছর বয়সের সময় আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহার বন্ধুদের মধ্যে প্রায় সকলেই বয়সে তাঁহার ছোটো হওয়ায় তাঁহার ছেলেবেলার কথা কাহারো নিকট হইতে পাওয়া যায় নাই।

তাঁহার আত্মচরিতের গোড়ায় তিনি নিজের শৈশব সম্বন্ধে যেটুকু লিখিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে, তাঁহার পিতামহী, রামলোচন ঠাকুরের স্ত্রীব কাছে তিনি মানুষ হইয়াছিলেন। এই পিতামহী অতিশয় ধর্মশীলা স্ত্রীলোক ছিলেন। তাঁহার কাছে যে দেবেন্দ্রনাথ মানুষ হইয়াছিলেন এবং ছেলেবেলায় আর-কোনো লোকের প্রভাব যে তাঁহার উপর তেমন করিয়া পড়ে নাই— শুদ্ধ এই কথাটি, জন্মাধিকার-সূত্রে তিনি কী পাইয়াছিলেন বা না পাইয়াছিলেন, তাহার চেয়ে অনেক বড়ো কথা। ছেলেবয়সে ধর্মের আবহাওয়ায় বাড়িয়া উঠিবার জন্যই দেবেন্দ্রনাথের তরুণ মনে ধর্মনিষ্ঠার সংস্কার একেবারে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার নিশ্বাসপ্রশ্বাস, শয়নভোজন, খেলাধুলার ভিতর দিয়া ধর্মনিষ্ঠার ভাব তাঁহার অন্তরের মধ্যে বসিয়া গিয়াছিল।

তাঁহার দিদিমা সম্বন্ধে স্বরচিত জীবনচরিতে তিনি লিখিতেছেন, "দিদিমা আমাকে বড় ভাল বাসিতেন। শৈশবে তাঁহাকে ব্যতীত আমিও আর কাহাকে জানিতাম না। আমার শয়ন উপবেশন ভোজন, সকলই তাঁহার নিকট হইত। তিনি কালীঘাটে যাইতেন, আমি তাঁহার সহিত যাইতাম। তিনি যখন আমাকে ফেলে জগন্নাথক্ষেত্রে ও বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন আমি বড়ই কাঁদিতাম। ধর্মে তাঁহার অত্যন্ত নিষ্ঠা ছিল। তিনি প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিতেন, এবং প্রতিদিন শালগ্রামের জন্য স্বহস্তে পুষ্পের মালা গাঁথিয়া দিতেন। কখনো কখনো তিনি সংকল্প করিয়া উদয়াস্ত সাধন করিতেন; সূর্যোদয় হইতে সূর্যের

অস্তকাল পর্যন্ত সূর্যকে অর্ঘ্য দিতেন। আমিও সে সময়ে ছাতের উপরে রৌদ্রেতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম, এবং সেই সূর্য-অর্ঘ্যের মন্ত্র শুনিয়া শুনিয়া আমার অভ্যাস হইয়া গেল। 'জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং। ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং॥' দিদিমা এক এক দিন হরিবাসর করিতেন; সমস্ত রাত্রি কথা হইত এবং কীর্তন হইত; তাহার শব্দে আমরা আর রাত্রিতে ঘুমাইতে পারিতাম না।

"তিনি সংসারের সমস্ত তত্ত্বাবধারণ করিতেন, এবং স্বহস্তে অনেক কার্য করিতেন। তাঁহার কার্যদক্ষতার জন্য তাঁহার শাসনে গৃহের সকল কার্য সুশৃঙ্খলরূপে চলিত। পরে সকলের আহারান্তে তিনি স্বপাকে আহার করিতেন। আমিও তাঁহার হবিষ্যান্নের ভাগী ছিলাম। তাঁহার সেই প্রসাদ আমার যেমন স্বাদু লাগিত, তেমন আপনার খাওয়া ভাল লাগিত না।

"তাঁহার শরীর যেমন সুন্দর ছিল, কার্যেতে তেমনি তাঁহার পটুতা ছিল, এবং ধর্মেতেও তাঁহার তেমনি আস্থা ছিল। কিন্তু তিনি মা গোসাঁইয়ের সতত যাতায়াত বড় সহিতে পারিতেন না। তাঁহার ধর্মের অন্ধবিশ্বাসের সহিত একটু স্বাধীনতাও ছিল।

"আমি তাঁহার সহিত আমাদের পুরাতন বাড়ীতে 'গোপীনাথ' ঠাকুর দর্শনার্থে যাইতাম। কিন্তু আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া বাহিরে আসিতে ভাল বাসিতাম না, তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া গবাক্ষ দিয়া শান্ত ভাবে সমস্ত দেখিতাম।"

এই সামান্য একটুখানি বর্ণনা পড়িয়া দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাড়ির যে পারিবারিক ছবিটি মনে জাগে, তাহাতে একটি চমৎকার সরল শ্রী আছে। তাহাতে ঐশ্বর্যের কোনো গন্ধ নাই। দেবেন্দ্রনাথের জন্মের সময় দ্বারকানাথ ঠাকুর লক্ষ্মীর বর লাভ করেন নাই— সবে ষোড়শোপচারে তাঁহার পূজার আয়োজন করিতেছিলেন মাত্র। তবু মনে হয় যে, দ্বারকানাথের ঐশ্বর্যের সময়েও সেকালের অন্তঃপুরের সেই সরল গার্হস্থ্য গ্রাম্য শ্রীটি নষ্ট হয় নাই। জোড়াসাঁকোর যে বাড়িতে এখন গিরীন্দ্রনাথের বংশধর শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়েরা বাস করিতেছেন,[১] তাহাই দ্বারকানাথ ঠাকুরের বৈঠকখানা-বাড়ি ছিল। তাহা তখনকার হাল-ফ্যাশানে তৈরি হইয়াছিল, এবং মূল্যবান আসবাব ও সজ্জায় সাজানো ছিল। তাঁহার প্রমোদভবন ছিল বেলগাছিয়ায়

১ বর্তমানে এই বাড়ি নাই। উহার স্থলে 'রবীন্দ্রভারতী ভবন' নির্মিত হইয়াছে।

ভবনে। শুধু জোড়াসাঁকোর পৈতৃক বাড়ি তাহার প্রাচীন শ্রীসৌন্দর্য রক্ষা করিয়া চলিতেছিল।

রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে তিনি জোড়াসাঁকোর বাড়ি যেমনটি দেখিয়াছিলেন, তাঁহার পিতার বাল্যকালে সে বাড়ির চেহারা ঠিক তেমনটি না হইলেও একেবারেই অন্তরকমের ছিল এ কথা মনে হয় না। তাহার কারণ, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবনস্মৃতি'তে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার বাল্যকালেও 'শহর এবং পল্লী অল্পবয়সের .ভাইভগিনীর মতো অনেকটা একরকম চেহারা লইয়া প্রকাশ পাইত।" রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলায় জোড়াসাঁকোর বাড়ির দোতলায় দক্ষিণ-পূর্ব কোণের ঘরের জানালার নীচেই একটি ঘাট-বাঁধানো মস্ত পুকুর ছিল। তিনি লিখিয়াছেন, "তাহার পূর্বধারের প্রাচীরের গায়ে প্রকাণ্ড একটা চীনা বট—দক্ষিণধারে নারিকেলশ্রেণী।··· বাড়ির ভিতরে আমাদের যে-বাগান ছিল···তাহার ···মাঝখানে ছিল একটা গোলাকার বাঁধানো চাতাল···উত্তর কোণে একটা ঢেঁকিঘর ছিল, সেখানে গৃহস্থালির প্রয়োজনে মাঝে মাঝে অন্তঃপুরিকাদের সমাগম হইত···আমাদের বাড়ির উত্তর-অংশে আর-একখণ্ড ভূমি পড়িয়া আছে, আজ পর্যন্ত ইহাকে আমরা গোলাবাড়ি বলিয়া থাকি। এই নামের দ্বারা প্রমাণ হয়, কোনো এক পুরাতন সময়ে ওখানে গোলা করিয়া সম্বৎসরের শস্য রাখা হইত।" বাড়ির ভিতরে আর-একটা পুকুর ছিল বলিয়া শোনা যায়; বাড়ির একটি লোক সেখানে ডুবিয়া মারা যাওয়ার পর সে পুকুরটা ভরাট করিয়া ফেলা হয়।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন যে, তাঁহাদের শিশুকালে ভোগবিলাসের আয়োজন ছিল না বলিলেই হয় এবং মোটের উপরে তখনকার জীবনযাত্রা এখনকার চেয়ে অনেক বেশি সাদাসিধা ছিল। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার কালের কোনো প্রাচীন লোকের কাছে গল্প করিয়াছিলেন যে, তাঁহার যখন তিন বছর বয়স, তখন তিনি একটা ছোটো মোড়ার উপরে দাঁড়াইয়া ঘরের কপাটের আগল খুলিতেন, সে কথা তাঁহার বেশ মনে পড়ে। আর বেতের চুন্‌কিতে করিয়া সকালে মুড়ি-মুড়কি প্রভৃতি গ্রাম্য জলখাবার খাইতেন। অতএব দ্বারকানাথের পরিবার বিখ্যাত ধনী-পরিবার হইলেও সেকালের জীবনযাত্রার সরল ব্যবস্থাগুলি পুরুষানুক্রমে এই পরিবারে চলিয়া আসিয়াছে, ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। দেবেন্দ্রনাথের দিদিমার কথা যেটুকু তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছেও

শুনিয়াছি যে, বাড়ির ভিতরে সেকালের গৃহস্থালির ব্যাপার অত্যন্ত সাদাসিধা ছিল। বারো মাসে তেরো পার্বণ চলিত। দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেন যে, দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্মৃতি তাঁহার মনে অত্যন্ত অস্পষ্ট। কেবল মনে আছে যে, তাঁহার ঐশ্বর্যের আমলে টাকার তোড়া গণিয়া না লইয়া ওজন করিয়া লওয়া হইত। এত টাকা! এবং গাড়িঘোড়া ও লোকজনের সমাগমে বৈঠকখানাবাড়ি গম্‌গম্ করিত।

দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার ছেলেবেলার একটি ঘটনা একদিন তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সৌদামিনী দেবীকে বলিয়াছিলেন। ঘটনাটি এই: যখন তাঁহার পাঁচ কি ছয় বছর বয়স, তখন ঠাকুরঘরে একদিন গিয়া দেখেন, ঘরে কেহ নাই, সিংহাসনের উপর শালগ্রাম ঠাকুর। তিনি সেই শিলাটিকে আস্তে আস্তে তুলিয়া লইয়া বাহিরে আসিয়া মাটিতে গড়াইয়া মনের আনন্দে খেলা করিতেছেন— ওদিকে পুজারি ব্রাহ্মণ আসিয়া দেখে যে, সিংহাসনে ঠাকুর নাই। ঠাকুর কে লইল বলিয়া মহাহুলস্থুল বাধিয়া গেল। চারিদিকে খোঁজ করিতে করিতে একজন আসিয়া দেখিল যে, বালক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লইয়া নিশ্চিন্ত মনে খেলা করিতেছেন। বাড়ির মেয়েরা সব ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন—'দেবেন্দ্র! এ কি সর্বনাশ! ঠাকুরকে লইয়া খেলা! কি মহা বিপদই না-জানি ঘটিবে!' আবার অভিষেক করিয়া ঠাকুরকে সিংহাসনে বসানো হইল। তার পরে যাহাতে বালকের কোনো অনিষ্ট না হয় সেজন্য শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ধূম পড়িয়া গেল।[১]

যাঁহারা মহাপুরুষদের জীবনে অল্প বয়সেই মহত্ত্বের লক্ষণসকল প্রকাশ পায় বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা এই ঘটনা শুনিয়া খুব পুলকিত হইয়া উঠিবেন সন্দেহ নাই। আমার কাছে এটা নিছক ছেলেমানুষির ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। শালগ্রাম শিলা লইয়া খেলা করিয়া থাকিলেও দিদিমার প্রভাবে এবং বাড়িতে সর্বদাই তাঁহাকে পুজা-পার্বণ ব্রতোপবাসাদি লইয়া ব্যস্ত থাকিতে দেখিয়া ছেলেবয়সেই দেবেন্দ্রনাথের মনে দেবতার প্রতি একান্ত ভক্তির সঞ্চার হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পর তাঁহাকে কেশবচন্দ্র প্রভৃতি যে অভিনন্দন দেন, তাহার জবাবে তিনি লিখিয়াছিলেন, "প্রথম বয়সে উপনয়নের পর প্রতিনিয়ত যখন গৃহেতে শালগ্রাম শিলার অর্চনা দেখিতাম, প্রতি বৎসর যখন দুর্গাপূজার উৎসবে উৎসাহিত হইতাম, প্রতিদিন যখন বিদ্যালয়ে যাইবার পথে ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরীকে প্রণাম করিয়া পাঠের পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ

১রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ১৩৭৫

হইবার জন্যে বর প্রার্থনা করিতাম, তখন মনের এই বিশ্বাস ছিল যে, ঈশ্বরই শালগ্রাম শিলা, ঈশ্বরই দশভুজা দুর্গা, ঈশ্বরই চতুর্ভুজা সিদ্ধেশ্বরী।”

দেবেন্দ্রনাথের অল্প বয়সেই তাঁহার পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর ঘরেই তাঁহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত, পারসী—এই চার ভাষা তাঁহাকে পড়িতে হইত এবং একটু বড়ো হইলে ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ব্যায়াম ও সংগীতাদিও শিক্ষা করিতে হইত। দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে রামমোহন রায়ের কি রকম বন্ধুত্ব ছিল, তাহা পূর্ব পরিচ্ছেদেই বলা হইয়াছে। হিন্দুকালেজ স্থাপনে দ্বারকানাথ একজন প্রধান উদ্যোগী হইলেও ছেলেকে তিনি হিন্দুকালেজে ভর্তি না করিয়া রামমোহন রায়ের ইস্কুলে ভর্তি কবিয়া দিলেন। রামমোহন রায়ের এই ইস্কুল খোলার একটু ইতিহাস আছে—তাহা এখানে বলা দরকার।

রামমোহন রায় যখন ১৮১৫ খৃস্টাব্দে কলিকাতায় আসিয়া স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধিলেন, তখন এ দেশের লোককে ভালো রকম করিয়া ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য একটা ভালো বিদ্যালয় খোলার প্রয়োজন তিনি অনুভব করিলেন। তাহার চৌদ্দ বছর আগে, ডেভিড হেয়ার নামে একজন ঘড়ির ব্যবসায়ী স্কচ্ ভদ্রলোক এ দেশে আসিয়াছিলেন। তিনি সুশিক্ষিত না হইলেও, তাঁহার আশ্চর্য বদান্যতা ও সহৃদয়তার দ্বারা তিনি এ দেশের লোকের মন আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব জমিয়া গেল। হেয়ার ও রামমোহন রায়ের চেষ্টায় একটা ভালো ইংরাজী কালেজ খোলার প্রস্তাব তখনকার সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার্ হাইড্‌ইস্ট গ্রহণ করিলেন। কিন্তু মুশকিল বাধিল রামমোহন রায়কে লইয়া! তিনি কালেজ কমিটিতে থাকিবেন ইহা শুনিয়া অনেক পৌত্তলিক হিন্দু ভদ্রলোক কালেজের সহিত কোনো সংস্রব রাখিবেন না স্থির করেন। রামমোহন রায় এ কথা শোনামাত্র কমিটির সভ্যপদ ত্যাগ করিলেন। ১৮১৭ খৃস্টাব্দে ২০শে জানুয়ারি হিন্দু কালেজ বা মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল।

রামমোহন রায় এক ইংরাজী ইস্কুল খুলিলেন। তাহার ব্যয়ভার রামমোহন রায় সম্পূর্ণরূপে নিজেই বহিতেন। নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায়, ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ দে প্রভৃতি কয়েকজন রাজার ইস্কুলের প্রথম ছাত্র ছিলেন। এই ইস্কুলেই দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে পাঠাইয়া দিলেন। দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, ‘রামমোহন রায় নিজে গাড়ি করিয়া তাঁহাকে লইয়া গিয়া আপনার ইস্কুলে ভর্তি করিয়াছিলেন।

রাজার সঙ্গে যাইবার সময়, তিনি বিমুগ্ধ চিত্তে রাজার সুন্দর গম্ভীর, ঈষৎ বিষাদ-মিশ্রিত মুখের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ইস্কুলে গিয়াছিলেন।'

ছেলেবেলায় দেবেন্দ্রনাথ যে তাঁহার পিতার সঙ্গ খুব বেশি পাইতেন, তাহা মনে হয় না। তাঁহার সাতাত্তর বছর বয়সে তিনি স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে একদিন গল্প করিয়াছিলেন যে, ছেলেবেলায় ইস্কুল হইতে আসিয়া বাবার বৈঠকখানার চারি দিকে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেন। বৈঠকখানায় ঢুকিতে ইচ্ছা হয়, অথচ সাহস হয় না। একদিন তাঁহার পিতা বলিলেন, তুই ছুটে ছুটে বেড়াস্ কেন, বৈঠকখানার ভিতরে বসতে পারিস্ না? তবু তাঁহার ভরসা হয় না। তার পরে এক সময় হঠাৎ গিয়া দেখেন যে ভিতরে বেশ ফুলের তোড়া, বৈঠকখানাটি নানা সুন্দর জিনিস দিয়া সাজানো। তখন হইতে বৈঠকখানায় বসিবার অধিকার হইল। সেইখানে বসিয়া অভিধান দেখিয়া তিনি পড়া শিখিতে লাগিলেন। এই গল্প করিয়া তিনি উমেশবাবুকে বলিলেন, 'এখন সে বাবা নাই, আদত বাবা ছুটাছুটি ছাড়িয়া তাঁর ঘরে বসিতে বলিয়াছেন। বেশ লাগিতেছে!'

চৌদ্দ বছর বয়সে দেবেন্দ্রনাথ, নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায় প্রভৃতি সতীর্থের সঙ্গে হিন্দুকালেজে প্রবেশ করেন। হিন্দুকালেজের ভিতর দিয়া তখন এক ঘোর সামাজিক বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছে। হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিয়ো নামে এক প্রতিভাবান ফিরিঙ্গি যুবক ১৮২৮ খৃস্টাব্দে হিন্দুকালেজের চতুর্থ শ্রেণীর সাহিত্য ও ইতিহাসের শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি তাঁহার অপূর্ব পাণ্ডিত্য, মনীষা ও হৃদ্যতার দ্বারা ছাত্রদের মন একেবারে দখল করিয়া লইলেন। তিনি শুধু পাঠ্য পুস্তক পড়াইতেন না; দীপশিখা হইতে যেমন দীপ জ্বালায়, তেমনি তাঁহার মননশীলতার দ্বারা ছাত্রদের স্বাধীন মননশক্তিকে তিনি জাগাইয়া দিতেন। ক্লাসে, ক্লাসের বাহিরে, ডিরোজিয়োর বাড়িতে—সকল সময়ে আলাপ-আলোচনায়, তর্ক-বিতর্কে ছাত্রদের সঙ্গে এই অধ্যাপকের এক অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ যোগ দাঁড়াইয়া গেল। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়ে এবং তাহার কিছু পূর্বে ইউরোপে হিউম, রুশো, ভল্টেয়ার, ভলনি, ডিডিরো, কন্দর্সে প্রভৃতির দ্বারা চিন্তারাজ্যে যে মহা বিপ্লব জাগিয়াছিল, তাহা অনেকেই জানেন। ধর্ম কিছু নয়, সমাজ কিছু নয়;—ধর্ম ও সমাজ বহুকাল ধরিয়া মানুষকে যে-সকল সুদৃঢ় সংস্কারের জালে বাঁধিয়াছে, তাহার বাঁধন না ছিঁড়িলে মানুষের মুক্তি নাই—এই ভাবের একটা বিদ্রোহ তখন সমস্ত ইউরোপকে তোলপাড় করিয়াছিল। সেই ফরাসী বিপ্লবের ঢেউ এ দেশকেও নাড়া দিল। ডিরোজিয়ো সেই বিপ্লবের মন্ত্রে

তাঁহার ছাত্রদিগকে দীক্ষিত করিলেন। তিনি তাহাদিগকে লইয়া অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন (Academic Association) নামে এক সভা খাড়া করিলেন। তাহাতে রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি উৎসাহী সভ্য ছিলেন। সেই সভায় স্বাধীনভাবে সামাজিক বিষয়ের বিচার চলিত এবং তাহার ফলে ছাত্ররা নিজের দেশকে, দেশের ইতিহাসকে, সমাজকে, ধর্মকে, সকল রীতিনীতিকে নির্বিচারে ঘৃণা করিতে শুরু করিয়া দিল। অথচ এই ছাত্ররা কালে সকলেই বড়ো হইয়া এক-একদিকে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন— ইঁহাদের নাম বাংলার ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছে। তার মানে ডিরোজিয়ো তাঁহার মনীষার সোনার কাঠি ছোঁয়াইয়া ইঁহাদের ভিতরকার সুপ্ত মনুষ্যত্বটিকে জাগাইয়াছিলেন। আমাদের সমাজের প্রথাগত আচারগত গতানুগতিক জীবনযাপনের আদর্শকে তাঁহারা কোনোমতেই স্বীকার করিয়া লইতে পারিলেন না। সেইজন্য যে-সকল কাজ সমাজের চোখে অত্যন্ত ঘৃণ্য অনাচার বলিয়া গণ্য ছিল, সেই-সকল কাজে ডিরোজিয়োর ছাত্রদের সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দেখা গিয়াছিল। যেমন, পৈতা ত্যাগ, গোমাংস ভক্ষণ, মদ্যপান, ইত্যাদি। ইহার কুফল যে ফলে নাই তাহা বলি না। কিন্তু ইহার ভিতরকার ভাবটা ছিল বিদ্রোহের ভাব— প্রথা ও আচার -পালনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা। এই সমাজবিদ্রোহ ও স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকাশ যদি এই সময়ে দেখা না দিত, তবে বিশ্ব-সাহিত্য, বিশ্ব-ইতিহাস, বিশ্ব-দর্শন, বিশ্ব-রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতির যে জোয়ার ইংরাজীশিক্ষার ভিতর দিয়া আসিয়া এ দেশের গ্রাম্যতার জীর্ণসংস্কারভারে আচ্ছন্ন রুদ্ধ চিত্তস্রোতের মধ্যে কলোচ্ছ্বাস জাগাইয়াছিল, তাহা আর কখনোই সম্ভব হইত না। ইহারি ফলে এ দেশে আমরা মাইকেলের কবি-প্রতিভা, রামগোপাল ঘোষ, হরিশ মুখুজ্যে প্রভৃতির রাষ্ট্রনৈতিক বুদ্ধিনৈপুণ্য, শিবচন্দ্র দেব, রামতনু লাহিড়ীর মতো দৃঢ়নিষ্ঠ চরিত্র, পাইয়া এক নূতন যুগের সিংহদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিতে পারিয়াছি। আমাদের দেশ গ্রাম্যসভা হইতে বিশ্ব-সভায় আসন পাইয়াছে।

অবশ্য রামমোহন রায় হিন্দুকালেজের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে খুশি ছিলেন না। তাহার কারণ, ডেভিড হেয়ার বা মেকলে বা ডিরোজিয়োর মতো পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাই এ দেশের সকল রকমের উন্নতির নিদান হইবে, এমন মূঢ় ধারণা রামমোহন রায়ের মতো লোকের থাকিতেই পারে না। ১৮২৩ খৃস্টাব্দে

রামমোহন রায় লর্ড আমহার্স্টকে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন-তরফে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র-শিক্ষাকে নিন্দা করিয়াছিলেন—অথচ নিজে সেই বেদান্ত দর্শনের ভাষ্য বাংলায় তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। রামমোহন রায় পরিষ্কার বুঝিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে আমাদের ধর্মশাস্ত্রকে আমরা না পড়িতে পারিলে, কোনো কালেই তাহার নিত্য তত্ত্ব এবং খণ্ডকালের হিসাবেও তাহার নিগূঢ় তাৎপর্য আমরা ধরিতে পারিব না। তখনি জীবনের হিসাবে তত্ত্বের মূল্য যাচাই না করিয়া শুষ্ক তর্কের হিসাবে তত্ত্বের মূল্য কষিবার একটা চেষ্টা লক্ষ করা যাইবে। আমাদেব দেশে এ চেষ্টা কি দেখা দেয় নাই? রামমোহন রায় তাই পশ্চিমের দিকে দেশের মুখ ফিরাইয়াছিলেন যাহাতে দেশের দিকেই সেই মুখখানা ভালো করিয়া ফেরে। হেয়ার, মেকলে বা ডিরোজিয়োর মতো তিনি স্বপ্নেও মনে করেন নাই যে হিন্দুসভ্যতার মধ্যে শিখিবার জিনিস কিছুই নাই, যাহা-কিছু আছে তাহা পশ্চিমের সভ্যতার ভাণ্ডারে।

গল্প আছে যে, হিন্দুকালেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কিছু পরে একজন লোক তাঁহার কাছে আসিয়া গল্প করিতেছিল যে, অমুক ব্যক্তি আগে ছিল Polytheist তার পর হইল Deist, এখন সে Atheist হইয়াছে। রামমোহন হাসিয়া বলিলেন, "ইহার পর বোধ হয় সে beast হইবে।" ধর্মশিক্ষা বাদ দিয়া বিদ্যাশিক্ষা (Secularisation of Education) রামমোহন রায় কখনোই কল্যাণকর মনে করিতেন না। অন্যান্য বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে ধর্মশিক্ষাও থাকে, সেজন্য তিনি নিজে যেমন একটি ইস্কুল করিয়াছিলেন, খৃস্টান মিশনারি ডফসাহেবকে একটি ইস্কুল খুলিতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। "প্রতিদিন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা-পূর্বক বিদ্যালয়ের কার্য আরম্ভ হয়, দেখিয়া তিনি অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিতেন।" যে-কোনো ধর্মশাস্ত্র হোক না, ছাত্ররা ধর্মালোচনা করিতে শিখুক এবং অন্যান্য শিক্ষাকে সেই বড়ো শিক্ষার অঙ্গীভূত বলিয়া জানুক, ইহাই ছিল রামমোহন রায়ের শিক্ষার আদর্শ। বেদান্তের অনুরাগী বলিয়া তিনি প্রাচীন কালের তপোবনের শিক্ষার মতো বিদ্যামন্দিরে অপরাবিদ্যা ও পরাবিদ্যা এ দুয়েরই চর্চা হয়, ইহাই ইচ্ছা করিতেন। হিন্দুকালেজের ধর্মহীন নাস্তিকতার শিক্ষা সেইজন্য তাঁহাকে অত্যন্ত পীড়া দিত।

আমি বলিয়াছি, দেবেন্দ্রনাথের যখন চৌদ্দ বছর বয়স, তখন তিনি হিন্দু-কালেজে আসেন। রমাপ্রসাদ রায়, তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রভৃতি তাঁহার সহপাঠী।

ডিরোজিয়ো তখন যে ক্লাসে পড়াইতেন, তাহার নীচের ক্লাসে দেবেন্দ্রনাথ ভর্তি হইয়াছিলেন। হিন্দুকালেজের ছাত্রদের বিপ্লবে কালেজকমিটির হিন্দুসভ্যগণ বিশেষ বিচলিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা অবশেষে ডিরোজিয়োর নামে সত্য মিথ্যা নানা অভিযোগ আনিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের হিন্দুকালেজে প্রবেশের চার মাস পরেই ডিরোজিয়ো হিন্দুকালেজ ছাড়িয়া চলিয়া যান। সুতরাং ডিরোজিয়োর সংসর্গলাভ দেবেন্দ্রনাথের মোটেই ঘটে নাই।

হিন্দুকালেজে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন। এখানে বোধ হয় বলা দরকার যে, হিন্দুকালেজকে এখনকার কালের এনট্রেন্স ইস্কুলের মতো মনে করিলে ভুল হইবে। রাজনারায়ণ বসু তাঁহার আত্মচরিতে হিন্দুকালেজের প্রথম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকের যে তালিকা দিয়াছেন তাহাকে এখনকার বি. এ. পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তকের তালিকা বলিয়া স্বচ্ছন্দে চালানো যাইতে পারে। সুতরাং দেবেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়িয়া থাকিলে তাঁহার শিক্ষা যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছিল বলিতে হইবে। তাহা ছাড়া তখন সাহিত্যবিভাগ (Arts Course) এবং বিজ্ঞানবিভাগ (Science Course) পৃথক ছিল না। প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদিগকে যেমন শেক্‌স্‌পীয়র, মিল্‌টন পড়িতে হইত, তেমনি ইতিহাস পড়িতে হইত এবং ক্যাল্‌কুলাস্‌ মেকানিক্‌স্‌ প্রভৃতি কঠিন গণিতের চর্চাও করিতে হইত। দেবেন্দ্রনাথ বোধ হয় চৌদ্দ বছর হইতে ষোলো কি সতেরো বছর পর্যন্ত হিন্দু-কালেজে পড়িয়াছিলেন।

কালেজের সতীর্থগণের সঙ্গে যে তাঁহার বিশেষ অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ হইয়াছিল, এমন কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। ডিরোজিয়োর শিষ্যদলের সঙ্গে তাঁহার কোনো ঘনিষ্ঠতাই হয় নাই। পূর্বেই বলিয়াছি যে, ডিরোজিয়োর শিষ্যগণ দেশের ধর্ম, সমাজ, শাস্ত্রসাহিত্য, সমস্তকেই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার নেশায় অবজ্ঞা করিতেন। নহিলে পব্‌লিক ইন্‌স্ট্রাক্‌শন্‌ কমিটিতে যখন শিক্ষাসম্বন্ধে মন্তব্য লিখিতে গিয়া মেকলে এমন অদ্ভুত কথা লিখিয়া বসিলেন যে, ইউরোপীয় লাইব্রেরির এক তাক্‌ গ্রন্থে যাহা আছে, সমস্ত ভারতবর্ষের ও আরব দেশের সাহিত্যে তাহা নাই, তখন ডিরোজিয়োর শিষ্যের দল সেই সুর ধরিয়া তাঁহার সমর্থন করিতে যাইবেন কেন? পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ঠিকই লিখিয়াছেন, "তদবধি ইঁহাদের দল হইতে কালিদাস সরিয়া পড়িলেন, শেক্‌স্‌পীয়র সেস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন; মহাভারত, রামায়ণাদির নীতির উপদেশ অধঃকৃত হইয়া *Edgeworth's Tales*

সেই স্থানে আসিল ; বাইবেলের সমক্ষে বেদবেদান্ত, গীতা প্রভৃতি দাঁড়াইতে পারিল না।···নব্য বঙ্গের তিন প্রধান দীক্ষাগুরুর হস্তে তাঁহাদের দীক্ষা হইয়াছিল। প্রথম দীক্ষাগুরু ডেভিড হেয়ার, দ্বিতীয় দীক্ষাগুরু ডিরোজিয়ো, তৃতীয় দীক্ষাগুরু মেকলে। তিনজনই তাঁহাদিগকে একই ধুয়া ধরাইয়া দিলেন ; প্রাচীতে যাহা-কিছু আছে তাহা হেয় এবং প্রতীচীতে যাহা আছে তাহাই শ্রেয়ঃ। এই অতিরিক্ত প্রতীচ্য-পক্ষপাতিতার ঝোঁকে বঙ্গসমাজ বহুকাল চলিয়া আসিয়াছে।"

সৌভাগ্যক্রমে দেবেন্দ্রনাথ দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; সুতরাং তাঁহার পক্ষে দেশীয় রীতিনীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহার বিসর্জন দিয়া বিদেশীয় অনুকরণ করিতে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব ছিল। তার পর ছেলেবেলা হইতে তাঁহার পিতামহীর শিক্ষা ও প্রভাব তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু এ-সকলের উপরে আমার মনে হয়, রামমোহন রায়ের আদর্শ তাঁহাকে ঐ বিপ্লবের স্রোতে ভাসিয়া যাইতে দেয় নাই। রামমোহন রায়ের কাছে তিনি যে ছেলেবেলা হইতে শিক্ষা পাইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন, এটা তাঁহার জীবনের পক্ষে একটা মস্ত ব্যাপার। সেই রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে তাঁহার বাল্যস্মৃতি তিনি কয়েকজন বন্ধুর কাছে এক সময়ে বলিয়াছিলেন। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় -লিখিত রামমোহন রায়ের জীবনচরিতে তাহা উদ্ধৃত আছে। বোধ হয় এখানে তাহা পুনরুদ্ধার করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কারণ দেবেন্দ্রনাথের বালক বয়সে অমন একজন মহাপুরুষের প্রত্যক্ষ প্রভাব তাঁহার মনের উপর কতটা পড়িয়াছিল, তাহা তাঁহার নিজের মুখ হইতে শোনার খুব একটি আনন্দ আছে।

দেবেন্দ্রনাথ বলিতেছেন—"আমি মাণিকতলায় রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যান বাটিকাতে প্রায়ই গমন করিতাম। হেদুয়ার নিকটস্থ রাজা রামমোহন রায়ের ইস্কুলের ছাত্র ছিলাম। রাজার পুত্র রমাপ্রসাদ আমার সহিত এক শ্রেণীতে পাঠ করিতেন। প্রায় প্রতি শনিবার বিদ্যালয়ের ছুটি হইলে পর, আমি রমাপ্রসাদের সহিত রাজাকে দেখিতে যাইতাম। রাজার উদ্যানে একটি বৃক্ষের শাখায় একটা দোলনা ছিল। রমাপ্রসাদ এবং আমি উহাতে দুলিতাম। কখনও কখনও রাজা আসিয়া আমাদের সহিত যোগ দিতেন। আমাকে কিছুক্ষণ দোলাইয়া, তিনি দোলনার উপর উঠিয়া বসিতেন এবং আমাকে দোল দিতে বলিতেন।

"এই স্থলে উপস্থিত ভদ্রলোকেরা দেবেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 'তখন আপনার বয়স কত ছিল?' দেবেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, 'তখন আমার বয়স কত ছিল ঠিক বলিতে পারি না। তখন আমি স্কুলের বালক ছিলাম, তখন আমার বয়স আট কিম্বা নয় বৎসর হইবে।

"রাজা আমাকে ভাল বাসিতেন। আমার যখন ইচ্ছা রাজার নিকট যাইতে পারিতাম। কখনও কখনও পূর্বাহ্নে তাঁহার আহারের সময় যাইতাম। তিনি সচরাচর উক্ত সময়ে মধু দিয়া রুটি খাইতেন। একদিন প্রাতঃকালে তাঁহার আহারের সময়ে মধু দিয়া রুটি খাইতে খাইতে তিনি আমাকে বলিলেন, 'বেরাদর, আমি মধু ও রুটি খাইতেছি, কিন্তু লোকে বলে আমি গোমাংস ভোজন করিয়া থাকি।' কোন কোন দিন আমি রাজার স্নানের সময়ে তাঁহার বাটিতে যাইতাম। তাঁহার স্নান বড় চমৎকার ছিল। তিনি স্নানের পূর্বে সমস্ত শরীরে অধিক সর্ষপ-তৈল মর্দন করিতেন। তাঁহার শরীরে তেল গড়াইয়া পড়িত। তিনি বলবান্ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার বক্ষঃস্থল প্রশস্ত ছিল। তাঁহার মাংসপেশী সকল শক্ত ছিল। তৈলমর্দিত অনাবৃত দেহ, কটিদেশের চতুষ্পার্শ্বে একখণ্ড বস্ত্রমাত্র, তাঁহার এই প্রকার মূর্তি দেখিয়া বালক বলিয়া আমার মনে ভীতিসঞ্চার হইত। এই প্রকার বস্ত্র পরিধান করিয়া বলপূর্বক পদ নিক্ষেপ করিতে করিতে তিনি উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিতেন। সংস্কৃত, পারসী ও আরবী ভাষায় কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে তিনি একটি প্রকাণ্ড জলপূর্ণ টবে ঝম্প প্রদান করিতেন। এই টবে তিনি এক ঘণ্টার অধিক কাল থাকিতেন। এই সময়ে তিনি ক্রমাগত তাঁহার প্রিয় কবিতা সকল আবৃত্তি করিতেন। স্পষ্ট বোধ হইত, তিনি এই সকল ভাবে মগ্ন হইয়া গিয়াছেন। তিনি অতিশয় ভাবের সহিত যে সকল কবিতা আবৃত্তি করিতেন আমি তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। আমার এখন বোধ হয় উহাই রাজার উপাসনা ছিল। রাজার পালিতপুত্র রাজারাম বড় দুষ্ট ছিল। রাজার সহিত অনেক প্রকার দুষ্টামি করিত। কিন্তু রাজা কিছুতেই তাহার প্রতি বিরক্ত হইতেন না। বাস্তবিক আমি এ পর্যন্ত যত লোক দেখিয়াছি, রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় সুমিষ্ট মেজাজের লোক দেখি নাই। একদিবস মধ্যাহ্নে আমি রাজার বাটীতে গমন করিলাম, রাজা তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন। রাজারাম আমাকে ডাকিয়া বলিল, 'একটা তামাসা দেখিবে তো এস।' আমি তাহার সহিত গমন করিলাম। রাজারাম ধীরে ধীরে রাজার শয্যার নিকটে গমন করিল, এবং হঠাৎ রাজার বক্ষঃস্থলের উপর ঝম্প দিয়া

পড়িল। রাজা জাগ্রত হইলেন এবং 'রাজারাম' 'রাজারাম' বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

"একদিন রমাপ্রসাদের সহিত আমি রাজার বাটীতে গমন করিয়াছিলাম। তাঁহার ঘরে একখানি খাট ছিল। আমরা তাঁহার নিকটে যাইবামাত্র তিনি রমাপ্রসাদকে তাঁহার প্রিয় সংস্কৃত সঙ্গীত 'অজরমশোকং জগদালোকং' গান করিতে বলিলেন। রমাপ্রসাদ বড় লজ্জায় পড়িলেন। তিনি গান করিতেও পারেন না, আবার তাঁহার পিতার আজ্ঞা অগ্রাহ্যও করিতে পারেন না। তিনি আস্তে আস্তে খাটের নীচে গিয়া বসিলেন এবং তথায় করুণাব্যঞ্জক স্বরে গান আরম্ভ করিলেন, 'অজরমশোকং জগদালোকং।'

"রাজা মধ্যে মধ্যে আমাদের বাড়ীতে আসিতেন। আমার পিতা রাজাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি অল্প বয়সে দেশের প্রচলিত ধর্মে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু রাজার সহিত আলাপ পরিচয় হওয়াতে প্রচলিত ধর্মে তাঁহার অবিশ্বাস হইয়াছিল। কিন্তু রাজা যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়াছিলেন তিনি কখনও তাহা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। যখন রাজার সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হইয়াছিল, তখন আমার পিতা প্রতিদিন প্রাতঃকালে পুষ্পাদি লইয়া দেবতার পুজা করিতেন। তিনি প্রকৃত ভক্তির সহিত পুজা করিতেন। কিন্তু পুজার অপেক্ষাও রাজার প্রতি তাঁহার ভক্তি অধিক হইয়াছিল। কখনও কখনও এমন হইত যে, তিনি পুজায় বসিয়াছেন, এমন সময়ে রাজা তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেন। রাজা আমাদের গলিতে প্রবেশ করিবামাত্র আমার পিতার নিকট সংবাদ যাইত যে, তিঁনি আসিতেছেন। আমার পিতা তৎক্ষণাৎ পুজা হইতে উঠিয়া রাজাকে অভর্থনা করিতে আসিতেন। রাজার বন্ধুদিগের উপরে তাঁহার এই প্রকার প্রভাব ছিল।

"তোমরা দেখিতেছ যে, আমার পিতার কথা না বলিয়া, আমি রাজার কথা বলিতে পারি না। রাজার সম্বন্ধীয় আমার স্মৃতি আমার পিতার স্মৃতির সহিত জড়িত। আমি আশা করি, তোমরা ইহাতে কিছু মনে করিবে না।

"আমাদের বাটীতে দুর্গাপুজা উপলক্ষ্যে আমি একবার রাজাকে নিমন্ত্রণ করিতে গিয়াছিলাম। আমি আমার পিতামহের প্রতিনিধিস্বরূপ গিয়াছিলাম। চলিত প্রণালী অনুসারে আমি রাজাকে বলিলাম, 'রামমণি ঠাকুরের বাড়ীতে আপনার দুর্গোৎসবের নিমন্ত্রণ।' রাজা ব্যগ্রভাবে উত্তর করিলেন, 'আমাকে পুজার নিমন্ত্রণ?'

"সেই স্বর আমি যেন এখনও শুনিতেছি! তিনি আমার উপর বিরক্ত হন নাই; আমার প্রতি তিনি সর্বদাই প্রসন্ন থাকিতেন। রাজা আশ্চর্য হইয়াছিলেন যে, তিনি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে এত প্রতিবাদ করিতেছেন, তথাচ লোকে তাঁহাকে দুর্গোৎসবে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকে। যাহা হউক রাজা বুঝিলেন যে, ইহা সামাজিক ব্যাপার মাত্র। তিনি আমাকে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদের নিকট যাইতে বলিলেন। প্রচলিত পৌত্তলিকতায় রাধাপ্রসাদের কোন আপত্তি ছিল না। সুতরাং তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন এবং আমাকে কিছু মিষ্টান্ন ও ফল খাইতে দিলেন।

"ফলের কথা বলাতে আমার স্মরণ হইল যে, রাজার মাণিকতলার বাগানে অনেক উত্তম উত্তম ফলের গাছ ছিল। এই সকল ফলের লোভে আমি অনেক সময়ে সেখানে যাইতাম। আমি নিচু ফল অতিশয় ভালবাসিতাম। আমি সেখানে অনেক সময়ে নিচু ফল খাইতে যাইতাম। যখন রাজা দেখিতেন যে, আমি বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসের ভীষণ রৌদ্রতাপে উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছি, তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিতেন 'বেরাদর, এখানে এস, তুমি যত নিচু চাও আমি দিব। রৌদ্রে বেড়াইতেছ কেন?' তখন তিনি মালীকে আমার জন্য সুপক্ক নিচু সকল আনিতে বলিতেন।

"আমার স্মরণ হয়, রাজা একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি মাংসাহার করি কি না? তিনি আমাকে বলিলেন যে, তুমি তোমার পিতাকে বলিয়ো যে, প্রতিদিন তোমার আহারের সময়ে তোমাকে কিছু মাংস দেওয়া হয়। রাজা বলিতেন যে, বৃক্ষমূলে জলসেচন করা আবশ্যক; নতুবা বৃক্ষ যথোপযুক্তরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। এই দেহের সম্বন্ধেও সেই প্রকার; বাল্যকাল হইতেই দেহকে উপযুক্ত আহার দেওয়া প্রয়োজন। রাজা আপনার শরীরকে অত্যন্ত যত্ন করিতেন। শরীরকে পরমেশ্বরের মূল্যবান দান বলিয়া মনে করিতেন।...

"রাজার এমন এক শক্তি ছিল, যদ্দ্বারা তিনি সকল প্রকার লোককে আকর্ষণ করিতে পারিতেন। আমার উপরে তাঁহার এক নিগূঢ় প্রভাব ছিল। আমি তখন বালক ছিলাম, সুতরাং তাঁহার সহিত কথোপকথনের সুযোগ ছিল না। কিন্তু আমার উপরে তাঁহার মুখের এমন এক আকর্ষণ ছিল যে, আমি আর কাহারও মুখ দেখিয়া কখনও সেরূপ আকৃষ্ট হই নাই।...

"আমি প্রায়ই রাজার গাড়িতে রাজার সহিত যাইতাম। তখন রাজার

সহিত আমার প্রায়ই কোনও কথাবার্তা হইত না। আমি তাঁহার সম্মুখে বসিয়া, তাঁহার সুন্দর মুখ দর্শন করিতাম। রাজার সহিত গাড়িতে বেড়াইবার সময়, আমি প্রায়ই রাজার বিষয়ে চিন্তাতে মগ্ন থাকিতাম। রাস্তায় কি হইতেছে, সে বিষয়ে কিছু জানিতে পারিতাম না। আমি পুত্তলিকার ন্যায় স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতাম। কেবলই রাজাকে দেখিতাম। আমার হৃদয় এক প্রকার গভীর ও অবর্ণনীয় ভাবে পরিপ্লুত হইত। স্পষ্টই বুঝা যায় যে, রাজার সহিত আমার কোন নিগূঢ় সম্বন্ধ ছিল।...

"আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি যে, আমি তাঁহাকে দুর্গাপূজার নিমন্ত্রণ করিতে গেলে কি হইয়াছিল। তিনি কেমন বলিলেন, 'আমাকে পূজায় নিমন্ত্রণ?' তিনি যখন এই কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন, ভাবেতে তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়াছিল। আমার জীবনে চিরকাল উহার আশ্চর্য প্রভাব রহিয়াছে। তাঁহার কথাগুলি আমার পক্ষে গুরুমন্ত্রস্বরূপ হইয়াছিল। তাহা হইতেই আমি ক্রমে পৌত্তলিকতা ত্যাগ করিলাম। ঐ কথাগুলি এখনও যেন আমার কানে বাজিতেছে। আমার এই দীর্ঘ জীবনে ঐ কথাগুলি আমার নেতাস্বরূপ হইয়াছে।

"ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইলে পর, আমি মধ্যে মধ্যে লুকাইয়া তথায় যাইতাম। তখনও বিষ্ণু গান করিতেন। বিষ্ণুর এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহার নাম কৃষ্ণ। রামমোহন রায়ের সমাজে বিষ্ণুর সহিত কৃষ্ণ একত্রে গান করিতেন। গোলাম আব্বাস নামক একজন মুসলমান পাখোয়াজ বাজাইতেন। "বিগতবিশেষং" গানটি রাজার অতি প্রিয় ছিল। বিষ্ণু ঐ সঙ্গীতটি মধুর স্বরে গান করিতেন।...

"তিনি আমাকে কখনও কথা কহিয়া উপদেশ দেন নাই। তখন আমি বড় ছোট ছিলাম। তাঁহার নিকট হইতে উপদেশ লইবার সময় হয় নাই। তথাচ আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি যে, আমার উপরে তাঁহার এক নিগূঢ় প্রভাব ছিল।...

"ইংলণ্ডে গমন করিবার সময়ে, রাজা আমার পিতার নিকটে বিদায় লইতে আসিলেন। আমাদের বাড়ীর সকলে এবং আমাদের অনেক প্রতিবেশী, রাজাকে দেখিবার জন্য আমাদের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে একত্র হইয়াছিলেন। আমি তখন সেখানে ছিলাম না। তখন আমি সামান্য বালক। তথাচ, রাজা আমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি আমার পিতাকে বলিয়াছিলেন যে, আমার হস্তমর্দন না করিয়া তিনি এ দেশ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আমার পিতা

আমাকে ডাকিয়া আনিলেন। তখন রাজা আমার হস্তমর্দন করিয়া ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। রাজা যে সস্নেহে আমার হস্তধারণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাব ও অর্থ তখন বুঝিতে পারি নাই। বয়স অধিক হইলে, উহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি।

"যখন রামমোহন রায়ের মৃত্যু-সংবাদ আসিল, তখন আমি আমার পিতার নিকটে ছিলাম। আমার পিতা বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আমারও অতিশয় শোক হইয়াছিল। যদিও রাজার সহিত আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল না, যদিও তিনি আমাকে কোন উপদেশ দেন নাই, তথাচ তাঁহার মুখশ্রী এবং চরিত্র আমার হৃদয়ে গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল। তাঁহা দ্বারা আমি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলাম।"

ছেলেবয়সে রামমোহন রায়ের চরিত্রের ছাপ বালক দেবেন্দ্রনাথের মনে মুদ্রিত হইয়াছিল বলিয়াই দেশের শিক্ষিত সাধারণ যখন পশ্চিমের ধর্ম, সমাজ, রীতিনীতি সমস্তকেই আদরে বরণ করিয়া লইলেন এবং দেশকে আঘাত করিতে লাগিলেন, তখন তিনি একাকী দেশের প্রাচীন সভ্যতার দিকে মুখ ফিরাইলেন। প্রতিকূল স্রোতের বিরুদ্ধে শক্ত করিয়া হাল ধরিয়া দাঁড়াইলেন। পাশ্চাত্ত্য শাস্ত্র-সাহিত্য ছাড়িয়া প্রাচ্য শাস্ত্র-সাহিত্যেব আলোচনা দেশময় ব্যাপ্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। রামমোহন রায়ের পরে তিনি যদি এই কাজে না লাগিতেন, তবে দেশের শিক্ষিত লোক যে খৃস্টান হইয়া সমাজে এক প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা ঘটাইত, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সবই ভাঙিত, কিছুই গড়িত না। ডিরোজিয়োর শিষ্যগণ তাঁহাদের দীক্ষাগুরুব নিকট হইতে ভাঙিবার শক্তি লাভ করিয়াছিলেন, গড়িবার শক্তি পান নাই। সেই সৃজনী শক্তি দেবেন্দ্রনাথের জন্য অপেক্ষা করিয়া ছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মৃত্যু-শোক—অধ্যাত্মজীবনের উদ্‌বোধন

পৃথিবীর সকল সাধুপুরুষেরই অধ্যাত্ম জীবনের প্রথম উদ্‌বোধনের ইতিহাস বড়ো আশ্চর্য। অনেক দিন পর্যন্ত তাঁহারা আপনাকে কেন্দ্র করিয়া আপনার চারি দিকে স্বার্থ, সুখ ও আরামের যে একটি পরিবেষ্টন রচনা করিয়া তুলিয়াছিলেন, হঠাৎ দেখা যায় যে, এক শুভ মুহূর্তে কোন্ ঘটনার আঘাতে তাহা ভাঙিয়া গিয়া এক অনন্ত প্রাণময় জগতের দৃশ্য তাঁহাদের সামনে খুলিয়া গেল। তাঁহাদের চোখের সামনে এতদিন যেন একটা পর্দা ছিল; তাঁহারা আপনাদিগকে, আপনাদের জীবনকে, জগৎসংসারকে সেই আবরণের ভিতরে সংকীর্ণ করিয়া পরিমিত করিয়া জানিতেছিলেন। যেমনি সেই পর্দাটি সরিয়া গেল, অমনি একি অপরিসীম, অনির্বচনীয়, অপরূপ একটি আনন্দলোক তাঁহাদের সমস্ত চৈতন্যকে পরিব্যাপ্ত করিয়া প্রকাশিত হইল! তাঁহারা দেখিলেন, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরের অনন্ত শক্তিতে, প্রাণে আনন্দে ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ।

সাধকদিগের জীবনে অধ্যাত্মবোধের এই উদ্‌বোধন আকস্মিক বলিয়া মনে হইলেও ইহা বস্তুত তাহা নয়। ইহার পিছনে দীর্ঘকালের চিত্তবিক্ষেপ, সংশয়-বেদনা এবং আপনার সঙ্গে আপনার সংগ্রামের ইতিহাস অধিকাংশ জায়গাতেই লুকানো থাকে। তাহা সাধকের কাছেও সুগোচর নয়। তাঁহার অব্যক্তচেতন-লোকে এই প্রচ্ছন্ন ইতিহাসের ক্রিয়া চলিতে থাকে। মাটির অন্ধকার গর্ভে বীজের ইতিহাস যেমন অজানা, অব্যক্তচেতনলোকে অধ্যাত্মবোধের জন্মের ইতিহাস তেমনি অজানা। সেই আঁধার বিদীর্ণ করিয়া অঙ্কুর যেদিন মাথাটি তোলে, সেদিন সেই অনন্ত আকাশ এবং আলোক তাহার সমস্ত প্রাণকে যেমন প্রাণিত করিয়া দেয়, ঠিক সেই রকম অব্যক্তচেতনলোকের সংশয়-দ্বন্দ্ব-বেদনার আঁধারপুঞ্জকে ঠেলিয়া যেদিন নবজাগ্রত অধ্যাত্মবোধ অনন্তস্বরূপের আবির্ভাবকে সর্বত্র প্রত্যক্ষ করে, সেদিন তাহার আনন্দের সীমা পরিসীমা থাকে না।

আমরা দেখিয়াছি যে, দেবেন্দ্রনাথ ছেলেবেলা হইতে তাঁহার দিদিমার শিক্ষায় পৌত্তলিক উপাসনায় নিষ্ঠাবান হইয়াছিলেন। নিঃসন্দেহ সেই নিষ্ঠা তাঁহার চারি দিকের ঐশ্বর্য ও বিলাসের দ্বারা ভিতরে ভিতরে পীড়িত হইতে-ছিল। একদিকে পূজার দালানে ঠাকুর-পূজা হইতেছে, আর-একদিকে বাহিরের

বাড়িতে নাচগান, মদ্যপান প্রভৃতি উচ্ছৃঙ্খল আমোদ-প্রমোদ চলিতেছে, এমনতর দৃশ্য হয়তো তাঁহাকে প্রায়ই দেখিতে হইত। দ্বারকানাথ ঠাকুরের পক্ষে অর্থশালী হইয়া সমাজে মানে মর্যাদায় শক্তিতে অন্য পাঁচজনের চেয়ে বড়ো ও শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিবার জন্য ভিতর হইতে একটা প্রবল তাগিদ ছিল। দেবেন্দ্রনাথের মনে স্বভাবতই সে তাগিদ ছিল না। সেইজন্য এই ধনের দ্বারা সকলের উপর প্রভাব বিস্তার করার ব্যাপারটা যে কতই ফাঁকা ও মিথ্যা, সেটা তিনি বেশ করিয়া দেখিতে পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার স্বাভাবিক ধর্মনিষ্ঠা ভিতরে ভিতরে অজ্ঞাতসারে এই বিলাসবিভবের বেষ্টনে পীড়া পাইতেছিল। অব্যক্তচেতন-লোকে এই ক্রিয়াটি চলিতেছিল। ঠাকুরপুজা যে প্রথাপালন মাত্র, সেটা তাঁহার বোধের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে জানান দিতেছিল।

কেবল তাহাই নয়। তিনি তখন হিন্দুকালেজের ছাত্র এবং যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। ডিরোজিয়োর প্রভাব তাঁহার উপর পড়ুক আর নাই পড়ুক, তখনকার কালের সংশয়ের হাওয়া যে তাঁহার মনের মধ্যে একেবারেই বহিবার সুযোগ পায় নাই, তাঁহার পৌত্তলিক ধর্মনিষ্ঠার স্থির জলে দু-একটা ঢেউও তাঁহার অজ্ঞাতসারে তোলে নাই, এমন কথা মনে করিতে পারি না। ভিতরে ভিতরে অব্যক্তচেতন-লোকে অন্ধ সংস্কারের বদ্ধ জানালায় জ্ঞানের রশ্মিঘাত লাগিতেছিলই—একটু আধটু ফাঁক পাইয়া ভিতরে আলোর অতি অস্পষ্ট আভাস জাগিতেছিলই। এমনি করিয়া এই-সকল অব্যক্তচেতনলোকের ক্রিয়া চলিতে চলিতে এবং জমিতে জমিতে অবশেষে একদিন হঠাৎ নক্ষত্রখচিত অনন্ত আকাশ তাঁহার চোখের আবরণ ঘুচাইয়া দিয়া অনন্তের বোধে তাঁহার সমস্ত চৈতন্যকে পরিপূর্ণ করিয়া দিল। তাঁহার নিজের ভাষায় সেই ঘটনার বিবরণ দিতেছি—

"প্রথম বয়সে আমার নিকটে এই নক্ষত্রখচিত অনন্ত আকাশ অনন্তদেবের পরিচয় দেয়। একদিন শুভক্ষণে এই অগণ্যনক্ষত্রপুঞ্জ অনন্ত আকাশ আমার নয়নপথে প্রসারিত হইয়া প্রদীপ্ত হইল। তাহার আশ্চর্য ভাবে একেবারে আমার সমুদায় মন, সমুদায় আত্মা, আকৃষ্ট হইল! অমনি বুদ্ধি প্রকাশিত হইয়া সিদ্ধান্ত করিল যে, এ কখনও পরিমিত হস্তের রচনা নহে। সেই মুহূর্তে অনন্তের ভাব হৃদয়ে প্রতিভাত হইল; সেই মুহূর্তে জ্ঞান-নেত্র বিকশিত হইল। তখন আমার পাঠ্যাবস্থা। এ কথা অদ্যাপি আমি কাহারও নিকটে প্রকাশ করি নাই। আপনাদের অন্তকার সৌহার্দ্যে বাধ্য হইয়া হৃদয়দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া তাহা এখন ব্যক্ত করিতেছি।

"প্রথমে এই অনন্ত আকাশ হইতে অনন্তের পরিচয় পাইলাম। যেন আবরণ ভেদ করিয়া অনন্ত ঈশ্বর আমাকে দেখা দিলেন, যেন যবনিকার এক পার্শ্ব হইতে মাতার প্রসন্ন বদন দেখিতে পাইলাম। সেই প্রসন্ন বদন আমার চিত্তপটে চিরদিনের নিমিত্ত মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে।...

"সেই শুভক্ষণে যেমন এই অনন্ত আকাশেব উপরে আমাব নয়নযুগল উন্মীলিত হইল, অমনি আমার জ্ঞান উন্মীলিত হইয়া মনের পৌত্তলিক ভাবকে ক্ষণকালের মধ্যে তিরোহিত করিয়া দিল। অমনি জানিলাম, অনন্ত আকাশের অগণ্য নক্ষত্র পরিমিত হস্তের কার্য নহে, অনন্ত পুরুষেবই এই অনন্ত রচনা।"[১]

যুগে যুগে এই অনন্ত আকাশ কত কবি, কত ভক্ত, কত তত্ত্বজ্ঞকে অনন্তের মহিমার ভাবে পূর্ণ করিয়াছে। উপনিষদের যে ঋষি বলিয়াছেন, কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ— কে বা শরীর চেষ্টা করিত, কে বা জীবিত থাকিত, যদি এই আকাশে আনন্দ না থাকিতেন?— নিশ্চয় একদিন তাঁহাকে আকাশের অনন্ত মহিমা এমনি করিয়াই আঘাত দিয়াছিল। গুরু নানকের যে ভজনে তিনি সূর্য চন্দ্র তারা ও নিখিল চরাচর অনন্তের আরতি করিতেছে বলিয়াছেন, সেই ভজন গান করিবার সময় একদিন নিশ্চয়ই আবরণ ভেদ করিয়া এই অনন্ত আকাশে সেই দীপ্যমান ঈশ্বর তাঁহাকে দেখা দিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন— গগনমৈ থাল রবি চন্দ্র দীপক বনে, / তারকামণ্ডল জনক মোতী।

অনন্ত যে কোন্ দরজা দিয়া কাহার চৈতন্যলোকে কখন প্রবেশ করেন, তাহা কে বলিতে পারে! খৃস্টান সাধু ব্রাদার লরেন্সের জীবনে দেখা যায় যে, শীতকালে একদিন তিনি পুষ্পপল্লবহীন এক শীর্ণ গাছ দেখিয়া যখন মনে করিলেন যে, বসন্তের উদয়ে কত কত নূতন পাতা তাহাতে ধরিবে, এবং কত কত সুগন্ধি ফুল তাহাতে ফুটিবে, অমনি হঠাৎ তাঁহার মনে যে কি দিব্য আনন্দ হইল, সে আর তিনি ধরিয়া রাখিতে পারেন না। সেই মুহূর্তেই তাঁহার কাছে সমস্ত জগৎ ঈশ্বরের প্রেমে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

কিন্তু সকল সাধকেরই অধ্যাত্মজীবনের উদ্‌বোধন যে একই রকমের হয়, তাহা হয় না। কেহ বা বহির্জগতে সহসা ঈশ্বরের অনন্ত সত্তার প্রাণময় ও জ্যোতির্ময় প্রকাশ দেখিতে পান, কেহ বা অন্তর্জগতে তাঁহার প্রেমের স্পর্শ অনুভব করিয়া হৃদয়ের মধ্যে তাঁহাকে হৃদয়নাথ রূপে দেখিতে পান। চৈতন্য

১ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অভিনন্দনপত্রের জবাবে প্রত্যভিনন্দনপত্র হইতে উদ্‌ধৃত।

মহাপ্রভু মহাপণ্ডিত ছিলেন, তর্কযুদ্ধে তাঁহার সহিত কেহ আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। যেদিন তাঁহার গুরুর দ্বারা তাঁহার প্রথম উদ্‌বোধন হইল, সেদিন তিনি যে বহির্জগতের কোনো রূপের মধ্যে অপরূপের প্রকাশকে দেখিলেন তাহা নয়। তিনি একেবারে অন্তরের অন্তরতম লোকে ঈশ্বরের প্রেমের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া উন্মাদের মতো বাহির হইয়া পড়িলেন— কোথায় পড়িয়া রহিল তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান, কোথায় রহিল তাঁহার প্রিয় পরিজন! ম্যাডাম গেঁয়োর জীবনীতেও ইহার অনুরূপ ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থ, রূপ, যৌবন— কিছুরই তাঁহার অভাব ছিল না। কিন্তু স্বামীর ঘরে তাঁহার আনন্দ ছিল না; সেই বিষাদকে ঢাকিবার জন্য তিনি ধর্মে মন দিলেন। কিছুতেই শান্তি পাইলেন না। একদিন এক ফ্রান্‌সিস্‌ক্যান সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী তাঁহাকে বলিলেন— ম্যাডাম, তুমি ভিতরের জিনিস বাহিরে খুঁজিয়া ফিরিতেছ। ভাব তাঁরে অন্তরে যে বিরাজে।— এই একটি কথা তাঁহার সমস্ত মনকে ঈশ্বরের প্রেমে এমনি ভরিয়া তুলিল যে, তখন দিনরাত্রি তাঁহার আনন্দের আর অবধি রহিল না।

সুতরাং প্রথম উদ্‌বোধনে কাহারো কাছে বিশ্বজগতের আবরণ ঘুচিয়া গিয়া তাহার মধ্যে বিশ্বাত্মার প্রকাশ অবারিত হইয়া যায়; কাহারো কাছে হৃদয়ের গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া হৃদয়ের মধ্যে সেই হৃদয়েশ্বরের দক্ষিণ মুখ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। উপনিষদে আছে যে, যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্বানুভূঃ— এই অসীম আকাশে সেই অমৃতময় জ্যোতির্ময় পুরুষ সকলি জানিতেছেন এবং যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃপুরুষঃ সর্বানুভূঃ— আত্মাতে সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ সকলি জানিতেছেন। বাহিরে তিনি, অন্তরে তিনি। অতএব বাহিরে তাঁহাকে তেজোময় অমৃতময় পুরুষরূপে দর্শন করিয়া কোনো সাধকের প্রথম অধ্যাত্ম উদ্‌বোধন হইলেও তাঁহাকে অন্তরের গুহায় ফিরিয়া আসিতেই হইবে এবং সেখানে ঈশ্বরের প্রেমস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাঁহাতে তন্ময় হইতে হইবে। যাঁহারা কেবল অন্তরের মধ্যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া বাহিরের বিষয় হইতে আপনাদিগকে বিবিক্ত করিয়া লন, তাঁহাদের অধ্যাত্ম উপলব্ধির সম্পূর্ণতা নাই। যাঁহারা কেবল বাহিরের জ্ঞানরাজ্যে তাঁহার অনন্ত অব্যক্ত স্বরূপ ভাবনা করিয়া তাঁহাকে অন্তরের মধ্যে অন্তরতমরূপে দেখিতে পান না, তাঁহাদেরও অধ্যাত্ম উপলব্ধির সম্পূর্ণতা নাই। দেবেন্দ্রনাথের এই বাহিরের উদ্‌বোধন অন্তরের উদ্‌বোধনের অপেক্ষায় রহিল।

অনন্ত আকাশ দেখিয়া অল্প বয়সে দেবেন্দ্রনাথের এই যে প্রথম উদ্‌বোধন হইল,

সংসারের ভোগবিলাসে তাহা ক্রমে চাপা পড়িয়া গেল। হিন্দুকালেজে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়িয়া তিনি পড়াশুনা ছাড়িয়া দিলেন, বলিয়াছি। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের বড়ো ছেলে— তাঁহার নবযৌবনের চঞ্চল দৃষ্টির সামনে তখন সম্পদের স্বর্ণচ্ছটা দিক্‌দিগন্তকে রাঙা করিয়া মোহবিস্তার করিয়াছে। তাঁহাকে ভুলাইবার জন্য ভোগের সকল আয়োজন তাঁহাকে চারি দিক হইতে একেবারে ঠাসিয়া ঘিরিয়াছিল। তিনি নিজে লিখিয়াছেন—"আমি বিলাসের আমোদে ডুবিয়া ছিলাম।" তাঁহার কালের কোনো প্রাচীন লোকের কাছে শুনিয়াছি যে, কলিকাতা শহরে তখন তাঁহার "বাবু" খ্যাতি রটিয়া গিয়াছিল। জগদ্ধাত্রী-ভাসানের সময়ে তিনি যেমন বেশভূষা পরিয়া বাহির হইতেন, অনেক বড়ো লোক তাঁহার অনুকরণ করিতেন। সেকালের বড়ো লোকদের সাজসজ্জায় ঐশ্বর্যের ভারের কাছে সৌন্দর্যরুচিকে লজ্জায় হার মানিতে হইত। তাঁহারা সর্বাঙ্গে মোটা মোটা গহনা পরিয়া বাহির হইতেন— কটি হইতে কণ্ঠ পর্যন্ত গহনার ভারে কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইত আর কি! দেবেন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-বোধ ও রুচির সূক্ষ্মতা ছিল পুরা মাত্রায়, সেইজন্য তিনি নিপুণভাবে সাজিতে জানিতেন। একবার এক বিখ্যাত ধনীলোকের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইবার সময় তিনি কলিকাতার ধনীদের স্থূল রুচিকে কসিয়া ঘা দিবার ইচ্ছায় পোশাক তৈরি করাইলেন এক সাদাসিধা ধরনের সাটিনের লম্বা জোব্বা— তাহাতে কেবল সাচ্চা রুপালি জরির কাজ করা। আর ইচ্ছা করিয়া গায়ে না পরিয়া তাঁহার জুতায় বসাইলেন যত রাজ্যের মণিমুক্তাজহরৎ। ঐ জিনিসগুলি পায়ে করিয়া সেই নিমন্ত্রণ-সভায় গিয়া তিনি হাজির হইলেন, যেন স্থূলরুচিবিশিষ্ট ধনী লোকগুলি তাঁহার পায়ের দিকে চাহিয়া দেখে!

এই সময়ে একবার তিনি প্রায় লাখ টাকা খরচ করিয়া খুব ধুমধামের সঙ্গে বাড়িতে সরস্বতী পূজা করিয়াছিলেন। সেই পার্বণে শহরে গাঁদা ফুল ও সন্দেশ দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছিল। গাঁদা ফুল দিয়া তিনি প্রকাণ্ড এক সামিয়ানার মতো তৈরি করিয়াছিলেন। প্রতিমাও এত মস্ত হইয়াছিল যে, বিসর্জনের সময় নানা কৌশলে তাহাকে বাড়ি হইতে বাহির করিতে হয়। সবসুদ্ধ ব্যাপারটাতে যে কেবল ঐশ্বর্যের জাঁকজমক ছিল তাহা নয়, সৌন্দর্যবোধেরও যথেষ্ট পরিচয় ছিল। পূজার এতটা খরচ দ্বারকানাথ ঠাকুরেরও কাছে বাড়াবাড়ি বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

চৌদ্দ বছর বয়সে দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুকালেজে প্রবেশ করেন এবং বোধ হয়

ষোলো কি সতেরো বছর বয়সে হিন্দুকালেজ ছাড়িয়া থাকিবেন। সুতরাং এই ষোলো হইতে আঠারো বছর পর্যন্ত তাঁহার ভাষায় বলিতে গেলে তিনি বিলাসের আমোদে ডুবিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা দেখিলাম যে, তাঁহার বিলাসিতার মধ্যেও তাঁহার ইন্দ্রিয়বোধের সূক্ষ্মতা, সুরুচি ও সৌন্দর্যবোধের পরিচয় খুবই পাওয়া যায়। প্রতিমাপূজার নানা কলাকাণ্ডের মধ্যে তাঁহার সৌন্দর্যমুগ্ধ চিত্তের যে একটা স্ফূর্তি হইত না, এমন কথা বলা যায় না। নইলে তিনি লাখো টাকা খরচ করিয়া সরস্বতী পুজা করিতে যাইবেন কেন? যাহাদের এমনিতর রসপ্রবণ মন, তাহাদের পক্ষে পৌরাণিক প্রতীকোপাসনার পরে একটা মোহ থাকা কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়। সেই রূপকের (Symbol) ভিতর দিয়া তাহাদের রূপবোধ ও রসস্ফূর্তির একটা চর্চা হইতে পারে—সুতরাং দেবেন্দ্রনাথের এই বাবুয়ানার পর্বে তাঁর ভোগবিলাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমাপূজার এই-সকল ঘটার বেশ একটি সুসংগতি আছে।

এমনি করিয়া জীবন ভোগবিলাসের নূতন নূতন উত্তেজনার আবর্ত তৈরি করিয়া আপনার প্রবৃত্তিগুলির মধ্যেই পাক খাইয়া মরিতে পারিত। ভোগের যজ্ঞশালায় নূতন নূতন ইন্ধন জোগানের মতো অর্থ ও সামর্থ্য দুইই তাঁহার ছিল। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা তাহা নয়। কালেজ ছাড়ার বছর দুই পরে এবং যৌবনের এই ভোগবিলাসিতার আরম্ভেই, দেবেন্দ্রনাথের আঠারো বছর বয়সে এমন এক ঘটনা ঘটিল, যাহা তাঁহার সমস্ত জীবনের গতি অন্য দিকে ফিরাইয়া দিল। ঈশ্বর তাঁহাকে প্রিয়জনবিচ্ছেদের প্রবল আঘাতের দ্বারা তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিয়া লইলেন। তাঁহার ভোগবিলাসের আয়োজনের মাঝখানেই তপস্যার আগুন জ্বালাইয়া দিলেন।

১৮৩৮ খৃস্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথের দিদিমার মৃত্যু হইল। তখন তাঁহার পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর এলাহাবাদ অঞ্চলে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। যখন তাঁহার দিদিমার মৃত্যু আসন্ন, তখন সেকালের প্রথা অনুসারে তাঁহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়া হইল। গঙ্গাতীরে একটি খোলার চালায় তাঁহাকে রাখা হইল; সেখানে তিনি তিন রাত্রি বাঁচিয়া রহিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে অত্যন্ত ভালো-বাসিতেন, তিনি তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিবেন কেমন করিয়া? তিনি সর্বদা সেই গঙ্গাতীরে দিদিমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিলেন।

পিতামহীর মৃত্যুর পূর্বদিন রাত্রে, নিমতলার ঘাটে একটা চাঁচের উপর তিনি বসিয়া আছেন—সেদিন পূর্ণিমারাত্রি, আকাশের অমৃত-উৎসের উৎসারে ধরণী-

গগন প্লাবিত। সেই আলোকধৌত অনন্ত গগনপ্রাঙ্গণের এক প্রান্তে সেই মুমূর্ষু মহিলার কাছে তখন নাম কীর্তন হইতেছে "এমন দিন কি হবে, হরিনাম বলিয়া প্রাণ যাবে"! বাতাসের স্রোতে তাহা অল্প অল্প দেবেন্দ্রনাথের কানে আসিতেছিল। এমন সময়ে হঠাৎ তাঁহার মনে "এক আশ্চর্য উদাসভাব উপস্থিত হইল!" তিনি যেন আর পূর্বের মানুষ নন। ঐশ্বর্যেব উপব বিরাগ জন্মিল। যে চাঁচের উপর বসিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহাব পক্ষে ঠিক বোধ হইল, "গালিচা-দুলিচা সকল হেয় বোধ হইল; মনের মধ্যে এক অভূতপূর্ব আনন্দ উপস্থিত হইল!"

পিতামহীর মৃত্যুর সময় দেবেন্দ্রনাথের মনে এই উদাস ভাবেব ও বিষয়-বৈরাগ্যের হঠাৎ আবির্ভাবকে অনেকে শ্মশানবৈরাগ্য বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। বুদ্ধদেব বথে চড়িয়া নগবে বেড়াইতে বেডাইতে মৃতদেহ দেখিয়া সাংসাবিক ভোগসুখের অনিত্যতা এমনি করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। মার্টিন লুথার একদিন এক সহপাঠীর সঙ্গে মাঠে বেডাইতে বেডাইতে হঠাৎ তাহাকে বজ্রাহত হইয়া মারা যাইতে দেখিয়া সংসাবে বিবাগী হইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথেরও এই বৈবাগ্য ঠিক একই কারণে তাঁহার মনেব মধ্যে জাগিলেও, ইহার সঙ্গে আর-একটি ভাব-বস্তু ছিল। কেবল সংসারের অনিত্যতা-বোধ নয়, কেবল ঐশ্বর্যের অসারতার উপলব্ধি নয়, একটি 'অভূতপূর্ব আনন্দ' তাঁহার সমস্ত মনকে একেবারে ভরিয়া দিল। সংসারেব অনিত্যতা-বোধে যে বৈরাগ্য মনে আসে, তাহা অভাবাত্মক বলিয়া মনকে বিষণ্ণ করিয়াই তোলে। শ্মশান-বৈরাগ্য মানুষকে তাই এমন মুষড়িয়া দেয় যে সমস্ত জগৎটা তাহার কাছে ছায়ার মতো মনে হয়। কিন্তু এ যে আনন্দ! দেবেন্দ্রনাথ নিজেই লিখিতেছেন, "ভাষা সর্বথা দুর্বল, আমি সেই আনন্দ কিরূপে লোককে বুঝাইব? তাহা স্বাভাবিক আনন্দ; তর্ক করিয়া, যুক্তি করিয়া, সেই আনন্দ কেহ পাইতে পারে না। সেই আনন্দ ঢালিবার জন্য ঈশ্বর অবসর খোঁজেন। সময় বুঝিয়াই তিনি আমাকে এ আনন্দ দিয়াছিলেন। কে বলে ঈশ্বর নাই? এই তো তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ। আমি তো প্রস্তুত ছিলাম না, তবে কোথা হইতে এই আনন্দ পাইলাম?

"এই ঔদাস্য ও আনন্দ লইয়া রাত্রি দুই প্রহরের সময় আমি বাড়ীতে আসিলাম। সে রাত্রিতে আমার আর নিদ্রা হইল না। এ অনিদ্রার কারণ, আনন্দ। সারা রাত্রি যেন একটা আনন্দ-জ্যোৎস্না আমার হৃদয়ে জাগিয়া রহিল।"

সেই রাত্রি প্রভাত হইতে দিদিমাকে দেখিবার জন্য তিনি গঙ্গাতীরে গেলেন। তখন তাঁহার শেষ মুহূর্ত— লোকেরা তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া গঙ্গাগর্ভে নামাইয়াছে এবং উচ্চৈঃস্বরে "গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম" নাম ডাকিতেছে। দিদিমা তাঁর হাতখানি বুকে রাখিয়া "হরিবোল" বলিয়া একটি অঙ্গুলি উপরের দিকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে ইহলোক হইতে চলিয়া গেলেন। দেবেন্দ্রনাথের বোধ হইল যেন মরিবার সময়েও তিনি ঈশ্বর ও পরকালের দিকে আঙুল দিয়া নির্দেশ করিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া দিয়া গেলেন। তিনি যেমন তাঁহার "ইহলোকের বন্ধু ছিলেন, তেমনি পরকালেরও বন্ধু।"

শ্মশানে দেবেন্দ্রনাথের এই যে দ্বিতীয় অধ্যাত্ম উদ্‌বোধন, এও কি আকস্মিক? এরও কি শুধু একটা মৃত্যুর উপরে নির্ভর ছিল? আমার তো তাহা মনে হয় না। সেই যে অল্প বয়সে অনন্ত আকাশ দেখিয়া তাঁহার প্রথম উদ্‌বোধন হইয়াছিল, ভোগবিলাসের আমোদের মধ্যে কিছুকালের মতো তাহা চাপা পড়িয়া গেলেও অব্যক্তচেতনলোকে তাহার কাজ নিশ্চয়ই চলিতেছিল। যেমন মৃত্যুর আঘাত পৌঁছিল, অমনি সেই চৈতন্যের অগোচর লোকের গোপন ক্রিয়া গোচর হইয়া সমস্ত চৈতন্যকে একমুহূর্তে উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিল। ভোগস্পৃহা সেই মুহূর্তেই কোথায় ভাসিয়া গেল। এক অনুভূতপূর্ব আশ্চর্য আনন্দ মনে আসিল। বাহিরে অনন্ত আকাশ দেখিয়া তাঁহার মনের মধ্যে একদিন অনন্তের উদ্‌বোধন হইয়াছিল, এখন মৃত্যুর আঘাতে বাহিরের সেই উদ্‌বোধন, অনন্ত আকাশে তেজোময় অমৃতময় সর্বানুভূ পুরুষের সত্তার সেই আশ্চর্য অনুভূতি, অন্তরে অনির্বচনীয় আনন্দরূপে নূতন করিয়া প্রকাশ পাইল। বাহিরে ইন্দ্রিয়ের স্থূল আবরণের একদিন মোচন হইয়াছিল; অন্তরের স্থূল বিষয়বাসনার আবরণ এখন ছিন্ন হইয়া গেল।

যথাসময়ে দিদিমার শ্রাদ্ধ সমারোহের সঙ্গে সাঙ্গ হইল। কয়দিন খুব গোলমালে কাটিয়া গেল। তার পরে সেই মৃত্যুর পূর্বরাত্রের আনন্দকে পাইবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ একদিন চেষ্টা করিয়া দেখেন, তাহা আর নাই! এক ঘন বিষাদ আসিয়া তাঁহার মনকে ছাইয়া ফেলিয়াছে।

এ আনন্দ ক্ষণস্থায়ী হইলেও, সমস্ত চৈতন্যের এই উদ্‌বেল অবস্থা সত্য নয় এ কথা বলিবার জো নাই। অবশ্য ইহা ঠিক যে, মনের তারগুলিকে সপ্তমে চড়া করিয়া বাঁধিলে, মন অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেই চড়া সুরকে রক্ষা করিতে পারে না এবং কিছুকাল পরে তাহার পুরানো অনুভূতির নীচের স্বরগ্রামে নামিয়া

পড়ে। অথচ তখন তাহার নীচের ঢিমে সুর কোনোমতেই ভালো লাগে না, সে চায় সেই উন্নত গ্রামের পরিপূর্ণ সুর। এইজন্য ঐ রকমের ভরপুর উদ্‌বেল আনন্দ মানুষের পক্ষে অস্বাভাবিক বলিয়াই উহার উপলব্ধিকে সত্যের উপলব্ধি নয় বলিয়া সন্দেহ হয়। অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুৎচমক যতই মনোহর হউক, অন্ধকারের পরে স্থির অচঞ্চল আলোব প্রকাশ যেমন পরিপূর্ণ, বিদ্যুৎচমকের প্রকাশ কখনোই তেমনটি নয়।

কিন্তু আমার এ কথা মনে হয় না। আমার মনে হয়, সমস্ত সাধনার পরিণামে যে অবস্থাটি হইবে, একেবারে আরম্ভেই কেহ কেহ যেন তাহার আভাস পায়। নানা বাধা পার হইয়া, তিলে তিলে আপনার সমস্ত হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া যে একটি আনন্দময় পরিণাম সাধক লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন, হঠাৎ একদিন সেই পরিণামের ছবি অভাবনীয় রূপে দেখা দেয়। এ যেন সেই জাদুকরের আমের আঁটি পুঁতিয়া তাহাতে মায়াযষ্টি বুলাইবামাত্র তাহা হইতে গোটা একটি ফলবান্ আমের গাছ দেখাইবার মতো ব্যাপার। কেন এই কথা মনে হয়, তাহার আরো কারণ এই যে, দেবেন্দ্রনাথ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে একদিন বলিয়াছিলেন—'তুমি আমার ধর্মজীবনের নিগূঢ় একটি রহস্য যদি জানিতে চাও, তবে আমি বলি যে, সেই শ্মশানে বসিয়া যে আনন্দকে আমি পাইয়াছিলাম, তাহাকেই চিরকাল আমি খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। যখনি কোন আনন্দের উপলব্ধি হয়, অমনি ভাবি, বুঝি সেই আনন্দকে পাইলাম।' আত্মচরিতে তিনি ভাগবত হইতে নারদের যে উপাখ্যান বলিয়া তাহার সঙ্গে নিজের অবস্থার তুলনা করিয়াছেন, তাহা হইতেও এ কথার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। নারদ মুহূর্তের জন্য ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া যখন ঘোর বিষাদের মধ্যে পড়িলেন, তখন দৈববাণী শুনিলেন, 'যাহাদের চিত্তের মল ক্ষালিত হয় নাই, যাহারা যোগে অসিদ্ধ, তাহারা আমাকে দেখিতে পায় না। আমি যে একবার তোমাকে দেখা দিলাম, ইহা কেবল তোমার অনুরাগবৃদ্ধির জন্য।'

অবশ্য এই ক্ষণস্থায়ী আনন্দের পরে যে বিষাদ আসে, সে ভয়ংকর। "স্বপ্নের কৃপায়, অন্ধে আঁখি পায়, ঐশ্বর্যে কাঁপিয়া উঠে দরিদ্র অভাগা"— কিন্তু যে দরিদ্র স্বপ্নে হাতের কাছে আকাশের চাঁদ পাইয়াছে, স্বপ্নের শেষে সে চাঁদ সে যখন হারায়, তখন তাহার মতো দুঃখী পৃথিবীতে আর কে আছে! সম্পূর্ণতার একবার স্বাদ পাইলে, তখন যে সত্য আগে সত্য ছিল, যে-সব বস্তু আগে

বাস্তবিক ছিল, তাহারা মিথ্যা ও মায়া হইয়া যাইবে না? সেইজন্য দেখিতে পাই যে, পিতামহীর মৃত্যুর পর একদিন হঠাৎ তিনি "কল্পতরু" হইয়া যে যাহা-কিছু চাহিল, তাহাকে তাহাই দিয়া ফেলিলেন। তাঁহার জ্যেঠার ছেলে ব্রজবাবু জরির পোশাক, ভালো ভালো ছবি, দামী দামী গৃহসজ্জা সমস্ত মুটের মাথায় করিয়া একদিন লইয়া গেলেন। এ-সব বস্তু যে আগে কত বাস্তবিক ছিল, কিন্তু এখন ইহারা একেবারে ছায়ার মতো শূন্য পদার্থ হইয়া গিয়াছে। যে জগতে পূর্বে বাস করিতেছিলেন, সে জগৎ হইতে চিত্ত আল্‌গা হইয়া আসিয়াছে—চিত্ত তাহার ভিতরে থাকিয়াও আর ভিতরে নাই। "বিষয়ের প্রলোভন আর নাই, কিন্তু ঈশ্বরের ভাবও কিছুই পাইতেছি না; পার্থিব ও স্বর্গীয়, সকল প্রকার সুখেরই অভাব। জীবন নীরস, পৃথিবী শ্মশানতুল্য।" এ যে কি ভয়ংকর অবস্থা তাহা কল্পনা করিতে পারাও কঠিন। এক-একদিন কৌচে পড়িয়া আছেন, ভৃত্য আসিয়া কখন আহার করাইয়া গিয়াছে তাহা মনে নাই —মনে হইয়াছে বুঝি সমস্ত দিনই কৌচে পড়িয়া আছেন। কখনো কখনো দুপুরে একলা শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনে চলিয়া গিয়াছেন। সেখানে একটি সমাধিস্তম্ভ[১] ছিল, তাহাতে গিয়া বসিয়া আছেন। মনে বড়ো বিষাদ। চারি দিক অন্ধকার দেখিতেছেন। সেই সময় তাঁহার মুখ দিয়া হঠাৎ এই গানটি বাহির হইল—

বেহাগ রাগিণী

হবে কি হবে দিবা-আলোকে জ্ঞান বিনা সব অন্ধকার।
গত হল আয়ু, নাহি গেল জানা, কেমনে তাঁরে জানিবে বল না॥

সেই স্মৃতিস্তম্ভে বসিয়া একলা গলা ছাড়িয়া এই গানটি তিনি গাহিতেন। এই তাঁহার প্রথম গান। তখন মনের এমন ভয়ংকর বিষাদ যে, "দুই প্রহরের সূর্যের কিরণ-রেখা-সকল যেন কৃষ্ণবর্ণ বোধ হইত।" কি আশ্চর্য! কতখানি প্রচণ্ড মনের বিষাদ হইলে মানুষ স্থূল চক্ষে দুপরের শুভ্র সূর্যকিরণকে কালো দেখিতে পারে! এমন কথা কে কবে শুনিয়াছে! ইহার মধ্যে যে কিছুমাত্র অতিশয়োক্তি নাই তাহা এইজন্য বুঝা যায় যে, বৃদ্ধবয়সে তিনি এই আত্মচরিত মুখে বলিয়া যাইতেন এবং প্রিয়নাথ শাস্ত্রী কিম্বা হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাহা লিখিয়া লইতেন। সে বয়সে কবিত্ব করিয়া আপনার দুঃখ সম্বন্ধে অলংকারের

১ বস্তুত ইহা রবার্ট কিড সাহেবের স্মৃতিস্তম্ভ।

আতিশয্য প্রয়োগ করা তাঁহার পক্ষে কোনোমতেই সম্ভাবনীয় ছিল না। এক কার্লাইলের সার্টার রিসার্টাসের 'Everlasting No' 'চিরন্তন না' নামক অধ্যায় ছাড়া চিত্তের রিক্ততা ও বিষাদের অবস্থার এমনতর বর্ণনা আর কোথাও দেখিয়াছি কি না সন্দেহ।

চিত্তের এই নিবিড় বিষাদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য প্রায়ই সাধকেরা ত্যাগব্রত গ্রহণ করে। কেহ বা ভিতরের দুঃখকে ভুলিবার জন্য বাহিরে শরীরকে পীড়া দিয়া নানা রকম কৃচ্ছ্রসাধনে লাগিয়া যায়। বিশেষভাবে খৃস্টান সাধু ও সাধ্বীদের জীবনে এটা দেখা যায়। সেণ্ট টেরেসা প্রভৃতির জীবনে কৃচ্ছ্রসাধনের চূড়ান্ত দেখা গিয়াছে। সেণ্ট ফ্রান্‌সিস্ সমস্ত বিলাইয়া ফকিরী ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। কুষ্ঠরোগীদের সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া ভিতরের আধ্যাত্মিক দৈন্য হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য তিনি যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু এ-সকল দৃষ্টান্তের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত একেবারেই মেলে না। দেবেন্দ্রনাথ এই বিষাদের দ্বারা চালিত হইয়া সেবাব্রত বা কৃচ্ছ্রসাধন-ব্রত কিছুই গ্রহণ করিলেন না। সেও তো অভাবাত্মক সাধনা— তাহাতে আধ্যাত্মিক দৈন্য মোচনের সম্ভাবনা কোথায়? যথার্থ জ্ঞান না হইলে এ দৈন্য কোনোদিন দূর হইবার নয়— এই কথা নিশ্চিত বুঝিয়া জ্ঞানের সাধনায় দেবেন্দ্রনাথ মন দিলেন। সংস্কৃত শিখিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। বাড়িতে একজন সভাপণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার নাম কমলাকান্ত চূড়ামণি। তিনি যেমন পণ্ডিত তেমনি তেজস্বী লোক ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথকে তিনি ভালোবাসিতেন এবং দেবেন্দ্রনাথও তাঁহাকে ভক্তি করিতেন। দেবেন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিক ক্ষুধায় তাঁহার কাছে সংস্কৃত শিখিতে লাগিলেন— মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়া শুরু করিয়া দিলেন। চূড়ামণি তাঁহার ছেলে শ্যামাচরণকে দেবেন্দ্রনাথ চিরকাল প্রতিপালন করিবেন, এই প্রতিজ্ঞাটি একটি কাগজে লিখিয়া দেবেন্দ্রনাথের দ্বারা তাহা সই করাইয়া লইলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে, শ্যামাচরণ সেই স্বাক্ষরটুকু লইয়া আসিলেন এবং দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার কাছে সংস্কৃত শিখিতে লাগিলেন। সংস্কৃত ভাষায় কিছু অধিকার হইলে, তিনি শ্যামাচরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন— ঈশ্বরের তত্ত্বকথা কোন্ গ্রন্থে পাওয়া যায়? শ্যামাচরণ বলিলেন— মহাভারতে। অমনি দেবেন্দ্রনাথ মহাভারত পড়িতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন— "এখন তো ঐ বৃহৎ গ্রন্থ অনুবাদিত হইয়া অনেকের পাঠ্য হইয়াছে, কিন্তু তখনকার কালে ঐ মূল গ্রন্থ অল্প লোকেই পাঠ করিত। আমি ধর্মপিপাসায় উহার অনেকাংশ পাঠ করি।

"একদিকে যেমন তত্ত্বান্বেষণের জন্য সংস্কৃত, তেমনি অপর দিকে ইংরাজী। আমি য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্র বিস্তর পড়িয়াছিলাম।"

আমি বলিয়াছি, হিন্দুকালেজের ছাত্রদিগের মধ্যে হিউমের সংশয়বাদ বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথের লেখা হইতে বেশ মনে হয় যে, তিনি এ সময়ে লক্ ও হিউমের দর্শনশাস্ত্রের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। হিন্দুকালেজের ছাত্র বলিয়া হিউমের দর্শনশাস্ত্রের কথা জানা তাঁহার পক্ষে তো খুবই সম্ভব ছিল। যাহাই হোক্, ইউরোপীয় দর্শন আলোচনা করিয়া তিনি দুইটি তত্ত্ব পাইলেন: ১. "প্রকৃতির অধীনতাই··· মনুষ্যের সর্বস্ব··· এই পিশাচী প্রকৃতির হস্তে কাহারও নিস্তার নাই।" ২. "যেমন ফটোগ্রাফের কাচপাত্রে সূর্যকিরণের দ্বারা বস্তু প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা মনের মধ্যে বাহ্যবস্তুর একটা অবভাস হয়। ইহাই তো জ্ঞান।"

প্রথম তত্ত্বটি কোথা হইতে তিনি সংগ্রহ করিলেন? ডিরোজিয়োর ছাত্রগণ হিউমের দর্শন ছাড়া ফরাসী Illumination শ্রেণীর তত্ত্বজ্ঞানীদের রচনারও সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। ভল্টেয়ার, রুশো, ডিডিরো, ডি. আলেমবার্ট, লা মেট্রি প্রভৃতি লেখকদের রচনা তখন বোধ হয় তাঁহাদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। জানি না লা মেট্রির 'সিস্‌টেম্ দে লা নেচার' (*Systeme de la Nature*)-নামক বিখ্যাত জড়বাদী গ্রন্থ হইতে প্রথম তত্ত্বটি তিনি পাইয়াছিলেন কি না। এই ফরাসীস লেখক একেবারে বিশুদ্ধ জড়বাদী ছিলেন। ঈশ্বর, আত্মা, ধর্ম সমস্ত উড়াইয়া দিয়া ইনি জড়ের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ এ সময়ে নিশ্চয় এই জাতীয় কোনো রচনা পড়িয়া থাকিবেন। কারণ তিনি লিখিতেছেন—"প্রকৃতির অধীনতাই কি মনুষ্যের সর্বস্ব? তবে তো গিয়াছি। এই পিশাচীর পরাক্রম দুর্নিবার।···এই পিশাচী প্রকৃতির হস্তে কাহারও নিস্তার নাই। ইহার নিকট নতশিরে থাকাই যদি চরম কথা হয়, তবে তো গিয়াছি। আমাদের আশা কৈ, ভরসা কৈ?"

দ্বিতীয় তত্ত্বটি স্পষ্টই মনে হয় লক্ ও হিউমের দর্শনের কথা। লক্ বলেন যে, আমাদের মধ্যে কোনো সহজাত ভাব (Innate ideas) নাই—আমাদের মনটা একটা *tabula rasa* বা শূন্য পাতার মতো, তাহাতে কোথাও কোনো আঁচড় পড়ে নাই। সুতরাং আমাদের যাহা-কিছু জ্ঞান সে সমস্তই অভিজ্ঞতার দ্বারা আমরা পাই। মানসপ্রকৃতির মধ্যে অন্তর্নিহিত রূপে কিছুই নাই। মনটা যেন একটা আয়না, তাহাতে বহির্জগতের অবভাস হইতেছে এবং তাহা

হইতে সে এক দিক দিয়া বাহ্য বস্তুসকলের জ্ঞান লাভ করিতেছে, অন্য দিক দিয়া আপনার ভিতরকার মানসক্রিয়া সম্বন্ধেও জ্ঞান লাভ করিতেছে।

হিউমের মতে বাহিরের বিষয়রাজ্যে এমন কিছুই নাই যাহা একেবারে গোড়ায় আমাদের ইন্দ্রিয়বোধের মধ্যে নাই। যেমন ধরো, আমি বলিতেছি অগ্নির দাহিকাশক্তি আছে। কিন্তু ইহাকে বাহিরের বিষয়রাজ্যের সত্য বলিয়া নির্দেশ করিবার কোনো উপায় নাই। কেননা, আমি যতবার ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অগ্নিকে দেখিয়াছি, ততবারই তাহার দাহিকাশক্তির পরিচয় পাইয়াছি। সুতরাং আমার ইন্দ্রিয়বোধের বাহিরে অগ্নির দাহিকাশক্তি আছে কি না তাহা জানিব কেমন করিয়া? অতএব ইন্দ্রিয়বোধের সাক্ষ্য ভিন্ন বিষয়রাজ্যে কোনো ব্যাপার সকল স্থানে, সকল অবস্থায়, সকল কালে যে সমান ঘটিবে এমন কথা বলা চলে না। অতএব কার্য-কারণের নিয়ম যে একটা বিশ্বনিয়ম এ কথা বলা চলে না। শুধু তাই? অহং বা আমি-বোধও একটি নিত্য বোধ নয়। তাহা ভিন্ন ভিন্ন ক্ষণিক বোধের একটি কাল্পনিক সমষ্টি মাত্র।

ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্র হইতে এই যে-দুটি তত্ত্ব তিনি পাইলেন, ১. প্রকৃতির অধীনতাই মানুষের সর্বস্ব, এবং ২. বাহ্য-ইন্দ্রিয়দ্বারা মনের মধ্যে বাহ্যবস্তুর যে অবভাস হয় তাহাই জ্ঞান—এই দুই তত্ত্বই তাঁহাকে কোনো আশ্বাস দিতে পারিল না। তিনি চান জ্ঞানের আলোকে ঈশ্বরকে জানিতে—এই সংশয়বাদ আর জড়বাদ তাঁহাকে কি তৃপ্তি দিতে পারে? তিনি ঠিকই লিখিয়াছেন যে, "একজন নাস্তিকের নিকট এইটুকুই যথেষ্ট; সে প্রকৃতি ছাড়া আর কিছু চায় না।" সুতরাং সংস্কৃতশাস্ত্র ও ইংরাজীশাস্ত্র পড়িয়াও তাঁহার মনের বিষাদ সমানই থাকিয়া গেল। এ সময়ে তাঁহার আধ্যাত্মিক ক্ষুধা ও যথার্থ জ্ঞানের জন্য আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা যে কি পরিমাণ ছিল, তাহা তাঁহার একটি কথা হইতে বুঝা যায়। তিনি লিখিয়াছেন—"এক একবার ভাবিতাম, আমি আর বাঁচিব না।" "হবে কি হবে দিবা-আলোকে, জ্ঞান বিনা সব অন্ধকার।"—বাস্তবিকই জ্ঞান ভিন্ন তখন তাঁহার কাছে দিবালোক কালো, জীবন একেবারে শূন্য। কার্লাইল তাঁর 'Everlasting No' অধ্যায়ে এই অবস্থার কথাই বলিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন, এই শূন্যতার অবস্থায় "সমস্ত জগৎটা আমার কাছে জীবনহীন উদ্দেশ্যহীন, গতিহীন, এমন-কি কোনো রকমের বন্দ্বভাবশূন্য বলিয়া বোধ হইত। জগৎটা যেন একটা প্রকাণ্ড, মৃত, অপরিমেয় স্টীম ইঞ্জিনের মতো উদাসীনভাবে গড়াইয়া গড়াইয়া চলিয়াছে এবং আমাকে প্রতি অঙ্গে অঙ্গে গুঁড়া

করিয়া পিষিয়া ফেলিতেছে।" এই 'না'র অবস্থার মতো ভীষণ অবস্থা মানুষের আর-কিছু হইতে পারে না। তখন সমস্তটাই একটা বিরাট না, কিছু না, ফাঁকা, অন্ধকার!

দেবেন্দ্রনাথ দার্শনিক না হইয়াও দর্শনশাস্ত্রের কোনো কোনো মূলতত্ত্ব কেবলমাত্র নিজের জ্ঞানের সাহায্যেই কেমন করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। তাঁহার আত্মজীবনীতে তিনি লিখিতেছেন, "এই বিষাদ অন্ধকারের মধ্যে ভাবিতে ভাবিতে, বিদ্যুতের ন্যায় একটা আলোক চমকিত হইল। দেখিলাম, বাহ্য ইন্দ্রিয়দ্বারা রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শের যোগে বিষয়-জ্ঞান জন্মে। কিন্তু এই জ্ঞানের সহিত, আমি যে জ্ঞাতা, তাহাও তো জানিতে পারি। দর্শন স্পর্শন আঘ্রাণ ও মননের সহিত, আমি যে দ্রষ্টা স্প্রষ্টা ঘ্রাতা ও মন্তা, এ জ্ঞানও তো পাই। বিষয়জ্ঞানের সহিত বিষয়ীর বোধ হয়; শরীরের সহিত শরীরীকে জানিতে পারি।

"আমি অনেক অনুসন্ধানে সর্বপ্রথমে এই আলোকটুকু পাই; যেন ঘোর অন্ধকারাবৃত স্থানে সূর্যকিরণের একটি রেখা আসিয়া পড়িল!"

এই নূতন সিদ্ধান্তে—ইন্দ্রিয়দ্বারা মনের মধ্যে বাহ্য বস্তুর যে অবভাস হয় তাহাই জ্ঞান, সেই তত্ত্ব একেবারে খণ্ডিত হইয়া গেল, কারণ বিষয়জ্ঞানের সঙ্গে বিষয়ীরও জ্ঞান পাওয়া যায় দেখা গেল। এই সিদ্ধান্তটি একেবারে ঔপনিষদ দর্শনের জিনিস। কারণ ঔপনিষদ দর্শনে আত্মা দ্রষ্টা স্প্রষ্টা ঘ্রাতা ও মন্তা; কিন্তু তাহার নিজের রূপ রস গন্ধ স্পর্শ নাই। উপনিষদে এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে যে গল্প আছে তাহা দেবেন্দ্রনাথ তখন জানিতেন না, কারণ উপনিষদের অস্তিত্বই তিনি তখন জানিতেন না। তিনি যে আপনার জ্ঞানের সাহায্যে ঔপনিষদ দর্শনের সিদ্ধান্তে গিয়া পৌছিয়াছিলেন, এ কথাটা জানিলেই আমাদের পক্ষে বোঝা সহজ হয় যে, যখন দেবেন্দ্রনাথ হঠাৎ একসময়ে উপনিষদের পরিচয় পাইলেন, তখন কেন তাঁহার সমস্ত মন তাহাতে সায় দিয়া উঠিয়াছিল। যাক, উপনিষদের সে গল্পটি এই: জনকের সভায় উষস্তি চাক্রায়ণ যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিয়াছিলেন—'যেমন লোকে অঙ্গুলিদ্বারা নির্দেশ করিয়া দেখায়, এই অশ্ব, এই গো, সেইরূপ সর্বান্তর্যামী পরব্রহ্মকে দেখাও।' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন 'আমি তো বলিয়াছি তোমার যে আত্মা তাহাই সকলের আত্মা।' উষস্তি বলিলেন 'কোন্‌টি সকলের আত্মা আমাকে বিশেষ করিয়া দেখাও।' তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন 'দৃষ্টিকার্যের দ্রষ্টাকে দৃষ্টির দ্বারা দেখা যায় না, শ্রবণ-কার্যের শ্রোতাকে শ্রবণের

দ্বারা শোনা যায় না, মননকার্যের মন্তাকে মননের দ্বারা মনন করা যায় না, ইত্যাদি।'

প্রকৃতির শাসন যে সর্বস্ব, ইউরোপীয় জড়বাদ-দর্শনের সেই তত্ত্বের বিরুদ্ধে দেবেন্দ্রনাথ নিজের জ্ঞানের আলোচনায় আর-এক নূতন সিদ্ধান্তে পৌঁছিলেন। তিনি লিখিতেছেন—"জ্ঞানের প্রভাব বিশ্বসংসারে সর্বত্র দেখিতে পাই। আমাদের জন্য চন্দ্র সূর্য নিয়মিতরূপে উদয়াস্ত হইতেছে; আমাদের জন্য বায়ু বৃষ্টি উপযুক্তরূপে সঞ্চালিত হইতেছে; ইহারা সকলে মিলিয়া আমাদের জীবন-পোষণের একটি লক্ষ্য সিদ্ধ করিতেছে। এইটি কাহার লক্ষ্য? জড়ের তো লক্ষ্য হইতে পারে না, চেতনেরই লক্ষ্য। অতএব একটি চেতনাবান পুরুষের শাসনে এই বিশ্বসংসার চলিতেছে।··· তিনিই সেই প্রয়োজন-বিজ্ঞানবান ঈশ্বর, যাঁহার শাসনে জগৎসংসার চলিতেছে।" এটিও ঔপনিষদ দর্শনের তত্ত্ব। উপনিষদে আছে যে, ঈশ্বর শাশ্বতকাল হইতে যথাতথরূপে সকল প্রয়োজনের বিধান করিতেছেন। পাশ্চাত্ত্য ধর্মতত্ত্বেও এই প্রয়োজন-বিজ্ঞানের যুক্তিকে বলে Design argument—প্রকৃতির মধ্যে জীবনপোষণের যে লক্ষ্য দেখা যায়, তাহা জড়ের লক্ষ্য নয়, চেতনেরই লক্ষ্য। ঈশ্বর সেই প্রয়োজন-বিজ্ঞানবান (Intelligent Designer)।

ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রের দুইটি তত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে দেবেন্দ্রনাথ আপনা হইতেই এই দুইটি সিদ্ধান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অথচ এই দুই সিদ্ধান্ত যে উপনিষদের মধ্যে অথবা অন্য কোনো বইয়ের ভিতরে পাওয়া যাইবে, তাহার কল্পনাও তখন তাঁহার মনে আসে নাই। যাহাই হউক, এইটুকু জ্ঞানের আলোক ফোটামাত্র বিষাদের অন্ধকার অনেকটা কাটিয়া গেল। তিনি সুস্থ হইলেন ও আরাম বোধ করিলেন।

তখন প্রথম বয়সে দেবেন্দ্রনাথ যে অনন্ত আকাশ হইতে অনন্তের পরিচয় পাইয়াছিলেন একদিন তাহা হঠাৎ আবার মনে পড়িয়া গেল। তিনি তখন একান্ত একাগ্রতার সঙ্গে অনন্ত আকাশের পানে চাহিয়া দেখিলেন। সেই মুহূর্তে তাঁহার জ্ঞানোজ্জ্বল দৃষ্টিতে এই সত্যটি প্রকাশ পাইল যে, ঈশ্বর "হাত দিয়া এ বিশ্ব গড়ান নাই; কেবল আপনার ইচ্ছার দ্বারা এই জগৎ রচনা করিয়াছেন।" তিনি অনন্তজ্ঞানস্বরূপ বলিয়াই "তাঁহার ইচ্ছাকে কেহ বাধা দিতে পারে না।" সেইজন্য তাঁহাকে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রচনা করিতে হয় না, তিনি ইচ্ছার দ্বারা সৃষ্টি করেন। তিনি সৃষ্টিকর্তা বলিয়া সৃষ্টির দ্বারা বাধিত নহেন। সৃষ্ট

বস্তু-সকল পরিণামী, কিন্তু তিনি অপরিবর্তনীয়। তাহা না হইলে সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার ভেদ থাকে না, দুজনে এক হইয়া যায়। "তিনিই নিত্য, অবিকৃত, অপরিবর্তনীয় ও স্বতন্ত্র।"

উপনিষদের অস্তিত্ব না জানিয়াই, সমস্ত উপনিষদের সার কথাগুলি এমনি করিয়া নিজের বুদ্ধির আলোচনার দ্বারা দেবেন্দ্রনাথ স্থির করিলেন। তিনি প্রথম স্থির করিলেন যে, জগতের ক্রিয়াসকল এক লক্ষ্য সিদ্ধ করিতেছে—এক চেতনাবান পুরুষের শাসনে ইহারা বাঁধা। উপনিষদে এই কথাই আছে—এতস্যবা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ, এতস্যবা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোন্যানদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোন্যাঃ : এই অক্ষর পুরুষের শাসনে, হে গার্গি, সূর্যচন্দ্র-বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে। অনেকানেক পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী নদী শ্বেত পর্বতসকল হইতে নিঃসৃত হইতেছে। তার পরে তিনি স্থির করিলেন ঈশ্বর উপকরণ সংগ্রহ করিয়া এ জগৎ গড়েন নাই, এ তাঁহার সৃষ্টি।—তাঁহার অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত ইচ্ছার দ্বারা ইহা সৃষ্ট হইয়াছে। উপনিষদে এই কথাই আছে— স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ। তিনি আলোচনা করিলেন, আলোচনা করিয়া এই সমুদয় যাহা-কিছু সৃষ্টি করিলেন। তার পরে দেবেন্দ্রনাথ স্থির করিলেন যে, সৃষ্ট বস্তুসকল অনিত্য, বিকারী, পরিবর্তনশীল ও পরতন্ত্র হইলেও সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং নিত্য, অবিকৃত, অপরিবর্তনীয় ও স্বতন্ত্র। সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে ভেদ আছে—কারণ স্রষ্টা নিজ সৃষ্টির দ্বারা বাধিত নহেন। তিনি মুক্ত। উপনিষদে এই কথাই আছে—স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্। কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। তিনি সর্বব্যাপী, নির্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ব্রণরহিত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ; তিনি কবি, এই জগৎ তাঁহার রচনা; তিনি মনের নিয়ন্তা, তিনি সকলের প্রভু ও তাঁহার কেহ প্রভু নাই; তিনি শাশ্বতকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থসকল বিধান করিতেছেন।

এই তো দেখিতেছি, এইখানেই পরবর্তীকালে তাঁহার সংকলিত 'ব্রাহ্মধর্মঃ' গ্রন্থের সকল তত্ত্বগুলি ক্রমান্বয়ে উপনিষদ্ পড়ার অনেক আগে তিনি জ্ঞানের আলোচনার দ্বারা বুঝিতে পারিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "কত সাধনার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম। তথাপি আমার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। জ্ঞান-পথ অতি দুর্গম পথ; এ পথে সাহস দেয় কে? আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত

হইলাম, তাহাতে সায় দেয় কে? কিরূপ সায়? যেমন পদ্মার মাঝির নিকট হইতে আমি একটা সায় পাইয়াছিলাম, সেইরূপ সায়।”

একবার কালীগ্রাম হইতে বোটে করিয়া বাড়ি ফিরিবার সময়, পথে পদ্মায় অত্যন্ত ঝড় হয়। মাঝিরা নৌকা কিনারায় বাঁধিয়া ফেলিল। কিন্তু বাড়ি ফিরিবার ইচ্ছা প্রবল হওয়ায় বাতাসের বেগ একটু কমামাত্র দেবেন্দ্রনাথ মাঝিকে নৌকা ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। মাঝি হুকুম পাইয়াও নৌকা ছাড়ে না। খোঁজ লইয়া জানিলেন যে, দেওয়ানজির নিষেধের জন্য মাঝি নৌকা ছাড়িতে ভয় পাইতেছিল। দেবেন্দ্রনাথ তাহাকে পুনরায় নৌকা ছাড়িবার হুকুম দিতে সে নৌকায় যেমনি পাল তুলিয়া দিল ও নৌকা পদ্মার মাঝখানে গিয়া পড়িল, অমনি সমস্ত তীরের নৌকাগুলি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—যাবেন না। তখন ফিরিবার উপায় নাই—উন্মত্ত তরঙ্গের উপর দিয়া নৌকা চলিল। এমন সময় একটা ডিঙি আসিতেছিল, তাহার মাঝি চীৎকার করিয়া বলিল—“ভয় নাই, চলে যান”।

সেই রকমের সায় চাই। অধ্যাত্ম তত্ত্বসকল তাঁহার মধ্যে স্ফুরিত হইয়াছে, কিন্তু তাহারা যে সত্য তাহার কোনো সাক্ষ্য না পাওয়া পর্যন্ত মন তো নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। অনুমান বা তর্কের দ্বারা যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইল, তাহার প্রামাণ্য যখন শাস্ত্রের মধ্য হইতে পাওয়া যায়, তখন সেই জ্ঞানের বস্তুতন্ত্রতা সম্বন্ধে আর সংশয় থাকে না। সুতরাং একটা সাক্ষ্য বা সায় চাইই চাই।

ঈশ্বরের শরীর নাই এই ধারণা হইবার সঙ্গে সঙ্গে আজন্মের সংস্কার পৌত্তলিকতার উপরে দেবেন্দ্রনাথের ভারি বিদ্বেষ হইল। তখন তাঁহার বাল্যগুরু রামমোহন রায়ের স্মৃতি তাঁহার মনে পড়িল। মনে পড়িল, একবার দুর্গোৎসবে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতে যখন তিনি যান, তখন রামমোহন রায় বলিয়াছিলেন, “বেরাদর, আমাকে কেন?” তিনি সংকল্প করিলেন যে, রামমোহন রায়ের মতো তিনি প্রতিমাপুজায় যোগ দিবেন না। ভাইদের লইয়া দেবেন্দ্রনাথ ছোটোখাটো একটি বিদ্রোহী দল তৈরি করিলেন। সন্ধ্যাবেলায় বাড়ির পুজার দালানে আরতির সময় যখন দ্বারকানাথ ঠাকুরদালানে যাইতেন, তখন তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া দালানে যাইতে হইত। সকলে প্রণাম করিত; তাঁহারা প্রণাম করিতেন না। কেহ দেখিতে পাইত না।

আমি বলিয়াছি যে, দেবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে সংস্কৃত শিখিতে-ছিলেন। সংস্কৃতশাস্ত্রে তাঁহার এই নূতন সিদ্ধান্তগুলির কোনো সায় পান কি না,

এই ছিল তাঁহার লক্ষ্য। খুঁজিয়া খুঁজিয়া কোথাও যখন কিছুই পান না, তখন তাঁহার মনে এক ভুল ধারণা হইল যে, সংস্কৃত সকল শাস্ত্রই বুঝি পৌত্তলিকতার শাস্ত্র। তিনি বড়োই নিরাশ হইয়া পড়িলেন।

কিন্তু ঈশ্বর নিজেই তাঁহাকে সায় দিলেন। কেমন করিয়া দিলেন সে ঘটনাটি শুনিলে তাহাকে নিতান্তই দৈব ঘটনা বলিয়া মনে হইতে পারে। তাহাতে ঈশ্বরেরই হাত দেখিতে পাওয়া যায়। সে সম্বন্ধে আর কোনো অবিশ্বাস থাকে না। ঘটনাটি এই : একদিন হঠাৎ দেবেন্দ্রনাথ সংস্কৃত বইয়ের একটি ছেঁড়া পাতা তাঁহার সামনে দিয়া উড়িয়া যাইতে দেখিলেন। ঔৎসুক্যবশত তাহা তখনি ধরিলেন। সংস্কৃত হইলেও তাহাতে যাহা লেখা ছিল তাহার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তিনি শ্যামাচরণ পণ্ডিতকে তাহার অর্থ করিতে দিলেন এবং তখন ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কাজ করিতেন বলিয়া সেখানে তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলেন। বেলা দশটা হইতে সেখানে তাঁহাকে হাজির থাকিতে হইত এবং ক্যাশ বুঝাইয়া দিতে কখনো কখনো রাত্রি দশটা বাজিয়া যাইত। দ্বারকানাথ ঠাকুর যুবক দেবেন্দ্রনাথকে বিষয়-কর্মে পাকা করিবার জন্য এই হিসাবের কাজে তাঁহাকে লাগাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সেদিন ক্যাশ বুঝাইয়া দিবার দেরি সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি তাড়াতাড়ি ছুটি লইয়া বাড়ি ফিরিলেন। শ্যামাচরণ পণ্ডিতের কাছে সেই পাতায় লেখা সংস্কৃত বাক্যের মানে জানিবার জন্য মনের মধ্যে একটা ছটফটানি উপস্থিত হইল। শ্যামাচরণ বলিলেন, তিনি তাহার মানে বুঝিতে পারেন নাই। তিনি অনুমান করিলেন যে, এ-সব ব্রহ্মসভার কথা— ব্রহ্মসভার রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ হয়তো বুঝাইতে পারিবেন। বিদ্যাবাগীশকে ডাকা হইল। তিনি পাতা পড়িয়া বলিলেন— এ যে ঈশোপনিষদের পাতা।

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং॥

ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত জগৎকে আচ্ছাদন করো। তিনি যাহা দান করিয়াছেন তাহাই উপভোগ করো। অন্য কাহারো ধনে লোভ করিয়ো না।

দেবেন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, "আমি মানুষের নিকট হইতে সায় পাইতে ব্যস্ত ছিলাম, এখন স্বর্গ হইতে দৈববাণী আসিয়া আমার মর্মের মধ্যে সায় দিল— আমার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইল। আমি ঈশ্বরকে সর্বত্র দেখিতে চাই; উপনিষদে কি পাইলাম? পাইলাম যে, 'ঈশ্বর দ্বারা সমুদয় জগৎকে আচ্ছাদন কর।'...আমি যাহা চাই তাহাই পাইলাম।

"এমন আমার মনের কথা আর কোথাও হইতে শুনিতে পাই নাই।...আহা! কি কথাই শুনিলাম,—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'—তিনি যখন দান করিয়াছেন তাহাই উপভোগ কর। তিনি কি দান করিয়াছেন? তিনি আপনাকেই দান করিয়াছেন। সেই পরম ধনকে উপভোগ কর। আর সকল ত্যাগ করিয়া সেই পরম ধনকে উপভোগ কর।...

"এ আমার নিজের দুর্বল বুদ্ধির কথা নহে, এ সেই ঈশ্বরের উপদেশ।... আহা, সে দিন আমার পক্ষে কি শুভ দিন,—কি পবিত্র আনন্দের দিন!

"উপনিষদের প্রতি কথা আমার জ্ঞানকে উজ্জ্বল করিতে লাগিল। উপনিষদ্‌কে অবলম্বন করিয়া আমি দিন দিন আমার গম্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।"

এই উপনিষদের ছেঁড়া পাতা যে কেমন করিয়া তাঁহার কাছে উড়িয়া আসিল, তাহা এক রহস্যের ব্যাপার। দ্বারকানাথ ঠাকুর রামমোহন রায়ের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। রামমোহন রায়ের কোনো উপনিষদ্‌গ্রন্থ তাঁহার বাড়িতে থাকা কিছু-মাত্র আশ্চর্য নয়। ১৮৪৭ খৃস্টাব্দে ২২এ সেপ্টেম্বরের 'বেঙ্গল হরকরা'তে (*Bengal Hurkaru*) প্রকাশিত 'Historical sketch of Vedantism'-নামক এক প্রবন্ধ ঐ বছরের ১৭৬৯ শকের কার্তিকের তত্ত্ববোধিনীতে উদ্‌ধৃত হইয়াছে। তাহাতে এক জায়গায় লেখা আছে—"The Tattwabodhini Sabha owes its birth to its founder's accidentally finding a flying sheet of Rammohan Roy's edition of the Isopanishad"—অর্থাৎ তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠাতা রামমোহন রায-কর্তৃক সম্পাদিত ঈশোপনিষদের এক উড়ন্ত ছিন্নপত্র দৈবক্রমে আবিষ্কার করায় এই তত্ত্ববোধিনী সভার উৎপত্তি হয়। ইহাকে দৈব ঘটনা না বলিয়া উপায় নাই। এবং সেইজন্যই তিনি উপনিষদের বাণীকে দৈববাণী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। এই "দৈববাণী" তিনি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি তো মন্ত্রকে শুধু মনন করেন নাই, তিনি মন্ত্রকে দেখিয়াছিলেন।

তাঁহার হৃদ্‌গত আত্মপ্রত্যয়ের দ্বারা যে ব্রহ্মজ্ঞান তিনি লাভ করিয়াছিলেন, এই দৈববাণী সেই ব্রহ্মজ্ঞানকেই সংশয়রহিত ও উজ্জ্বল করিয়া দিল। উপনিষদের বাক্যের সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ের বাক্য মিশিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে, ঈশা, কেন, কঠ, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ পড়া শেষ হইয়া গেল, আরো ছয়খানি উপনিষদ্‌ও পড়া হইল। প্রতি দিন উপনিষদ্ যেটুকু পড়িতে লাগিলেন, সেটুকু

কণ্ঠস্থ করিয়া বিদ্যাবাগীশকে তিনি শুনাইতে লাগিলেন। বিদ্যাবাগীশ তাঁহার বেদের উচ্চারণ শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার কাছে শিখিবার পূর্বেই এক দ্রাবিড়ী বৈদিক ব্রাহ্মণের কাছে বৈদিক উচ্চারণ শিখিয়াছিলেন।

কবি কীট্স হোমরের তর্জমা পড়িয়া এক নূতন কল্পলোকের প্রথম আভাস পাইয়া বলিয়াছিলেন যে, কোনো জ্যোতিষীর দৃষ্টিতে একটা নূতন গ্রহ যখন হঠাৎ একদিন ভাসিয়া উঠে তখন তিনি যেমন অনুভব করেন, হোমর পড়িয়া তাঁহার তেমনি অনুভব হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে উপনিষদের আবিষ্কার সেই রকম এক নূতন গ্রহের আবিষ্কারের মতো। বোধ হয় তাহার চেয়েও বেশি। কারণ, গ্রহটা বাইরের বস্তু। এ একেবারে নিজের ভিতরকার উপলব্ধির কথাটাকে বাইরে একটা কোনো প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা। উপনিষদ্ যেন তাঁহারি লেখা, তাঁহারি উপলব্ধির ভাষা! এ আবিষ্কারের মতো আনন্দের আবিষ্কার আর কিছুই হইতে পারে না!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ধর্মপ্রচার ধর্মদীক্ষা ধর্মসম্প্রদায়গঠন

উপনিষদে যখন দেবেন্দ্রনাথের রীতিমত প্রবেশ হইল এবং সত্যের আলোক পাইয়া জ্ঞান ক্রমে উজ্জ্বল হইতে লাগিল, তখন এই সত্যধর্ম প্রচার করিবার জন্য তাঁহার মনে প্রবল ইচ্ছা জন্মিল। এখন হইতে তাঁহার ধর্মপ্রচারের বিচিত্র উদ্যম আমরা দেখিতে পাইব।

হিন্দু বিচিত্র সাধনমার্গের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে বলিয়া কোনো বিশেষ ধর্মকে একান্ত করিয়া তুলিয়া অন্য সকল ধর্মকে অস্বীকার করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় না, এমন কথা আজকাল আমরা শুনিতে পাই বটে। খৃস্টান বা মুসলমান ধর্মের মতো নানা উপায়ে লোককে নিজের ধর্মমণ্ডলীতে আনিয়া ফেলার চেষ্টা হিন্দুধর্মে নাই। সেই কারণেই সভাসমিতি, প্রচারকের দল, বক্তৃতা প্রভৃতি ধর্মপ্রচারের বিপুল কল-বল এ দেশে বৌদ্ধধর্মের পরে আর তেমন করিয়া দেখা দেয় নাই।

ভারতবর্ষে অসংখ্য ধর্ম ও ধর্মপন্থা আছে— অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়' বইখানি পড়িলেই এ বিষয়ে চোখ ফুটিবে। যখনই যে পন্থা বা সম্প্রদায় জাগিয়াছে, তখনই সকল মানুষকে সেই পন্থার পন্থী করিবার জন্য চেষ্টা ও উদ্যমও দেখা গিয়াছে। খৃস্টান বা মুসলমান ধর্মের সঙ্গে ইহাদের তফাত কেবল এই যে, ইহারা মানুষকে নানা উপায়ে ভজাইয়া দল ভারী করিবার জন্য চেষ্টা করে নাই। কারণ সেই রকম চেষ্টার মূলে একটা লুব্ধতা ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা স্পষ্টই লুকানো থাকে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি নূতন অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া তাহাকে একেবারে গোপন করিয়া রাখিলেন এবং জগৎকে দান করিয়া গেলেন না, এমন ঘটনা মানুষের জগতে ঘটা সম্ভব নয়। বরং মহাপুরুষেরা যখন সত্য লাভ করেন, তখন তাহা দিবার জন্য তাঁহাদের এমন ব্যাকুলতা হয় যে, তাঁহারা আহার নিদ্রা ভুলিয়া যান, এমনও দেখা যায়। মাতার স্তন দুধে ভরিয়া উঠিলে সন্তানের মুখে যদি তিনি তাহা না ধরিতে পারেন, তবে তাঁহার যেমন পীড়া বোধ হয়, নবলব্ধ অধ্যাত্ম সত্যকে সকলের কাছে প্রচার করিতে না পারিলে তেমনি পীড়াই মহাত্মাগণ অনুভব করিয়া থাকেন।

দেবেন্দ্রনাথের মনে যখন অধ্যাত্ম সত্য প্রকাশ পাইল, তখন তিনি যাহাকে

হাতের কাছে পাইলেন— তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও ভাই— সবাইকে সেই সত্য দেওয়ার জন্য তাঁহার "প্রবল ইচ্ছা" হইল। দুর্গোৎসবের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে বাড়ির পুকুরের ধারে একটা ছোটো কুঠরিতে দেবেন্দ্রনাথ এক সভা স্থাপন করিলেন। সকলে শুদ্ধ স্নাত হইয়া সেখানে গিয়া বসিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া কঠোপনিষদের এক শ্লোক ব্যাখ্যা করিলেন। "ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ং। অয়ং লোকোনাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে।" অর্থাৎ 'প্রমাদী ও ধনমদে মূঢ় নির্বোধের নিকটে পরলোক সাধনের উপায় প্রকাশ পায় না। এই লোকই আছে পরলোক নাই— যাহারা এ প্রকার মনে করে, তাহারা পুনঃপুনঃ আমার বশে অর্থাৎ মৃত্যুর বশে আসে।' সেই তাঁহার প্রথম ব্যাখ্যান। ব্যাখ্যানের পর, দেবেন্দ্রনাথের প্রস্তাবে ও সকলের সম্মতিক্রমে সভার নাম রাখা হইল "তত্ত্বরঞ্জিনী সভা"। সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে ডাকা হইল, তিনি ইহার নাম বদল করিয়া নাম রাখিলেন, তত্ত্ববোধিনী সভা। তিনি এই সভার আচার্য হইলেন। এইরূপে, ১৮৩৯ খৃস্টাব্দে (১৭৬১ শক, ২১ আশ্বিন) রবিবারে এই তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপিত হইল। ইহার উদ্দেশ্য "সমুদয় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার।" প্রথমে দশজন মাত্র সভ্যকে লইয়া এই সভার আরম্ভ হয় এবং দেবেন্দ্রনাথের বাড়ির এক তলার ঘরেই ইহার অধিবেশন হইত। তখন প্রাচীনকালের মতো নিয়ম ছিল যে, প্রতি সভ্য আপন লাভের চৌষট্টি অংশের এক অংশ সভায় দান করিবেন। ইহার পরের বছরে ১০৫ জন সভ্য-সংখ্যা হয় এবং মাসিক দানের নিয়ম প্রবর্তিত হয়। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এই সভায় আচার্যের আসন গ্রহণ করিতেন এবং উপনিষদ্ পাঠ ও ব্যাখ্যার দ্বারা ঈশ্বরের আরাধনা করিতেন। সভ্যেরা বক্তৃতা করিতেন। যে সভ্য সকলের আগে বক্তৃতা লিখিয়া সম্পাদকের হাতে দিতেন, তিনিই বক্তৃতা পাঠ করিতে পাইতেন, এই নিয়ম ছিল। সেইজন্য কেহ কেহ সম্পাদকের বিছানার বালিসের নীচে বক্তৃতা রাখিয়া আসিতেন।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কথা পূর্ব পরিচ্ছেদেই আমরা শুনিয়া আসিয়াছি। তাঁহার সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের এই যোগ এক হিসাবে রামমোহন রায়ের ভাবের ও কাজের সঙ্গে তাঁহার যোগ বলা যাইতে পারে। সেইজন্য এখানে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া দরকার মনে করি।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের বড়ো দাদার নাম ছিল হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী—তিনি সন্ন্যাসী হইয়া দেশবিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। রংপুরে রামমোহন রায়ের সঙ্গে

তাঁহার দেখা হয়[১]; রামমোহন রায় তাঁহার অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান দেখিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন ও তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসেন। এই অবধূত তীর্থস্বামীর কাছে রাজা তন্ত্রশাস্ত্র ও তন্ত্রসাধনার সম্বন্ধে অনেক খবর সংগ্রহ করেন। ইঁহারি সর্বকনিষ্ঠ ভাই রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ সংস্কৃতে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি এক সময়ে বিপদ্‌গ্রস্ত হওয়ায় হরিহরানন্দ তাঁহাকে রাজার আশ্রয়ে আনিয়া ফেলেন। বিদ্যাবাগীশ ব্যাকরণ, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র আলোচনা করিয়াছিলেন; বেদান্তাদি মোক্ষশাস্ত্র পড়েন নাই। রামমোহন রায় তাঁহার বন্ধু শিবপ্রসাদ মিশ্র নামে এক বড়ো পণ্ডিতের কাছে বিদ্যাবাগীশের বেদান্ত পড়ার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ইহার পরে রাজা তাঁহাকে হেদুয়া পুকুরের দক্ষিণে এক চতুষ্পাঠী খুলিতেও সাহায্য করিয়াছিলেন। এমনি করিয়া বিদ্যাবাগীশের সঙ্গে রামমোহন রায়ের খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয়। সাকার উপাসকদের সঙ্গে রামমোহন রায়ের যে-সকল শাস্ত্রীয় বিচার হইত, তাহাতে বিদ্যাবাগীশ তাঁহার দলের পণ্ডিতদের মধ্যে আসন পাইতেন। "আত্মীয়সভা" স্থাপিত হইলে পর, সেখানে বিদ্যাবাগীশ ব্রহ্মবিদ্যার ব্যাখ্যান করিতেন। ১৮২৮ খৃস্টাব্দে (১৭৫০ শক, ৬ ভাদ্র) যখন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তিনি তাহার অধ্যক্ষ হইলেন। বিদ্যাবাগীশের অত্যন্ত ইচ্ছা ছিল যে, প্রতিজ্ঞার সহিত ব্রাহ্মধর্মে সকলে দীক্ষা গ্রহণ করে; কিন্তু তখনো তাহার সময় আসে নাই। রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজের ট্রস্টডীড্ পড়িলে বেশ দেখা যায় যে তিনি ব্রাহ্মসমাজকে বা ব্রহ্মসভাকে একেশ্বরবাদীদিগের একটা উপাসনা-মন্দিরের মতো দাঁড় করাইয়া গিয়াছেন। তাহাতে হিন্দু, ইহুদী, খৃস্টান, মুসলমান সকলেই যোগ দিতে পারিত। বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্মকে বিধির মতো গ্রহণ করিয়া একদল লোক একটা নূতন ধর্মসম্প্রদায় সৃজন করিয়া তোলে, এমন কোনো চেষ্টা রামমোহন রায় অবলম্বন করেন নাই। বিদ্যাবাগীশের মনে কিন্তু এই ইচ্ছা ছিল। অথচ ১৮৪৩ খৃস্টাব্দের আগে তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। সেই বছরের ৭ই পৌষে কুড়িজন লোকের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার কাছে বিধিপূর্বক বেদান্তধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। সে-সকল কথা পরে হইবে।

এই সুদীর্ঘ চৌদ্দ বছর কাল তিনি ব্রহ্মসভার শূন্য মন্দিরের পূজারি ছিলেন; রামমোহন রায়ের অনুষ্ঠানের মঙ্গলদীপটিকে নিভিতে দেন নাই। শুধু তাই নয়। রামমোহন রায় যে বেদান্ত-ব্রহ্মবিদ্যার উজ্জ্বল মণিটিকে শাস্ত্রখনি হইতে টানিয়া

১ রামমোহন কিশোর বয়স হইতেই তাঁহাকে জানিতেন। রংপুরে পুনরায় দেখা হয়।

বাহির করিলেন, বিদ্যাবাগীশ সেটিকে বহুযত্নে সংগোপনে রক্ষা করিতেছিলেন। তিনি ভিন্ন দেবেন্দ্রনাথকে ঈশোপনিষদের পাতার অর্থ আর কে বুঝাইয়া দিত ? দুর্ভাগ্যক্রমে ১৮৪৩ সালেই পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া তাহার পরের বছরে (১৭৬৬ শকের ৯ ফাল্গুন) বিদ্যাবাগীশ কাশী যাত্রা করেন এবং ১৮৪৫ খৃস্টাব্দের ২মার্চ পথের মধ্যে মুর্শিদাবাদে ৫৯ বছর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

১৮৩৯ হইতে ১৮৪১ সাল পর্যন্ত তত্ত্ববোধিনী সভার কাজ নিতান্ত মৃদু গতিতে চলিল। ১৮৩৯ খৃস্টাব্দে আর-একজন মনস্বী ব্যক্তির সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের পরিচয় হয় এবং তিনি তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হন। তিনি অক্ষয়কুমার দত্ত। তাঁহার অসাধারণ জ্ঞানানুরাগ ছিল। ইংবাজী বিদ্যালয়ে কিছুদূর পর্যন্ত পড়ার পর পিতার মৃত্যু হওয়ায় অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় অক্ষয়কুমারকে প্রবৃত্ত হইতে হয়। কিন্তু দারিদ্র্যের সঙ্গে এমন করিয়া লড়িয়াও তাঁহার জ্ঞানের উৎসাহ কিছুমাত্র কমিল না। তিনি ইংরাজী বিজ্ঞানশাস্ত্র ও গণিতশাস্ত্রের বই সংগ্রহ করিয়া পড়িতে লাগিলেন। ইংরাজীতে বই লিখিলে তাহাতে এ দেশের লোকের কোনো উপকার হইবে না, এই কথা ভাবিয়া অক্ষয়কুমার বাংলাভাষা ভালো করিয়া শিখিবার জন্য সেই দারিদ্র্যক্লেশের মধ্যেও সংস্কৃত শিখিতে শুরু করিলেন। তখন ঈশ্বর গুপ্ত বাংলা সাহিত্যের আকাশে তাঁহার 'সংবাদপ্রভাকরের' প্রভা বিকীর্ণ করিতেছিলেন , তাঁহার প্রভায় যতটা তাপ দিত ততটা বোধ হয় আলো দিত না। কারণ, তখন বাংলা সাহিত্য সবে কবির লড়াইয়ের উপরের ধাপে উঠিয়াছে, তাহার রুচিটা তখনো পুরাপুরি শুচি হয় নাই এবং লেখার মধ্যে সাবেক সাহিত্যের ঝাঁঝও তেমন মরে নাই। ঈশ্বর গুপ্ত অক্ষয়কুমারের লেখার ক্ষমতা দেখিয়া তাঁহাকে প্রভাকরের প্রভাবর্ধনের কাজে ভর্তি করিয়া লন। শুনা যায় যে, দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারের রচনা পড়িয়া তাঁহার খোঁজ করেন এবং ঈশ্বর গুপ্ত তত্ত্ববোধিনী সভায় আনিয়া পরিচিত করাইলে পর কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে বলেন, "অক্ষয়বাবু, দূর্বাবনে মুক্তা ছড়াইতেছেন কেন ?"

১৮৪০ খৃস্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে কলিকাতায় তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপিত হয়। কেবল সকালবেলায় সেই পাঠশালায় পড়ানো হইত। অক্ষয়কুমার সেই পাঠশালার ভূগোল ও পদার্থবিদ্যার শিক্ষক নিযুক্ত হন। প্রথম মাসে ৮ তৃতীয় মাসে ১০ ও কিছুদিন বাদে ১৪ টাকা মাসিক মাহিনা পান। পাঠশালার বার্ষিক পুরস্কার বিতরণের সময় দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে বলেন, "এই পাঠশালার পরম সৌভাগ্য যে, অক্ষয়কুমারের মত এমন উপযুক্ত ও উৎসাহী

শিক্ষক পাওয়া গিয়াছে।" এই পাঠশালা ছাড়া তত্ত্ববোধিনী সভার দ্বারা এই বছরে বাংলাভাষায় অনুবাদিত কঠোপনিষদ ৫০০ খানা বই ছাপানো হয়।

তবু দুই বছর পর্যন্ত তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার কোনো বিশেষ উন্নতি দেখিতে না পাইয়া দেবেন্দ্রনাথ খুবই দুঃখিত হইতেছিলেন। ১৮৪১ খৃস্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী সভার সাম্বৎসরিক উৎসব বেশ জাঁকাইয়া করিবার জন্ত তাঁহার মনে ইচ্ছা হইল। কলিকাতায় যত আপিস ও কার্যালয় আছে, তাহার প্রত্যেক কর্মচারীর নামে নিমন্ত্রণ-পত্র গেল। কর্মচারীরা ইতিপূর্বে তত্ত্ববোধিনী সভার নামও শোনে নাই, তাহারা তো নিমন্ত্রণ-পত্র পাইয়া অবাক! এদিকে সভার আয়োজন করিতে দেবেন্দ্রনাথ সমস্ত দিন ব্যস্ত রহিলেন। লোকসমাগম হইল, অথচ লোকেরা জানে না কী উদ্দেশ্তে সভায় উপস্থিত হইয়াছে। যথাসময়ে শঙ্খ ঘণ্টা ও শিঙা বাজাইয়া এক সময়ে সমস্ত দরজা খোলা হইল। আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বেদীতে বসিলেন। লাল রঙের বনাত গায়ে দিয়া দশ দশ জন করিয়া দুই সারিতে বিশ জন দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ সমস্বরে বেদপাঠ আরম্ভ করিয়া দিলেন। সন্ধ্যা ৮টার সময় সভা আরম্ভ হইয়াছিল, বেদপাঠ শেষ হইতেই ১০টা বাজিয়া গেল। বেদপাঠের পর দেবেন্দ্রনাথ উঠিয়া বক্তৃতা করিলেন। তিনি বলিলেন যে, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় এ দেশের লোকের মনের অন্ধকার দূর হওয়ায়, তাহারা পূর্বের ন্যায় কাষ্ঠলোষ্ট্র পূজায় আর প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছে না। অথচ ঈশ্বরের প্রকৃত নিরাকার চৈতন্তস্বরূপের তত্ত্ব বেদান্ত প্রচারের অভাবে তাহারা জানে না। তাহাবা মনে ভাবে যে, আমাদের শাস্ত্রে কেবল সাকার উপাসনার কথাই আছে এবং সেইজন্ত নিরাশ হইয়া অন্য শাস্ত্রে বিশুদ্ধ ঈশ্বরতত্ত্ব খুঁজিয়া বেড়ায়। দেবেন্দ্রনাথের পরে যথাক্রমে শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য, উমেশচন্দ্র রায়, প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ, অক্ষয়কুমার দত্ত ও রমাপ্রসাদ রায় বক্তৃতা করিলেন। রাত্রি ১২টা বাজিয়া গেল। তার পর বিদ্যাবাগীশ একটা ব্যাখ্যান দিলেন— তাহার পর গান হইয়া সভা ভঙ্গ হইতে ২টা বাজিয়া গেল। আপিসের ফেরতা সেই-সমস্ত লোক এই এত রাত্রি পর্যন্ত সমস্তদিনের শ্রমের পর বসিয়া রহিল। কে যে কী বুঝিল তাহার ঠিকানা নাই; কিন্তু কেহই উঠিল না। ইহাই তত্ত্ববোধিনী সভার প্রথম ও শেষ সাম্বৎসরিক সভা।

তার পর ১৮৪২ খৃস্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজে যোগদান এক স্মরণীয় ঘটনা। ১৮৩৩ খৃস্টাব্দে রামমোহন রায় ব্রিস্টলে পরলোক গমন করেন। রামমোহন রায় ভারতবর্ষে থাকিতেই রাজা রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি ধর্মসভা খাড়া

করিয়া ব্রহ্মসভাকে নষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটি করেন নাই। সুতরাং রামমোহন রায়ের অবর্তমানে ইহার প্রতি রুষ্টের সংখ্যা যথেষ্ট ছিল, কিন্তু ইহাকে পুষ্ট করিবার লোক-সংখ্যা মোটেই ছিল না। রাজার বন্ধুরা ধর্মের টানে না হোক রাজার প্রতি হৃদয়ের টানে ইহাকে সাহায্য করিতেন—দ্বারকানাথ ঠাকুর মাসিক ৮০ টাকা করিয়া ব্রহ্মসভাকে সাহায্য করিতেন। কিন্তু একা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ রাজার এই শিশু-অনুষ্ঠানটিকে মাতার মতো আপনার নিষ্ঠার স্তন্যরসে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পরে ব্রহ্মসভায় গিয়া তাহার অবস্থা কেমনতর দেখিয়াছিলেন তাহা কয়েকজন বন্ধুকে গল্পচ্ছলে একদিন বলিয়াছিলেন। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের রামমোহন রায়ের জীবনীতে সেই কথাগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা হইতে পুনরায় এখানে উদ্ধার করা যাইতেছে—

"ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পর, তিনি (রামমোহন রায়) একবৎসর মাত্র[১] কলিকাতায় ছিলেন। তিনি যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তিনিও একজন অসাধারণ ব্যক্তি। তিনি পরমেশ্বরকে প্রীতি করিতেন এবং রাজা রামমোহন রায়কেও প্রীতি করিতেন।···ইহাতেই বুঝা যায় যে, যে সময়ে ব্রাহ্মসমাজ রক্ষা পাইবে বলিয়া কোনো আশা ছিল না, সে সময়েও তিনি কেমন অতুলনীয় নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াছিলেন। সে সময়ে ব্রাহ্মসমাজের উপাসকমণ্ডলী ছিল না বলিলেই হয়। বৃষ্টি বাদল হইলে, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে উপাসক এবং আচার্য দুইয়ের কার্য একাকী করিতে হইত। যে-সকল ধনীলোক রাজার জীবদ্দশায় তাঁহার সহিত যোগ দিয়াছিলেন, রাজার মৃত্যু-সংবাদ কলিকাতায় আসিলে পরেই, তাঁহারা সমাজের সহিত সংস্রব ত্যাগ করিলেন। কতকগুলি মধ্যবর্তী লোক সমাজে আসিতেন। সাপ্তাহিক উপাসনার সময়ে পথের লোক আসিয়া বসিত। কেহ কেহ বাজার করিয়া যাইবার সময়, বাজারের ধামা হস্তে প্রবেশ করিত। কেহ কেহ টিয়াপাখি হস্তে লইয়া সমাজে আসিত। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় একখানি তক্তপোষের উপর বসিতেন। শতরঞ্জের উপরে চাদর বিছানো থাকিত, তাহাতেই অন্য লোক বসিতেন।"

১ ইহা দেবেন্দ্রনাথ-রচিত 'ব্রাহ্মসমাজে পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত' হইতে উদ্ধৃত। রামমোহন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পর প্রকৃতপক্ষে দুই বৎসরেরও অধিককাল কলিকাতায় ছিলেন।

সূর্যাস্তের পরে সমাজের পাশের ঘরে একজন দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ উপনিষদ্‌ পাঠ করিতেন, সেখানে ব্রাহ্মণ ভিন্ন শূদ্রের প্রবেশ নিষেধ। সূর্যাস্ত হইলে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন সমাজঘরে প্রকাশ্যে বেদী গ্রহণ করিয়া বসিতেন। সমাজে লোক বেশি হইত না। বড়ো জোর দশ-বারো জন লোক হইত।

দেবেন্দ্রনাথ দেখিলেন যে, ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য এবং তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্দেশ্য একই উদ্দেশ্য। দুয়েরি উদ্দেশ্য ব্রহ্মজ্ঞানের প্রচার। অতএব এ দুয়েব পৃথক থাকিবার দরকার কি! ১৮৪২ খৃস্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে ব্রাহ্ম-সমাজের যোগ হইয়া গেল। তত্ত্ববোধিনী সভার মাসিক উপাসনার বদলে ব্রাহ্ম-সমাজেই সেই মাসিক উপাসনা হইবে এইরূপ স্থির হইল। এবং তত্ত্ববোধিনী সভার সাম্বৎসরিক উৎসব ছাড়িয়া দিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার দিন ১১ই মাঘ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব করিবার সংকল্প স্থির হয়।

এখানে একটা কথা বলা দরকার যে, তখন 'ব্রাহ্মধর্ম' বলিয়া কোনো কথা চলিত ছিল না। তত্ত্ববোধিনী সভা বা ব্রহ্মসভা যে ধর্মের প্রচার করিতেন, তাহার নাম ছিল 'বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্ম'। ব্রাহ্মধর্ম কথাটা অনেক পরে চল্‌তি হয়। কোন্‌ সময়ে হয় আমরা পরে দেখিব। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ রীতিমত বৈদান্তিক ছিলেন। তাহার পরিষ্কার প্রমাণ, ১৮৪৪ খৃস্টাব্দের (১৭৬৫ শকের) ১১ই মাঘে তিনি যে ব্যাখ্যান দেন তাহাতে তিনি লেখেন যে, "পরমেশ্বরের উপাসনা অধিকারীভেদে চারিপ্রকারে বিহিত হয়, তন্মধ্যে, 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম, অহংব্রহ্মাস্মি, তত্ত্বমসি' ইত্যাদি মহাবাক্য-প্রতিপাদ্য জীবাত্মাপরমাত্মার যে অভেদচিন্তন ইহা মুখ্য উপাসনা হয়।" সেই মাঘেই "সমাজাধিপতি", (বোধ হয় দেবেন্দ্রনাথ) যে বক্তৃতা পাঠ করেন, তাহা পরবর্তীকালে অন্যান্য বক্তৃতার সহিত ছাপাইবার সময় ফুটনোটে নিজেই স্থানে স্থানে তাহার প্রতিবাদ করেন। সেই বক্তৃতার এক জায়গায় ছিল "ব্রহ্মজ্ঞানী সমাধিকালে পূর্ণানন্দকে উপভোগ করিয়া এবং ব্যবহারকালে সাংসারিক সমূহ সুখে সুখী হইয়া অন্তকালে পরব্রহ্মের সহিত লীন হয়েন।"— ফুটনোট— "ইহা বৈদান্তিক মত, ইহা ব্রাহ্মধর্মের সম্মত নহে।"—প্রধান আচার্য।

শাঙ্কর বেদান্ত মত সুতরাং বেদের অপৌরুষেয়বাদ যে এক সময়ে ব্রাহ্ম-সমাজকে অত্যন্ত বেশি রকমে অধিকার করিয়াছিল, তাহার একটা প্রধান কারণ ছিল রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের প্রভাব। এটা এখানে বলিয়া রাখা ভালো।

ব্রাহ্মসমাজের ভার লইয়া তাহার ভিতর দিয়া ধর্মপ্রচারের পথ প্রশস্ত

হইলেও, দেবেন্দ্রনাথ তাহাতেই খুশি থাকিতে পারিলেন না। তখন তাঁহার মনের মধ্যে ধর্মপ্রচারের উৎসাহের আগুন জ্বলিতেছে। তিনি যে সত্য পাইয়াছেন, কি করিয়া সেই সত্য সকল দেশের লোকে পাইবে, কেমন করিয়া তাহাদের অজ্ঞানের অন্ধকার দূর হইবে, ইহাই তখন তাঁহার একমাত্র চিন্তার বিষয়।

তিনি দেখিলেন যে, তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যগণ কাজের গতিকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আছেন। সকলেই সব সময়ে সভায় উপস্থিত থাকিতেও পারেন না। ব্রাহ্মসমাজে যে-সকল ব্যাখ্যান হয়, তাহাও সকলে জানিতে পারেন না। শুধু তাই নয়। রামমোহন রায় বেদান্ত প্রচারের জন্য বেদান্তসূত্র, উপনিষদের অনুবাদ প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে যে-সব বই প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাদেরই বা প্রচার কোথায়? তাহা ছাড়া তখন কলিকাতা শহর দুর্নীতির দ্বারা জর্জরিত হইয়াছিল, কিন্তু সে সম্বন্ধে মানুষের চোখ ফুটাইয়া তাহাকে ধর্মের পথে লইবার জন্য কোনো চেষ্টা ছিল না। এই-সমস্ত নানা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি মাসিক পত্র বাহির করার বিশেষ প্রয়োজন দেবেন্দ্রনাথ অনুভব করিলেন। একটি ছাপাখানা রাখাও দরকার হইল। ১৮৪৩ খৃস্টাব্দে (১৭৬৫ শক ভাদ্র মাসে) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' বাহির হইল।

অক্ষয়কুমার দত্ত এই নূতন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হইলেন। তত্ত্ববোধিনী সভার অনেক সভ্যের রচনা পরীক্ষা করিয়া দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারকেই পছন্দ করিলেন। তিনি অক্ষয়কুমারের লেখাকে "হৃদয়গ্রাহী ও মধুর" বলিয়াছেন। এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বাংলা সাহিত্যে এক যুগান্তর উপস্থিত করিল। কারণ ইহার পূর্বে বাংলায় উচ্চভাবপূর্ণ গদ্য রচনা যাহা-কিছু হইয়াছিল তাহা সংস্কৃতেরই অনুকৃতি ও অনুবৃত্তি। আর 'প্রভাকর' 'ভাস্কর' প্রভৃতি যে-সকল কাগজ তখন চলিত ছিল, তাহাদের কথা তো পূর্বেই বলা হইয়াছে। ১৮১০ খৃস্টাব্দে "অভিনব যুবক সাহেবজাতের শিক্ষার্থে" পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় তর্কালংকারের যে 'প্রবোধচন্দ্রিকা' প্রকাশিত হয়, তাহার ভাষা হুবহু সংস্কৃত। কেবল সংস্কৃতের বিভক্তির শৃঙ্খলগুলি তাহাতে খুলিয়া ফেলা হইয়াছে, নহিলে তাহাকে বাংলা বলিয়া চিনিবার আর-কোনো লক্ষণ নাই। তার পরে রামমোহন রায় ১৮১৫ খৃস্টাব্দে বাংলায় বেদান্ত-সূত্রের ভাষ্য প্রকাশ করিলেন। বাংলাভাষায় যে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা চলিতে পারে এ ধারণা রামমোহন রায়ের পূর্বে আর-কাহারো ছিল না। বাংলাভাষার গড়ন যে সংস্কৃতের মতো নয় এ কথা

রামমোহন বেশ ভালো করিয়া জানিতেন বলিয়াই তিনি লম্বা লম্বা সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহার করিয়া তাঁহার রচনারীতিকে জটিল করেন নাই। কিন্তু রামমোহনের রচনারীতি তবু বাংলাসাহিত্যে চল্‌তি হইবার মতো নয়, কারণ তিনি শাঙ্কর ভাষ্যের রচনাপদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। সর্বদাই কোনো প্রতিপক্ষকে সামনে খাড়া করিয়া তাহার যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি চালানোর দার্শনিক পদ্ধতি।

বাস্তবিক বাংলাসাহিত্যের পক্ষে অক্ষয়কুমারের মতো যুক্তিপন্থী ব্যক্তির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। আমার মনে হয়, ফরাসী Illumination সম্প্রদায়ের ডিডিরো, ডি আলেমবার্ট প্রভৃতির মতো তাঁহারো Encyclopædic একটা বিশ্বগ্রাসী জ্ঞানানুশীলনের ইচ্ছা ছিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদন করিতে করিতে অতিরিক্ত ছাত্ররূপে তিনি মেডিক্যাল কালেজে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, প্রভৃতিব আলোচনা কবিয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভার সহায়তায় বিস্তর গ্রন্থ তিনি পড়িতেন এবং পত্রিকায় নানা জ্ঞান বিজ্ঞান ইতিহাসের তত্ত্বসকল প্রকাশিত করিতেন। প্রথম সংখ্যার তত্ত্ববোধিনীতে পত্রিকার উদ্দেশ্য, বিদ্যাবাগীশের ব্যাখ্যান, তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার কথা, এবং রামমোহন রায়ের বাজসনেয় সংহিতোপনিষদের ভূমিকার চূর্ণক— এই কয়েকটি প্রবন্ধ বাহির হয়। প্রথম কয়েক সংখ্যাতে এই রকম প্রবন্ধই ছিল। অগ্রহায়ণের সংখ্যায় অক্ষয়কুমারের এক প্রবন্ধ বাহির হয়। তাহাতে পৃথিবীর সৃষ্টিকৌশলের মধ্যে স্রষ্টার অসীম জ্ঞানের পরিচয়ের কথার আলোচনা ছিল। বিজ্ঞানের তত্ত্ব এই বোধ হয় প্রথম বাংলাভাষাতে প্রকাশের চেষ্টা—

"পৃথিবী সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত, সেই সমুদ্রের জল সূর্যের উত্তাপে বাষ্পরূপে উত্থাপিত হইয়া মেঘরূপে আকাশে স্থিতি করে; তাহার কিয়দংশ পুনর্বার জলরূপে পরিণত হইয়া অবনীতে বর্ষণ হয় এবং অবশিষ্টভাগ বায়ুদ্বারা সঞ্চালন পূর্বক পর্বতশৃঙ্গোপরি শীত দ্বারা ঘনীকৃত হইয়া তুষাররূপে অবস্থান করে। পরন্তু এই ইহার সৌন্দর্য যে, পর্বতস্থিত তুষার এবং বর্ষণের জল উভয়ই নদনদীতে গমন পূর্বক এক শরীর হইয়া পুনর্বার সেই সমুদ্রে মিশ্রিত হয়, এবং তথা হইতে পূর্ববৎ বাষ্পরূপে উত্থিত হইয়া পুনর্বার ধরণীতে বর্ষণ হয় বা পর্বতে স্থাপিত হয়; এইরূপ নিত্য নিয়মে বদ্ধ থাকিয়া পরমেশ্বরের জলযন্ত্র দিবারাত্রি ভ্রমণ করিতেছে, যাহার দ্বারা প্রতিদেশে প্রতিজাতিমধ্যে যাবৎকাল যথাপ্রয়োজন সমভাবে বারি বিতরণ হইতেছে। হা: মূঢ় মনুষ্য! তুমি কি ইহার অপেক্ষা

আর শ্রেষ্ঠতর কৌশল মনেতেও কল্পনা করিতে পার যাহার দ্বারা পৃথিবীতে জল পরিবেশন হয় ?”

অক্ষয়কুমার বাংলাভাষার ভিতর দিয়া বিজ্ঞান, ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের তথ্য ও তত্ত্বগুলি প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়াই দেখিতে দেখিতে বাংলাভাষা সকল রকম ভাবপ্রকাশের উপযোগী হইয়া উঠিল। তাহা ছাড়া আর-একটি বড়ো লাভ হইল এই যে, বাংলায় গদ্যের ভাষা বেশ শৃঙ্খলিত ও সুবিন্যস্ত হইয়া উঠিল। বিজ্ঞানের চর্চা করিতে গেলে কোনো ভাবকে অস্পষ্ট রাখা চলে না এবং একটি সুবিহিত চিন্তাপ্রণালী অনুসারে মনোভাবগুলিকে বাঁধিয়া তুলিতে হয়। এই-সব কারণেই নব্য শিক্ষিতদের মধ্যে তত্ত্ববোধিনী তখন একটা যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল বলিয়াছি। রমেশ দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন “People all over Bengal awaited every issue of that paper with eagerness” সমস্ত বাংলা দেশের লোক প্রতিমাসেই পত্রিকাব অপেক্ষায় উন্মুখ হইয়া থাকিত। ১৮৪৩ হইতে ১৮৫৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বারো বছর অক্ষয়কুমার পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। তিনি এ কাজে সমস্ত মনপ্রাণ সঁপিয়া দিয়াছিলেন। যখন তত্ত্ববোধিনীতে তিনি ৩০ টাকা মাসিক বৃত্তি পাইতেন, তখন একদিন কথাপ্রসঙ্গে কোনো বন্ধুকে বলেন— যদি আমার ৩০০ টাকা বৃত্তির বিষয়কর্ম উপস্থিত হয়, তবু আমি তত্ত্ববোধিনী ছাড়িতে পারি না। এক-এক দিন বই পড়ায় ও তত্ত্ববোধিনীর জন্য প্রবন্ধ লেখায় সমস্ত রাত্রি অক্ষয়বাবু জাগিয়া কাটাইতেন। ইহা হইতেই বুঝিতে পারি যে তখন সাহিত্য ইঁহাদের কাছে তপস্যার বিষয় ছিল— ইঁহাদের সাহিত্য-সৃষ্টির গোড়ায় ছিল তপস্যার তাপ। সে তপস্যা জীবনের বিচিত্র চেষ্টা হইতে নিজেকে সরাইয়া লইয়া একটা নিভৃত কলাভবন গড়িয়া তাহার মধ্যে বসিয়া বিরলে সাহিত্য সৃজনের তপস্যা নয়— তাহা জীবনকেই নানা দিক হইতে প্রকাশ করিবার তপস্যা। এইজন্যই বাংলা ভাষায় অল্প সময়ের মধ্যে এমন একটা অদ্ভুত গতিবেগ দেখা দিয়াছিল। পৃথিবীর সামান্য বালুকণা হইতে আকাশের দূরতম নক্ষত্রলোক পর্যন্ত তখন বাংলাভাষার দৌড়।

দেবেন্দ্রনাথ এইসঙ্গে এশিয়াটিক সোসাইটির মতো এক “গ্রন্থসভা” স্থাপন করেন। কমিটির পাঁচজনের বেশি গ্রন্থাধ্যক্ষ সভ্যের সংখ্যা ছিল না। একজন গ্রন্থাধ্যক্ষ অবসর গ্রহণ করিলে আর-একজন তাঁর স্থান পুর্ণ করিতেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, শ্রীধর ন্যায়রত্ন,

রাধাপ্রসাদ রায়, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, প্রভৃতি ইহার সভ্য হইয়াছিলেন। ১৮৪৮ খৃস্টাব্দে বিদ্যাসাগর এই সভার সভ্য হন।

বোধ হয় ইহার কার্য-বিবরণের কিছু নিদর্শন উদ্ধার করিলে পাঠকদের মন্দ লাগিবে না—

কবীরপন্থীদিগের বৃত্তান্ত বিষয়ক পাণ্ডুলেখ্য প্রেরণ করিতেছি, যথাবিহিত অনুমতি করিবেন। নিবেদনমিতি।

তত্ত্ববোধিনী সভা
১৪ই আশ্বিন ১৭৭০

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত,
গ্রন্থ-সম্পাদক।

প্রেরিত প্রস্তাবপাঠে পরম পরিতোষ পাইলাম। ইহা অতি সহজ ও সরল ভাষায় সুচারুরূপে রচিত ও সঙ্কলিত হইয়াছে। অতএব পত্রিকায় প্রকাশ বিষয়ে আমি সন্তুষ্টচিত্তে সম্মতি প্রদান করিলাম ইতি।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উক্ত পাণ্ডুলেখ্যের স্থানে স্থানে যে সকল পবিবর্তন করিয়াছেন, তাহা অতি উত্তম হইয়াছে।

শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়।

প্রেরিত পাণ্ডুলেখ্য প্রকাশযোগ্য।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র।
শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ঋগ্বেদ-সংহিতা অনুবাদিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ আগামী তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ জন্য প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা পাঠাইতেছি।

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।
গ্রন্থ-সম্পাদক।

ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় কি যে বেদ জ্ঞাত হইবার জন্য সকল জাতি সকল লোকেরই প্রায় চেষ্টা এবং আশা হইয়াছে তাহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ হয়। অতএব অবশ্য প্রকাশযোগ্য।

শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়।

সাধারণ লোকের পক্ষে বেদভাব জানিবার নিমিত্ত এমত উপায় হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা আর আনন্দের বিষয় কি আছে? ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের নিমিত্ত

"বিবিধ উপায়ের" মধ্যে বেদের অনুবাদ এক প্রধান উপায় হইয়াছে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক।

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

ইহা অতি আহ্লাদের বিষয় বহুকালাবধি বেদ সাধারণের অগোচর ছিল। এইক্ষণে সাধারণের অনায়াসে গোচর বেদে জ্ঞানযোগ হইবে ইহার পর আর আনন্দের বিষয় কি আছে। ইহা অবশ্য পত্রিকায় প্রকাশযোগ্য।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

দেবেন্দ্রনাথ কি তত্ত্ববোধিনী সভায়, কি পত্রিকা-সম্পাদনে, কোথাও যে এখনকার কালের সভাসমিতির বিধিব্যবস্থা নিয়মাদি লঙ্ঘন করিয়া চলিতেন না, তাহাই দেখাইবার জন্য উপরে গ্রন্থসভার কার্যবিবরণের কিছু অংশ উদ্ধার করিয়া দেখানো গেল।

১৮৪৩ খৃস্টাব্দে (১৭৬৫ শক ১৮ই বৈশাখ) তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা কলিকাতা হইতে হুগলি জেলার অন্তর্গত বাঁশবেড়ে (বংশবাটী) গ্রামে উঠিয়া যায়। কলিকাতায় সকালে ৯টা পর্যন্ত ঐ পাঠশালা বসিত এবং বাংলা ও সংস্কৃত বেদান্ত পড়ানো হইত। ১০টার পরে ছাত্ররা ইংরাজী বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিখিতে যাইত। সকালে ৯টা পর্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় পড়িয়া ১০টার সময়ে অন্য ইস্কুলে হাজির হওয়া ছাত্রদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিল, সেইজন্য ক্রমশ ছাত্র না পাওয়ায় পাঠশালাটা উঠিয়া গেল। পাড়াগাঁয়ে পাঠশালা হইলে এ-সব মুশকিল নাই; কারণ সেখানে ইংরাজী বিদ্যালয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই। বাঁশবেড়ে গ্রামে পাঠশালা প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সভায় নানা জায়গা হইতে প্রায় পাঁচ শত ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ সেই সভায় বক্তৃতায় বলেন যে, ইংরাজী শিক্ষার জন্য যে-সব বিদ্যালয় সেই সময়ে স্থাপিত হইতেছিল, তাহাতে ছাত্রগণ বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া ঈশ্বরের তত্ত্ব সম্বন্ধে স্বভাবতই কৌতূহলী হইবে এবং কিছু পরিমাণে তাঁহার যথার্থ স্বরূপও ভাবিতে পারিবে। কিন্তু তাহারা দেখিবে যে তাহাদের নিজ নিজ পরিবারে পৌত্তলিক পূজা চলিতেছে, অসার আমোদপ্রমোদ হাস্যকৌতুককেই লোকে ঈশ্বরের পূজা বলিয়া মনে করিতেছে। সুতরাং তাহাদের নিজেদের দেশের ধর্মশাস্ত্রে প্রকৃত ঈশ্বর-তত্ত্বের উপদেশ আছে কি না তাহা না জানিতে পারিয়া "নিরাশ্বাসে অনেকে বিজাতীয় খৃস্টান ধর্ম প্রভৃতি...অবলম্বন" করিবে। অতএব "স্বধর্মে থাকিয়া

যাহাতে ঈশ্বরজ্ঞান সম্পূর্ণ হয় তন্নিমিত্তেই এই পাঠশালা স্থাপিতা হইয়াছে।" অক্ষয়কুমার দত্তও সেই সভায় এক তেজস্বী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বিদেশের প্রভাব ও সকল বিষয়ে অনুকরণপ্রিয়তার সম্বন্ধে খেদ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমরা আর কোন বিষয়ে আপনারদিগের প্রতি নির্ভর করিতে পারি না। আমরা পরের শাসনের অধীন রহিতেছি, পরের ভাষায় শিক্ষিত হইতেছি, পরের অত্যাচার সহ্য করিতেছি, এবং খৃষ্টীয়ান ধর্মের যেরূপ প্রাদুর্ভাব হইতেছে তাহাতে শঙ্কা হয় কি জানি পরের ধর্ম বা এ দেশের জাতীয় ধর্ম হয়। অতএব এই ক্ষণে আমারদিগের স্ব স্ব সাধ্যানুসারে আপন ভাষায় শিক্ষা প্রদান করা এবং এ দেশীয় যথার্থ ধর্মের উপদেশ প্রদান করা অতি আবশ্যক হইয়াছে।"* কি আশ্চর্য স্বদেশ-প্রেম! তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পাতায় পাতায় এই দেশানুরাগ প্রদীপ্ত হইয়া আছে। দেশের শাস্ত্রোদ্ধার, তাহার ব্যাখ্যান, দেশের উপাসক-সম্প্রদায়ের সংবাদ, দেশের প্রাচীন সমাজব্যবস্থার আলোচনা ও প্রথাসকলের উৎপত্তি নির্ণয়, কুপ্রথা দূর করিবার জন্য উপদেশ—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় এই শ্রেণীর রচনা প্রকাশিত হইত।

১৮৪৫ খৃস্টাব্দের তত্ত্ববোধিনীতে (১৭৬৬ শক) তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার খবর পাওয়া যায় এই যে, পাঠশালায় মোট ১২৭ জন ছাত্র ছয়টি শ্রেণীতে তত্ত্বজ্ঞান, ব্যাকরণ, পদার্থবিদ্যা, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় পড়িতেছিল। প্রথম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্য-গ্রন্থের মধ্যে কঠোপনিষৎ ও রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থের চূর্ণক ছিল। পাঠশালার পরীক্ষা খুব জাঁকাইয়া হইত—প্রায় চারি শত গণ্যমান্য লোক পরীক্ষার সময় গিয়া উপস্থিত হইতেন। প্রথম শ্রেণীর পরীক্ষার প্রশ্নের মধ্যে কতগুলি প্রশ্ন নিম্নলিখিত রূপ ছিল— "পরব্রহ্মের লক্ষণ কি?" "তিনি চক্ষুগোচর হয়েন কি না, তাহার প্রমাণ কি?" "পরমেশ্বরের উপাসনাই যদি সত্যধর্ম তবে পুরাণ এবং তন্ত্রে প্রতিমাদি সাকার বস্তুর আরাধনার বিধি কি জন্য আছে?" ইত্যাদি।

ধর্মশিক্ষার সঙ্গে অন্যান্য সমস্ত বিষয়-শিক্ষাকে মিলাইয়া একটা বিদ্যালয় স্থাপনের ইচ্ছা শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠার অনেক পূর্বে দেবেন্দ্রনাথের মনের মধ্যে ছিল এবং তাহার পরীক্ষাও তিনি এক-আধবার করেন নাই, থাকিয়া থাকিয়া সেই পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এ দেশে শিক্ষার এই নূতন আদর্শের তিনি একজন পথপ্রদর্শক, এ কথা বোধ হয় স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে।

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ১৭৬৫ শক।

এই সময়ে যখন তত্ত্ববোধিনী সভা, তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা, ব্রাহ্মসমাজ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের গঠন ও উন্নতিসাধন লইয়া দেবেন্দ্রনাথ ব্যস্ত, তখন দ্বারকানাথ ঠাকুর দেবেন্দ্রনাথের ভাবগতিক বুঝিতে পারিয়া তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ উদ্‌বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। দেবেন্দ্রনাথকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন বলিয়া প্রকাশ্যে তাঁহাকে কিছু বলিতে বা ভর্ৎসনা করিতে তিনি ইচ্ছা করিতেন না। তাহা ছাড়া দেবেন্দ্রনাথ তখন যুবক, বালক নন। কিন্তু তাঁহার পিতা যে মনে মনে বিরক্ত হইতেছিলেন তাহা দেবেন্দ্রনাথ বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের প্রতি বিরক্ত হইয়া তিনি একদিন বলিলেন, "আমি তো বিদ্যাবাগীশকে ভাল বলিয়া জানিতাম , কিন্তু এখন দেখি যে, তিনি দেবেন্দ্রের কাণে ব্রহ্মমন্ত্র দিয়া তাহাকে খারাপ করিতেছেন। একে তার বিষয়-বুদ্ধি অল্প,এখন সে ব্রহ্ম ব্রহ্ম করিয়া আর বিষয়কর্মে কিছুই মনোযোগ দেয় না।" দ্বারকানাথের বিরক্ত হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপনের বোধ হয় কিছুকাল পরেই ১৮৪১ খৃস্টাব্দে গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ডের ভগিনী মিস্ ইডেনের অভ্যর্থনায় দ্বারকানাথ ঠাকুর এক বিখ্যাত নাচ ও ভোজ দেন। সে কথা পূর্বে বলিয়াছি। তার পরে বাঙালীরা খেদ করেন যে, "ইনি কেবল সাহেবদের লইয়া আমোদ করেন, বাঙালীদের ডাকেন না", সে কথা শুনিয়া তিনি বাইনাচ ও গান বাজনা দিয়া আর-এক মজলিস করেন। দ্বারকানাথের বড়ো ছেলে বলিয়া সেদিন অতিথিদিগকে অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন করা দেবেন্দ্রনাথেরই কর্তব্য ছিল। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী সভার সেদিন অধিবেশন ছিল বলিয়া তিনি পিতার ভয়ে তাড়াতাড়ি একবার সেই "বিলাসভূমি" ঘুরিয়া সভার কাজে চলিয়া গেলেন। দ্বারকানাথ বুঝিলেন যে ছেলের বিষয়ব্যাপারে ও ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে মন নাই। সেইজন্য তাঁহার ভয় হইল যে, ব্রহ্ম ব্রহ্ম করিলে দেবেন্দ্রনাথ একেবারেই নষ্ট হইয়া যাইবেন এবং তাঁহার পরে তাঁহার মানমর্যাদা ঐশ্বর্য প্রতিপত্তি রক্ষা করিতে পারিবেন না। বিদ্যাবাগীশ দ্বারকানাথের ভয়ে দেবেন্দ্রনাথকে বাড়িতে আসিয়া বেদান্তদর্শন উপনিষদ্ পড়াইতে রাজি হইলেন না। তত্ত্ববোধিনী সভার ছাপাখানায় গোপনে পড়াইতেন। ইহার পর দ্বারকানাথ ঠাকুর ইউরোপে চলিয়া গেলেন। সেখানে গিয়াও দেবেন্দ্রনাথের বিষয়কর্মে অমনোযোগের জন্য অত্যন্ত খেদ করিয়া তাঁহাকে তিনি চিঠিপত্র লিখিতেন। দেবেন্দ্রনাথকে পাকা বৈষয়িক করিবার জন্য দ্বারকানাথ বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। অল্প বয়স হইতেই ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে তাঁহাকে প্রতিদিন কেরানীর কাজ

করিতে হইত। তহবিল মিলাইতে হইত, হিসাব রাখিতে হইত। হিসাবের কাজে তিনি এমনি পাকা হইয়া গিয়াছিলেন যে, বৃদ্ধবয়সেও কানে শুনিয়া তিনি সমস্ত হিসাব বুঝিয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহার অসাধারণ বৈষয়িক প্রতিভার জোরে যে প্রভূত বিষয়-সম্পত্তি, বাণিজ্য ব্যবসায়, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি বিপুল অর্থাগমের আয়োজন-উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সে-সকল তিনি কেমন করিয়া রক্ষা করিতে পারিবেন? বিশেষত যখন বিষয়ে তাঁহার একেবারে বিরাগ হইয়া গিয়াছে; ঈশ্বরেব সান্নিধ্য লাভ ভিন্ন আর কিছুই যখন তিনি চান না। সুতরাং তিনি পিতার অত্যন্ত উদ্‌বেগ ও ক্লেশের বিষয় হইয়া রহিলেন।

পত্রিকার ভালো রকম ব্যবস্থা হওয়ার পব দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির দিকে মন দিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ব্রাহ্মসমাজে তিনি গিয়াই দেখিলেন যে, একটি নিভৃত ঘরে শূদ্রের অসাক্ষাতে বেদ পাঠ হয়। আর-একদিন তিনি শুনিলেন, ঈশ্বর ন্যায়রত্ন রামচন্দ্রের অবতার হওয়ার কথা ব্যাখ্যানের সময় বলিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজের আদর্শের বিরুদ্ধে এই-সকল ব্যাপার বন্ধ করিয়া দিয়া, যাহাতে সকলের সামনে বেদপাঠ ও বেদব্যাখ্যা হয় দেবেন্দ্রনাথ তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কিন্তু উপযুক্ত আচার্য পাইবেন কোথায়? বেদবেদান্তের আলোচনা তখন বাংলা দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছিল বলিলেই হয়। সুতরাং এই-সকল শাস্ত্র পড়াইবার জন্য তিনি বিজ্ঞাপন দিলেন—"যিনি সংস্কৃত ভাষায় নির্দিষ্ট পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইবেন, তিনি তত্ত্ববোধিনী সভায় থাকিয়া শিক্ষা-লাভের জন্য ছাত্রবৃত্তি পাইবেন।" পাঁচ-ছয়জন ছাত্র বিদ্যাবাগীশের কাছে পরীক্ষা দিলেন। তাহাদের মধ্যে আনন্দচন্দ্র ও তারকনাথ উত্তীর্ণ হইলেন।

এই ১৮৪৩ খৃস্টাব্দ (১৭৬৫ শক) এ দেশের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণীয় বছর। এই বছরেই বাস্তবিক ব্রাহ্মসমাজ বা ব্রাহ্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ, এই বছরের ৭ই পৌষে দেবেন্দ্রনাথ কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে ধর্মদীক্ষা গ্রহণ করেন।

১৮২৮ খৃস্টাব্দে রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন না বলিয়া ব্রহ্মোপাসনার জন্য এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিলেই সংগত হয়। ট্রস্টডীডে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, বিশ্বের স্রষ্টা ও পাতা অনন্ত অগম্য ও অপরিবর্তনীয় ঈশ্বরের উপাসনার জন্যই ব্রহ্মমন্দির স্থাপিত হইল। সশ্রদ্ধ ও ভক্তভাবে যে-কোনো জাতি বা যে-কোনো সম্প্রদায়ের লোক সেখানে উপাসনা করিতে অধিকারী—"a place of public meeting of all sorts and

descriptions of people without distinction।" সুতরাং ট্রস্টডীডখানি পড়িলে বেশ বুঝা যায় যে, হিন্দু, মুসলমান খৃস্টান প্রভৃতি সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যে-সকল লোকের নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনার জন্য আগ্রহ আছে, এ মন্দির তাহাদেরি জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রামমোহন রায় প্রতি রবিবারে বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর য়্যুনিটেরিয়ান বন্ধু অ্যাডাম্ সাহেবের উপাসনা মন্দিরে গিয়া উপাসনা করিয়া আসিতেন। একদিন তাঁহার দুই সহচর চন্দ্রশেখর দেব ও তারাচাঁদ চক্রবর্তী বলিলেন, আমাদের নিজেদের ধর্মোপাসনার জন্য একটি মন্দির থাকা দরকার। তাহারি কিছুদিন পরে রামকমল বসুর বাড়িতে ব্রহ্মমন্দির স্থাপিত হইল। ১৮৩০ সালের ১১ই মাঘে ব্রাহ্মসমাজের নূতন মন্দির তৈরি হওয়ায় সেইখানে উপাসনা আরম্ভ হয়। সেই মন্দিরে ব্রাহ্মণ, শূদ্র, খৃস্টান, মুসলমান সকলে যাইত এবং মধ্যে মধ্যে সন্ধ্যাবেলায় ফিরিঙ্গি ও মুসলমান বালকেরা সেখানে পারসী ও ইংরাজী ভাষায় ঈশ্বরের স্তবগান করিত।

দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার 'ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত' নামক বক্তৃতায় ঠিকই লিখিয়াছেন, "ব্রাহ্মসমাজের সহিত তত্ত্ববোধিনী সভার যোগের অগ্রে ব্রাহ্মসমাজ যেন অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল— স্পন্দহীন হইতেছিল; তাহার যতদূর পর্যন্ত দুর্গতি হইতে পারে তাহা হইয়াছিল।··· ১৭৬৩ শকে তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত যোগ না হইলে ব্রাহ্মসমাজের কি পরিণাম হইত বলা যায় না। হয়ত আমরা ইহার কিছুই দেখিতে পাইতাম না। রামমোহন রায়ের এক ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল, আমরা সেখানে অধ্যয়ন করিয়াছি। কিন্তু তাহা এখন কোথায়? হয়ত ব্রাহ্মসমাজের দশা সেই প্রকার হইত।"

সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের ভার গ্রহণ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ দেখিতে পাইলেন যে, মন্দিরে "জোয়ার ভাঁটার ন্যায় কত লোক আসিতেছে, চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু কেহই এক ধর্মসূত্রে গ্রথিত হয় নাই।" মন্দিরে লোকসমাগমটাই তো লক্ষ্য নয়— লক্ষ্য-শূন্য লোকের সমাগম দিয়া কি উপকার হইবে? বিধিপূর্বক পৌত্তলিকতা ছাড়িয়া দিয়া যাঁহারা ব্রহ্মোপাসনায় ব্রতী হইবেন, তাঁহারাই তো ব্রাহ্ম হইবেন। তিনি লিখিয়াছেন, "অনেকে হঠাৎ মনে করিতে পারেন যে, ব্রাহ্মদল হইতে ব্রাহ্মসমাজ হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ব্রাহ্মসমাজ হইতে ব্রাহ্ম নাম স্থির হয়।" অতএব রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মোপাসনার মন্দিরখানি রক্ষা করিয়া দেবেন্দ্রনাথ খুশি হইলেন না। তিনি এই 'ব্রাহ্ম' অর্থাৎ যাহারা বিধিপূর্বক পৌত্তলিকতা ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মোপাসনাকে অবলম্বন করিয়াছে

এমন একদল লোকের একটি ধর্মমণ্ডলী বা সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিবার দিকে মন দিলেন। তিনি স্থির করিলেন যে, তাঁহারা কয়েকজনে মিলিয়া ১৮৪৩ খৃস্টাব্দে (১৭৬৫ শকের ৭ই পৌষে) আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের কাছে ধর্মদীক্ষা গ্রহণ করিবেন।

সমাজের যে নিভৃত কুঠরীটিতে বেদপাঠ হইত, তাহা একটা পর্দা দিয়া ঢাকা হইল। সেখানে একটি বেদী স্থাপিত হইল, বিদ্যাবাগীশ সেই বেদীতে আসন গ্রহণ করিলেন। ৭ই পৌষ বৃহস্পতিবার দিনে দুপুরবেলা তিন ঘণ্টার সময়ে ২১ জন যুবক সেই বৃদ্ধ আচার্যের কাছে দীক্ষার্থী হইয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন। তাঁহাদের সকলেরি মুখ ধর্মের উৎসাহে প্রদীপ্ত। দেবেন্দ্রনাথ প্রথমে বিদ্যাবাগীশের সামনে দাঁড়াইয়া একটি বক্তৃতা করিলেন। তিনি বলিলেন, "অদ্য এই শুভক্ষণে এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্মব্রত গ্রহণ করিবার জন্য আমরা সকলে আপনার নিকট উপনীত হইয়াছি। যাহাতে পরিমিত দেবতার উপাসনা হইতে বিরত হইয়া এক অদ্বিতীয় পরমব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারি, যাহাতে সৎকর্মে আমাদের প্রবৃত্তি হয় এবং পাপমোহে মুগ্ধ না হই, এইরূপ উপদেশ দিয়া আমাদের সকলকে মুক্তির পথে উন্মুখ করুন।" দেবেন্দ্রনাথের এই বক্তৃতা শুনিয়া ও তাঁহার প্রাণের একাগ্রতা দেখিয়া বিদ্যাবাগীশ আর চোখের জল রাখিতে পারিলেন না। তিনি শুধু বলিলেন যে, রামমোহন রায়ের এই ইচ্ছাই ছিল, কিন্তু তিনি তাহা কাজে পরিণত করিয়া যাইতে পারেন নাই। এতদিন পরে তাঁর সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইল। প্রথমে শ্রীধর ভট্টাচার্য উঠিয়া বেদীর সামনে প্রতিজ্ঞা পাঠ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলেন। পরে শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য, পরে দেবেন্দ্রনাথ। তার পরে ব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, প্রভৃতি ২১ জন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "এই ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়া আমরা নূতন জীবন লাভ করিলাম।…পূর্বে ব্রাহ্মসমাজ ছিল, এখন ব্রাহ্মধর্ম হইল। ব্রহ্ম ব্যতীত ধর্ম থাকিতে পারে না, এবং ধর্ম ব্যতীতও ব্রহ্ম লাভ হয় না। ধর্মেতে ব্রহ্মেতে নিত্য সংযোগ। এই সংযোগ বুঝিতে পারিয়া আমরা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলাম।" এই ৭ই পৌষের দীক্ষার দিনটিকে দেবেন্দ্রনাথ যে কত বড়ো মনে করিতেন তাহা তাঁহার একটি কথা হইতেই বুঝা যায়। তিনি লিখিয়াছেন, "অদ্য আমাদের প্রতি-হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্ম-বীজ রোপিত হইবে। আশা হইল, এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া কালে ইহা অক্ষয় বৃক্ষ হইবে, এবং যখন ইহা ফলবান্ হইবে, তখন ইহা

হইতে আমরা নিশ্চয় অমৃতলাভ করিব।" দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার সাধনার ক্ষেত্র শান্তিনিকেতনে উত্তরকালে যে আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন, প্রতি বছর সেখানে এই ৭ই পৌষের দিনে উৎসব হয় ও মেলা হয়। তাঁহারই ইচ্ছানুসারে সেখানে এই উৎসব ও মেলার আরম্ভ হয়। এই দিনটির পরে তাঁহার একটি সুগভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা কেন ছিল, তাহা উপরে উদ্ধৃত কথাটি হইতেই বুঝা যাইবে। তিনি এই দিনটিকে অমৃতফলসম্ভাবী বীজের মতো দেখিয়াছিলেন।

শান্তিনিকেতনের বাৎসরিক ৭ই পৌষের উৎসব উপলক্ষে একবার রবীন্দ্রনাথ এই দীক্ষার দিনটি সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "শান্তিনিকেতনের সাম্বৎসরিক উৎসবের সফলতাব মর্মস্থান যদি উদ্‌ঘাটন কবে দেখি তবে দেখতে পাব, এর মধ্যে সেই বীজ অমর হয়ে আছে, যে বীজ থেকে এই আশ্রম-বনস্পতি জন্মলাভ করেছে।

"সে হচ্ছে সেই দীক্ষাগ্রহণের বীজ। মহর্ষিব সেই জীবনের দীক্ষা এই আশ্রম-বনস্পতিতে আজ আমাদের জন্যে ফলছে এবং আমাদের আগামীকালের উত্তর-বংশীয়দের জন্যে ফলতেই চলবে।

"বহুকাল পুর্বে কোন্‌-এক দিনে মহর্ষি দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন, সে খবর কজন লোকই বা জানত? যারা জেনেছিল, যারা দেখেছিল, তারা মনে মনে ঠিক করেছিল, এই একটি ঘটনা আজকে ঘটল এবং আজকেই এটা শেষ হয়ে গেল।...

"আমাদের জীবনে কত শত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, কিন্তু চিরপ্রাণ তো তাদের স্পর্শ করে না, তারা ঘটছে এবং মিলিয়ে যাচ্ছে, তার হিসেব কোথাও থাকছে না।

"কিন্তু মহাপ্রাণ এসে কার জীবনের কোন্‌ মুহূর্তটিকে কখন লুকিয়ে স্পর্শ করে দেন, তার উপরে নিজের অদৃশ্য চিহ্নটি লিখে দিয়ে চলে যান, তার পরে তাকে কেউ না-দেখুক, না-জানুক, সে হেলায় ফেলায় পড়ে থাক্‌, তাকে আবর্জনা বলে লোকে ঝেঁটিয়ে ফেলুক— সেদিনকার এবং তার পরে বহুদিনকার ইতিহাসের পাতে তার কোনো উল্লেখ না-থাকুক— কিন্তু সে রয়ে গেল। জগতের রাশি রাশি মৃত্যু ও বিস্মৃতির মাঝখান থেকে সে আপনার অঙ্কুরটি নিয়ে অতি অনায়াসে মাথা তুলে ওঠে— নিত্যকালের সূর্যালোক এবং নিত্য-কালের সমীরণ তাকে পালন করবার ভার গ্রহণ করে— সদাচঞ্চল সংসারের ভয়ংকর ঠেলাঠেলিতেও তাকে আর সরিয়ে ফেলতে পারে না।

"মহর্ষির জীবনের একটি ৭ই পৌষকে সেই প্রাণস্বরূপ অমৃতপুরুষ একদিন

উপসংহার

পৃথিবী ও মনুষ্যের কার্য্যতত্ত্ব এবং মনুষ্য জাতি
সংসারে [illegible] — সংসারের প্রকৃতি
[illegible] ভাবিলে [illegible] মনুষ্য
সংসার হইতে শ্রেষ্ঠ। এই সংসার এক অসীম কার্য্য-কারণ
শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া চলিতেছে — দুর্ব্বল মনুষ্য তাহা ভঙ্গ-
করিতে পারিবে না — এবং সংসারকে [illegible] করিয়া [illegible]
[illegible]। কিন্তু এ কথায় [illegible]
সংসারের সহিত [illegible] মনুষ্যের [illegible]। [illegible]
[illegible] সহিত [illegible], [illegible]
[illegible]। [illegible]
সংসার [illegible]
[illegible], কিন্তু [illegible]
[illegible] — [illegible] সংসারের [illegible]।

[illegible] সংসার [illegible] — [illegible]
[illegible]। পৃথিবী [illegible]
[illegible]
[illegible] মনুষ্য
[illegible]
[illegible] না। [illegible] সংসারের অতীত, [illegible]
[illegible] না। পৃথিবী [illegible]
[illegible] কিছু [illegible]। [illegible]
[illegible]। [illegible]
[illegible]। [illegible]
[illegible] মনুষ্যের পৃথিবীর [illegible]
[illegible]। কিন্তু [illegible] প্রতি [illegible]
[illegible] না, [illegible]
[illegible] মনুষ্যে
[illegible]। [illegible] প্রভৃতি
[illegible]

চিরকালের উদারতা ও মহত্ত্ব জীবনের সম্বল
তোমার শরীর যেমন সর্বত্র-বিস্তৃত সকলের সংযুক্ত হবে, সেই কথা
এই পৃথিবী সমুদয় সংযুক্ত হবে। তোমার চিত্ত যেমন পরিব্যাপ্ত
সর্বত্র অভিজ্ঞান ... যেন সংযুক্ত হইতে থাকে, সেই কথা
এই পৃথিবীতে পার্থিব পৃথিবী প্রাচীন সব সংযুক্ত সেবায়
পাবে এবং উপলব্ধি হইতে হইবে। ইহাতে সংসারে
যদি প্রতিকূলতা হয়, তবে তুমি তাহা অতিক্রম করিও।

বিষয় সুখে দুঃখে আত্মা তৃপ্ত হয় না — সাধুর সৌন্দর্য
তাহে প্রেমের পূর্ণ হয় না — শোক-দুঃখ-বিমিশ্রিত হয় তাহা
তাহাতে শান্তি হয় না — ইহা বড় গভীর হয়ে অন্তরে নিবাস
করিতেছে যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং
ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। তাঁহার প্রেমে সুখ প্রেমে বিহ্বল
প্রেমের পূর্ণ সাধনাতেই ... তখন নিশ্চয়
প্রতিমুহূর্তে সন্তোষ ... নিত্যানন্দ সম্ভোগ।
বিষয় বাসনার "বিষয় সুখে মন তৃপ্ত না হওয়ায়
ঈশ্বরের প্রতি নিষ্কামভাবে ... সার্থক হবে

যে ব্রহ্মজ্ঞান পুরুষ জীবনসঙ্গী প্রাণের প্রাণ
সর্বত্র করিতেছে যে সত্যস্বরূপ অন্তরাত্মার কি
প্রকারে দেখিবে। যে চিত্ত-সুখে পবিত্র হইয়া
সে সেই সকল সত্যের প্রেমের সম্মুখে সর্বত্র —
... ... যে ... ...
... ... তাঁহার ... ...
... ... যে ... ...

শ্রী দেবেন্দ্রনাথ

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপদেশ

নিঃশব্দে স্পর্শ করে গিয়েছেন— তার উপরে আর মৃত্যুর অধিকার রইল না। সেই দিনটি তাঁর জীবনের সমস্ত দিনকে ব্যাপ্ত করে কি রকম করে প্রকাশ পেয়েছে তা কারও অগোচর নেই। তার পরে তাঁর দীর্ঘ জীবনের মধ্যেও সেই দিনটির শেষ হয় নি। আজও সে বেঁচে আছে— শুধু বেঁচে নেই, তার প্রাণশক্তির বিকাশ ক্রমশই প্রবলতর হয়ে উঠছে।...

"মহর্ষির ৭ই পৌষের দীক্ষার উপরে আত্মার দীপ্তি পড়েছিল— তার উপরে ভূত-ভবিষ্যতের যিনি ঈশান তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। এইজন্যে সেই দীক্ষা ভিতরে থেকে তাঁর জীবনকে ধনীগৃহের প্রস্তরকঠিন আচ্ছাদন থেকে সর্বদেশ সর্বকালের দিকে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছে— এবং সেই ৭ই পৌষ এই শান্তি-নিকেতন-আশ্রমকে সৃষ্টি করেছে এবং এখনও প্রতিদিন একে সৃষ্টি করে তুলছে।"

৭ই পৌষের দীক্ষাদিনের অমর বীজ থেকে শান্তিনিকেতন আশ্রম-বনস্পতির জন্ম হইয়াছে এবং সেই বীজের সফলতা সেখানেই দেখা দিতেছে কি না, সে প্রশ্ন এখানে তোলার দরকার নাই। কারণ শান্তিনিকেতনের আশ্রমের প্রসঙ্গে এখনো আমরা পৌঁছাই নাই। কিন্তু এই দিনটি যে দেবেন্দ্রনাথ জীবনের সমস্ত দিনকে ব্যাপ্ত করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, এই দিনটির উপরে যে অমৃতস্বরূপ আপনার চিহ্ন মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন— এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। সুতরাং ইহার বীজ হইতে দেবেন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে "আমরা নিশ্চয় অমৃত লাভ করিব।" কত দিকে দিকে কত শুভ অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া সেই অমরতার বীজের অঙ্কুরসকল দেখা দিবে এবং ক্রমশ সফল হইয়া উঠিবে। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন যে, "ইহার উপর আর মৃত্যুর অধিকার রহিল না।"— তাহা হইলে ইহার অমরতার রূপের আর সমাপ্তি কোথায়?

১৮৪৫ সালের পৌষের মধ্যে ৫০০ জন বিধিপূর্বক ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, তখন ব্রাহ্মের সঙ্গে ব্রাহ্মের যেরূপ আশ্চর্য মিল এমন সহোদর ভাইয়ে ভাইয়েও দেখা যায় না। ৭ই পৌষে ব্রাহ্মদিগকে লইয়া মেলা করিবার ভাব তখন হইতেই তাঁহার মনে জাগিয়াছিল। ১৮৪৫ সালে ৭ই পৌষে তিনি গঙ্গার পরপারে গোরিটির বাগানে এক মেলা করেন—বোটে করিয়া সকল ব্রাহ্মকে সেখানে লইয়া যান। সেইদিন উপাসনার পরে রাখালদাস হালদার প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মদিগের উপবীত ত্যাগ করা কর্তব্য। ব্রহ্মের উপাসকদিগের মধ্যে আবার জাতিভেদ কি? রাখালদাস হালদারের

পিতা ছেলের উপবীত ত্যাগের কথা শুনিয়া নিজের বুকে ছুরি মারিতে চাহিয়াছিলেন।

এ সম্বন্ধে রাখালদাস হালদার তাঁহাব এক বন্ধুকে পত্র লিখিয়াছিলেন—তাহার কিছু অংশ এখানে উদ্ধার করি—"পল্‌তার উদ্যানে ব্রাহ্মমণ্ডলীর সমক্ষে আমি যখন প্রতিজ্ঞা করি যে, প্রকাশ্যরূপে ব্রাহ্মধর্ম পালন করিব, তখন আমার মনে দৃঢ় প্রতীতি ছিল যে, আমি পিতার নিকট হইতে বহিষ্কৃত হইলে কোন মতেই তাঁহার দুঃখের বিষয় হইবে না।...আমার বিশ্বাস ছিল যে, পিতা বর্তমান থাকিলেও আমি এক প্রকার স্বাধীন, কারণ তিনি আমার প্রতি ক্রোধান্বিত হইলে আমারও ক্রোধবৃত্তি কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হইবে এবং আমি অবিচলিত চিত্তে সহধর্মিণীকে লইয়া কলিকাতায় আসিতে সমর্থ হইব। কিন্তু মঙ্গলবার রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় বাটীতে উত্তীর্ণ হইলে কি বিপরীত ভাব প্রতীত হইল! আমি পিতার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া উপবীত ত্যাগের বিষয় স্বীকার করাতে তিনি ক্রোধমিশ্রিত দুঃখ প্রকাশ পুর্বক আমাকে শয়ন করিতে অনুমতি করিলেন। পরদিবস প্রাতে বিদায় প্রার্থনা করাতে পিতা রোদন করিতে লাগিলেন এবং নানা বিতণ্ডার পর কহিলেন, "আমার মস্তকচ্ছেদ করিয়া যদি তুমি তুষ্ট থাক তবে তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।" এরূপ বাক্য শুনিয়া আমাকে স্তম্ভীভূত হইতে হইল।...সকলেই আমাকে উপবীত ধারণে অনুরোধ করিতে লাগিল।...এই প্রকারে চতুর্দিক হইতে স্নেহ-মিশ্রিত বাক্য শুনিয়া আমি হতজ্ঞান হইয়া অঙ্গীকার করিলাম যে, যদি আমার ধর্মানুযায়ী আর আর সকল বিষয় করিতে পারি, তবে আপনাদের অনুরোধ রক্ষার্থ সূত্র ধারণ করিব।"[১]

বিধিপুর্বক ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার মানে ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান করা। এই অনুষ্ঠান ব্যাপার লইয়াই হিন্দুসমাজের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের যত গোলযোগ। বুদ্ধি ও বিচারের দ্বারা বুঝিলাম যে, পৌত্তলিকতা ভুল; তাহা ঈশ্বরের সত্য পুজা নয় এবং তাহা আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রেরও উপদেশ নয়। অথচ নিজের বুদ্ধি-বিচার অনুসারে কাজ করিবার সাহস বা অভিরুচি আমাদের মধ্যে দেখা যায় না। রামমোহন রায় তাঁহার ঈশোপনিষদের ভূমিকায় স্পষ্ট দেখাইয়াছেন যে, "উপনিষদের দ্বারা ব্যক্ত হইবেক যে পরমেশ্বর একমাত্র সর্বব্যাপী...তাঁহারই উপাসনা প্রধান এবং মুক্তির প্রতি কারণ হয়।... যদি কহ, পুরাণ এবং তন্ত্রাদি শাস্ত্রেতে যে সকল দেবতার উপাসনা লিখিয়াছেন সে সকল কি অপ্রমাণ?"

[১] দ্রষ্টব্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী (চতুর্থ সংস্করণ), পরিশিষ্ট ৫৩, ৫৪।

তাহার উত্তরে তিনি লিখিয়াছেন যে, পুরাণতন্ত্রাদিতে সাকার উপাসনার বাহুল্য বর্ণনা থাকিলেও এ কথা স্বীকার করা হইয়াছে যে. "পরমেশ্বরের উপাসনাতে যাহার অধিকার হয়, কাল্পনিক উপাসনাতে তাহার প্রয়োজন নাই।"

কিন্তু এ সকল প্রমাণ দেখিলেও, নিজের বুদ্ধিকে এবং সেই বুদ্ধির সাহায্যে যথার্থ শাস্ত্রের উপদেশকে গ্রাহ্য করিয়া অগ্রসর হওয়া কেন এ দেশে অসম্ভব হয়? ইহার উত্তর রামমোহন রায় দিয়াছেন। প্রথম কারণ, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ "যাঁহারা শাস্ত্রার্থের প্রেরক হইয়াছেন", তাঁহারা জানেন যে, "সাকার উপাসনায় যথেষ্ট নৈমিত্তিক কর্ম এবং ব্রত যাত্রা মহোৎসব আছে; সুতরাং ইহার বৃদ্ধিতে লাভের বৃদ্ধি।" সুতরাং মূঢ়তাকে একবার স্থান দিলে, ধর্মানুষ্ঠান একবার বাহ্যিক প্রথা-পালন হইয়া দাঁড়াইলে, অজ্ঞলোকের তাহাতেই "মনের রঞ্জনা" হয়, কারণ "আপনার উপমায় ঈশ্বর এবং আত্মবৎ সেবার বিধি পাইলে ইহা হইতে অধিক কি তাঁহাদের আহ্লাদ হইতে পারে?" অতএব যাহাতে "মন এবং বুদ্ধিব চালনের অপেক্ষা রাখে" সেরূপ উৎকৃষ্ট উপাসনায় প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হয়। আমাদের হাড়ে মজ্জায় এই বহু যুগের সংস্কার সত্য অনুষ্ঠানকে অবলম্বন করিতে দেয় না। আমরা যে মূঢ় সংস্কারের দাস, ইহা কোনোমতেই বুঝিতে চাই না বলিয়া সমাজ এবং পুরুষানুক্রমিক প্রথা নামক একটা দুর্গকে আশ্রয় করিয়া আমরা যুক্তিব আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করি। সেইজন্য আমরা বলি, যাহা পুরুষানুক্রমে হইয়া আসিতেছে তাহা সহসা ছাড়া উচিত নয়—সমাজকে অগ্রাহ্য করিলে উদ্দাম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এই "পুরুষানুক্রমিক প্রথা" দুর্গটিকেও রামমোহন রায় ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছেন। ঈশোপনিষদের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন যে, যে-সকল ব্যক্তি পরম্পরার দোহাই দেন তাঁহারা যখন "পূর্বশিষ্টপরম্পরার অত্যন্ত বিপরীত এবং শাস্ত্রের সর্বপ্রকার অন্যথা, সামান্য লৌকিক প্রয়োজনীয় শত শত কর্ম করেন সে সময়ে তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ শাস্ত্র এবং পূর্বপরম্পরার নামও করেন না; যেমন আধুনিক কুলের নিয়ম; যাহা পূর্বপরম্পরার বিপরীত এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ। ইংরাজ—যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন, তাহাকে অধ্যয়ন করান কোন শাস্ত্রে আর কোন পূর্বপরম্পরায় ছিল? কাগজ যে সাক্ষাৎ যবনের অন্ন, তাহাতে গ্রন্থাদি লেখা কোন শাস্ত্রবিহিত আর পরম্পরাসিদ্ধ হয়? ইংরাজের উচ্ছিষ্ট করা আর্দ্র ওয়েফর দিয়া বদ্ধ করা পত্র, যত্নপূর্বক হস্তে গ্রহণ করা, কোন পরম্পরাতে পাওয়া যায়?"

রামমোহন রায় সাকার উপাসনার বিরুদ্ধে এবং পুরুষানুক্রমিক প্রথানুসরণের বিরুদ্ধে যতই যুক্তি দেখান-না কেন, বহুযুগের সংস্কারের আগল ভাঙা দু-এক দিনের কাজ নয়। সেইজন্য অনুষ্ঠানে বদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মধর্মব্রত গ্রহণ করিতে হইবে, দেবেন্দ্রনাথ যে এই নূতন আন্দোলনের সূত্রপাত করিলেন, ইহাতে একটি নূতন ধর্মমণ্ডলী আপনা আপনি গড়িয়া উঠিল। তাহার নাম ব্রাহ্মসমাজ। কিন্তু তাহা যে হিন্দুসমাজ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র হইয়া গেল, এমন মনে করিবার কোনো হেতু নাই। কারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রবর্তক রামমোহন তাঁহার সমস্ত বিচারগ্রন্থে এই একটি কথাই প্রমাণ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন যে, সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রের মতে ব্রহ্মোপাসনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা এবং সাকার উপাসনা নিকৃষ্ট উপাসনা ও কাল্পনিক উপাসনা। শঙ্কর শাস্ত্রীর সহিত বিচারে রামমোহন রায় স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে, তিনি নূতন ধর্মমতের স্থাপনকর্তা, এ কথা কোনোমতেই তিনি স্বীকার করিতে চান না। তিনি প্রকৃত শাস্ত্রার্থই বাহির করিয়া দেশের লোকের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন মাত্র। রামমোহন রায়ের এই পন্থা হইতে দেবেন্দ্রনাথ কখনোই সরিয়া যান নাই। দেশীয় সমাজকে সুস্থ ও উন্নত করিবার জন্যই যে একটা প্রাণবান ও ক্রিয়াবান সম্প্রদায়ের দরকার, এই কথা মনে রাখিয়াই তিনি সম্প্রদায় গড়ায় মন দিয়াছিলেন। সম্প্রদায় যে সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে গিয়া পড়িয়া তাহার উদ্দেশ্য ভুলিয়া যায় এবং সমাজশরীর হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে করিতেই ক্রমশ অভ্যস্ত হইতে থাকে, তাহার প্রচুর দৃষ্টান্ত ইতিহাসে দেখিলেও সম্প্রদায়ের ভিতর দিয়া ছাড়া কোনো বড়ো আদর্শকে মানুষ সমস্ত সমাজের বৃহৎ প্রাণের মধ্যে সঞ্চারিত করিতে কখনোই পারে না। সমাজের মধ্যে যখনি সেই আদর্শ নানা মূর্তিতে সাকার হইয়া উঠে, তখনই সম্প্রদায়ের প্রয়োজনের অবসান হয়। তখন সম্প্রদায় আপনার সাম্প্রদায়িকতার জোরে টিঁকিতে পারে না; প্রতি মুহূর্তেই সমস্ত বৃহৎ সমাজের শক্তির কাছে তাহার পরাভব ঘটিতে থাকে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উপাসনাপদ্ধতি সাধনপ্রণালী

দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার স্বরচিত জীবনচরিতে লিখিয়াছেন—"আমরা ব্রহ্মপ্রতিপাদক উপনিষদ্‌কেই বেদান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতাম। বেদান্ত-দর্শনকে* আমরা শ্রদ্ধা করিতাম না, যেহেতুক, তাহাতে শঙ্করাচার্য জীব আর ব্রহ্মকে এক করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমরা চাই ঈশ্বরকে উপাসনা করিতে। যদি উপাস্য উপাসক এক হইয়া যায়, তবে কে কাহাকে উপাসনা করিবে? অতএব বেদান্ত-দর্শনের মতে আমরা মত দিতে পারিলাম না। আমরা যেমন পৌত্তলিকতার বিরোধী, তেমনি অদ্বৈতবাদেরও বিরোধী। শঙ্করাচার্য উপনিষদের যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহা আমরা সম্পূর্ণরূপে লইতে পারিলাম না; যে-হেতুক, তিনি অদ্বৈতবাদের পক্ষে টানিয়া তাহার সমুদায় অর্থ করিয়াছেন। এই জন্যই ভাষ্যের পরিবর্তে আমার আবার নূতন করিয়া উপনিষদের বৃত্তি লিখিতে হইয়াছিল।"

দেবেন্দ্রনাথ শাঙ্কর মত কেন মানেন নাই এবং উপনিষদেরও অদ্বৈতবাদ-ঘেঁষা বাক্যগুলি কেন গ্রহণ করেন নাই, তাহার বিচার আমরা এ গ্রন্থের পরিশিষ্ট ভাগে করিলাম। কারণ, জীবনচরিতের স্রোতের মাঝখানে এ-সকল দার্শনিক বিচারের শৈলস্তূপ চাপানো চলে না।

শাস্ত্র মানা সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের মতের পার্থক্য আছে। রামমোহন রায় শাস্ত্রের সাহায্যেই ধর্মের সত্যসকল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যে সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গে তিনি যখন বিচারে লাগিয়াছেন, তখন তাহার শাস্ত্রকেই মানিয়া তাহা হইতেই সত্যের উদ্ধার করিয়াছেন। শাস্ত্রের উপর এইজন্য তাঁহার শেষ পর্যন্ত ভরসা ছিল। নহিলে তিনি কি পৌত্তলিক পূজার সমর্থক পুরাণতন্ত্রাদি শাস্ত্র হইতে পৌত্তলিকতাকেই আক্রমণ করিতে সাহস পাইতেন? বৈষ্ণব শাস্ত্র ভাগবতের সাহায্যে বৈষ্ণব ধর্মের শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া পূজাকে আক্রমণ করিতে সাহস পাইতেন? বাইবেলের সাহায্যে খৃস্টান ধর্মের নানা ভ্রান্ত সংস্কারকে আক্রমণ করিতে সাহস পাইতেন? নানা শাস্ত্র আলোচনা করিয়া তিনি পরিষ্কাররূপে সকল ধর্মের অন্তর্নিহিত বিশ্বজনীন সত্যকে ধরিতে পারিয়াছিলেন এবং ধর্মের লৌকিক ও ব্যবহারিক অংশকে সেই সার্বভৌমিক

* বেদান্তদর্শন বলিতে দেবেন্দ্রনাথ শাঙ্কর দর্শনই বুঝিয়াছেন।

অংশ হইতে বিবিক্ত করিয়া লইতেও পারিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার 'ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্তে' রামমোহন রায় সম্বন্ধে ঠিকই লিখিয়াছেন—"যদিও তিনি জানিতেন, ধর্মপ্রচার ও রক্ষার জন্য এক এক আপ্ত পুস্তকের অবলম্বন চাই, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাসের ভূমি সহজ জ্ঞান ছিল; তাহা না হইলে সকল ধর্মের মধ্য হইতে তিনি সার সত্য কেমন করিয়া সংকলন করিলেন?... রামমোহন রায় মনে করিয়াছিলেন, যাহারা বেদ মানে তাহাদের মধ্যে বেদ রক্ষা করিয়া পরব্রহ্মের উপাসনা প্রচলিত করা; কিন্তু যাহারা জ্ঞানবিজ্ঞানে উন্নত হইয়া বেদকে আপ্ত বাক্য বলিয়া না মানিবে, তাহাদের মধ্যে কি করা, ইহা তাঁহার তখন বিবেচনায় আইসে নাই।" আমার বিশ্বাস, দেবেন্দ্রনাথ এ জায়গায় রামমোহন রায়ের প্রতি ঠিক বিচার করিতে পারেন নাই। রামমোহন রায় কোনো শাস্ত্রকেই সর্বাংশে আপ্ত বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। 'তুহফাতুল মওয়াহেদ্দীন' নামে রামমোহনের পারস্যভাষায়-রচিত বইটিতে তিনি লিখিয়াছেন—"আমি হিন্দু মুসলমান খৃস্টানাদি নানা সম্প্রদায়ের ধর্মমত ও ধর্মশাস্ত্রের গূঢ় আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, ঈশ্বর একমাত্র অদ্বিতীয় ও তিনিই উপাস্য, এই মূল মতে সকলের ঐক্য আছে, কেবল অবান্তর ভেদ লইয়া বিবাদ-বিসংবাদ।"

সকল ধর্মের সার্বভৌমিক দিকটিকে দেখিতে পাইবার অপূর্ব ক্ষমতা রামমোহন রায়ের মতো এ যুগে আর কাহারো ছিল বলিয়া মনে হয় না। এ জায়গায় তাঁহার সহিত দেবেন্দ্রনাথ কেন, কাহারো তুলনা চলে না। দেবেন্দ্রনাথ শাস্ত্রকে আপ্ত বলিয়া না মানিলেও শাস্ত্রের যে দরকার আছে, ইহা বেশ জানিতেন। 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থই তাহার সাক্ষী। যখন বেদকেও সর্বাংশে লইতে পারিলেন না, উপনিষদ্‌কেও সর্বাংশে লইতে পারিলেন না, তখন "বেদ ও উপনিষদের যে সকল সার সত্য তাহা লইয়াই ব্রাহ্মধর্ম (গ্রন্থ) সংগঠিত হইল"। কিন্তু এ-সকল কথা পরে আলোচ্য।

শাস্ত্র মানা সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের মতের যেমনি ভেদ থাক্‌, ব্রহ্মোপাসনা সম্বন্ধে রামমোহন রায় যাহা বুঝিয়াছিলেন এবং ধর্মের মূল ভাব সম্বন্ধে ঐ 'ব্রহ্মোপাসনা' নামে তাঁর এক চটি বইতে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সহিত দেবেন্দ্রনাথের কোথাও কোনো অনৈক্য নাই। রামমোহন রায়ের 'গায়ত্র্যাপরমোপাসনাবিধানং', 'গায়ত্রীর অর্থ', 'অনুষ্ঠান', 'ব্রহ্মোপাসনা' ও 'প্রার্থনাপত্র'—এই কয়েকটি ছোটো চটি বইয়ে তাঁহার ব্রহ্মোপাসনার সমস্ত ভাবটি

দিব্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ জায়গায় দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতার সাদৃশ্য দেখিতে পাইয়া আশ্চর্য হইয়া যাইতে হয়! সেই সাদৃশ্যগুলি একে একে দেখাইতে ইচ্ছা করি।

প্রথমত গায়ত্রীর সাহায্যে উপাসনা রামমোহনের জীবনে শেষদিন পর্যন্ত চলিয়াছিল। গাড়িতে চলিতে চলিতে তিনি চোখ বুজিয়া এই গায়ত্রী মন্ত্র ধ্যান করিতেন। এই গায়ত্রী আবাব দেবেন্দ্রনাথের জীবনে শেষদিন পর্যন্ত অবলম্বন ছিল, এই গায়ত্রী তিনি কখনোই ছাড়েন নাই। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা লইবার সময়ে তিনি যে প্রতিজ্ঞাপত্র তৈরি করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রতিদিন গায়ত্রী মন্ত্রদ্বারা ব্রহ্মোপাসনা করার কথা ছিল। কিন্তু শেষে তিনি দেখিলেন, "গায়ত্রী মন্ত্র আয়ত্ত কবিয়া, তাহার অর্থ বুঝিয়া, ব্রহ্মের উপাসনা কবা অনেক সাধনা-সাপেক্ষ।" রামমোহন বায়ও 'গায়ত্রীর অর্থ' নামে এক চটি বইতে লিখিয়াছেন— গায়ত্রীর "জপকর্তাবা ইহার কি অর্থ তাহা জানিবাব অনুসন্ধান না কবিয়া শুকাদির ন্যায় কেবল উচ্চারণ করিয়া এ মন্ত্রেব যথার্থ ফলপ্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হইতেছেন।" তার পরে তিনি লিখিতেছেন, "প্রণবপূবক তিন মহাব্যাহৃতি অর্থাৎ ভূর্ভুবঃস্বঃ আর ত্রিপাদ গায়ত্রী এই তিন ব্রহ্মপ্রাপ্তির দ্বার হইয়াছে।" গায়ত্রীর মধ্যে এই তিন মন্ত্র। রামমোহন রায় তাহার নিম্নলিখিতরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন— আদি মন্ত্র ওঁ— ওঁ অর্থ জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ পরব্রহ্ম। কিন্তু ব্রহ্ম যে জগৎ হইতে পৃথক নহেন ইহা বলিবার জন্য বলা হইতেছে, ভূর্ভুবঃস্বঃ— অর্থাৎ ব্রহ্ম ভূলোক ভুবর্লোক ও স্বর্লোককে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। ভূর্ভুবঃস্বঃ দ্বিতীয় মন্ত্র। তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্যধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ, তৃতীয় মন্ত্র। অর্থাৎ "দীপ্তিমন্ত সূর্যের সেই অনির্বচনীয় অন্তর্যামী জ্যোতিঃস্বরূপ বিশেষমতে প্রার্থনীয়; তাঁহাকে আমরা চিন্তা করি। তিনি কেবল সূর্যের অন্তর্যামী হন এমত নহে, কিন্তু যে সেই স্বপ্রকাশ আমাদেব সর্বদেহীর অন্তঃস্থিত— অন্তর্যামী হইয়া বুদ্ধিবৃত্তিকে বিষয়ে প্রেরণ করিতেছেন।" যিনি সর্বলোকের প্রকাশক, তিনিই বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরয়িতা— সুতবাং তাঁহাকে একদিকে যেমন নিখিলবিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত বলিয়া জানিতে হইবে, অন্য দিকে তাঁহাকে তেমনি ধীশক্তির প্রেরয়িতা অন্তর্যামীরূপে ধারণা করিতে হইবে। যে ধীশক্তির দ্বারা তিনি অব্যক্ত জগৎকারণস্বরূপ এবং ব্যক্ত জগৎকে আদ্যন্তমধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, ইহা আমরা চিন্তা করিতে পারিব, সেই ধীশক্তির আবার তিনিই প্রেরয়িতা— সুতরাং তিনি নিকট হইতেও নিকটতম।

দেবেন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, "পুরুষানুক্রমে আমরা এই গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আসিতেছি। এই মন্ত্র আমাদের শিরায় শিরায়।··· আমি সম্যক্‌রূপে ব্রাহ্মধর্ম প্রতিপালনের জন্য প্রতিদিনই অভুক্ত অবস্থায় অতন্দ্রিত ও সংযত হইয়া গায়ত্রীর দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলাম।··· ক্রমে ক্রমে 'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ' আমার সমস্ত হৃদয়ে মিশিয়া গেল! ইহাতে আমার দৃঢ় নিশ্চয় হইল যে, ঈশ্বর আমাকে কেবল যে মূক সাক্ষীর ন্যায় দেখিতেছেন, তাহা নহে, তিনি আমার অন্তরে থাকিয়া অনুক্ষণ আমার বুদ্ধিবৃত্তি-সকল প্রেরণ করিতেছেন। ইহাতে তাঁহার সহিত একটি ঘনিষ্ঠ জীবন্ত সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইল।··· এতদিন আমি জানি নাই যে, তিনি আমার হাত ধরিয়া আনিয়াছেন, এক্ষণে আমি জানিয়া, তাঁহার হাত ধরিয়া চলিলাম। এই অবধি আমি তাঁহার আদেশ শুনিবার শিক্ষা করিতে লাগিলাম।··· গায়ত্রীমন্ত্র অবলম্বন করিয়া কি আশার অতীত ফলই পাইলাম।"

গায়ত্রী মন্ত্রের সাহায্যে ধ্যান-ধারণার উপকারিতা সম্বন্ধে যেমন রামমোহন রায় এবং দেবেন্দ্রনাথের ভাবের মিল দেখা যায়, তেমনি ব্রহ্মোপাসনার পদ্ধতি তৈরি সম্বন্ধেও এই দুই জনের মধ্যে আশ্চর্য মিল দেখিতে পাওয়া যায়। রামমোহন রায় ব্রহ্মোপাসনার "সংক্ষেপ ক্রম" তাঁহার 'ব্রহ্মোপাসনা' বইটিতে যেমন প্রকাশ করিয়াছেন, দেবেন্দ্রনাথের প্রথম ব্রহ্মোপাসনার পদ্ধতি অনেকটা সেই ক্রমই অবলম্বন করিয়াছিল। রামমোহন রায় লিখিয়াছেন—"ওঁ তৎসৎ সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ের কর্তা সেই সত্য। একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম—একমাত্র অদ্বিতীয় বিশ্বব্যাপী নিত্য ব্রহ্ম। এই দুয়ের সাহিত্যে অথবা পার্থক্যে শ্রবণ এবং চিন্তন করিবেক।" দেবেন্দ্রনাথ লিখিলেন, "প্রতিদিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিব।" এবং এই সমাধানের উপযোগী দুইটি মহাবাক্য তিনি বাছিয়া লইলেন: "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম" এবং "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি"। তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম এবং যাহা-কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহা তাঁহার আনন্দরূপ, অমৃতরূপ। এই আনন্দরূপের ভাবনা দেবেন্দ্রনাথের উপাসনা-পদ্ধতিতে নূতন। রামমোহন রায়ের মধ্যে এই আনন্দের উপলব্ধির দিকটা যে ছিল না তাহা বলি না। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতিতে সৌন্দর্যবোধ-শক্তি স্বভাবতই প্রবল থাকায় এই দিকটা তাঁহার মধ্যে যেমন ফুটিয়াছে, এমন আর কাহারো মধ্যে নয়। শঙ্কর-দর্শনের সঙ্গে এই জায়গায় রামানুজ-দর্শনের পার্থক্য। শঙ্কর বলেন, ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ; রামানুজ বলেন, ব্রহ্ম আনন্দবান্,

আনন্দস্বরূপ নন। রামমোহন রায় সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি'র জায়গায় যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে— যাঁহা হইতে সকল ভূত জন্ম লাভ করে, যাঁহাতে জীবিত থাকে এবং যাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়, তিনিই ব্রহ্ম— উপাসনার সময়ে এই শ্লোকের শ্রবণ ও মনন প্রশস্ত হইবে ভাবিয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ সত্যং জ্ঞানং অনন্তং প্রভৃতির সঙ্গে উপনিষদ্ হইতে আরো তিনটি শ্লোক যোগ করিলেন— ১ম শ্লোক : স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং। কবির্মনীষীপরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। "তিনি সর্বব্যাপী, নির্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ব্রণরহিত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ ; তিনি সর্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা ; তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বপ্রকাশ ; তিনি সর্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থ-সকল বিধান করিতেছেন।" কিন্তু তিনিই যে বিশ্বের স্রষ্টা, এ কথা যাহাতে মনন করা যায়, সেজন্য দ্বিতীয় শ্লোক আসিল : এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ খংবায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্যধারিণী। "ইহা হইতে প্রাণ, মন ও সমুদায় ইন্দ্রিয় এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও সকলের আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হয়।" কিন্তু তিনি তো শুধু স্রষ্টা নন, তিনি বিধাতা ও শাস্তা। তিনি মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং— অন্যায় কর্ম করিলে তিনি দণ্ড দেন। সুতরাং তিনি যে সকল নীতির আকর ও শাসনকর্তা ইহা চিন্তা করিবার জন্য তৃতীয় শ্লোক আসিল : ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ। "ইহার ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, ইহার ভয়ে সূর্য উত্তাপ দিতেছে, ইহার ভয়ে মেঘ ও বায়ু ও মৃত্যু ধাবিত করিতেছে।"

রামমোহন রায় কেবল পরমাত্মাতে আত্মার সমাধান অংশটুকু তাঁহার ব্রহ্মোপাসনায় রাখিয়াছিলেন। ঈশ্বরকে আনন্দময় স্রষ্টা ও পাতা এবং বিধাতা ও শাসনকর্তা রূপে ধারণা করিবার কোনো ক্রম তিনি তাঁহার উপাসনা-পদ্ধতিতে নির্দেশ করেন নাই। কিন্তু এই সমাধানের পর আরাধনা বা স্তবের দ্বিতীয় ক্রম রামমোহন রায়ও তাঁহার ব্রহ্মোপাসনায় ইঙ্গিত করিয়াছেন। আশ্চর্য এই যে "নমস্তে সতে, সর্বলোকাশ্রয়ায়"— মহানির্বাণ তন্ত্রের সেই স্তবটিকে রামমোহন রায় তাঁহার ব্রহ্মোপাসনা-পদ্ধতিতে কিছুমাত্র বদল না করিয়া বসাইয়া দিয়াছেন। সেইজন্য মনে হয় যে, নিশ্চয়ই দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার 'ব্রহ্মোপাসনা' নামক ছোটো বইটি দেখেন নাই। কারণ তিনি তান্ত্রিক কুলের শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশের নিকট হইতে এই স্তবটি পান। বেদের মধ্যে অনেক খোঁজ করিয়া ভালো ব্রহ্মস্তোত্র না পাইয়া অবশেষে মহানির্বাণতন্ত্রের এই স্তবটি পাইয়া, তিনি ইহার অদ্বৈতবাদ-

ঘেঁষা কথাগুলি সংশোধন করিয়া ইহাকে ব্রহ্মোপাসনায় ব্যবহারের উপযোগী করিয়া লইয়াছিলেন। রামমোহন রায় ইহাতে কোনো সংশোধন করেন নাই। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ঐ স্তবের শ্লোকগুলিতে 'বিশ্বরূপাত্মকায়'র জায়গায় 'জগৎ-কারণায়', 'নির্গুণায়'র জায়গায় 'শাশ্বতায়' ইত্যাদি অনেক জায়গায় বদল করেন। কেন করেন তাহা পরিশিষ্ট ভাগের আলোচনা পড়িলেই বুঝা যাইবে।

সেই তন্ত্রোক্ত স্তব এবং বদল হইবার পর তাহার কেমন চেহারা হইল তাহা নীচে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

নমস্তে সতে সর্বলোকাশ্রয়ায় নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায় নমো ব্রহ্মণেব্যাপিনে নির্গুণায় ॥১॥
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপং।
ত্বমেকং জগৎকর্তৃপাতৃপ্রহর্তৃ ত্বমেকং নিশ্চলং নির্বিকল্পং ॥২॥
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাং।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষকাণাং ॥৩॥
পরেশপ্রভো সর্বরূপা বিনাশিন্ন নির্দেশ্য সর্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য।
অচিন্ত্যাক্ষরব্যাপকাব্যক্ততত্ত্ব জগদ্ব্যাপকাধীশ্বরাধীশনিত্য ॥৪॥
বয়ং ত্বাং স্মরামো বয়ং ত্বাং জপামো বয়ং ত্বাং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
বয়ং ত্বাং নিধানং নিরালম্বমীশং নিদানং প্রসন্নং শরণ্যং ব্রজামঃ ॥৫॥

ইহার চতুর্থ রত্ন সম্পূর্ণ বাদ দিয়া এবং অন্য সকল রত্ন বদল হইয়া, নিম্নলিখিতরূপ দাঁড়াইল—

ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎকারণায় নমস্তে চিতে সর্বলোকাশ্রয়ায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায় নমো ব্রহ্মণেব্যাপিনে শাশ্বতায় ॥
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং ত্বমেকং জগৎপালকং স্বপ্রকাশম্।
ত্বমেকং জগৎকর্তৃপাতৃপ্রহর্তৃ ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্বিকল্পম্ ॥
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং গতিঃপ্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষকাণাম্ ॥
বয়ন্ত্বাং স্মরামো বয়ন্ত্বাম্ভজামো বয়ন্ত্বাং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ ॥

আশ্চর্য এই যে, এই পরিবর্তিত স্তবের প্রত্যেক রত্নের প্রত্যেক চরণের দুটি ভাগে ঈশ্বর-তত্ত্বের দুই দিক ফুটিয়া উঠিয়াছে। একদিক তাঁহার স্বরূপের দিক— অন্য দিক তাঁহার প্রকাশের দিক—ইংরাজী ভাষায় বলিতে গেলে একদিক

তাঁহার Transcendent দিক ও অন্য দিক তাঁহার Immanent দিক। তুমি সৎস্বরূপ ও জগতের কারণ— এ গেল তাঁর স্বরূপ নির্ণয়, তাঁর Transcendent দিক; কিন্তু তুমি চিৎস্বরূপ ও সকলের আশ্রয়— এ গেল তাঁর আমাদের চিদ্‌লোকে প্রকাশ, তাঁর Immanent দিক। তুমি অদ্বৈত তত্ত্ব, মুক্তিপ্রদ— কিন্তু তুমিই আবার সর্বব্যাপী শাশ্বত ব্রহ্ম। তুমি শরণ্য বরেণ্য এবং তুমি জগতের পালক ও স্বপ্রকাশ; এবং তুমিই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা শ্রেষ্ঠ, নিশ্চল ও বিকল্প-শূন্য। তুমি সকল ভয়ের ভয় ও ভয়ানকের ভয়ানক; অথচ তুমিই প্রাণিগণের গতি ও পাবনের পাবন। তুমিই মহোচ্চ পদসকলের নিয়ন্তা, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং রক্ষকদিগের রক্ষক; আমরা তোমাকে স্মরণ করি, তোমাকে ভজনা করি, তুমি জগতের সাক্ষী তোমায় নমস্কার করি। সত্যস্বরূপ আশ্রয়স্বরূপ অবলম্ব-রহিত; সংসার-সাগরের তরণী তোমার শরণাপন্ন হই।

এই পদ্ধতির শেষে একটি প্রার্থনা দেবেন্দ্রনাথ যোগ করিয়া দিলেন; কারণ শুধু আরাধনায় প্রার্থনার কাজ হয় না। প্রার্থনাটি এই—"হে পরমাত্মন্! মোহ-কৃত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া এবং দুর্মতি হইতে বিরত রাখিয়া তোমার নিয়মিত ধর্মপালনে আমাদিগকে যত্নশীল কর, এবং শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্বক অহরহ তোমার অপার মহিমা এবং পরম মঙ্গলস্বরূপ চিন্তনে উৎসাহযুক্ত কর; যাহাতে ক্রমে তোমার সহিত নিত্যসহবাসজনিত ভূমানন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।"

উপনিষদের তত্ত্বমূলক বচনের সঙ্গে এই যে আরাধনার স্তব ও প্রার্থনা মিলিল ইহাতেই ব্রহ্মোপাসনা পূর্ণাঙ্গ হইল। উপনিষদের মন্ত্রের সাহায্যে আত্মাকে পরমাত্মাতে 'সমাধান' সুন্দররূপে সম্পাদিত হয়; কারণ উপনিষদ্ ব্রহ্মোপাসনা বলিতে বুঝিয়াছেন, শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যঃ। ব্রহ্মবিষয়ক শাস্ত্র শ্রবণ করিতে হইবে, তাহার অর্থ চিন্তা করিতে হইবে এবং ব্রহ্মের সত্তাতে চিত্তকে নিবেশ করিবার অর্থাৎ 'সমাধান' করিবার ইচ্ছা করিতে হইবে। ইহাই ব্রহ্মোপাসনা। যত্রৈকাগ্রতা-তত্রাবিশেষাৎ। যেখানে চিত্ত স্থির হয়, সেইখানেই উপাসনা করা বিধেয়। রামমোহন রায় উপনিষদোক্ত উপাসনার এই প্রথম ক্রম— ব্রহ্মে চিত্ত-সমাধান ব্যাপারটিকে— অত্যন্ত গুরুতর মনে করিতেন। তাঁহার 'অনুষ্ঠান' নামক বইটিতে তিনি লিখিয়াছেন—"এই প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান যে জগৎ ইহার কারণ ও নির্বাহকর্তা পরমেশ্বর হন, শাস্ত্রত ও যুক্তিত এইরূপ যে চিন্তন তাহা পরমেশ্বরের উপাসনা হয়।" এই উপাসনার সাধনসম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "ইন্দ্রিয়দমনে ও

প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন করা এ উপাসনার আবশ্যক সাধন হয়। ইন্দ্রিয় দমনে যত্ন অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণকে এরূপ নিয়োগ করিতে যত্ন করিবেন যাহাতে আপনার বিঘ্ন ও পরের অনিষ্ট না হইয়া স্বীয় ও পরের অভীষ্ট জন্মে।"

কিন্তু ব্রহ্মোপাসনার এই অংশটুকু পরবর্তী কালের ব্রাহ্মসমাজে অত্যন্ত অবহেলিত হইয়াছে এবং নামমাত্রে রক্ষা পাইয়াছে।

ব্রহ্মসংগীতের সাহায্যে ব্রহ্মোপাসনা—ইহারও রামমোহন রায় সূত্রপাত করিয়া যান। গীত যে একরকমের মোক্ষসাধন, ইহা রামমোহন ভালো করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। প্রথম দিনের ব্রাহ্মসমাজে, উপাসনার সময়ে, রামমোহন রায়ের তিনটি গান গাওয়া হয়; 'শাশ্বতমভয়মশোকমদেহম্বং', 'বিগতবিশেষং' ও 'ভাব সেই একে'। এই ব্রহ্মসংগীত যদি ব্রহ্মোপাসনার অঙ্গীভূত না হইত, তবে আমাদের সাহিত্য কত দরিদ্র হইয়া থাকিত এবং বোধ হয় ব্রাহ্মধর্মের ভাবসকল দেশের মধ্যে ভালো করিয়া ছড়াইয়া পড়িতেও পারিত না। গানকে মোক্ষসাধনের উপায় জানিয়া রামমোহন রায় কবীরপন্থী, দাদূপন্থী ও নানকপন্থী-দিগকে ব্রহ্মোপাসক শ্রেণীর মধ্যে ফেলিয়াছিলেন।

ইহার পরে দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্মবীজের সেই চরণটি তুলিয়া দিলে আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে না যে রামমোহন রায়ের সঙ্গে তাঁহার ব্রহ্মোপাসনা সম্বন্ধে ভাবের মিল কেমনতর ছিল—তস্মিন্‌প্রীতিস্তস্যপ্রিয়কার্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব। তাঁহাকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।

রামমোহন রায়ও "তস্মিন্‌প্রীতি"র কথা অন্য ভাষায় লিখিয়াছেন—

"১। পরমেশ্বরেতে নিষ্ঠার সংক্ষেপ লক্ষণ এই যে তাঁহাকে…সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা এবং প্রীতিপূর্বক তাঁহার নানাবিধ সৃষ্টিরূপ লক্ষণের দ্বারা তাঁহার চিন্তন করা এবং তাঁহাকে ফলাফলের দাতা এবং শুভাশুভের নিয়ন্তা জানিয়া সর্বদা তাঁহার সমীহা করা অর্থাৎ এই অনুভব সর্বদা কর্তব্য যে যাহা করিতেছি, কহিতেছি এবং ভাবিতেছি তাহা পরমেশ্বরের সাক্ষাতে করিতেছি, কহিতেছি এবং ভাবিতেছি।"

এবং তস্য প্রিয়কার্যসাধনঞ্চের কথা অন্য ভাষায় লিখিয়াছেন—

"২। পরস্পর সাধু-ব্যবহারে কালহরণের নিয়ম এই যে অপরে আমাদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিলে আমাদের তুষ্টির কারণ হয়, সেইরূপ ব্যবহার

আমরা অপরের সহিত করিব—আর অন্তে যেরূপ ব্যবহার করিলে আমাদের অতুষ্টি হয়, সেরূপ ব্যবহার আমরা অন্তের সহিত কদাপি করিব না।"

দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "১৭৬৭ শকে (১৮৪৫ খৃস্টাব্দে) ব্রাহ্মসমাজে এই উপাসনা-প্রণালী প্রবর্তিত হয়।" ১৮৪৪ খৃস্টাব্দে জ্যৈষ্ঠের (১৭৬৬ শক) তত্ত্ববোধিনীতে "ব্রহ্মসঙ্গীতের ভূমিকা" নামে এক প্রবন্ধে দেখি যে রামমোহন রায় ও তাঁহাদের বন্ধুদের রচিত গানগুলি সংগ্রহ করিয়া ছাপানো হইয়াছে এবং সেই বইটির ভূমিকায় ভূমিকাকার লিখিতেছেন, "ঐ সকল গানে সংসারের অনিত্যতা এবং পরমেশ্বরের অদ্বিতীয়ত্বের বিষয় বারবার বর্ণিত আছে।" ঐ বছরের তত্ত্ববোধিনীতে অনেকগুলি নূতন ব্রহ্মসংগীতও প্রকাশিত হইয়াছে। সেগুলিও ঐ "মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর" গোছের ভয়ংকর গান। "ক্ষীণ পাঞ্চিকে শরীরে অভিমান কেন?"—একটি গানের প্রথম ছত্র। এ গানগুলি কষ্ট করিয়া রচনা না করিয়া মোহমুদ্গর যে কেন সুর করিয়া গাওয়া হইত না তাহা বুঝা যায় না। কেবল দেবেন্দ্রনাথের রচিত দু-একটি গানে এই ভাবের কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়। তাঁহার এই সময়ে তৈরি একটি গান নীচে তুলিয়া দিতেছি—

ভাব তাঁরে, অন্তরে যে বিরাজে; অন্য কথা ছাড না!
সংসার-সঙ্কটে, ত্রাণ নাহি কোন মতে, বিনা তাঁর সাধনা॥

তত্ত্বকথাকে সুর করিয়া গাইবার জন্য যে ব্রহ্মসংগীত নয়, এবং গান যে ভগবানের প্রেমোপলব্ধিতে প্রকাশ করিবে, এখনো পর্যন্ত ব্রহ্মসংগীত রচনার সে আদর্শ জাগে নাই।

১৮৪৫ খৃস্টাব্দে, এই নূতন উপাসনা-প্রণালী ব্রাহ্মসমাজে প্রবর্তিত হইবার পূর্বে, সেখানে বেদপাঠ হইত (শূদ্রের অসাক্ষাতে অবশ্য), উপনিষদের শ্লোক পড়া হইত, এবং তাহার অর্থ বলা হইত, আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ব্যাখ্যান পড়িতেন এবং পরমার্থতত্ত্বের ব্রহ্মসংগীত হইত। ১৮৪৫ খৃস্টাব্দে মহানির্বাণতন্ত্রের স্তোত্র পাঠ হইতে আরম্ভ হইল বটে, কিন্তু তাহার বাংলা অনুবাদ পড়া হইত না।

উপাসনা-পদ্ধতি তৈরি হইল, ১৮৪৩ খৃস্টাব্দে ব্রাহ্মপ্রতিজ্ঞাপত্রও ৭ই পৌষে দীক্ষাগ্রহণের সময়ে তৈরি হইয়াছিল। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞাপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং তাহা কেমনতর ছিল জানিবার কোনো উপায় নাই। রাজনারায়ণ বসু বলেন, "ব্রাহ্মপ্রতিজ্ঞাপত্র যে কত পরিবর্তন ও সংশোধনের পর বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে তাহা বলা যায় না।"

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার *History of the Brahmo Somaj* প্রথম ভল্যুমে লিখিয়াছেন, "এই সময়ে মহানির্বাণতন্ত্রের নির্দেশ অনুসারে দীক্ষাবিধি ব্রাহ্মসমাজে চলিয়াছিল। ব্রাহ্মণদিগকে দীক্ষার কালে শিখা এবং সূত্র ত্যাগ করিতে হইত। অবশ্য দীক্ষার পরে তাঁহারা পুনরায় তাহা পরিতে পাইতেন। কিছুকাল ধরিয়া এক প্রথা চলিয়াছিল, যে ধুনুচিতে ধূপ জ্বালাইয়া দীক্ষার স্থানে তাহা আনা হইত এবং সেই ধূপের আগুনে যজ্ঞোপবীত ফেলিয়া তাহা পোড়ানো হইত। তাহার গন্ধ যে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পক্ষে সুখজনক হইত, তা মোটেই নয়। দীক্ষার্থীকে একটা আংটি দেওয়া হইত; সেই আংটিতে "ওঁতৎসৎ" এই মন্ত্র খোদিত থাকিত। শোনা যায় যে, মহানির্বাণতন্ত্রের নির্দেশ অনুসারে দেবেন্দ্রনাথ দীক্ষার্থীদিগকে হিন্দুপ্রথা আশ্রয় করিয়া মন্ত্র দিতেন। অবশ্য মন্ত্রগুলি যে ব্রাহ্মধর্মের মন্ত্র ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। ইহাও শোনা যায় যে, কাঁচড়াপাড়ার জগৎচন্দ্র রায় এবং লোকনাথ রায়ের অন্তঃপুরে মহিলাদিগকে এইরূপে মন্ত্র দিবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতা সমাজের উপাচার্য পণ্ডিত শ্রীধর ন্যায়রত্নকে পাঠাইয়াছিলেন। এরূপ মন্ত্রদানের আর কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।"

রামমোহন রায়ের "গায়ত্র্যাপরমোপাসনাবিধানং" পড়িয়া দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের যে প্রথম প্রতিজ্ঞাপত্র তৈরি করেন, তাহাতে একটি প্রতিজ্ঞা ছিল এই—"প্রতিদিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্বক দশবার গায়ত্রী জপের দ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা করিব।" আমাদের দেশে মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রে পর্যন্ত শূদ্রের পক্ষে গায়ত্রী-মন্ত্র শোনার অধিকার নাই; ব্রাহ্মণের পক্ষে তাই গায়ত্রী উচ্চারণ করাও নিষেধ —কারণ গায়ত্রী সমস্ত বেদের মাতৃস্বরূপা। এক মহানির্বাণতন্ত্র শাস্ত্রে গায়ত্রীমন্ত্রে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ সকলেরি সমান অধিকাব আছে, এই কথা সাহসের সহিত বলিয়াছে। সুতরাং রামমোহন রায় গায়ত্রীর দ্বারা উপাসনা-বিধানের মধ্যে মহানির্বাণতন্ত্রের সেই বিধান আগাগোড়া উদ্ধার করিয়াছেন। এখানে সেই তন্ত্রবিধানের কয়েকটি শ্লোকের পুনরুদ্ধার করা যাইতেছে—

তথা সর্বেষু মন্ত্রেষু গায়ত্রী কথিতা পরা।
জপেদিমাং মনঃপূতং মন্ত্রার্থমনুচিন্তয়ন্॥
প্রণবব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্রীপঠিতা যদি
সর্বাসু ব্রহ্মবিদ্যাসু ভবেদাশুশুভপ্রদা॥…
অবধূতো গৃহস্থো বা ব্রাহ্মণোঽব্রাহ্মণোপি বা।
তন্ত্রোক্তেষেষু মন্ত্রেষু সর্বেষ্যরধিকারিণঃ॥

"সেই প্রকার সকল মন্ত্রের মধ্যে গায়ত্রীকে শ্রেষ্ঠরূপে কহিয়াছেন, পবিত্র মনে মন্ত্রার্থ চিন্তাপূর্বক তাঁহার জপ করিবেক ॥

"প্রণব ব্যাহৃতির সহিত যদি গায়ত্রী পঠিত হয়েন, তবে অন্য সকল ব্রহ্মবিদ্যা অপেক্ষা গায়ত্রী ঝটিতি শুভপ্রদান করেন ॥···

"অবধূত অথবা গৃহস্থ, সেইরূপ ব্রাহ্মণ কিম্বা ব্রাহ্মণ ভিন্ন এই তন্ত্রোক্ত মন্ত্রে সকলেই অধিকারী হয়েন।" —রামমোহন রায়ের অনুবাদ।

মহানির্বাণতন্ত্রের নির্দিষ্ট দীক্ষাবিধি ব্রাহ্মসমাজে গ্রহণ করিবার একটা বড়ো কারণ এইখানে দেখিতে পাওয়া যায়— এই তন্ত্রে গায়ত্রীমন্ত্রে সকলেরি অধিকার আছে, এই কথা বলা হইয়াছে। এই তন্ত্রশাস্ত্রকে যদি রামমোহন রায়ের ভিতর দিয়া দেবেন্দ্রনাথ না পাইতেন, তবে সকলকে নির্বিচারে গায়ত্রীমন্ত্র দিবার মতো বিদ্রোহের কথা তিনি একেবারে গোড়াতেই বলিয়া বসিতে পারিতেন কিনা জানি না। আগমকারেরা বাংলাদেশে ধর্মের আকার একেবারে বদল করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহারা বৈদিক হোম, দীক্ষা ও অন্যান্য ক্রিয়ার জায়গায় তান্ত্রিক হোম ও দীক্ষা ক্রিয়াদি স্থাপন করিয়াছিলেন। সুতরাং এখানে মহানির্বাণতন্ত্রের নলের ভিতর দিয়া বেদ-উপনিষদের নির্মল গঙ্গোদক পরিবেশিত হওয়ায়, বেদ-উপনিষদ্‌কে ব্যবহার করা লোকের পক্ষে সহজ হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

যাই হোক, কাঁচড়াপাড়ায় অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকদিগকে মন্ত্র দিবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ যে পণ্ডিত শ্রীধর ন্যায়রত্নকে পাঠাইয়াছিলেন বলিয়া পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, সে সম্বন্ধে অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনীলেখক মহেন্দ্রনাথ রায় আরো লেখেন এই যে, স্ত্রীলোকদের জন্য "দেবেন্দ্রবাবু এই মত স্থির করেন ও প্রচার করিতে উদ্যত হন যে, স্ত্রীলোকেরা পুষ্প, চন্দন ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা করিবে।" ১৮৬৮ খৃস্টাব্দের 'ইণ্ডিয়ান মিররে' ২৩ বছর পরে কাঁচড়াপাড়ার ঐ ঘটনাটাকে খুঁড়িয়া বাহির করা হয়; সেই মিররের প্রমাণের উপর মহেন্দ্রবাবু এই কথা লিখিয়াছেন। ১৮০৮ শকের (১৮৮৬ খৃস্টাব্দ) কার্তিকের তত্ত্ববোধিনীতে মহেন্দ্রবাবুর লিখিত ঐ জীবনীর সমালোচনা ও উহাতে বর্ণিত কোনো কোনো ভুল ঘটনার প্রতিবাদ বাহির হয়। তাহাতে এই ঘটনা সম্বন্ধে লেখা হয় "একদা শ্রীধর ন্যায়রত্ন আসিয়া তাঁহাকে (দেবেন্দ্রনাথকে) কহেন, কাঁচড়াপাড়ার কোন বৈষ্ণপরিবারের কোন কোন স্ত্রীলোক ব্রাহ্মধর্মের প্রণালী-ক্রমে ঈশ্বরের আরাধনা করিতে অসমর্থ। তাঁহাদিগকে আমি মহানির্বাণতন্ত্রোক্ত পুষ্পচন্দনাদি দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা করিতে বিধি দিয়াছি। ইহা শুনিয়া তিনি

(দেবেন্দ্রনাথ) বলিলেন যে, অশিক্ষিত স্ত্রীদিগের পক্ষে নিরীশ্বর ও উপাসনাশূন্য হইয়া থাকা অপেক্ষা হৃদয়ের ভক্তিভরে পুষ্পচন্দনাদি দ্বারা ব্রহ্মের পূজা করাও বরং ভাল।" মহানির্বাণতন্ত্রের প্রভাব যে ব্রাহ্মসমাজের উপরে [illegible] পড়িয়াছিল, এই ঘটনা হইতেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ব্রহ্মনিষ্ঠোগৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ ॥

ব্রাহ্মধর্মের এই গার্হস্থ্যে থাকিয়া ধর্মাচরণের আদর্শের মন্ত্রটিও মহানির্বাণ-তন্ত্রের অষ্টমোল্লাস হইতেই সংগৃহীত।

এই সময়ের ব্রাহ্মপ্রতিজ্ঞাপত্র সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসু ঈষৎ ভিন্ন বিবরণ দেন। তিনি বলেন, "যে সকল ব্রাহ্মণ 'ব্রাহ্ম' এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাঁহারা উপাসনা সময়ে উপবীত পরিত্যাগ করিয়া উপাসনা করিতেন। উপাসনা হইয়া গেলে তাহা আবার পরিতেন।" যাহাই হউক তিনি যখন লিখিয়াছেন যে, ব্রাহ্মপ্রতিজ্ঞাপত্র অনেক পরিবর্তন ও সংশোধনের পর বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, এবং সেই প্রতিজ্ঞাপত্র যখন তত্ত্ববোধিনীতে ছাপা হয় নাই, তখন তাহার মূল চেহারা বা পরিবর্তিত ও সংশোধিত চেহারা দেখার কোনো সম্ভাবনা নাই। আদি ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান প্রতিজ্ঞাপত্র ১৮৫০ খৃস্টাব্দে প্রবর্তিত হয়—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এই কথা বলেন।[১]

ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাবিধি এবং ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের প্রতিজ্ঞাপত্র যেমনি থাকুক, ব্রহ্মোপাসনার পদ্ধতিটি দেবেন্দ্রনাথের একটি প্রধান কীর্তি। এ তাঁহার অধ্যাত্ম-সাধনার অমর ফল। যদিও কেহ কেহ দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, দেবেন্দ্র-নাথের সাধন-প্রণালী যে কী ছিল, তাহা তাঁহার লেখা হইতে বুঝিবার জো নাই।

শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসন—এই তিন অন্তরঙ্গ সাধন-প্রণালী তাঁহার চিরজীবনের অবলম্বন ছিল। তিনি নিজে লিখিয়াছেন যে, গায়ত্রীধ্যানের দ্বারা পরমাত্মার সহিত তাঁহার একটি "ঘনিষ্ঠ জীবন্ত সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইল।" ঈশ্বর অন্তরে থাকিয়া সকল বুদ্ধি-বৃত্তি প্রেরণ করিতেছেন, এই বোধ তাঁহার মনে এমন স্পষ্ট হইল যে, তিনি তাঁহার "আদেশ" শুনিবার শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন কোন্‌টা মনের প্রবৃত্তি আর কোন্‌টা তাঁহার আদেশ তাহা ক্রমশ বুঝিতে পারিলেন। ঈশ্বরের আদেশের উল্টা কোনো কাজ করিলে তাঁহার শাসন অনুভব

১ দ্রষ্টব্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী (চতুর্থ সংস্করণ), পরিশিষ্ট ২৫ এবং ব্রাহ্মধর্মঃ (নবম সংস্করণ), পৃ ৬-৭।

করিতেন, আর তাঁর আদেশ পালন করিয়া কোনো সাধু কাজ করিলে "সমুদয় হৃদয় পুণ্য-সলিলে পবিত্র হইত।"

এই আদেশ শোনা প্রভৃতি ব্যাপারকে কেহ কেহ 'hallucination of the senses' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-বিভ্রম বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করেন, অথচ এ জিনিসগুলা সাধকমাত্রের জীবনে এত পুনঃপুনঃ ও বিচিত্রভাবে দেখা দেয় যে, ইহাকে ইন্দ্রিয়বিভ্রম বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। ইন্দ্রিয়বিভ্রম যে কোথাও ঘটে না এমন কথা মনে করা আবার ভুল। অনেক সময় কল্পনার সুর চড়িলে বা রঙ চড়িলে অনেক জিনিস শোনা যায় বা দেখা যায় এবং সেই সুর বা রঙ একটু-আধটু নরম পড়িলে একেবারেই ছায়ার মতো সব মিলাইয়া যায়। মানুষের সমস্ত প্রকৃতি যখন অবিভক্ত ভাবে জাগিয়া ওঠে, যখন তাহার ইন্দ্রিয়, মন, হৃদয়, চিরাগত জন্ম-সংস্কার, এ-সমস্ত এক হইয়া মিলিয়া গিয়া ব্যক্ত ও অব্যক্ত চৈতন্যের মাঝখানের পর্দাটাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দেয়, তখন সেই অবস্থায় মানুষ যে-সব অতীন্দ্রিয় দৃশ্য দেখে বা বাণী শোনে তাহা এক হিসাবে তাহারি সৃষ্টিশক্তির ফল। এমনিতর অবস্থাতেই চিত্রকর তাহার অলিখিত চিত্রকে চোখের সামনে ভাসিতে দেখে, গায়ক তাহার অগীত রাগিণী কানে শুনিয়া চঞ্চল হয়, কবি তাহার অস্ফুট রসসৃষ্টির কলামূর্তিকে সর্বেন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করে। সাধকের কল্পনায় যে-সব ইঙ্গিত, যে-সব বিগ্রহ ভাসিতে থাকে, গভীর ধ্যানের দ্বারা তাহারাই অস্পষ্ট হইতে স্পষ্ট হয়, নিরাকার হইতে সাকার হয়। সেই সাকার বিগ্রহই (Symbol) কখনো বা দৃশ্যরূপে কখনো বা বাণীরূপে সাধকের কাছে প্রত্যক্ষ ও শ্রুতিগম্য হয়।

ম্যাডাম গেঁয়ো দেবেন্দ্রনাথেরই মতো 'মনের প্রবৃত্তি' আর ঈশ্বরের 'আদেশ' —এ 'দুয়ের পৃথক্ ভাব' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"অনেক স্পষ্ট ভিতরকার কথা যাহা শোনা যায়, তাহা বিভ্রমজনিত—তাহা সয়তানের কাছ হইতে আসে।... ঈশ্বর স্বয়ং যে কথা আত্মাতে আপনি বলেন সে একেবারে আসল কথা। তাহা নীরব অথচ জীবনপ্রদ এবং প্রাণপ্রদ।"

এই ঈশ্বরের সাক্ষাৎ "আদেশ" শুনিয়া প্রত্যেক কাজ করা, ইহার পর হইতে দেবেন্দ্রনাথের জীবনে নিশ্বাস প্রশ্বাস লওয়ার মতো সহজ হইয়া গিয়াছিল। এমন-কি, বিষয়কর্মের ব্যবস্থা করিতে গেলেও তিনি চোখ বুজিয়া ঈশ্বরসান্নিধ্যে কর্তব্য স্থির করিয়া লইতেন।

কোনো বহিরঙ্গ সাধনপ্রণালী যে তিনি কোনো সময়েই বিশেষভাবে গ্রহণ

করিয়াছিলেন, এমন আমার মনে হয় না। তাঁহার বহিরঙ্গ-সাধন ছিল নির্জন প্রকৃতির সহবাসে থাকিয়া তাহার অপরিসীম শান্তি সৌন্দর্য ও আনন্দের আস্বাদন করিয়া সেই পরম শান্ত, পরম সুন্দর, পরমানন্দকে প্রকৃতির মধ্যে সহজেই উপলব্ধি করা। ইহাই তাঁহার "জগন্মন্দিরে অনন্তদেবকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া তাঁহার উপাসনা" করা। এই বহিরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গ দুই সাধনা অভেদাঙ্গ হইয়া যে অমৃতফল উৎপন্ন করিল, তাহাই ঐ ব্রহ্মোপাসনা-পদ্ধতি। অন্তরঙ্গ-সাধনের মন্ত্র—সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম—বহিরঙ্গ-সাধনের মন্ত্র—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।

কিন্তু আমার মনে হয় যে, এ সময়ে এই অন্তরঙ্গ-সাধনায় তিনি যতটা অগ্রসর হইয়াছিলেন এমন বহিরঙ্গ-সাধনায় নহে। প্রকৃতির ভিতর দিয়া প্রকৃতির স্বামীকে দেখা তাঁহার পক্ষে সহজ—সে ঐশ্বর্যের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখা, সৌন্দর্যের মধ্যে সুন্দরকে দেখা। এ দেখা কঠিন হইলেও অন্তরের মধ্যে ঈশ্বরকে অন্তরতম ভাবে একান্ত ও নিবিড় উপলব্ধির চেয়ে সহজ। প্রকৃতির মধ্যে বাহিরে, তাঁহার সত্তার উপলব্ধির মন্ত্র ছিল—ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতিসূর্যঃ—ইহার ভয়ে অগ্নি উত্তাপ দিতেছে, সূর্য উত্তাপ দিতেছে। সেখানে তিনি রাজা, তিনি শাসনকর্তা, তিনি প্রবল ও শক্তিমান্। এই সাধনার আরো একটু গভীরে আসিলে, বড়ো জোর তাঁহাকে পিতা ও প্রাণদাতা বলিয়া উপলব্ধি হয়। কিন্তু অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি তো তা নয়—সে যে প্রেমের উপলব্ধি। তাহাতে যে ক্ষুধাতৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় না। এ উপলব্ধিতে তিনি রাজা নন, পিতা নন, তিনি নাথ। সমস্ত হৃদয় তখন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলে—"হে নাথ! তোমার দর্শন পাইয়াছি, তুমি আরো জাজ্জ্বল্য হইয়া আমাকে দর্শন দাও। আমি তোমার বাণী শুনিয়া কৃতার্থ হইয়াছি, তোমার আরো মধুর বাণী আমাকে শোনাও। তোমার সৌন্দর্য নবতররূপে আমার সম্মুখে আবির্ভূত হোক। তুমি এখন আমার নিকটে বিদ্যুতের ন্যায় আসিয়াই চলিয়া যাও, তোমাকে আমি ধরিয়া রাখিতে পারি না, তুমি আমার হৃদয়ে স্থায়ী হও।" এ যে কত ব্যাকুল ও কত নিবিড় উপলব্ধি তাহা দেবেন্দ্রনাথের আর-একটি কথা হইতে বুঝি—"জানিলাম, তিনি আমার প্রাণের প্রাণ, হৃদয়সখা, তিনি ভিন্ন আমার এক নিমেষও চলে না।"

এখানে উপনিষদের তত্ত্বজ্ঞানের সাধনাকে তিনি যেন ছাড়াইয়া ঐকান্তিকী ভক্তির রসনিবিড় সাধনায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয়।

ইহা গীতার ভক্তিযোগের সেই কথা স্মরণ করায়—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মিতত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥

—১৮ অধ্যায়, ৫৫ শ্লোক।

অর্থাৎ আমি যাদৃশ (সর্বব্যাপী) এবং যাহা (সচ্চিদানন্দঘন) তাহা একান্ত ভক্তি-যোগে ভক্ত প্রকৃতরূপে জানিতে পারেন এবং তার পরে আমাকে স্বরূপতঃ জানিয়া আমাতে প্রবেশ করেন॥

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, গায়ত্রী ধ্যানের দ্বারাই তিনি এই তন্ময়তা লাভ করিয়াছিলেন— সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ধ্যানের দ্বারা নয়। জ্ঞানমার্গের সাধনায় ভক্তিমার্গে যে কেমন করিয়া পৌঁছানো যায়, দেবেন্দ্রনাথের অধ্যাত্মসাধনার এই অপূর্ব বিকাশের ক্রম অনুসরণ করিলে তাহা সুস্পষ্ট দেখা যায়। ব্রহ্মোপাসনা-পদ্ধতিতে পরমাত্মায় আত্মার সমাধানের প্রথম ক্রম হইতে আরাধনা ও স্তবস্তুতির দ্বিতীয় ক্রম যাহা নির্দেশিত হইয়াছে, তাহা দেবেন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-সাধনার বিকাশেরই ক্রম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিবাহিত জীবন বন্ধুপ্রীতি

কোনো সাধু মহাপুরুষের জীবন আলোচনার সময় একপেশে হইয়া পড়ার একটা বিপদ আছে। সাধুর দেবভাবের কথা বলিতে গিয়া তাঁহার মনুষ্যস্বভাবের কথা আর বলা হয় না। সাধুদের জীবনের এই লৌকিক অংশ বাদ দিবার জন্যই তাঁহাদের জীবনব্যাপার অলৌকিক হইয়া উঠে।

যে-সকল সাধু সংসারে বিরাগী হইয়া চিরজীবন সন্ন্যাসী হইয়াছেন, ভারতবর্ষে তাঁহাদের সম্মান যেমনি থাক্, বিশ্বমানব সেই বৈরাগ্যের আদর্শকে বড়ো আদর্শ বলিতে পারিবে না। ইউরোপের মধ্যযুগীয় সাধুসন্ন্যাসীদের এই আদর্শ ছিল। আমাদের দেশেও মধ্যযুগ হইতে এই আদর্শই চলিয়া আসিতেছে। এ দেশের পনেরো-আনা লোকের ধারণা এই যে, সংসারে থাকিয়া ধর্ম হয় না। ধার্মিক হইতে গেলে বনে পর্বতে গিয়া সন্ন্যাসী হইতে হয়। জনক রাজার আদর্শ, যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ীর আদর্শ— উপনিষদে আছে; কিন্তু উপনিষদ্ পুরাণ হইতেও এত পুরানো যে তাহা হইতে কোনো সাকার মূর্তি গড়ানো অসম্ভব। অধিকাংশ লোকের মানসচক্ষে মুনিঋষি বলিলে যাত্রার দলের নারদের এক রাশ শুভ্র দাড়ি ভিন্ন আর-কোনো ছবি জাগে কি না সন্দেহ। অতটা সুদূর অতীতের সমুদ্র পাড়ি দিবার মতো কল্পনার পাখা সব মানুষের নাই— সেজন্য আক্ষেপ মিথ্যা।

সংসারে থাকিয়া পরমার্থ সাধন করিয়াছেন এমন সাধু মহাপুরুষের যথেষ্ট উদাহরণ কোথায়? আমাদের দেশে তাহা বিরল, পশ্চিমদেশে এখনকার কালে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অর্থের সঙ্গে পরমার্থের প্রণয় ঘটাইবার জন্য আয়োজন অনেক কাল হইতেই চলিতেছে; কিন্তু মিলনের বাঁশি আজ পর্যন্ত বাজিল কই? এ যুগে এই আদর্শটা আসিয়াছে বটে, অথচ তাহার মূর্তি তৈরি হয় নাই। সেইজন্য এই আদর্শ সম্বন্ধে লোকের মনে সংশয় আর ঘুচিতে চায় না।

দেবেন্দ্রনাথের অতি অল্প বয়সেই বিবাহ হইয়াছিল। সতেরো বছর বয়সে। তাঁহার স্ত্রী, সারদাসুন্দরী দেবীর বয়স তখন আট বছর ছিল মাত্র। তিনি যশোহরের রায়চৌধুরী-বংশের মেয়ে। তখনকার কালে ঠাকুরদের অতি দূর হইতে মেয়ে আনাইয়া বিবাহ করিতে হইত বলিয়া মেয়েদের অদৃষ্টে আর

বাপের বাড়ি যাওয়া ঘটিয়া উঠিত না। বিবাহের পরে চিরজন্মের মতো বাপের বাড়ি হইতে বিদায় লইতে হইত। সে বড়োই কষ্টের ব্যাপার ছিল। আট বছরের কচি মেয়েকে স্বামীর ঘরে পাঠাইয়া, সারদা দেবীর মা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই আট বছরের সময় সারদা দেবী স্বামীর ঘরে আসিয়াছিলেন আর আটচল্লিশ কি উনপঞ্চাশ বছর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়— সুতরাং বেয়াল্লিশ তেতাল্লিশ বছর তিনি স্বামীর ঘর করিয়াছিলেন।

১৮৩৪ খৃস্টাব্দে, দেবেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়— তখন তিনি বালক এবং তাঁহার স্ত্রী শিশু। যৌবনে যখন তিনি "বিলাসের আমোদে" ডুবিয়াছিলেন, কলিকাতা শহরে তাঁহার বাবুয়ানার খ্যাতি রটিয়া গিয়াছিল, তখনো তাঁহার দিদিমা বাঁচিয়া ছিলেন; দিদিমাই তখন তাঁর সব— দিদিমার আদরযত্নেই তিনি মানুষ। একুশ বছর বয়সে সেই দিদিমার মৃত্যু হইল। সেই সময় তাঁহার অধ্যাত্মজীবনের সূত্রপাত, মানসিক বিষাদে তিনি ছটফট করিতেছেন। তাঁহার কাছে "জীবন নীরস, পৃথিবী শ্মশান-তুল্য"। তার পর যখন ঈশোপনিষদের সেই ছিন্ন পত্র পাইলেন— ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত আচ্ছাদিত করো; তিনি যাহা দান করিয়াছেন তাহা ভোগ করো— তখনই তাঁহার বিষাদ ঘুচিয়া গেল। তিনি "ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ" পাইলেন। ১৮৩৮ খৃস্টাব্দে, তাঁহার প্রথমে একটি কন্যাসন্তান জন্মলাভ করে এবং জন্মের পরে মারা যায়। ১৮৪০ খৃস্টাব্দে তাঁহার প্রথম পুত্র শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম হয়। ১৮৪২ খৃস্টাব্দে সত্যেন্দ্রনাথ, ১৮৪৪ খৃস্টাব্দে হেমেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন।

দেবেন্দ্রনাথ যে কোনো কালেই বহিঃসন্ন্যাসের পক্ষপাতী ছিলেন না, ১৮৪৩ সালে একটি সামান্য ব্যাপারে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ বছরেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশে তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদের রচনা পরীক্ষা করিয়া সর্বোৎকৃষ্ট রচনার লেখককে সম্পাদক নিয়োগ করা স্থির হয়। অক্ষয়কুমার দত্তের রচনা দেবেন্দ্রনাথের সবচেয়ে ভালো বলিয়া বোধ হয় এবং তিনিই সম্পাদক নিযুক্ত হন। কিন্তু অক্ষয়কুমার তাঁহার রচনায় এক জায়গায় "জটাজুটমণ্ডিত ভস্মাচ্ছাদিতদেহ তরুতলবাসী সন্ন্যাসীর প্রশংসা করিয়াছিলেন।" দেবেন্দ্রনাথের তাহা ভালো লাগে নাই। তিনি লিখিয়াছেন, "চিহ্নধারী বহিঃসন্ন্যাস আমার মতবিরুদ্ধ।" অথচ এ সময়ে সংসারের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ঔদাসীন্য ও বৈরাগ্য ছিল। তিনি তত্ত্ববোধিনী সভা ও ব্রাহ্মসমাজ লইয়াই ব্যস্ত —সংসারের সুখভোগের প্রতি তাঁহার সুগভীর বিতৃষ্ণা। তাঁহার পিতা,

দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া ক্রমশ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। কারণ, বিষয়কর্মে তিনি মনোযোগ দেন না, আমোদপ্রমোদের মজলিসে তাঁহার মনের অনুরাগ নাই। দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "তখন যে আমি উপনিষদে এই কথা পড়িয়াছি যে, 'ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ।' আর কি কেহ বিষয়েতে আমাকে ডুবাইতে পারে? আর কি কেহ আমাকে ঈশ্বরের নিকট হইতে দূরে লইয়া যাইতে পারে?" তিনি যে তখন বিষয়সম্পত্তি একেবারেই দেখিতেন না, তাহা ১৮৪৬ খৃস্টাব্দে (১৭৬৮ শকে) বিলাত হইতে দ্বারকানাথ ঠাকুরের এক ভর্ৎসনা-পত্র পড়িলেই বেশ বুঝা যায়। দ্বারকানাথ ঠাকুর এক ইংরাজী পত্রে তাঁহাকে লিখিতেছেন, "আমি ভাবিয়া অবাক হই যে, এখনো আমার সমস্ত বিষয় একেবারে নষ্ট হইয়া যায় নাই কেন! আমার বিশ্বাস তোমার সমস্ত সময় খবরের কাগজ লিখিয়া এবং মিশনারিদের সঙ্গে লড়াই করিয়াই কাটিতেছে এবং জমিদারির অত্যন্ত জরুরি কাজগুলি তুমি নিজে না দেখিয়া আমলাদের হাতে ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছ।" বাস্তবিক, দেবেন্দ্রনাথের এই সময়কার সংসার-বৈরাগ্য মধ্যযুগীয় খৃষ্টীয় সাধু বা এদেশের সাধুসন্ন্যাসীদের সংসার-বৈরাগ্যেরই মতো। সংসার, বিষয়সম্পত্তি, এ-সমস্তই তখন ধর্মজীবনের পক্ষে অন্তরায় বলিয়া তাঁহার মনে হইত। ত্রিশ বছর বয়সে— পিতার মৃত্যুর পরে, যখন দেনার দায়ে তাঁহার অতুল বিষয়সম্পত্তি নষ্ট হইল, তখনো তিনি হাফেজের বয়েদ আওড়াইয়া বলিতেছেন, "সেই অভিলাষে, বিদ্যুতের প্রার্থনা ছাড়া কোন প্রার্থনা না থাকুক— যদি বিদ্যুৎ পড়িয়া ধনধান্য জ্বলিয়া যায়, তবে সে বড় আশ্চর্য নহে।" "আমি যা চাই তাই হইল, বিষয়সম্পত্তি সকলি হাত হইতে চলিয়া গেল।" অথচ ইহাই আশ্চর্য যে, তিনি ইউরোপের ও ভারতবর্ষের মধ্যযুগীয় সাধুসন্ন্যাসীর মতো সংসার ত্যাগ করিয়া একেবারে গুহাবাসী হইলেন না, কিম্বা দণ্ডকমণ্ডলু-হাতে বাহির হইয়া পড়িলেন না। তিনি লিখিয়াছেন, "ঘরে থাকিয়া সন্ন্যাসী হইলাম।"

এই সুদীর্ঘ সময়ে, তাঁহার সংসার-বৈরাগ্যের এই পর্বে, তাঁহার স্ত্রীর যে কী অবস্থা ছিল তাহা কল্পনা করা শক্ত নয়। হিন্দুঘরের মেয়ে— ঠাকুর-দেবতার প্রতি ভক্তির সংস্কার তাঁহার অস্থিমজ্জার ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া আছে। অথচ বালিকা বয়স হইতেই শুনিতেছেন যে, স্বামী ঠাকুরদেবতা মানেন না, ব্রহ্ম ব্রহ্ম করিয়া বেড়ান— পৌত্তলিক পুজায় নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পর্যন্ত চান না। তার পর তাঁহার দিদিমার মৃত্যুর পর হইতেই তাঁহার উদাস ভাব— সমস্ত দিন কৌচে

পড়িয়া আছেন, চাকরেরা আসিয়া মধ্যে মধ্যে খাওয়াইয়া যাইতেছে এবং তিনি যে খাইয়াছেন সে কথা ভুলিয়া গিয়া তাহাদিগকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাঁহার খাওয়া হইয়াছে কি না? এ-সকল কথা নিশ্চয়ই তাঁহার কানে আসিতেছিল এবং তাঁহার হৃদয়কে কতই পীড়িত ও উদ্‌বিগ্ন করিতেছিল। বিষয়কর্মে মন নাই, গান বাজনা মজলিসে মন নাই—কর্তা এজন্য বিরক্ত হইতেছেন, সে কথাও কি তাঁহার কানে যায় নাই? তাঁহার প্রতিও যে মনের এ অবস্থায় তিনি যথেষ্ট মনোযোগ করিয়াছিলেন, এ কথাও তো বিশ্বাস হয় না। তিনি নিজে আশ্চর্য রূপবান পুরুষ— দীর্ঘাকৃতি সুগঠিত শরীর; প্রশস্ত ও উজ্জ্বল ললাট; বড়ো বড়ো চোখ— তাহাতে যেমন বিদ্যুতের মতো দীপ্তি, তেমনি মেঘের মতো স্নিগ্ধতা; বর্ণ অপূর্ব গৌর। দেবেন্দ্রনাথ নিজে যেমন সুপুরুষ, তাঁহার স্ত্রী সারদা দেবী তেমনি সুন্দরী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার ভোগবিলাসের পর্বে তাঁহার স্ত্রী বালিকা মাত্র। স্ত্রী যখন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন তখন তাঁহার স্বামী ঘরে থাকিয়াও সন্ন্যাসী। স্ত্রীলোকের সুখ-সৌভাগ্য সমস্তই তাঁহার পুরাপুরি জুটিয়াছিল, কিন্তু সকল সুখ-সৌভাগ্যের মূল যিনি তাঁহারি সকল বিষয়ে বীতরাগ! সুতরাং সারদা দেবীর অবস্থা যে এই সময়ে কেমন ছিল তাহা কল্পনা করা শক্ত নয়। দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীতে একটিমাত্র জায়গায় সারদা দেবীর কথা আছে, আর কোথাও নাই; কিন্তু সেই একটি জায়গাতেই তাঁহার যে চিত্রটি পাওয়া যায়, তাহা বড়োই করুণ।

১৮৪৫ খৃস্টাব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুর দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে যান। তাঁহার বিপুল জমিদারি, ব্যাঙ্ক, কোম্পানি, সমস্ত তত্ত্বাবধানের ভার দেবেন্দ্রনাথের উপরেই পড়িল। অথচ তিনি তখন "বেদ বেদান্ত, ধর্ম, ঈশ্বর ও চরমগতির অনুসন্ধানে" ব্যস্ত। এ-সব বৈষয়িক ব্যাপার দেখাশোনা কি তাঁহার কাজ? তিনি তাই কর্মচারীদের উপরে তদারকের ভার ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকিবার উপায় ছিল না, কারণ তাঁহারি উপরে আসল ভার। তিনি লিখিয়াছেন— "বাড়ীতে যে একটু স্থির হইয়া বসিয়া থাকি, তাহাও পারিয়া উঠিতাম না। এত কর্মকাজের প্রতিঘাতেতে আমার উদাস ভাব আরো গভীর হইয়া উঠিয়াছিল। এত ঐশ্বর্যের প্রভু হইয়া থাকিতে আমার ইচ্ছা করিত না। সব ছাড়িয়া ছুড়িয়া একা একা বেড়াইবার ইচ্ছাই আমার হৃদয়ে রাজত্ব করিতে লাগিল। তাঁহার প্রেমে মগ্ন হইয়া একাকী এমন নির্জনে বেড়াইব যে, তাহা কেহ জানিতেও পারিবে না;— জলে স্থলে তাঁহার মহিমা প্রত্যক্ষ করিব, দেশ-

ভেদে তাঁহার করুণার পরিচয় লইব ; বিদেশে, বিপদে, সঙ্কটে পড়িয়া তাঁহার পালনী-শক্তি অনুভব করিব—এই উৎসাহে আমি আর বাড়ীতে থাকিতে পারিলাম না।”

“১৭৬৮ শকের (১৮৪৬ খৃস্টাব্দে) ভাদ্র মাসের ঘোর বর্ষাতেই গঙ্গাতে বেড়াইতে বাহির হইলাম। আমার ধর্মপত্নী সারদা দেবী কাঁদিতে কাঁদিতে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ‘আমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? যদি যাইতেই হয়, তবে আমাকে সঙ্গে করিয়া লও।’ আমি তাঁহাকে সঙ্গে লইলাম। তাঁহার জন্য একটা পিনিস ভাড়া করিলাম। তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ এবং হেমেন্দ্রনাথকে লইয়া তাহাতে উঠিলেন।”

এই একটি ঘটনাতে যেমন সারদা দেবীর একটি করুণ আলেখ্য পাই, তেমনি দেবেন্দ্রনাথেরও স্নেহশীলতার কী একটি সুন্দর ছবি ইহার মধ্যে পাওয়া যায়! তিনি চলিয়াছেন ঈশ্বরের প্রেমে মগ্ন হইয়া একাকী নির্জনে বেড়াইবার জন্য। কিন্তু তিনি স্ত্রী-পুত্রকে ফেলিয়া যান নাই ; স্ত্রীর সকরুণ অনুরোধকে ঠেলেন নাই। স্ত্রীর প্রতি তাঁহাব বরাবরই এমনি একটি স্নেহ ছিল।

স্বামীর সঙ্গে দূরে ভ্রমণের সুযোগ আর সারদা দেবীর হয় নাই। দেবেন্দ্রনাথ ইহার পরে কখনো সিমলায়, কখনো বক্রোটায়, কখনো মারী-পর্বতে, কখনো কাশ্মীরে, প্রান্তরে পর্বতে একলা ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, তখন স্ত্রী তাঁহার সঙ্গিনী ছিলেন না। শুনিয়াছি একবার তিনি স্বামীর সঙ্গে হিমালয়ে যাইবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, পাহাড়ে তাঁহাকে যে পরিমাণ ক্লেশ ও অসুবিধা সহ্য করিতে হয়, সময় সময় যে-রকম বিপদের মুখেও যাইতে হয়, কোনো স্ত্রীলোকের পক্ষে সে পারমাণ ক্লেশ, অসুবিধা ও বিপদের মধ্য দিয়া ভ্রমণ করা একেবারেই অসম্ভব। ঝাঁপানে করিয়া পাহাড়ে উঠিতেছেন, কোথায় যাইবেন, কোথায় থাকিবেন, তাহার ঠিকানা নাই। হয়তো কোথাও আশ্রয় জুটিল, কিন্তু খাদ্য জুটিল না। একটা খাটিয়ার উপর সমস্ত রাত কাটাইতে হইল।

যখন হইতে তাঁহার মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান স্ফুটিল এবং প্রতিমাপুজার প্রতি তাঁহার আর শ্রদ্ধা থাকিল না, তখন হইতে পুজার সময়ে দেবেন্দ্রনাথ বাড়ি ছাড়িয়া ভ্রমণে বাহির হইতেন। তাঁহার স্ত্রীর মনে প্রচলিত ধর্মের সংস্কার যথেষ্ট প্রবল ছিল ; কিন্তু স্বামী বাড়িতে থাকিতেন না বলিয়া পুজার উৎসবে যাত্রা গান আমোদ যত কিছু হইত, তিনি তাহার মধ্যে কিছুতে যোগ দিতে পারিতেন

না। তখন নির্জন ঘরে তিনি একলা বসিয়া থাকিতেন। তাঁহার জায়েরা আসিয়া তাঁহাকে কত সাধ্যসাধনা করিতেন, তিনি বাহির হইতেন না।

অথচ পুজা-অর্চনায় তাঁহার বিশেষ নিষ্ঠা ছিল। গ্রহণের সময় উৎসর্গ করা, ব্রাহ্মণকে গোদান করা, বারো মাসে তেরো পার্বণ করা—এ-সকল তিনি খুব নিষ্ঠার সঙ্গেই করিতেন। দেবেন্দ্রনাথ প্রায়ই বিদেশে কাটাইতেন বলিয়া তাঁহার মনে উদ্‌বেগের আর সীমা ছিল না। তখন গ্রহাচার্য ব্রাহ্মণেরা আসিয়া ক্রমাগত শান্তিস্বস্ত্যয়নাদির দ্বারা তাঁহার স্বামীর আপদ দূর করিবার প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহার কাছে সর্বদাই অর্থ লইত। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা লিখিয়াছেন, "আমরা ছোটবেলায় শিবপুজা ইতুপুজা প্রভৃতি যাহা দেখিতাম তাহারই অনুকরণ করিতাম। দুর্গোৎসবের সময় প্রতিমার নিকট অঞ্জলি দিয়া তবে জলগ্রহণ করিতে পাইতাম; আমার ঘরে কৃষ্ণের ছবি ছিল, আমি গোপনে ফুলজল লইয়া ভক্তির সহিত সেই ছবির পুজা করিতাম।"

১৮৪৬ খৃস্টাব্দে রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। সেই সময় হইতে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার চিরজীবনের বন্ধুতার আরম্ভ। সে-সকল কথা পরে হইবে। কোনো বন্ধুর স্ত্রীকে চিঠিতে দেবেন্দ্রনাথ মৈত্রেয়ী বলিয়া ডাকিতেন। রাজনারায়ণবাবুর স্ত্রীর সম্বন্ধে তাঁহার দুইখানি চিঠির দুইটা টুকরা এখানে উদ্‌ধৃত করিলে স্ত্রীকে সহধর্মিণী করিবার আদর্শ যে তাঁহার মনে কত উজ্জ্বল ছিল তাহা বেশ দেখা যাইবে—

"তোমার মৈত্রেয়ীকে আমি আমার কন্যা তুল্য দেখি, সে অতি সুশীলা হইয়াছে শুনিয়া তাহার জন্য এবং তোমার জন্য পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। তাহার আত্মা এইক্ষণে ব্রহ্মজ্ঞান-জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইলে ব্রহ্মপ্রীতি রসেতে আর্দ্র হইলে যে তাহার কি শোভা হইবে, সে শোভার সহিত কি কোন শোভার তুলনা হইতে পারে? স্বর্ণময় অলঙ্কারে তাহার কি প্রয়োজন? সুন্দর শরীরের মধ্যে যদি মন সুন্দর হয়, এবং সেই সুন্দর মন যদি পুর্ণ-সুন্দরকে ধারণ করে, তবে সে সৌন্দর্যের নিকটে কি অন্য কোন সৌন্দর্য লক্ষ্য হয়?"

"প্রশস্ত সময় পাইলেই তোমার মৈত্রেয়ীকে তুমি উপদেশ দিতে থাকিলে, কালে তিনি অবশ্যই জ্ঞানস্বরূপ নিরাকার ব্রহ্মকে ভাবিতে পারিবেন। তুমি জীবাত্মার উপমার দ্বারা যে পরমাত্মাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছ, উত্তম উপায় অবলম্বন করিয়াছ।··· স্বর্ণলতাকে ব্রাহ্মধর্ম উত্তম রূপে শিখাইতে হইবেক।"

ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থের অনুশাসন খণ্ডেও তিনি স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধের আদর্শ নিম্নলিখিত শ্লোক অবলম্বনে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"অন্যোন্যস্যা ব্যভিচারো ভবেদামরণান্তিকঃ।
এষধর্মঃ সমাসেন জ্ঞেয়ঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ পরঃ॥"

"অর্থাৎ, স্ত্রীপুরুষে মরণান্ত পর্যন্ত পরস্পর কাহারও প্রতি কেহ ব্যভিচার করিবেক না; সংক্ষেপেতে তাঁহাদের এই পরম ধর্ম জানিবে।"

টীকা: "পতি ও পত্নী কি ধর্মে, কি সাংসারিক কার্যে কি ভোগে পরস্পরকে অতিক্রম করিবেন না। পত্নী স্বামীর সহধর্মিণী হইবেন সহকর্মিণী হইবেন ও সহভোগিনী হইবেন। ধর্মকার্যে পরস্পর পৃথক্ হওয়াকে ধর্মবিষয়ক ব্যভিচার কহে; ইহা স্ত্রীপুরুষের আধ্যাত্মিক প্রেমে বিঘ্ন উৎপাদন করে। সাংসারিক কার্যে পরস্পর ভিন্ন হওয়াকে অর্থবিষয়ক ব্যভিচার কহে; তাহা দ্বারা সংসারে অনেক অনিষ্ট উৎপন্ন হয়। যদি পতি অন্য স্ত্রীতে ও পত্নী অন্য পুরুষে আসক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহারা ভোগ-বিষয়ে ব্যভিচারী হইলেন; ভোগবিষয়ক ব্যাভিচারই অধিকতর মন্দ; কেন না ইহা হইতে পাপ ও অপবিত্রতা উৎপন্ন হইয়া ব্যভিচারীকে ধর্ম হইতে পতিত করিয়া রাখে।"

দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বসুকে যে চিঠি লিখিয়াছেন এবং ব্রাহ্মধর্মে উপরোক্ত শ্লোকের যে ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, তাহার আদর্শ অনুসারে নিজের স্ত্রীকে "সহ-ধর্মিণী, সহকর্মিণী ও সহভোগিনী" করিবার জন্য চেষ্টার কখনোই ত্রুটি করেন নাই। তাঁহাকে তিনি নিজে ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ পড়াইয়া ব্রাহ্মধর্মের সত্যসকল তাঁহার মনে মুদ্রিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পারিবারিক উপাসনা যখন তাঁহার বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন প্রতিদিন প্রভাতে তাঁহার স্ত্রী তাঁহার বাম দিকে উপাসনায় বসিতেন। শেষাশেষি তাঁহার স্ত্রীর পৌত্তলিক সংস্কার অনেকটা পরিমাণে কাটিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু আমার কাছে ইহাই আশ্চর্য লাগে যে, দেবেন্দ্রনাথ কোনোদিন তাঁহার উপর লেশমাত্র জোর করেন নাই। তাঁহার পৌত্ত-লিক পুজার নিষ্ঠাকে বলপূর্বক আঘাত করিয়া ভাঙিয়া দিতে চান নাই। মানুষের স্বাধীনতার উপর তাঁহার কি আশ্চর্য শ্রদ্ধা ছিল! ভিতর হইতে যখন সংস্কারের মূল আপনি ছিঁড়িয়া যাইবে, তখনই তাহা সত্যরূপে যাইবে, ইহাই তিনি মনে করিতেন। তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিবার ধৈর্য তাঁহার ছিল। তাহা যদি না থাকিত, তবে কখনোই স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধের মধ্যে শান্তি থাকিত না। দেবেন্দ্রনাথ অবশ্য একালের Femininist movement, স্ত্রী-স্বাধীনতার হাঙ্গামার

বিষয় কিছুই জানিতেন না; স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ লইয়া পশ্চিমদেশের সাহিত্যে যে-সব লড়াই চলিতেছে, সেই ইব্‌সেন-মেটারলিঙ্ক-হাউপ্‌ট্‌ম্যানদের নামও তখনো ওঠে নাই। তাঁহার আদর্শ সেই পুরানো আদর্শই ছিল— Subjection of women— স্ত্রী, "ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্মসু সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্যেষু দক্ষয়া"— ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগতা ও সখীর ন্যায় তাঁহার হিতকর্ম সাধন করিবেন এবং সর্বদা প্রহৃষ্ট থাকিয়া গৃহকার্যে সুদক্ষ হইবেন। কিন্তু স্ত্রীকে তিনি যে পরিমাণে স্বাধীনতা দিয়াছিলেন, তাহা একালের কোনো স্বামীর পক্ষে দেওয়া শক্ত। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো বিষয়ে মতভেদ গুরুতর রকমে থাকিলে এমন অশান্তির সৃষ্টি হয় যে, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রেমই মলিন হইয়া আসে— ইহার দৃষ্টান্ত বিস্তর দেওয়া যাইতে পারে। দেবেন্দ্রনাথ নিজে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে প্রাণপণে সংগ্রাম করিতেছেন, অথচ তাঁহার পত্নী পৌত্তলিক ধর্মে নিষ্ঠাবতী, ইহা তাঁহার মনকে অধীর ও অশান্ত করিয়া তুলিতে পারিত। অথচ তাহা যে হয় নাই, ইহা তাঁহার আশ্চর্য ঔদার্য ও ধৈর্যেরই ফল।

তখনকার কালে মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চা বড়ো একটা ছিল না। বৈষ্ণব মেয়েরা কেহ কেহ বাংলা এমন-কি সংস্কৃত শিক্ষা করিত, তাহারাই বাড়িতে বাড়িতে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিত। তাহাদের কাছে শিখিয়া রামায়ণ মহাভারত এবং দু-একটা গল্পের বই পড়িতে পারিলে তাহাই যথেষ্ট শিক্ষা মনে করা হইত। দেবেন্দ্রনাথের স্ত্রী সেই রকম শিক্ষাই পাইয়াছিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ক্রমে এই স্ত্রীশিক্ষায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। ইহার পরে তাঁহার কন্যাদের শিক্ষার সময় যখন উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তিনি তাঁহাদের শিক্ষার পুরাপুরি ব্যবস্থার জন্য বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছিলেন। তাহা আমরা পরে দেখিব। ছোটোখাটো বিষয়ে পর্যন্ত তাঁহার দৃষ্টি ছিল। যেমন মেয়েদের পোশাক। বাহিরে যাইবার পক্ষে তাহা একেবারেই শোভন ছিল না বলিয়া তিনি নিজের কল্পনা হইতে নানা রকমের পোশাক তৈরি করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অনেকটা পেশোয়াজের ধরনের পোশাক তৈরি হইয়াছিল। মেয়েদের চুল বাঁধা পর্যন্ত তিনি নিজে দেখিতেন— তাঁহার পছন্দমত চুল বাঁধিতে হইত।

১৮৪০ খৃস্টাব্দে (১৭৬১ শকে) দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্ম হয় বলিয়াছি। তখন দ্বারকানাথ ঠাকুর জীবিত, তখন ঠাকুর-পরিবারের ঐশ্বর্যের মধ্যাহ্নকাল। দ্বিজেন্দ্রনাথের শৈশবে মায়ের চেয়ে তাঁহার মেজকাকীমার— গিরীন্দ্রনাথ

ঠাকুরের স্ত্রীর, আকর্ষণ বেশি ছিল। তিনি যখন ইস্কুলে পড়িতে যাইতেন, বাড়ির জন্য তাঁহার মন ছট্‌ফট্‌ করিত। ছুটি হইলে আর এক মুহূর্তও দেরি করিতে ইচ্ছা হইত না। এই মেজকাকীমার ঘরেই সকল ছেলেপিলের আশ্রয় ছিল। তাঁহার সন্তান বেশি ছিল না বলিয়া তিনিই সকলের দেখাশোনা করিতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেন, সে এক চমৎকার কাল গিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথের অন্য দুই ভাই—গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ তখন জোড়াসাঁকোর বাড়ির দোতলার বৈঠকখানা সরগরম করিয়া রাখিতেন। মছলন্দ বিছাইয়া তাকিয়া ঠেস্ দিয়া পারিষদবর্গ লইয়া মজলিস জমাইয়া বসিতেন— তাহার মধ্যে একদিকে যেমন বিলাস ও ধনাড়ম্বর ছিল, তেমনি অন্য দিকে এমন একটি শিষ্টাচার, ভদ্রতা ও নিবিড় সামাজিকতা ছিল, যাহা এখনকার কালে একেবারেই দুর্লভ। দেবেন্দ্রনাথের এ-সব ছিল না। তাঁহার কাছে কোনো মোসাহেব ঘেঁষিতেই পারিত না। এজন্য তাঁহার কাকা রমানাথ ঠাকুরের এত দুঃখ ছিল যে, তিনি একবার যখন পাহাড়ে যান, তখন রমানাথ ঠাকুর তাঁহাকে দুঃখ করিয়া এক চিঠি লেখেন। সেই চিঠি দেবেন্দ্রনাথ মজা করিয়া তাঁহার স্ত্রীকে পাঠাইয়া দিয়া লেখেন—"দেখ, ছোটকাকা আমাকে পত্র দিয়াছেন তুমি আর দেশ ছাড়িয়া কতদিন পাহাড়ে পর্বতে ঘুরিয়া বেড়াইবে —বাড়িতে আসিয়া বড় লোকের ছেলেদের মত দশ পাঁচটা মোসাহেব রাখিয়া আমোদ আহ্লাদে দিন যাপন কর— তুমি একলাটি কি করিয়া জীবন কাটাইতেছ।"

আশ্রিতবৎসলতা, বন্ধুবৎসলতা, তখনকার কালের আর-একটা বিশেষত্ব ছিল। বাড়িতে কত রকমের লোকজন, কত হাসি তামাসা গল্পগুজব তাহাদিগকে লইয়া সর্বদাই জমিয়া উঠিতেছে—সেই একটা স্বাভাবিক আনন্দের আবহাওয়ার মধ্যে ছেলেরা বাড়িয়া উঠিতেছে, তাহাদের পক্ষে ইহার চেয়ে আর কী সৌভাগ্য হইতে পারে! কখনো অক্ষয়বাবু আসিতেছেন— তাঁহার মাথাটি নানা জ্ঞানবিজ্ঞানের বিদ্যার একটি মৌচাকবিশেষ। বাহ্যবস্তুর সঙ্গে মানবপ্রকৃতির যে কত রকমের সম্বন্ধ তাহারি বিচার লইয়া তিনি ব্যস্ত। সেই নানা বিদ্যার মৌচাকের গুঞ্জনধ্বনিতে বাড়ির ছেলেরা যে আকৃষ্ট হইত না এ কথা বলা যায় না। দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেন, তাঁহার বৈজ্ঞানিক কৌতূহল অক্ষয়বাবুর সংসর্গে আসিয়াই জাগে। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে এই বন্ধুদের এমনি হৃদ্যতার সম্বন্ধ ছিল যে, তখন তাঁহারা শাস্ত্রোক্ত নামে পরস্পরকে ডাকিতে শুরু করিয়াছিলেন। অক্ষয়বাবু ছিলেন শীর্ণ মানুষ; রাজনারায়ণবাবু প্রভৃতি তাঁহার নাম জরৎকারু

রাখিয়াছিলেন। কাহারো নাম শৌনিক, কাহারো নাম অষ্টাবক্র। ১৩১১ বাংলা সালের 'প্রবাসী' পত্রে রাজনারায়ণবাবুর পুত্র রাজনারায়ণবাবুকে লিখিত অক্ষয়বাবুর কতগুলি চিঠির টুকরা প্রকাশ করিয়াছিলেন। একটি পত্রের টুকরা এখানে উদ্ধৃত করিলেই তাঁহাদের মধ্যে বন্ধুত্ব যে কত প্রগাঢ় ছিল তাহা অনায়াসেই দেখিতে পাওয়া যাইবে। অক্ষয়বাবু লিখিতেছেন, "আপনার প্রেমার্দ্র পত্র প্রাপ্ত হইয়া অমৃতাভিষিক্ত হইলাম এবং অমনি আপনার আনন্দোৎফুল্ল উৎসাহকর মুখশ্রী এবং ত্রিভঙ্গভঙ্গিম কোমল কলেবর আমার অন্তঃকরণে জাজ্বল্যমান হইয়া প্রকাশ পাইল। যেন আপনি সমাজের সোপান দ্বারা আগমন পূর্বক সহসা আমাকে দর্শন দিলেন!···যতক্ষণ আপনকার পত্র বারম্বার পাঠ করিলাম, ততক্ষণ আপনকার সহিত আলাপ করিয়া সুখী হইলাম।" অক্ষয়বাবুকে দেবেন্দ্রনাথও খুব স্নেহ করিতেন। তবে বন্ধুদের মধ্যে রাজনারায়ণবাবুর সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের যেমন জমিত, এমন আর-কাহারও সঙ্গে নয়। রাজনারায়ণবাবুর পিতা নন্দকিশোর বসু রামমোহন রায়ের একজন প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তিনি ১৮৪৪ খৃস্টাব্দে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সর্বদাই এই ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন—"যদি রাজনারাণ ব্রাহ্ম হয় তবে বড় ভাল হয়।" তাঁহার মৃত্যু হইলে অশৌচ অবস্থায় রাজনারায়ণ বসু দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তখনই দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তিনি হিন্দুকালেজের রিচার্ডসনের প্রিয় ছাত্র— মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি তাঁহার সতীর্থ ও বন্ধু। ইংরাজীশিক্ষিতদের মধ্যে তখন তাঁহার বেশ প্রতিষ্ঠা ছিল। কিন্তু পণ্ডিত মানুষ প্রায়ই যেমন কুনো ও অসামাজিক হইয়া থাকে, রাজনারায়ণ ছিলেন একেবারে তার উল্টা। দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "তিনি সর্বদা প্রহৃষ্ট থাকিতেন, তাঁহার হাস্যমুখ সর্বদাই দেখিতাম।" হাস্যমুখ না বলিয়া অট্টহাস্য বা হাস্যোচ্ছ্বাস বলা উচিত। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার হাসি শুনিলে লোকের চমক লাগিত। শারীরিক অসুস্থতা হোক, সংসারের দুঃখদারিদ্র্য হোক, এমন প্রচুর প্রসন্নতা তাঁহার ছিল যে, সব দুঃখকষ্টকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যাইত। তিনি ইংরাজীরই চর্চা করিতেন বেশি, সংস্কৃত বড়ো জানিতেন না। দেবেন্দ্রনাথের কাছে তিনি উপনিষদ্ পড়েন এবং ঈশ, কেন, মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ইংরাজী তর্জমা তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশ করেন। দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের শ্লোক তাঁহার নিকট ব্যাখ্যা করিতেন ও তিনি তাহা ইংরাজীতে তর্জমা করিতেন। সন্ধ্যায় উপনিষদ্

তর্জমা করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া তিনি কখনো কখনো ঘুমাইয়া পড়িতেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে জাগাইয়া খাওয়াইতেন— তিনি লিখিয়াছেন, "সে সকল বন্ধুত্বের কার্য কখনই ভুলিবার নহে।" দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে "ইংরাজী খাঁ" বলিয়া জানিতেন; কিন্তু তিনি যে বাংলা লিখিতে জানেন তাহা তিনি জানিতেন না। একদিন রাজনারায়ণবাবু তাঁহার প্রথম বাংলা রচনা লিখিয়া দেবেন্দ্রনাথের তাকিয়ার নীচে তাহা রাখিয়া চলিয়া আসেন। সেই লেখা পড়িয়া দেবেন্দ্রনাথ কী না মনে করিয়াছেন এই কথা ভাবিতে ভাবিতে পরদিন তিনি 'স্পন্দায়মান হৃদয়ে' তাঁহার কাছে গেলেন। দেবেন্দ্রনাথ সেই লেখার অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন। সেই অবধি তাঁহাকে সমাজে বাংলায় বক্তৃতা করিতে হইত। "ইংরাজী খাঁ" হইয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করার অনুরাগ ও উৎসাহ যে তাঁহার ছিল, তাহার কারণ তাঁহার অকৃত্রিম স্বদেশপ্রীতি ছিল। ঈশ্বরপ্রীতি ও স্বদেশপ্রীতি এই দুইই তাঁর প্রকৃতির মধ্যে সমান প্রবল ছিল। ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা প্রভৃতির মধ্যে প্রীতিভাবের সঞ্চার করিবার যে দাবি তিনি করেন, আমার মনে হয় তাহা সত্য দাবি।

দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে এই-সকল বন্ধুরা যে কি রকম অসংকোচে মিশিতেন তাহা রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিতের একটি গল্পে বেশ বুঝা যায়। তিনি লিখিতেছেন—"সমাজে হারমোনিয়ম ব্যবহার করিবার পূর্বে একর্ডিয়ন যন্ত্র দিনকতক ব্যবহার করা হইয়াছিল। কঠোপনিষদের যে শ্লোকের প্রথমে আছে "ন সদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য" সেই শ্লোক একর্ডিয়নে গাওয়া হইত। এক-একদিন দেবেন্দ্রবাবুর বাটীতে সন্ধ্যার পর এইরূপ গাওনাতে বড় আনন্দ হইত। চন্দ্রনাথ রায় নামে দেবেন্দ্রবাবুর একটি পারিষদ ছিলেন। ইঁহাকে দেবেন্দ্রবাবু পরে একটি নায়েবি কর্ম দেন। ইঁহার বাটী বংশবাটী গ্রামে ছিল। ইনি একরাত্রি বাসায় ফিরিয়া না যাইতে পারাতে দেবেন্দ্রবাবুর বৈঠকখানায় শয়ন করিয়াছিলেন। পার্শ্বের ঘরে দেবেন্দ্রবাবু শুইয়াছিলেন। ঐ রাত্রিতে সন্ধ্যার পর বড় ব্রহ্মানন্দ হয়। দুই প্রহর রাত্রি বেলায় দেবেন্দ্রবাবু "দুপ্ দুপ্" এইরূপ শব্দ শুনিতে পাইলেন। তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। বাহিরে আসিয়া দেখেন যে, চন্দ্রনাথ রায় নৃত্য করিতেছেন। একি জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি বলিলেন, "আমার নাচ পাইয়াছে, কি করি?" লোকের যেমন ক্ষুধা পায়, তৃষ্ণা পায়, তেমনি নাচ পায় ইহা অদ্ভুত কথা।... উপনিষদের আলোচনায়, উপনিষদোক্ত শ্লোক গানে এবং তখনকার ব্রাহ্মধর্মসম্বন্ধীয় নানা তত্ত্ব আলোচনায় আমাদিগের দিন পরমানন্দে অতিবাহিত

হইত··· থাঁটি ঈশ্বরপ্রসঙ্গে অনেকটা সময় যাপিত হইত। তখন ভগবদ্গীতার এই শ্লোকানুসারে অনেকটা কার্য হইত।

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরং।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥"

রাজনারায়ণবাবু এই সময় দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের কাজে যোগ দেওয়ায়, তাঁহাতে দেবেন্দ্রনাথ একজন মস্ত সহায় পাইলেন। তখন ব্রাহ্মসমাজের আকাশে পশ্চিম কোণে এবং পূর্ব কোণে, দুই কোণেই কালো মেঘ জমিয়াছিল এবং দুই দিক হইতেই এমন ঝড় ওঠে যে রাজনারায়ণবাবুর মতো একজন সুদক্ষ মাঝিকে না পাইলে সমাজের কর্ণধার দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে একলা ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করা কষ্টকর ছিল। পশ্চিম কোণের ঝড়— খৃস্টান মিশনারিদের সঙ্গে বিবাদ। পূর্ব কোণের ঝড়—বেদ ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্র কিনা ইহা লইয়া অক্ষয়কুমার দত্তের দলের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতির বিবাদ। প্রথম ঝড়ের কথাই পর পরিচ্ছেদে বলিব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

খৃস্টানসংঘাত হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়

রামমোহন রায়ের সময় হইতেই খৃস্টান পাদ্রীদের সঙ্গে এ দেশের লোকের ঝগড়া চলিয়া আসিয়াছে। শ্রীরামপুরের পাদ্রী কেরী ও মার্শম্যানের সঙ্গে রামমোহন রায়কে রীতিমত যুঝিতে হইয়াছিল। খৃস্টান কাগজ 'সমাচারচন্দ্রিকা' হিন্দু-শাস্ত্রকে আক্রমণ করিত, রামমোহনকে সেইজন্য 'ব্রাহ্মণসেবধি' ও *Brāhminical Magazin* নামে বাংলায় ও ইংরাজীতে এক কাগজ চালাইয়া সেই আক্রমণ ঠেকাইতে হইত। তবে রামমোহন রায় যুঝিবার চেয়ে খৃস্টান ধর্মকে বুঝিবার দিকে বেশি মন দিয়াছিলেন। ১৮২০ খৃস্টাব্দে তিনি বাইবেল হইতে খৃস্টের উপদেশ বাছিয়া *Precepts of Jesus, Guide to Peace and happiness*, খৃস্টের উপদেশ, শান্তি ও আনন্দপথের নেতা—এই নাম দিয়া এক বই বাহির করেন। শুধু খৃস্টের নীতি-উপদেশগুলি বাঁটিয়া এবং খৃস্টের ঈশ্বরত্ব, অলৌকিক ক্রিয়া, তাঁর রক্তে জগতের পরিত্রাণ ইত্যাদি খৃস্টান ধর্মের মতবাদ (dogmas) অংশের কথাগুলি ছাঁটিয়া দেওয়ায় পাদ্রী মার্শম্যান রামমোহন রায়কে ভারি নিন্দা করেন। তখন রামমোহন রায় যে পাণ্টা গাহিয়া আসর জমাইলেন তাহা নয়। তিনি হিব্রু শিখিয়া পুরানো বাইবেলের মূল গ্রন্থ ও গ্রীক শিখিয়া নূতন বাইবেলের মূল গ্রন্থ তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়া এক "আপিল" বা আবেদন বাহির করিলেন। তার নাম An Appeal to the Christian Public। ঐ-সব মতবাদ যে বাইবেল গ্রন্থের জিনিস নয়, বাইবেলের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া ইহাই তিনি প্রমাণ করিতে লাগিয়া গেলেন। এক আপিলে কুলাইল না, আরো দুই আপিল বাহির হইল।

আমাদের দেশে যেমন বেদের কোনো কোনো অংশকে অভ্রান্ত বলিয়া ভাবা হইত, পশ্চিম দেশে বাইবেলকে তার চেয়ে বেশি—একেবারে অক্ষরে অক্ষরে অভ্রান্ত মনে করা হইত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে "ফ্রী থিঙ্কার" স্বাধীন চিন্তাশীল একদল লোক ইউরোপে দেখা দিতে লাগিলেন বটে; কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতেই প্রথম ফ্রান্সে, ইংলণ্ডে বাইবেল শাস্ত্র ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত ইহা লইয়া পণ্ডিতেরা বিচারে বসিয়া যান। তখনো বাইবেলের Higher Criticism যাহাকে বলে, তাহা পাকিয়া উঠে নাই। গস্‌পেলগুলির রচনার

তারিখ স্থির করা, মূলের সঙ্গে অনুবাদের পাঠান্তর মেলানো, কবে কোন্ নূতন মত তাহাতে সন্নিবেশ হয় তাহার খোঁজ— এই রকমে বিশ্লেষ করিয়া বাইবেল শাস্ত্রের সমালোচনা-পদ্ধতির নাম Higher Criticism। এই সমালোচনার ফলেই খৃস্টানদের মধ্যে একেশ্বরবাদী সম্প্রদায় (unitarians) দেখা দিয়াছিল এবং রামমোহন রায় এই সম্প্রদায়েরই প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে একজন বলিয়া পশ্চিমদেশে আজও তাঁহার সম্মান আছে। রামমোহন রায়ের আপিলগুলি এই ধরনের সমালোচনা। তবু সেগুলি কি রকমের, বোধ হয় আর-একটুখানি খুলিয়া বলিলে ভালো হয়।

খৃস্টানেরা তিন ঈশ্বর মানেন। এক ঈশ্বর পিতা, অন্য ঈশ্বর পুত্র, আর তৃতীয় ঈশ্বর 'হোলিগোস্ট' বা পবিত্রাত্মা। এই তিনই এক। সুতরাং খৃস্টে আর ঈশ্বরে সমান। রামমোহন রায় বলেন যে, বাইবেলে খৃস্টের উপদেশে খৃস্ট কোনো জায়গায় ঈশ্বরের সমান আসন গ্রহণ করেন নাই। এই ত্রীশ্বরবাদেরও কোনো কথা বাইবেলে নাই। তিনি বাইবেল হইতে খৃস্টের নানা বাক্য তুলিয়া ও মূল গ্রন্থের সঙ্গে তাহার অর্থ বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, খৃস্ট তাঁহার পিতার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমার কথাই পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন— নিজেকে কোথাও তাঁহার সমান বলেন নাই। "পুত্র নিজে হইতে কিছু করিতে পারে না, পিতার ইচ্ছাই তার ইচ্ছা"— এই তো তাঁহার সকল উপদেশের মর্ম। যেখানে তিনি বলিয়াছেন, "I and my Father are one" আমি ও আমার পিতা এক, সেখানে তিনি এই ইচ্ছার সম্পূর্ণ যোগের কথাই বলিয়াছেন। খৃস্টের আর-একটি কথা হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়, যখন তিনি প্রার্থনা করিতেছেন— তাঁহার শিষ্যরাও যেন সেই ইচ্ছার যোগে পিতার সঙ্গে তাঁহারি মতো যুক্ত হইয়া এক হয়। "They may be one as we are"। এমনি করিয়া মূল বাইবেল অবলম্বনে বাইবেলের বিচার করিয়া রামমোহন রায় খৃস্টান ধর্মের অনেক মতবাদ (dogmas) খণ্ডন করেন। তিনি Mosheim-এর খৃস্টান ধর্মমত ও সম্প্রদায়ের ইতিহাস (Ecclesiastical History) হইতে প্রমাণ করিয়া দেন যে, চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে ঐ ত্রীশ্বরবাদ মোটে দেখাই দেয় নাই। আলেকজান্দ্রিয়াতে ইহা লইয়া এক মস্ত ঝগড়া ও গোলযোগ হয়— এরিয়াস্ প্রভৃতি এই ত্রীশ্বরবাদের বিপক্ষে ছিলেন। অবশেষে সম্রাট কন্‌স্টান্‌টাইন্ মাঝে পড়িয়া ঝগড়া মেটান ও ত্রীশ্বরবাদের মতটাই চর্চে বাহাল হয়। রামমোহন দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই-সব মতের লড়াইতে খৃস্টান ধর্মটা সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ভাগ হইয়া কেবল বিচ্ছেদ ও অনৈক্যের সৃষ্টি

করিয়াছে। আর প্রাচীন কালে কত যে যুদ্ধ আর রক্তসেচন এজন্য হইয়াছে তাহা বলা যায় না। খৃস্টধর্ম গ্রীক আর রোমান পৌত্তলিকদের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই তাহাদের কুসংস্কারের সঙ্গে জড়িত হইয়া বিকৃত হয়। এই-জন্য রামমোহন রায় একেবারে মূল উৎসে গিয়া অর্থাৎ স্বয়ং খৃস্টের কী বাণী তাহাই বিচার করিয়া সেই উৎসের ধারায় বিকার ও জঞ্জালগুলি ধুইয়া মুছিয়া ফেলিবার পরামর্শ দেন। একজন ভারতবাসী যে ভারতবর্ষে বসিয়া এবং কাহারো সাহায্য না লইয়া বাইবেলের এই নূতন আলোচনা-পদ্ধতির গোড়াপত্তন করিয়া যাইবে ইহা কি কম বিস্ময়, কম গৌরবের কথা?

রামমোহন রায় ইংলণ্ডে যাইবার পূর্বে ১৮৩০ খৃস্টাব্দে পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডফ্ সাহেব তাঁহার আশ্রয় লন। রামমোহনের চেষ্টাতেই ডফ্ এ দেশে আসেন। বোধ হয় রামমোহন রায় ভাবিয়াছিলেন যে, স্কচ্ মিশনারিরা শ্রীরামপুরের ইংরাজ মিশনারিদের মতো অতটা গোঁড়া হইবে না। ডফ্‌কে রামমোহন নানা রকমে সাহায্য করিলেন—তাঁহার ইস্কুলের বাড়ি ঠিক করিয়া দিলেন, এবং ইস্কুলের ছাত্র জুটাইয়া দিলেন। পূর্বেই বলা গিয়াছে যে, হিন্দুকালেজের ধর্মহীন শিক্ষার উপর রামমোহন রায়ের শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি তাই আশা করিয়াছিলেন যে, ডফের সুশিক্ষায় এ দেশের ছাত্রদের উপকার হইবে। কিন্তু তখন তিনি স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই যে, যাঁহাকে তিনি তাঁহার "গদি" দিয়া গিয়াছিলেন, ডফ্ সেই দেবেন্দ্রনাথেরই মহা প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইবেন।

ডফ্ সাহেব তো ইস্কুল খুলিয়া হিন্দুকালেজের কাছেই বাসা বাঁধিলেন এবং কালেজের ছাত্রদের কাছে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন। পাদ্রী ডফ্ এবং পাদ্রী ডিয়ালট্রির বক্তৃতার হাওয়ায় কালেজের ছাত্রদের মধ্যে অনেকেরই ধর্ম-সম্বন্ধে সংশয়ের মেঘ একটু একটু করিয়া কাটিয়া যাইতে লাগিল। অথচ তাহাদের ডিরোজিয়ো-গুরুর প্রভাবে তাহাদের মনে হিন্দুবিদ্বেষ অত্যন্ত প্রবল ছিল বলিয়া তাহারা কেহ কেহ খৃস্টান ধর্মের দিকেই স্বভাবত ঝুঁকিল। ১৮৩২ খৃস্টাব্দে ডিরোজিয়োর একজন প্রধান শিষ্য, মহেশচন্দ্র ঘোষ খৃস্টধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন। সেই একই বছরে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ও খৃস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। কলিকাতা শহরে একটা হৈ রৈ পড়িয়া গেল। এমন জনরব উঠিল যে, হিন্দু-কালেজের সকল ভালো ভালো ছাত্র খৃস্টান হইয়া যাইবে।

ডফ্ সাহেব ১৮৩০ হইতে ১৮৬৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ৩৩ বছর এ দেশে মিশনের কাজে ছিলেন। ইহার মধ্যে দুইবার তিনি ইউরোপ ও আমেরিকায় গিয়া

মিশনের কাজের জন্য টাকার জোগাড় করেন। প্রথমবার স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া *India and India's Missions* নামে এক বই প্রকাশ করেন এবং তাহাতে হিন্দুধর্মকে, বিশেষভাবে বেদান্তকে, খুব কড়া রকমে আক্রমণ করিয়া নিতান্ত অর্থহীন ও নীতিহীন একটা ধর্ম বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। তত্ত্ববোধিনী সভার তরফ হইতে ঐ বইয়ের প্রতিবাদ ১৭৬৬ শকের (১৮৪৪ খৃস্টাব্দ) আশ্বিনের পত্রিকায় বাহির হয়। সেই প্রতিবাদ বাহির হইতেই 'ক্যালকাটা রিভিয়ু', 'ক্রিশ্চান হেরাল্ড', 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' প্রভৃতি কাগজে খৃস্টানদের বাদ-প্রতিবাদ নিতান্তই বিসম্বাদ ও অপবাদ হইতে শুরু করে— ১৭৬৬ শকের মাঘে তাই আর-এক প্রতিবাদ বাহির হয়, তাহার শিরোনামা "Vaidantic Doctrines Vindicated"। ইহার পরের বছরে ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে ১৭৬৭ শকের শ্রাবণের এবং আশ্বিনের কাগজে আবার ক্যালকাটা রিভিয়ুয়ের পুনশ্চ প্রতিবাদের উত্তর বাহির হয়। এই-সমস্ত লেখাগুলি হইতে পরে *Vaidantic Doctrines Vindicated* অর্থাৎ বেদান্ত মতের সমর্থন নামে এক চটি বই দাঁড় করানো হয়।—সে বই আমি দেখিতে পাই নাই।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন যে, এই 'বৈদান্তিক ডক্‌ট্রিন্‌স্ ভিণ্ডিকেটেড' দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণবাবুর রচনা। কিন্তু যে সময়ে ডফ্ সাহেবের বইয়ের সমালোচনা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, সে সময়ে রাজনারায়ণবাবু ব্রাহ্মসমাজে আসেন নাই। ১৮৪৬ খৃস্টাব্দে তিনি ব্রাহ্ম হন ও তার পরের বছরে তিনি উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদকের কাজে নিযুক্ত হন। ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া ইহাই তাঁহার প্রথম কাজ। অতএব ডফ্ সাহেবের বই লইয়া বাদানুবাদের লেখায় কোনোক্রমেই তাঁহার হাত থাকিতেই পারে না।

লেওনার্ড সাহেব তাঁহার *A History of the Brahmo Somaj* বইটিতে লিখিয়াছেন যে, এই 'বৈদান্তিক ডক্‌ট্রিন্‌স্ ভিণ্ডিকেটেড' রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু ও শিষ্য চন্দ্রশেখর দেবের রচনা। চন্দ্রশেখর দেবের ইংরাজী লেখার সুন্দর ক্ষমতা ছিল। সুতরাং তাঁহাকে দিয়া যে দেবেন্দ্রনাথ এই-সকল বাদ-প্রতিবাদ লিখাইয়াছিলেন, ইহা খুবই সম্ভব বলিয়া মনে হয়। কেন আমি দেবেন্দ্রনাথকেই এই প্রবন্ধগুলির আসল লেখক মনে করিতেছি, তাহার কারণ এই যে, তিনি ভিন্ন এত উপনিষদ্-বচন উদ্ধার করিয়া ও তাহাদের ভিতরকার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া ডাক্তার ডফের মতামত খণ্ডন করা তখন আর দ্বিতীয় কারো সাধ্যের ভিতরে ছিল না। তার পরে বইখানি প্রকাশিত হইলে, ইহার

প্রণেতা যে কে তাহার কোনো উল্লেখ থাকিল না। রচনার মধ্যেও জায়গায় জায়গায় "আমরা" কথাটার বিশেষভাবে ব্যবহার আছে। দেবেন্দ্রনাথের সাহায্য লইয়া চন্দ্রশেখর এই বাদ-প্রতিবাদগুলি লিখিয়াছিলেন— এ প্রবন্ধগুলির রচয়িতা দুজনেই। এখন দেখা যাক "বৈদান্তিক ডক্‌ট্রিন্‌স্‌ ভিণ্ডিকেটেড" ব্যাপারটা কি! কারণ অনেকের বিশ্বাস, বিশেষত অক্ষয়কুমার দত্তের বন্ধুবর্গের বিশ্বাস যে, দেবেন্দ্রনাথ এই সময়ে (১৮৪৫ খৃস্টাব্দে) বেদকে সম্পূর্ণ অভ্রান্ত শাস্ত্র বলিয়া মানিতেন।

ডফ্‌ সাহেব বেদান্তে ব্রহ্মের "অনাদি, অনন্ত, অপরিবর্তনীয়, অসীম, অখণ্ড, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী ও আনন্দময়" এই যে-সকল স্বরূপের বর্ণনা পাওয়া যায়, সেগুলি "অর্থহীন" বলিয়াছেন, কারণ উপাসকের মনে ইহার অনুরূপ ধারণার উদয় হয় না। আসল কথা, ডফ্‌ সাহেব "নির্গুণ ব্রহ্মের" অর্থ কী তাহা না বুঝার দরুন বেদান্তের ব্রহ্মবাদের সম্বন্ধে এই অনর্থের অভিযোগ আনিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন— "ব্রহ্ম বিনা জ্ঞানবুদ্ধিতে, এমন-কি, নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিনা চৈতন্যে বর্তমান।" তত্ত্ববোধিনী সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য উদ্ধার করিয়া এই জবাব দেন যে, মানুষের মধ্যে যে-সব গুণ, প্রকৃতির মধ্যে যে-সব গুণ দেখা যায়, সেগুলি অনির্দিষ্ট, পরিবর্তনশীল ও বিকারশীল বলিয়া ব্রহ্মে আরোপিত হইতে পারে না— সেই অর্থেই ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা হয় তাহা ডফ্‌ বুঝিতে পারেন নাই। রামমোহন রায়ের *The Brahmunical Magazine* No. IV হইতে নির্গুণ ব্রহ্মের এই ব্যাখ্যার সমর্থক একটা স্থান তত্ত্ববোধিনী উদ্ধার করেন।

মোটামুটি এই জায়গায় ঝগড়া— ডফ্‌ বলেন যে, ব্রহ্মের ধারণা হয় না; মানুষের মন নিজের বস্তুত্ব ও গুণ ভিন্ন অন্য কোনো বস্তু বা গুণের ধারণা করিতেই পারে না! তত্ত্ববোধিনী বলেন, ব্রহ্ম যে ধারণার অগম্য ইহা সত্য বটে কিন্তু একেবারেই ধারণার অগম্য হইলে তাঁহার উপাসনাই হইতে পারিত না। যেমন ধর, সূর্য যে-সকল মূলবস্তুর উপাদানে তৈরি, সেগুলি এমনি সূক্ষ্ম যে, কোনো বিজ্ঞানই তাহার পুরা ধারণা করিতে পারে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া সূর্যের অস্তিত্ব তো কেহ অগ্রাহ্য করে না, কারণ সে যে স্বয়ম্প্রকাশ। ব্রহ্মের স্বরূপ কি মানুষের বুদ্ধির দ্বারা ধারণা হয়! অথচ তাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করা যায়, ঠিক যেমন সূর্যের স্বরূপ না জানিয়াও তাহাকে অনুভব করা যায়।

ব্রহ্মের ধারণা হয় না— এ গেল ডফের প্রধান আপত্তি। দ্বিতীয় আপত্তি

এই যে, বেদান্তে নীতির কোনো কথা নাই, এ ধর্মে মানুষকে নীতিমান করে না। তত্ত্ববোধিনী ইহার উত্তরে লেখেন যে, যাঁহাকে তদেতৎ সত্যং, পরমং পরস্তাৎ, রসোবৈসঃ বলা হয়, যিনি সকল পূর্ণতার আকর—তাঁর উপাসনা করিলে মানুষের নীতির উন্নতি হইবে না, এ কেমন কথা? 'বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ' ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধার করিয়া তত্ত্ববোধিনী দেখান যে, বেদান্তে নীতিব কথা যথেষ্ট আছে।—যে মানুষের বিজ্ঞান সারথি ও মন প্রগ্রহস্বরূপ সে মৃত্যুর পথ পার হইয়া ঈশ্বরের পরমপদ প্রাপ্ত হয়—এ কথা বেদান্তই বলিয়াছে।

ডফ্‌ সাহেব বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্মের বিরুদ্ধে যে দুটি বড়ো আপত্তি তুলিয়াছিলেন, প্রায় সকল খৃস্টান লেখকই আজও পর্যন্ত সেই আপত্তি দেখান এবং সেই আপত্তির সমর্থনে সেই একই উপপত্তিও খাড়া করেন।

ডফের সমালোচনার পর খৃস্টানী কাগজের প্রতিবাদের যে উত্তর ১৭৬৬ শকের (১৮৪৫ খৃস্টাব্দ) তত্ত্ববোধিনীর মাঘের কাগজে বাহির হয়, তাহাতে খৃস্টান একজন প্রতিবাদকারীর এক মজার অভিযোগের উল্লেখ ও উত্তর দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি অভিযোগ আনেন যে, তত্ত্ববোধিনীর লেখক নিও-প্লেটনিক মতের অর্থাৎ খৃস্টান ধর্মমতবিশেষের নিকট ঋণী হইয়া সেই মতের সাহায্যে বেদান্তের স্থূল ও ঘোলাটে মতগুলিকে সূক্ষ্ম ও পরিষ্কার করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কারণ বেদান্তের সমস্তই misty metaphysics—ধোঁয়াল তত্ত্বকথা। তত্ত্ববোধিনী এই অভিযোগের উত্তরে লিখিলেন যে, বেদান্তবাক্যগুলিকে ব্যাখ্যা করিবার সময়ে Natural Theologyর পন্থা অনুসরণ করা হইয়াছে ও বিজ্ঞানের উদাহরণ দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে বটে। কিন্তু খৃস্টান লেখকেরা বেকন্‌ প্রভৃতি তত্ত্ববিদ্‌দের প্রণালী অবলম্বন করিয়া ইহুদী জ্ঞানীদের বাক্যসকল ব্যাখ্যা করেন না? বেকনের প্রণালীর সঙ্গে কি হিন্দুধর্মের চেয়ে খৃস্টান ধর্মেরি বেশি খাতির আছে নাকি? সুতরাং কোনো বিশেষ যুক্তিপ্রণালী গ্রহণ করিলেই খৃস্টান ধর্মের কাছে ঋণ স্বীকার করা বোঝায় না।

তখন রামমোহন রায়ের বেদান্ত মত যে ব্রাহ্মসমাজ সর্বাংশেই মানিতেন, তাহারও বেশ পরিচয় এই দ্বিতীয় রচনার মধ্যে পাওয়া যায়। খৃস্টান প্রতিবাদকারীরা রামমোহন রায়ের বেদান্তের ব্যাখ্যাকে একপেশে বলিয়াছিলেন। কারণ রামমোহন রায় যাগযজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়াকর্ম নিকৃষ্ট অধিকারীর পক্ষে ব্যবস্থামাত্র বলিয়াছেন, তাহা বেদান্তের শ্রেষ্ঠ উপদেশ নয় বলিয়াছেন। এবং বেদের

বহুদেববাদকে ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্ব বুঝাইবার উপায় হিসাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; সুতরাং অস্বীকার করিয়াছেন। তত্ত্ববোধিনী রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে এই-সকল অভিযোগের উত্তর রামমোহন রায়ের নিজের কথা দ্বারাই দিয়াছেন।

১৮৪৫ খৃস্টাব্দের (১৭৬৭ শক) শ্রাবণে ও আশ্বিনে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে বেদান্তের সমর্থনে তৃতীয় ও চতুর্থ প্রতিবাদ তত্ত্ববোধিনীতে বাহির হয়। বেদ হইতে উপনিষদ্-বেদান্ত পর্যন্ত ধারায় ধর্মের যে-সকল নিত্য সত্য এ দেশের লোকের কাছে প্রকাশিত হইয়াছে (Revelation), সেই প্রকাশের মধ্যেও একটি ক্রম-পরিণাম (Progressive revelation) লক্ষ্য করা যায়। গোড়ায় দেখা যায় স্থূল ধারণাবিশিষ্ট লোকদের জন্য যাগযজ্ঞের ব্যবস্থা। ক্রমে দেখা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন দেবতার পূজায় যাগযজ্ঞ হইতে, সকল দেবতাই যে এক ঈশ্বরেরই নানা শক্তি, তাঁহারি নানা গুণের নানা প্রকাশমাত্র এই ধারণা মানুষের মনে উপস্থিত হইল। বৈদিক বহুদেববাদ এই জিনিস—তাহা বাস্তবিকই বহুদেববাদ নয়। সব শেষে নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের ধারণা আসিল, তখনই বেদান্তের আরম্ভ। এইজন্য এই-সকল প্রবন্ধে বেদান্তের ভিতর দিয়া ঈশ্বরের বাণীর প্রকাশ বা বিধানকে "Final vedantic dispensation" বলা হইয়াছে। এই ধর্মের ক্রম-পরিণামের ইতিহাস এ প্রবন্ধগুলিতে রামমোহন রায়ের প্রণালী অনুসরণ করিয়াই দাঁড় করানো হইয়াছে। এই প্রবন্ধগুলিতে প্রাচীন ও নূতন বাইবেলের এবং ইহুদী ইতিহাসের সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং এ কথা খুবই মনে হয় যে, দেবেন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই এ সময়ে বাইবেল বেশ ভালো করিয়া পড়িয়াছিলেন।

রাজনারায়ণবাবু লিখিয়াছেন, "আমরা ঈশ্বর-প্রত্যাদেশে বিশ্বাস করিতাম বটে, কিন্তু বেদ কেবল যুক্তিযুক্ত বাক্যপূর্ণ বলিয়া তাহা ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করিতাম।" তিনি তাঁহার *Defence of Brahmoism and the Brahmo Somaj* নামক ইংরাজী বইয়ে রেভারেণ্ড মলেন্‌স্ সাহেবের *Essay on Vedantism, Brahmoism and Christianity* গ্রন্থ হইতে উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ব্রাহ্মরা বেদকে ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ বলিয়া মানিলেও প্রকৃতি ও প্রকৃতির কার্যকেই তাঁহাদের 'প্রধান ধর্মশিক্ষক' বলিয়া মনে করিতেন। এই আশ্বিনের প্রতিবাদটিও আবার যুক্তি ও প্রত্যাদেশ সম্বন্ধেই আলোচনা। তাহাতে এ কথা স্পষ্ট করিয়া বলা হইতেছে যে, মানুষ নিজের দ্বারাই সত্যকে পায় না; সেইজন্য প্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্রের প্রয়োজন। অথচ প্রত্যাদেশ মানে কোনো

অলৌকিক ব্যাপার নয়। ঈশ্বর কোনো বিশেষ স্থানে বিশেষ আকারে উপস্থিত হইয়া বিশেষ বাণী উচ্চারণ করিলেন, এমন কোনো কাণ্ড নয়— খৃস্টানেরা যেমন বিশ্বাস করে। ঈশ্বরের পথ সরলতার পথ ; মানুষ যখন নিজের বুদ্ধিতে সংশয়িত হইয়া পথ খুঁজিয়া পায় না তখনই তাঁহার আবির্ভাব (Revelation) প্রত্যক্ষ হইয়া তাহাকে পথ দেখায়। সেই যে অপরোক্ষানুভূতির বাক্য, তাহা এক-এক দেশের শাস্ত্রে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে—তাহা চিরন্তন সত্যকে প্রকাশ করিতেছে। বেদই যে একমাত্র আপ্তশাস্ত্র, বাইবেল নয়— ঈশ্বরের বাণী যে এ দেশের ঋষিদের নির্মল হৃদয়ে প্রকাশ পাইয়াছে, অন্য দেশের ঋষিদের হৃদয়ে প্রকাশ পায় নাই— এমন কথা এই গ্রন্থে কোথাও বলা হয় নাই। ঈশ্বরের প্রকাশ সর্ব দেশে, সর্ব কালে। যেখানেই মানুষের হৃদয় জ্ঞানের দ্বারা উজ্জ্বল হইয়াছে, সেখানেই ঈশ্বর তাঁহার সত্যকে প্রকাশ করিয়াছেন। সেইজন্য যেমন বেদবেদান্ত dispensation এর কথা আছে, তেমনি "Christian dispensation"ও বলা হইয়াছে।

বেদ যে আপ্তশাস্ত্র তাহার কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে কি না এ প্রশ্নের উত্তরে শাস্ত্র সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের ভিতরকার মনের ভাবটি এই সময়েই বাহির হইয়া পড়িয়াছে দেখা যায়। বাহিরের প্রমাণ যে প্রমাণ নয়, ভিতরের আত্মপ্রত্যয়াদির প্রমাণই যে আসল প্রমাণ এ কথা এ সময়েই তিনি বলিয়া বসিয়াছেন। রামমোহন রায় এ ভাবের কথা বলিতেন না। ঐতিহাসিক প্রমাণের মূল্য তাঁর কাছে যথেষ্ট ছিল। তিনি ঐতিহাসিক প্রণালীতেই বেদ যে আপ্তশাস্ত্র তাহা প্রমাণিত করিতেন— বাইরের প্রমাণকে তুচ্ছ করিতেন না। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী লিখিতেছেন, "এই পবিত্র বেদাদি গ্রন্থের অনৈসর্গিক উৎপত্তির কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ দেওয়া অসম্ভব ; কারণ ঐতিহাসিক প্রমাণের মূল্য সে সময়ে কেহই বুঝিত না। যে-সকল তত্ত্ব বেদে পাওয়া যায়, তাহাদের যুক্তি-যুক্ততা, সারবত্তা, গতি ও অভিমুখিতার দ্বারা যেটুকু প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা ভিন্ন অন্য প্রমাণও কিছু নাই। যদি বেদের ঈশ্বরতত্ত্ব ও নীতিতত্ত্বগুলি খাঁটি যুক্তি ও জ্ঞানের সঙ্গে খাপ খায়, যদি এই-সকল মত ও উপদেশে সত্যের অনিন্দনীয় স্বরূপটি বজায় থাকে, তবে যে ব্যক্তি ইহাদিগকে আশ্রয় করিয়াছে এবং এই-সকল তত্ত্বে বিশ্বাস করিয়াছে, নিজের ধর্ম সম্বন্ধে নিরীশ্বরবাদের আনুমানিক অন্যায় অভিযোগকে আমল দিবার কোনো কারণই তাহার নাই।"*

* It is impossible to prove the divine origin of these sacred works by any historical testimonies, the value of which was not understood at the

এইখানেই তো 'আত্মপ্রত্যয়ের' দ্বারা যে শাস্ত্রের সত্যসকল নির্ধারণ করিতে হইবে, সে কথা পরিষ্কার আসিয়া পড়িয়াছে। অথচ এ সময়ে শাস্ত্রকে আপ্তশাস্ত্র বলিয়াই দেবেন্দ্রনাথ গ্রহণ করিয়াছেন।

এই বছরে ১৭৬৭ শকের (১৮৪৫ খৃস্টাব্দ) বৈশাখেই এমন এক ঘটনা ঘটিল, যাহাতে খৃস্টানদের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের কেবল এই তর্কের সংঘাতেই কুলাইল না, রীতিমত কর্মের সংঘাত বাধিল। ঘটনাটি এই— একদিন সকালে দেবেন্দ্রনাথ সংবাদপত্র পড়িতেছেন, এমন সময় তাঁহার হাউসের সরকার রাজেন্দ্রনাথ সরকার তাঁহার কাছে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। সে বলিল যে, গত রবিবারে তাহার স্ত্রী ও তাহার ছোটো ভাই উমেশচন্দ্রের স্ত্রী গাড়িতে চড়িয়া নিমন্ত্রণে যাইতেছিলেন এমন সময় উমেশচন্দ্র আসিয়া নিজের স্ত্রীকে গাড়ি হইতে জোর করিয়া নামাইয়া লয় এবং দুজনে খৃস্টান হইবার জন্য ডফ্ সাহেবের বাড়িতে চলিয়া যায়। তাহার পিতা অনেক চেষ্টা করিয়া তাহাদিগকে সেখান হইতে ফিরাইয়া আনিতে না পারিয়া অবশেষে সুপ্রীম কোর্টে নালিশ করেন। নালিশে হার হয়। তখন রাজেন্দ্র ডফ্ সাহেবকে অনুনয় বিনয় করিয়া বলে যে, পুনরায় তাহারা কোর্টে নালিশ আনিবে। কিন্তু সেই বিচার না চুকিয়া যাওয়া পর্যন্ত ডফ্ সাহেব যেন তাহার ভাই ও ভাইয়ের স্ত্রীকে খৃস্টান না করেন। কিন্তু ডফ্ সাহেব তাহা না শুনিয়া গতকল্য সন্ধ্যাবেলায় তাহাদিগকে খৃস্টান করিয়া ফেলিয়াছেন।

ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই বটে, কিন্তু ঐ শকের জ্যৈষ্ঠের তত্ত্ববোধিনী পড়িয়া আরো অনেকটা জানা যায়। উমেশচন্দ্রের বয়স ছিল চৌদ্দ বছর মাত্র এবং তার স্ত্রীর বয়স ছিল এগারো। সুতরাং নাবালক বলিয়া আইনত তাহার পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কাজ করার অধিকার উমেশের ছিল না। ইহার পূর্বে এই রকমের আর-একটা বিচার সুপ্রীম কোর্টের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। ব্রজমোহন

---

time ; or indeed by any other evidence than what they themselves afford by the drift and tendency, the reasonableness and cogency of the doctrines taught in them. ...If the doctrines of theology and the principles of morality taught in the sacred volumes referred to, appear to be consonant to the dictates of sound reason and wisdom—if these tenets and precepts carry the unimpeachable character of truth in them— the man who has received them and continues to place his trust in them, will have no reason to fear the vituperative surmises of ungodliness in respect to his religion.

—*Tattwabodhini*, Asvin, 1767 Saka.

ঘোষ নামে একটি নাবালক ছেলে খৃস্টান হইতে গিয়াছিল— আদালত সেই ছেলেটিকে পাদ্রীদের হাত হইতে তাহার পিতার হাতে সমর্পণ করেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আদালত বলিলেন যে, বাপকে তো ছেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ডফ্ সাহেব নিষেধ করেন নাই ; অথচ ছেলের যখন বাপের কাছে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা নাই, তখন আদালত কেন তাহার উপরে জবরদস্তি করিবেন? অর্থাৎ আইনটা এ ক্ষেত্রে ডফ্ সাহেবের দিকেই মোচড় খাইল ; সুতরাং আইনের মোচড় অনুসারে সোজা বিচারও বাঁকা হইয়া দাঁড়াইল।

ব্যাপারটা যতটুকুখানিই হোক, কলিকাতার সমাজে আন্দোলনটা নিতান্ত সামান্য হয় নাই। তাহার একটা কারণ, নাবালক ছেলে ধর্মভ্রষ্ট হইলে তাহার অভিভাবক আইনের সাহায্য পাইবেন না এই একটা আতঙ্ক সুপ্রীম কোর্টের বিচারে লোকের মনকে দোলা দিতেছিল। কিন্তু প্রধান কারণ, "অন্তঃপুরের স্ত্রীলোক পর্যন্ত" খৃস্টান হইতে চলিল, এজন্য একটা উৎকণ্ঠা ও উদ্‌বেগ। এই কারণেই দেবেন্দ্রনাথ পর্যন্ত অমন উত্তেজিত হইয়াছিলেন। রাজেন্দ্র সরকারের কাছে ঘটনাটি শোনামাত্র তিনি উঠিয়া পড়িলেন এবং তখনি অক্ষয়কুমার দত্তের লেখনীকে চালাইলেন। তত্ত্ববোধিনীতে এক ঝাঁঝালো প্রবন্ধ বাহির হইল। অক্ষয়কুমার লিখিলেন, "অন্তঃপুরস্থ স্ত্রী পর্যন্ত স্বধর্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পরধর্মকে অবলম্বন করিতে লাগিল! এই সকল সাংঘাতিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কি আমারদিগের চৈতন্য হয় না?·· ১৪ বৎসর বয়স্ক বালক এবং ১১ বৎসর বয়স্কা বালিকা ধর্মবিষয়ে কি বিবেচনা করিতে সমর্থ হয়? ইহারদিগকে ধর্মচ্যুত করা কি ন্যায়যুক্ত ব্যবহার হইতে পারে? ··তাহারদিগের (খৃস্টান মিশনারিদিগের) কেবল এই প্রতিজ্ঞা হইয়াছে যে, যে উপায় দ্বারা হৌক হিন্দুধর্মের উচ্ছেদ করিবেক।··· আমরা পুনঃপুনঃ সাবধান করিয়াছি এবং এখনও অনুরোধ করিতেছি যে, ইহার প্রতিকারের জন্য আপামর সাধারণ সকলে যত্নবন্ত হও। দাবাগ্নি চতুর্দিক বেষ্টন করিয়াছে, এখনও যদি না নির্বাণ করিতে চেষ্টা করা যায়, তবে অবিলম্বে সমুদয় দগ্ধ হইয়া ভস্মসাৎ হইবে।···অতএব যদি আপনার মঙ্গল প্রার্থনা কর, পরিবারের হিত অভিলাষ কর, দেশের উন্নতি প্রতীক্ষা কর, এবং সত্যের প্রতি প্রীতি কর, তবে মিশনারিদিগের সংস্রব হইতে বালকগণকে দূরস্থ রাখ, তাহারদিগের পাঠশালাতে পুত্রদিগকে প্রেরণ করিতে নিবৃত্ত হও এবং যাহাতে স্ফূর্তির সহিত তাহারা বুদ্ধিকে চালনা করিতে পারে এমত উদ্যোগ শীঘ্র কর। যদি বল, পাদ্রীদিগের পাঠশালা ব্যতীত দরিদ্র সন্তানদিগের অধ্যয়ন জন্য অন্য

স্থান কোথায়? কিন্তু ইহাই বা কি লজ্জার বিষয়! খৃস্টানেরা অতলস্পর্শ সমুদ্র-তরঙ্গকে তুচ্ছ করতঃ আপনাদিগের ধর্মপ্রচার জন্য ভারতবর্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পাঠশালা সকল স্থাপন করিতেছে, আর আমার-দিগের দেশের দরিদ্র সন্তানদিগকে অধ্যাপন করিবার নিমিত্তে একটিও উত্তম পাঠশালা নাই। সকলে একত্র হইলে তাহারদিগের পাঠশালার তুল্য বা তাহার অপেক্ষা দশগুণ উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় কি স্থাপিত হইতে পারে না? ঐক্য থাকিলে কোন্ কর্ম না সিদ্ধ হয়?... অতএব হে স্বদেশস্থ বান্ধবগণ! হিন্দুমধ্যে যিনি যে মতাবলম্বী হউন, এ বিষয়ে সকলের একতা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে।"

পত্রিকায় এই প্রবন্ধ প্রকাশ হইবার পরে দেবেন্দ্রনাথ প্রতিদিন গাড়ি করিয়া সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত শহরের গণ্যমান্য লোকদিগের কাছে গিয়া হিন্দু ছেলেদের জন্য একটি বিদ্যালয় খোলার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, রামগোপাল ঘোষ সকলকেই মিশনারি বিদ্যালয়ে ছেলে পড়ানোর অনিষ্ট যে কতখানি তাহা বুঝাইয়া তিনি উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব গোঁড়া হিন্দু; রামমোহন রায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে তিনি এক ধর্মসভা খাড়া করিয়াছিলেন। এই উত্তেজনায়, ব্রাহ্মসভা ধর্মসভায় সেই দলাদলির ভাব একেবারে ভাঙিয়া গেল। সকলেই একদিকে হইলেন এবং যাহাতে খৃস্টানদিগের বিদ্যালয়ে আর ছেলে পড়িতে না পায়, এবং খৃস্টানেরা আর খৃস্টান করিতে না পারে, তাহার জন্য সকলেই উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। ১৬ই জ্যৈষ্ঠ সিমুলিয়াতে এক প্রকাশ্য সভা হইল, সেই সভায় প্রায় হাজার লোক একত্র হইল। স্থির হইল যে, "হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়" নামে এক পাঠশালা খোলা হইবে এবং পাদ্রীদের বিদ্যালয়ে ছেলেরা যেমন বিনা বেতনে পড়িতে পায়, তেমনি এই পাঠশালাতেও বিনা বেতনে পড়িবে। রাজা রাধাকান্ত দেব সভাপতি হইলেন। রাজা কালীকৃষ্ণ, রাজা সত্যচরণ, আশুতোষ দেব, প্রমথনাথ দেব, মতিলাল শীল, প্রভৃতি শহরের ২১ জন গণ্যমান্য ধনী লোক অধ্যক্ষ হইলেন এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও হরিমোহন সেন সম্পাদক হইলেন। আশুতোষ দেব ও প্রমথনাথ দেব (ছাতুবাবু, লাটুবাবু) নিজে হইতে চাঁদার খাতা চাহিয়া তাহাতে প্রত্যেকে দশ হাজার টাকা স্বাক্ষর করিলেন। রাজা সত্যচরণ তিন হাজার, ব্রজনাথ ধর দুই হাজার, রাজা রাধাকান্ত দেব দুই হাজার। দেবেন্দ্রনাথ নিজে দুই হাজার। সেই দিনেই চল্লিশ হাজার টাকা স্বাক্ষর হইয়া গেল। তত্ত্ববোধিনীতে এই সভার বিবরণ দিয়া লেখা হইয়াছে, "এদেশে

একাল পর্যন্ত কেবল হিন্দুদিগের মধ্যে কোন্ সাধারণ বিষয়ে এত শীঘ্র এত ধন স্বাক্ষরিত হইয়াছে? অন্তঃপুরস্থ স্ত্রী পর্যন্ত এতদ্রূপ কোন্ সাধারণ বিষয়ে স্বেচ্ছাধীন শত মুদ্রা দান করিয়াছেন?" এই হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় নিযুক্ত হন। এইসঙ্গেই ২১শে জ্যৈষ্ঠ মতিলাল শীল আর-এক ইস্কুল খুলিলেন—সেখানেও বিনা বেতনে ছেলেরা পড়িতে পাইবে তাহার ব্যবস্থা হইল। সেই শীল্‌স্ ফ্রী ইস্কুলের এখনো বোধ হয় অস্তিত্ব আছে। শোনা যায় যে, ছাতুবাবুর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া মতি শীল এই ইস্কুল খোলেন। বড়ো লোকের সঙ্গে বড়ো লোকের রেষারেষি তখনকার কালে খুবই চলিত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কেমন করিয়া তাঁহারা সবাই একত্র হইয়া এমন একটা উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। শুধু কলিকাতায় নয়, মেদিনীপুর হইতেও হাজার টাকার উপর এই বিদ্যালয়ের সাহায্যের জন্য চাঁদা স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। গ্রামে গ্রামে উৎসাহের আগুন ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

তখন কত অল্প সময়ের মধ্যে বাংলার গ্রামে গ্রামে কত লোক যে খৃস্টান হইয়াছিল তাহার সংখ্যা শুনিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। সেই সময়ের কয়েকটা জায়গায় দেশীয় খৃস্টানের জনসংখ্যা তুলিয়া দিতেছি।-- কাটোয়াতে ১৩৭ জন। কৃষ্ণনগরে ৩১০ জন। টালিগঞ্জে ৫৪৪ জন। ঢাকায় ১৮ জন। বরিশালে ৭০ জন। বর্ধমানে ১৮৬ জন। যশোহরে ৩২২ জন। কার্পাসডাঙাতে ৯৬০ জন। বারুইপুরে ১৩২১ জন। সবসুদ্ধ এক বাংলাদেশেই প্রায় ৮০০০ লোক খৃস্টান হইয়াছিল।

খৃস্টান হওয়াটাই যে একটা ভয়ানক অন্যায় এবং সেই সংস্কারের বশবর্তী হইয়াই যে দেবেন্দ্রনাথ মিশনারিদের বিরুদ্ধে লাগিয়াছিলেন, এমন কথা মনে করিলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইবে। রামমোহন রায় তাঁহার *Appeal to the Christian Public*এ যে যে কারণে মিশনারিদের এ দেশীয় লোককে খৃস্টান করিবার চেষ্টাকে নিন্দা করিয়াছিলেন, ঠিক সেই সেই কারণেই দেবেন্দ্রনাথও তাঁহাদের প্রতিকূল হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রামমোহন রায় দুইটি কারণ উল্লেখ করিয়াছেন—(আমি এখানে তাঁহার কথা অনুবাদ করিয়া দিই):

১. "খৃস্টানরা নিজেদের চেষ্টা নিজেরাই প্রতিহত করেন, কারণ তাঁহারা যে-সমস্ত জাতি খৃস্টান চর্চের মতামত (dogmas) এবং অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের কথা (mysteries) গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নয়—তাহাদিগের উপর সেইগুলিই চাপান। ...তাহার ফল হইয়াছে এই যে, এ দেশের লোকেরা সাধারণত বাইবেল পড়িয়া

কোথায় উপকৃত হইবে তা নয়, অনেক সময় বিনামূল্যে প্রাপ্ত বাইবেল গ্রন্থগুলি তাহারা সাদা কাগজের মতো ব্যবহার করিয়া থাকে, আর কথাবার্তা বলিবার সময় খৃস্টানী মতামতের ভাষা অত্যন্ত অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ব্যবহার করে।"
২. "এ পর্যন্ত যাহারা খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছে তাহারা প্রায়ই অশিক্ষিত শ্রেণীর লোক। সুতরাং তাহাদের অধিকাংশই খৃস্টানী ডগ্‌মার সত্য সম্বন্ধে বিশ্বাসী হইয়া যে এ ধর্ম গ্রহণ কবিয়াছে তাহা নয়— অন্যান্য আকর্ষণই তাহাদের কাছে প্রবলতর ছিল। তাহারা হয় চাকুরি, নয় আহারের প্রলোভন পাইয়াছে। সুতরাং তাহাদের মধ্যে কেহ যদি অবহেলা পায়, তবে সে স্বভাবতই বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে পারে।"

তত্ত্ববোধিনীতেও দেবেন্দ্রনাথ এই দিক দিয়াই মিশনারিদের নিন্দা করিয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনী লিখিয়াছিলেন যে, শিক্ষার ভার যখন মিশনারিদেরই হাতে অনেক পরিমাণে আছে, তখন এ দেশের যুবকদের উপর তাঁহাদের একটা দখল জন্মিয়াছে। যুবকেরা হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে কিছুই জানে না; সুতরাং তাহাদিগকে খৃস্টান করা মিশনারিদের পক্ষে সহজ কাজ বটে, কিন্তু উচিত কাজ কিনা সেইটেই প্রশ্নের বিষয়। সেইজন্য তত্ত্ববোধিনী লিখিয়াছিলেন, "All we desire is fair play for both creeds" উভয় ধর্মের বেশ উচিত বিচার ও আলোচনা আমরা চাই। "হিন্দুধর্মের এবং খৃস্টান ধর্মের মতামতগুলির সম্যক্‌ জ্ঞান দেশময় বিস্তারিত হোক— তার পর দুই ধর্মমত তৌল করিয়া যদি কেউ একটিকে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া নির্বাচন করিয়া লয়— তবে তো ভয়ের কোনো কারণই নাই। এক ধর্মের সম্বন্ধে ভুল ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া বা অযথা নিন্দাবাদ করা— কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্মের দলবৃদ্ধির উপায় স্বরূপ বলিয়া গণ্য হইতে পারে বটে, কিন্তু সে উপায় ঈশ্বরের জ্ঞান ও বোধের সিংহদ্বারের এক পাও নিকটে মানুষকে অগ্রসর করিয়া আনিতে পারে না।"* খৃস্টান পাদ্রীরা বেদান্তধর্ম সম্বন্ধে লোকের মনে অযথা গালাগালি করিয়া ভুল সংস্কার উৎপন্ন করিতেছিলেন বলিয়াই *Vaidantic Doctrines Vindicated*এর প্রয়োজন ছিল। সুতরাং দেবেন্দ্রনাথ খৃস্টান ধর্মেব বিদ্বেষী ছিলেন, না বলিয়া খৃস্টান ধর্ম যেভাবে এ দেশে প্রচারিত হইতেছিল এবং হিন্দুধর্মের সত্যের প্রতি যেভাবে

* "Misrepresentation and calumnies may sometimes serve the cause of sectarian proselytism, but can never bring any man a single step nearer the portals of divine knowledge and wisdom."—*Vaidantic Doctrines Vindicated.*

লোকের মনে ভুল সংস্কার জন্মাইয়া দেওয়া হইতেছিল, তাহারই বিরুদ্ধ ছিলেন বলাই সংগত হয়। *Vaidantic Doctrines Vindicated*এ অনেকবার বলা হইয়াছে "we profess hostility to no creed"— আমরা কোনো ধর্মমতের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রচার করি না। সকল দেশের ঋষিদের মধ্যেই ঈশ্বর তাঁহার সত্যসকল প্রকাশিত করিতেছেন এ কথা সেই গ্রন্থে নানা জায়গায় বলা হইয়াছে এবং সেইজন্য যেমন 'বেদ-বেদান্ত Dispensation' তেমনি 'Christian Dispensation' দুই ধর্মবিধানই যে ঈশ্বরের বিধান তাহাও স্বীকার করা হইয়াছে। খৃস্টানেরা যখন প্যান্‌থীজম্ অর্থাৎ জগতের ভিতরেই ঈশ্বর নিঃশেষে আছেন তাহার বাহিরে নাই, এই মত— বেদান্তের মত বলিয়া নিন্দা করিলেন, তখন তত্ত্ববোধিনী লিখিলেন যে, ঈশ্বর সর্বত্র আছেন, এ কথা বলিলে যদি তাহা প্যান্‌থীজম্ হয় তবে বাইবেলে যখন বলা হইয়াছে "we live and move and have our being in God"— আমরা ঈশ্বরের মধ্যেই বাঁচিয়া আছি, তাঁরি মধ্যে চলিতেছি এবং আমাদের সত্তা তাঁরি ভিতরে, তখন সেটা প্যান্‌থীজম্ হইবে না কেন? এ জায়গায় খৃস্টধর্মকে তত্ত্ববোধিনী আক্রমণ না করিয়া কোনো ধর্মকে অযথা আক্রমণ যে কি রকম মূঢ়তা, খৃস্টানদিগকে তাহারই একটা শিক্ষা দিলেন। এই-সব কারণে আমার মনে হয় যে, দেবেন্দ্রনাথের খৃস্ট বা খৃস্টান ধর্মের প্রতি বিদ্বেষের ভাবের কথা যাহা প্রচলিত আছে, তাহা তাঁহার সম্বন্ধে একটি ভুল ধারণা মাত্র। ইহার পরে তিনি খৃস্টান ধর্ম সম্বন্ধে এ সময়ের চেয়েও বেশি আলোচনা করিয়াছিলেন এবং শ্রদ্ধাবান হইয়াছিলেন, তাহা আমরা ক্রমশ দেখিতে পাইব।

তবে রামমোহন রায় যেমন খৃস্টান মতবাদ (dogmas) বাদ দিয়া, তাহার নীতি-উপদেশগুলিকে গ্রহণ করিলেন, দেবেন্দ্রনাথ তাহা করেন নাই। তাহার কারণ, দেবেন্দ্রনাথের কাছে নৈতিকতা জিনিসটা আধ্যাত্মিকতার অন্তর্গত ছিল, যেমন ফলের শাঁসের অন্তর্গত তাহার বীজ। তাঁহার আনন্দমার্গের সাধনায়, পাপবোধ যথেষ্ট ছিল কিন্তু আনন্দের সমগ্রতার মধ্যে তাহা ক্রমাগতই আপনাকে বিসর্জন দিয়াছে। কোথাও একান্ত হইয়া সমস্ত জীবনকে তাহার মুঠির মধ্যে চাপিয়া ধরিতে পারে নাই। এইজন্য বোধ হয় মধ্যযুগীয় খৃস্টীয় সাধুসন্ন্যাসীদের জীবনী বা উপদেশ আলোচনা করিবার দিকে তাঁহার কোনো কালেই উৎসাহ হয় নাই। সেণ্ট বার্নাড পথে চলিবার সময় সুইট্‌জারল্যাণ্ডের হ্রদ-পর্বতের রমণীয় সম্মিলনের দৃশ্য চোখ মেলিয়া একবার চাহিয়া দেখিলেন না— চোখ বুজিয়া

রহিলেন।— এ সাধনা তো দেবেন্দ্রনাথের নয়। সেণ্ট টেরেসা কন্‌ভেণ্টে বা মঠে যখন সন্ন্যাসিনী হইয়া আছেন, তখন কন্‌ভেণ্টের বৈঠকখানার ঘুল্‌ঘুলি দিয়া বাহিরের দু-একটি লোকের সঙ্গে আলাপ করিতেন— সেটুকু বহির্জগতের সম্পর্কও তাঁহার আধ্যাত্মিকতার সাধনার পক্ষে ব্যাঘাতকর মনে হইল।— এই সাধনার সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের যোগ কোথায়? সেণ্ট অগস্টিন বা সেণ্ট টেরেসা বা ফ্রান্‌সিস্‌ অব আসিসি— কোনো মধ্যযুগীয় সাধু বা সাধ্বীর রচনা বোধ হয় তিনি প্রথম বয়সে স্পর্শ করেন নাই— আর করিয়া থাকিলেও ছুঁইবামাত্র ঠেলিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার সৌন্দর্যপ্রিয় চিত্ত প্রকৃতির সৌন্দর্যরসে নিমগ্ন হইয়া সেই রসের মধ্যেই পাপের সমস্ত দাহকে ও কালিমাকে নিমেষে নিমেষে ধুইয়া ফেলিত। পাপ হইতে শুদ্ধির জন্য সৌন্দর্যকে দূরে রাখিবার সাধনা তাঁহার আশ্রয় করার কোনো প্রয়োজনই ছিল না।

তবে এই পাপবোধের যন্ত্রণা ও আত্মনিপীড়নের অবস্থা পার হইয়া খৃস্টান সাধকেরা যেখানে ভগবৎ-প্রেমরসে অভিষিক্ত হইয়া তাহার অনির্বচনীয় মাধুর্যের কথা বলিয়াছেন, সেগুলি নিশ্চয়ই তাঁহার ভালো লাগিত। কারণ শেষ বয়সে *Amiel's Journal* তাঁর এক প্রিয় পুস্তক ছিল। আমিয়েলও একজন ভক্ত খৃস্টান ছিলেন। তাঁহার লেখার মধ্যে বিশ্বসৌন্দর্যে অভিনিবিষ্ট ভগবৎ-প্রেমের উপলব্ধি স্থানে স্থানে খুবই ফুটিয়াছে। শেষ বয়সে সেণ্ট অগস্টিন, ম্যাডাম গেঁয়ো প্রভৃতি খৃস্টান ভক্তদের বাণীও তাঁহার ভালো লাগিত।

খৃস্টান ধর্মের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ ছিল না, তাহার অন্য প্রধান কারণ— ইহার মধ্যে তিনি অনন্তের ভাব তেমন করিয়া দেখিতে পান নাই। উপনিষদ্‌ এই অনন্তের ভাবরসে পরিপূর্ণ, কিন্তু বাইবেলে খৃস্ট মানুষটি অত্যন্ত বেশি জলজলে। এবং ঐ মানুষভাবেই ভগবানের ধ্যান-ধারণাও বাইবেলের একটি বিশেষত্ব। হিব্রু ঋষিদের সামগাথায় (Psalms) সৃষ্টির মাহাত্ম্যের চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু হিব্রুদের সেই অনন্তত্ব একটা স্থানকালের অনন্তত্ব, ভাবের অনন্তত্ব নয়। হিব্রুধর্ম অত্যন্ত বেশি নৈতিক (Ethical) ধর্ম— সেমিটিক ধর্ম মাত্রেই তাই।

এখানে আর-একটি কথা বলা দরকার। শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি এই সময়েই *Rational Analysis of the Gospel* নামে এক বই প্রকাশ করেন। এই বইয়ে খৃস্টের ঈশ্বরত্ব খণ্ডিত হয় দেখিয়া, ডফ্‌ সাহেব রাগিয়া ইহার নাম দিয়াছিলেন, The irrational paralysis of the Gospel।

এই বই তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে প্রকাশিত হয় নাই*. তবে এই বইয়ের সমালোচনা ১৭৬৭ শকের পৌষের তত্ত্ববোধিনীতে বাহির হইয়াছিল বটে। বইটির লেখক বোধ হয় শ্যামাচরণ ছিলেন না ; লেখক ছিলেন কার্লাইল নামে এক সাহেব। তাহাতে বাইবেল শাস্ত্রকে অভ্রান্তরূপে গ্রহণের পক্ষে কতগুলি তথ্য বাধাস্বরূপ বলিয়া দাঁড় করানো হয়। তথ্যগুলি তত্ত্ববোধিনীতে উদ্ধৃত হইয়াছে এইরূপ—"৫০ খানারও অধিক বাইবেল অর্থাৎ খৃস্টধর্মপুস্তক ছিল কি না? তন্মধ্যে সকলকে জঘন্য জ্ঞানে কেবল চারিখানিমাত্র ধর্মপুস্তককে ঈশ্বর-বাক্য বলিয়া গ্রাহ্য করা হইয়াছে কি না?... ভবিষ্যদ্বক্তাদিগের অনেক বাণী বাইবেলে ঈশ্বরবাক্য রূপে মানা হইয়াছে কি না এবং তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকে মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া ভবিষ্যৎ বাণী কথনে প্রবৃত্ত হইতেন কি না?" ইত্যাদি।

তত্ত্ববোধিনী পড়িয়া মনে হয় যে, রামমোহন রায়ের আপিল গ্রন্থের চেয়ে যে এই বইটিতে বাইবেলের অধিকতর যুক্তিমূলক বিশ্লেষ (Rational analysis) হইয়াছিল তাহা নয়। বরং রামমোহন রায়ের বইগুলিতে বাইবেল শাস্ত্রের সত্যের প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাব আছে, এ বইটিতে তাহাও নাই। রামমোহন রায় বাইবেলের চারি দিকের ঝোপঝাড় কাটিয়া কুটিয়া তাহার সত্যের শ্রীসৌন্দর্য খুলিয়া দিয়াছেন। আর এই বইয়ের লেখক শুধুই খন্তা হাতে করিয়াছেন। তবে এ গ্রন্থের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ বা তত্ত্ববোধিনী সভার কোনো যোগই ছিল না।

* স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র বসু তাঁহার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনীতে ভুল করিয়া লিখিয়াছেন যে, এই গ্রন্থ তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে প্রকাশিত হয়। ১৭৬৭ শকের পৌষের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এই কথা অস্বীকার করা হইয়াছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পিতৃবিয়োগ পিতৃশ্রাদ্ধ বিশ্বজিৎযজ্ঞ

ধর্মদীক্ষার পর দেবেন্দ্রনাথের অন্তর বাহির যখন ঈশ্বরের প্রেমের আভায় উদ্‌ভাসিত হইল, তখন তিনি লিখিতেছেন, "তাঁহার দর্শন পাইলাম, তাঁহার আদেশ শ্রবণ করিলাম এবং একেবারে তাঁহার সঙ্গী হইয়া পড়িলাম।" এই দর্শন ও আদেশ শ্রবণ প্রভৃতি ব্যাপার যে কি, তাহা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। সমস্ত চৈতন্যের একটা উদ্দীপ্ত অবস্থা (Illumination) হইতেই ইহাদের উৎপত্তি। কিন্তু এই অবস্থাই চরম নয়। যে-সকল সাধক ইহাকেই চরম মনে করিয়া ক্রমাগতই এই অতীন্দ্রিয় দর্শন বা শ্রবণের মধ্যেই নিবিষ্ট থাকেন, তাঁহাদের এটা মৌতাত হইয়া যায় বলিয়া কোনটা দিব্য ভাস আর কোন্‌টা অভ্যাস তাহার বিচারশক্তি তাঁহাদের লোপ পায়। তখন অধ্যাত্ম (Spiritual) লক্ষণা রোগবিকারের লক্ষণার (Pathological) পর্যায়ের মধ্যে পড়িয়া সাধককে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে। এমন প্রায়ই দেখা যায়।

চৈতন্য যখন দিব্যালোকে পরিপূর্ণ, তখন জগতের উপর যে আলো পড়ে— "That light which never was on land or sea"— যে আলো জলে স্থলে কোথাও নাই—সেই আলোই সাধনার চরম ধন নয়। তার পরে উঠে ঝড়, আসে মেঘ, ছায় অন্ধকার। একজন খৃষ্টীয় সাধক তাহাকে বলিয়াছেন, ঈশ্বরের "ঝোড়ো প্রেম" (Stormy Love)— ঝড়ের বেশেই তাহা আসে। তখন হঠাৎ অন্তরে বাহিরে সমস্ত উলোটপালোট হইতে থাকে, অঘটন ঘটিতে থাকে, বাস্তব জগৎটাকে একটা পেন্সিলে আঁকা ঘষা ছবির মতো কতগুলি আঁক-জোঁকের সমষ্টির মতো অর্থহীন ঠেকে।

গত পরিচ্ছেদে খৃস্টান সংঘাতের ঝড়ের কথা তুলিয়াছি—সে আর কী বা ঝড়—একটা বাইরের কাণ্ড। খানিকটা বাক্যের ধূলি আর শুষ্ক পত্রের মর্মর রোল। তেমন ঝড়ে জীবন-তরী এপাশ ওপাশ কোনো পাশই হেলে না— তার বুকের পাঁজরের মধ্যে ঢেউয়ের কান্না বাজে না। দেবেন্দ্রনাথের জীবনে বাইরের প্রচণ্ড ঝড়ের ভিতর দিয়াই ভিতরের ঝড় একদিন আসিয়াছিল। সেই কথাই এ পরিচ্ছেদে বলিব।

ইংরাজী ১৮৪৬ সালের শ্রাবণ মাসের ঘোর বর্ষায় দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার স্ত্রী

সারদা দেবীকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গায় বেড়াইতে বাহির হইলেন, সে কথা বলা হইয়াছে। একটি প্রকাণ্ড পিনিসে সারদা দেবী তাঁহার তিন ছেলে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও হেমেন্দ্রনাথকে লইয়া উঠিলেন, আর-একটি বোটে দেবেন্দ্রনাথ কেবল রাজনারায়ণ বসুকে সঙ্গে লইলেন। বোটে থাকিবার সময়, রাজনারায়ণ প্রতিদিনের ঘটনা একটি দৈনন্দিন লিপিতে লিখিতেন। নবদ্বীপ ও চুপি পার হইয়া পাটুলিকে পশ্চাৎ করিয়া একদিন যখন চলিয়াছেন, এমন সময় বেলাবেলি দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণকে তাঁহার দৈনন্দিন লেখাটা শেষ করিয়া ফেলিতে বলিলেন। রাজনারায়ণ বলিলেন, বেলা শেষ হয় নাই, ইহার মধ্যে কত কি ঘটিতে পারে! বলিতে বলিতে তাঁহারা দুজনে দেখেন, আকাশের পশ্চিম কোণে একখানি ঘোর কালো মেঘ দেখা দিয়াছে। ঝড়ের সম্ভাবনা দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণকে বলিলেন— ঝড়ের সময় বোটে থাকা ভাল নয়, চল আমরা পিনিসে যাই। মাঝি পিনিসের সঙ্গে বোট লাগাইয়া দিল। দেবেন্দ্রনাথ তখন বোটের ছাতের উপর বসিয়া আছেন। দেবেন্দ্রনাথ ছাত হইতে নামিয়াছেন, এমন সময় একটা দমকা ঝোড়ো হাওয়া আসিয়া পিনিসের মাস্তুলের একটা শাখা ভাঙিয়া দিল এবং তাহার পাল দড়িদড়া সমেত বোটের মাস্তুলকে জড়াইয়া বোটের ছাদের উপর পড়িল। পিনিস বাকি পালে তীরের মতো ছুটিল এবং বোটটাকে সঙ্গে লইয়া চলিল। পিনিসের টানে বোট কাৎ হইল। যে দিকটা কাৎ হইল সে দিকটা প্রায় জলের সমান, এক আঙুল জল হইতে উঁচু হইবে। তখন সামাল সামাল রব পড়িয়া গেল, মাস্তুলে জড়ানো দড়ি কাটার জন্য দায়ের খোঁজ পড়িল— দা মিলে না। একটা ভোঁতা দা দিয়া ঘা মারিয়া মারিয়া দুটা দড়ি কাটিল। ততক্ষণ দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ স্তব্ধ হইয়া জলের দিকে চাহিয়া আছেন— একেবারে মৃত্যুর সম্মুখীন। আর এক মুহূর্ত হইলে বোটে জল উঠিয়া বোট ডুবিয়া যাইবে। দাঁড়ীরা দড়িই কাটিতেছে। আবার একটা প্রবল দম্‌কা হাওয়া আসিল, মাঝিরা চেঁচাইয়া উঠিল "আবার তাইরে, আবার তাইরে"। রাজনারায়ণ লিখিয়াছেন সেই শব্দ তিনি জীবনে ভোলেন নাই। শেষ দড়িটা কাটিয়া ফেলাতেই বোটটা ছাড়া পাইয়া একেবারে তীরবেগে ওপারের কাছাড়ে গিয়া লাগিল এবং পাড়ের সমান হইয়া দাঁড়াইল। দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ তীরে লাফ দিয়া পড়িলেন— তখন প্রায় আঁধার হইয়াছে, তবু "সায়াহ্নের পিঙ্গল আভাস রাঙাইছে আঁখি।"

এমন সময় একটা ছোটো ডিঙি বোটে আসিয়া লাগিল। বোম্বেটে নৌকা

মনে করিয়া তাঁহাদের দুজনার বিশেষ ভয় হইল। নৌকা হইতে লাফাইয়া এক ব্যক্তি পাড়ে আসিল— দেবেন্দ্রনাথ দেখেন, সে তাঁহাদের বাড়ির স্বরূপ খান্সামা। সে একখানি চিঠি তাঁহার হাতে দিল। আঁধারে অস্পষ্ট আলোয় ভালো করিয়া পড়া যায় না, যেটুকু পড়া গেল তাহাতে মনে হইল, দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু-সংবাদ। সেই ঝড়ের রাতে, সেই অজানা তীরের মধ্যে দাঁড়াইয়া দেবেন্দ্রনাথ এমন খবর পাইলেন, যাহা "বজ্রপাতের ন্যায় তাঁহার মস্তকে পড়িল।"

তখন আর দেরি করার সময় নাই কলিকাতায় অবিলম্বে যাইতে হইবে, তাহা না হইলে বিষয়ের গোলযোগ উপস্থিত হইবে। পরদিন বোটে তিনি সপরিবারে উঠিলেন এবং ঝড়ের মুখেই কলিকাতার দিকে ফিরিলেন। রাজনারায়ণকে পিনিসে করিয়া আস্তে আস্তে পশ্চাৎ আসিতে বলিলেন। মাঝ-পথে এমনি তুফান উঠিল যে বোট ডুবে আর কি! মাঝিরা তীরে লাফাইয়া পড়িয়া একটা মুড়া গাছের সঙ্গে বোট বাঁধিয়া ফেলিয়া তাহাকে রক্ষা করিল। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পল্তায় পৌঁছিলেন! পল্তায় পৌঁছিয়া গাড়ি পাইলেন। বোটের তখন এক খোল ভরা জল। যদি সে রাত্রে গাড়ি না পাইতেন এবং সেই বোটে করিয়া বরাবর কলিকাতার দিকে চলিতেন, তবে জলের ভারে বোট একেবারে ডুবিত। সমস্ত রাস্তা জলময়— দুর্যোগ— যখন বাড়ি পৌঁছিলেন তখন রাত দুপর।

বাহিরে ঝড়ের বেশে মৃত্যুর বেশে এই যে দুর্দিন দেখা দিল, ইহা যে কত বড়ো দুর্দিন তাহা তখনো দেবেন্দ্রনাথ জানেন নাই। পিতৃশ্রাদ্ধ কি নিয়মে হইবে, ইহা লইয়া তিনি মহা গোলযোগের মধ্যে পড়িলেন। অশৌচের ক'দিন তিনি প্রতিদিন সকালে উঠিয়া দুপর পর্যন্ত খালি পায়ে শহরের গণ্যমান্য লোকদের সঙ্গে দেখা করিতেন এবং দুপর হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁহাদিগকে নিজের বাড়িতে অভ্যর্থনা করিতেন। যখন অশৌচ পার হইয়া শ্রাদ্ধের সময় উপস্থিত, তখন তাঁহার ছোটো কাকা রমানাথ ঠাকুর বলিলেন, "দেখো ব্রহ্ম ব্রহ্ম করে এ সময় কোনো গোলমাল তুলো না। দাদার বড়ো নাম।" রাজা রাধাকান্ত দেব দেবেন্দ্রনাথকে বড়ো স্নেহ করিতেন, তিনিও তাঁহাকে সেই পরামর্শ দিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বিনয়ের সহিত বলিলেন যে, তিনি তাঁহার ধর্মব্রতের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করিতে পারিবেন না। তিনি উপনিষদের মতে শ্রাদ্ধ করিবেন। রাজা রাধাকান্ত দেব বলিলেন— সে হবে না, সে হবে না; শ্রাদ্ধ তাহা হইলে বিধিপূর্বক হবে না। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার মেজ ভাই গিরীন্দ্রনাথকে

বলিলেন যে, ব্রাহ্মধর্ম ব্রত গ্রহণ করিয়া শালগ্রাম আনিয়া কেমন করিয়া আমরা পিতৃশ্রাদ্ধ করি? গিরীন্দ্রনাথ বলিলেন—তাহা হইলে সকলে আমাদিগকে ত্যাগ করিবে, সকলে বিপক্ষ হইবে।

সকলেই তাঁহার মতেব বিরোধী। কাহাবো কাছে তিনি সায় পান না। ব্রাহ্মসমাজে যাঁহারা তখন যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহারাও যে সকলে অপৌত্তলিক অনুষ্ঠান কবিতে প্রস্তুত ছিলেন তাহা নয়। তার সাক্ষী রমানাথ ঠাকুরই তো রামমোহন বায়ের সঙ্গে যোগ দিয়া ব্রাহ্মসমাজেব কাজে তাঁহার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন এবং তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অথচ তিনি সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে পবিবর্তন ঘটাইতে রাজি ছিলেন'না। এ দেশে ধর্ম-মতেব স্বাধীনতা চিরকালই আছে—কেহ বা অদ্বৈতবাদী কেহ বা চার্বাকমত-বাদী নাস্তিক। তাহাতে সমাজ হইতে কোনো কালেই আপত্তি উঠে নাই। হিন্দুব ছেলে যদি মুসলমান পীর বা ফকিরের কাছে গিয়া ধর্মোপদেশ লয়, তাহাতেও আপত্তিব কাবণ নাই— কাবণ সেটা হইল ধর্মের ব্যাপার, সামাজিক ব্যাপার নয়। সুতরাং রমানাথ ঠাকুর প্রভৃতি বেদান্ত মত অবলম্বন করুন বা না করুন, তাহাতে সমাজের কিছুই আসিত যাইত না। তাঁহারা সমাজের প্রচলিত রীতি-নীতি-অনুষ্ঠান মানিয়া চলিলেই হইল, তার পরে যা খুশি মত প্রচার করিতে চান করুন-না কেন। সমাজস্থিতি ভঙ্গ করা একটা মহা তুর্লক্ষণ বলিয়া তখন গণ্য হইত, এবং এখনো গণ্য হয়। এইখানেই মানুষের এ দেশে স্বাধীনতা নাই। শালগ্রামকে উপাস্য বলিয়া স্বীকাব করি বা না-করি, সামাজিক অনুষ্ঠানে শালগ্রামকে উঠাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব করা চলিবে না। ধর্মের সঙ্গে সমাজের এই বিচ্ছেদ, মাথার সঙ্গে ধড়ের বিচ্ছেদের মতো এ দেশে এতকাল ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে যে, এটার জন্য ধর্ম যে হয় কেবল মাত্র একটা তত্ত্বকথা এবং সমাজ হয় একটা যন্ত্র এবং উভয়ই হয় জীবনশূন্য— ইহা আমাদের দেশের লোকের মনেই হয় না। এইজন্যই এ দেশে কত নূতন নূতন ধর্মপন্থার পরে ধর্মপন্থা আসিয়াছে, কিন্তু তাহারা সমাজকে কোথাও নাড়া দেয় নাই। একদল বৈরাগী বা সন্ন্যাসী তৈরি করিয়াছে। সুতরাং দেবেন্দ্রনাথ যে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া পিতৃশ্রাদ্ধের মতো এমন গুরুতর অনুষ্ঠানে পৌত্তলিক সংস্কারকে বাদ দিবার সংকল্প করিতেছেন, এটা তখনকার কালের হিসাবে একেবারেই অদ্ভূত ব্যাপার ছিল। তাঁহার আত্মীয়স্বজন তাঁহার এ সংকল্পে কেমন করিয়া উৎসাহ দেন? রাধাকান্ত দেব তাঁহাকে সমাজস্থিতির দিক্ হইতে ঠিকই বলিয়াছিলেন যে, উপনিষদের

মতে শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধ "বিধিপূর্বক হইবে না," তাহা "শিষ্টাচারের বিরুদ্ধ কার্য হইবে"। তিনি জানেন নাই যে, মানুষের জন্যই সমাজ, সমাজের জন্য মানুষ নয়। এই মানুষই সমাজকে ভাঙে, সমাজকে গড়ে। মানুষ যতই জ্ঞান ও ধর্মে উন্নতি লাভ করে, তাহার সমাজের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলি ততই সেই উন্নতির অনুরূপ হইয়া গড়িয়া উঠে, তাহা না হইলে অসভ্য মানুষের সমাজে আর সুসভ্য মানুষের সমাজে কোনো তফাতই থাকিত না। মানুষ ব্যষ্টি, সমাজ সমষ্টি— মানুষের মধ্যে যে উন্নতির নিয়ম, সমাজের মধ্যে সেই উন্নতিরই নিয়ম। তবে ব্যষ্টি যত দ্রুত এগোয়, সমষ্টি তত দ্রুত এগোয় না। সমাজে সেইজন্য পরিবর্তন ঘটিতে বিলম্ব লাগে।

দেবেন্দ্রনাথের কাছে যে ধর্ম ও সমাজের মধ্যে বিচ্ছেদ থাকিতেই পারে না, ইহা তখন রমানাথ ঠাকুর প্রভৃতি তাঁহার ব্রাহ্ম আত্মীয়বাও বুঝিতে পারেন নাই। কারণ তাঁহাদেব কাছে ধর্মটা ছিল মস্তিষ্কের কোটরগত জিনিস, সমস্ত জীবনের ভিতরকার জিনিস ছিল না। সেই কারণে দেবেন্দ্রনাথের পিতৃশ্রাদ্ধে প্রচলিত সামাজিক অনুষ্ঠানরীতিকে উল্টাইয়া দিবার ইচ্ছাব কোনো ন্যায্য কারণ তাঁহারা খুঁজিয়া পাইলেন না। আবহমান রীতিনীতিকে বদল করিলে সমাজে মানুষ থাকিবে কেমন কবিয়া? ইহাই তাঁহাদের কাছে একমাত্র সমস্যা ছিল।

এ সময়ে একটি মাত্র লোকের কাছে দেবেন্দ্রনাথ উৎসাহ পাইলেন। তিনি লালা হাজাবীলাল। তিনি বলিলেন, "লোকভয় আবার ভয়। ধর্মের জন্য প্রাণ দেওয়া যায়, তাহার কাছে লোকনিন্দা কি! প্রাণ গেলেও আমরা ব্রাহ্মধর্ম ছাড়িব না।" দেবেন্দ্রনাথের পিতামহ এক সময়ে বৃন্দাবনে তীর্থ করিতে যান, তখন হাজারীলালকে পিতৃমাতৃহীন অনাথ দেখিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনেন। কলিকাতায় আসিয়া কুসঙ্গে পড়িয়া তাঁহার জীবন একেবারে নষ্ট হইয়া গেল। কিন্তু তিনি ব্রাহ্মধর্মের আশ্রয় পাইয়া ধর্মনিষ্ঠ ও ঈশ্বরনিষ্ঠ হইয়াছিলেন, পাপের পথ সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিলেন। নিজে পাপ হইতে উদ্ধাব পাইয়াছিলেন বলিয়া ধর্মপ্রচারে তাঁহার উৎসাহ ছিল অসাধারণ। তখন যে অতগুলি লোক অল্প সময়ের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল, সে কেবল লালা হাজারীলালের চেষ্টায়। তিনি দেবেন্দ্রনাথকে যাই বলিলেন, "ঈশ্বর বড় না মানুষ বড়।" অমনি দেবেন্দ্রনাথের মনে আর কোনো দ্বিধা রহিল না। অবশ্য তখন তাঁহার সংগ্রাম যে কতখানি তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার। সমস্ত সমাজ, সমস্ত আত্মীয়বর্গ, বন্ধু-বান্ধব একদিকে, তিনি অন্য দিকে। ইহারা সকলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে,

নিগ্রহ করিবে, নিন্দাবাদ করিবে। অথচ ইহারাই প্রিয়জন, বান্ধব আত্মীয়— ইহাদের মমতা ও স্নেহের বন্ধন কাটানো যায় না। তিনি লিখিতেছেন, এই সময়ে "ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করিতেছি 'আমার দুর্বল হৃদয়ে বল দাও, আমাকে আশ্রয় দাও।' এই সকল চিন্তাতে শোচনাতে রাত্রিতে নিদ্রা হয় না। বালিশের উপরে মাথা ঘুরিতে থাকে।" সংকল্প তো স্থিরই হইয়াছে, লড়াই তবু যায় না— কারণ এ লড়াই যে সংসারের সঙ্গে ধর্মের লড়াই— সুতরাং বড়ো কঠিন

এমন সময় একদিন রাত্রে তিনি এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখিলেন। সেদিন তাঁহার ভালো ঘুম হইতেছিল না, এক-একবার তন্দ্রা আসিতেছিল, আবার জাগিয়া উঠিতেছিলেন। স্বপ্নটা যদিচ মগ্ন চৈতন্যলোকের ক্রিয়া, তবু সেটাকে Symbolic vision বা রূপক দৃষ্টির হিসাবে ধরা যাইতে পারে। কল্পনাশক্তি যাহাদের অত্যন্ত বেশি, সেই কবি বা শিল্পীদের পক্ষে এই রকমের দৃষ্টিটা স্বতোস্ফূর্ত এবং তাহাদেরি মতো কল্পনাশক্তিসম্পন্ন মরমী (mystic) সাধকদের পক্ষেও এটা তেমনিই স্বাভাবিক জিনিস। সেণ্ট টেরেসা, সুসো প্রভৃতি পশ্চিমের মরমিয়াদিগের জীবনে এরকমের দৃষ্টির বা স্বপ্নের গল্প বিস্তর পাওয়া যায়। দেবেন্দ্রনাথের এই স্বপ্নের মধ্যেও কবি-কল্পনার যথেষ্ট প্রাচুর্য আছে। এ যেন মনেরই কল্পনা সত্যের সংযোগে রূপ ধরিয়াছে।

তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, যেন একজন অন্ধকারে আসিয়া তাঁহাকে বলিল "উঠ"। তিনি উঠিয়া বসিলেন। সে বিছানা হইতে নামিতে বলিল এবং তাহার পিছনে পিছনে আসিতে বলিল। বাড়ির ভিতরের সিঁড়ি দিয়া সে ও তিনি নামিলেন, উঠানে আসিলেন, দেউড়ি পার হইলেন। তার পর সেই ছায়া-পুরুষ ঊর্ধ্বে আকাশে উঠিল, তিনিও তাহার পিছনে পিছনে উঠিলেন। "পুঞ্জ পুঞ্জ গ্রহ-নক্ষত্র তারকা সকল দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে সমুজ্জ্বল হইয়া আলোক দিতেছে, আমি তাহার মধ্য দিয়া চলিতেছি। যাইতে যাইতে একটা বাষ্প-সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সেখানে আর তারা নক্ষত্র কিছুই দেখিতে পাই না। বাষ্পের মধ্যে খানিক দূর যাইয়া দেখি যে, সেই বাষ্প-সমুদ্রের উপদ্বীপের ন্যায় একটি পূর্ণচন্দ্র স্থির হইয়া রহিয়াছে। তাহার যত নিকটে যাইতে লাগিলাম সেই চন্দ্র তত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আর তাহাকে গোলাকার বলিয়া বোধ হইল না, দেখিলাম, তাহা আমাদের পৃথিবীর ন্যায় চেটাল। সেই ছায়া-পুরুষ গিয়া সেই পৃথিবীতে দাঁড়াইল, আমিও সেই পৃথিবীতে দাঁড়াইলাম। সে সমুদায় ভূমি

শ্বেতপ্রস্তরের, একটি তৃণ নাই, না ফুল আছে, না ফল আছে, কেবল শ্বেতমাঠ ধূ ধূ করিতেছে। তাহার যে জ্যোৎস্না তাহা সে সূর্য হইতে পায় নাই, সে আপনার জ্যোতিতে আপনি আলোকিত, তাহার চারিদিকে যে বাষ্প তাহা ভেদ করিয়া সূর্যরশ্মি আসিতে পারে না। তাহার নিজের সে রশ্মি অতি স্নিগ্ধ, এখানকার দিনের ছায়ার ন্যায় সেখানকার সে আলোক। সেখানকার বায়ু সুখস্পর্শ। মাঠ দিয়া যাইতে যাইতে সেখানকার একটা নগরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সকল বাড়ি, সকল পথ শ্বেত-প্রস্তরের, স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। রাস্তায় একটি লোকও দেখিলাম না। কোন কোলাহল নাই, সকলই প্রশান্ত। রাস্তার পার্শ্বে একটা বাড়িতে আমার নেতা প্রবেশ করিয়া তাহার দোতালায় সে উঠিল, আমিও তাহার সঙ্গে উঠিলাম। দেখি যে, একটা প্রশস্ত ঘর, ঘরে শ্বেতপাথরের টেবিল ও শ্বেতপাথরের কতকগুলা চৌকি রহিয়াছে। সে আমাকে বলিল 'বসো'। আমি একটা চৌকিতে বসিলাম। সে ছায়া বিলীন হইয়া গেল। আর সেখানে কেহই নাই। আমি সেই নিস্তব্ধ গৃহে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছি, খানিক পরে দেখি যে, সেই ঘরের সম্মুখের একটা দরজার পর্দা খুলিয়া উপস্থিত হইলেন আমার মা। মৃত্যুর দিবস তাঁহার যেমন চুল এলানো দেখিয়াছিলাম, সেইরূপ তাঁহার চুল এলানোই রহিয়াছে। আমি তো তাঁহার মৃত্যুর সময়ে মনে করিতে পারি নাই যে, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর যখন শ্মশান হইতে ফিরিয়া আসিলাম, তখনো মনে করিতে পারি নাই যে, তিনি মরিয়াছেন, আমার নিশ্চয় যে, তিনি বাঁচিয়াই আছেন। এখন দেখিলাম, আমার সেই জীবন্ত মা আমার সম্মুখে। তিনি বলিলেন, 'তোকে দেখবার ইচ্ছা হইয়াছিল, তাই তোকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছি। তুই নাকি ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছিস? কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা।' তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহার এই মিষ্ট কথা শুনিয়া, আনন্দ-প্রবাহে আমার তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল।"

মৃত্যুর এই স্বপ্ন-কাব্যটি রবীন্দ্রনাথের "সিন্ধু-পারে" কবিতাকে মনে পড়াইয়া দেয়। সেখানে সব ছবিগুলা কালো ও ধূমল, কালো ঘোড়ার উপর ঘোমটায় মুখ-ঢাকা রমণী, কালো সিন্ধু, কালো শৈল "গুহামুখ পরকাশি।" এখানে সমস্ত শুভ্র — বাষ্প-সমুদ্রের মধ্যে পূর্ণচন্দ্র, শ্বেত-প্রস্তরের ভূমি, সাদা ধূ ধূ করা মাঠ, সমস্ত শুভ্র জ্যোৎস্নাময়। কবি দান্তে ছাড়া আর কারো নাম মনে পড়ে না, যাহার বর্ণনার সঙ্গে এই অপূর্ব স্বপ্ন-রূপক কাব্যের বর্ণনার তুলনা হইতে পারে। দান্তের 'আলোর নদী'র বর্ণনা আলোর প্রতি এমনি মোহে ভরা। "আলোককে একটি

নদীর ধারার মতন উজ্জ্বলতায় ভরা দেখিলাম··· সেই নদী হইতে স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল এবং নদীর দুই তটের ফুলদলের উপর সোনায় বসানো রুবির মতো সেই স্ফুলিঙ্গগুলি সংলগ্ন হইল। গন্ধে মাতাল হইয়া তাহারা আবার সেই আশ্চর্য আলোর বন্যার ভিতরে ডুব দিল এবং 'একে একে অপূর্ব বেশে আবার মাথা জাগাইয়া উঠিতে লাগিল।" ইত্যাদি। আলোর উপর এমন একটা আশ্চর্য মুগ্ধ টান এই বর্ণনাব মতো প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু আলোর অলৌকিক রূপ দেখিলেও, মৃত্যুকে এমন শুভ্র করিয়া দান্তে কি মিল্‌টন কেহই দেখেন নাই।

এই কাব্যের মধ্যে আর-একটি মাধুর্য-রস আছে— মায়েব সঙ্গে দেখার কথা যেখানে আসিয়াছে। তাহাতেই তাহার রূপকটি দানা বাঁধিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ দিদিমার কাছেই মানুষ হইয়াছেন লিখিয়াছেন, মায়ের কথা কই কিছুই তো কোথাও লেখেন নাই। পিতার আদ্যকৃত্যের পুর্বে পরলোকেব এই স্বপ্ন এবং মায়েব কাছ হইতে এই আশ্বাসবাণী— "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা"— তাঁহার সংকল্পের উপরে যেন একটি আশীর্বাদেব অমৃত বর্ষণ করিল। মৃত্যুর পরপার হইতে বাণী পৌছিল— মাভৈঃ। ভয় নাই।

শ্রাদ্ধের দিন আসিল। বাড়ির সামনে পশ্চিম প্রাঙ্গণে মস্ত এক চালা তৈরি হইল। দানসাগরের সোনারুপাব যোড়শে সেই চালা সাজানো হইল। দেবেন্দ্রনাথ দানোৎসর্গেব একটি মন্ত্র স্থির কবিয়া শ্যামাচরণ ভট্টাচার্যকে বলিয়া রাখিয়াছেন যে, দানোৎসর্গের সময় তিনি তাঁহাকে যেন সেই মন্ত্র পড়ান। চালার মাঝখানে পুরোহিত, আত্মীয়স্বজন সকলে শালগ্রাম স্থাপন করিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন; তিনি সেই অবসরে দানসামগ্রী উৎসর্গ করিতে শুরু করিলেন। মহা সোরগোল উপস্থিত হইল— দেবেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি দানসামগ্রী উৎসর্গ করিয়া তেতলায় চলিয়া গেলেন। তার পর তিনি শুনিলেন যে, গিরীন্দ্রনাথ শ্রাদ্ধ করিতেছেন। দুপুরে গোলযোগ থামিয়া গেলে তিনি শ্যামাচরণ ও কয়েকজন ব্রাহ্মকে লইয়া কঠোপনিষৎ পড়িলেন। কারণ ঐ উপনিষদে আছে—য ইমং পরমং গুহ্যং শ্রাবয়েদ্ ব্রহ্মসংসদি। প্রযতঃ শ্রাদ্ধকালে বা তদানন্ত্যায় কল্পত তদানন্ত্যায় কল্পত ইতি। অর্থাৎ যিনি শুদ্ধচিত্ত হইয়া এই পরম গুহ্য উপাখ্যান ব্রাহ্মণসমাজে বা শ্রাদ্ধকালে শ্রবণ করান, তাঁহার পক্ষে তাহা অনন্ত ফল উৎপাদক হয়, তাহা অনন্ত ফল উৎপাদক হয়।

এমনি করিয়া শ্রাদ্ধ তো সম্পন্ন হইল। সেদিন সকল জ্ঞাতিকুটুম্ব আত্মীয়-বান্ধবেরা আহার করিয়া চলিয়া গেলেন, পরদিন ভোজের নিমন্ত্রণে আর কেহ

আসিলেন না। প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন, "যদি দেবেন্দ্র পুনরায় এরূপ না করেন, তবে আমরা সকলে তাঁহার নিমন্ত্রণে যাইব।" দেবেন্দ্রনাথ বলিয়া পাঠাইলেন, 'যদি তাই হবে, তবে এতটা কাণ্ড কেন করিলাম। আমি আর পৌত্তলিকতার সঙ্গে মিলিতে পারিব না।" দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "জ্ঞাতি বন্ধুরা আমাকে ত্যাগ করিলেন, কিন্তু ঈশ্বর আমাকে আরো গ্রহণ করিলেন।"

শ্রাদ্ধক্রিয়া অপৌত্তলিক ভাবে সম্পন্ন হইলেও, দানোৎসর্গ প্রভৃতি অনুষ্ঠান লইয়া সংবাদপত্রে অত্যন্ত আন্দোলন উপস্থিত হইল। "Justicia" স্বাক্ষরিত কোনো ব্যক্তি ইংলিশম্যান পত্রে* দেবেন্দ্রনাথকে আক্রমণ করেন— রাজনারায়ণ বসু বলেন, এই Justicia দেবেন্দ্রনাথেরই আত্মীয় জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ১৭৬৮ শকের (১৮৪৬ খৃস্টাব্দ) অগ্রহায়ণের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তাহার জবাব দেন, সেই জবাব রাজনারায়ণবাবু ইংরাজীতে তাঁহার হইয়া লিখিয়া দিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে জস্টিসিয়ার অভিযোগ ছিল— ১. প্রত্যক্ষভাবেই হৌক, পরোক্ষভাবেই হৌক, হিন্দুশ্রাদ্ধের পৌত্তলিক অনুষ্ঠানে দেবেন্দ্রনাথ যোগ দিয়াছেন। তিনি তত্ত্ববোধিনী সভার মাথা; সুতরাং সেই সভার মত ও আদর্শের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা তাঁহার একান্ত কর্তব্য ছিল। অথচ তিনি প্রচলিত হিন্দু-রীতির সহিত আপস করিতে গিয়া সে কর্তব্য পালন করিতে পারেন নাই। ২. তিনি নিজে শ্রাদ্ধ করিয়াছেন, অনুষ্ঠানে যোগ দিবার জন্য তাঁর বাড়িতে লোকজন নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, দানোৎসর্গ নিজের হাতে করিয়াছেন— সুতরাং পৌত্তলিক অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণরূপে উৎসাহ দিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্রের নিয়ম এই যে, জ্যেষ্ঠ পুত্রই পিতার শ্রাদ্ধের অধিকারী— অবশ্য অন্য কাহাকেও সেই অধিকার তিনি দিতে পারেন। কিন্তু তাহা তাঁহারই অনুমতি-সাপেক্ষ। তিনি এ অনুমতি দিলেন কেন? তাঁহার মনে রাখা উচিত ছিল যে, তাঁহার যতই কেন বাধাবিঘ্ন হৌক-না, ধর্মসংস্কারকের পক্ষে নিজের উচ্চ আদর্শকে কোনো কুরীতির সঙ্গে আপসে পড়িতে দেওয়া একেবারেই উচিত নয়। তাহাতে সংস্কারের কাজ একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

দেবেন্দ্রনাথ ইহার জবাবে যাহা লেখেন তাহা সংক্ষেপত এই— 'প্রথমত, জস্টিসিয়া, আমার বলা উচিত যে, আমরা বেদকে এবং কেবলমাত্র বেদকেই আমাদের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মমতের মানদণ্ডের মতো মনে করি। বেদের জ্ঞানকাণ্ড

* 19th October 1846

ও কর্মকাণ্ড এই দুই কাণ্ডের মধ্যে জ্ঞানকাণ্ডকেই আমরা আশ্রয় করিয়াছি, কিন্তু কর্মকাণ্ডকে আমরা ধর্মগর্হিত বা দূষণীয় মনে করি না— নিরর্থক মনে করি মাত্র। বেদেই বলিয়াছে যে, ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে বাহ্য ক্রিয়াকাণ্ডের প্রয়োজন নাই। আমি আমার পিতার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে ক্রিয়াকাণ্ড কিছুই করি নাই— পৌত্তলিক আচারের কথা তো দূরের কথা। বেদে যখন বলে যে, ব্রহ্মজ্ঞানী কর্মকাণ্ডকে আশ্রয় করিতেও পারেন, না করিতেও পারেন, তাহাতে কিছুই আসে যায় না, তখন আমি আমাদের দেশপ্রচলিত নির্দোষ রীতি অনুসারে আমার পরলোকগত পিতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছি—ব্রাহ্মণ ও দরিদ্র লোকদিগকে দান করিয়াছি। আমি যে দানোৎসর্গ করিয়াছি তাহাতে কোনো ধর্মের ব্যাপার ছিল না; সেই সকল বস্তু আমার অধিকার হইতে গেল— এই রকমের কথা ছিল মাত্র। আমি শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানের অংশ নিজেও সম্পন্ন করি নাই; কিম্বা আর কাহারো উপরে বরাত দিই নাই। আর-একটি কথা আপনার মনে রাখা উচিত। আমরা উপনিষদ্‌-বেদান্তের পন্থী বলিয়া আমাদের বনে গিয়া কৃচ্ছ্রসাধন ও তপস্যা করা আদর্শ নয়। আমরা সমাজে পরিবারের মধ্যে বাস করিব; আমরা ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ থাকিব। সুতরাং বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি সামাজিক চিরপ্রচলিত অনুষ্ঠান আমাদের অবশ্য-পালনীয়। আমাদের চেষ্টা তাই এই যে, কেবল যে-সকল অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে সেগুলি ভাঙা নয়, তাহার জায়গায় উৎকৃষ্টতর অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করা।'

'জষ্টিসিয়া' এই জবাবেও ক্ষান্ত না হইয়া আবার এক চিঠি লিখিলেন। তাহাতে তিনি লেখেন যে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড একবার নিরর্থক বলা হইলে আবার তাহার প্রয়োজন আছে এ কথা বলা কেন? সেই ক্রিয়াকাণ্ড কি একেবারেই অপৌত্তলিক? দানোৎসর্গ প্রভৃতি ক্রিয়া অপৌত্তলিক হয় কি করিয়া? ইত্যাদি। তত্ত্ববোধিনীতে তাহার লম্বা উত্তর বাহির হইল— তাহাতে বেদে কোথাও যে প্রতিমাপূজার কোনো কথা নাই এবং বৈদিক কর্মকাণ্ড যে নিম্ন অধিকারীর জন্য— এই দুটি কথা প্রমাণ করার চেষ্টা হইল।

যাই হোক, এ-সকল তর্কবিতর্ক হইতে একটি কথা বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া গেল যে, এ সময়ে ব্রাহ্মধর্ম (যাহার নাম ছিল বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্ম), বেদ এবং বেদান্ত দুই শাস্ত্রের উপরেই ভর করিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল। বৈদিক যাগযজ্ঞ ঠিক প্রতিমাপূজা না হইলেও কতকটা যে তাহারি সামিল এবং একই জাতীয়, সে কথাটা বোধ হয় এ সময় তেমন করিয়া ভাবা হয় নাই। কারণ

যাগযজ্ঞগুলিকে ধর্মসাধনার সহায় বলিয়া ধরা হইয়াছে এবং অগ্নি প্রভৃতি দেবতাদিগকে এক ঈশ্বরেরই নানা প্রকাশ বা নানা রূপ বলিয়া ভাবনা করার চেষ্টা হইয়াছে। এটা একটা বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয়। যে দেবেন্দ্রনাথ প্রতিমাপূজাকে কোনোমতেই স্বীকার করিতে পারেন নাই—এমন-কি ধর্মসাধনার বিবর্তনে তাহার যে কোনো স্থান আছে ইহাও যিনি আদৌ মানেন নাই, তিনি যখন বৈদিক যাগযজ্ঞের উদ্দিষ্ট দেবতাদের এক ঈশ্বরেরই বিচিত্র প্রকাশ বলিয়া বর্ণনা করেন এবং যাগযজ্ঞকেও সেই কারণে গ্রাহ্য করেন, তখন সেটা একটু আশ্চর্যের বিষয় বলিয়া ঠেকে না কি ? বাস্তবিক বৈদিক দেবতারা যে দেবেন্দ্রনাথের কাছে তন্ত্রপুরাণের দেবদেবীর প্রতিমার চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণের জিনিস হইবেন, তাহার কারণ তাঁহার স্বাভাবিক অসাধারণ সৌন্দর্যমুগ্ধতা। প্রকৃতির সৌন্দর্যের এক-একটি রসমূর্তি তাঁহার কাছে মানুষের হাতগড়া বিগ্রহমূর্তির চেয়ে অনেক মনোহারী ছিল। বেদের বিস্তারিত আলোচনা না করা পর্যন্ত বেদ সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইল, সেই-সকল ধারণা তাঁহার দূর হয় নাই। বাংলায় বেদের চর্চা লোপ পাইয়াছিল বলিয়া তিনি ১৮৪৫ খৃস্টাব্দে একজন ছাত্রকে এবং ১৮৪৬ খৃস্টাব্দে আর তিন জন ছাত্রকে বেদ শিখিবার জন্য কাশী পাঠাইলেন। সেই চারি জন ছাত্রের নাম, আনন্দচন্দ্র, তারকনাথ, বাণেশ্বর ও রমানাথ। এবং ১৮৪৭ খৃস্টাব্দে পিতৃশ্রাদ্ধের পর তিনি নিজেই কাশী যাত্রা করিলেন। সে-সকল কথা পরে হইবে।

পিতৃশ্রাদ্ধ ও পিতৃশ্রাদ্ধের সমস্ত হাঙ্গামা চুকিল বটে কিন্তু এ ব্যাপারে যেটুকু ঝড়ঝাপট দেখা দিল তাহাতে নৌকার নোঙরের গোটাকতক শিকল টুটিল মাত্র। জনকতক আত্মীয়ের সঙ্গে বিচ্ছেদ হইয়া গেল। ইহার চেয়েও যে বড়ো ঝড় এবং বড়ো তুফান সামনে—তাহা তখন তাঁহার কল্পনাতেও আসে নাই। ধর্মের জন্য যে তাঁহাকে সর্বস্ব খোয়াইয়া প্রায় পথে দাঁড়াইতে হইবে, ক্রোরপতির ছেলের বাড়ির জিনিসপত্র আসবাব পর্যন্ত নিলামে উঠিবে, এ কথা কি তিনি তখন কিছুই জানিতেন !

দ্বারকানাথ ঠাকুর নিজের চেষ্টায় যে কি পরিমাণ ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহা প্রথম পরিচ্ছেদেই বলা হইয়াছে। ১৮৪২ খৃস্টাব্দে, তিনি যখন প্রথমবার ইউরোপে যান, তখন তাঁহার হাতে হুগলী, পাবনা, রাজশাহী, কটক, মেদিনীপুর, রংপুর, ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলার বড়ো বড়ো জমিদারি এবং নীলকুঠি ; সোরা, চিনি, চা প্রভৃতি বাণিজ্যের বিস্তৃত ব্যাপার। রানীগঞ্জের কয়লার

খনিগুলিও তখন তাঁহার দখলে। কিন্তু দ্বারকানাথ ঠাকুর বেশ বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহার ছেলেরা এ-সকল বিষয়-বাণিজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না। এমন-কি তাঁহার আশঙ্কা ছিল যে, স্বোপার্জিত বিষয়গুলি তো যাইবেই, হয়তো পৈত্রিক বিষয় বিরাহিমপুর ও কটকের জমিদারিও থাকিবে না। সেই কারণে ইউরোপে যাইবার পূর্বে তিনি ১৮৪০ খৃস্টাব্দে পৈত্রিক বিষয় বিরাহিমপুর ও কটকের জমিদারি ও তাঁহার স্বোপার্জিত বিষয় সাহাজাদপুর ও কালীগ্রাম একত্র করিয়া ট্রস্টডীড্ করিয়া তিন জন ট্রস্টীর হাতে ঐ বিষয়গুলি ছাড়িয়া দেন। ট্রস্টীরা তাঁহার ছেলেদের হইয়া বিষয় রক্ষা করিবেন ও বিষয় হইতে যাহা আয় হইবে তাহা ছেলেদের হাতে দিবেন। তার পর ১৮৪৩ খৃস্টাব্দে ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া দ্বারকানাথ ঠাকুর এক উইল করেন। সেই উইলে সমস্ত বিষয় তিন ভাইকে সমানভাগে ভাগ করিয়া দেন। ভদ্রাসন বাড়ি দেন দেবেন্দ্রনাথকে, বৈঠকখানা বাড়ি গিরীন্দ্রনাথকে এবং ভদ্রাসন বাড়ির পশ্চিম প্রাঙ্গণের সমস্ত জমি ও বাড়ি তৈরির জন্য ২০০০০ টাকা নগেন্দ্রনাথকে দেন। কার-ঠাকুর কোম্পানির অর্ধেক অংশ ছিল দ্বারকানাথের, আর অর্ধেক অংশ ছিল অন্যান্য ইংরাজ সাহেবদের। দ্বারকানাথ তাঁহার অর্ধাংশ বড়ো ছেলে দেবেন্দ্রনাথকেই দিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ সেই অর্ধাংশ নিজে না লইয়া তিন ভাইয়ে সমান ভাগে ভাগ করিয়া লইলেন। গিরীন্দ্রনাথ কার-ঠাকুর কোম্পানির হাউসের অংশ পাইয়া বলিলেন যে, হাউসের মূলধন যখন আমাদের, তখন সাহেবদিগকে অংশ না দিয়া সমস্ত বিষয়টা নিজেদের হাতে লওয়াই ভালো। দেবেন্দ্রনাথ প্রথমে এ প্রস্তাবে রাজি হইলেন না। তিনি বলিলেন যে, সাহেবেরা অংশী থাকায় যেমন উৎসাহে কাজ করিতেছে, অংশী না থাকিলে তাহাদের তেমন উৎসাহ, তেমন উদ্যম থাকিবে না। তাঁহাদের পক্ষে একলা এত বড়ো কাজ চালানো শক্ত। তাহা ছাড়া, অংশ না দিলে সাহেবদিগকে মোটা মোটা মাহিনা দিতে হইবে। গিরীন্দ্রনাথ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে সাহেবদের সম্পত্তি নাই, হাউস ফেল হইলে তাঁহাদেরই বিষয় আটক পড়িবে। সাহেবেরা লাভের ভাগী, কিন্তু ক্ষতির ভাগী হইবে না। এখনি জমিদারির টাকা হাউসে ঢালা হয়, অথচ সাহেবেরা এক পয়সাও দেয় না। গিরীন্দ্রনাথের বিষয়বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকেই সমস্ত হাউসের কর্তৃত্ব দিলেন—সাহেবদের কোনো অংশ রহিল না। তাঁহারা সম্পূর্ণ হাউসের অধিকারী হইয়া সাহেবদিগকে মাহিনা দিয়া কর্মচারী নিযুক্ত রাখিলেন। দেবেন্দ্রনাথের ইহাতে সুবিধাই হইল। গিরীন্দ্রনাথ বিষয়কর্মের ভার

গ্রহণ করায় তিনি ব্রাহ্মসমাজের কাজের দিকে বেশি মনোযোগ করিতে পারিলেন।

দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংলণ্ডে যে রাজার ঠাটে থাকিতেন, তাহা বলিয়াছি। রাজারাজড়া, ডিউক্ ডাচেসের সঙ্গেই সেখানে তাঁহার দহরম-মহরম ছিল; সুতরাং সেখানকার বিলাসযজ্ঞে তিনি তাঁহার শেষ কড়িটি পর্যন্ত আহুতি দিয়াছিলেন। তাঁহার যখন মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার প্রায় এক ক্রোর টাকা দেনা। দেনার দায়ে কার-ঠাকুর কোম্পানি দেউলিয়া হইল। হুণ্ডি আসিতেছে, শোধ করিবার টাকা জোটে না। একদিন ত্রিশ হাজার টাকার হুণ্ডি আসিল—টাকা দিতে পারা গেল না। হাউসের সম্ভ্রম গেল, আফিসের দরজা বন্ধ হইল। ইংরাজী ১৮৪৭ সালে (১৭৬৯ শক) ব্যবসা-বাণিজ্য সমস্ত নষ্ট হইল। শুধু যে ব্যবসা-বাণিজ্যের পতন হইল তাহা নয়। আশঙ্কা হইল যে, পিতার ঋণের জন্য হয়তো সমস্ত সম্পত্তিই যাইতে পারে। হাউস ফেল হওয়ার তিন দিন পরে, প্রধান কর্মচারী ডি. এম. গর্ডন সাহেব দেনাপাওনার একটা হিসাব তৈরি করিয়া, পাওনাদারদিগকে ডাকিয়া এক সভা করিলেন। হিসাবে দেখা গেল যে, হাউসের দেনা এক কোটি টাকা, পাওনা সোত্তর লক্ষ টাকা। ত্রিশ লক্ষ টাকার অকুলান।[১]

দ্বারকানাথের অসাধারণ বিষয়বুদ্ধি ছিল; পাছে হাউস ফেল হইলে বিষয়-সম্পত্তি দেনার দায়ে নষ্ট হয়, এই ভয়ে তিনি কতকগুলি সম্পত্তি ট্রস্ট সম্পত্তি করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা বলা হইয়াছে। সেই ট্রস্ট সম্পত্তির উপর পাওনাদারদের হাত দিবার কোনো অধিকার নাই। সুতরাং পাওনাদারদের সভায় ডি. এম. গর্ডন সাহেব জানাইলেন যে, হাউসেব পাওনা, জমিদারির স্বত্ব প্রভৃতি সমস্ত দিয়া হাউসের অধিকারীরা ঋণ শোধ করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু ট্রস্ট সম্পত্তির উপরে ইঁহাদের কোনো অধিকার নাই বলিয়া সে সম্পত্তি পাওনাদারেরা দখল করিতে পাইবেন না।

দেবেন্দ্রনাথ জানিতেন যে, ঋণের জন্য তাঁহার ট্রস্ট সম্পত্তির কোনো ক্ষতি হইবে না। কিন্তু তিনি নিজে সে সম্পত্তি ভোগ করিতে থাকিবেন আর পাওনাদারেরা তাহাদের ন্যায্য পাওনা হইতে বঞ্চিত হইবে, ইহা তাঁহার ধর্মবুদ্ধিতে অত্যন্ত বাধিল। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর প্রভৃতি তাঁহার আত্মীয়েরা এ-স্থলে সকলেই যেমন সাংসারিক পরামর্শ দিয়া থাকে সেইমতো পরামর্শই

১ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অতিবৃদ্ধ বয়সের স্মৃতিনির্ভর উক্তিতে স্মৃতিবিভ্রমবশত তথ্যের কিছু গরমিল আছে। দ্রষ্টব্য আত্মজীবনী (চতুর্থ সং), পরিশিষ্ট ১৪, পৃ ২৭৮-৯০, ৪৬৪-৭০

হইলেন। তাঁহারা তাঁহাকে বারম্বার বলিলেন, তুমি বিষয় বেনামী করিয়া insolvence লও। রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন যে, কতবার তিনি প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নিকট হইতে আসিয়া তাঁহাদিগকে বলিতেন যে, "খুড়া মহাশয় আমাকে বিষয় বেনামী করিয়া insolvence লইতে বলিতেছেন কিন্তু আমি তাহা কখন লইব না।" বিষয় থাকিতে তিনি কী করিয়া লিখিবেন, যে তাঁহার কোনো বিষয় নাই? Insolvence যদি না লন, তবে ট্রস্ট সম্পত্তি রাখিলেও তাঁহার কোনো অভাব থাকে না, যদিও আর আর অনেক সম্পত্তি তাঁহার হাত হইতে চলিয়া যায় বটে। ট্রস্ট সম্পত্তিও ছাড়িয়া দিলে তাঁহার পরিবার পরিজনকে একেবারেই পথে দাঁড় করানো হয়। কিন্তু তিনি যে-মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন—সত্যং—নিখিল সত্যের মধ্যে জীবনকে সত্য করিবার মন্ত্র—অসত্যের সঙ্গে লেশমাত্রও আপস তিনি কেমন করিয়া করিবেন? বারো বছর আগে ঈশ্বরের জন্য যখন তিনি ব্যাকুল, তখন উপনিষদের যে ছিন্ন পত্র দৈববাণীর মতো তাঁহার কাছে আসিয়াছিল, তাহাতে তিনি শুনিয়াছিলেন, মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্—কাহারও ধনে লোভ করিয়ো না—তিনি এখন কেমন করিয়া পরের প্রাপ্য ধন নিজে ভোগ করিবেন? সত্যের মধ্যে সত্য হইতে গেলে, সাংসারিক বুদ্ধি, স্বার্থবুদ্ধিকে রেয়াৎ করা চলে না। কারণ সে বুদ্ধি বলে যে, অতদূর পর্যন্ত সত্য হইতে গেলে মানুষের পক্ষে সংসারে বাস করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। তিনি তাই সংকল্প করিলেন যে, তাঁহাকে পথে দাঁড়াইতে হয় তাও স্বীকার, তবু সত্যের পথ হইতে ধর্মের পথ হইতে চুল পরিমাণ সরিতে পারিবেন না।

পাওনাদারদের সভায় গর্ডন সাহেব যখন তাঁহাদিগকে বলিলেন যে, তাঁহারা ট্রস্ট সম্পত্তির উপরে হাত দিতে পারিবেন না, তখন দেবেন্দ্রনাথ গিরীন্দ্রনাথকে বলিলেন, "গর্ডন সাহেব পাওনাদারদিগকে ভয় দেখাইতেছেন যে, আমাদের ট্রস্ট-সম্পত্তিতে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। এ সময় আমাদের নিজে অগ্রসর হইয়া বলা উচিত, "যদিও আমাদের দেনার দায়ে ট্রস্ট-সম্পত্তি কেহ হস্তান্তর করিতে পারেন না, তথাপি আমরা এই ট্রস্ট ভাঙিয়া দিয়া ঋণপরিশোধের জন্য ইহাও ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছি।" যাহাতে আমরা পিতৃঋণ হইতে একেবারে মুক্ত হইতে পারি, সেই পথই অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ। যদি অন্যান্য সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ না হয়, তবে ট্রস্ট-সম্পত্তিও বিক্রয় করিতে হইবে।"

পাওনাদারেরা প্রথমটা ট্রস্ট সম্পত্তির কথা শুনিয়া তাঁহাদের প্রাপ্য সম্বন্ধে

নিরাশ হইয়াছিলেন। তাঁহারা যখন দেবেন্দ্রনাথের নিজমুখে শুনিলেন যে, ট্রস্ট সম্পত্তিও তাঁহাদের হাতে তিনি ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছেন, তখন তাঁহারা অবাক্! কেহ কেহ তাঁহার প্রতি সহানুভূতিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহারা বেশ বুঝিলেন যে, ইচ্ছা করিয়া এই ধনী পরিবারের ছেলেরা কী দারুণ বিপদের মধ্যে গিয়া পড়িলেন! আজ রাজপুত্র, কাল হয়তো পথের কাঙাল হইবেন! অথচ ইঁহারা নির্দোষ। হাউসের উত্থান-পতনে ইঁহাদের কোনো হাত ছিল না। ট্রস্ট সম্পত্তি না দিলে পাওনাদারেরা কী করিতে পারিতেন?

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন যে, দেবেন্দ্রনাথের নিজমুখে তিনি শুনিয়াছেন—যেদিন তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির তালিকা করিয়া পাওনাদারদের হাতে দিতে যান, সেদিন তাঁহাব বাড়িতে মহা বিপ্লব উপস্থিত হইল। তাঁহার ছোটোকাকা রমানাথ ঠাকুর মহাশয় রাগ করিয়া গাড়ি হাঁকাইয়া তাঁহাদের বাড়ি হইতে চলিয়া গেলেন। তিনি বলিয়া গেলেন, "তোমরা পথে দাঁড়াও, আমার কাছে আর যেয়ো না।" দেবেন্দ্রনাথ যখন যাইবার জন্য বাহির-বাড়িতে আসিতেছেন, তখন অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকদের কান্না উঠিল—যেন কাহারও মৃত্যু হইয়াছে। ঘরে বাইরে এই প্রতিবাদের মধ্যে তিনি স্থির থাকিয়া নিজের কর্তব্য করিয়া গেলেন। রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি তখন দেবেন্দ্রনাথের প্রধান বন্ধু বলিয়া তিনি লিখিয়াছেন যে, কালী ভট্টাচার্য নামে দ্বারকানাথ ঠাকুরের এক মোসাহেব রাজনারায়ণবাবুকে ঠাট্টা করিয়া তাঁহার কাছে একটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিল; সে শ্লোকের অর্থ এই—"পূর্বে গরুড়ের ন্যায় পক্ষী পরামর্শদাতা ছিল, এখন বায়স সকল বাবুর পরামর্শদাতা হইয়াছে।"

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছে গল্প শুনিয়াছি যে, বিষয়-সম্পত্তির তালিকা তৈরি করার সময় তিনি আপনার হাতের একটি বহুমূল্য আংটি তালিকাভুক্ত করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। বড়ো লোকের ছেলে, জিনিসপত্র আভরণের তো কোনো অভাব নাই—আংটিটা যে আঙুলে ছিল তাহা তাঁহার মনেই ছিল না। তালিকা পড়ার সময় তিনি উঠিয়া বলিলেন, "এই আংটিটা আমার হাতে আছে; আমার বিষয়-সম্পত্তির তালিকার মধ্যে ইহাকেও ধরা উচিত।" এই কথা শুনিয়া কলিকাতা শহরের সকল লোকেরই মনে একটা বিস্ময়ের বৈদ্যুত কম্প সঞ্চারিত হইয়াছিল!

এই সত্যনিষ্ঠা ও সাধুতার পুরস্কার হইল এই যে পাওনাদারেরা আপনা হইতেই প্রস্তাব করিলেন যে, ইঁহারা যখন সমস্ত ছাড়িয়া দিলেন তখন ইঁহাদের

খোরপোষের জন্য বছরে পঁচিশ হাজার টাকা করিয়া তাঁহারা দিবেন। সম্পত্তি-গুলি তাঁহারা হাতে লইলেন এবং তাহা চালাইবার জন্য এক কমিটি গঠিত করিলেন।

বাড়ি ফিরিয়া যাইবার সময় দেবেন্দ্রনাথ গিরীন্দ্রনাথকে বলিলেন, "আমরা ত বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়া সমস্ত দিলাম।" তিনি বলিলেন "হাঁ, লোকে জানুক আমরা আমাদের জন্য কিছুই রাখি নাই, তাহারা বলুক যে. ইঁহারা সকল ধন দিলেন।" দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, "লোকে বলিলে কি হইবে? আদালত তো শুনিবে না। আদালতে যে কেহ একজন নালিশ করিলেই আমাদের শপথ করিয়া বলিতে হইবে যে, আমরা সকলি দিলাম, আমাদের আর কিছুই নাই; নতুবা আদালত আমাদিগকে ছাড়িবে না। কিন্তু, যাবৎ অঙ্গে একটি চীর পর্যন্ত থাকিবে, তাবৎ রাজদ্বারে দাঁড়াইয়া শপথ করিয়া বলিতে পারিব না যে, সব দিলাম। এমনি সকলি দিব, কিন্তু শপথ করিতে পারিব না। ঈশ্বর ও ধর্ম আমাদিগকে রক্ষা করুন, যেন ইন্‌সল্‌বেণ্ট আইনে আমাকে মস্তক দিতে না হয়।"

হাউস পতনের তিন-চারি মাস পরে গিরীন্দ্রনাথ একদিন তাঁহাকে বলিলেন যে, পাওনাদারদের হাতে বিষয়-সম্পত্তির ভার যাওয়ার পর হইতে ঋণ তো কিছুই শোধ হইতেছে না। এমন করিয়া চলিলে বাড়ি বেচিয়াও ঋণদায় হইতে মুক্ত হওয়া যাইবে না। পাওনাদরেরা যদি দেবেন্দ্রনাথের হাতে বিষয়ের সমস্ত ভার দেন, তবে ঋণ শোধের উপায় হইতে পারে। পাওনাদারেরা কেবল মাস-হারা ছাড়া দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁহার পরিবারবর্গের ব্যবহারের জন্য কতকগুলি বাড়ি ও জিনিসপত্র তাঁহাদের হাতেই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এখন সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার হাতে ফিরাইয়া দিবার ও ঋণ শোধের ভার তাঁহারি উপরে রাখিবার প্রস্তাবে তাঁহারা কিছুমাত্র আপত্তি না করিয়া বিশ্বস্ত চিত্তে রাজি হইলেন। তাঁহাকে সাধু ও সদাশয় ব্যক্তি জানিয়াই তাঁহার উপরে পাওনাদারদের এই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। বাড়িতে আপিস উঠিয়া আসিল। গিরীন্দ্রনাথ বেলা ১০টার সময় কাছারি করিতে বসিতেন, ৫টা পর্যন্ত কাছারি করিতেন।

দেবেন্দ্রনাথ এই সময়ে এতদূর পর্যন্ত ব্যয় সংকোচ করিলেন যে তাঁহার সেই দরিদ্র ভাব দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইয়া গিয়াছিল। রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন, "প্রতিদিন চর্বচোষ্য লেহ্যপেয় পৃথিবীর যাবতীয় উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য-পুরিত টেবিলের পরিবর্তে ফরাসের উপরে বসিয়া কেবল ডাল রুটি ভক্ষণ ধরিলেন। দেবেন্দ্রবাবু টেবিলে খাবারের সময় একটু একটু সুরা পান

করিতেন। এই সময় হইতে তাহা চিরকালের মতন পরিত্যাগ করেন। কেবল পীড়ার সময় ডাক্তারের আদেশ ব্যতীত আর কখন ব্যবহার করেন নাই। (১৮৯০)।" তিনি নিজে লিখিয়াছেন "চাকরের ভিড় কমাইয়া দিলাম, গাড়ি-ঘোড়া সব নিলামে দিলাম, খাওয়া পরা খুব পরিমিত করিলাম; ঘরে থাকিয়া সন্ন্যাসী হইলাম। কল্য কি খাইব, কি পরিব, তাহার আর ভাবনা নাই। কাল এ বাড়ীতে থাকিব, কি, এ বাড়ী ছাড়িতে হইবে, তাহার ভাবনা নাই।" গল্প শুনিয়াছি, এ সময়ে তিনি বাড়ির মেয়েদের হাতের সেলাই করা পোশাক পরিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিতেন। বন্ধু-বান্ধব দেখা করিতে আসিলে গালিচা দুলিচার জায়গায় কম্বল কিম্বা মাদুরে তাহাদের অভ্যর্থনা করিতেন।

ঋণ হইতে মুক্ত হইবার জন্য তিনি অনেকগুলি বাড়ি, আসবাব-পত্র, ও সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় করিয়া দিলেন। বেলগাছিয়া বাগানেব এবং নিজের বাড়িব আসবাব-পত্রের তালিকা যখন বাহির হইয়াছিল, তখন ইংরাজ বাঙালী সকলেরি চমক লাগিয়াছিল যে, একজন মানুষের ব্যবহারের জিনিসপত্র এত থাকিতে পারে! দেবেন্দ্রনাথের সমসাময়িক কোনো প্রাচীন লোকের মুখে শুনিয়াছি যে, জোড়াসাঁকোব বাড়ি হইতে দ্বাবকানাথ ঠাকুরের গলির প্রান্ত পর্যন্ত বাড়ির সব জিনিস-পত্র সাজাইয়া পনেবো দিন ধরিয়া নিলামে সেগুলি বিক্রয় করা হইয়াছিল। দামী দামী জিনিস জলের দরে বিকাইয়াছিল। তাহা ছাড়া যে-সকল সম্পত্তি বিক্রয় করা হয়, তাহার মধ্যে যদি দু-একটা বিষয়ও তিনি রাখিতেন, তবে ভবিষ্যতে তাঁহার প্রচুর লাভ হইতে পারিত। যেমন রানীগঞ্জের কয়লার খনি, বা নীলকুঠি, রেশমের কুঠি ও চিনির কারখানা-গুলি। অনেকে তাঁহাকে পরামর্শ দিয়াছিল যে, অন্তত পক্ষে রানীগঞ্জের কয়লার খনিগুলি তিনি যেন হাতছাড়া না করেন। তিনি তখন সে-সকল কথায় ভ্রূক্ষেপ করিবার মতো অবস্থায় ছিলেন না। তখন তাঁহার সম্পূর্ণ বিষয়-বৈরাগ্যের অবস্থা —বিষয় যাক্, বিষয় যাক্— এই একমাত্র মনের কামনা। কলিকাতার উপরে বড়ো বড়ো বাড়ি বিক্রয় হইয়া গেল। তাহাদের মধ্যে লর্ড বিশপের বর্তমান প্রাসাদ তাঁহার একটা বাড়ি ছিল। বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িটা দ্বারকানাথ ঠাকুর নানা দামী আসবাব, ছবি ও প্রতিমূর্তি প্রভৃতির দ্বারা সাজাইয়াছিলেন। ইউরোপ হইতে প্রথমবার আসিবার পর, অনেক উৎকৃষ্ট ছবি তিনি সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সে সমস্ত গেল। রোমের পোপ তাঁহাকে র‍্যাফেলের ম্যাডোনার এক ছবি উপহার দিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ শেষ বয়সে কখনো কখনো নাকি

সেই ছবির উল্লেখ করিয়া বলিতেন, "আমার আর কিছুরই জন্য দুঃখ হয় না, কিন্তু সেই ছবিটি যদি থাকিত! সেটি আমার বড়ই প্রিয় ছিল।"

এ একেবারে বিশ্বজিৎ যজ্ঞই বটে। দ্বারকানাথ ঠাকুরের যখন মৃত্যু হয়, তখন চল্লিশ লক্ষ টাকার বিষয় ছিল। সে সমস্ত জমিদারি গিয়া তিন লক্ষ টাকার বিষয় বাকি রহিল মাত্র। ক্রোর টাকা ঋণের মধ্যে, অর্ধেকের উপর এই-সকল বিষয়-সম্পত্তি, বাড়ি, কয়লার খনি প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া শোধ হইল। বাকি ঋণ শোধ করিতে তাঁহার দীর্ঘকাল লাগিয়াছিল। শোনা যায়, চল্লিশ বছরে বাকি ঋণ তিনি শোধ করিয়াছিলেন। ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেব্‌ল্ সোসাইটিতে ব্লাইণ্ড ফণ্ডে, অন্ধদের সাহায্যের জন্য দ্বারকানাথ ঠাকুর এক লক্ষ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। সেই প্রতিশ্রুত দানকে পিতার ঋণ বলিয়া মনে করিয়া অনেক বছর পরে ১৮৭০ সালে দেবেন্দ্রনাথ তাহাও সুদে আসলে শোধ করিয়াছিলেন! অথচ শোনা যায় যে, জীবনে সবসুদ্ধ তিনি ২২ লাখ টাকা দান করিয়াছিলেন।

যদিও দেবেন্দ্রনাথকে পথের ভিখারি হইয়া দাঁড়াইতে হয় নাই, তবু হঠাৎ এমন-একটা অবস্থার বিপর্যয় কয়জন মানুষ ধৈর্যের সঙ্গে স্বীকার করিয়া লইতে পারে? ধনমানের বাঁধনগুলি কি কম কঠিন বাঁধন? যে-সকল অভ্যাসে ধনী সন্তান অভ্যস্ত, তাহার কোথাও একটু সামান্য নড়চড় হইলে তাহার পক্ষে সে কী বিষম ক্লেশের বিষয় হয়! সেইজন্যই খৃস্ট বলিয়াছেন যে, ছুঁচের ভিতর দিয়া বরং উটকে গলানো সহজ, কিন্তু ধনীর পক্ষে স্বর্গরাজ্যের ভিতরে প্রবেশলাভ সহজ ব্যাপার নয়। কারণ ধনীর "বসন ভূষণ হয় যে বিষম ভার!" সেইগুলিই সেই হতভাগ্যকে সোনার শিকল পরাইয়া ঐশ্বর্যের গারদের মধ্যে চিরবন্দী করিয়া রাখে। সে যে বন্দী, এই খবরটাই তাহার কাছে পৌঁছায় না। সেইজন্য খাঁচার পাখির মতো সে আপনার খাঁচার প্রত্যেক শলাকাটাকে একান্ত আশ্রয় জানিয়া আঁকড়িয়া ধরে— অনন্ত আকাশে মুক্তিলাভকে সে পরম ভয়ের ব্যাপার বলিয়াই জানে।

ঐশ্বর্যকে যদি দেবেন্দ্রনাথ একেবারে ত্যাগ করিয়া ফকির হইয়া বাহির হইতেন, তবে হয়তো এ দেশের লোকের কাছে সাধু হিসাবে তাঁহার সম্মান অনেক বাড়িয়া যাইত। কিন্তু সে ত্যাগ যথার্থ ত্যাগ হইত না, এই কথাই আমাদিগকে ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিতে হইবে। নিষ্কাম কর্মই যথার্থ ত্যাগের আদর্শ। গীতায় বলে, ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি— সন্ন্যাসেই সিদ্ধি মিলে না। অর্থকে অনর্থ মনে করিয়া ত্যাগ করাই ত্যাগ নয়; অর্থকে পরমার্থের

অধীন করিয়া তাহার সম্বন্ধে কামনাশূন্য হওয়াই ত্যাগ। বিষয়ের মধ্যে থাকিয়া এই যে বিষয়-বন্ধন হইতে মুক্তির ছবি দেবেন্দ্রনাথ দেখাইলেন, এমন এ যুগে কয়জন ভাগ্যবানের জীবনে দেখা গিয়াছে? কে লাখো লাখো টাকার বিষয়-সম্পত্তি পাওনাদারদের হাতে ফেলিয়া দিয়া, তার পরে কিছুই ফেরত আসিবে কি না সে সম্বন্ধে ভাবনা মাত্র না করিয়া এই কথা বলিতে পারে; "আমি যা চাই, তাই হইল— বিষয়-সম্পত্তি সকলি হাত হইতে চলিয়া গেল। যেমন আমার মনে বিষয়ের অভিলাষ নাই, তেমনি বিষয়ও নাই; বেশ মিলে গেল—

দর্ আঁ হবা, কে জুজ্ বরক্ অন্দর্ তলব্ না ব্াশদ্,
গর্ খির্ মনে বেসোজ়দ্, চন্দে অজব্ ন ব্াশদ্।

—দীবান্ হাফিজ্ ১৮১।১

'সেই অভিলাষে, বিদ্যুতের প্রার্থনা ছাড়া আর কোন প্রার্থনা না থাকুক,— যদি বিদ্যুৎ পড়িয়া ধনধান্য জ্বলিয়া যায়, তবে সে বড় আশ্চর্য নহে।' 'বিদ্যুৎ পড়ুক, বিদ্যুৎ পড়ুক' বলিতে বলিতে যদি বিদ্যুৎ পড়িয়া সব জ্বলিয়া যায়, তবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি? আমি বলি যে, 'হে ঈশ্বর, আমি তোমা ছাড়া আর কিছু চাই না।' তিনি প্রসন্ন হইয়া এ প্রার্থনা গ্রহণ করিলেন; গ্রহণ করিয়া আমার নিকটে প্রকাশ হইলেন, এবং আর সব কাড়িয়া লইলেন। 'দমড়ীকী ঠুড়িয়াঁ মুয়েস্সর নহীঁ, কে চিবাকে পানী পিয়ুঁ।'* যাহা প্রার্থনাতে ছিল, তাহা পূর্ণ হইয়া এখন কার্যে পরিণত হইল।

"সে শ্মশানের সেই এক দিন, আর অদ্যকার এই আর-এক দিন! আমি আর-এক সোপানে উঠিলাম।··· একেবারে নিষ্কাম হইলাম। নিষ্কাম পুরুষের যে সুখ ও শান্তি, তাহা উপনিষদে পড়িয়াছিলাম; এখন তাহা জীবনে ভোগ করিলাম। চন্দ্র যেমন রাহু হইতে মুক্ত হয়, আমার আত্মা তেমনি বিষয় হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোককে অনুভব করিল। 'হে ঈশ্বর, অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যে তোমাকে না পাইয়া প্রাণ আমার ওষ্ঠাগত হইয়াছিল; এখন তোমাকে পাইয়া আমি সব পাইয়াছি।'"

এমনি করিয়া ঈশ্বরের "ঝোড়ো প্রেম", খৃস্টান সাধক যেমন বলিয়াছিলেন, দেবেন্দ্রনাথের জীবনের উপর দিয়া বহিয়া গেল। এই ঝড়ে তাঁহার সেই রিক্ততার অবস্থা লাভ হইল— এ দেশের সাধকেরা যাহাকে বিষয়-বৈরাগ্যের অবস্থা বলেন, খৃস্টান সাধকেরা **Purgative stage** বলেন। চৈতন্যের উপরে বিষয়ের যে পর্দা

* আমার হাতে এক দমড়ী চাল-ভাজাও নাই যে কিছু চিবাইয়া একটু জলপান করি।

পড়িয়া যায়, এ অবস্থা সেই পর্দা খুলিয়া ফেলিয়া নগ্নচৈতন্যকে একেবারে সমস্ত বিশ্বের সামনে মেলিয়া ধরা—সেই পরম চৈতন্যের মধ্যে নিঃশেষে ঢালিয়া দেওয়া। এ সেই রিক্ততা—যে রিক্ততা সম্বন্ধে একজন খৃস্টান সাধু বলিয়াছেন, "ভগবান তো সংকীর্ণ হৃদয়ে বাস করেন না, এ রিক্ততা যে তাঁরি প্রেমের মতোই বিশাল। এ রিক্ততার বক্ষ এমন প্রসারিত যে স্বয়ং তাঁকে পর্যন্ত ইহাতে ধরানো যাইতে পারে।" এ সেই রিক্ততার পরিপূর্ণতা, যে পরিপূর্ণতার আনন্দে ভক্ত সেণ্ট ফ্রান্‌সিস্‌ আকাশ-বাতাসকে আলো-জল-পৃথিবীকে প্রিয় সম্বোধন করিয়া প্রণাম করিয়াছিলেন। এ সাধনায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে কোনো ভেদ নাই। রিক্ত না হইলে যে পরিপূর্ণ হওয়া যায় না—এ কথা সব দেশেই বলিয়াছে। যেনাহং নামৃতা স্যাম্‌ কিমহং তেন কুর্যাম্‌। যাহা দিয়া অমর না হইব, তাহা দিয়া আমি কি করিব—সকল দেশের সাধকের অন্তর হইতেই এই বাণী উঠিয়াছে। তিনিই রিক্ত করেন—তাঁহার দিকে মানুষের আত্মা যতই যাইতে থাকে, বিষয়ের বাঁধনগুলি ততই একে একে খসিতে থাকে। দেবেন্দ্রনাথ ঠিকই লিখিয়াছেন যে, তিনি আর-এক সোপানে উঠিলেন। তিনি আভাসে যে সত্যকে পাইয়া আনন্দে অধীর হইয়াছিলেন, তাহাকে যখন তাহার পূর্ণ প্রকাশে দেখিলেন—দেখিলেন তাহা কঠিন, তাহা রুদ্র, তাহা ভয়ংকর। তাহা ঝড়ের বেশে সমস্ত ভাঙিয়া চুরিয়া উড়াইয়া লইয়া যায়, ব্যথার বিদ্যুতে বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া তবে তাহার শান্তিবারি বর্ষণ হয়, সমস্ত জলভারকে রিক্ত করাইয়া তবে তাহার কান্তি দেখা দেয়। সেই রিক্ততার যে পরিপূর্ণতা, সেই বিরাট 'না'র মধ্যে যে একটি মাত্র হাঁ, সেই স্তূপাকার মরণের মধ্যে যে একবিন্দু অমৃত—তাহা যে সাধক পান, পৃথিবীতে তাঁহার আর কোনো কামনার বিষয় থাকে না।

নবম পরিচ্ছেদ

বেদের অপৌরুষেয়বাদ খণ্ডন— ঋগ্‌বেদপ্রকাশ

১৮৪৫ হইতে ১৮৪৮ এই তিনটা বছর দেবেন্দ্রনাথের জীবনের আকাশে যেন মৈসুম বাতাসের তুমুল ঝড়বৃষ্টির পালা চলিয়াছিল। এ সময়ে সমস্ত দেশের চিত্ত-সমুদ্রও তরঙ্গক্ষুব্ধ— সুতরাং বাতাসটা সমস্ত দেশের বুকের মধ্যে ঢেউ তুলিয়া শেষকালটা এমন একটি জায়গায় আসিয়া বর্ষণ করিল, যেখানে চাষের আয়োজন অনেক দিন হইতেই চলিতেছিল। তখন এ দেশে ইংরাজী শিক্ষার যেটুকু ধারা নামিয়াছিল, তাহা মাটির উপর দিয়া গড়াইয়া শিক্ষিতসম্প্রদায় নামক এমন একটি সংকীর্ণ বালুনদীব খাতের মধ্যে আশ্রয় লইত এবং বান জাগাইত যে, তাহার দ্বারা কূলধ্বংস এবং চিরাগত প্রথাব আশ্রয়ের মূলধ্বংস ভিন্ন আর বিশেষ কোনো কাজ হইত না। এবার আর বাদলের ধারার গড়াইয়া যাওয়ার সুযোগ হইল না; এবার বৃষ্টিকে সৃষ্টির কাজে লাগিতে হইল। দুর্যোগের বাতে মাথায় বজ্র-বিদ্যুৎ করিয়া কে ঐ বীজ বুনিতে রত? চোখ হইতে তাহাব অন্ধকারের সমস্ত কালিমা লুপ্ত— সেথায় মেঘের ডাক নাই, বজ্রের হাঁক নাই; শুধু ভাবী সোনার ফসলে দিক্‌দিগন্ত ছাইয়া গিয়াছে। আকাশে তার রঙ ধরিয়াছে, বাতাসে তার গন্ধ ভরিয়াছে। সেই বীজ বুনিবার ইতিহাস এবার শোনা যাক।

বামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ব্রাহ্মসমাজের প্রথম হলধর ছিলেন সন্দেহ নাই। তিনি ব্রাহ্মসমাজের বুকে দুটি রেখা বেশ গভীরভাবে কাটিয়া দিয়াছিলেন: ১. "জীবাত্মা পরমাত্মার অভেদ চিন্তনই মুখ্য উপাসনা' (এটা তাঁরি কথা), ২. বেদ নিত্য এবং অভ্রান্ত। এ দুটি রেখা মুছিয়া ফেলা বড়ো সহজ হয় নাই। দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাঁহার পরবর্তীরা ঐ দুটি রেখার উপরেই দাগাবোলানো অভ্যাস করিতেছিলেন। তাহার বিস্তর প্রমাণ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ঘাঁটিলেই দেখিতে পাওয়া যায়। আষাঢ় ১৭৬৭ শকের (১৮৪৫ খৃস্টাব্দ) তত্ত্ববোধিনীতে একজন প্রশ্ন করিয়া পাঠান— "বেদবাক্য তর্কাভাব কি না?" তত্ত্ববোধিনী উত্তর করিতেছেন— "তর্ক প্রতি নির্ভর করিয়া বেদকে অমান্য করিবেক না। কিন্তু বেদবাক্যের অর্থ তর্কের দ্বারা অনুসন্ধান করিবেক।" তার পর প্রশ্নকর্তা প্রশ্ন করিতেছেন— "তর্কের দ্বারা যে বেদবাক্য যুক্তিসিদ্ধ হইবেক, ঐ বেদবাক্য সত্য অন্য অসত্য কি না?" তত্ত্ববোধিনী উত্তর করিতেছেন— "বেদবাক্য মাত্রই সত্য, তাহার কোন

অংশই অসত্য হইতে পারে না। শ্রুতিই যখন সকল ধর্মের প্রমাণ হইলেন, তখন সে শ্রুতির প্রতি সংশয় করিলে কি প্রকারে ধর্ম রক্ষা হয়?" তার পরে প্রশ্ন হইতেছে—"বেদশাস্ত্রে দুর্বলাধিকারীর প্রতি প্রবঞ্চনা রূপে উক্তি আছে কি না?" ইহার উত্তরে তত্ত্ববোধিনী বলেন যে, বৈদিক কর্মকাণ্ড প্রবঞ্চনা নয়, যাহারা পরব্রহ্মের উপাসনায় অসমর্থ তাহাদের মনঃস্থিরের জন্যই এই কর্মকাণ্ডের বিধান।

পিতৃশ্রাদ্ধের পর "জষ্টিসিয়ার" সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের বাদানুবাদেও বেদ সম্বন্ধে এই-সকল আলোচনাই হইয়াছিল। আশা করি পাঠকদের তাহা মনে আছে।

যাহাই হোক, বৃদ্ধ হলধর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের চিহ্নিত রেখা ধরিয়াই যে দেবেন্দ্রনাথ চলিয়াছিলেন, এমন তো আমার বোধ হয় না। তাহার প্রধান কারণ— রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ শাঙ্কর অদ্বৈতমত সম্পূর্ণই মানিতেন, দেবেন্দ্রনাথ গোড়া হইতেই তাহার বিরুদ্ধে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়ান। তবে শাঙ্কর অদ্বৈতবাদ মানুন আর নাই মানুন, বেদ যে আপ্তশাস্ত্র, এ মত মানা সম্বন্ধে তিনি রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সঙ্গে অদ্বৈত বা অভেদ ছিলেন। বেদ বলিতে তাঁহারা বুঝিতেন, ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান— বিশুদ্ধহৃদয় ঋষিদের মনে ঈশ্বর আপনার সেই স্বরূপজ্ঞান ও নিয়মজ্ঞানকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, ইহাও তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন। ঈশ্বরের স্বরূপ যখন নিত্য, তখন স্বরূপজ্ঞানও নিত্য, কাজেই বেদও নিত্য। এই রকম যুক্তি অনুসরণ করিয়া তাঁহারা বেদকে নিত্য ও আপ্ত বাক্য বলিয়া মানিতেন।

রাজনারায়ণ বসু এখানে একটি আপত্তি তুলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "আমরা তখন ঈশ্বর-প্রত্যাদেশে বিশ্বাস করিতাম বটে, কিন্তু বেদ কেবল যুক্তি-যুক্ত বাক্যপূর্ণ বলিয়া তাহা ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করিতাম।" এটা আমার মনে হয়, রাজনারায়ণবাবুর পক্ষে বলা বাহুল্য হইয়াছে। কারণ ঈশ্বর-প্রত্যাদেশ অযুক্তিযুক্ত, সাদা বাংলায় পাগলামি বা প্রলাপ হইবে ইহার কোনো মানে নাই। প্রশ্নটা প্রত্যাদেশ মানা কি না-মানা। যদি বলেন, তর্কের দ্বারা যেটা যুক্তিমূলক বাক্য বলিয়া মনে করিব সেটাকেই প্রত্যাদিষ্ট বাক্য বলিব, তবে তো শাস্ত্র-নিরপেক্ষ যুক্তিবাদকেই মানা হইল। রাজনারায়ণ বসু তাঁহার ***Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj***এ যাহা লিখিয়াছেন*

* "...the leaders of the Samaj at this time considered the Vedas to be revealed solely on account of the reasonableness and cogency of these

তাহাতে মনে হয় যে তাঁহারা যুক্তিকেই প্রত্যাদিষ্ট বেদবাক্যের কষ্টিপাথর করিয়া ধরিয়াছেন। 'বৈদান্তিক ডক্‌ট্রিন্স ভিন্‌ডিকেটেড'—যে-বইটি দেবেন্দ্রনাথের লেখা বলিয়া আমি মনে করিয়াছি—তাহাতে একজায়গায় স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, ন্যাচারল থিয়লজির উপর ভর করিয়া বৈদান্তিক মতের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হইয়াছে। রাজনারায়ণ বসু তাই লিখিয়াছেন যে, তাঁহারা "প্রকৃত প্রস্তাবে বেদকে ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া কখন বিশ্বাস করিতেন না।" বেকন্ ও লকের যুক্তিবাদকে অষ্টাদশ শতাব্দীর যে ডীস্‌ট্‌রা ধর্মের ব্যাপারে নিয়োগ করিয়াছিলেন, যেমন টিণ্ডাল কি চব্‌স্ কি টোল্যাণ্ড প্রভৃতি, তাঁহারাও ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্রে বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহারা বলিতেন, অতিপ্রাকৃত কোনো কাণ্ড মানুষ-সম্বন্ধীয় ব্যাপারে হইতেই পারে না। ইহারা যে ভাবে খৃস্টানশাস্ত্র মানিতেন, তাহার সঙ্গে রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতির বেদ শাস্ত্র মানার তফাত শুধু এই ছিল যে, রাজনারায়ণ প্রভৃতি বৈদান্তিকগণ যুক্তি আর প্রত্যাদেশ দুই মানিতেন। অর্থাৎ তাঁহারা দিয়াছিলেন দুই নৌকায় পা। কেন দিয়াছিলেন, তাহার হেতু বলি।

দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদ্‌কে পাইয়া যখন দেখিলেন যে, তাহার সিদ্ধান্ত তাঁহার নিজের বুদ্ধির সিদ্ধান্তের সঙ্গে বেশ মিলিয়া গেল, তাঁহার নিজের হৃদয় যাহা বলিতেছে উপনিষদে ঠিক তাহারি "প্রতিধ্বনি", তখন তাঁহার বেদ সম্বন্ধে আর কোনো সংশয় বা প্রশ্নমাত্র রহিল না। তাঁহার মনে হইল এ এক রত্নের খনি-বিশেষ, এ খনি যতই খোঁড়া যাইবে ততই সত্য উপলব্ধির রত্নসকল বাহির হইবে। তিনি দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করিয়া জানিয়াছিলেন যে, উপনিষদ্‌কে বেদান্ত অর্থাৎ বেদের সারভাগ বলিয়া সকল শাস্ত্রকারেরা মানিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মনে এই আশা হইল যে, এই 'বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্ম' প্রচার করিতে পারিলে, ভারতবর্ষের সকল ধর্মকে এক করা যাইবে। ভারতবর্ষ আবার তাহার পুরাতন গৌরব ফিরিয়া পাইবে। ভারতবর্ষে তন্ত্রপুরাণের দ্বারা ধর্মের যে জটিল জঙ্গল তৈরি হইয়াছে, যে-সকল পৌত্তলিক উপধর্ম রচিত হইয়াছে, বেদান্ত-

doctrines Their error lay in believing that whatever that contained was reasonable and cogent. As soon as they perceived their mistake after a wider study of the Vedas, they shook it off at once. Now, why did they do so easily? The reason is, that a higher standard of belief had always predominated in their minds...over that of written revelation, viz., the standard of reason; and, as conscientions men, they could not continue professing that to be a revelation, which was found to contain errors."

—*Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj*, p. 20.

প্রতিপাদ্য ধর্ম প্রচার করিলে সে জঙ্গল কি আব থাকিতে পারে, সে-সকল উপধর্ম কি আর টেঁকে? দেবেন্দ্রনাথের ধর্মপ্রচারের ভিতরে ভিতরে এই একটা প্রবল দেশানুরাগ ছিল। কিসে ভাবতবর্ষের বন্ধন মোচন হয়, তাহার প্রাচীন বিক্রম ও শক্তির আবাব বোধন হয়, এই ছিল তাঁহাব প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষাটির উৎসকে যাঁহাবা ধরিতে পারেন নাই, তাঁহাবা তাঁহার মতো যুক্তিবাদী লোকের পক্ষে বেদের অপৌরুষেয়বাদ আঁকড়িয়া থাকাব কোনো তাৎপর্যই খুঁজিয়া পাইবেন না। তিনি কেন যে যুক্তির নায়ে এক পা আব প্রত্যাদেশবাদের নায়ে আর-এক পা বাখিয়া চলিয়াছিলেন, তাহার কারণ এইখানে। তিনি চাহিয়াছিলেন যে, বেদেব সূত্রে পুনবায় সমস্ত ভাবতবর্ষেব বিচ্ছিন্ন ধর্মগুলি এক হইয়া গাঁথা হোক। তন্ত্রপুবাণের পৌত্তলিক ধর্মগুলি যাক। বেদান্ত পৌত্তলিকতাকে মানে না। ভাবত এক হোক, এক হইয়া শক্তিমান্ হোক, ইহাই ছিল তাঁহার বেদ মানাব ভিতবকার কাবণ।

এ জায়গায় আবার বামমোহন বায়েব সঙ্গে তাঁহাব আশ্চর্য মানসিক সাদৃশ্যেব কথা না ভাবিয়া থাকিতে পাবা যায় না। বামমোহন বায় শাঙ্কর মতাবলম্বী অদ্বৈতবাদী হইয়াও কেমন কবিয়া "লোকশ্রেয়ঃ" সাধনের উপরে অতটা জোর দিলেন, ইহা এক সমস্যা। লর্ড আমহার্স্টের কাছে ইংরাজী শিক্ষার স্বপক্ষে তিনি যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বৈদান্তিক মায়াবাদ মানুষকে "better members of society" লোকসমাজের উপযুক্ত সামাজিক করিয়া তোলে না বলিয়া তিনি বেদান্তকে নিন্দা কবিয়াছেন। এও তো দুই নায়ে পা দিয়া চলা— কিন্তু এই অসাধ্য সাধনের ভিতরকাব উৎসটিও স্বদেশপ্রেম। বেদান্ত সকল শাস্ত্রের সার, বেদান্ত ধর্মকে মানিলেই ভাবতবর্ষের উদ্ধার, ইহাই রামমোহন বায়ের মনে ছিল। অথচ সমাজের উপবে বেদান্তের শিক্ষার ফল যে ভালো হয় নাই, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন বলিয়া বেদান্তের নিষ্ক্রিয় সাধনাকে সক্রিয় করিয়া তোলার চেষ্টায় ছিলেন। নীতিকে অধ্যাত্মতত্ত্বের দোসর করিয়া দিলেন— দোঁহে দোঁহায় অভিন্নপ্রাণ হইল। এই কাজটিকে আরো পাকা করিবার জন্ম খৃস্টান ধর্মকেও কতক পরিমাণে আনার জন্ম তাঁহার মনের ব্যগ্রতা ছিল। ইংরাজী প্রবাদ বচন অনুসারে তিনি চাহিয়াছিলেন, পুরানো মদকে নূতন বোতলেব মধ্যে পুরিতে। বেদান্তের তুরীয় ঝিমানির ভাবটাকে পশ্চিমের দৌড়ীয় ঝাঁঝানিব ভাবের দ্বারা ঝাঁঝাইয়া তার নাড়ীর রক্তটাকে একটু চন্‌চনে করিবার মতলব তাঁহার ছিল। তাহা না হইলে ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক মোক্ষের নিদারুণ বাঁধন

ঘোচে কোথায়? ঐ মোক্ষত্বের সাধনা যে পঞ্চত্বের সাধনা হইয়া দাঁড়ায়; কারণ 'সমাধি' মানেই এক রকমের জীবন্ত কবর।

দেবেন্দ্রনাথ বেদকে যে-সকল কারণে শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন, অক্ষয়কুমার দত্তের মধ্যে সে-সকল কারণের অভাব ছিল। অক্ষয়কুমার নানা বিজ্ঞান ও ইতিহাসের চর্চা করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর ডীস্‌ট্‌ ও এন্‌সাইক্লোপিডিস্‌ট্‌দের মতো শাস্ত্রের অভ্রান্ততা, অলৌকিক ক্রিয়া, প্রভৃতি যাহা-কিছু যুক্তির কষ্টিপাথরে কষা যায় না তাহাকে বাদ দিয়া বসিয়াছিলেন। পেলি প্রভৃতি তত্ত্ববিদ্‌দের মতো জগৎব্যাপারে যে একটা সুশৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থা আছে এবং তাহা হইতে জগতের স্রষ্টার যে এক আশ্চর্য কৌশল (Design) বুঝিতে পারা যায়, অক্ষয়কুমারের সকল লেখায় এই ধরনের তত্ত্বকথাই থাকিত, তাহার বেশি নয়। অর্থাৎ ব্রহ্ম-তত্ত্বের চেয়ে ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব তাঁহার রচনায় ফুটিত বেশি।— তাঁর লেখার ধুয়ো তাঁহার একটি বুলিতে ধরা যায়— "ব্রহ্মাণ্ড কি আশ্চর্য কাণ্ড!"

সুতরাং তিনি তত্ত্ববোধিনী সভাতে ঢুকিয়াই বেদের অপৌরুষেয়বাদ সম্বন্ধে বাদানুবাদে লাগিয়া গেলেন। তিনি বলিলেন, বেদ মানুষের তৈরি জিনিস এবং কোন্ আদিকালের জিনিস— তাহার মধ্যে কত ভুলচুক আছে, তাহাকে অভ্রান্ত বলিয়া ধরা যায় কেমন করিয়া? বেদ যে সময়কার, সে সময়ে মানুষ সভ্যতায় তো তেমন উন্নতি লাভ করে নাই— জ্ঞান-বিজ্ঞান তখন কিছুই ছিল না বলিলেই হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মানুষ সেই বেদকে ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্র বলিয়া আশ্রয় করিয়া থাকিবে আর বেদের সব কথাকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে— ইহার চেয়ে মানুষের দুর্দশা আর কি হইতে পারে? দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে এই প্রসঙ্গ লইয়া অক্ষয়কুমারের তুমুল তর্কবিতর্ক চলিতে লাগিল। দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়ের বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদকে কোনোমতেই মানিতে পারিতেন না। কারণ তিনি পরিষ্কার দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, উপনিষদে ঋষিদের অপরোক্ষানুভূতির কথা আছে, প্রত্যক্ষ উপলব্ধির কথা আছে। সেই উপলব্ধি চিরকাল সমান সত্য। উপনিষদ্ না পড়িয়াই তাঁহারো মধ্যে সেই একই উপলব্ধি দেখা দিয়াছিল। উপনিষদে তাহার সাদৃশ্য পাইয়া তিনি আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিলেন। এক-এক শাস্ত্রের মধ্যে সেই যে মানুষের চিরন্তন অধ্যাত্ম উপলব্ধির বাণী সঞ্চিত হইয়া আছে, তাহাকে যুক্তির গজকাঠিতে মাপা যায় না। তাহার কোন্ কথা ভুল, আর কোন্ কথা সত্য সেটা নির্ধারণ করিতে গেলে গোড়ায় ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের তুলনামূলক আলোচনা করা দরকার। তাহা ছাড়া, জাতীয় ইতিহাসের বিবর্তনের

দিক দিয়া শাস্ত্রের মধ্যে কোন্‌টা বরাবর বিকাশমান সুতরাং নিত্য আর কোন্‌টা বিলীয়মান সুতরাং অনিত্য, তাহাও স্থির করা দরকার। রামমোহন রায় এই দুই দিক হইতে শাস্ত্রের বিচার করিয়া গিয়াছেন। শুধু ব্যক্তিগত যুক্তি যথেষ্ট নয়, এ কথা দেবেন্দ্রনাথ বেশ ভালো করিয়া জানিতেন বলিয়াই অক্ষয়কুমারের আন্দোলনে তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই।

প্রায় ছয় বছর ধরিয়া অক্ষয়কুমারের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের এই বেদ লইয়া তর্কবিতর্ক চলে। ১৭৭৬ শকের ফাল্গুনের তত্ত্ববোধিনীতে অক্ষয়কুমার রামমোহন রায় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া রামমোহন কোনো শাস্ত্রকে আপ্তবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না—কেবল "বিশ্বরূপ বিশাল পুস্তক মাত্রই ঈশ্বরের প্রণীত ধর্মশাস্ত্র বলিয়া প্রত্যয় করিতেন", এই কথা বলিয়া রামমোহন রায়কেও নিজের দলে টানিয়াছেন। সেই প্রবন্ধে রামমোহন রায় সম্বন্ধে এমনতর মত-ব্যক্তির যুক্তি তাঁর এই যে, সাধারণ লোকের শাস্ত্র সম্বন্ধে কুসংস্কার আছে বলিয়া, রামমোহন রায় শাস্ত্রের দোহাই পাড়িয়া "স্বীয় মত সংস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।" এটা যেন একটা কৌশল মাত্র! তাই স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ব্যক্তিগত জ্ঞান ও শাস্ত্রের সামঞ্জস্য করিয়া শাস্ত্রপ্রামাণ্যের যে নূতন ব্যাখ্যা রামমোহন বর্তমান যুগে উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা অক্ষয়কুমার ধরিতে পারেন নাই। তিনি নিজে শাস্ত্রসম্বন্ধে লিখিতেছেন, "আমাদিগের আপন প্রকৃতিই আমাদিগের এক এক পরম শাস্ত্রস্বরূপ। যে নক্ষত্রের মনোবৎ দ্রুতগামী কিরণপুঞ্জ পৃথিবী-মণ্ডলে উপনীত হইতে দশ লক্ষ বৎসর অতীত হয়, তাহাও আমাদের শাস্ত্র; আবার যে অতি সূক্ষ্ম শোণিতবিন্দু আমাদিগের হৃদয়াভ্যন্তরেই সঞ্চরণ করিতেছে, তাহাও আমাদের শাস্ত্র। সমগ্র সংসারই আমাদিগের ধর্মশাস্ত্র, বিশুদ্ধ জ্ঞানই আমাদিগের আচার্য।"

রাজনারায়ণবাবু লিখিয়াছেন, "দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার দুই জনে তর্ক হইয়া স্থির হইল যে, বেদকে আর ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন করা কর্তব্য নয়, যেহেতু উহাতে ভ্রম ও অযুক্তিযুক্ত বাক্য দৃষ্ট হইতেছে। বেদ ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট নহে, বিশ্ববেদান্তই প্রকৃত বেদান্ত, এই মত অক্ষয়বাবু-দ্বারা ১৭৭২ শকের ১১ই মাঘ (১৮৫১ খৃস্টাব্দ) দিবসের সাম্বৎসরিক উৎসবের বক্তৃতাতে প্রথম ঘোষিত হয়।* ব্রাহ্মসমাজের দুই নায়কের মধ্যে তর্কবিতর্ক দ্বারা যাহা স্থিরীকৃত হয়

* ১৭৭২ শকের ১১ই মাঘের বক্তৃতায়—"অখিল বিশ্বরূপগ্রন্থে"র কথা ছিল বটে, কিন্তু ১৭৭৩ শকের ১১ই মাঘের বক্তৃতায় অক্ষয়কুমার শাস্ত্রসম্বন্ধে তাঁর মত পরিষ্কার করিয়া নিম্নলিখিত রূপ

তাহার গৌরব কেবল একজনকে দেওয়া কর্তব্য নহে, কিন্তু আমি দেখিতেছি অক্ষয়বাবুর বন্ধুরা ইহার গৌরব কেবল তাঁহাকেই চিরকাল দিয়া আসিতেছেন।"

কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তই যে প্রথম বেদ ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট নয় এবং ব্রাহ্মধর্ম বৈদান্তিক ধর্ম নয় এ কথা ঘোষণা করেন এবং সেই ১৮৫১ হইতেই যে, ব্রাহ্মধর্ম বেদান্তের পাশ হইতে মুক্ত হয়, এ কথাটি অক্ষয়কুমার দত্তের বন্ধুরা প্রচার করিলেও এবং রাজনারায়ণ বসু তাহা মানিয়া লইলেও, এ কথাটি ঠিক সত্য নয়। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্র ইহার বহু পরে ১৮৬৮, ১৮৭৭, ১৮৭৮ খৃস্টাব্দে ক্রমাগত এই কথাটার তারের উপর ঘা মারিয়া মারিয়া এর ছাপটা মানুষের মনে কায়েম করিয়া দেবার চেষ্টা করিয়াছেন। "Babu Devendranath Tagore owes to a great extent to Akshay Babu his deliverane from the Pantheism and errors of the Vedas and Upanishads." (*Indian Mirror*, 15th July 1877)— অক্ষয়বাবুর কাছেই দেবেন্দ্রনাথ বেদ আর উপনিষদ্ যে অভ্রান্ত নয়, এই সংস্কার হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য ঋণী। ইণ্ডিয়ান মিররগুলি পড়িলে বেশ মনে হয় যে, দেবেন্দ্রনাথ যে প্রথম অবস্থায় শুষ্ক বৈদান্তিক আর কুসংস্কারী গোছের মানুষ ছিলেন, এটা প্রমাণ করিতে পারিলে মিররের লেখকের যেন ভারি স্ফূর্তি হয়। যাই হোক আমি তবু কেন কথাটা সত্য নয় বলিতেছি, তাহার কারণগুলি দেখাই। ১৭৬৯ শকের (১৮৪৭ খৃস্টাব্দে) জ্যৈষ্ঠের তত্ত্ববোধিনীতে এক বিজ্ঞাপন দেখিতে পাই। তাহা এইরূপ—

"গত ১৪ই বৈশাখের বিশেষ সভার আদেশানুসারে আগামী ১৫ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার সন্ধ্যা সাত ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের নিম্ন গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা আগমন করিবেন। উক্ত সভায় পশ্চাল্লিখিত প্রস্তাব বিচারিত হইবেক।

বলেন— "এক এক অসীমপ্রায় সৌরজগৎ যে বিশ্বরূপ মূল গ্রন্থের এক এক পত্র স্বরূপ, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, ধূমকেতু যাহার অক্ষর স্বরূপ এবং যাহার এই সমস্ত অবিনশ্বর অক্ষর অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির্ময়ী মসী দ্বারা লিখিতবৎ প্রকাশ পাইতেছে, তাহাই যথার্থ অবিকল অভ্রান্ত শাস্ত্র।...নানাদেশীয় পূর্বতন শাস্ত্রকারেরা যদি এই মূল গ্রন্থের অভিপ্রায় সমুদায় সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে পারিতেন এবং যে পর্যন্ত অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার সহিত মনঃকল্পিত ব্যাপার সমুদায় মিশ্রিত করিয়া না লিখিতেন, তবে ভূমণ্ডলের সর্বস্থানে আমাদের ব্রাহ্মধর্ম এতদিনে অতি প্রাচীন ধর্ম বলিয়া গণিত হইত।"—গ্রন্থকার

"প্রস্তাব

"১৭৬৮ শকের নিয়মপত্রের প্রথম সংখ্যক নিয়মে যে "বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যধর্ম" এই বাক্য আছে তাহার পরিবর্তে "ব্রাহ্মধর্ম" এই শব্দ হয়।"

ইহা একটা মস্ত পরিবর্তন। ব্রাহ্মধর্ম যে ঠিক বৈদান্তিক ধর্ম নয়, ইহা লইয়া তত্ত্ববোধিনীর সভ্যদের মধ্যে যে তখন আন্দোলন চলিতেছিল— উপরের বিজ্ঞাপনটিই তাহার প্রমাণ। এ প্রস্তাব যে সবসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহারও প্রমাণ আছে। ১৭৬৮ শকের তত্ত্ববোধিনী সভার নিয়মের গোড়াতেই ছিল "বিবিধ উপায়ের দ্বারা তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিবেন।" কিন্তু ১৭৬৯ শকের নিয়মের গোড়াতে আছে, "বিবিধ উপায় দ্বারা তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিবেন।" সুতরাং যখন বেদ ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্র বলিয়া মানা হইত, তখন "ব্রাহ্মধর্ম" এ নাম ছিল না— নাম ছিল "বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্য ধর্ম।" বেদ ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট কি না এ সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক হওয়ার পর নাম বদল হইয়া ব্রাহ্মধর্ম নাম চল্‌তি হইল। নিয়মাবলীর মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞানের জায়গায় ব্রাহ্মধর্ম কথাটা নূতন আসিল। ১৮৪৭ খৃস্টাব্দে (১৭৬৯ শকে) এই পরিবর্তন হয়। ইহা অক্ষয়কুমার দত্তের ঘোষণার অনেক পুর্বকার ব্যাপার।

আরো প্রমাণ আছে। অক্ষয়কুমার দত্তের চরিতলেখক মহেন্দ্রনাথ রায়ের দ্বারাই এই কথাটা প্রতিষ্ঠিত হয় যে, অক্ষয়কুমার দত্ত ব্রাহ্মসমাজকে বেদের আধিপত্য হইতে মুক্ত করেন। ১৮০৮ শকের (১৮৮৬ খৃস্টাব্দ) কার্তিকের তত্ত্ববোধিনীতে রাজনারায়ণবাবু সেই জীবনচরিতের এক সমালোচনা বাহির করেন, তাহাতে এই কথাটার রীতিমত প্রতিবাদ করা হয়। দেবেন্দ্রনাথ সেই সমালোচনা দেখিয়াছিলেন, রাজনারায়ণবাবুর অপ্রকাশিত ডায়ারি হইতে তাহা জানা যায়। তাহাতে স্পষ্ট বলা হয় যে, দেবেন্দ্রনাথ নিজে বেদ আলোচনা করিয়া ও কাশীতে যে চারিজন ছাত্র পাঠানো হইয়াছিল তাহারা ফিরিয়া আসার পর তাহাদের কাছে সমস্ত বেদের ব্যাখ্যা শুনিয়া বেদের অপৌরুষেয়বাদকে আর মানা চলে না, ইহা বুঝিতে পারেন। বেদের যে সবটাই ব্রহ্মজ্ঞান বা পরাবিদ্যার বিষয় তাহা নয়— দেবতাদের যাগযজ্ঞের কথা তাহাতে বেশি। ইহা দেখিতে পাইয়া বেদকে তিনি ছাড়েন। অক্ষয়কুমারের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক তাঁহাকে এই খোঁজে হয়তো প্রবৃত্ত করিয়াছিল, কিন্তু অক্ষয়কুমার যে তাঁহাকে নিজের মতে আনিয়া ফেলিয়াছিলেন, এ কথাটা একেবারেই ভুল। কারণ অক্ষয়কুমারের মতে সবই শাস্ত্র, বিজ্ঞানও শাস্ত্র, গণিতও শাস্ত্র, পুরাতত্ত্বও শাস্ত্র— বিশ্ব-

সংসারই শাস্ত্র। তিনি কোনো বিশেষ শাস্ত্র মানিতেন না— যে শাস্ত্রে মানুষের গভীরতম অধ্যাত্ম-উপলব্ধির বাণী আবদ্ধ হইয়া আছে।

ঐ একই বছরে ইংরাজী ১৮৪৭ সালে (১৭৬৯ শকে) দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদে প্রথম জানিতে পারিলেন যে, ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ— এই সকলি অপরা বা অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। যাহার দ্বারা পরব্রহ্মকে জানা যায় তাহাই পরা বা শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। এই কথাটি তাঁহার এত ভালো লাগিল যে, সেই বছরের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মাথায় এই বেদবাক্য প্রকাশিত হইতে লাগিল— অপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা-কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তঞ্ছন্দোজ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে। এই প্রথম তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে, বেদের মধ্যে পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা দুই ভাগ আছে। কাশীতে ছাত্র পাঠাইয়া তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। সমস্ত বেদ জানিবার জন্য তাঁহার এমনি আগ্রহ হইল যে, তিনি ঐ বছরেই (১৮৪৭ খৃস্টাব্দে) লালা হাজারীলালকে সঙ্গে করিয়া পাল্কীর ডাকে কাশী রওনা হইলেন। চৌদ্দ দিনে অনেক কষ্টে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেখানে গিয়া কাশীর প্রধান প্রধান বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া তিনি এক সভা খাড়া করিলেন। কাশীতে রব পড়িয়া গেল যে, এক শ্রদ্ধাবান বাঙালী যজমান চারি বেদ শুনিতে চান। দেবেন্দ্রনাথ কাশীর মানমন্দিরে থাকিতেন, সেখানে ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে তিনি মাল্যচন্দনাদির দ্বারা যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া প্রত্যেককে একখান কাপড় ও দুইটি করিয়া টাকা দিলেন। চতুর্বেদ শোনা হইল— ইহার মধ্যে শুক্ল যজুর্বেদ আগে পড়া হইয়াছিল বলিয়া কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণেরা চটিয়া অস্থির! তাহারা কোনোমতে ঝগড়া থামায় না দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথ তাহাদের দুই দলকেই এক সঙ্গে পড়িতে বলিলেন এবং পরে পৃথক পৃথক পড়া শুনিলেন। কাশীর শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের সঙ্গে বেদ আলোচনা করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে, বৈদিক যজ্ঞ লইয়াও বিস্তর দলাদলি আছে। কাশীতে থাকিতে, কাশীর রাজা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন এবং একটি হীরার আংটি তাঁহাকে উপহার দিলেন। তাঁহার অনুরোধে কাশীতে রামলীলা দেখিয়া নৌকায় করিয়া তিনি বিন্ধ্যাচল পাহাড় দেখিলেন এবং মৃজাপুরে গেলেন। বিন্ধ্যাচলের সেই ছোটো ছোটো পাহাড় দেখিয়াও তাঁহার কত আনন্দ! মৃজাপুর হইতে ষ্টীমারে করিয়া বাড়ি ফিরিলেন— সঙ্গে আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশকে লইয়া আসিলেন।

লালা হাজারীলাল কাশী হইতে শূন্য হাতে প্রচারের জন্য বাহির হইলেন। একটি আংটি মাত্র তাঁহার সম্বল ছিল, তাহাতে খোদাই ছিল, "ইহ ভী নহী রয়েগা।" সেই যে তিনি গেলেন— চির-জন্মের মতো গেলেন। ১৮৫৪ খৃস্টাব্দে (১৭৭৫ শক) ফাল্গুনের তত্ত্ববোধিনীতে তাঁহার মৃত্যুসংবাদ বাহির হয়— তাহাতে জানা যায় যে, "কাশী, কানপুর, আগ্রা, লাহোর, পেশোয়ার, করাচী, বোম্বাই প্রভৃতি নানা স্থানে তিনি ভ্রমণ করেন। যখন যে স্থানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তখন তথায় ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলন করিতে এবং যোগ্য পাত্র প্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করিতে ত্রুটি করেন নাই।" তিনি ইন্দোরে মারা যান। কী একটি মূর্তিমান উৎসাহের অগ্নিশিখা! দেবেন্দ্রনাথের অধ্যাত্মজীবনের আলোয় এমন কত প্রদীপ তখন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। কত সংশয়-অন্ধকারের মধ্যে, কত পাপরুদ্ধ কারাগারের মধ্যে এই দীপগুলি গিয়া পৌঁছিয়াছিল— দেশ-বিদেশে, দিক্‌-দিগন্তরে— আজ তাহাদের স্মৃতি কে মনে করিয়া রাখিবে। বিধাতা যাহার হাতে আপনার সৃষ্টির আগুন সঁপিয়া দেন, সেই হয় স্মৃত, কিন্তু সেই আগুন হইতে যাহারা দীপ্তি পায়, তাহারা হয় বিস্মৃত— কালের এই নিয়ম!

যাহাই হৌক, কাশীতে গিয়া বেদ আলোচনা করিয়া তাঁহার আর মনে সন্দেহ মাত্র রহিল না যে, বেদে অপরা বিদ্যার কথাই বেশি, কেবল দেবতাদের যাগযজ্ঞের কথা। বেদের দেবতা তেত্রিশটি— অগ্নি, ইন্দ্র, মরুৎ, সূর্য, উষা, এই কয়েকটি প্রধান। অগ্নি সকল যজ্ঞেই আছেন— অগ্নি পুরোহিত— অগ্নি হোতবাং —হোতা। সকল কাজেই অগ্নি। অগ্নি বিবাহের সাক্ষী, অগ্নি জাতকর্ম হইতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, শ্রাদ্ধ— সকল অনুষ্ঠানেই আছেন। সেই সুদূর বৈদিক কাল হইতে অগ্নির এই আধিপত্য চলিয়া আসিতেছে। দেবেন্দ্রনাথ শালগ্রাম, কালী দুর্গা প্রভৃতি পুত্তলিকা ছাড়িয়া দিয়া মনে ভাবিয়াছিলেন যে, বুঝি সমস্ত পৌত্তলিকতাই ছাড়া হইয়াছে। বেদে প্রতিমা পূজা না থাকিলেও, অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র প্রভৃতি যে আর-এক রকমের প্রতিমা, সে কথা তাঁহার মনেই হয় নাই। এই-সব প্রাকৃত দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্যই যে বৈদিককালের আর্যেরা যাগযজ্ঞ করিতেন, এই সোজা কথাটা এতদিন তিনি জানিতে পারেন নাই। উপনিষদ্‌কেও বেদ বলে, ঋক্‌ যজু অথর্বকেও বেদ বলে— ইহাদের মধ্যে যে প্রভেদ কতখানি তাহা তাঁহার ধারণার মধ্যেও আসে নাই। তাঁহারা জানিতেন যে, বেদের জ্ঞান-কাণ্ড আর কর্মকাণ্ড, এই দুই কাণ্ডের মধ্যে কর্মকাণ্ড দুর্বল অধিকারীর চিত্তসংযম

বা চিত্তশুদ্ধির জন্য ব্যবস্থা মাত্র। তাহা মোটের উপরে নির্দোষ। এখন কর্মকাণ্ড পৌত্তলিকতার ভাবে পূর্ণ দেখিয়া তাহাকে একেবারেই ছাড়িতে হইল। "ইন্দ্রং সাতিমীমহে"—ইন্দ্রের নিকট ধন প্রার্থনা করি। কেবল ধন, পুত্র, নানা প্রকার কাম্যবস্তু দেবতাদের কাছে কামনা করার জন্যই যজ্ঞ। প্রাকৃত দেবতাদের যেন বলির দ্বারা খুশি করিলে তাঁহারা কামনা পূর্ণ করিতে পারেন, এই বিশ্বাস বৈদিক আর্যদের মনে ছিল। এ তো ব্রহ্মজ্ঞান নয়। এ-ও তো পৌত্তলিকতা, অর্থাৎ নিজের মনগড়া দেবতা বাঁচিয়া তাহার কাছে সাংসারিক কাম্য বিষয় প্রার্থনা করা। এক সময়ে বৈদিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয় ঋষিরা বিদ্রোহ করিয়া যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানের জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। তাঁহারা ঘর ছাড়িয়া বনে গেলেন এবং ইন্দ্রিয়গোচর দেবতাকে ছাড়িয়া ইন্দ্রিয়ের অতীত সেই পরমাত্মাকে ধারণা করিবার চেষ্টা করিলেন। উপনিষদ্ তাঁহাদেরি রচনা—সেই আরণ্যক ঋষিদের। সেই উপনিষদেই যথার্থ আত্মতত্ত্ব; আত্মা কি, জগৎ কি, ইত্যাদি প্রশ্নের উদয় ও উত্তর।

কিন্তু বেদের আগাগোড়াই যে কর্মকাণ্ডের যাগযজ্ঞের কথা, তাহা নয়। বৈদিক ঋষিদের মধ্যেও প্রশ্ন উঠিয়াছিল, কেমন করিয়া এই সৃষ্টি হইল, দেবতারা কোথা হইতে আসিলেন? তাঁহারা এই ইন্দ্রিয়গোচর জগতের মাঝখানে দাঁড়াইয়া ইন্দ্রিয়ের পর্দা তুলিয়া জগতের সেই চির-রহস্যময় মূলের দিকে ইঙ্গিত করিয়া প্রশ্ন করিয়াছেন—

"Like a child crying for the light
And with no language but a cry."

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্যচ্ছায়াঽমৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥

যিনি আত্মদাতা, বলদাতা, যাঁহার বিধানকে বিশ্বসংসার উপাসনা করে, দেবতারাও যাঁহার বিধানকে উপাসনা করেন; অমৃত যাঁহার ছায়া, মৃত্যু যাঁহার ছায়া, তাঁহাকে ভিন্ন আর কোন্ দেবতাকে আমরা হবিঃ দান করি?" এমনিতর অনেক ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, ব্রহ্মতত্ত্বের বাণী দেবেন্দ্রনাথ ঋক্ ও যজুর্বেদেতে পাইলেন। উপনিষদেরও অনেকগুলি মহাবাক্য যে ঋগ্‌বেদের বাক্য তাহাও তিনি দেখিতে পাইলেন—যেমন সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম। যেমন দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া প্রভৃতি সেই বাক্যটি—দুই পাখি একই গাছে বসিয়া আছে—দুঁহুঁ দোঁহার সখা। তাহার মানে ঋগ্‌বেদের জ্ঞানকাণ্ডের কথাগুলি উপনিষদের অন্তর্গত

হইয়াছে। এখানেও একটা নির্বাচন প্রণালী কাজ করিয়াছে। বৈদিক খনির পাথরে মেশানো সোনাকে অধ্যাত্ম-অভিজ্ঞতার আগুনে গলাইয়া উপনিষদের ঋষিরা পাথর হইতে সোনাটুকুকে তফাত করিয়া লইয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথকেও যে একবার উপনিষদের সম্বন্ধেও ঠিক এই কাজই করিতে হইবে, তাহা তখন তিনি জানিতে পারেন নাই।

যে চারিজন ছাত্রকে কাশীতে বেদ পড়ার জন্য পাঠানো হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে আনন্দচন্দ্রকে দেবেন্দ্রনাথ সঙ্গে লইয়া আসিলেন। আর তিনজন ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদ কতক কতক পড়িয়া ফিরিয়া আসিলেন। আনন্দচন্দ্রকে তিনি বেদান্তবাগীশ উপাধি দিলেন, কারণ তিনি অনেকগুলি উপনিষদ্‌, বেদাঙ্গের কিছু অংশ ও বেদান্তদর্শন পড়িয়াছিলেন। তাঁহাকে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্যও করিয়া দিলেন। ইঁহাদের সঙ্গে বেদ আলোচনা করিয়া তাঁহার মনে হইল যে, ঋগ্‌বেদের দেবতাদের উপাসনা ঠিক উপনিষদের উপাসনার মতো বিশুদ্ধ ব্রহ্মোপাসনা না হইলেও ঈশ্বরেরই উপাসনা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ ঋগ্‌বেদে যজুর্বেদে স্পষ্ট বাক্য আছে যে, তাঁহারা পরমেশ্বরকেই অগ্নি বায়ু নানারূপে উপাসনা করিতেন। এষ উহ্যেব সর্বেদেবা— ইনিই সকল দেবতা। কোল্‌ব্রুক, মোক্ষমূলর প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য বৈদিক পণ্ডিতগণ এই কথাই বলিয়াছেন। কোলব্রুক বলিয়াছেন এটা, "Seeming Polytheism"—আপাতঃ বহু ঈশ্বরবাদ কিন্তু মূলতঃ একেশ্বরবাদ। মোক্ষমূলর ইহার এক নূতন নামকরণ করিলেন— Henotheism। রামমোহন রায়ও বেদ আলোচনা করিয়া তাঁহার বেদান্ত গ্রন্থে বৈদিক ধর্মকে একেশ্বরবাদ বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, বেদে নানা দেবতাকে জগতের কর্তা বলিয়া বর্ণনা করা হইলেও, বেদ বারবার স্বীকার করিয়াছেন— একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম। বেদে নানা দেবতা ও নানা বস্তুকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে; অথচ ব্রহ্মকে এক বলা হইয়াছে। এ সমস্তই সেই একের মধ্যে বিধৃত, সেই একেরি রূপ— এইটেই বৈদিকধর্মের ভিতরকার কথা।

দেবেন্দ্রনাথ যখন ঋগ্‌বেদ অনুবাদ করিতে শুরু করিলেন, তখন তাহার ভূমিকা ১৭৬৯ শকের (১৮৪৮ খৃস্টাব্দ) ফাল্গুনের তত্ত্ববোধিনীতে বাহির হইল এইমত—

"যদিও বেদের মধ্যে পরব্রহ্মবিষয়ক শ্রুতিসকলই আমারদিগের মুখ্যরূপে আলোচনীয়, কিন্তু সেই ব্রহ্মপর শ্রুতি সমুদায় বেদের কিয়দংশমাত্র, এজন্য সমস্ত

বেদের মর্ম অবগত হওয়া আবশ্যক। অতএব ঈশ্বরের অনুগ্রহে প্রথমতঃ ঋগ্‌বেদ বঙ্গভাষাতে অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, ঈশ্বরেচ্ছায় ইহার সমাপ্তি হইলে ক্রমে ক্রমে যজুঃ সাম অথর্ব বেদও এতদনুসারে প্রকাশিত হইতে পারিবেক। প্রতি বেদের দুই অংশ, সংহিতা এবং ব্রাহ্মণ। সম্প্রতি ঋগ্‌বেদের সংহিতা অংশ অনুবাদ আরম্ভ হইল। এই ঋগ্‌বেদের সংহিতাতে দশ সহস্রেরও অধিক ঋক্ আছে সুতরাং ইহাও অল্পদিনে ও অল্প পরিশ্রমে সমাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নহে। সম্প্রতি আশাকে অবলম্বন করিয়া এই কর্মে হস্তক্ষেপ করিলাম, ইহার শেষ করিবার ভার পরমেশ্বরের প্রতিই আছে।

"যিনি তাবৎ শুভাশুভের বিধানকর্তা তাঁহার নিকট হইতে শুভ বস্তু প্রার্থনা করা এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সমুদায় বেদের তাৎপর্য হইয়াছে। ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরব্রহ্ম যে ক্রমাগত আমাবদিগের মঙ্গলবিধান করিতেছেন ইহা সাধারণরূপে প্রত্যক্ষ প্রতীতি করাইবাব জন্য সূর্য, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি দেবতাদিগের উপাসনা বেদে বাহুল্যরূপে বিধান হইয়াছে। সূর্যের অন্তর্যামী যে কোন পুরুষ তিনি সূর্যদেবতা, বায়ুব অন্তযামী যে কোন পুরুষ তিনি বায়ুদেবতা, অগ্নির অন্তর্যামী যে কোন পুরুষ তিনি অগ্নিদেবতা, ইহাতে বৈদিকেরা বাহ্য জড় সূর্য প্রভৃতিকে উপাসনা করেন না, কিন্তু তাহাব অন্তর্যামী যে, চৈতন্য-পুরুষ তাঁহারই উপাসনা করেন। সূর্য বায়ু প্রভৃতির দ্বারা প্রত্যক্ষ উপকার প্রাপ্ত হইয়াই তৎক্ষণাৎ তাহার অন্তর্যামী পুরুষ সূর্যদেবতা বায়ুদেবতা প্রভৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকাব করিতে মন উদ্যত হয়। সূর্য বায়ু প্রভৃতির অন্তর্যামী পুরুষ পরমেশ্বর ভিন্ন নহে, কাবণ তিনি সকলের অন্তর্যামী, অতএব সূর্যদেবতা বা বায়ুদেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করাতে পরমেশ্বরেব প্রতিই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হইল। ভিন্ন ভিন্ন কার্যেতে ভিন্ন ভিন্ন নাম দ্বারা পরমেশ্বরকে নির্দিষ্ট করিয়া সকাম উপাসনা করিতে তাবৎ বিধি আছে যাবৎ বেদান্ত-প্রতিপাদ্য অনন্ত পরমেশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান না হয়। এই ঋগ্‌বেদের ঋক্‌সকল প্রায় দেবতা-দিগেব স্তোত্র, এই ঋক্ সকল ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন ঋষিদ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে।"

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাগুলি পড়িলেই বেশ দেখা যায়, দেবেন্দ্রনাথ কেমন করিয়া সকল কাজে নিজের নাম গোপন করিয়া চলিতেন। তাঁহার আত্মজীবনী বাহির না হইলে তিনি যে কি কি কাজ করিয়াছিলেন, তাহার কিছুই জানার সম্ভাবনা ছিল না। তত্ত্ববোধিনী সভা তিনিই স্থাপন করিলেন, অথচ ১৭৬৯ শকের ফাল্গুনের তত্ত্ববোধিনীতে আছে "শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য মহাশয়ের

উপদিষ্ট কতিপয় ব্যক্তি ১৭৬১ শকে ব্রাহ্মধর্ম প্রদীপ্ত করিবার মানসে তত্ত্ববোধিনী নাম্নী এই সভা স্থাপন করিলেন।" ঋগ্‌বেদের বাংলা অনুবাদ পত্রিকায় বাহির হইবার সময়ে ঐ শকের ফাল্গুনেব পত্রিকায় লেখা আছে, "এইক্ষণে অতি আনন্দের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে, কোন ধর্মপরায়ণ দেশহিতৈষী ব্যক্তি কাশী হইতে বেদপারদর্শী পণ্ডিত আনয়ন করিয়া সমস্ত বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ বঙ্গভাষাতে অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।" সমস্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাগুলি ঘাঁটিলে, দেবেন্দ্রনাথের নাম কদাচিৎ পাওয়া যায়— যাঁহাদের ধারণা যে তিনি অত্যন্ত কর্তৃত্বপরায়ণ ছিলেন, তাঁহাদের এটা জানা উচিত। বোধ হয় এতটা আত্মগোপনতা পৃথিবীর খুব অল্প জননায়কদের মধ্যেই দেখা গিয়াছে। তত্ত্ব-বোধিনী সভার যে রীতিমত বিধিব্যবস্থাবদ্ধ প্রতিষ্ঠান (constitution) ছিল, তাহা তাহার নিয়মাবলী পড়িলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। দেবেন্দ্রনাথ এ পর্যন্ত তত্ত্ববোধিনী সভার সভাপতিও হন নাই, সম্পাদকও হন নাই—সামান্য সভ্য ছিলেন মাত্র। গ্রন্থাধ্যক্ষ সভার মধ্যে তিনি একজন মাত্র গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার খুড়তুতো ভাই নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সময়ে সম্পাদক ছিলেন। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, গ্রন্থাধ্যক্ষ সভায় দেবেন্দ্রনাথের লেখাও অনুমোদনের জন্য পাঠাইতে হইত। সভার সভ্যেরা অনুমোদন করিলে তবে তাহা ছাপা হইত। ধর্মসমাজে প্রতিষ্ঠান (constitution) গড়াব যাঁহাবা দাবি করেন, এবং মনে করেন যে, দেবেন্দ্রনাথের সময়ে ঐ জিনিসটার অস্তিত্বই ছিল না, তাঁহাবা একটু মনোযোগ করিয়া ১৭৬৬ শক আশ্বিনের তত্ত্ববোধিনীতে সভার নিয়মগুলির উপর চোখ বুলাইলেই তাঁহাদের ধাবণাব যে কোনো মূল নাই, তাহা বেশ ভালো করিয়া বুঝিতে পারিবেন। ধর্মসমাজও যে আধুনিক প্রতিষ্ঠানের বিধিনিয়ম-অনুসারে পরিচালিত হইবে, ইহার গোড়াপত্তন তিনিই করিয়া যান।

১৭৬৯ শক (১৮৪৮ খৃস্টাব্দ) হইতে আরম্ভ করিয়া ১৭৯৩ শক (১৮৭১ খৃস্টাব্দ) পর্যন্ত এই ঋগ্‌বেদ সংহিতার তর্জমা ছাপা হইয়া চলিল। ঋগ্‌বেদ সংহিতায় দশ হাজারের উপর শ্লোক। সবসুদ্ধ ১২৪৮ শ্লোকের অনুবাদ প্রকাশ হইয়াছিল। "প্রথমমণ্ডলস্য ষোড়শেঽনুবাকে তৃতীয়ং সূক্তং" পর্যন্ত। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন, "আমি যে ইহা সমাপ্ত করিতে পারিব, তাহার কোন আশা নাই।" কিন্তু এত বৃহৎ ব্যাপার যে তিনি হাতে লইয়াছিলেন, ইহাই আশ্চর্য। কারণ এই বছরেই তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি সমস্তই গেল। কেমন করিয়া ঋণ শোধ করিবেন সেজন্য তাঁহার দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। তাহার উপবে এ সময়টা তাঁহার

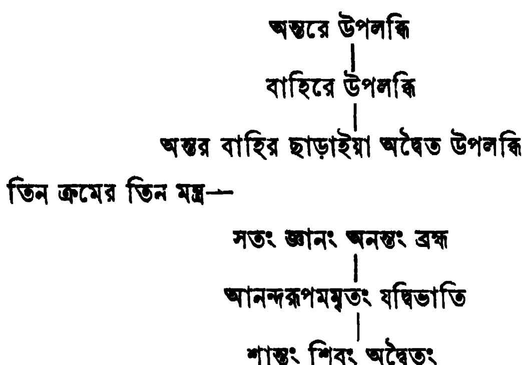
অত্যন্ত বৈরাগ্যের সময়— তখন নির্জনে ধ্যানধারণায় কাল কাটাইতেই তাঁহার মনের একান্ত অনুরাগ। অথচ আশ্চর্য এই যে, এই সময়েই তিনি কাজের মধ্যে একেবারে অষ্টপ্রহর ডুবিয়া ছিলেন। সকাল হইতে দুপর পর্যন্ত দর্শনশাস্ত্রের চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। দুপরের পর সন্ধ্যা পর্যন্ত বেদ, বেদান্ত, মহাভারত প্রভৃতি শাস্ত্রালোচনা ও বাংলাভাষায় ঋগ্‌বেদের অনুবাদ করিতেন। সন্ধ্যার সময় তিনি ছাদের উপর কম্বল পাতিয়া বসিতেন ও ধর্মজিজ্ঞাসু ব্রাহ্মবন্ধুদের সঙ্গে নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। আলোচনা করিতে করিতে সময়ের জ্ঞান থাকিত না, কখনো কখনো রাত দুপর বাজিয়া যাইত। তার উপর তত্ত্ববোধিনীর অনেক প্রবন্ধ তাঁহাকে দেখিয়া দিতে হইত। রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন, "পরম শ্রদ্ধাস্পদ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম প্রচার জন্য এই সময়ে যেরূপ অসাধারণ পরিশ্রম করিতেন যিনি নিজ চক্ষে তাহা দেখিয়াছিলেন তিনিই কেবল বুঝিতে পারেন। এক-এক দিন অক্ষয়বাবুর রচিত প্রস্তাব সকল তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশ করিবার পূর্বে তাহা সংশোধন করিতে করিতে তিনি গলদ্‌ঘর্ম হইতেন।" এ-সমস্ত কাজের উপর বিষয়কর্ম চালাইবার ভার ছিল— ঋণশোধের জন্য সেই বৈষয়িক কাজে তাঁহাকে রীতিমত খাটিতে হইত। এত পরিশ্রমের মধ্যেও তিনি যে কেমন করিয়া অধ্যাত্মসাধনায় অগ্রসর হইতেছিলেন, তাহা মনে করিলে একেবারে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়।

আমরা ইতিপূর্বে উপাসনা-পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে, ব্রহ্মোপাসনার যে দুই মহাবাক্য— সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম এবং আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি— তাহা তাঁহারই অধ্যাত্মসাধনার বিকাশের ফলে দাঁড়াইয়াছিল। ১৮৪৮ খৃস্টাব্দে— ১৭৭০ শকে, তিনি আর-একটি বাক্য জুড়িয়া দিলেন— শান্তং শিবং অদ্বৈতং। অর্থাৎ তিনি তাঁহার সাধনার অভিজ্ঞতায় আর-এক ধাপে উঠিলেন। প্রথমে অন্তরে জ্ঞানযোগে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিবার মন্ত্র হইল— সতং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম— তিনি সকল সত্তার মধ্যে সত্য, তাঁহার জ্ঞানের মধ্যে সমস্ত বিধৃত, তাঁহার কোথাও সীমা বা পরিমাণ নাই, তিনি সকলের বড়ো, ব্রহ্ম। তার পরে আনন্দযোগে জগতের শোভা-সৌন্দর্যের মধ্যে তাঁহাকে উপলব্ধি করিবার মন্ত্র আসিল— আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। যাহা-কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহার মধ্যে তাঁহারি আনন্দরূপ, অমৃতরূপ। কিন্তু তিনি অন্তরে বাহিরে থাকিয়াও আবার যে আপনাতে আপনি আছেন এবং আপনার মঙ্গল ইচ্ছা আপনি জানিতেছেন, সে উপলব্ধি না হইলে

তো তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি হয় না। তাঁহাকে তাঁহার আপনাতে দেখার মন্ত্র—শান্তং শিবং অদ্বৈতং।—তিনি সকল চঞ্চল গতির মধ্যে অচঞ্চল শান্তি; সকল ঘটনার মধ্যে নিত্য শিব, এবং আপনাতে আপনি একলা অদ্বৈত।

দেবেন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, "সাধকদিগকে এই তিন স্থানে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে হইবে। অন্তরে তাঁহাকে দেখিবেন, বাহিরে তাঁহাকে দেখিবেন এবং আপনাতে আপনি যে আছেন, সেই ব্রহ্মপুরে তাঁহাকে দেখিবেন··· আমরা একই সময়ে সব ভাবিয়া উঠিতে পারি না! কখনো তাঁহাকে আমরা আমাদের অন্তরে ভাবি, কখনো তাঁহাকে আমরা আমাদের বাহিরে ভাবি, কখনো ভাবি যে তিনি আপনাতে আপনি রহিয়াছেন। কিন্তু একই সময়ে সেই অবাতপ্রাণিত নিত্য জাগ্রত পুরুষ আপনাতে আপনি শান্তভাবে অবস্থিতি করিয়া আপনার মঙ্গল ইচ্ছা নিত্যই জানিতেছেন, আমাদের অন্তরে জ্ঞানধর্ম প্রেরণ করিতেছেন এবং বহির্জগতে জীবের কাম্যবস্তু সকল বিধান করিতেছেন।··· যে যোগী সেই একই সময়ে তাঁহার এই ত্রিত্ব দেখিতে পান—দেখিতে পান যে, তিনি আপনাতে আপনি থাকিয়া সকলের অন্তরে আছেন, আপনাতে আপনি থাকিয়া সকলেব বাহিরে আছেন এবং আপনাতে আপনি থাকিয়া আপনার মঙ্গল ইচ্ছা নিত্যই জানিতেছেন, তিনি পরম যোগী।··· তিনি ব্রহ্মোপাসকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

সুতরাং ব্রহ্মোপাসনার তখন যে তিন ক্রম হইল, তাহা অধ্যাত্মসাধনার তিন ধাপের ক্রম—



কিন্তু সাধনার এই তিন ধাপ এবং উপাসনার তিন ক্রম যখন এক হইয়া মিলিয়া যায় তখন তাহার আর পারম্পর্য থাকে না। অদ্বৈত উপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত অন্তরগত (Subjective) এবং বাহ্য (objective) দুই উপলব্ধিই পরস্পর দ্বন্দ্ব করিতে থাকে। এ দিকে ঝোঁক দিলে ওদিককার ঝোঁক কমে। বেশি

অন্তরগত উপলব্ধি হইলেই বাহ্য জগৎটাকে মায়া ছায়া বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা হয়; বেশি বস্তুগত উপলব্ধি হইলেই কেবল সৌন্দর্য চারুশিল্প, কলাবিদ্যার মধ্যেই সমস্ত উপলব্ধি পর্যাপ্ত এই ভুল ধারণা জন্মে। একটা যায় অতিরিক্ত অরূপের দিকে অন্যটা যায় অতিরিক্ত রূপের দিকে। এই দুয়েরি বিপদ আছে। কেয়ার্ড তাঁহার 'ধর্মের বিবর্তন' *(Evolution of Religion)* বইটিতে এই দুদিককার অবস্থাব দ্বন্দ্বটা যে কি রকম, তাহা বেশ ভালো করিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু ইহার সমাধান অদ্বৈত উপলব্ধি ভিন্ন আর কিছুতে হইতে পারে না। সেই উপলব্ধির জীবনকে পাশ্চাত্ত্য ভাষায় Unitive Life বলা হয়। পশ্চিম দেশীয় মরমী (mystic) সাধক রুইজ্‌ব্রোয়েক এই উপলব্ধির কথাটাই তাঁহার খৃস্টানী অভিজ্ঞতার ভাষায় বলিয়াছেন—"The spirit (of deified souls) is caught by a simple rapture to the Trinity and by a threefold rapture to the Unity, and yet never does the creature become God, never is she confounded with Him"—অর্থাৎ ঈশ্বরে যোগযুক্ত ব্যক্তিদের আত্মা একটি সহজ আনন্দে সেই ত্রিত্বের দিকে ছুটিয়া যায়; আবার তিন রকমের আনন্দের যোগে একের মধ্যে সমাহিত হয়। তবু কখনোই জীব ঈশ্বর হয় না—জীবে ঈশ্বরে ভেদ থাকিয়া যায়। এ ত্রিত্বও সেই ত্রিত্ব—একটা অন্তরগত—খৃস্টানী ভাষায় পবিত্রাত্মার যোগের উপলব্ধি। একটা বস্তুগত—খৃস্টানী ভাষায় ঈশ্বরকে মনুষ্য-প্রেমের মধ্যে উপলব্ধি। আর-একটা স্বরূপগত—খৃস্টানী ভাষায় যেখানে তিনি সকল ছাড়াইয়া আপনাতে আপনি আছেন সেই অদ্বৈত উপলব্ধি। এই তিন আবার মিলিয়া এক হইয়া যায়—কিন্তু সেই ঐক্য জীব-ব্রহ্মের ঐক্য নয়।

দশম পরিচ্ছেদ

ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ

বেদে যখন ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি স্থাপন করা গেল না তখন বেদ ছাড়িয়া দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদ্‌কেই ধরিলেন। দেখা যাক উপনিষদের সঙ্গে বেদের সম্বন্ধটা কি। চতুর্বেদের প্রত্যেকটির অন্তর্গত সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও সূত্র, এই তিন ভাগ। ঋক্‌, সাম ও যজুর্বেদের প্রত্যেকটিরই যে একটি করিয়া "ব্রাহ্মণ" গ্রন্থ আছে তাহা নয়; অনেকগুলি "ব্রাহ্মণ" আছে। প্রত্যেক বেদের অন্তর্গত তেমনি অনেকগুলি উপনিষদ্‌ আছে। উপনিষদ্‌ অরণ্যের উপনিষদ্‌—অরণ্যেই তাহার উৎপত্তি—এইজন্য "ব্রাহ্মণ" ছাড়া "আরণ্যক" গ্রন্থের সঙ্গে উপনিষদ্‌কে অনেক সময়ে সংলগ্ন দেখা যায়। উপনিষদের আর-এক নাম বেদান্ত। বেদান্ত শব্দের অর্থ বেদের অন্ত বা সারভাগ। কোনো কোনো পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত মনে করেন যে, বেদের মধ্যে তিনটি স্তর আছে—একটি যাগযজ্ঞ প্রভৃতি কর্মকাণ্ডের স্তর (ritual স্তর)। দ্বিতীয় স্তর, একেবারে কর্মকাণ্ড ছাড়াইয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মতত্ত্বের অন্বেষণের স্তর (philosophical স্তর)। শেষ স্তর, ব্রহ্মতত্ত্বের দিক দিয়া যাগযজ্ঞ প্রভৃতিকে রূপকের হিসাবে দেখার স্তর (allegorical স্তর)। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের এই ধারণার বিশেষ মূল নাই। বরং এ দেশের কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন যে, যাগযজ্ঞাদির প্রথম স্তর ছাড়াইয়া বৈদিকধর্ম একটা রূপক স্তরে উঠিয়াছিল। যাগযজ্ঞাদির অর্থ যখন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত করিয়া বৈদিকেরা দেখিলেন, তখনই তাঁহাদিগের অজ্ঞাতসারে তাহারা রূপক (Symbols) হইয়া উঠিল। ক্রমে জ্ঞানের উদ্‌বোধন হইতে তত্ত্বান্বেষণের তৃতীয় স্তর আসিল! তার পরে আবার তত্ত্বের সাহায্যে যাগযজ্ঞাদি কর্মকাণ্ডকে রূপক হিসাবে ব্যাখ্যা করিবার একটা সজ্ঞান চেষ্টা দেখা যায়—একেবারে পুরাণগুলি পর্যন্ত সে চেষ্টার দৌড়।

বেদের বিস্তর শাখা (schools) লোপ পাইয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে বিস্তর উপনিষদ্‌ও লোপ পাইয়াছে। ঋগ্‌বেদের অন্তর্গত ঐতরেয়ী শাখায় ঐতরেয় উপনিষদ্‌, কৌশীতকী শাখায় কৌশীতকী উপনিষদ্‌; সামবেদের অন্তর্গত জৈমিনীয় বা তলবকার শাখায় কেন বা তলবকার উপনিষদ্‌—এই রকম তিন বেদের ভিন্ন ভিন্ন শাখার অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদ্‌ আছে। এই রকম ১১টি উপনিষদ্‌ শঙ্করাচার্য ভাষ্য করিয়াছেন—এইগুলিই প্রামাণ্য উপনিষদ্‌। এ ছাড়া

অথর্ববেদের অন্তর্গত অনেক উপনিষদ্ আছে। এই উপনিষদ্গুলির সঙ্গে আর ত্রিবেদের ১১টি উপনিষদের তুলনা করিয়া পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ মনে করেন যে যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা উপনিষদের মূল হইলেও ক্ষত্রিয়রা ইহার তত্ত্বগুলিকে বেশি আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং তাহারাই অনেকগুলি উপনিষদের মন্ত্রদ্রষ্টা। ব্রহ্মবিদ্যার আর-এক নাম এইজন্য রাজবিদ্যা। ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়কে ইহাদের তত্ত্বসিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করিতে হয় বলিয়া বেদের কর্মকাণ্ডের স্তর (ritual স্তর) আর এই জ্ঞানকাণ্ডের স্তরের (philosophical স্তর) মাঝখানে একটা রূপককাণ্ডের স্তর (allegorical স্তর) দেখা দিয়াছিল। উপনিষদের মধ্যে এই স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। এই মত যে সমর্থনযোগ্য নয় তাহা বলিলাম। তবে উপনিষদের মধ্যে এই রূপকের স্তর যে দেখা যায়, ইহা সত্য।

কিন্তু এইখানেই উপনিষদের শেষ নয়। দেবেন্দ্রনাথ গোড়ায় শঙ্করাচার্য যে ১১খানি প্রাচীন উপনিষদের ভাষ্য করিয়াছেন, তাহাদেরি কথা জানিতেন। শেষে খোঁজ করিয়া দেখিলেন যে, ১৪৭ খানি উপনিষদ্ আছে। উপনিষদ্কে বেদান্ত বা বেদের শিরোভাগ বলা হয় বলিয়া বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায়েরা উপনিষদ্ নাম দিয়া গ্রন্থ প্রচার করিয়াছে এবং পরমাত্মার বদলে নিজেদের দেবতাদের উপাসনা প্রচার করিয়াছে। বৈষ্ণবদের উপনিষদ্ গোপালতাপনী উপনিষদ্, গোপীচন্দনোপনিষদ্ প্রভৃতি। শৈবদের উপনিষদ্ স্কন্দোপনিষদ্ ইত্যাদি। আকবরের সময়ে হিন্দুদের মুসলমান করিবার জন্য একটা উপনিষদ্ তৈরি হইয়াছিল, তাহার নাম ছিল আল্লোপনিষদ্।

এই উপনিষদ্ যখন বেদান্ত বা বেদের সার ভাগ, তখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে, বেদের অপরোক্ষানুভূতির বাক্যগুলি মন্থন করিয়া উপনিষদ্ তৈরি হয়। বেদের বিস্তর বাক্য যে উপনিষদে স্থান পাইয়াছে তাহা দেবেন্দ্রনাথই বেদ আলোচনা করিবার সময় দেখিতে পাইয়াছিলেন। "আশ্চর্য যে উপনিষদের যে-সকল মহাবাক্য তাহা সেই প্রাচীন বেদেরই মহাবাক্য"— এ তাঁহারি উক্তি। বেদ ও উপনিষদ্ তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা না করিলে উপনিষদের এ রহস্য তাঁহার কাছে চাপাই থাকিত।

অথচ, উপনিষদের মধ্যে রূপকের স্তর এবং বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের স্তর এই দুই মিলিয়া আছে, ইহা যদি সত্য হয়— তবে এ কথা মানিতেই হইবে যে, উপনিষদের মূল উৎসটি যেমনই নির্মল হৌক, তাহার সব ধারাটা কখনোই নির্মল

থাকে নাই। উপনিষদ্‌কার ঋষিদিগকে এক সময়ে বেদ হইতেই অপরোক্ষ অনুভূতির বাক্যগুলি বাছিয়া লইতে হইয়াছিল এবং সেই অনুভূতির ধারাটিকে বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য জনপদ ছাড়িয়া অরণ্যে যাইতে হইয়াছিল। অথচ যদি সেই উপনিষদেই খাদ মিশিয়া থাকে, তাহার ধারার মধ্যেই যদি মলিনতা ও আবিলতা জমিয়া থাকে, তবে উপনিষদের কোন্ অংশ বিশুদ্ধ আর কোন্ অংশ বিশুদ্ধ নয় তাহা কি কোনোকালেই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে না? ডয়সন স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন "All the principal Upanishads contain earlier and later elements side by side" সমস্ত প্রধান প্রধান উপনিষদেই গোড়াকার এবং শেষের দিককার জিনিস পাশাপাশি মিলিয়া মিশিয়া আছে। কিন্তু তাহাদের বিচ্ছেদ সাধন তো দরকার? ডয়সন মনে করেন, গদ্য উপনিষদ্‌গুলি— যথা বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয় প্রভৃতি সকলের চেয়ে প্রাচীন; তার পরে ছন্দোবদ্ধ উপনিষদ্‌গুলি, যেমন ঈশ, শ্বেতাশ্বতর ইত্যাদি; প্রশ্ন, মাণ্ডুক্য প্রভৃতি গদ্য উপনিষদ্ সকলের শেষে। এই ভাগ ঠিক ভাগ কি না হলপ পড়িয়া কোনো পণ্ডিতই বলিতে পারেন না। তবে ডয়সনের একটা ভ্রান্ত সংস্কার মাথার মধ্যে অত্যন্ত প্রবল থাকায় তিনি এই ভাগ খাড়া করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস, জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যতত্ত্ব অর্থাৎ শাঙ্কর দর্শনের অদ্বৈততত্ত্ব উপনিষদের গোড়াকার তত্ত্ব এবং মূল তত্ত্ব। তাহা যে একেবারেই ঠিক নয় তাহা যে-কোনো উপনিষদ্ ধরিয়াই দেখানো যাইতে পারে।

যাহাই হোক, ডয়সন যেটাকে উপনিষদের গোড়াকার তত্ত্ব এবং মূল তত্ত্ব মনে করেন, সেই তত্ত্বের কথা প্রথমে শঙ্করাচার্যের শারীরক মীমাংসা বেদান্ত-দর্শনে পড়িয়া ও পরে উপনিষদে পাইয়া উপনিষদেও দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি স্থাপন করিতে পারিলেন না। তিনি গোড়ায় বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদ্ পড়েন নাই— পড়েন নাই মানে হাতের কাছে পান নাই। শঙ্করের শারীরক মীমাংসা পড়িয়া তাহার জীবব্রহ্মের অভেদ সিদ্ধান্ত যে কোনো ধর্মেরই ভিত্তিভূমি হইতে পারে না, ইহা তিনি বেশ করিয়া বুঝিয়াছিলেন! কারণ ধর্মের প্রাণ "ঈশ্বরের সঙ্গে উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ।" শঙ্করের সিদ্ধান্তে সে সম্বন্ধের কোনো স্থানই থাকে না।* বেদান্ত-দর্শনের নির্বাণ মুক্তিতে ব্যক্তিত্বের কোনো স্ফূর্তি

* আমরা এখানে শাঙ্কর মত বা শাঙ্কর সিদ্ধান্ত বলিতে যে ভাবে এ দেশে শঙ্করের মত বা সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যাত ও প্রচলিত হইয়াছে, তাহারি কথা বলিতেছি। শঙ্করের মতের অন্য ব্যাখ্যাও আছে।

হইতেই পারে না। ব্যক্তিত্বের সাধনা সেখানে পঞ্চত্বের সাধনায় বিলীন হইবার উপক্রম করে। বেদান্ত-দর্শনের এই নির্বাণ মুক্তি সামাজিক জীবনকে কোথাও স্পর্শ করে না বলিয়াই রামমোহন রায় বৈদান্তিক হইয়াও বেদান্ত-দর্শনের শিক্ষাকে লর্ড আমহার্স্টের নিকটে লিখিত তাঁর চিঠিতে অমন নিন্দা করিয়াছিলেন। এই কৈবল্য মুক্তির আদর্শে ইচ্ছার স্বাধীনতা জিনিসটা একেবারেই চাপা পড়ে, সুতরাং নৈতিক জীবন (ethical life) আর জাগিতে পায় না। তাহা না জাগিলেই সমাজে স্থিতির আদর্শ একেবারে কায়েম হইয়া যায়, তাহাতে নড়াচড়ার কোনো লক্ষণ প্রকাশ পাইতে চায় না। সমস্ত দেশের পক্ষে এই বেদান্তের কৈবল্য মুক্তির আদর্শের প্রভাব কাটাইয়া উঠার বিষম প্রয়োজন হইয়াছিল। সমস্ত দেশের হইয়া সেই বন্ধন মোচনের কাজে যদি দেবেন্দ্রনাথ না লাগিতেন তবে মুক্তির ঐ ভয়ংকর স্থিতির আদর্শ (static conception) কোনো দিন ঘুচিত না। বিশ্বের, সমস্ত মনুষ্যজাতির এবং মানবাত্মার মুক্তির ক্রমিক উন্নতির আদর্শ (dynamic conception) আর দেখা দিত না।

যখন বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদ্ পাইয়া তাহাতে তিনি দেখিলেন, সোঽহমস্মি, তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্য, তখন উপনিষদেও শাঙ্কর দর্শনের সিদ্ধান্ত দেখিয়া উপনিষদ্ সম্বন্ধে তিনি নিরাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, বেদ ছাড়িয়া তিনি প্রামাণ্য এগারোটি উপনিষদের উপরে ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি স্থাপন করিবেন। কিন্তু এ কৈবল্য মুক্তির আদর্শ তো কখনোই ধর্মের আদর্শ হইতে পারে না—ইহাতে উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ থাকে কোথায়? ইহাতে ব্যক্তিত্বের স্ফূর্তি জাগে কোথায়? সুতরাং উপনিষদ্-বেদান্তের এই একটি প্রধান তত্ত্বের অংশ দেবেন্দ্রনাথকে একেবারেই বাদ দিতে হইল। এ যে বাদ, এক হিসাবে বেদান্তের, অন্তত্তপক্ষে শাঙ্কর বেদান্ত-দর্শনের একটি মূল তত্ত্বকেই বাদ। সুতরাং যাঁহারা মনে করেন যে, দেবেন্দ্রনাথ খৃস্টানী ভাবে শাস্ত্রকে এক সময়ে আগাগোড়া অক্ষরে অক্ষরে অভ্রান্ত মনে করিতেন, (যাহা কখনোই কোনো হিন্দু মনে করে নাই), তার পরে দু-একটা জায়গায় ভুলভ্রান্তি দেখিয়া একেবারে গোটা শাস্ত্রটাই বাদ দিয়া তাহার জায়গায় স্বরচিত শাস্ত্র চালাইলেন, তাঁহাদের সে ধারণা একেবারেই মূলহীন। এ কথা ঠিক যে, আমাদের দেশে কোনো সম্প্রদায় সর্বাংশে বেদকে আপ্ত বাক্য বলে নাই ; বেদের মধ্যে যাহা অপরোক্ষানুভূতির বাক্য তাহাকেই আপ্ত বলিয়াছে। কিন্তু সেই-সকল বাক্যের কোনো কোনোটা সম্বন্ধেই যদি সংশয় জাগে, যদি তাহাদিগকে

সর্বাংশে গ্রহণ না করা যায়, তবে শাস্ত্রের উপরে ধর্মের ভিত্তি কেমন করিয়া স্থাপন করা যায়? জীবব্রহ্মের অদ্বৈততত্ত্ব তো একটা উড়ো বাজে তত্ত্ব নয়— শাঙ্কর দর্শনের ভিত্তিই যে ঐ তত্ত্বের উপরে। সেই তত্ত্বকে লইতে না পারিলে এ কথা আর বলা চলে না যে, উপনিষদে বা বেদান্তেই ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি।

সকল উপনিষদের মধ্যে নির্গুণ ও সগুণ (Transcendent ও Immanent) ব্রহ্মতত্ত্বের এই দুই দিকই প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তু শঙ্করাচার্য উপনিষদের অর্থকে জোর করিয়া নির্গুণবাদের দিকে টানিয়াছেন। অথচ বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রে উপনিষদের এই দুই তত্ত্বেরই সমন্বয় দেখা যায়; সেইজন্য কোনো কোনো পণ্ডিতের মত এই যে, ঐ ব্রহ্মসূত্রই উপনিষদের যথার্থ ভাষ্য— শাঙ্কর ভাষ্য যথার্থ ভাষ্য নয়। দেবেন্দ্রনাথ প্রধানভাবে শাঙ্কর ভাষ্যের সাহায্যে উপনিষদ্‌কে বুঝিতে গিয়াছিলেন বলিয়া উপনিষদের মধ্যে শাঙ্কর মত দেখিবামাত্র তাহাকে আর গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এ মত গ্রহণ করিলে যে ব্যক্তিত্ব ফোটে না, সমাজ-ধর্ম যায়, নৈতিক জীবন গড়ে না ইত্যাদি, তাহা বুঝিয়াই তিনি এ মতটিকে মধ্যযুগীয় ও একালের অনুপযোগী স্থির করিয়া বাদ দেওয়া প্রয়োজন মনে করিলেন। সুতরাং তখন উপনিষদের মধ্যে কোন্‌টা তৎকালের এবং কোন্‌টা নিত্যকালের তাহার একটা বাছাই দরকার বলিয়া তিনি অনুভব করিলেন। অয়কেনের ভাষায় বলিতে গেলে, তিনি খোঁজ করিলেন, উপনিষদের মধ্যে "amid all that was peculiar to their own age, there was some element in them that transcended time, and could be transmitted to all times," সেই কালের সকল বিশিষ্ট বস্তুর মধ্যে এমন কোনো বস্তু ছিল যাহা কালকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে, যাহা সর্বকালের বস্তু হইতে পারে। সে বস্তু কোন্ বস্তু? উপনিষদের কোন্ তত্ত্ব? কোন্ পত্তনভূমিতে ব্রাহ্মধর্মের আশ্রয় মিলিতে পারে? দেবেন্দ্রনাথ এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন, "আত্ম-প্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়" ব্রাহ্মধর্মের পত্তনভূমি। এ কথাটি তাঁহার স্বরচিত কথা নয়, ইহাও বেদান্তেরই কথা— "জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধ-সত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।" বিশুদ্ধহৃদয় ব্যক্তি ধ্যানযুক্ত হইয়া নির্মল জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে দেখেন। এই একটি বেদান্ত বাক্য ছাড়া আর-একটি বাক্য তিনি স্বরচিত জীবনচরিতে উদ্ধার করিয়াছেন: —"হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তঃ: হৃদয়ের সহিত নিঃসংশয় বুদ্ধির যোগে মনের আলোচনা দ্বারা, ঈশ্বর অভিপ্রকাশিত হয়েন।" আত্মপ্রত্যয় কথাটাও বেদান্তের কথা। "একাত্ম-

প্রত্যয়সারং।" "এক আত্মপ্রত্যয়ই তাঁহার অস্তিত্বের প্রতি প্রমাণ হইয়াছে।" ধর্মের পত্তনভূমি কেবল আত্মপ্রত্যয় এ কথা তিনি বলেন নাই— অনেকে যদিও সেই ভুল ধারণার বশবর্তী হইয়া তাঁহার সমালোচনা করিতে বসিয়া যান। ধর্মের পত্তনভূমি তিনটি জিনিস একযোগে— ১. আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞান বা নিঃসংশয় জ্ঞান বা নির্মল জ্ঞান, ২. বিশুদ্ধসত্ত্ব বা বিশুদ্ধহৃদয়, ৩. মনের আলোচনা বা ধ্যান-ধারণা। সুতরাং এখানে আত্মপ্রত্যয় কথাটা যে পাশ্চাত্ত্য Intuition অর্থে তিনি ব্যবহার করেন নাই, তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। তিনি বলিতেছেন, "পূর্বকার যে ঋষি জ্ঞানপ্রসাদে ধ্যানযোগে আপনার বিশুদ্ধ হৃদয়ে পূর্ণব্রহ্মকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারই পরীক্ষিত কথা এই যে— জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধ-সত্ত্বস্ততস্তুতং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ। আমারও হৃদয়ের পরীক্ষার সঙ্গে এই কথার মিল হইল, অতএব আমি এই কথা গ্রহণ করিলাম।" সুতরাং 'আত্ম-প্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধহৃদয়' কথাটা এই 'জ্ঞানপ্রসাদেন' প্রভৃতি বেদান্ত-বাক্যের অবিকল অনুবাদ বলিলেই হয়। এই তত্ত্বটিকেই তিনি উপনিষদের সার বা নিত্যতত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাহারি উপরে ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন— পাশ্চাত্ত্য Intuition বাদের উপরে নয়। তবে এখানে বলা দরকার যে, ইহার পরে তিনি 'আত্মপ্রত্যয়ের' সঙ্গে 'সহজ জ্ঞান' কথাটা আনিয়া ফেলিয়া আত্মপ্রত্যয়ের অর্থের কিছু গোলযোগ করিয়াছেন— পরিশিষ্টভাগে তাহার আলোচনা করা হইয়াছে।

জ্ঞান নিঃসংশয় হওয়া চাই, হৃদয় বিশুদ্ধ হওয়া চাই, তার পরে ধ্যান-যোগে ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া যে উপলব্ধি হইবে— সেই উপলব্ধির সঙ্গে শাস্ত্রের যে-সমস্ত উপলব্ধির কথার সুর মিলিবে, সেই সেই বাক্যই গ্রাহ্য। এমন নিকষে উপনিষদের বাক্যগুলিকে কষিলে তবেই অয়কেনের ভাষায় বলিতে গেলে আমাদের সেই উপলব্ধি "By distinguishing between perishable and imperishable, that which grows old and that which is always young, it seeks to build up...a realm of truth, to which, as to a steadfast star, we may attach our own life,—" যাহা নশ্বর এবং যাহা অবিনশ্বর, যাহা প্রাচীন এবং যাহা চিরনবীন, তাহার মধ্যে পার্থক্য রচিয়া এমন একটি সত্যের ভূমি তৈরি করিয়া তোলে, যে ভূমিটিতে ধ্রুবতারার মতো আমরা আমাদের জীবনকে সংলগ্ন করিতে পারি। তিনি ছান্দোগ্য উপনিষদে পড়িলেন যে, যাহারা গ্রামে থাকিয়া যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করে, তাহারা

মৃত্যুর পরে ধূমকে পায়, ধূম হইতে রাত্রিকে, রাত্রি হইতে কৃষ্ণপক্ষকে, কৃষ্ণপক্ষ হইতে দক্ষিণায়নের মাসগুলিকে, দক্ষিণায়নের মাসগুলি হইতে পিতৃলোককে, পিতৃলোক হইতে আকাশকে, আকাশ হইতে চন্দ্রলোককে পায়, এবং সেই চন্দ্রলোকে পুণ্যফল ভোগ করিয়া আবার এই পৃথিবীলোকে জন্মগ্রহণ করিবার জন্য চন্দ্রলোক হইতে বিচ্যুত হইয়া আকাশকে পায়, আকাশ হইতে বায়ুকে পায়, বায়ু হইতে ধূম হয়, ধূম হইয়া বাষ্প হয়, বাষ্প হইয়া মেঘ হয়, মেঘ হইয়া বর্ষিত হয়— তাহারা এখানে ব্রীহি, যব, ওষধি, বনস্পতি, তিল মাষ হইয়া উৎপন্ন হয়। সেই ব্রীহি, যব, তিল মাষাদি অন্ন যে যে ভক্ষণ করে সেই স্ত্রী পুরুষ হইতে তাহারা এখানে জীব হইয়া জন্মগ্রহণ করে। এটা স্পষ্টই উপনিষদের নশ্বর অংশ। তখনকার কালের অবৈজ্ঞানিক মানুষের অসংযত কল্পনার বাক্য। বাইবেলে যেমন আছে যে, ছয় দিনে ঈশ্বর জগৎসৃষ্টি করিয়াছিলেন— এও তেমনিতর অদ্ভুত কথা। সুতরাং উপনিষদের ধর্মতত্ত্বে (Theology), জগৎতত্ত্বে (Cosmology), মনস্তত্ত্বে (Psychology), এবং পরলোকতত্ত্বে (Eschatology), সকল তত্ত্বে এমনিতর যেগুলি অনিত্য ও অসার অংশ সেগুলিকে নিত্য ও সার অংশ হইতে পৃথক করা অত্যন্ত প্রয়োজন। ধর্মতত্ত্বে, যে-সকল প্রতীকের (symbol) সাহায্যে অনেক সময় ব্রহ্মের ধারণা করা হইত, যেমন প্রাণ বা বায়ু বা আকাশ প্রভৃতি, বা শব্দে যেমন ওঁ, এখন সে-সকল প্রতীকের কোনো অর্থই নাই। সে-সকল গূঢ় সাধনতন্ত্র এখন আমাদের একেবারেই অজানা। জগৎতত্ত্বে এবং মনস্তত্ত্বে তেমনি বিস্তর ব্যাপার আছে, যাহা দুর্বোধ এবং যাহাকে মানা শক্ত। অর্থাৎ উপনিষদ্‌ শাস্ত্র হইলেও তাহাতে যখন এ-সকল তত্ত্ব আছে, তখন যাহা আছে তাহাই খাঁটি এবং ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত বাক্য এমন কথা মনে করিলে তাহাকে জীবনের জিনিস করা যায় না। তাহাকে মূঢ়তার স্বর্গলোকে তুলিয়া রাখিতে হয়।

এইরূপে "আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধহৃদয়ের" দ্বারা যখন উপনিষদের নিত্য ও অনিত্য অংশের পার্থক্য সাধন হইল, তখন তাঁহার মনে হইল যে, ব্রাহ্মধর্মের এমন একটি বীজমন্ত্র চাই, যে বীজমন্ত্র ব্রাহ্মদের ঐক্যস্থল হইতে পারে। ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারঃ— ঋষিরা মন্ত্রকে দেখেন। সমস্ত বেদের সার মন্ত্র গায়ত্রী মন্ত্র— বেদের মাতৃস্বরূপা। সে মন্ত্র দেবেন্দ্রনাথের চিরজীবনের মন্ত্র হইলেও তাহা ব্রাহ্মধর্মের বীজমন্ত্র হইতে পারে না। এমন একটি মন্ত্র চাই— যাহাতে এই ধর্মের সমস্ত মত ও বিশ্বাস, সাধনপ্রণালী, সবটা এক সূত্রে গাঁথা পড়ে। সেটা শুধু creed-এর

মতো যদি কতগুলা বিশ্বাসের শুষ্ক তালিকা হয়, তবে তাহা আর মন্ত্র হয় না— মন্ত্রের গাম্ভীর্য ও গভীরতা তাহাতে থাকে না। মন্ত্র যে মন্তব্য— বাঁধা creedকে তো শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন করার উপায় নাই। মন্ত্র যখন চাই, তখন তাহাকে দেখা চাই। সেইজন্য তিনি লিখিতেছেন, "আমি আমার হৃদয় ঈশ্বরের প্রতি পাতিয়া দিলাম; বলিলাম, 'আমার আঁধার হৃদয় আলো কর।' তাঁহার কৃপায় তখনি আমার হৃদয় আলোকিত হইল। সেই আলোকের সাহায্যে আমি ব্রাহ্ম-ধর্মের একটি বীজ দেখিতে পাইলাম। অমনি একটি পেন্‌সিল দিয়া সম্মুখের কাগজখণ্ডে তাহা লিখিলাম, এবং সেই কাগজ তখনি একটা বাক্সে ফেলিয়া দিলাম, ও সেই বাক্স বন্ধ করিয়া চাবি দিয়া রাখিলাম। তখন ১৭৭০ শক; আমার বয়স ৩১ বৎসর।"

যেমন ভগবানের "আদেশ" শ্রবণ, যেমন তাঁহাকে দর্শন প্রভৃতি ব্যাপারে অধ্যাত্মবোধের আলোকে সমস্ত চৈতন্যের প্রদীপ্ত অবস্থায় সাধকদের জীবনে ঘটে, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে, তেমনি আর-একটি জিনিসও ঘটে দেখা যায়। কখনো কখনো কোনো কোনো সাধক ভগবৎ প্রেরণায় স্বতোলিখিত রচনা (Automatic writing) রচিয়াছেন, এমনও দেখা যায়। কবিদের জীবনে শোনা যায় যে তাঁহাদের রচনা অনেক সময় স্বতোলিখিত হয়— কে যেন তাঁহাদের হাত হইতে কলমটা কাড়িয়া লইয়া তাঁহাদের হইয়া লিখিয়া দেয়। এমনিতর মগ্নচৈতন্যের কার্য (subliminal aotion) কবিদের জীবনে ঘটে বটে। কবি ব্লেক তো বলিতেন যে, তাঁহার রচনাগুলি তাঁহার নয়— সে তাঁহার স্বর্গীয় বন্ধুদের। ঠিক সেই একই অবস্থায় সাধকদের হাত হইতেও স্বতোলিখিত রচনা বাহির হইয়া পড়ে। ম্যাডাম গেয়ো, সেণ্ট ক্যাথারিন, জেকব বইমে প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য সাধ্বী ও সাধুদের জীবনে তাহার সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে। ম্যাডাম গেঁয়ো এমন কথা বলিয়াছেন যে, লিখিবার সময় শুধু আঙুলের সঞ্চালন ছাড়া আর যে তিনি লিখিতেছেন, তাহা তিনি একেবারেই জানিতে পারেন নাই। কি আশ্চর্য! দেবেন্দ্রনাথের এই বীজমন্ত্র রচনাও তেমনি স্বতোলিখিত রচনা।

অথচ এটাকে অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক মনে করার কোনোই হেতু নাই। বীজমন্ত্রে তিনি যে-সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার বহুদিনের চিন্তার বিষয়। সেই কথাগুলি তাঁহার চিত্তের মগ্ন-চৈতন্যের স্তরে জমিতেছিল, এক সময়ে প্রেরণার আঘাতে উচ্ছ্বসিত হইয়া অখণ্ড আকারে বাহির হইয়া দেখা

দিল। কবির স্বতোলিখিত কাব্যরচনাও ঠিক এই-জাতীয়। তাহাও কোনো অলৌকিক কাণ্ড নয়।

১৮৪৯ সালে, অর্থাৎ বীজমন্ত্র লিখিবার এক বছর পরে তিনি বাক্স হইতে বীজমন্ত্রটি খুলিয়া আশ্চর্য হইয়া দেখিলেন যে, তাহা কেমন সম্পূর্ণ ও সারগর্ভ হইয়াছে। তখন দু-একটা শব্দ মাত্র তাঁহাকে বদল করিতে হইয়াছিল। দ্বিতীয় মন্ত্রে 'আনন্দং' ও 'বিচিত্র শক্তিমৎ' শব্দের বদলে 'অনন্তং' ও 'সর্বশক্তিবৎ' শব্দ বসানো হয়; দ্বিতীয় মন্ত্রের শেষে "ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমং" শব্দ যোগ করা হয়। তৃতীয় মন্ত্রে 'সুখং' শব্দের বদলে 'শুভং' শব্দ বসানো হয়। ইহার আট বছর পরে, ১৮৫৭ সালে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মাথায় সম্পূর্ণ বীজমন্ত্রটি প্রকাশিত হইতে থাকে এবং আজও পর্যন্ত হইতেছে। সম্পূর্ণ বীজমন্ত্রটি এই: ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ তদিদং সর্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্বব্যাপিসর্বনিয়ন্তৃসর্বাশ্রয় সর্ববিৎ সর্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্যপ্রিয়কার্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।" "পূর্বে কেবল এক পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন; অন্য আর কিছুই ছিল না; তিনি এই সমুদায় সৃষ্টি করিলেন। তিনি জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, নিত্য, নিয়ন্তা, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, সর্বাশ্রয়, নিরবয়ব, নির্বিকার, একমাত্র, অদ্বিতীয়, সর্বশক্তিমান, স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ; কাহারও সহিত তাঁহার উপমা হয় না। একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়। তাঁহাকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।" তিনি লিখিয়াছেন, "যদিও ব্রাহ্মসমাজ বহুধাভিন্ন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ঈশ্বরপ্রসাদে এই বীজমন্ত্র সকল ব্রাহ্মেরই একমাত্র ঐক্যস্থল রহিয়াছে।"

ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থও এমনি আর-একটি স্বতোলিখিত রচনা। তাহা তিন ঘণ্টার মধ্যে তৈরি হইয়াছিল; তিনি যখন অনুভব করিলেন যে, উপনিষদের নিত্য অংশ, যাহা তাঁহার আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত হৃদয়ে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই যথার্থ শাস্ত্র ও তাহাই ব্রাহ্মদের অবলম্বনীয়, তখন অক্ষয়কুমার দত্তকে বলিলেন, 'তুমি কাগজ কলম লইয়া ব'সো এবং আমি যাহা বলি তাহা লিখিতে থাক।' তখনো তিনি একাগ্রচিত্ত হইয়া ঈশ্বরের দিকে হৃদয় পাতিয়া দিলেন। উপনিষদের যে আধ্যাত্মিক সত্যগুলি তাঁহার হৃদয়ে দেখা দিতে লাগিল, 'নদীর স্রোতের' মতো সতেজে তাহা তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন—আর

অক্ষয়কুমার লিখিয়া যাইতে লাগিলেন। নিঃসন্দেহ, এখানেও উপনিষদের এই নিত্য বাণীগুলি তাঁহার বহুকালের অধ্যাত্ম-অভিজ্ঞতার দ্বারা চিহ্নিত হইয়া তাঁহার মনের মধ্যে সঞ্চিত হইয়াছিল। বালির নীচে ঝরণার ধারা যেমন বহিয়া চলে, তেমনি জাগ্রৎচৈতন্যের নীচে এই একটি ধারা বহিয়া চলিতেছিল। হঠাৎ একদিন সেই গভীরতল হইতে ঝরণার উৎসেরই মতো উচ্ছ্বলিত হইয়া যখন উঠিল, তখন তাহাকে বড়ো আশ্চর্য বোধ হইল। আমরা পুর্বেই দেখিয়াছি যে, উপনিষদ্ পাইবার আগে যখন তিনি সবেমাত্র অধ্যাত্মবোধে উদ্‌বোধিত হইয়াছিলেন, তখনই তাঁহার নিজের মনের আলোচনা দ্বারা যে-সকল সিদ্ধান্তে তিনি আসিয়া পৌঁছিলেন, সে-সব সিদ্ধান্ত উপনিষদেরই সিদ্ধান্ত! "পরে উপনিষদ্ পাইয়া দেখিলেন, তাহার বাক্যগুলি তাঁহারি হৃদয়ের প্রতিধ্বনি।" সুতরাং উপনিষদের এই বাণীগুলি তাঁহার অস্থিমজ্জার সঙ্গে মিশিয়াছিল।

শাঙ্কর দর্শনে ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বলা হইয়া থাকে। শাঙ্কর মতে জ্ঞানই আত্মা। এই Impersonal জ্ঞানে পুজা হইতে পারে না বলিয়া দেবেন্দ্রনাথ শাঙ্কর দর্শনের মতকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। দেবেন্দ্রনাথের ব্রহ্ম একেবারে personal God বা সবিশেষ পুরুষ— তাঁহার সঙ্গে আত্মার অব্যবহিত যোগ। তাঁহার অনির্বচনীয় স্বরূপ বুদ্ধির দ্বারা বুঝা যায় না— সেখানে বাক্য মনের সহিত তাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে। কিন্তু তাঁহার আনন্দ, তাঁহার প্রেম যখন ভক্তের প্রেমের সঙ্গে মেলে, তখনই তাঁহাকে না জানিয়াও ভক্ত জানিতে পারেন। এই আনন্দের সাধনাই দেবেন্দ্রনাথের বিশেষত্ব। এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 'ব্রাহ্ম-ধর্মে' এই দিকটাই গোড়ায় প্রকাশ পাইয়াছে। ব্রহ্ম যে আনন্দময়— তাঁহার আনন্দ হইতেই যে সর্বভূতের উৎপত্তি ও স্থিতি এবং সেই আনন্দেই তাহাদের লয়— এই বাক্যদ্বারাই ব্রাহ্মধর্মের আরম্ভ।

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।

যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥ ইত্যাদি।

ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ ষোলটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথমে দেবেন্দ্রনাথ কোনো ভাগ করেন নাই। যেমন যেমন যে মন্ত্রগুলি আসিয়াছে তাহা বলিয়া গিয়াছেন এবং অক্ষয়কুমার দত্ত লিখিয়া লইয়াছেন। পরে বিভাগ করিয়াছেন। প্রথম অধ্যায় গেল আনন্দ অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে— সৃষ্টি যে মায়া বা মিথ্যা নয় এবং সৃষ্টি যে আপনা আপনি কিছু হয় নাই—এ যে তাঁহার ইচ্ছারি সৃষ্টি— এই তত্ত্বের মন্ত্রগুলি আসিয়াছে। সতপোঽতপ্যত— তিনি আলোচনা করিলেন, আলোচনা করিয়া সমস্ত সৃষ্টি করিলেন। অতএব দ্বিতীয় অধ্যায় হইল সৃষ্টিতত্ত্বের অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়ে— সৃষ্টিতে স্রষ্টার স্বরূপতত্ত্ব বলা হইয়াছে। তিনি স্থূল নহেন, অণু নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন ইত্যাদি এবং তাঁহারি শাসনে ও নিয়মে যে সমস্ত জগৎ চলিতেছে, এই কথা বলা হইয়াছে। এ জগৎ তাঁহারি প্রাণ হইতে নিঃসৃত।

চতুর্থ অধ্যায়ে--ব্রহ্মের এই স্বরূপ যে অব্যক্ত ও বর্ণনার অতীত, সেই কথা আসিয়াছে। নাহংমন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ— ব্রহ্মকে সুন্দররূপে জানিয়াছি এমন মনে করি না। জানি না এমনও নহে। এবং পঞ্চম অধ্যায়ে এই কথাটারই জের চলিয়াছে যে, সকল আপাতঃ-বিরোধ ব্রহ্মের মধ্যে অবিরুদ্ধ। তিনি চলেন, তিনি চলেন না— তিনি অকায় অব্রণ ; অথচ তিনিই কবি মনীষী ও বিধাতা।

ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে—সাধনার তত্ত্ব ব্যক্ত হইয়াছে। এ পর্যন্ত গেল জগৎতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব, স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির সম্বন্ধের কথা। এবার আসিল জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্বন্ধের কথা। তপস্যার দ্বারা তাঁহাকে জানিতে হইবে। আত্মরূপ হিরণ্ময় কোষে ধ্যানের দ্বারা তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়। জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ। বিশুদ্ধহৃদয় ব্যক্তি ধ্যানযুক্ত হইয়া নির্মল জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে দেখেন। হৃদা মনীষা মনসাভিকপ্তঃ— হৃদয়ের সহিত নিঃসংশয় বুদ্ধির যোগে মনের আলোচনা দ্বারা ঈশ্বর অভিপ্রকাশিত হন। শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ। শর যেমন তাহার লক্ষ্যকে বিদ্ধ করে তেমনি ব্রহ্মকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহাতে তন্ময় হইতে হইবে।

অষ্টম অধ্যায়ে—ব্রহ্মের Immanence—অর্থাৎ তিনি যে বিশ্বের সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন, এই তত্ত্বের মন্ত্রগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ ব্রহ্মের স্বরূপ অব্যক্ত মাত্র হইলে জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্বন্ধ দাঁড়ায় কেমন করিয়া? তাঁহাকে "পশ্যতে ধ্যায়মানঃ"— ধ্যায়মান হইয়া দেখার কথা আসে কেমন করিয়া? তিনি নিশ্চয়ই কেবলমাত্র বিশ্বের অতীত নন, বিশ্বের ভিতরে আছেন। সর্বত্র তাঁহার চক্ষু, তাঁহার মুখ, তাঁহার বাহু, তাঁহার পদ। একংরূপং বহুধা যঃ করোতি —এক রূপকে তিনি বহু প্রকার করেন— ইত্যাদি।

নবম অধ্যায়ে—ইহা হইতে এক পদক্ষেপ বেশি অগ্রসর—Personal God, ঈশ্বর যে পুরুষ—এই তত্ত্বের উপনিষদ্‌-বাক্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। দুই পক্ষী এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া আছেন, তাঁহারা একত্র থাকেন এবং পরস্পর পরস্পরের সখা। তদেতৎপ্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎসর্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা। তিনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, আর আর সকল হইতে প্রিয়—অন্তরতর এই পরমাত্মা। মহান্‌প্রভুর্বৈপুরুষঃ। এই মহান্‌ পুরুষ সকলের প্রভু।

দশম অধ্যায়ে—অধ্যাত্মযোগের কথা, communion-এর কথা। এই অধ্যায়েই গায়ত্রী মন্ত্রটি আছে।

একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়ে—উপাসনার কথা। যমেবৈষবৃণুতে তেন লভ্যঃ। যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করে সেই তাঁহাকে লাভ করে। এই দ্বাদশ অধ্যায়ে অসতো মা সদ্‌গময়—অসত্য হইতে সত্যে লইয়া যাও, সেই প্রার্থনাটি আছে।

ত্রয়োদশ, চতুর্দশ পঞ্চদশ ও ষোড়শ অধ্যায়ে—পাপ হইতে বিরত না হইলে এবং বিশুদ্ধহৃদয় না হইলে যে ব্রহ্মের উপলব্ধি হয় না, এই ভাবের অনেকগুলি বাক্য আছে। ইহাতে কতকটা যেন নীতিমার্গের কথা আসিয়াছে।

তবেই দেখা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থের গোড়াকার দিকে জ্ঞানযোগের কথা, মাঝের দিকে ভক্তিযোগের কথা, শেষের দিকে কর্মযোগের কথা। গোড়ায় আরাধনা, মাঝে ধ্যান ও উপাসনা ও সকলের শেষে চিত্তশুদ্ধির কথা, ধর্মনীতির কথা।

দেবেন্দ্রনাথ এই ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "ইহা আমার দুর্বল বুদ্ধির সিদ্ধান্ত নহে, ইহা মোহ-বাক্যও নহে, প্রলাপ-বাক্যও নহে। ইহা আমার হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত তাঁহারই প্রেরিত সত্য।...আমার কেবল এক মনের টানে তাঁহার পদধূলি লাভ করিলাম, এবং সেই ধূলি আমার নেত্রের অঞ্জন হইল।...

"এইরূপে ব্রহ্ম-বিষয়ক উপনিষদ্‌, ব্রাহ্মী উপনিষদ্‌, প্রস্তুত হইল। এইজন্য ব্রাহ্মধর্মের প্রথম খণ্ডের শেষে লেখা আছে: উক্তা ত উপনিষৎ; ব্রাহ্মীং বাব ত উপনিষদমব্রূমেত্যুপনিষৎ।' তোমার নিকটে উপনিষদ্‌ উক্ত হইল; ব্রহ্মসম্বন্ধীয় উপনিষদ্‌ই আমি তোমাকে বলিয়াছি। ইহাই উপনিষৎ, ইহাই উপনিষৎ।"

দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থকে উপনিষদ্‌ বলিলেও, অনেকে বলেন যে, তিনি প্রাচীন শাস্ত্র ত্যাগ করিয়া আপনার 'সঙ্কলিত' ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থকে প্রামাণ্যশাস্ত্রের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যেহেতু তিনি উপনিষদ্‌ আগাগোড়া

গ্রহণ করেন নাই, সেই হেতু তাঁহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ। বেদ, উপনিষদ্ যে তিনি ত্যাগ করেন নাই, তাহা তিনি নিজেই লিখিয়াছেন—"ইহা কেহ মনে করিবেন না যে, আমাদের বেদ ও উপনিষদ্‌কে আমি একবারে পরিত্যাগ করিলাম, ইহার সঙ্গে আমাদের আর কোন সংস্রব রহিল না। এই বেদ ও উপনিষদের যে সকল সার সত্য, তাহা লইয়াই 'ব্রাহ্মধর্ম' সংগঠিত হইল, এবং আমার হৃদয় তাহারই সাক্ষী হইল। বেদরূপ কল্পতরুর অগ্র শাখার ফল এই ব্রাহ্মধর্ম। বেদের শিরোভাগ উপনিষদ্, এবং উপনিষদের শিরোভাগ ব্রাহ্মী উপনিষদ্, ব্রহ্মবিষয়ক উপনিষদ্।" সমস্ত উপনিষদ্‌কে যে কেন একালের ধর্মের আশ্রয়স্বরূপ শাস্ত্র করা যায় না, তাহা আলোচনা করিয়াছি। উপনিষদে সকল রকমের মতবাদের অদ্ভুত সমাবেশ দেখা যায়। তাহাতে আইডিয়ালিজ্‌ম্ আছে, প্যান্‌থীজ্‌ম্ আছে, থীজ্‌ম্ আছে, ডীজ্‌ম্ আছে, আবার সাংখ্যের দ্বৈতবাদও আছে—কোন্ 'ইজ্‌ম্' যে নাই তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না। ডয়সনের 'উপনিষদ্‌তত্ত্ব' গ্রন্থ পড়িলেই উপনিষদের এই মতবাদের স্তরগুলি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইবে। এমন অবস্থায় সমস্ত উপনিষদ্ কি করিয়া একটা নূতন ধর্মের ভিত্তি হয়? অথচ এ ধর্মের মূল উৎস যে উপনিষদ্, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করার উপায় নাই। ব্রহ্মতত্ত্ব কিছু দেবেন্দ্রনাথ নিজের কল্পনা হইতে গড়ান নাই—তাহা উপনিষদ্ হইতেই পাইয়াছেন। উপনিষদের সেই ব্রহ্মতত্ত্বের থীজ্‌ম্-অংশ লইয়া যে ধর্ম গড়িয়া চলিল, তাহারই নাম ব্রাহ্মধর্ম। সুতরাং এ ধর্মের শাস্ত্র উপনিষদের সেই অংশই হইবে এবং তাহার নাম ব্রাহ্মী উপনিষদ্‌ই হইবে। ইহাতে শাস্ত্র-প্রামাণ্য যে কোথায় অস্বীকার করা হইল, তাহা বুঝা যায় না। আগাগোড়া শাস্ত্রে যাহা লেখা আছে, তাহাকে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে গেলে মানুষের বুদ্ধি-বিচারকে একেবারে বিসর্জন দিতে হয়—একালে তাহা কোনোমতেই সম্ভাবনীয় নয়। ইউরোপেও বাইবেলকে অভ্রান্ত শাস্ত্র বলিয়া মানিবার কাল আর নাই। এখন রীতিমত বিশ্লেষণ করিয়া বাইবেলের বিচার চলিতেছে এবং একালের জ্ঞানের উপযোগী করিয়া বাইবেল-তত্ত্বসকলের ব্যাখ্যাও চলিতেছে। এই criticism বা বিচার ও interpretation বা ব্যাখ্যার সাহায্যেই শাস্ত্রের অনিত্য ও নিত্য অংশের ভেদ সাধন করা যায় ও শাস্ত্র সর্বকালের ব্যবহারের উপযোগী হয়। ইহার জন্য আবার নূতন নূতন ঋষির প্রয়োজন হয়। এক শত বছর আগে বাইবেল-তত্ত্ব যাহা ছিল, এখন তাহা নাই। চ্যানিং, থিয়োডোর পার্কার প্রভৃতি পশ্চিমের ঋষিদের দ্বারা যেমন তাহা নূতন করিয়া ব্যাখ্যাত

হইয়াছে, তেমনি এ দেশে রামমোহন রায়ও তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার *Precepts of Jesus* 'ব্রাহ্মধর্মে'র মতোই বাইবেলের সংকলন গ্রন্থ। বাইবেলের অনেক জটিল মতবাদ (dogmas) সেই গ্রন্থে বাদ পড়ায় তাঁহাকে এ দেশের খৃস্টান সমাজ তীব্র আক্রমণ করে—সেইজন্য তাঁহাকে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়া তিনটি আবেদন বা *Appeals to Christian Public* বাহির করিতে হয়। রামমোহন রায়ের মতো বাইবেল গ্রন্থের সংকলন পশ্চিমে কেহ বাহির না করিলেও, বাইবেলকে গোটা ভাবে গ্রহণ করিতে অনেকেরই আপত্তি আছে এবং সে আপত্তি কিছু অসংগত নয়। এখন তো Higher criticism-এ বাইবেলকে পণ্ডিতসমাজ ঐতিহাসিক প্রণালীতে দেখিতে গিয়া তাহার মধ্যে কত জাতির ও কত কালের হাতের চিহ্ন দেখিতে পাইতেছেন। সে যে এককালে স্বর্গ হইতে অখণ্ড ভাবে ভূতলে নামিয়াছিল, সে বিশ্বাস তো প্রতিদিনই খসিয়া যাইতেছে। ধর্মের এই বিবর্তনই তো দেখিবার জিনিস, সে যে কেমন করিয়া প্রথমে জাতিগত (Ethnic) গণ্ডী পার হইয়া এবং অবশেষে মতগত (credal) গণ্ডী পার হইয়া একেবারে বিশ্বমানবের ধন (universal) হইয়া বসে ইহাই তো দেখিবার বিষয়। খৃস্টান ধর্ম যে ইহুদী জাতির গণ্ডী ছাড়িয়া গ্রীকো-রোমান ভূমিতে আসিয়া পড়িল এবং ক্রমে ইন্দোজার্মান জাতির ভিতর দিয়া উত্তরোত্তর বিকাশমান হইয়া চলিল, ইহাতে তাহার শাস্ত্র ও শাস্ত্রব্যাখ্যায় যে অপূর্ব বৈচিত্র্য দেখা গিয়াছে তাহাতেই তো এই ধর্মের প্রাণবান ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। এখন আবার নানা জাতির মধ্যে গিয়া তাহার নানা বৈচিত্র্য দেখা দিতেছে। এই বৈচিত্র্যই অমৃত। এই বৈচিত্র্যই ঈশ্বরের লীলা। খৃস্টান ধর্ম-শাস্ত্রের এই পরিবর্তনলীলাতে আমরা চমকিয়া উঠি না; কেবল আমাদের ধর্মশাস্ত্র যদি কোথাও নাড়া পায়, অমনি আমরা ভাবি, তবে বুঝি শাস্ত্রের জায়গায় যুক্তিকে সিংহাসনে বসাইবার উদ্যোগ চলিতেছে। বেদান্ত শাস্ত্রকেও ভালো করিয়া নাড়া দিলে তাহার ক্রমবিকাশমান ইতিহাসে এমনিতর একটি বৈচিত্র্যই লক্ষিত হইবে। বেদের ব্রহ্মতত্ত্বান্বেষণের একটি ধারা অবলম্বন করিয়াই আরণ্যক উপনিষদ্ জাগে। উপনিষদ্ সেই ধারারই একটি অংশ, একটি উপধারা। যখন যাগযজ্ঞ লইয়া বৈদিক কোনো কোনো ঋষিরা সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না, যখন তাঁহাদের মধ্যে সৃষ্টির প্রহেলিকা সম্বন্ধে আন্দোলন উপস্থিত হইল, তখন তাঁহারা প্রশ্ন করিলেন—"কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।" "কে ঠিক জানে কোথা হইতে এই বিচিত্র সৃষ্টি? কেবা এখানে

বলিয়াছে যে, কোথা হইতে এ-সকল জন্মিয়াছে।" তখন তাঁহাদের মধ্যে যে, ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মতত্ত্বের স্ফুরণ হইল উপনিষদ্‌কার ঋষিরা সেই ব্রহ্মতত্ত্বসকল উপনিষদে সন্নিবেশ করিয়াছেন, তাহা তো স্পষ্টই দেখা যায়। সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম— ঋগ্‌বেদের বাক্য। এও তো এক রকমের সংকলন, যদি ইহার সংকলন নাম হয়। এ জৈব সংকলন— জীবনের সংগ্রহ। অবশ্য ইহা সংকলনেই ঠেকিয়া রহিল না, ক্রমশ তত্ত্বজ্ঞানের নানা ধারায় ধারায় শত শাখা-প্রশাখায় বিস্তার লাভ করিল। কিন্তু তবু বেদ হইতে বেদান্তের একটা স্বাতন্ত্র্য দাঁড়াইল এই যে, বেদান্ত বেদের শিরোভাগ বা সারভাগ বলিয়া গণ্য হইল। যে-সকল ঋষি বিশুদ্ধ হৃদয়, নির্মল জ্ঞান, ও মনের আলোচনার দ্বারা ধ্যায়মান হইয়া সত্যের সাক্ষাৎকার করিলেন, তাঁহারাই জানিলেন বেদের মধ্যে বেদান্ত অংশ কোন্‌টা— বেদের শ্রেষ্ঠভাগ কী। ঠিক যেমন এখানে দেবেন্দ্রনাথ আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধহৃদয়ের দ্বারা জানিলেন উপনিষদের মধ্যে ব্রাহ্মীউপনিষদ্‌ অংশটা কী।

সেকালেই ঋষি যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, একালে আর মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি হইবার উপায় নাই, এ-সকল কথা যাহারা ভাবে তাহারা কৃপাপাত্র সন্দেহ নাই।

আমাদের দেশে এ কথা ভাবা আরো আশ্চর্যের বিষয়। কারণ খৃস্টান ধর্মের কেন্দ্রে যেমন খৃস্ট আছেন বা মুসলমান ধর্মের কেন্দ্রে যেমন মোহম্মদ আছেন, আমাদের ধর্মের কেন্দ্রে তেমনি একটি ঋষি বা আচার্য নাই— বরং ঋষি ও আচার্যপরম্পরা আছেন। অর্থাৎ আমাদের ধর্মের একটি কেন্দ্র নয়, বহু কেন্দ্র।

এক সময়ে কোনো একজন ঋষির কাছে ঈশ্বর আপনার বাণীকে প্রকাশিত (Revelation) করিয়াছেন, আমাদের বেদ যে সেই বাণী তাহা নয়— ঈশ্বরের বাণীর প্রকাশ যুগে যুগে হইতেছে। সেই হিসাবেই বেদ নিত্য। অর্থাৎ শাস্ত্র বলিতে আমরা বুঝিয়াছি বিশ্বতোমুখী সত্যের একটি বাণীমূর্তি। বীজ যেমন গাছে উদ্‌ভিন্ন হয়, তেমনি সেই সত্য বিশ্বতোমুখী বলিয়াই কালের ধারার ভিতর দিয়া ক্রমাগতই উদ্‌ভিন্ন হইয়া চলিবে। কালে কালে সেই সত্যের নূতন নূতন রূপ। কালে কালে সেইজন্য সেই সত্যের নূতন নূতন দ্রষ্টা, নূতন নূতন ঋষি চাই। খৃস্টান ধর্মে ক্যাথলিক চার্চের oecumenical council-এর ভিতর দিয়া শাস্ত্রের এই ক্রমবিকাশের একটা পথ খোলা ছিল বটে— সমস্ত কার্ডিন্যালগণ একত্রিত হইয়া শাস্ত্রবিধিসম্বন্ধে যাহা স্থির করিবেন তাহাই গ্রাহ্য হইবে। এবং মুসলমান ধর্মে শিয়াদিগের মধ্যে ব্যবস্থা আছে যে "শরিয়ৎ" বা বিধির মধ্যে যদি নূতন বিচার্য কোনো দিক থাকে তবে "মজ্‌তাহিদ"রা সেই নূতন বিধি স্থির করিয়া

দিতে পারেন। কিন্তু শাস্ত্রের সত্যকে যে যুগে যুগে নূতন নূতন রূপে প্রতিভাত হইতে হইবে এবং সেজন্য যে নূতন নূতন ঋষি চাই সে কথা হিন্দুধর্মে যেমন স্বীকার করা হইয়াছে, এমন কোনো ধর্মেই হয় নাই। আজকাল আমরা এ কথা কেন অস্বীকার করি বুঝি না। সেণ্ট পল্‌কে যদি ঋষি বলা যায়, তবে চ্যানিং, থিয়োডোর পার্কার, এমারসন, প্রভৃতি ঋষি নহেন কেন? উপনিষদ্‌কার ঋষিদিগের মতো মধ্যযুগে কবীর, নানক, দাদূ প্রভৃতিই ঋষিপদ-বাচ্য কেন হইবেন না, এবং একালে রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথকেই বা ঋষি বলা হইবে না কেন? Seer কি সেকালেই হইত, একালে আর হয় না?

বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র যদি উপনিষদের একটা সংক্ষিপ্ত সার (Epitome) হইতে পারে, 'তত্তু সমন্বয়াৎ'—তাহাতে যদি সর্বোপনিষদের সমন্বয় থাকে—তবে ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ সেই রকমের একটা এ কালের ব্রহ্মসূত্র না হইবে কেন? বেদান্ত ভাষ্য লইয়া যদি এ দেশে বেদান্তদর্শনের অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত প্রভৃতি নানা বাদের উৎপত্তি হইতে পারে, তবে একালে একটা নূতন 'বাদ' দেখা দিলেই আমরা তাহাতে চঞ্চল হইয়া উঠি কেন? উপনিষদের যাহা-কিছু ব্যাখ্যা তাহা কি শেষ হইয়া গিয়াছে? নূতন কালে তাহার নূতন ব্যাখ্যার কি কোনো প্রয়োজন নাই? অরেগন্‌, এথানেসিয়াস্‌ প্রভৃতি গ্রীক ফাদারগণ বা মধ্যযুগের মরমী সাধকগণ যেভাবে বাইবেলশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাই কি তাহার চূড়ান্ত ব্যাখ্যা? আর কোনো নূতন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় হয় নাই বা হইবে না?

ভগবদ্‌গীতা-শাস্ত্রকে কেহ কেহ হিন্দুদের gospel বলেন। তাহা মহাভারতের মধ্যে স্থান পাইলেও তাহার মধ্যে ভারতবর্ষের সাংখ্য, যোগ ও বেদান্তশাস্ত্রের একটি সমন্বয় চেষ্টা দেখা যায়। তাহার অনেক শ্লোক উপনিষদের শ্লোক। সুতরাং এক হিসাবে তাহাও তো একটি বড়ো সংকলন গ্রন্থ। অথচ তাহাকে শাস্ত্র বলিতে তো ভারতবর্ষের আপত্তি হয় নাই। তাহার ভাষ্যেরও অন্ত নাই। কেবল দেবেন্দ্রনাথেরই উপনিষদের সংকলন ও ভাষ্য সম্বন্ধেই যত আপত্তি উপস্থিত হয়। কারণ তিনি একালের মানুষ। একালের মানুষ ঋষি বা শাস্ত্রব্যাখ্যাতা হইতেই পারে না, এই বিশ্বাসই যত আপত্তির হেতু।

দেবেন্দ্রনাথ "আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ে" উপনিষদের তত্ত্বের সাক্ষাৎকার করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে আর-একটি অভিযোগ এই যে, তিনি তাঁহার 'ব্রাহ্মধর্মকে' একটা অতিপ্রাকৃত (Supernatural) প্রামাণ্য-

মর্যাদা দান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রেরণা বা Inspiration হইলেই যদি তাহা অতিপ্রাকৃতের কোঠায় পড়ে, তবে এ অভিযোগ সত্য বটে। তবে তো কবির কাব্য অতিপ্রাকৃত, শিল্পীর শিল্পরচনা অতিপ্রাকৃত। যাহা-কিছু প্রেরণার বশবর্তী হইয়া মানুষ করে তাহাই অতিপ্রাকৃত। এ অভিযোগ সত্য হইত যদি দেবেন্দ্রনাথ বলিতেন যে, তিনি যে উপনিষদের তত্ত্বসকলের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন ও ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থে সন্নিবেশ করিয়াছেন, তাহাই বেদ-উপনিষদের মথিত সমস্ত অমৃত— আর তাহাতে নূতন পাইবার কিছুই নাই। কিম্বা যদি বলিতেন যে, এই গ্রন্থে আর উত্তরকালে কেহ নূতন কিছু সন্নিবেশ করিতে পারিবে না। এ যাহা হইল তাহাই অভ্রান্ত শাস্ত্রের মতো গ্রহণ করিতে হইবে, একটি অক্ষরও ইহাতে নূতন যোগ করা হইবে না। তাহা যে তিনি বলেন নাই তাহার প্রমাণ তাঁহার নীচের এই উক্তিটি— "এই উপনিষদ্ হইতেই প্রথমে আমার হৃদয়ে আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতিধ্বনি পাইয়াই আমি সমগ্র বেদ এবং সমস্ত উপনিষদ্‌কে ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা করিতে যত্ন পাইয়াছিলাম, কিন্তু তাহা করিতে পারিলাম না, ইহাতেই আমার দুঃখ। কিন্তু এ দুঃখ কোন কার্যের নহে, যেহেতুক সমস্ত খনি কিছু স্বর্ণ হয় না, খনির অসার প্রস্তরখণ্ডসকল চূর্ণ করিয়াই তাহা হইতে স্বর্ণ নির্গত করিয়া লইতে হয়। এই খনি-নিহিত সকল স্বর্ণ ই যে বাহির হইয়াছে, তাহাও নহে। বেদ-উপনিষদ্-রূপ খনির মধ্যে এখনো কত সত্য কত স্থানে গভীররূপে নিহিত আছে। ভগবদ্ভক্ত বিশুদ্ধ-সত্ত্ব সত্যকাম ধীরেরা যখনি অনুসন্ধান করিবেন, তখনি ঈশ্বরপ্রসাদে তাঁহাদের হৃদয়-দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইবে এবং তাঁহারা সেই খনি হইতে সেই সত্যসকল উদ্ধার করিয়া লইতে পারিবেন।"

ব্রাহ্মধর্মের শ্রুতিশাস্ত্র যখন প্রস্তুত হইয়া গেল, তখন স্মৃতিশাস্ত্র প্রস্তুত করার জন্য দেবেন্দ্রনাথ মন দিলেন। ব্রাহ্মরা "যেমন ব্রহ্মবিষয়ক উপনিষদ্ পড়িয়া ব্রহ্মকে জানিবে, তেমনি ধর্মের অনুশাসন দ্বারা অনুশাসিত হইয়া হৃদয়কে বিশুদ্ধ করিবে।" চিত্তশুদ্ধি না হইলে ব্রহ্মোপাসনার অধিকার হয় না, এ কথা আমাদের দেশের সকল শাস্ত্রেই বলে। প্রথম খণ্ড ব্রাহ্মধর্ম সমাপ্ত হইলে, দ্বিতীয় খণ্ড অনুশাসনের জন্য মহাভারত, গীতা, মনুস্মৃতি সমস্ত খোঁজ করিয়া শ্লোক সংগ্রহ চলিতে লাগিল। মনুস্মৃতিতে তন্ত্রের শ্লোক আছে, অন্যান্য স্মৃতির শ্লোক আছে, মহাভারতের এবং গীতারও শ্লোক আছে। ভগবান মনুর এমন করিয়া পাঁচজায়গার জিনিস জোড়াতাড়া দেওয়াটা ঠিক হইয়াছিল কি না তাহা দেবেন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মধর্মে'র সমালোচকবর্গ আলোচনা করিয়া দেখিতে পারেন। যাহাই হোক— এই অনু-

শাসন অনেক পরিশ্রমের পর দাঁড় করানো গেল। রাজনারায়ণ বসু বলেন যে, এই অনুশাসন খণ্ড প্রস্তুত করিতে অনেক সময় লাগে। এবং এই খণ্ডে মনু হইতে যে-সকল শ্লোক উদ্ধৃত আছে তাহা মনুসংহিতা হইতে তিনিই উদ্ধার করিয়া দেন। ইহাকেও ষোল অধ্যায়ে ভাগ করা হয়।

ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের অনেক দিন পরে তাহার তাৎপর্য লেখা হয়। বোধ হয় এই তাৎপর্য লেখায় রাজনারায়ণ বসু দেবেন্দ্রনাথকে সাহায্য করিয়াছিলেন। কারণ, রাজনারায়ণ বসুর নিকটে লিখিত এক পত্রে দেখি, দেবেন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, (তারিখ নাই)—

"ব্রাহ্মধর্মের তাৎপর্য দুই এক শ্লোক করিয়া যেমন লিখিবে তেমনই পাঠাইয়া দিবে, তাহা ডাকের মাশুল না দিয়া পাঠাইবে। ব্রাহ্মধর্মের তাৎপর্য লেখা অতি গুরুতর কর্ম তাহার সন্দেহ কি ? তুমি তাহা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ ইহাতে আমি আনন্দিত হইলাম। যদিও তোমার সময় অল্প তথাপি ক্রমে ক্রমে লিখিবে —শনৈঃ পন্থা শনৈঃ কন্থা শনৈঃ পর্বতলঙ্ঘনম্। ব্রাহ্মধর্মের প্রথম অধ্যায় সকলের তাৎপর্য অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই, কিন্তু অচিরাৎ মুদ্রিত হইবার সম্ভাবনা আছে, অতএব তাহার যে যে শ্লোকে যে যে ভাব তোমার উদয় হইবে তাহা লিখিতে থাকিবে।"

আর-একটি পত্রের তারিখ আছে—৫ই আশ্বিন ১৭৭৪ শক—তাহাতে তিনি রাজনারায়ণ বসুকে লিখিতেছেন—"ব্রাহ্মধর্মের তাৎপর্য দেখিয়া তোমার মনে যে সকল শিষ্ট ভাব উঠিয়াছে তাহা তোমাতেই আছে, তাহা আর অন্যত্র আমি পাই না। বিশেষতঃ 'প্রাণোহ্যেষঃ' এই শ্রুতিতে যে তাৎপর্য অধিক করিয়া দিতে লিখিয়াছ তাহা অমূল্য।" সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম ১৮৪৮ খৃস্টাব্দে (১৭৭০ শকে) গ্রন্থে আবদ্ধ হইলেও তাহার চারি বছর পরেও তাহার তাৎপর্য বাহির হয় নাই। ১৭৭৫ শকের চৈত্রের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রথম ব্রাহ্মধর্মের প্রথম খণ্ডের তাৎপর্য বাহির হইতে আরম্ভ হয়।

ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার সময়ে আগে বেদ উপনিষদ্ পাঠ হইত, এখন তাহার স্থানে এই ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ পাঠ হইতে লাগিল। এই ১৮৪৮ সালের পত্রিকায় ব্রহ্মো-পাসনার যে প্রকরণ ছাপা হইয়াছে দেখিতে পাই, তাহাতে 'নমস্তে সতে তে' স্তোত্রটির বাংলা অনুবাদ নাই এবং অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় ইত্যাদি প্রার্থনাটিরও কোনো উল্লেখ নাই। রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন, "'ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়' ইহার বাংলা অনুবাদ এবং 'অসতো মা সদ্গময়,

তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়' এই প্রার্থনাটুকু আমা দ্বারা প্রবর্তিত মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা প্রণালী হইতে লওয়া হয়।"

রাজনারায়ণ বসুর দ্বারাই যে 'অসত্য হইতে সত্যে লইয়া যাও' এই প্রার্থনাটি ব্রাহ্মসমাজে প্রবর্তিত হয়, তাহার এক বড়ো কারণ এই যে, তাঁহার বক্তৃতার দ্বারাই বাস্তবিক ব্রাহ্মসমাজে ভক্তিভাবের প্রথম সঞ্চার হয়। তিনি লিখিয়াছেন, "আমি এরূপ প্রীতিভাবের বক্তৃতা যে লিখিতে সমর্থ হইয়াছিলাম তাহার একটি কারণ আমার পারসী শিক্ষা।" শুধু উপনিষদের জ্ঞানগর্ভ তত্ত্ববাক্যসকল আবৃত্তি করিয়া গেলে উপাসনা সরস হইতে পাবে না। তাহাতে মনন ও নিদিধ্যাসন চলে, কিন্তু ভক্তির উৎস খুলিয়া যায় না। ব্রহ্মোপাসনায় সেই ভক্তিভাব আসার বিশেষ দরকার ছিল। ভক্তি আসিলে তাহা কি আর সংস্কৃত ভাষার কড়া বাঁধাবাঁধির মধ্যে আটকা থাকে? নিজের মাতৃভাষায় তরঙ্গ জাগাইয়া তখন সে চলিতে চায়। আমাদের দেশের প্রধান ভক্তিশাস্ত্র— শ্রীমদ্ভাগবত।— অথচ তাহাকে গ্রহণ করা শক্ত, কারণ তাহাতে সাকারবাদ ও অবতারবাদ অত্যন্ত স্পষ্ট। হাফেজ তখনো দেবেন্দ্রনাথের কাছে তেমন করিয়া ধরা দেন নাই। রাজনারায়ণ বসু ফরাসী ব্রহ্মবাদী ফেনেলোঁর এক ব্রহ্মস্তোত্র অনুবাদ করিয়া দেবেন্দ্রনাথকে দিলেন। তিনি তাহার মধ্যে মধ্যে উপনিষদ্‌বাক্য প্রবিষ্ট করিয়া সেই স্তোত্রটি ১৭৭০ শকে ১১ই মাঘে, যেবারে প্রথম ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ পাঠ হইল, সেইবারের মাঘোৎসবেই পড়িলেন। সেবার সমাজমন্দিরের তেতলা তৈরি হইয়াছে— সেখানে শ্বেতপ্রস্তরের বেদী, সামনে গীতমঞ্চ, পূর্বপশ্চিমে ক্রমোচ্চ কাষ্ঠাসন, ঝাড় লণ্ঠনের আলো প্রভৃতি বিচিত্র আয়োজনে মন্দির সাজানো হইয়াছে। প্রথমে গান হইল, তার পরে সমস্বরে স্বাধ্যায় পড়া হইল, তার পরে ব্রাহ্মধর্ম হইতে শ্লোকের আবৃত্তি হইল ও সকলের শেষে শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ বলিয়া উপাসনা শেষ হইল। তখন ঐ ফেনেলোঁর স্তোত্রটি দেবেন্দ্রনাথ পড়িলেন। স্তোত্র পড়ার পরে দেখেন যে, অনেক ব্রাহ্ম ভাবে মগ্ন হইয়া চোখের জল ফেলিতেছেন। ইহার পূর্বে ব্রাহ্মসমাজে এমনতর ভাবাবেশ কখনোই দেখা যায় নাই। ১৭৭০ শকের ফাল্গুনের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এই প্রথম ব্রহ্মস্তোত্র বাহির হয়। ফরাসী সাধক ফেনেলোঁ যে এ দেশের ব্রহ্মোপাসনায় ভক্তিভাব জাগাইবার সাহায্য করিবেন, এ কথা কে কবে কল্পনা করিয়াছিল? পশ্চিম হইতে কিছুই গ্রহণ করিবেন না, ইহাই যদি দেবেন্দ্রনাথের মনোভাব হইত, তবে ব্রহ্মোপাসনার মধ্যে ফেনেলোঁর এই স্তোত্র তিনি গ্রহণ করিলেন কেন? খৃস্টানধর্মের ঈশ্বরবাদ

ও অন্যান্য নানা মতের গোটাকতক প্রহরীপাহারার বাইরের দেউড়ি তিনি যদি একবার পার হইতে পারিতেন, তবে সেখানকার ভাবুকদের মজলিসে তিনি এমনি মজিতেন যে, খৃস্টানধর্মের অনেক জিনিস নিশ্চয়ই আত্মসাৎ করিয়া লইতেন। দেউড়িতে মতের সঙিনের আস্ফালন দেখিয়াই তিনি পিছনে হটিয়া গেলেন। কিন্তু ইহা আমার কাছে অত্যন্ত আপশোষের বিষয় বলিয়া মনে হয়।

ইহার পর হইতে পত্রিকায় ব্রহ্মস্তোত্র ক্রমাগতই বাহির হইতে লাগিল দেখিতে পাই। অনেকগুলি স্তোত্রই রাজনারায়ণ বসুর রচনা। দু-একটাতে দেবেন্দ্রনাথের হাত আছে বলিয়া মনে হয়। আর কে কে এই স্তোত্ররচয়িতা ছিলেন জানি না। 'প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা' নাম দিয়া পরে এই স্তোত্রগুলি একত্র করিয়া প্রকাশ করা হয়। এগুলি বড়োই মিষ্ট। প্রায় দশ বছর পর্যন্ত এই স্তোত্র বাহির হইয়া চলিয়াছিল।

ফেনেলোঁর স্তোত্রে আছে, "হে পরমাত্মন! আমি কি দেখিতেছি, তোমাকেই যে সকল বস্তুতে প্রকাশমান দেখিতেছি। যে তোমাকে দেখে নাই সে কিছুই দেখে নাই, যাহার তোমাতে আস্বাদ নাই সে কোনো বস্তুরই আস্বাদ পায় নাই, তাহার জীবন স্বপ্নস্বরূপ, অস্তিত্ব বৃথা। আহা! সে আত্মা কি অসুখী, তোমার জ্ঞান অভাবে যাহার সুহৃৎ নাই, যাহার আশা নাই, যাহার বিশ্রামস্থান নাই। কি সুখী সেই আত্মা, যে তোমাকে অনুসন্ধান করে, যে তোমাকে পাইবার নিমিত্তে ব্যাকুল রহিয়াছে।..." কিন্তু ইহার পরের স্তোত্রগুলিতে ইহার চেয়ে প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁহার প্রকাশ দেখা ও তাঁহার মাধুর্য আস্বাদন করার কথা আছে। একটি স্তোত্রের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করি— "যে ব্যক্তি তোমার প্রেমে মগ্ন হয় নাই, এ জগৎ যে কত মধুর ও কত সুন্দর তাহা সে কি জানিবে? যে ব্যক্তি তোমার প্রেমরস পান করিয়াছে, তাহার পক্ষে সকলই মধুময়, সকলই সৌন্দর্যময়। সে দেখিতে পায়, সুগন্ধ পুষ্পের সৌরভমধ্যে তোমারই প্রীতিসৌরভ উত্থিত হইতেছে, সুমন্দ মারুতের সঞ্চরণমধ্যে তোমারই প্রীতিসমীরণ সঞ্চারিত হইতেছে, নিশাকরের কিরণধারায় তোমারই প্রেমামৃতধারা ক্ষরিত হইতেছে, সুবিমল নির্ঝরনীরে তোমারই পরম পবিত্র প্রীতিবারি চলিত হইতেছে, এবং পরিশুদ্ধ প্রস্রবণমধ্যে তোমারই প্রীতিরূপ বিশুদ্ধ সলিল নিঃসৃত হইতেছে।"—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, জ্যেষ্ঠ ১৭৭৭ শক। দশম স্তোত্র— প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা।

এটি যে কাহার রচনা তাহা জানিবার কোনো উপায় না থাকিলেও অনুমান করিবার কোনো বাধা নাই। প্রকৃতির সৌন্দর্যের ভিতর দিয়া সেই পরমসুন্দর

পরমানন্দকে সহজে উপলব্ধি করিবার সাধনা যে তাহার অন্তরঙ্গ-সাধনা ছিল, তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে? এই স্তোত্রগুলি টমাস্ এ. কেম্পিসের রচনা স্মরণ করায় এবং একালে মার্টিনোর প্রার্থনাগুলি স্মরণ করায়। এখন যে কেন ইহাদের আর আদব নাই তাহা বুঝিতে পারি না। উপাসনাকে সরস করিবার মতো এমন অনুকূল জিনিস আমাদের ভাষায় বোধ হয় আর কিছুই নাই।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ভ্রমণ ও ধর্মপ্রচার সংসার-উপরতি

ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের পর হইতেই দেবেন্দ্রনাথ প্রতি বছর দুর্গোৎসবের সময়ে বাড়ি ছাড়িয়া ভ্রমণে বাহির হইতেন। পূর্বেই বলিয়াছি যে, জোর করিয়া কাহারো মনের সংস্কার ভাঙিয়া দিবার চেষ্টা তিনি অন্যায় বলিয়াই বোধ করিতেন। তিনি বাড়ির কর্তা, বাড়িতে যে দুর্গাপুজা ও জগদ্ধাত্রীপুজা হইত, তিনি ইচ্ছা করিলেই তাহা উঠাইয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি মনে করিতেন যে, "পরিবারের মধ্যে কাহারো যদি ইহাতে বিশ্বাস থাকে, কাহারো ভক্তি থাকে, তাহাতে আঘাত দেওয়া অকর্তব্য।" অবশ্য তাই বলিয়া যে তিনি অন্ধসংস্কার দূর করিবার জন্য কোনো চেষ্টা করিতেন না, কিম্বা সে সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতেন, এমন কথা মনে করিলে ভুল হইবে। পুজা উঠাইবার জন্য তিনি ধীরে ধীরে চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার ছোটো ভাই নগেন্দ্রনাথ যখন ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসেন, তখন তাঁহার আশা হইল যে তিনি প্রতিমাপুজার বিরোধী হইয়া তাঁহার মত সমর্থন করিবেন। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথ দুজনেই খুব সামাজিক ও মজলিসী মানুষ ছিলেন। নগেন্দ্রনাথ বলিলেন যে, দুর্গোৎসব সমাজবন্ধন, বন্ধুদের সঙ্গে ও সকলের সঙ্গে হৃদ্যসম্বন্ধ স্থাপনের একটা চমৎকার উপায়। গিরীন্দ্রনাথেরও সেই মত। দেবেন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিক জীবনের একটা স্বাদ পাইয়াছেন বলিয়া বিষয় বিভব, পদমর্যাদা, সামাজিকতা প্রভৃতির আকর্ষণ তাঁহার মনের মধ্যে প্রবল হইতে পারে নাই। কিন্তু গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথের পক্ষে সে আকর্ষণ শিথিল হইবার কোনো কারণ ছিল না; সুতরাং সমাজবন্ধন তাঁহাদের কাছে অত্যন্তই দৃঢ় ছিল। বন্ধুবান্ধব, আশ্রিত, প্রতিবেশী ও ধনগৌরবে সমান মর্যাদাবান্ লোকদের সঙ্গে ঠিকমত সামাজিক সম্বন্ধ রক্ষা করিতে না পারিলে সেটা তাঁহাদের পক্ষে মর্মান্তিক কষ্টের বিষয় হইত। এইজন্য যখন দেবেন্দ্রনাথ সত্যরক্ষার জন্য অত বড়ো সম্পত্তির অধিকাংশই খোয়াইলেন, তখন পূর্বের মতো লৌকিকতা, আদর-আপ্যায়ন প্রভৃতি করিতে না পারিয়া তাঁহার অন্য দুই ভাই বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইতেন। গিরীন্দ্রনাথ নিতান্ত সরল ও আত্মভোলা মানুষ ছিলেন; তাহা ছাড়া তিনি অত্যন্ত ভ্রাতৃবৎসল ছিলেন। দাদা যাহা বলিতেন তাহাই তিনি মানিয়া লইতেন। নগেন্দ্রনাথও দাদার বাধ্য ছিলেন; কিন্তু তাঁহার স্বভাব কিছু উচ্ছৃঙ্খল ছিল

বলিয়া তিনি সময়ে সময়ে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িতেন এবং দেবেন্দ্রনাথকে সে ঋণ শোধ করিতে হইত। নগেন্দ্রনাথের জন্য তাঁহাকে অনেক সময় অত্যন্ত ক্লেশ পাইতে হইত। তবু তাঁহাকে তিনি বিশেষ স্নেহ করিতেন। নগেন্দ্রনাথ প্রভৃতির পক্ষে দুর্গোৎসব উঠাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব যে অত্যন্ত বেদনার বিষয় হইবে, ইহা বুঝিয়াই তিনি কোনো জোর করিলেন না। তাঁহার ভাইয়েরা জগদ্ধাত্রীপুজাটা উঠাইয়া দিলেন— দুর্গোৎসব পূর্বের মতো চলিতেই লাগিল।

আমাদের দেশে শরৎকালই ভ্রমণের প্রশস্ত কাল বলিয়া বরাবর গণ্য হইয়া আসিয়াছে। পূর্বকালে এই সময়ে রাজারা দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন। এই সময়ে পৃথিবীর সৌন্দর্য যেমন উপভোগ্য, এমন আর কোন্ সময়? বর্ষায় মানুষকে ঘরে ডাকিয়া আনে, শরতে ঘর হইতে বাহির করিয়া দেয়। এই সময়ে সকল দিক প্রসন্ন, বর্ষাধৌত পৃথিবীর শ্যামহরিৎ শিশিরস্নিগ্ধ অম্লান শ্রী; নির্মল আকাশ রজতশঙ্খমৃণালগৌর মেঘচামরের দ্বারা উপবীজ্যমান রাজার মতো শোভমান; বাতাস শিশিরসিক্ত, শেফালিবন-কুসুমবাসিত ও সুখকর— এই তো ভ্রমণের কাল। শুধু পুজা এড়াইবার জন্য নয়— এই ঋতুতে দেবেন্দ্রনাথ আর ঘরে থাকিতে পারিতেন না। নূতন নূতন স্থানে বিশ্বপ্রকৃতির নূতন নূতন সৌন্দর্য আবিষ্কার করিবার ও তাহার মধ্যে সেই পরম সুন্দরকে উপলব্ধি করিবার জন্য তাঁহার মনটা চঞ্চল হইয়া উঠিত।

১৮৪৮ সালের আশ্বিনে তিনি রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া দামোদর নদীতে বেড়াইতে যান। সাত দিন পরে দামোদরের একটা চড়ায় নৌকা লাগাইয়া তাঁহারা সেখান হইতে দুই ক্রোশ দূরে বর্ধমান শহর দেখিতে গেলেন। শহর দেখিয়া নৌকায় ফিরিয়া আসিতে অনেক রাত্রি হইল। রাজনারায়ণবাবু কখনোই এতটা দূর পর্যন্ত বেড়ান নাই, তাঁহার জ্বর হইয়া পড়িল। পরদিন দেবেন্দ্রনাথ স্নান সারিয়া উপাসনা করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে বর্ধমানের রাজার নিকট হইতে একজন লোক গাড়ি লইয়া হাজির। রাজা তাঁহাকে দেখিতে চাহিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বলিলেন, 'এখন আমি নদী, বন, পাহাড়, পর্বত দেখিতে বাহির হইয়াছি; এখন আমি কোথায় রাজদর্শন করিতে যাইব? আমি এই নদী দিয়া আসিয়াছি, এই নদী দিয়াই ফিরিয়া যাইব। আমি আর ডাঙায় উঠিব না।' কিন্তু সে নিতান্ত অনুনয় ও অনুরোধ করিতে লাগিল এবং বলিল, 'আপনার প্রতি রাজার অনুরাগ দেখিলে আপনি পরিতুষ্ট হইবেন— আপনাকে সঙ্গে না লইয়া যাইব না।' দেবেন্দ্রনাথ

তাহার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাহার সঙ্গে শহরে গেলেন। সেখানে তাঁহার থাকিবার জন্য এক চমৎকার বাড়ি ঠিক হইয়াছে— রাজ-অমাত্যেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিল— প্রতি মুহূর্তে তিনি কি করিতেছেন, কি বলিতেছেন তাহা জানিবার জন্য রীতিমত ডাক বসিয়া গেল। তিন-চারিখানি গোরুর গাড়ি করিয়া মস্ত সিধা আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন এত খাদ্য কেন? শুনিলেন যে রাজগুরুর জন্য যে সিধা নির্দিষ্ট তাহাই তাঁহাকে মহারাজ পাঠাইয়াছেন। তাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। মহারাজ মহাতাবচাঁদ বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন, কিন্তু তিনি তাহার কিছুই জানিতেন না। রাজনারায়ণবাবু লিখিয়াছেন যে, "মহারাজা মানুষকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছিলেন—'World-man and God-man'। ইনি দেবেন্দ্রবাবুকে, God-man অর্থাৎ ঈশ্বরপরায়ণ-লোক বলিতেন।" মহারাজার সঙ্গে দেখা হইলে তিনি দেবেন্দ্রনাথকে ধরিয়া একটা উচ্চ আসনে বসাইয়া দিলেন। তাঁহার ভিতরে স্বাভাবিক ধর্ম-পিপাসা ছিল, দেবেন্দ্রনাথের সংসর্গে সেই পিপাসা আরো বাড়িল। তিনি তাঁহার পরামর্শে রাজবাড়ির মধ্যে এক ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন। ৩০এ আষাঢ় ১৭৭৩ শকে এই ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। শ্রীধর বিদ্যারত্ন, শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ ও তারকনাথ তত্ত্বরত্ন— এই তিন উপাচার্যকে দেবেন্দ্রনাথ বর্ধমানে পাঠাইয়া দেন। মহারাজার সহিত এই যে ধর্মের যোগ হইল— ইহার পরে দেবেন্দ্রনাথকে প্রায়ই বর্ধমানে যাইতে হইত এবং তিনি যখনি যে উপলক্ষ্যেই যাইতেন, মহারাজা তাঁহার সহিত ব্রহ্মোপাসনা করিতেন ও ধর্মালোচনা করিতেন। এক রাত্রিতে ব্রহ্মোপাসনার সময় ঈশ্বরের প্রতি নিজের কৃতজ্ঞতার অভাবের কথা বলিতে গিয়া মহারাজা কাঁদিতে লাগিলেন। ক্রমে দেবেন্দ্রনাথের প্রতি তিনি এমন ভক্তিমান হইলেন যে, একদিন তাঁহাকে অন্তঃপুরের মধ্যেই লইয়া গেলেন। কোথায় তিনি ও রানী বসিয়া মাছ ধরেন, কোথায় বসিয়া রানী তাঁহার বিলিয়ার্ড খেলা দেখিতে পান সমস্ত তাঁহাকে দেখাইলেন। আর-একদিন দেবেন্দ্রনাথকে বসাইয়া একজন ভালো ইংরেজের দ্বারা তাঁহার একটি তৈলচিত্র মহারাজা আঁকাইলেন। সেই ছবিখানি বরাবর তাঁহার ঘরেই থাকিত। তাঁহার পুত্র আফতাবচাঁদও ব্রাহ্ম ছিলেন এবং নিয়মিত ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় যোগ দিতেন।

আর-একজন রাজার সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল, তাহা বড়োই আশ্চর্য। একদিন কলিকাতায় তিনি গাড়িতে চড়িয়া বেড়াইতেছিলেন, এমন সময় পথে

এক ব্যক্তি তাঁহার হাতে একখানা চিঠি দিল। চিঠিখানি কৃষ্ণনগরের রাজা শ্রীশচন্দ্রের। তিনি পরদিন বিকালে টাউন হলে তাঁহার সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা জানাইয়া চিঠি লিখিয়াছেন। টাউন হলে দেখা হইতে পরস্পর পরস্পরের মিলনে বড়োই সুখী হইলেন এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত ধর্মালোচনা করিলেন। সেদিন বিদায়ের সময় শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, 'এত অল্প আলাপে তৃপ্তি হইল না। আপনি একদিন সন্ধ্যার সময় আমার বাসায় আসিয়া আলাপ করিলে সুখী হই।' তিনি প্রকাশ্যে দেখা করিতে ভয় পান। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের নেতা, আর শ্রীশচন্দ্র নবদ্বীপের পৌত্তলিক সমাজের কর্তা। অথচ ভিতরে ভিতরে যে তিনি কেমন করিয়া দেবেন্দ্রনাথের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, সে এক রহস্য। কলিকাতায় তাঁহার বাসাতে যখন তিনি দেখা করিতে গেলেন, রাজা শ্রীশচন্দ্র তাঁহাকে ছাদের উপর নির্জনে লইয়া গেলেন এবং সেখানে গিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। দেবেন্দ্রনাথও তাঁহার সঙ্গে মাটিতে বসিলেন। তিনি লিখিতেছেন, "বেশ ফকিরী ভাব হইয়া গেল।" সেদিন তাঁহার সঙ্গে এমনি হৃদয়ের বিনিময় হইল যে, তাঁহারা যেন অভিন্ন-হৃদয়, দেবেন্দ্রনাথ এমনি অনুভব করিতে লাগিলেন। শ্রীশচন্দ্র তাঁহাকে কৃষ্ণনগরে নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। তিনি সেখানে গেলে তাঁহার যথেষ্ট সম্বর্ধনা ও সমাদর করিলেন।[১]

'ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে' আছে যে, রাজা শ্রীশচন্দ্র ১৮৪৪ খৃস্টাব্দে তাঁহার প্রদেশের তিন ব্যক্তিকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করিয়া কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের নিয়মপত্রে স্বাক্ষর করান এবং দেবেন্দ্রনাথকে একজন বেদজ্ঞ উপদেষ্টা পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া চিঠি লেখেন। দেবেন্দ্রনাথ লালা হাজারীলালকে পাঠাইলেন। হাজারীলাল শূদ্র এবং বেদবিৎ নয়, সেইজন্য রাজা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইলেন। যাহাই হৌক, হাজারীলালকে তিনি বিদায় করিলেন না। ইহার পরে তিনি কোনো প্রয়োজনে মুর্শিদাবাদে চলিয়া গেলেন। সেখানে এক মাসের বেশি কাটাইয়া ফিরিয়া আসিয়া তিনি দেখেন যে, কৃষ্ণনগরে প্রায় চল্লিশ জন যুবক ব্রাহ্ম হইয়াছেন এবং হাজারীলাল উপাচার্যের কাজ করিতেছেন। তিনি ইহাতে বিরক্ত হইয়া রাজবাড়িতে ব্রাহ্মদিগকে সমাজ করিতে নিষেধ করিলেন। ব্রাহ্মরা আর-একটি বাড়ি ভাড়া করিয়া সেখানে সমাজ করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন ব্রাহ্মণ উপাচার্য

১ দ্রষ্টব্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী (চতুর্থ সংস্করণ)-পরিশিষ্ট ৪৪

পাঠাইলেন। কৃষ্ণনগরে অনেকেই ব্রাহ্মদলের বিরোধী হইল, কিন্তু রাজা শ্রীশচন্দ্রের সহানুভূতি থাকাতে তাহাদের কোনো অনিষ্ট করিতে পারিল না। ১৮৪৮ খৃস্টাব্দে (১৭৬৯ শকে) কৃষ্ণনগরের সমাজমন্দির তৈরি হইল। দেবেন্দ্রনাথ মন্দির নির্মাণের জন্য এক হাজার টাকা দান করেন।

মহাতাবচাঁদ প্রকাশ্যে দেবেন্দ্রনাথকে ধর্মবন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীশচন্দ্র গোপনে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুজনেরই সঙ্গে তাঁহার আন্তরিক বন্ধুত্বের যোগ হইয়াছিল।

কৃষ্ণনগরের ব্রাহ্মসমাজ ভিন্ন আরো নানা জায়গায় এই কয়েক বছরের মধ্যে অনেকগুলি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। রাখালদাস হালদারের ডায়ারি হইতে তাহার একটা তালিকা আমি পাইয়াছি এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বিজ্ঞাপনের সঙ্গে সেই তালিকা মিলাইয়া দেখিয়াছি যে তাহা বিশুদ্ধ। সেই তালিকাটি নীচে দেওয়া যাইতে পারে—

১. কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মসমাজ— ১৮৪৭ খৃস্টাব্দে, ১৭৬৯ শকে স্থাপিত— রাজা শ্রীশচন্দ্রের সহায়তায়।

২. মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ— ১৮৪৬ খৃস্টাব্দে, ১৭৬৮ শকে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেব কর্তৃক স্থাপিত। প্রতি রবিবার সমাজ হয়, পঞ্চাশজন সভ্য, বেদাধ্যয়ন

৩. সুখসাগর ব্রাহ্মসমাজ—১৮৪৬ খৃস্টাব্দে, ১৭৬৭ শকের ২৭এ মাঘে শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর মিত্র কর্তৃক স্থাপিত।

৪. ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ— ১৮৪৬ খৃস্টাব্দে, ১৭৬৮ শকের ২৯এ অগ্রহায়ণে শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর মিত্র কর্তৃক স্থাপিত।

এ সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্র লেখেন— "শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র এখানকার সমাজের প্রাণস্বরূপ এবং অতি ভদ্রলোক।...শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র শিরোমণিকে তথায় রাখিয়া আইলাম।...যদিও এখানকার সমাজ প্রতি বুধবারে হইয়া থাকে তথাপি আমি সে পর্যন্ত এখানে থাকিলে প্রত্যাগমনের কাল বিলম্ব হয় এজন্য গত দিবসেই এক অতিরেক সমাজ হইয়াছিল।"

৫. বর্ধমান ব্রাহ্মসমাজ— ১৮৫১ খৃস্টাব্দে, ১৭৭৩ শক, ৩০ এ আষাঢ়ে শ্রীযুক্ত মহারাজ মহাতাব্‌চাঁদ বাহাদুর কর্তৃক স্থাপিত।

৬. কাল্‌না ব্রাহ্মসমাজ— শ্রীযুক্ত মহারাজ মহাতাব্‌চাঁদ বাহাদুর কর্তৃক স্থাপিত।

৭. ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ— ১৮৫২ খৃস্টাব্দে, ১৭৭৪ শকে শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর মিত্র, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, হরিশ্চন্দ্র মুখুয্যে প্রভৃতি কর্তৃক স্থাপিত। ঐ শকের কার্তিকের পত্রিকায় আছে যে প্রতি সপ্তাহে সোমবারে সন্ধ্যাকালে সমাজ হয় এবং ৫০।৬০ জন উপস্থিত থাকেন।

৮. জগদ্দল ব্রাহ্মসমাজ— ১৮৫২ খৃস্টাব্দে, ১৭৭৪ শকে, ২০এ আষাঢ়ে শ্রীযুক্ত রাখালদাস হালদার কর্তৃক স্থাপিত। প্রতি রবিবার সন্ধ্যার পর সমাজ হয় এবং কুড়ি জন ভদ্রলোক উপস্থিত থাকেন।

রাখালদাস হালদার তাঁহার রোজনামচায় দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "এই বঙ্গপ্রদেশে এইক্ষণে যে কয়েকটি ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত আছে তাহার প্রত্যেকে তিনি মধ্যে মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া উপাসনা ও বক্তৃতা করিয়া থাকেন ও সমাজের ব্যয়ানুকূল্যার্থে কোন স্থলে অর্থ সাহায্যও করিয়া থাকেন।—জগদ্দলস্থ ব্রাহ্মসমাজের একটা প্রস্তাব।"

৯. খিদিরপুর ব্রাহ্মসমাজ— ১৮৫৩ খৃস্টাব্দে, ১৭৭৪ শকের ৭ই ফাল্গুনে শ্রীযুক্ত রাখালদাস হালদার ও অনঙ্গমোহন মিত্র প্রভৃতি কয়েকজন ব্যক্তি কর্তৃক স্থাপিত। প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবারে সমাজ হইত।

১০. ডুমুরদহ ব্রাহ্মসমাজ— ১৮৫৩ খৃস্টাব্দে, ১৭৭৫ শকের ২রা জ্যৈষ্ঠে স্থাপিত।

১১. ত্রিপুরা ব্রাহ্মসমাজ— ১৮৫৪ খৃস্টাব্দে, ১৭৭৬ শকের ৩রা শ্রাবণে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত কর্তৃক স্থাপিত। অমৃতবাবু দেবেন্দ্রনাথকে সমাজ স্থাপন করিয়া এক পত্রে লেখেন, "যে নগরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা গ্রহণ করিলেই নাস্তিক পাষণ্ডাদি দুর্নামবাচ্য হওয়া যায়, সে স্থানে প্রকাশ্যরূপে একস্থলে সমাগত হইয়া ব্রহ্মোপাসনাদি কার্য নিষ্পাদন করা সামান্য ব্যাপার নহে।"— ২২এ কার্তিক ১৭৭৬ শক।

এই ১১টি ব্রাহ্মসমাজ ভিন্ন ভবানীপুরে ও বেহালায় সত্যজ্ঞানসঞ্চারিণী সভা ও নিত্যজ্ঞানসঞ্চারিণী সভা নামে দুই সভা স্থাপিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উমেশ মিত্র ও নবকৃষ্ণ বসু কর্তৃক ১৮৫৩ খৃস্টাব্দে ১৭৭৫ শকের ৬ই বৈশাখ সত্যজ্ঞানসঞ্চারিণী সভা স্থাপিত হয়। এই সভার দ্বারা সবসুদ্ধ ৫৩ জন ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়। ঐ বছরেই বেহালায় নিত্যজ্ঞানসঞ্চারিণী সভা স্থাপিত হয়— বেচারাম চট্টোপাধ্যায় তাহার সভাপতি হন। তাহার বাৎসরিক কার্য-বিবরণী পড়িলে বেশ বুঝা যায় যে, সভার সভ্যমহাশয়েরা পল্লীবাসীদের "অসহ্য তাড়না ও বিষবৎ কটূক্তি সকল সহ্য করিয়াছিলেন।"

তবেই দেখিতে পাইতেছি যে, বৈষয়িক ক্ষতির পর হইতেই ধর্মপ্রচারে দেবেন্দ্রনাথের উৎসাহ পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি বাড়িয়া গিয়াছিল। ১৮৪৮ খৃস্টাব্দ হইতে ১৮৫৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত, এই ছয় বছর ব্রাহ্মসমাজের কাজ আর ক্ষীণ ভাবে চলে নাই—দেশের প্রাণের মধ্যে তাহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তাহার প্রমাণ স্থানে স্থানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন। এই সময়ের মধ্যেই আবার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত বাংলা গদ্য সাহিত্যে এক নবযুগের পত্তন করিয়াছেন। ১৮৫১ সালে ও ১৮৫৭ সালে অক্ষয়কুমার দত্তের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' বাহির হয়। ঐ বই জর্জ কুম্বের *Constitution of Man* নামক গ্রন্থের সার সংকলন ছিল। ইহাতে স্বাস্থ্যতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, ধর্মনীতি, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা ছিল। প্রাকৃতিক নিয়ম ভালো করিয়া না জানাব জন্যই যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের সমাজে নানা দুঃখের উৎপত্তি হয়, ইহাই ঐ বইটির সকল আলোচনার ভিতরকার কথা ছিল। ঐ বইটিতে শারীরিক নিয়মপালন প্রসঙ্গ পড়িয়া ব্যায়াম চর্চার এক ধুম পড়িয়া যায়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের বাড়িতেই ব্যায়ামের ব্যবস্থা করেন। তিনি নিজে, অক্ষয়বাবু, ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যায়াম অভ্যাস করিতে লাগিয়া গেলেন। 'বাহ্যবস্তু' গ্রন্থে অক্ষয়বাবু নিরামিষ আহারের পক্ষ সমর্থন করেন, সেই প্ররোচনায় অনেক যুবক নিরামিষ আহার করিতে শুরু করেন। মদ্যপানের অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে তিনি যে আলোচনা করেন, তাহার ফলে রীতিমত একটা Temperance movement বা মদ্যপান নিবারণের আন্দোলন দাঁড়াইয়া যায়। সামাজিক নীতি সম্বন্ধেও ঐ বই পড়ার পরে সমাজে এক আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। শুনা যায় যে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে পুরুষানুক্রমে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল—তাঁহার পিতৃপুরুষেরা সকলেই চল্লিশ পঞ্চাশটি করিয়া বিবাহ করিতেন। অক্ষয়বাবুর বই পড়িয়া তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, কখনোই তিনি বহুবিবাহ করিবেন না।

দেবেন্দ্রনাথের এই সময়ের কতগুলি চিঠির টুকরা হইতেও বেশ দেখা যায় যে, মাছ মাংস খাওয়া, মদ্যপান সমস্ত ছাড়িবার জন্য আন্দোলনে তিনিও অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। এক পত্রে তিনি লিখিতেছেন, "মদ্যপান পরিত্যাগ হইল, এইক্ষণে মৎস্য মাংস পরিত্যাগ হইলেই হয়, তাহার আর বড় বিলম্ব বোধ হইতেছে না। সত্ত্বগুণ যখন প্রবল হয়, তখন সাত্ত্বিক আহারই হইয়া উঠে।" আর-এক পত্রে লিখিতেছেন, "এইক্ষণে মৎস্য মাংস পরিত্যাগ করিবার কি

করিলে? বর্ধমানাধিপতির যে পত্র সম্প্রতি পাইয়াছি, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে, তিনি মৎস্ত মাংস পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।"

এই সময়ের মধ্যে আবার বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলন উঠে। ১৮৪৯ খৃস্টাব্দে এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি ড্রিঙ্কওয়াটার বিট্‌ন্ সাহেব পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালংকার প্রধানত এই দুইজনের সাহায্যে এ দেশে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য কলিকাতায় বিট্‌ন্ বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। ক্রমে বারাসত, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি মফঃস্বলের অনেক জায়গায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে লাগিল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, "স্ত্রীশিক্ষা লইয়া সমাজমধ্যে নানা আলোচনা উপস্থিত হইল। 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষাণীয়াতিযত্নতঃ' মহানির্বাণতন্ত্রের এই বচনালংকৃত নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের গাড়ি যখন রাজপথে বাহির হইত, তখন লোকে হা করিয়া তাকাইয়া থাকিত ও নানা কথা কহিত; এবং সুকুমারমতি শিশু বালিকাদিগকে উদ্দেশ করিয়া কত অভদ্র কথাই কহিত। ...নাটুকে রামনারায়ণ রসিকতা করিয়া বাবুদের মজলিসে বলিতে লাগিলেন—'বাপ্‌রে বাপ্ মেয়েছেলেকে লেখা পড়া শেখালে কি আর রক্ষা আছে! এক 'আন' শিখাইয়াই রক্ষা নাই! চাল আন, ডাল আন, কাপড় আন করিয়া অস্থির করে, অন্য অক্ষরগুলো শেখালে কি আর রক্ষা আছে!'...বঙ্গের রসিক কবি ঈশ্বর গুপ্তও ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন—

'যবে ছুঁড়ী গুলো তুড়ী মেরে কেতাব হাতে নিচ্চে যবে,
এ, বি শিখে, বিবি সেজে, বিলাতী বোল্ কবেই কবে;
আর কিছুদিন থাকরে ভাই! পাবেই পাবে দেখতে পাবে,
আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী, গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।'"

মদনমোহন তর্কালংকার, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি যাঁহারা বিট্‌ন্ সাহেবের বিদ্যালয়ে সর্বপ্রথমে নিজেদের মেয়েদের ভর্তি করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাদের পক্ষে এ কাজ তখন নিতান্ত সহজ ছিল না। দেবেন্দ্রনাথও তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনী দেবীকে স্ত্রী-বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। ১৮৫১ খৃস্টাব্দে (১৭৭৩ শকে) ২৫এ আষাঢ়ের এক পত্রে তিনি লিখিতেছেন—"আমি বেথুন সাহেবের বালিকা বিদ্যালয়ে সৌদামিনীকে প্রেরণ করিয়াছি, দেখি এ দৃষ্টান্তে কি ফল হয়।"

এই সময়েই রাজনীতি সম্বন্ধেও এক মহা আন্দোলন বাংলাদেশে উপস্থিত হইল। কলিকাতাতে সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হওয়ার পর, দেশের নানা স্থানে

দেওয়ানী আদালতের সঙ্গে সঙ্গে ফৌজদারী আদালতও স্থাপিত হয়। পূর্বে ফৌজদারী আদালত মুসলমানদের হাতেই ছিল। মফঃস্বলে যে-সকল ফৌজদারী আদালত হইল, মফঃস্বলবাসী ইংরাজেরা তাহার অধীন রহিলেন না—তাঁহারা কেবলমাত্র সুপ্রীম কোর্টের অধীন থাকিলেন ; সুতরাং যা খুশি তাই করিবার অবাধ স্বাধীনতা তাঁহাদের রহিল। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে চাষীদের অবস্থা নিদারুণ হইয়া উঠিল, অথচ তাহার প্রতিবিধান কিছুই হইল না। কিন্তু ক্রমেই ইংরাজ সরকারের কর্মচারিগণ এই অত্যাচার দূর করিবার জন্য একটা নূতন রাজবিধি তৈরি করার প্রযোজন বোধ করিতে লাগিলেন এবং ব্যবস্থাসচিব ভারতবন্ধু বীটন্ সাহেব চারিটি ড্রাফ্‌ট আইন তৈরি করিলেন। এ দেশের ইংরাজেরা এই আইনগুলিকে কালা আইন (Black Acts) নাম দিয়া ইহাদের বিরুদ্ধে এমন এক প্রবল আন্দোলন জাগাইয়া তুলিলেন যে সে আন্দোলনকে দমন করার কোনো সাধ্য এ দেশের লোকের ছিল না। ইংরাজদের হাতেই অধিকাংশ সংবাদপত্র ; তাঁহারা খবরের কাগজে আন্দোলনে করিতে লাগিলেন। তাঁহারা একেবারে পার্লেমেণ্টে আন্দোলন চালাইবার জন্য বিস্তর অর্থ জোগাড় করিলেন। এ দেশের লোকের মধ্যে এক রামগোপাল ঘোষ তাঁহাদের যাহা-কিছু প্রতিবাদ করিয়াছিলেন—আর কেহই কিছু করিতে পারিলেন না। অবশেষে পার্লেমেণ্টে ইংরাজদের পক্ষেরই জিত হইল—কালা আইন আর ব্যবস্থাপক সভায় মাথা তুলিতে পারিল না। এই ভীষণ আন্দোলনের ফলে বীটন্ সাহেব অকালে পরলোকগত হইলেন। তিনিই একমাত্র এদেশবাসীর বন্ধু ও সহায় ছিলেন, সুতরাং তাঁহার মৃত্যুতে দেশের শিক্ষিত সাধারণ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারা বাস্তবিক কি রকম নিঃসহায়। ইংরাজদের মধ্যে মিলিত হইবার শক্তি কেমন আশ্চর্য—তাঁহারা কেবলমাত্র একতার গুণে কেমন অসাধ্য সাধন করিলেন। আর সেই শক্তির অভাবে এ দেশের লোকদের সরকারের কাছে নিজেদের তরফের কথাটার কোনো জোরই পৌঁছিল না। অতএব, প্রজাশক্তিকে জাগাইবার জন্য রাজনৈতিক আন্দোলনের দরকার আছে এবং মিলিত হওয়ারও দরকার আছে, এই কথাটি বিশেষভাবে অনুভব করিয়া তাঁহারা এই উদ্দেশ্যে একটা সভা খাড়া করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন।

দ্বারকানাথ ঠাকুর বেঙ্গল ল্যাণ্ড হোল্‌ডার্‌স্ অ্যাসোসিয়েশন বা বাংলা দেশের জমিদার সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন। তার পর জর্জ টম্‌সন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি নামে এক সভা স্থাপিত করিয়াছিলেন। এই দুই সভাকে যুক্ত

করিয়া ১৮৫১ খৃস্টাব্দের ৩১এ অক্টোবরে "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন" সভা স্থাপিত হইল। তাহার প্রথম সভাপতি, রাজা রাধাকান্ত দেব। কমিটির মধ্যে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, আশুতোষ দেব, রামগোপাল ঘোষ, প্যারিচাঁদ মিত্র প্রভৃতি ছিলেন। আর প্রথম সম্পাদক ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য এই প্রথম বড়ো একটি উদ্যোগে দেবেন্দ্রনাথের মতো ধার্মিক ব্যক্তির সর্বান্তঃকরণে যোগ দেওয়া একটা আশ্চর্য ব্যাপার নয় কি? দেশের সকল মঙ্গল অনুষ্ঠানেই যে তাঁহার উৎসাহ ছিল এবং সেই অনুষ্ঠানকে সফল করিবার জন্য তাঁহার শক্তি, উদ্যম ও অর্থ ব্যয় করিতে তিনি যে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত ছিলেন না, এই স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলন ও রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়াই তাহার পরিষ্কার প্রমাণ। ইহার পর, বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহের আন্দোলনেও তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি ও যোগ ছিল, ইহা আমরা পরে দেখিতে পাইব। দ্বিতীয় খণ্ডে তাঁহার দানের তালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, কনগ্রেস্ যখন স্থাপিত হয় তখন কনগ্রেসের রিসেপশন ফণ্ডে তিনি একবার ৩০০ টাকা ও কনগ্রেসের সাহায্যে একবার এক হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে তাঁহার এমনি উৎসাহ ছিল।

১৮৪৯ সালের আশ্বিনে পুজার সময় দেবেন্দ্রনাথ আসাম দেখিবার জন্য বাহির হইলেন। এবারেও বন্ধু রাজনারায়ণ সঙ্গে গেলেন। রাজনারায়ণবাবু লিখিয়াছেন যে, গঙ্গাসাগর দিয়া সুন্দরবন হইয়া তাঁহারা আসামে যাইবার সংকল্প করেন। স্টীমারের কাপ্তেন সাহেব পেট ভরিয়া খাইতে দিতেন না বলিয়া রাজনারায়ণবাবুর দুঃখের সীমা ছিল না। তিনি লিখিয়াছেন, "কাপ্তেন সাহেব যে লোকে এখন থাকুন না কেন, ঐ অল্প আহার দেওয়ার জন্য তিনি এক্ষণে অনুতপ্ত হইতেছেন সন্দেহ নাই।" একে আহার অল্প, তার উপরে সমস্তই বৈদেশিক খাদ্য। রাজনারায়ণবাবুর প্রাণ তো ওষ্ঠাগতপ্রায় হইল। স্টীমার ঢাকায় পৌছিতেই দেবেন্দ্রনাথকে তিনি অনুনয় করিয়া সেইখানেই নামিয়া পড়িলেন, আর আসামে গেলেন না। এক বন্ধুর বাড়িতে তেল দিয়া স্নান করিয়া এবং মাছের ঝোল ভাত খাইয়া তবে তিনি ঠাণ্ডা হন।

দেবেন্দ্রনাথ গৌহাটি পৌছিয়া সেখান হইতে পায়ে হাঁটিয়া কামাখ্যার মন্দির দেখিতে চলিলেন। ত্রিশ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া পাহাড়ের নীচে আসিয়া পৌছিলেন। পাথরে বাঁধানো পথ একেবারে নীচ হইতে পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত গিয়াছে—পথের দুই ধারে এমন ঘন জঙ্গল যে, চোখ যায় না। তখনো ভোর হয় নাই।

মন্দিরে গিয়া দেখেন, সেখানে কোথায় মন্দির, কোথায় বিগ্রহ, কোথায় বা কারুকার্য! মন্দির একটি পাহাড়ের গহ্বর মাত্র, একটি যোনিমুদ্রা তাহার বিগ্রহ।

ইহার পরের বছর, ১৮৫০ সালের আশ্বিনে সমুদ্র দেখিবার জন্য এক স্টীমারে চড়িয়া তিনি সমুদ্রযাত্রা করিলেন। এই প্রথম তাঁহার সমুদ্রযাত্রা। তিনি লিখিয়াছেন, "তরঙ্গায়িত অনন্ত নীলোজ্জ্বল সমুদ্রে দিনরাত্রির বিভিন্ন বিচিত্র শোভা দেখিয়া অনন্ত পুরুষের মহিমায় নিমগ্ন হইলাম।" প্রথমে তিনি চট্টগ্রামে পৌঁছিলেন—সমুদ্রের উপবে "শ্বেত বালুব চড়া", তাহারি উপরে সেই চট্টগ্রাম শহর। তার পরে সেখান হইতে ব্রহ্মদেশে মুলমীনে গেলেন। সেখানে একজন মাদ্রাজবাসী গভর্মেণ্টের উচ্চ কর্মচারীর বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া কয়দিন তিনি সেইখানেই কাটাইলেন। ব্রহ্মরা বৌদ্ধধর্ম-অবলম্বী, অথচ তাহারা কুমীর খায় দেখিয়া তাঁহার বড়োই খারাপ বোধ হইল। মুলমীনে এক পাহাড়ের গুহা দেখিবার জন্য তিনি এক দলের সঙ্গে বাহির হইলেন। হাতিতে চড়িয়া, জঙ্গল ভাঙিয়া সুরঙ্গের পথে তাঁহারা সেই গুহায় গিয়া পৌঁছিলেন। এত বড়ো প্রকাণ্ড গুহা তিনি জীবনে কখনো দেখেন নাই। উপরের দিকে তাকাইলে দৃষ্টি তাহার উচ্চতাব সীমা পায় না। বৃষ্টির জন্য গুহার ভিতরে প্রকৃতির স্বহস্তের অদ্ভুত কারুকার্য দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হয়!

ব্রহ্মদেশে দেবেন্দ্রনাথের ভ্রমণকালের একটি গল্প মনে পড়িল। দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের বয়স তখন এগারো হইবে। তিনি ইস্কুলে পড়েন। ভূগোলে পড়িয়াছেন যে, সমুদ্রের নীচে জলমগ্ন পাহাড় থাকে, তাহাতে জাহাজ লাগিলে জাহাজ ডুবিয়া যায়। সেই গল্প মায়ের সভায় বলিয়া তাঁহাদিগকে একেবারে আশ্চর্য করিয়া দিবেন, এই কল্পনা করিয়া একদিন মায়ের কাছে সেই নূতন তথ্য তিনি প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার পিতা দেবেন্দ্রনাথ তখন ব্রহ্মদেশে—সারদা দেবী তাঁহার জন্য অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। তখনি লোকজন ডাকাইয়া কর্তাকে টেলিগ্রাম করিবার জন্য তিনি মহা ব্যস্ত হইলেন। বাড়িতে দেবেন্দ্রনাথের একজন আশ্রিত ব্যক্তি ছিলেন, ছেলেদের তিনিই দেখাশুনা করিতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ সমুদ্রের জলমগ্ন পাহাড়ের গল্প বলিয়া মাকে উৎকণ্ঠিত করিয়াছেন শুনিয়া তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথকে দক্ষিণহস্তে এমন কষিয়া পুরস্কার দিলেন যে, গল্পটা যে নিতান্ত অন্নের উপর দিয়া যায় নাই, তাহা বুঝিতে তাঁহার দেরি হইল না! বাস্তবিক দেবেন্দ্রনাথ বিদেশে বিদেশে একলা ঘুরিয়া

বেড়াইতেন বলিয়া তাঁহার বাড়িতে পরিজনদের উদ্‌বেগ ও উৎকণ্ঠার আর অন্ত ছিল না।

ব্রহ্মদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া সেই বছরেই ফাল্গুন মাসে দেবেন্দ্রনাথ পুরী দেখিতে গেলেন। কটকে পাণ্ডুয়া নামে এক জায়গায় তাঁহাব জমিদারি ছিল, জমিদারি দেখিবাব জন্য সেখানে কিছুদিন তিনি থাকিলেন। সেখান হইতে জগন্নাথ দেখিবার জন্য পুরীতে রওনা হইলেন। মন্দিরের বাহিরের দরজায় হাজার যাত্রী জড়ো হইয়াছে। দরজার পর দরজা— যখন শেষ দরজা খুলিল তখন তাহারা হুড়মুড় করিয়া সকলে একসঙ্গে প্রবেশ করিল। দেবেন্দ্রনাথ সেই ভিড়ের ঠেলাঠেলির মধ্যে পড়িয়া কোনো মতে জগন্নাথের রত্নবেদীর সামনে পর্যন্ত আসিলেন। বেদীর সামনে একটা তামার কুণ্ড পূর্ণ জল, তাহাতে জগন্নাথজীব ছায়া পড়িয়াছে। পাণ্ডারা সেই ছায়াকেই দাঁতন করাইল ও তাহাতেই জল ঢালিল। এইরূপে জগৎপতি জগন্নাথেব দাঁতমাজা ও স্নান হইল। তার পবে জগন্নাথকে বেশ ও আভরণ পরানো হইল। তার পরে ঠাকুরের ভোগের পালা। তখন দেবেন্দ্রনাথ চলিয়া আসিলেন। সেখান হইতে তিনি বিমলা দেবীর মন্দিরে গেলেন। তিনি দেবীকে প্রণাম করিলেন না দেখিয়া উড়িয়ারা তো চটিয়া অস্থির। পুরীধামে মহাপ্রসাদ লইয়া ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেই যে জাতিবিচার ভুলিয়া পরস্পর পরস্পরের মুখে প্রসাদ দিতেছিল ও একত্র হইয়া খাইতেছিল, ইহা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন।

এই কাশী, কামাখ্যা, জগন্নাথ প্রভৃতি তীর্থভ্রমণ তাঁহার পক্ষে বিশেষ দরকাব ছিল। ভারতবর্ষে জনসাধারণের মধ্যে ধর্মের অবস্থাটা কিরূপ, ধর্মসংস্কাবক হিসাবে ইহা তাঁহার জানা নিতান্তই কর্তব্য। আমাদের দেশের পূজা ব্যাপার যে কী বাল্যলীলায় পরিণত হইয়াছে, তাহা তীর্থভ্রমণ করিয়া নিজের চোখে না দেখিলে এ দেশে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারেব জন্য অমন একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা এই সময়ে তাঁহার মনকে নাড়া দিত না। স্থানে স্থানে যে তাঁহারি উদ্যোগে ও উৎসাহে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহার আসল কারণ এই তীর্থভ্রমণের জন্য দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও সেই অবস্থার উন্নতির জন্য তাঁহার হৃদয়ের একান্ত ব্যাকুলতা।

১৮৫১ সালের জ্যৈষ্ঠে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। তীর্থ হইতে ফিরিয়াই তাঁহার মনে হইল যে, কয়েকজন যুবাকে ব্রাহ্মধর্ম শিক্ষা দেওয়া নিতান্তই প্রয়োজন। শুধু সাপ্তাহিক সামাজিক উপাসনাতে যোগ দিলে চলিবে না,

উপাসনায় যোগ দিবার উপযুক্ত করিবার জন্য ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা থাকা চাই। এইজন্য ১৮৫১ সালের (১৭৭৩ শক) জ্যৈষ্ঠের তত্ত্ববোধিনীতে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি দেখিতে পাই—"দুইজন ছাত্রকে ব্রাহ্মধর্ম অধ্যয়ন করানো যাইবেক, তাঁহারা প্রত্যেকে মাসিক বৃত্তি দশ টাকা করিয়া পাইবেন। যাঁহার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসরের ন্যূন না হয় এবং পঞ্চবিংশতি বৎসরেব অধিক না হয় ও ব্যাকরণে বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকে, তিনি এইরূপ ছাত্র হইবার যোগ্য হইবেন। যিনি এইরূপ অধ্যয়ন করিতে প্রার্থনা করেন, তিনি আগামী ১লা শ্রাবণের মধ্যে আমার নিকটে আবেদনপত্র প্রদান করিবেন।—শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ— ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য।"

ঐ বছরের পৌষে রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে তিনি লিখিয়াছেন— "তোমার ভ্রাতাদিগের কি প্রকার লেখা পড়া হইতেছে? বোধ হয় তোমারই বিদ্যালয়ে তাহারা ভুক্ত হইয়াছে। যে প্রকার তুমি দেখিয়াছ যে, আমি কতক বালককে ব্রাহ্মধর্ম অধ্যাপনা করিতেছি, সেই প্রকার তুমি তোমার ভ্রাতাদিগকে পড়াইলে অনেক উপকার হয়। অপরা বিদ্যার সহিত তাহারদিগকে পরাবিদ্যার উপদেশ দিতে অবহেলা করিবে না।...যদি বিবেচনা কর, ব্রহ্মবিদ্যা অতি কঠিন বিদ্যা, ইহা বালকের শিখিবার উপযুক্ত নহে, তবে পরে ইহার জন্য সন্তাপ করিতে হইবে। যখন মনে নিকৃষ্ট বৃত্তি সকল প্রবল হইবে, কামক্রোধাদি বলবান হইবে, যখন যৌবনের তরঙ্গ করালমূর্তি ধারণ করিবে, তখন তাহাতে সেতুবন্ধনের চেষ্টা অবশ্য বিফল হইবে—তখন তাহাতে উৎকৃষ্ট বৃত্তিসকলকে উন্নত করিবার যত্ন অবশ্য বৃথা হইবে। সেই যৌবনকালের পূর্বে, সেই তরঙ্গ উঠিবার পূর্বে সেতুবন্ধন করা আবশ্যক। পয়োগতে কিং খলু সেতুবন্ধঃ। ঈশ্বরেতে প্রীতিবৃত্তির পোষকতা ধর্মবৃত্তিসকলের পোষকতা বালককাল অবধি যদি মানবজাতি না পায়, তবে তাহার যে অবস্থা হয়, তাহার দৃষ্টান্ত, রাজকীয় বিদ্যালয়ের সহস্র সহস্র পূর্বকার ছাত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব আমার বিবেচনায় ১১।১২ বৎসর অবধি বালককে সহজে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করা উচিত। আমি এখানে ব্রাহ্মধর্ম বালকদিগকে পড়াইবার যে নিয়ম করিয়াছি তাহা অবশ্য তুমি অবগত আছ। প্রতি রবিবার অতি প্রত্যূষ হইতে দশ ঘণ্টা পর্যন্ত পড়ান হয়। ইহাতে এখানে ১২।১৩ জন ছাত্রের অধ্যাপনা হইতেছে। মন্দ কি? ক্রমে ছাত্রবৃদ্ধি হইবারও সম্ভাবনা আছে। এই ক্ষণে ব্রাহ্মধর্মের উন্নতি, ইহার প্রতি আমার বিশেষ নির্ভর হইয়াছে। কাল গৌণে আমার কোন খেদ নাই; উত্তম পত্তন পাইলেই সুখ

হয়। আমি অতি আহ্লাদ পূর্বক অবগত হইলাম যে, তুমি সেখানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছ। সকল বিষয়েরই আরম্ভ 'ছোট্টো খাট্টো', তজ্জন্য নিরাশ হইবে না।"

ভাবী ব্রহ্মবিদ্যালয়ের এই প্রথম সূত্রপাত। তাঁহার নিজের ছেলেদের মধ্যে এই বিদ্যালয়ে তখন দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং সত্যেন্দ্রনাথেরই যোগ দেওয়ার বয়স হইয়াছে। তাঁহারা পিতার কাছে ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা পাইতে লাগিলেন। অল্প বয়সেই তাঁহাদের ভিতরে ধর্মভাবের উদ্দীপন ও মানসিক বিকাশের কারণ ছিল এই শিক্ষা—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

রমানাথ ঠাকুরের পুত্র নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর এতকাল ধরিয়া তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে ১৭৭৫ শক ১৮৫৩ খৃস্টাব্দের জ্যৈষ্ঠে দেবেন্দ্রনাথ ঐ সভার সম্পাদক নিযুক্ত হন। তত্ত্ববোধিনী সভার নিয়মাবলীতে সম্পাদকের কর্তব্য যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নিতান্ত সামান্য ছিল না। "সম্পাদক সভার সমস্ত কার্য নির্বাহ করিবেন, সাম্বৎসরিক ও বিশেষ সভা ও অধ্যক্ষ সভার কার্যবিবরণ লিখিয়া রাখিবেন, সভার প্রাপ্য টাকা যথাবিহিত অঙ্গীকার-পত্র দিয়া গ্রহণ এবং সভার প্রয়োজনমতে যথানিয়মে তাহা ব্যয় করিবেন, আয়ব্যয়ের বিবরণ প্রতি মাসে অধ্যক্ষদিগকে অবগত করিবেন এবং সভার নিয়মরক্ষায় সতত সতর্ক থাকিবেন।" আমার এটুকু তুলিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্য কেবল এই যে, দেবেন্দ্রনাথকে যাঁহারা একান্ত কর্মবিমুখ ধ্যানপরায়ণ সাধক ভাবিয়া থাকেন, তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত যে, অধ্যাত্মজীবনের আরম্ভ হইতে আর এই আঠারো বছর কাল পর্যন্ত তিনি কী অক্লান্তভাবে শ্রম করিয়াছেন। তিনি যদি "কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে" দেশের অজ্ঞান ও মোহের কঠিন পাথর ভাঙিয়া পথ কাটিবার চেষ্টা না করিতেন, কেবল "অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে" "ভজন পূজন সাধন আরাধনা" লইয়াই কাল কাটাইতেন, তবে দেশের কাছে তাঁহার পরমার্থ সাধনের কোনো অর্থই থাকিত না। তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদকতা, ব্রাহ্মধর্ম শিক্ষা দান, ব্রাহ্মসমাজের আচার্যের কাজ, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রবন্ধ সংশোধন ও তাহাতে নিয়মিত লেখা, ঋগ্‌বেদ অনুবাদ, বিষয়পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান—এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রের রীতিমত আলোচনা—দেকার্ত প্রভৃতির দর্শন, চামার্স, থিয়োডোর পার্কার, নিউম্যান্ প্রভৃতি ব্রহ্মবিদ্‌দের রচনা, বেদান্ত দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন—এতগুলি কাজ একসঙ্গে নির্বাহ করা

কি আশ্চর্যের বিষয় নয়? ইহার উপরে আবার তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক হইয়াছিলেন এবং তাহার কাজেও তাঁহাকে যথেষ্ট মনোযোগ দিতে হইত।

এতদিন ধরিয়া গিরীন্দ্রনাথ বিষয়সম্পত্তি দেখিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং সে সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ একেবারেই নিশ্চিন্ত ছিলেন। ১৮৫৪ খৃস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার অভাবে হাউসের কাজ চালানো কঠিন হইয়া উঠিল। এতদিনে অনেক ঋণ শোধ হইয়াছে বটে, কিন্তু শোধ হইতে অনেক বাকিও আছে। কোনো কোনো পাওনাদারেরা টাকা পাইবার বিলম্ব দেখিয়া নালিশ করিয়াছে এবং ডিক্রিও পাইয়াছে। তত্ত্বোধিনী সভার সম্পাদক হইয়া অবধি তিনি সভার কাজ দেখিবার জন্য প্রতিদিন দুপরবেলা ব্রাহ্মসমাজের দোতলায় সভার কার্যালয়ে থাকিতেন। একদিন তিনি সভায় যাইতেছেন, এমন সময়ে বাড়ির লোকেরা তাঁহাকে বলিল— আজ সভায় যাবেন না, আজ একটা ওয়ারেন্টের আশঙ্কা আছে। নিষেধ সত্ত্বেও তিনি সভায় গেলেন এবং সেখানে কিছুক্ষণ পরে একজন কেরানী মুখ চোখ লাল করিয়া বলিল— 'আজ আপনাকে এখানে আসিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইয়াছিলাম, আপনি আজ এলেন কেন?' এবং তার পরে তাহার অনুগামী বেলিফকে বলিল— 'ইনিই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।' বেলিফ তাঁহাকে ওয়ারেন্ট দিল— ১৪০০০ টাকা তখনি দিতে হইবে। টাকা দিতে না পারায় সে তাঁহাকে সেরিফের কাছে লইয়া গেল। বাড়িতে গোল উঠিল যে দেবেন্দ্রনাথকে ওয়ারেন্ট দিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। তাঁহার ছোটো ভাই নগেন্দ্রনাথ জজ সাহেবের কাছে গিয়া উপস্থিত— জজ ভাগ্যক্রমে তাঁহাদেরি উকিল ছিলেন। তিনি জামিন দিয়া দেবেন্দ্রনাথকে খালাস করিবার পরামর্শ দিলেন। যাক সে যাত্রা জেলে যাওয়ার দায় হইতে তিনি মুক্ত হইলেন। তাঁহার খুড়া প্রসন্নকুমার ঠাকুর এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্ষোভ করিয়া বলিলেন— 'দেবেন্দ্র তো আমাকে কিছুই বলে না, আমাকে জানাইলেই তো আমি তার ঋণের সব বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারি।' দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার কাছে গেলে তিনি তাঁহার দেনা শোধের সমস্ত ভার লইলেন। দেবেন্দ্রনাথ নিশ্চিন্ত হইয়া গেলেন। প্রায় প্রতিদিন সকালে গিয়া তাঁহাকে হিসাবপত্র দেখাইয়া আসিতে হইত। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের এক প্রিয় মোসাহেব নব বাঁড়ুয্যা সর্বদাই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত ও তাঁহার একমাত্র বিশ্বাসের পাত্র ছিল। একদিন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের কাছেই সে দেবেন্দ্রনাথকে বলিল যে, তত্ত্বোধিনী পত্রিকা বড়ো উত্তম

কাগজ, ইহা পড়িলে জ্ঞান হয়, চৈতন্য হয়। দেবেন্দ্রনাথ তাহাকে বলিলেন, 'তুমি কি তত্ত্ববোধিনী পড়? পোড়ো না পোড়ো না।' প্রসন্নকুমার ঠাকুর বলিলেন, 'কেন? তত্ত্ববোধিনী পড়িলে কি হয়?' তিনি বলিলেন— 'তত্ত্ববোধিনী পড়িলে আমার যে দশা তাই হয়।' প্রসন্নকুমার ঠাকুর এই জবাবে খুব হাসিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, 'আরে, দেবেন্দ্র কোব্‌লো জবাব দিল— একেবারে যে কোব্‌লো জবাব দিল। দেবেন্দ্রনাথকে একটু পরীক্ষা করিয়া দেখিবার ছলে তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন— 'আচ্ছা, ঈশ্বর যে আছেন তাহা আমাকে বুঝাইয়া দাও দেখি?' তিনি তাহার উত্তরে বলিলেন— 'ঐ দেওয়ালটা যে ওখানে আছে আপনি তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিন দেখি।' প্রসন্নকুমার ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, 'আরে, দেওয়াল যে ঐ রহিয়াছে আমি দেখিতেছি— ইহা আর বুঝাইব কি?' দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন— 'ঈশ্বর যে এই সর্বত্র রহিয়াছেন আমি দেখিতেছি, ইহা আর বুঝাইব কি?' প্রসন্নকুমার ঠাকুর বলিলেন— 'ঈশ্বর আর দেওয়াল বুঝি সমান হইল? হাঃ দেবেন্দ্র বলে কি?' দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন— 'এই দেওয়াল হইতেও ঈশ্বর আমার নিকটের বস্তু— তিনি আমার অন্তরে আছেন, আমার আত্মাতে আছেন। যাঁহারা ঈশ্বরকে মানেন না শাস্ত্রে তাঁহাদের নিন্দা আছে। "অসত্যাস্তে প্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরং" অসুরেরা অসত্যকে অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহারা জগতে ঈশ্বর নাই বলিয়া থাকে।'

অনুমান বা তর্ক যে ব্রহ্মজ্ঞানের ভিত্তি হইতে পারে না, তাহা দেবেন্দ্রনাথ বেদান্তাদি শাস্ত্র আলোচনা করিয়া এবং বিশেষভাবে নিজের অধ্যাত্ম-অভিজ্ঞতার দ্বারা ভালো রূপেই বুঝিয়াছিলেন। শ্রুতিতে আছে— নৈষা তর্কেণ মতিরাপনীয়া। অনুমানাদি দ্বারা আত্মার সত্তা প্রমাণ করা সম্বন্ধে শঙ্করের একটি উক্তি আছে—

"মানং প্রবোধয়ন্তং মানং যে মানেন বুভুৎসন্তে,
এধোভিরেব দহনং দগ্ধুং বাঞ্ছন্তি তে মহাসুধিয়ঃ।"

অর্থাৎ "প্রমাণক্রিয়াতে বল সঞ্চার করে যে সাক্ষাৎ জ্ঞান, সেই সাক্ষাৎ জ্ঞানকে যাহারা প্রমাণ দ্বারা আয়ত্ত করিতে ইচ্ছা করেন— সেই-সকল মহাপণ্ডিতেরা ইচ্ছা করেন কি? না, ইন্ধন কাষ্ঠে দাহিকাশক্তি সঞ্চার করে যে অগ্নি, সেই অগ্নিকে ইন্ধন কাষ্ঠ দ্বারা দগ্ধ করিতে।"*

আমরা দেখিয়া আসিলাম যে, এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ কাজের জালে একেবারে আপনাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছিলেন। কাজ যে 'বিপুল আকার' ধারণ

* শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অনুবাদ।

করিয়া তাঁহাকে নিবিড় নীরন্ধ্রভাবে বেড়িয়া ধরিয়াছিল বলিয়াই তাঁহার মনটা ভিতরে ভিতরে ছুটির জন্য ব্যাকুল হইতেছিল, এ কথা মনে করা ঠিক হইবে না। অবশ্য ইহার পরেই দীর্ঘকালেব মতো সমস্ত কাজ হইতে তিনি অবসর গ্রহণ করিলেন ও হিমালয়ে চলিয়া গেলেন। কিন্তু তাহার কারণ ভিন্ন।

যদিও দশ বছরে পিতৃঋণ অনেকটা শোধ হইয়া গেল, তবুও এক নূতন ঋণে তিনি জড়াইয়া পড়িলেন। গিরীন্দ্রনাথ বাঁচিয়া থাকিতে অনেক ঋণ করিয়া গিয়াছিলেন—সেই ঋণ পিতৃঋণেব সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ কতক কতক শোধ করিয়াছিলেন। এখন নগেন্দ্রনাথ নিজের খরচের জন্য অত্যন্ত বেশি মাত্রায় ধারকর্জ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি অতিশয় বদান্য ব্যক্তি ছিলেন—তাঁহার বন্ধুবান্ধব, আশ্রিত শরণাগত লোকদিগের সাহায্যে তাঁহার দান সংকুচিত হইতে জানিত না। কাহাকেও হয়তো দশ হাজার টাকা সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, নিজের টাকা না থাকায় ধার করিয়া সেই প্রতিশ্রুতি তাঁহাকে রক্ষা করিতে হইয়াছে। একদিন একজন ঋণদাতা তাঁহাকে টাকার জন্য কিছু কড়া কথা শুনাইয়া দেয়, তিনি দেবেন্দ্রনাথের কাছে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন। তিনি বলিলেন যে, ঋণদাতাকে তিনি যে নোট লিখিয়া দিয়াছেন, তাহাতে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার সহিত স্বাক্ষর না করিলে সে তাঁহাকে ছাড়িতেছে না। দেবেন্দ্রনাথ খতে সহি দিতে অস্বীকার করায় তিনি একটি দেওয়ালে ঠেস দিয়া তিন ঘণ্টা কাঁদিলেন। সেই কান্নায় দেবেন্দ্রনাথের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু তিনি নোটে সহি দিলেন না। তিনি বলিলেন, "পরিশোধ করিবার উপায় না জানিয়া আমি ধর্মের বিরুদ্ধে কর্জা নোটে সহি দিতে পারিব না।" দাদা আমাকে সাহায্য করিলেন না বলিয়া নগেন্দ্রনাথ অভিমান করিয়া বাড়ি হইতে চলিয়া গেলেন এবং তাঁহার ছোটো কাকা রমানাথ ঠাকুরের বাড়িতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তার পর দেবেন্দ্রনাথ আট হাজার টাকার নোটে সহি দিলেন এবং নগেন্দ্রনাথ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তাঁহাদের যত বই আছে সমস্ত বিক্রয় করিয়া ঐ টাকা শোধ দিবেন। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ আর বাড়িতে আসিলেন না। এই ঘটনায় দেবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। তিনি মনে ভাবিলেন যে, বাড়িতে থাকিলেই এই-সব উপদ্রব হইতে থাকিবে এবং ক্রমে ঋণও বাড়িতে থাকিবে। সুতরাং তিনি বাড়ি ছাড়িয়া যাইবার সংকল্প করিলেন।

কিন্তু নগেন্দ্রনাথের এই ব্যবহারই যে তাঁহার সংসার হইতে উপরত হইবার

প্রধান কারণ তাহা নয়। তখন দেশে যে আন্দোলন সকল হইতেছিল, তাহার কোনোটারই প্রসার খুব বড়ো ছিল না। বাংলা গদ্যসাহিত্যে যে দুই জন প্রতিভাবান পুরুষ এক নবযুগ আনিতেছিলেন— ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত— তাঁহারা দুজনেই আধ্যাত্মিকতার চেয়ে নৈতিকতাকেই বড়ো বলিয়া জানিতেন। সেইজন্য দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমার দত্ত সম্বন্ধে আক্ষেপ করিয়া এক জায়গায় লিখিয়াছেন, "আমি কোথায় আর তিনি কোথায়! আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ, আর তিনি খুঁজিতেছেন বাহ্য-বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ। আকাশ পাতাল প্রভেদ!" অক্ষয়কুমার দত্ত ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার আবশ্যকতাই স্বীকার করিতেন না। তিনি বলিতেন, "কৃষিজীবী লোক পরিশ্রম করিয়া শস্য লাভ করে, কিন্তু জগদীশ্বরের সমীপে প্রার্থনার দ্বারা কোনো কৃষাণের কস্মিন্‌কালেও শস্য লাভ হয় নাই।" তিনি বীজগণিতের সমীকরণ প্রণালীতে প্রার্থনার শক্তি যে কিছু নয় তাহা নিম্নলিখিত রূপ দেখাইয়াছিলেন—

পরিশ্রম = শস্য

পরিশ্রম ও প্রার্থনা } = শস্য

অতএব, প্রার্থনা = 0

এই সমীকরণ ব্যাপার লইয়া ছাত্রমহলে মহা তোলপাড় হয়। রাজনারায়ণ বসু ইহার প্রতিবাদ ছলে পত্রিকায় এক বক্তৃতা প্রকাশ করেন। তিনি সেই প্রবন্ধে লেখেন, "অনেকে এইরূপ স্থির করিলেন যে…পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিবার কোনো প্রয়োজন বোধ হয় না— তিনি প্রার্থনা করিবার পূর্বাবধি তাবৎ বস্তু আমারদিগের মঙ্গলের নিমিত্তে প্রেরণ করিতেছেন। …অকাম হইয়া সত্য ও তপস্যার দ্বারা এবং তাঁহাতে মনের অভিনিবেশ দ্বারা যে উপাসনা সেই তাঁহার সাক্ষাৎ উপাসনা।" ইত্যাদি।

দেবেন্দ্রনাথের 'পত্রাবলী'তে এই সময়ে লিখিত দু-একটা পত্র পড়িলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তত্ত্ববোধিনী সভায় অক্ষয়বাবুর দলের প্রাধান্য হওয়ায় রাজনারায়ণ-বাবুর সঙ্গে তাঁহাদের একটু-আধটু খিটিমিটি চলিতেছিল। একবার রাজনারায়ণ-বাবু মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজে একটা বক্তৃতা পড়েন, সেই বক্তৃতা দেবেন্দ্রনাথের অত্যন্ত ভালো লাগিয়াছিল— কিন্তু তত্ত্ববোধিনী সভার গ্রন্থাধ্যক্ষেরা তাহা পত্রিকায় প্রকাশযোগ্য মনে করেন নাই। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে পত্রে লিখিতেছেন,

(২৬ ফাল্গুন ১৭৭৫)—"এ বক্তৃতা আমার বন্ধুদিগের মধ্যে যাঁহারা শুনিলেন তাঁহারাই পরিতৃপ্ত হইলেন ; কিন্তু আশ্চর্য এই যে তত্ত্ববোধিনী সভার গ্রন্থাধ্যক্ষেরা ইহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশযোগ্য বোধ করিলেন না। কতকগুলান নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে, ইহারদিগকে এ পদ হইতে বহিষ্কৃত না করিয়া দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুবিধা নাই।"

অক্ষয়কুমার দত্ত 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থের উপরেও সন্তুষ্ট ছিলেন না— কারণ ঐ গ্রন্থের প্রচারে বেদ-উপনিষদেব প্রভাব ব্রাহ্মসমাজের উপর সমানই রহিয়া গেল। তিনি ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে এক বক্তৃতায় বলেন যে, "ভাস্কর ও আর্যভট্ট এবং নিউটন ও লাপ্লাস যে কিছু যথার্থ বিষয় উদ্‌ভাবন করিয়াছেন তাহাও আমাদের শাস্ত্র। গৌতম ও কণাদ এবং বেকন ও কোম্ত যে কোনো প্রকৃত তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত্র।" মূল প্রবন্ধে লাপ্লাস ও কঁতের নাম ছিল। এই দুইটি নাম নাস্তিকের নাম বলিয়া পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার সময় ব্রাহ্মসমাজের কোনো কর্মাধ্যক্ষ তাহা উঠাইয়া দেন। তাহাতে অক্ষয়বাবুর বিশেষ বিরক্তির কারণ হয়। তিনি ব্রাহ্মধর্মকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বমূলক ডীজ্‌ম্ করিবার জন্য একান্তভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধবিচারে'র দ্বিতীয় ভাগের বিজ্ঞাপনে তিনি লিখিতেছেন,"বিশ্বপতি যে সকল শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্বরাজ্য পালন করিতেছেন, তদনুযায়ী কার্যই তাঁহার প্রিয়কার্য ; এবং তাঁহার প্রতি প্রীতিপ্রকাশপূর্বক তৎসমুদায় সম্পাদন করাই আমাদের একমাত্র ধর্ম।"

ব্রাহ্মসমাজের নূতন ধর্মগ্রন্থ 'ব্রাহ্মধর্ম' যেমন অক্ষয়কুমারের ভালো লাগিত না, তেমনি ব্রহ্মোপাসনা-পদ্ধতিরও তিনি বিরোধী ছিলেন। সংস্কৃত মন্ত্র বাদ দিয়া নিছক বাংলা ভাষায় উপাসনা হয়, ইহাই তিনি ইচ্ছা করিতেন। এটা যে শুধু তাঁহার একলার ইচ্ছা ছিল তাহা নয়। এ ইচ্ছা তখন অনেকগুলি ব্রাহ্মের মনে উদয় হইয়াছিল। স্বর্গীয় রাখালদাস হালদারের তাঁহার এক বন্ধুকে লিখিত এক চিঠি পড়িলে বেশ বুঝা যায় যে, তাঁহার মতও অক্ষয়বাবুরই অনুরূপ ছিল। চিঠিটার দু-এক টুকরা উদ্‌ধৃত করিয়া দিতেছি—

২৩ শ্রাবণ ১৭৭৬ শক— "ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ অসম্পূর্ণ বোধ হইতেছে। তাহাতে এমত কতকগুলি শ্লোক আছে, যাহা লোকদের বুঝাইবার নিমিত্ত এক নূতন অভিধান প্রস্তুত করিতে হয়। এতৎ পরিবর্তে এমন গ্রন্থ প্রস্তুত করা উচিত বোধ হয় না— যাহা লোকেরা এককালে বুঝিতে পারে ?

"উপাসনার সময় সংস্কৃত ভাষা ব্যবহারের দ্বারা অনেক ব্যাঘাত ঘটে, সে ভাষা অধিকাংশ লোকেই বুঝিতে অশক্ত, অতএব বাংলাতে উপাসনা করিলেই উত্তম হয়।"

ঐ বছরেই অগ্রহায়ণ মাসে রাখালদাস হালদার 'ব্রাহ্মদিগের বর্তমান আন্তরিক অবস্থা বিষয়ক পর্যালোচনা' নাম দিয়া এক আবেদন লিখিয়া দেবেন্দ্রনাথকে পাঠাইয়া দেন। তাহাতে ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে তিনি লেখেন, "তাহা (ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ) যে প্রকার ভাষায় লিখিত, তাহা এইক্ষণকার পক্ষে সুশ্রাব্য নহে। প্রাচীনকালের মুনিঋষিরা যে প্রকার অবস্থায় অবস্থিত ছিলেন, আমরা সে প্রকারে অবস্থিত নহি। সুতরাং পরমেশ্বর বিষয়ে মনের ভাব প্রকাশের যে প্রকার রীতি তাঁহাদের ছিল আমাদের সেরূপ নহে।" তার পরে ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থের বাক্যগুলি অনেক স্থলেই স্ববিরোধী, সুতরাং দুর্বোধ— এই এক আপত্তি তিনি প্রকাশ করেন। যেমন এক জায়গায় বলা হইল তিনি মনের গম্য নহেন— আবার বলা হইল— মনোরূপ উজ্জ্বল কোষমধ্যে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা যায়। উপাসনা-পদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি লেখেন, "এক পদ্ধতিই চিরকালের নিমিত্ত নির্দিষ্ট আছে। ঈদৃশ নিয়মের এক দোষ এই যে, দুর্বল উপাসকেরা অমনোযোগী হইয়া পড়ে। উপাসনাকালীন সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর।…যদি কেহ বলেন যে, যে-সকল সংস্কৃত বচন নির্দিষ্ট আছে তাহার অর্থ জানিলেও তো হইতে পারে ? তদ্‌বিরুদ্ধে আমাদের উত্তর এবং জিজ্ঞাস্য এই যে, তাহার প্রয়োজন কি ?" আবেদনের শেষে তিনি ব্রাহ্মসমাজে কতকগুলি পরিবর্তন আনিবার প্রস্তাব করেন। সে প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীন কালের সঙ্গে আর একেবারেই যোগ থাকে না। তাহা অত্যন্ত বেশি মাত্রায় উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যপরায়ণ হইয়া উঠে। রাখালদাস হালদার তাঁহার আবেদনের উপসংহারে লিখিতেছেন, "আমাদের প্রস্তাব এই যে, ব্রাহ্মেরা… সংস্কৃতে শ্রুতিপাঠ ও ব্রাহ্মধর্ম-পাঠের পরিবর্তে বঙ্গভাষায় পরমেশ্বর প্রসঙ্গ ও আপনাদের কর্তব্যাকর্তব্যের বিষয়ে কথোপকথন করিবেন।…কাহারো যদি কোনো বিষয়ে ভ্রম থাকে, তবে উপস্থিত সভ্যেরা সহৃদয়ে তাহার অপনয়নে যত্ন করিবেন।" অর্থাৎ ব্রাহ্মরা ব্যক্তিগত যুক্তিকেই সত্যাসত্য নির্ধারণের কষ্টিপাথর করিবেন।

তখনকার ব্রাহ্মদের সম্বন্ধেও রাখালদাস হালদারের ঐ আবেদনপত্রে যেটুকু তথ্য পাওয়া যায়, তাহাও বিশেষ আশাজনক নয়। তিনি লিখিতেছেন, "সকলে

সমবেত হইয়া আমোদের সহিত ভোজন করিব, উত্তম অট্টালিকাতে নিবসতি করিব, উত্তম বস্ত্র পরিধান করিব, উত্তম যানে আরোহণ করিব, এবং ঈশ্বর বর্তমান আছেন, এইরূপ বিশ্বাস করিব , তাঁহারদেব (ব্রাহ্মদের) প্রিয় অভিপ্রায় এই যে, এই সকল বিষয় সম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মধর্মের চরম উদ্দেশ্য সফল হইল। তাঁহারদের বিবেচনায় অন্তর্মনুষ্যকে সচ্চরিত্র, শ্রদ্ধাবান এবং ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন করা তত আবশ্যক নহে, বহির্মনুষ্যকে যত সুসজ্জিত, সুশোভিত এবং সুসভ্য করা বিহিত। হা! ধর্ম এমত স্থল হইতে পলায়ন করেন।" কোনো কোনো প্রাচীন লোকের কাছে শুনিয়াছি যে, গ্রামে গ্রামে পর্যন্ত 'ব্রাহ্ম' বলিয়া পরিচয় দেওয়া তখন একটা ফ্যাশান দাঁড়াইয়া গিয়াছিল, কারণ ব্রাহ্ম বলিলেই সুসভ্য বাবু লোক বুঝাইত। দেশের লোকের বিশ্বাস ছিল যে, ধর্মের ছলে ব্রাহ্মরা আমোদপ্রমোদের জন্যই একত্রিত হয়। মদ্যপানটা ব্রাহ্মদের মধ্যে রীতিমত চলিত ছিল।

দেবেন্দ্রনাথ নিজেই রাখালদাস হালদারের কথায় সায় দিয়া লিখিয়াছেন, "এখানে যাঁহারা আমার অঙ্গস্বরূপ, যাঁহারা আমাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের মধ্যে আর কোন ধর্মভাব ও নিষ্ঠাভাব দেখিতে পাই না। কেবলি নিজের বুদ্ধি ও ক্ষমতার লড়াই। কোথাও মনের মত সায় পাই না।"

১৮৫২ খৃস্টাব্দে অক্ষয়কুমার দত্তের উদ্যোগে এক আত্মীয়-সভা স্থাপিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার সভাপতি হন এবং অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদক হন। ঈশ্বর বিষয়ে আলোচনা করা এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। অক্ষয়বাবু হাত তুলিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে মীমাংসা করিতে শুরু করিলেন। একজন বলিলেন, "ঈশ্বর আনন্দস্বরূপ কি না?" যাহাদের আনন্দস্বরূপে বিশ্বাস আছে, তাহারা হাত উঠাইল। এমনি করিয়া ভোট লইয়া ঈশ্বরের স্বরূপের সত্যাসত্য নির্ধারিত হইত। এই-সকল ব্যাপার ক্রমশ জমিতে জমিতে দেবেন্দ্রনাথের মনকে ধর্ম প্রচারের সকল রকমের উদ্যোগ ও আয়োজন হইতে একেবারে বিমুখ করিল। তিনি লিখিতেছেন, "...আমার বিরক্তি ও ঔদাস্য অতিশয় বৃদ্ধি হইল।

"ইহাতে আমার এই একটি মহৎ উপকার হইল যে, এখন আমি আত্মার গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করিয়া পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিবার জন্য ব্যগ্র হইলাম। আত্মার মূলতত্ত্ব কি, ইহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। হৃদয়ের উচ্ছ্বাস-স্রোতে যে-সকল সত্য ঈশ্বরের প্রসাদে আমার নিকট ভাসিয়া আসিয়াছে, তাহা জ্ঞানালোকে পরীক্ষা করিতে এবং তাহার নিগূঢ় অর্থসকল আবিষ্কার করিয়া তাহা জীবনে পরিণত করিতে দৃঢ় যত্নবান হইলাম।

"অয়াঁ ন শুদ্, কে চেরা আমদম্, কুজা বুদম্।
দর্দ ও দরেগ্, কে গাফিল্ জে কাবে খেশ্‌তনম্।
—দীবান্ হাফিজ, ৩৮৩।৩

'প্রকাশ হল না যে, কোথায় ছিলাম, এখানে কেন আইলাম; দুঃখ ও পরিতাপ যে, আপনার কাজ আপনি ভুলিয়া রয়েছি।' কোথায় ছিলাম, কেন এখানে আইলাম, আবার কোথায় যাইব, অদ্যাপি আমার নিকটে প্রকাশ হইল না। অদ্যাপি এখানে থাকিয়া ব্রহ্মকে যতটা জানা যায়, তাহা আমার জানা হইল না; আর আমি লোকেদের সঙ্গে হো হো করিয়া বেড়াইব না, বৃথা জল্পনা করিয়া আর সময় নষ্ট করিব না। একাগ্রচিত্ত হইয়া একান্তে তাঁহার জন্য কঠোর তপস্যা করিব। আমি বাড়ী হইতে চলিয়া যাইব, আর ফিরিব না।"

এমার্সন এই অবস্থার কথাই তাঁহার "Spiritual Laws" প্রবন্ধে সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন—"We are full of mechanical actions....Our Sunday schools and churches and pauper societies are yokes to the neck. ...Let man regard no good as solid, but that which is in his nature, and which must grow out of him as long as he exists.... Why should we be cowed by the name of action ?...The poor mind does not seem to itself to be anything, unless it have an outside badge....The rich mind lies in the sun, and sleeps, and is Nature. To think is to act."

ইহার অর্থ: আমরা যান্ত্রিক কাজে একেবারে ভরিয়া আছি। আমাদের সাপ্তে ইস্কুল, গির্জা, দরিদ্রের জন্য হিতসাধন সমিতি সমস্তই ঘাড়ের উপরে জোয়ালের মতো চাপিয়া আছে। যে ভালোটা মানুষের প্রকৃতির মধ্যে অন্তর্নিহিত ভাবে নাই এবং যাহা তাহার জীবিতকাল পর্যন্ত তাহার ভিতর হইতে বাড়িয়া উঠিবে না, সে ভালোকে মানুষ যেন যথার্থ ভালো বলিয়া না মনে করে। আমরা কাজের নামে কাবু হইয়া যাই কেন? সংকীর্ণ যাহার মন, সেই একটা বাহিরের তকমা না থাকিলে আপনাকে শূন্য বলিয়া জ্ঞান করে— কিন্তু যাহার মন বৃহৎ, সে সূর্যকিরণের মধ্যে শয়ন করিয়া থাকে, সে সেইখানেই সুপ্ত থাকে, সে বিশ্বপ্রকৃতি হইয়া যায়। চিন্তাই যে যথার্থ কাজ।

১৮৫৬ সালের শ্রাবণ মাসে দেবেন্দ্রনাথ বরাহনগরে গোপাললাল ঠাকুরের বাগানে ছিলেন। তখন তিনি শ্রীমদ্ভাগবত পড়িতেন। একটি শ্লোক তাঁহার মনে লাগিয়া গেল:

"আময়োষশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত।
তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতং ॥

"হে সুব্রত, জীবদিগের যে রোগ যে দ্রব্য দ্বারা জন্মে, সে দ্রব্য কখনো রোগীকে আরাম করিতে পারে না।—আমি সংসারে থাকিয়াই এই বিপদ-ঘোরে পড়িয়াছি, অতএব এ সংসার আর আমাকে এ বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। অতএব এখান হইতে পলাও।

"সন্ধ্যার সময়ে আমি এই বাগানে গঙ্গাতীরে বন্ধুদিগের সঙ্গে বসিতাম। বর্ষার ঘন মেঘ আমার মাথার উপরে আকাশ দিয়া উড়িয়া উড়িয়া চলিয়া যাইত। সেই নীল নীরদ আমাকে তখন বড়ই সুখ দিত, বড়ই শান্তি দিত। মনে করিতাম, ইহারা কেমন কামাচার। কেমন মুক্ত ভাবে যেখানে সেখানে ইচ্ছামত চলিয়া যাইতেছে। আমি যদি ইহাদের মত কামচার হইতে পারি, ইচ্ছামত যেখানে সেখানে চলিয়া যাইতে পারি, তবে আমার বড়ই আনন্দ হয়।...তখন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম, কখন আশ্বিন মাস আসিবে,—আমি এখান হইতে পলাইব, সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইব, আর ফিরিব না।

তোরা জে কঙ্গুরয়ে অর্শ্ মী জননন্দ্ সফীর,
ন দানমৎ কে দরী দাম্গহ্চে উফতাদ্ অস্ত।

—দীবান্ হাফিজ, ২৩।৭

সপ্তম স্বর্গ হইতে তোমার আহ্বান আসিতেছে, না জানি, এই পৃথিবীর মোহ-পাশে তোমার কি কাজ আটকাইয়াছে।"

এমার্সন বলিয়াছেন যে, কর্ম যখন মানুষের আত্মাকে আচ্ছন্ন করিয়া দাঁড়ায়, তখন মানুষ বনে চলিয়া যাক—"In the woods, a man casts of his years as the snake his slough, and at what period soover of life, is always a child....In the woods we return to reason and faith ...Standing on the bare ground,— my head bathed by the blithe air and uplifted into infinite space,— all mean egotism vanishes. I become a transparent eyeball , I am nothing ; I see all , the currents of the universal. Being circulate through me , I am part or particle of God "

বনে, মানুষ সাপ যেমন তার নির্মোক ত্যাগ করে তেমনি তাহার বয়সের ভারকে মোচন করে এবং তাহার যতই বয়স হোক না, সে চিরশৈশবেই বর্তমান থাকে। এই বনে আবার, আমরা আমাদের বোধ এবং বিশ্বাসে ফিরিয়া আসি। উন্মুক্ত

ভূমির উপরে যখন দাঁড়াই এবং সুখকর বায়ুর দ্বারা যখন আমার মস্তক স্নাত হয়, এবং অসীম আকাশের মধ্যে সমুত্থিত হয়, তখন সকল অহমিকা কোথায় অন্তর্ধান করে। আমি একটি স্বচ্ছ চক্ষুতারকার মতো হই— আমি আর কিছুই না, অথচ সমস্তই দেখি— বিশ্বসত্তার স্রোত নানা ধারায় আমার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে— আমি ঈশ্বরের অংশ হইয়া যাই।

এই গভীরতর আত্মোপলব্ধির জন্য দেবেন্দ্রনাথ তুষার নির্জন অরণ্য গহন হিমাচলে যাত্রা করিলেন। তাহার কথা পরপরিচ্ছেদে হইবে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

হিমালয়ে নির্জন বাস সংসারে পুনরাবর্তন

১৮৫৬ খৃস্টাব্দে (১৭৭৮ শক) ১৯শে আশ্বিন বেলা ১১টার সময় জলপথে কাশী যাইবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ নৌকায় উঠিলেন।

"কিশ্‌তী-নিশস্তগান্ এম্, অয়্ বাদেশুর্তা ব্‌রখেজ্,
বাশদ্‌কে বাজ্ বীনেম্ দীদারে আশনারা।

—দীবান্ হাফিজ, ৩।৩

'আমরা এখন নৌকাতে বসিয়াছি ; হে অনুকূল বায়ু, তুমি উঠ। হয়তো আবার আমাদের সেই দর্শনীয় বন্ধুকে দেখিতে পাইব।'" হাফেজের এই বচন বলিতে বলিতে গঙ্গার ভরা জোয়ারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ের উৎসাহের জোয়ারও ছুটিল। তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার ৩৯ বছর বয়স।

মুঙ্গেরে পৌঁছিতেই প্রায় এক মাস লাগিল। মুঙ্গের ছাড়িয়া পাটনার পথে নদীতে এমন প্রবল ঝড় উঠিল যে, নৌকা ডাঙাতে আসিলেও গঙ্গার পাড়ে ঝড়ে নৌকাকে আছড়াইতে লাগিল। দেবেন্দ্রনাথ ডাঙায় উঠিলেন ; চড়ার বালু ছিটাগুলির মতো তাঁহার শরীরে বিঁধিয়া তাঁহাকে অস্থির করিল। সেই ঝড়ের মধ্যে তিনি 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্' পরমেশ্বরের মহিমা অনুভব করিলেন।

অগ্রহায়ণ মাসে তিনি কাশীতে পৌঁছিলেন। কাশীতে দশদিন মাত্র কাটাইয়া তিনি ডাকের গাড়িতে কাশী ছাড়িলেন। অন্যান্য চাকর বিদায় করিয়া দিয়া কেবল কিশোরীনাথ চাটুয্যে এবং একজন গোয়ালাকে তিনি সঙ্গে লইলেন। প্রয়াগে তিনি গঙ্গা-যমুনার সংগম দেখিলেন। আগ্রায় সূর্যাস্তের সময় নীল যমুনার বক্ষে তাজ দেখিলেন। "শুভ্র স্বচ্ছ তাজ, সৌন্দর্যের ছটা লইয়া যেন চন্দ্রমণ্ডল হইতে পৃথিবীতে খসিয়া পড়িয়াছে।" ডাকের গাড়ি দিনরাত্রি চলিত। দুপুরে পথে গাছের তলায় রান্না করিয়া তাঁহাকে আহার সারিতে হইত। চমৎকার ভ্রমণের ব্যবস্থা! আগ্রা হইতে দিল্লী পর্যন্ত তিনি বজরায় গেলেন—পৌষ মাসের শীতে যমুনার জলে তিনি স্নান করিতেন, শরীরের রক্ত জমাট হইয়া যাইত। বজরা চলিত আর তিনি যমুনার ধারে ধারে শস্যক্ষেত্র, গ্রাম ও বাগানের মধ্য দিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করিতে করিতে হাঁটিয়া চলিতেন। পথে মথুরা এবং বৃন্দাবন দেখিয়া পৌষের শেষে দেবেন্দ্রনাথ দিল্লীতে

পৌঁছিলেন। দিল্লীতে তিনি যখন আছেন, তখন নগেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বাড়িতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য দিল্লী গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার দেখা পান নাই। দিল্লীতে রামমোহন রায়ের বন্ধু হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর শিষ্য সুখানন্দনাথ স্বামী অবধূতের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। সুখানন্দনাথ স্বামী বলিলেন—"আমি এবং রামমোহন রায় উভয়েই হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর শিষ্য ; রামমোহন রায় আমার মতন তান্ত্রিক ব্রাহ্মঅবধূত ছিলেন।" দেবেন্দ্রনাথ বুঝিলেন যে, রামমোহন রায়কে সকল ধর্মসম্প্রদায়ের লোকেরাই আপনার দলের লোক বলিয়াই মনে করে। দিল্লী হইতে ডাক গাড়িতে অম্বালায়, অম্বালা হইতে ডুলি করিয়া তিনি লাহোরে গেলেন। ৪ঠা ফাল্গুনে তিনি অমৃতসরে পৌঁছিলেন। সেখানে গিয়া কিছুকাল বাস করিয়া 'অলখ নিরঞ্জনে'র উপাসনা শিখধর্মের বিষয় ভালো করিয়া জানিবার ইচ্ছা তাঁহার মনের মধ্যে ছিল।

অমৃতসরে গুরু-দরবারে সকালে যখন তিনি গেলেন, তখন গ্রন্থসাহেবের গান চলিতেছে। সন্ধ্যায় যখন গেলেন, তখন আরতি এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্তবগান হইতেছে। যে স্তবগানটি তিনি সেখানে শুনিতে পাইলেন, তাহা এখন সকলেরই পরিচিত এবং ব্রহ্মসংগীতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। "গগনমৈ থাল রবি চন্দ্র দীপক বনে, তারকামণ্ডল জনক মোতী।" ইত্যাদি। তিনি দেখিলেন যে, শিখদের মন্দিরে দিনরাত্রি ঈশ্বরের উপাসনা হয়—কেবল মন্দির পরিষ্কার করিবার জন্য রাত্রি শেষ প্রহরে উপাসনা বন্ধ থাকে। অথচ ব্রাহ্মসমাজে সপ্তাহে দুই ঘণ্টার বেশি উপাসনা হয় না। শিখমন্দিরে যখন উপাসনার জন্য যাহার মন ব্যাকুল তখনি সে মন্দিরে গিয়া উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে। তাহার পরে, শিখদের মধ্যে বর্ণবিচার নাই—যে-কোনো জাতির লোকই শিখ হইতে পারে। ইহা দেখিয়াও তাঁহার অত্যন্ত আহ্লাদ হইল। শিখদের মধ্যে পৌত্তলিকতা দেখিয়া তিনি কষ্ট পাইলেন। অলখ নিরঞ্জনের উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা যে কালী, শিব প্রভৃতি দেবতাকেও পূজা করে, ইহা দেখিয়া তাঁহার আশঙ্কা হইল—"সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিব না।"—এই ব্রাহ্ম প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা সকলের পক্ষে চিরকাল সম্ভব এবং সহজ হইবে কি না। যাহাই হোক, তিনি অমৃতসরে বসিয়া গুরুমুখী ভাষা ও শিখধর্ম শিখিতে লাগিলেন।

অমৃতসরে রামবাগানের কাছে তিনি এক ভাঙা বাড়ি পাইয়াছিলেন, তাহার বাগানটিও জংলা রকমের। কিন্তু তখন তাঁহার হৃদয়ের প্রেম বাহিরের

সমস্তকেই পরম সুন্দর করিয়া দেখিত। তিনি সেই বাগানে যে কী অনির্বচনীয় সৌন্দর্যরস আস্বাদন করিতেন তাহা তাঁহার নিম্নলিখিত সুন্দর বর্ণনাটি পড়িলেই বেশ বুঝা যায়। তিনি লিখিতেছেন—"অরুণোদয়ে প্রভাতে" আমি যখন সেই বাগানে বেড়াইতাম, যখন আফিমের শ্বেত, পীত, লোহিত ফুল-সকল শিশিরজলের অশ্রুপাত করিত, যখন ঘাসের রজতকাঞ্চন পুষ্পদল উদ্যানভূমিতে জরির মছনদ বিছাইয়া দিত, যখন স্বর্গ হইতে বায়ু আসিয়া বাগানে মধু বহন করিত, যখন দূর হইতে পঞ্জাবীদের সুমধুর সঙ্গীতস্বর উদ্যানে সঞ্চরণ করিত, তখন তাহাকে আমার এক গন্ধর্বপুরী বোধ হইত। কোন কোন দিন ময়ূর-ময়ূরীরা বন হইতে আসিয়া আমার ঘরে ছাদের একতালায় বসিত এবং তাহাদের চিত্র-বিচিত্র দীর্ঘ পুচ্ছ সূর্যকিরণে রঞ্জিত হইয়া মৃত্তিকাতে লুটাইতে থাকিত। কখনো কখনো তাহারা ছাদ হইতে নামিয়া বাগানে চরিত। আমি তাহাদের ভালবাসিয়া কিছু চাউল হাতে করিয়া লইয়া তাহাদিগকে খাওয়াইতে যাইতাম। তাহারা ভয় পাইয়া কেকা শব্দ করিয়া কে কোথায় উড়িয়া যাইত। ...একদিন মেঘ উঠিল, আর দেখি যে, ময়ূরেরা মাথার উপরে পাখা উঠাইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। এ কি আশ্চর্য দৃশ্য! আমি যদি বীণা বাজাইতে জানিতাম, তবে তাহাদের নৃত্যের তালে তালে তাহা বাজাইতাম।...

"ফাল্গুন মাস চলিয়া গেল, চৈত্র মাস মধুমাসের সমাগমে বসন্তের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, এবং অবসর পাইয়া দক্ষিণবায়ু আম্র-মুকুলের গন্ধে সদ্যপ্রস্ফুটিত লেবুফুলের গন্ধ মিশ্রিত করিয়া কোমল সুগন্ধের হিল্লোলে দিগ্বিদিক আমোদিত করিয়া তুলিল। ইহা সেই করুণাময়েরই নিশ্বাস।...এমনি করিয়া চকিতের মধ্যে সুখে কালস্রোত চলিয়া গেল।"

পৃথিবীর সৌন্দর্য উপভোগ করিবার এমন শক্তি কয়জন মানুষের থাকে! বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে শুভদৃষ্টি বিনিময় না করিয়া কত লোকেরই জীবনযাত্রা দিনের পর দিন বহিয়া যায়। পৃথিবীর কোনো সৌন্দর্যের ভাষাই তাহারা বোঝে না, তাহার কোনো বার্তাই তাহাদের কাছে পৌছে না। এমন-কি, পৃথিবীতে যে-সকল ভক্ত সাধক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাও অনেকেই ইহার সৌন্দর্যের দিকে চোখ মেলেন নাই। সমস্ত ত্যাগ করিয়া রিক্ত হইয়া, সমস্ত সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া কেবল অন্তরের মধ্যে ঈশ্বরের করুণা ও প্রসাদ লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। বর্ণে, স্বাদে, গন্ধে, গানে, ইন্দ্রিয়ের উপভোগের ভিতর দিয়া যে ঈশ্বরের প্রেমোপলব্ধি হয়—এ সাধনা ও এ সাধনার তত্ত্ব দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে

নূতন। গুরু নানক, কবীর প্রভৃতির মধ্যে ইহার পরিচয় যথেষ্ট থাকিলেও, তাঁহাদের সৌন্দর্য-উপভোগশক্তি এমন অসামান্য রকম প্রবল ছিল কি না সন্দেহ। এ যে কবির কথা, এ যে শিল্পীর কথা যে, যখন শিখীরা নৃত্য করিতেছে, তখন তাহাদের নৃত্যের তালে তালে বীণা বাজাইতে ইচ্ছা করে। বর্ণের এমন বৈচিত্র্যের উপলব্ধি এবং ভাষায় সেই বর্ণভঙ্গিমা ফুটাইবার এমন আশ্চর্য ক্ষমতা—কবি ভিন্ন আর কাহারো মধ্যে দেখা গিয়াছে।

বৈশাখ মাস আসিতে সূর্যের তাপ ক্রমশ বাড়িতে লাগিল। অমৃতসরে তখন লোকে মাটির নীচের ঘরে ঠাণ্ডায় থাকে। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ মুক্ত আকাশের তলা ছাড়িয়া মাটির নীচে ঢুকিতে একেবারেই রাজি হইলেন না। তিনি সেখান হইতে সিমলা পাহাড়ে যাত্রার জন্য উদ্যোগ করিলেন। কাল্‌কায় পৌছিয়া যখন উত্তুঙ্গ পর্বতশ্রেণী দেখিতে পাইলেন, তখন তাঁহার মনে হইল যেন তিনি স্বর্গের দিকে উঠিতেছেন। "আমি আনন্দে ভাবিতে লাগিলাম যে, কাল আমি ইহার উপরে উঠিব, পৃথিবী ছাড়িয়া স্বর্গের প্রথম সোপানে আরোহণ করিব।" একটা ঝাঁপান লইয়া পাহাড়ে-পথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া তিনি উঠিতে লাগিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "যত উচ্চ পর্বতে উঠি, ততই আমার মন উচ্চ হইতে লাগিল। উঠিতে উঠিতে দেখি যে, আবার আমাকে লইয়া অবতরণ করিতেছে। আমি চাই ক্রমিক উঠিতে, আর এরা আবার আমাকে নামায় কেন?" "Not to the earth confined, ascend to Heaven!" এ যেন একটা উচ্চে উঠিবার একান্ত আবেগ, এই আবেগে বাহিরের উপরে ওঠা এবং ভিতরের উপরে ওঠা সমান তালে মিলিয়া গেল। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের পর্বতের নির্জন দৃশ্যের মধ্যে থাকিয়া "Thoughts of more deep seclusion" গভীরতর নির্জনতার চিন্তা লাভ করার সঙ্গে ইহার যেন কতকটা সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে হয়।

যে বছরে তিনি সিমলায় পৌছিলেন, সেই বছরেই সিপাহী বিদ্রোহের হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। সিমলায় হঠাৎ একদিন খবর পৌছিল যে, সিপাহীরা বিদ্রোহ করিয়াছে এবং গুরখারা সিমলা লুট করিতে আসিতেছে। তখন যে যেখানে পারে পলাইতে লাগিল। গুরখারা সিমলা দখল করাতে সিমলা দেখিতে দেখিতে জনশূন্য হইয়া পড়িল। দেবেন্দ্রনাথকে তখন বাধ্য হইয়া সিমলা ছাড়িতে হইল। ভাগ্যক্রমে তিনি কুলি ও ডুলি দুই পাইলেন এবং সিমলা ছাড়িয়া ডগ্‌শাহী নামক এক পর্বতে চলিয়া গেলেন। ডগ্‌শাহীতে একটা গোয়ালার

বাড়ির উপরে ভাঙা ঘরে তিনি থাকিবার জায়গা পাইলেন এবং শোবার জন্য একটা দড়ির খাটিয়া পাইলেন। রাত্রে যখন বৃষ্টি হইল, তখন ভাঙা ছাদ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। এমনিতর কষ্টে এগারো দিন কাটিয়া গেল। সুরম্য অট্টালিকায় কোমল শয্যায় শয়ন করা যাঁহার অভ্যাস, তিনি যে এমন কষ্ট স্বীকার করিতে পারিলেন, ইহাই আশ্চর্য। এই তিতিক্ষাই তখন তাঁহার সাধনার বিষয়।

সিমলা নির্বিঘ্ন হইয়াছে খবর পাইয়া, তিনি সেখানে ফিরিয়া আসিলেন। ফিরিয়া আসিয়াই কিশোরী চাটুয্যেকে তিনি বলিলেন যে, এক সপ্তাহের মধ্যে আরো উচ্চতর পর্বতে যাইবার তাঁহার ইচ্ছা। ঝাঁপান প্রস্তুত, সব প্রস্তুত— শুধু কিশোরীর যাইবার আগ্রহ দেখা গেল না। সে বেচারী শীতের ভয়ে আরো উত্তরে যাইতে অনিচ্ছুক, ইহা দেবেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিলেন। তখন তাহাকে ফেলিয়া একলাই তিনি চলিয়া গেলেন। কিছু দূর গিয়া দেখা গেল যে, আর পথ নাই— একটা ভাঙা পুলের কার্নিশ দিয়া একাকী পুল পার হইতে হইবে। ঝাঁপান সেখানে যাইবে না। কার্নিশের উপরে একটিমাত্র পা রাখিবার জায়গা —হাত ধরিবার কোনো অবলম্বন নাই— নীচে ভয়ানক গভীর খদ। ঈশ্বর-প্রসাদে তিনি তাহা নির্বিঘ্নে লঙ্ঘন করিলেন। দুই প্রহরের পর সোজা খাড়া উচ্চ পর্বতের চড়াই ভাঙিয়া একটা পান্থশালা পাইয়া সেখানেই তিনি সেদিনের জন্য থাকিয়া গেলেন। সঙ্গে রাঁধিবার লোক নাই। ঝাঁপানীদের মক্কার মোটা রুটি খাইয়াই অগত্যা ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে হইল। পাহাড়ীদের সঙ্গে তাঁহার বেশ জমিয়া গেল— পান্থশালা ছাড়িয়া তার পরের দিন বিকালে আর-এক পাহাড়ের চূড়ায় গিয়া তিনি থাকিলেন এবং পরের দিন আবার ঝাঁপানে করিয়া চলিতে চলিতে দুপুরে এমন জায়গায় তিনি আসিয়া পড়িলেন, যেখানে আর পথ নাই। পথ ভাঙিয়া গিয়াছে। সেই সংকটময় ভাঙা পথের উপর দিয়াই তিনি চলিয়া গেলেন। পথের কোনো বাধাবিঘ্নই তখন তাঁহার মনের আবেগকে রোধ করিতে পারে না। অবশেষে নারকাণ্ডা নামে এক উচ্চ পাহাড়ের শিখরে দেবেন্দ্রনাথ পৌঁছিলেন— সেখানে অতি তীব্র শীত।

কিন্তু সেখানে পৌঁছিয়াও তাঁহার বিশ্রাম হইল না। সকালে উঠিয়া দুধ পান করিয়া তিনি পুনরায় পায়ে হাঁটিয়া চলিতে লাগিলেন এবং হিমালয়ের এক নিবিড় বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। "মধ্যে মধ্যে সেই বন ভেদ করিয়া রৌদ্রের কিরণ ভগ্ন হইয়া পথে পড়িয়াছে"— কোথাও বড়ো বড়ো গাছ শাখা-

নলে পুড়িয়া গিয়াছে। পাহাড়ের গায়ে কত তৃণলতা, এবং তাহাদের গায়ে গায়ে কত ফুলই ফুটিয়া আছে। কোনোটা সাদা, কোনোটা হল্‌দে, কোনোটা নীল, কোনোটা সোনার বরণ। সাদা গোলাপের গুচ্ছ বন হইতে বনান্তরে ফুটিয়া সমস্ত বনকে গন্ধে ভরপুর করিয়া রাখিয়াছে। কোথাও চামেলির গন্ধ, কোথাও ষ্ট্রাবেরি ফল "রক্তবর্ণ উৎপলের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে।" সঙ্গের একটি চাকর এক বনলতা হইতে তাহার একটি পুষ্পিত শাখা আনিয়া তাঁহার হাতে দিল। তিনি লিখিতেছেন, "এমন সুন্দর পুষ্পের লতা আমি আর কখনো দেখি নাই। আমার চক্ষু খুলিয়া গেল, আমার হৃদয় বিকশিত হইল। আমি সেই ছোট ছোট শ্বেত পুষ্পগুলির উপরে অখিলমাতার হস্ত পড়িয়া রহিয়াছে, দেখিলাম। এই বনের মধ্যে কে বা সেই সকল পুষ্পের সুগন্ধ পাইবে, কে বা তাহাদের সৌন্দর্য দেখিবে, তথাপি তিনি কত যত্নে, কত স্নেহে, তাহাদিগকে সুগন্ধ দিয়া, লাবণ্য দিয়া, শিশিরে সিক্ত করিয়া, লতাতে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার করুণা ও স্নেহ আমার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। নাথ! যখন এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পগুলির উপরে তোমার এত করুণা, তখন আমাদের উপর না জানি তোমার কত করুণা। 'তোমার করুণা আমার মনপ্রাণ হইতে কখনই যাইবে না। তোমার করুণা আমার মনপ্রাণে এমনি বিদ্ধ হইয়া আছে যে, যদি আমার মস্তক যায়, তথাপি প্রাণ হইতে তোমার করুণা যাইবে না।'

"হর্‌গিজ়ম্ মেহ্‌রে তো অজ়্‌লওহে দিল্‌ওজাঁ ন রবদ্।

...

আঁচুনাঁ মেহ্‌রে তো অম্ দর্‌দিল্‌ও জাএ গিরিফ্‌ৎ,
কে গর্ অম্ সর্ বে রবদ্, মেহ্‌রে তো অজ্ জাঁ ন-রবদ্।"

—দীবান হাফিজ, ২৬৬।১,২

হাফেজের গানের মধ্যে এই বচনটিই তাঁহার সব চেয়ে প্রিয় হইল— "তোমার প্রেম আমার হৃদয় ও প্রাণের ফলক হইতে কখনও লুপ্ত হইবে না। তোমার প্রেম আমার হৃদয় ও প্রাণে এমন ভাবে স্থান অধিকার করিয়াছে যে, যদি আমার মস্তক যায় (অর্থাৎ জীবন যায়) তথাপি প্রাণ হইতে তোমার প্রেম মুছিয়া যাইবে না।"

এই কবিতা পথে সমস্ত দিন উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে পড়িতে ভাবে বিভোর হইয়া তিনি চলিতে লাগিলেন। দিন যে কোথা দিয়া গেল তাহা জানিতেই পারিলেন না। সন্ধ্যাবেলায় সুজ্ঞ্রী নামে এক উচ্চ পর্বতচূড়ায় তিনি পৌঁছিলেন। সেখানে

দুইটি পর্বতশ্রেণী মুখামুখী করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, মাঝে নিবিড় বন। কোনো পাহাড়ের আপাদমস্তক গমের ক্ষেতে সোনার বরণ দেখাইতেছে। মাঝে মাঝে দূরে দূরে এক-একটি গ্রাম— দশ-বারোটি ঘর— তাহার উপরে সূর্যাস্তের রক্তিমাভা পড়িয়াছে। সূর্য অস্ত গেল, সেই পর্বতের শৃঙ্গে তিনি একা বসিয়া রহিলেন।

পরদিন এক বনময় পর্বতে দেবেন্দ্রনাথ নামিতে লাগিলেন— সেখানে ঘন কেলুগাছের বন। তাহার ঘন পাতাঢাকা শাখাকে তিনি 'বৃহৎ পক্ষীর পক্ষের' সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। শীতে যখন তাহার উপর বরফ পড়ে, তখন পাতা মরে না, আরো সতেজ হয়। কি আশ্চর্য!

সুঙ্গ্রী হইতে নীচে বোয়ালি পর্বতে নামিয়া, তাহার তলে তিনি নগরী নদী এবং দূরে শতদ্রু নদী 'রৌপ্যপত্রের ন্যায় সূর্য-কিরণে চিক্ চিক্ করিতেছে' দেখিতে পাইলেন। নগরী নদীর গর্ভে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর, তাহাতে ঘা খাইয়া নদী সরোষে সফেন হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। দুই তীরে পাষাণ-প্রাচীরের মতো পাহাড়। নদীর উপরে সেতু আছে, সেই সেতু পার হইয়া তিনি ওপারের উপত্যকায় গেলেন। সেইখানে সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ দেখেন, দূরে পাহাড়ের বনে দাবানল লাগিয়াছে। দেখিতে দেখিতে সমস্ত গাছ একে একে 'অগ্নিরূপ ধারণ করিল'— "অগ্নির এই অপরূপ রূপ দেখিতে দেখিতে, যে দেবতা অগ্নিতে তাঁহার মহিমা" তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন। আবার সেখান হইতে চলিতে চলিতে দারুণ ঘাট নামে এক দারুণ উচ্চ পর্বতশিখরে উপস্থিত হইয়া তাহার সামনে ববফে-ঢাকা আর-এক পর্বতের চূড়া তিনি দেখিতে পাইলেন। সেখানে তখন বরফ পডিতেছিল— আষাঢ মাসে বরফ পডা দেখা এক আশ্চর্য ব্যাপার। সেখান হইতে রামপুরে গিয়া, ১৩ই আষাঢ় দেবেন্দ্রনাথ পুনরায় সিমলায় ফিরিয়া আসিলেন। তিনি লিখিতেছেন, "এই বিংশতি দিবসের পর্বতভ্রমণে ঈশ্বর আমার শরীরকে আধিভৌতিক কত বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন, আমার মনকে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, বিবেক ও বৈরাগ্যের কত উচ্চ শিক্ষা দিলেন, তাঁহার সহবাস-সুখে আমার আত্মাকে কত পবিত্র ও উন্নত করিলেন, ইহার জন্য কৃতজ্ঞতা আমার হৃদয়ে ধরিল না। আমি তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া ঘরে গিয়া তাঁহার প্রেমগান করিতে লাগিলাম।"

ইহার পরে হিমালয়ে তুমুল বর্ষা শুরু হইল। পাহাড়ের নীচে হইতে বাষ্পময় মেঘ উঠিয়া উপরের পাহাড়কে জড়াইয়া ফেলিল, বৃষ্টি হইয়া সব পরিষ্কার। আবার তুলারাশির মতো মেঘ উঠিয়া সমস্ত আচ্ছন্ন করিল, আবার সূর্যের

প্রকাশ হইল। শ্রাবণ মাসে কোনো কোনো পক্ষ মেঘে মেঘে সমস্ত ঢাকা—যেন দশ হাত দূরে আর কিছুই নাই, সমস্ত বিশ্ব বিলুপ্ত। সেই অবিরল ধারাপাতের মধ্যে তিনি লিখিতেছেন যে, তাঁহার মন সহজেই সংসার হইতে উপরত হইল, তিনি অনুভব করিলেন যে, তিনি আছেন আর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর আছেন। ভাদ্র মাসে হিমালয়ের আর-এক রূপ। "হিমালয়ের জটাজটের মধ্যে জল-কল্লোলের বিষম কোলাহল"—পথ তখন দুর্গম। কার্তিকে শীতের আরম্ভ এবং অগ্রহায়ণে বরফ পড়া। সমস্ত পাহাড় এক রাত্রের মধ্যেই বরফে আচ্ছন্ন। পৃথিবী একেবারে শুভ্র। এমনি করিয়া ঋতুতে ঋতুতে হিমালয়ের নব নবতর রূপ দেখিতে দেখিতে তাঁহার মধ্যে প্রকৃতির ভিতর দিয়া প্রকৃতির অধীশ্বরের সঙ্গে তাঁহার আত্মার নিগূঢ় পরিচয় ও মিলন ঘটিতে লাগিল।

সেই দারুণ শীতে তুষারের মধ্য দিয়াই তিনি আনন্দে বেড়াইতেছেন এবং দুপুরে বরফ-গলা জলে স্নান করিতেছেন। মুহূর্তের জন্য তাঁহার হৃদয়ের রক্ত-চলাচল যেন বন্ধ হইয়া যাইত এবং তার পরে দ্বিগুণ বেগে চলিত। সেই শীতের রাত্রে তিনি আগুন জ্বালাইতেন না এবং শোবার ঘরের দরজা খুলিয়া রাখিতেন। অর্ধেক রাত্রি পর্যন্ত কম্বল জড়াইয়া বিছানায় বসিয়া হাফেজের কবিতা গান করিতেছেন এবং নিজে গান রচনা করিতেছেন, "যোগী জাগে, ভোগী রোগী কোথায় জাগে। / ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দ-রস পান, / প্রীতি ব্রহ্মে যার, সেই জাগে।"

হাফেজের কবিতা এই সময়ে তাঁর নিত্য সাথী।

"যা রব্ আঁ শমএ শব্ অফ্রোজ্ জে কাশানা এ কীস্ত্?
জানে মা সোখৎ, বে পুরসীদ্ কে জানানা এ কীস্ত্।

—দীবান্ হাফিজ, ৬১।১

"যে দীপ রাত্রিকে দিন করে, সে দীপ কাহার ঘরে? আমার তো তাতে প্রাণ দগ্ধ হ'লো, জিজ্ঞাসা করি তাহা প্রিয় হ'লো কার?"

যে রাত্রিতে ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ সহবাস অনুভব করিতেন, সে রাত্রে আনন্দে মত্ত হইয়া উচ্চকণ্ঠে গাহিতেন—

"গো শম্অ ম-য়ারেদ্ দরীঁ জম্অ, কে ইম্শব্
দর্ মজ্লিসে মা মাহ্ রুখে দোস্ত্ তমাম্ অস্ত্।

—দীবান হাফিজ, ৫৬।২

"আজ আমার এ সভাতে দীপ আনিয়ো না। আজিকার রাত্রিতে সেই পূর্ণচন্দ্র আমার বন্ধু এখানে বিরাজমান।"

দিনের বেলাতেও দেবেন্দ্রনাথ গভীর ব্রহ্মচিন্তায় ডুবিয়া থাকিতেন। রাজনারায়ণবাবুকে লিখিত সিমলা হইতে ১২ই শ্রাবণ তারিখের চিঠিতে দেখিতে পাই যে, তিনি কাণ্ট, ফিক্তে ও নিউম্যানের তত্ত্বগ্রন্থ হইতে স্থানে স্থানে বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। কাণ্ট, ফিক্তে, নিউম্যান, ভিক্‌টর কুজ্যাঁ, হাফেজ—এই-সমস্ত লেখকের গ্রন্থ এই সময়ে তাঁহার সর্বদাই পাঠ্য ছিল। এক দিকে যেমন হিমালয়ের উত্তুঙ্গ নির্জনতা ও অপূর্ব সৌন্দর্য ও মহিমা, অন্য দিকে তেমনি মানসহিমালয়ের সমুচ্চ ভাবশিখরের গাম্ভীর্য—দুই দিক হইতেই তাঁহার ব্রহ্মচিন্তা পরিপুষ্ট হইতেছিল। কিন্তু তিনি যে শুধু চিন্তা করিতেন গ্রন্থাদির সাহায্যে, শুধু আনন্দ সম্ভোগ করিতেন প্রকৃতির সহবাসে—তাহা নয়। তিনি এসময়ে রীতিমত একাগ্রচিত্তে অনন্যমনা হইয়া সাধনা করিয়াছেন—'দৃঢ় আসনবদ্ধ হইয়া' প্রতিদিন সকাল হইতে দুপর পর্যন্ত তিনি ধ্যানে বসিতেন। আত্মার মূল তত্ত্ব কী, ইহাই ছিল তাঁহার অনুসন্ধানের বিষয়। ধ্যান করিতে করিতে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসিলেন যে, মূলতত্ত্ব স্বতঃসিদ্ধ, তাহা আপনি আপনার প্রমাণ—কারণ তাহা "আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞাতে প্রতিষ্ঠিত।" জ্ঞান প্রসন্ন হইলে, হৃদয় বিশুদ্ধ হইলে, ধ্যানের দ্বারা যে একটা প্রমাজ্ঞান জন্মায়, তাহাতেই ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। মূলতত্ত্বকে তাই ইহার পরে তিনি আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ সত্য বলিয়াছেন, ইহা আমরা দেখিতে পাইব। ঋষিরা যে-সকল সত্যের সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তাহা এমনিতর স্বতঃসিদ্ধ সত্য—তাহা কোনো বাহিরের প্রমাণের অপেক্ষা রাখে নাই। তাঁহারা সৃষ্টিতত্ত্বের বিচার করিতে গিয়া এ কথা বলেন নাই যে জড়ের অন্ধশক্তিতে বিশ্ব চলিতেছে, কিংবা কালের প্রভাবে চলিতেছে। প্রকৃতি বলিলে ঈশ্বরের স্থান থাকে না। আদি কারণ বলিলে তাহা অন্ধশক্তিরই মতো হয়, তাহাতে ঈশ্বরের পুরুষত্বের ভাব আর থাকে না। একমাত্র ইচ্ছার দিক হইতে দেখিলে সৃষ্টিতত্ত্বের মূল পাওয়া যায়। যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং—এই জগৎ তাঁহার প্রাণ হইতে নিঃসৃত হইতেছে। উপনিষদেরও এ-সকল সত্যের গভীরতর অর্থসকল এখানে ধ্যানযোগে তাঁহার কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল।

তিনি যে এ সময়ে কাণ্টের দর্শন খুব ভালো করিয়া পড়িয়াছিলেন তাহা তাঁহার আর-একটা কথা হইতেই বেশ বুঝিতে পারি। কাণ্ট আকাশকে ও কালকে *a priori* principles of sense, ultimate forms of external

and internal sense বলিয়াছিলেন। আকাশ ও কালের বোধ সকল বোধের মূলে স্থতরাং স্বতঃসিদ্ধ ভাবে বর্তমান আছে। দেবেন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, "সম্মুখে বৃক্ষ যে আছে, তাহাকে দেখিতেছি ও স্পর্শ করিতেছি। কিন্তু সেই বৃক্ষ যে-আকাশে আছে, সে-আকাশকে আমরা দেখিতেও পাই না, স্পর্শ করিতেও পাই না। কালে কালে বৃক্ষের শাখা হইতেছে, পল্লব হইতেছে, ফুল হইতেছে, ফল হইতেছে ; এ সকল দেখিতেছি। কিন্তু তাহার সূত্র সেই কালকে দেখিতে পাই না।" এই আকাশ ও কালের উপমা হইতে ঈশ্বর যে সর্বত্র ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছেন অথচ তাঁহাকে দেখা যায় না এই তত্ত্ব দেবেন্দ্রনাথ পাইলেন। প্রত্যেক বস্তু যে প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধসূত্রে গাঁথা, তাহার কারণ ইহা নয় যে তাহারা এক আকাশের মধ্যে বিধৃত ; বরং তাহারা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধে জড়িত বলিয়াই তাহারা এক আকাশে আছে, এইরূপ একটা আভাস আমরা পাই। স্থতরাং কাণ্টের কাছে আকাশ এবং কাল, মানসিক একটা অবস্থা মাত্র। দেবেন্দ্রনাথ কাণ্টের আকাশ ও কালের ভাব হইতে একেবারে আত্মার স্বরূপবোধে উত্তীর্ণ হইলেন। আকাশ ও কালে যেমন সমস্ত দৃশ্য বস্তু অনুস্যূত, আত্মাতে তেমনি সমস্ত দেশকাল পূর্ণ হইয়া আছে। "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তারাত্মন্। কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষৎ আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্ব-মিচ্ছন্।"—স্বয়ম্ভূ ঈশ্বর ইন্দ্রিয়দিগকে বহির্মুখ করিয়াছেন ; সেই হেতু তাহারা বাহিরেই দেখে অন্তরাত্মাকে দেখে না ; কোনো ধীর অমৃতত্বকে ইচ্ছা করিয়া, মুদিতচক্ষু হইয়া, সর্বান্তর্গত এক আত্মাকে দেখেন। তিনি লিখিয়াছেন, "এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া, মনন করিয়া, নিদিধ্যাসন করিয়া, এই ব্রহ্ম-যজ্ঞ-ভূমি হিমালয় পর্বত হইতে আমি ঈশ্বরকে দেখিতে পাইলাম ; চর্মচক্ষুতে নয়, কিন্তু জ্ঞানচক্ষুতে।... বেদাহং এতং মহান্তং / আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ : আমি এই তিমিরাতীত আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি।"

"বাদ্ অজঈঁ নূরব-আফাক্ দেহেম্ অজ দিলে খেশ্।
কে ব-খুরশীদ্ রসীদেম্, ও গোবার্ আখির্ শুদ্॥

—দীবান-হাফিজ, ১৫০।৩

"এখন অবধি জ্যোতি আমার হৃদয় হইতে পৃথিবীতে ছড়াইব, যেহেতুক আমি সূর্যেতে পঁহুছিয়াছি, ও অন্ধকার বিনাশ হইয়াছে।"

দেবেন্দ্রনাথ যখন সিমলায়, তখন হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর শিষ্য সুখানন্দনাথ স্বামী ভজ্জির রাণার গুরু ছিলেন—তিনি তান্ত্রিক ব্রহ্মজ্ঞানী তাহা পূর্বেই

বলিয়াছি। রাণাকে বলিয়া তিনি দেবেন্দ্রনাথকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। শতদ্রু-নদীতীরে রাণার রাজধানী সোহিনী। সেখানে রাণার উজীর আসিয়া সাদরে দেবেন্দ্রনাথকে লইয়া গেলেন। শতদ্রু নদীর জল সমুদ্রজলের মতো নীল এবং উজ্জ্বল। মশকের উপর চড়িয়া নদী পার হইতে হয়, কারণ জলের মধ্যে বড়ো বড়ো পাথর থাকায় নৌকা যাইতে পারে না। ওপারের তীরের জল গরম—সেই গরম জলে অনেক পীড়িত লোক স্নান করিতে আসে। ভজ্জিতে এক সপ্তাহ থাকিয়া তিনি সিমলায় ফিরিয়া গেলেন। তখন ফাল্গুন মাস, কিন্তু তখনো বরফ পড়িয়া আছে। চৈত্র মাসে হঠাৎ "ফুলে ফুলে সকল ভূমি একেবারে মনোরম উদ্যানভূমি হইয়া উঠিল।" এ বছরে পাহাড়ের উপরে তিনি একটি নির্জন জায়গায় বাংলা ভাড়া করিলেন। সেই চূড়ার উপরে একটি মাত্র গাছ ছিল—সে ছিল তাঁহার একমাত্র বন্ধু। বৈশাখে দুপরের পর তিনি মনের আনন্দে বেড়াইয়া বেড়াইতেন—কখনো কখনো কোনো নির্জন পাহাড়ের শিলায় বসিয়া ধ্যানে ডুবিয়া থাকিতেন। একদিন বেড়াইতে বেড়াইতে একটা বনাকীর্ণ পাহাড়ের মধ্য দিয়া একটা পথ গিয়াছে দেখিলেন। সেই পথে বিকালে চলিতে লাগিলেন। চলার আর শেষ নাই। সন্ধ্যা হইয়া গেল—জনশূন্য বনপথে তিনি একা। কোথাও কোনো শব্দটি নাই, শুধু পায়ের শব্দ শুকনো পাতার উপরে খড়্‌খড় করিতেছে। ভয় হইতে লাগিল, অথচ তখন কি একটা গম্ভীর ভাব মনে আসিল। "রোমাঞ্চিত শরীরে সেই বনের মধ্যে ঈশ্বরের চক্ষু দেখিলাম··· তাঁহার এই দৃষ্টি চিরকালের জন্য আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে।"

আমরা দেবেন্দ্রনাথের অধ্যাত্মজীবনের সকল ধাপগুলি ক্রমে ক্রমে দেখিয়া আসিয়াছি। প্রথম ধাপে, তাঁহার অধ্যাত্মজীবনের উদ্‌বোধন ও তীব্র ব্যাকুলতা ও বেদনা দেখিয়াছি—তখন তাঁহার যৌবন বয়স। বাহিরে তাঁহার দৃষ্টির উপর হইতে আবরণ উন্মোচিত হইয়া অনন্ত আকাশের মহিমা প্রসারিত হইল; অন্তরে তাঁহার মুগ্ধ সংস্কার ঘুচিয়া নানা তত্ত্বসকল স্ফুরিত হইল। দ্বিতীয় ধাপে, তাঁহার আত্মশোধনের পালা— বিষয়-বৈরাগ্য এবং আপনাকে অশ্রান্তভাবে ধর্ম-প্রচারের কাজে নিয়োগ, ক্রমশ বাহিরের দিকেও তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি গেল, আত্মীয়স্বজন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। এমনি করিয়া একটা রিক্ততার সাধনা চলিতে লাগিল। তৃতীয় ধাপে, তাঁহার সমস্ত চৈতন্য পরিশুদ্ধ হইয়া ঈশ্বরের প্রেমে এবং সান্নিধ্যবোধে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিল—তখন তাঁহার জ্ঞান প্রসন্ন হইল,

হৃদয় নির্মল হইল, এবং মন তাঁহাতে ধ্যায়মান হইল। তখনি তিনি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি হইলেন এবং ব্রাহ্মধর্মের বীজমন্ত্র ও ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থের গভীব মন্ত্রগুলিকে দর্শন করিলেন। তখন হইতেই তিনি ঈশ্বরের 'আদেশবাণী' শুনিতে লাগিলেন, তাঁহাব প্রেরণা লাভ কবিতে লাগিলেন। চতুর্থ ধাপে, কর্মজালে তিনি যেমন নিবিড়ভাবে আপনাকে জড়াইয়া ফেলিয়াছেন, ক্রমশ তাহাব বন্ধনগুলি আলগা হইয়া আসিল এবং সমস্ত ছাড়িয়া দূবে নির্জনতাব মধ্যে ধ্যানেব জন্য তাঁহাব মন ব্যাকুল হইল। এই যে ধ্যানের অবস্থা—ইংবাজীতে যাহাকে contemplation বলিয়া কতকটা বুঝাইবাব চেষ্টা হয়, সে সম্বন্ধে একজন লেখকেব একটি বেশ চমৎকাব কথা আছে। তিনি লিখিতেছেন—"গায়কেব কাছে যেমন স্ববসঙ্গতি (harmony), শিল্পীর কাছে যেমন বেখা ও বর্ণ, কবিব কাছে ছন্দ, তেমনি সাধকেব কাছে এই ধ্যানটা একটা উপকবণ—যাহার ভিতব দিয়া তিনি সহজেই সেই শিবসুন্দরকে দেখিতে পান ও তাঁহার সহিত যোগযুক্ত হইতে পারেন।" কবি বা শিল্পী কোনো সাধনার ভিতর দিয়া না গিয়াও রচনার উৎকর্ষ দেখাইতে পারেন বটে—কিন্তু সাধনার ভিতর দিয়া গেলে তবেই তাঁহাদের রচনার সৌষ্ঠব পরিপূর্ণ হয়। সেইরূপ সাধক ধ্যানধারণা যোগাভ্যাসের ভিতর দিয়া না গিয়াও সময়ে খুবই উচ্চ অবস্থা লাভ করিতে পাবেন—কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না। যখন এই ধ্যানধারণায় সাধনায় তিনি সিদ্ধ হন, তখনি তাঁহার চিত্ত সহজেই ঈশ্বরে সমাহিত হয়।

কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রকৃতির মধ্যে নিগূঢ়নিবিষ্ট চিত্তেব এই ধ্যানের অবস্থার কথা বলিয়াছেন—

"We are laid asleep
In body, and become a living soul,
While with an eye made quiet by the power
Of harmony, and the deep power of joy,
We see into the life of things."

আমাদের শরীর তখন সুপ্ত হইয়া যায়—আত্মা জাগ্রত হইয়া উঠে; আমাদের চক্ষু গভীর আনন্দ এবং সামঞ্জস্যের বোধেব দ্বাবা শান্ত হইয়া সকল বস্তুর অন্তরতর জীবনের মধ্যে নিবিষ্ট হয়।

এই যে অভিনিবেশ—যে অভিনিবেশের কথা বলিতে গিয়া আর-এক জায়গায় ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বলিয়াছেন যে, এ অবস্থায়—

"Thought was not; in enjoyment it expired."

চিন্তাশক্তি আর ছিল না—তাহা আনন্দে বিলীন হইয়াছিল—সেই অভিনিবেশের

ফলে বাস্তবিক ঐ অনির্বচনীয় আনন্দ বা প্রেমই উদ্‌বেল হইয়া উঠে। সে গভীর আনন্দ যে কী, সে গভীর প্রেম যে কী, যে আস্বাদন করে নাই সে কেমন করিয়া বলিবে? আমরা তাহার কল্পনা মাত্র পাই, বস্তু তো পাই না। যে আনন্দে মত্ত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ হাফেজের কবিতা আবৃত্তি করিতেন, বাস্তবিক সেই আনন্দেই—"Thought was not, in enjoyment it expired।" একটি আরম্ভ, অন্যটি পরিণাম। ধ্যানে চতুর্দিক হইতে চিত্তকে কুড়াইয়া আনিয়া সেই একে সংহৃত সংযত করা হয়। আর আনন্দে সেই নিবিড় যোগোপলব্ধিকে দশ দিকে উচ্ছ্বসিত করিয়া দেওয়া হয়।

কিন্তু এই ধ্যান ও আনন্দের ধাপেও দেবেন্দ্রনাথ ঠেকিয়া থাকিতে পারিলেন না। ফুল যখন ফোটে, তখন মনে হয় সেই বুঝি গাছের সাধনার চরম ধন; কিন্তু ফল ফলিলে বুঝা যায় যে, ফুলের গন্ধ ও রঙ, ফুলের লাবণ্য ও মাধুর্য— ফলকেই প্রতীক্ষা করিয়া ছিল। ফুল আপনাতে আপনি পূর্ণ পর্যাপ্ত; কিন্তু ফলকে যে আপনাকে নিঃশেষে দান করিয়া দিতে হয়। সেই যে দানযজ্ঞ তাহাই অধ্যাত্ম-জীবনের চরমতা। ঈশ্বরে যোগযুক্ত আত্মা যখন স্বর্গলোক ছাড়িয়া মর্তে পিপাসিত আত্মাদের অমৃতবারি পরিবেশন করিতে নামিয়া আসেন এবং আপনাকে বিলাইয়া দেন—তখনই তাঁহার সকল আনন্দের চরমতা ও সার্থকতা। অয়কেনের ভাষায় তখন এই-সকল আত্মা "fruition of reality" সত্যের সফলতার অবস্থায় উত্তীর্ণ হন।

কিন্তু এই যে একবার সংসার হইতে উপরত হইয়া পুনর্বার সংসারে প্রত্যাবর্তন, এটা সকল সাধকের জীবনে দেখিতে পাওয়া যায় না। অনেকের জীবনে crucifixion পর্যন্ত হয়—অর্থাৎ একেবারে পরমাত্মাতে তাঁহারা আপনাকে বিলীন করিয়া এ জীবনে মরিয়া যান বটে। কিন্তু তার পরে আর তাঁহাদের resurrection হয় না, অর্থাৎ পুনর্বার সেই মৃত্যুলোক হইতে ফিরিয়া আসিয়া যাহারা অধ্যাত্মজীবন না পাইয়া হাবুডুবু খাইতেছে, তাহাদের পরমবার্তা জানাইবার আগ্রহ দেখা যায় না। সংসারের সমুদ্রে যে জল তরঙ্গিত হইতেছিল, অধ্যাত্মসূর্যের উত্তাপে সে জল বাষ্প হইয়া স্বর্গে গেল; কিন্তু সেই বাষ্প যে প্রেমে জমাট বাঁধিয়া পুনরায় তপ্ত পৃথিবীর উপরে বর্ষিত হইলে তবেই তাহার চরম সার্থকতা সে কথাটি কি আর তাহার মনে হয়?

"মুক্তি? ওরে, মুক্তি কোথায় পাবি, মুক্তি কোথায় আছে!
আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন প'রে বাঁধা সবার কাছে।"

এ বাঁধন যে স্বয়ং ঈশ্বরকে নিজে পরিতে হইয়াছে, মানুষই কি মুক্ত হইয়া এ বাঁধন এড়াইয়া যাইতে পারে ?

দেবেন্দ্রনাথের জীবনে আবার এই ফিরিয়া আসার কাহিনীটি বড়ো আশ্চর্য।

এ বছর হিমালয়ে আবার যখন বর্ষা নামিল, তখন পাহাড়ের গুহায় গুহায় নদী-ঝরণার নূতন নূতন শোভা তিনি দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। নদীর বেগে বড়ো বড়ো পাথর খসাইয়া লইয়া যায়— কী উন্মত্ত তাহার গতি ! একদিন আশ্বিন মাসে খদে নামিয়া একটা নদীর সেতুর উপর দাঁড়াইয়া তিনি তাহার স্রোতের উদ্দাম গতি দেখিতে দেখিতে বিস্ময়ে ডুবিয়া গেলেন। তখন তাঁহার মনে এই প্রশ্ন হইল— এই যে নদীর জল এখন কেমন শুভ্র ও নির্মল, এ কেন আপনার পবিত্র ভাব পরিত্যাগ করিবার জন্য নীচে ছুটিতেছে ? এ নদী যত নীচে যাইবে, ততই পৃথিবীর কাদা মাটি ও মলিনতা ইহাকে কলুষিত করিবে। অথচ সেই দিকেই না ছুটিয়া ইহার উপায় নাই। বিধাতার শাসনে মলিন হইয়াও ইহাকে পৃথিবীর মাটিকে উর্বরা করিতে হইবে। সেইজন্য ইহার উদ্ধত ভাব ত্যাগ করিয়া ইহাকে নীচে নামিতে হইতেছে।

তিনি লিখিয়াছেন যে, যেমনি এই কথা ভাবিতেছেন, অমনি সেই সময়ে "হঠাৎ আমি আমার অন্তর্যামী পুরুষের গম্ভীর আদেশ-বাণী শুনিলাম, 'তুমি এ উদ্ধত ভাব পরিত্যাগ করিয়া এই নদীর মত নিম্নগামী হও। তুমি এখানে যে সত্য লাভ করিলে, যে নির্ভর ও নিষ্ঠা শিক্ষা করিলে, যাও, পৃথিবীতে গিয়া তাহা প্রচার কর।'

"আমি চমকিয়া উঠিলাম ! তবে কি আমাকে এই পুণ্যভূমি হিমালয় হইতে ফিরিয়া যাইতে হইবে ? আমার তো এ ভাবনা কখনই ছিল না। কত কঠোরতা স্বীকার করিয়া সংসার হইতে উপরত হইয়াছি, আবার সংসারে যাইয়া কি সংসারীদিগের সহিত মিশিতে হইবে ? আমার মনের গতি নামিয়া পড়িল। সংসার মনে পড়িল, মনে হইল, আবার আমাকে ফিরিয়া বাড়ী যাইতে হইবে, সংসার-কোলাহলে কর্ণ বধির হইয়া যাইবে। এই ভাবনাতে আমার হৃদয় শুষ্ক হইয়া গেল, ম্লানভাবে বাসায় ফিরিয়া আইলাম। রাত্রিতে আমার মুখে কোন গান নাই। ব্যাকুল হৃদয়ে শয়ন করিলাম, ভাল নিদ্রা হইল না।

"রাত্রি থাকিতে থাকিতে উঠিয়া পড়িলাম, দেখি যে, হৃদয় কাঁপিতেছে, বুক ভয়ে ধড়্ ধড়্ করিতেছে। আমার শরীরের এমন অবস্থা পুর্বে কখনই ঘটে নাই। ভয় হইল, কোনরূপ সাংঘাতিক পীড়াই বা আমার হইল ? বেড়াইতে

গেলে যদি ভাল হয়, এই মনে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। অনেকটা পথ বেড়াইয়া সূর্য উদয় হইলে বাসাতে আসিলাম, তাহাতেও আমার বুকের ধড়্ধড়ানি গেল না। তখন কিশোরীকে ডাকিলাম, এবং বলিলাম, 'কিশোরী! আমার আর সিমলাতে থাকা হইবে না, ঝাঁপান ঠিক কর।' এই কথা বলিতে বলিতে দেখি যে, আমার হৃৎকম্প কমিয়া যাইতেছে। তবে এই কি আমার ঔষধ হইল? আমি সেই সমস্ত দিনই বাড়ী যাইবার জন্য স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম, ইহাতেই আমি আরাম পাইলাম। দেখি যে, আমার হৃদয়ের সে ধড়ধড়ানি আর নাই, সব ভাল হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বরের আদেশ, বাড়ীতে ফিরিয়া যাওয়া, সে আদেশের বিরুদ্ধে কি মানুষের ইচ্ছা টিঁকিতে পারে? সে আদেশের বাহিরে একটু ইচ্ছা করিতে গিয়া প্রকৃতি-সুদ্ধ বিরুদ্ধে দাঁড়াইল, এমনি তাঁহার হুকুম! ...এখনো পথে অনেক ভয় আছে, স্থানে স্থানে এখনো অনেক বিদ্রোহীদল রহিয়াছে; কিন্তু আমি আর সে সকল ভাবনাকে মনে স্থান দিলাম না। নদী যেমন আপনার বেগ-মুখে প্রস্তরের বাধা মানে না, আমিও তেমনি আর কোন বাধা মানিলাম না।"

১লা কার্তিক বিজয়া দশমীর দিনে তিনি সিমলা ত্যাগ করিলেন—"আমার সিমলা হইতে বিসর্জন হইল।"—কথাটি কী চমৎকার ও অর্থপূর্ণ! হিমালয় হইতে গৌরীর বিসর্জন সংসারে অন্নপূর্ণা হইয়া বিরাজ করিবার জন্য! এলাহাবাদ পর্যন্ত নির্বিঘ্নে পৌঁছিয়া সেখানে সরকারের এক বিজ্ঞাপন দেখিতে পাইলেন যে, 'যিনি আরো পূর্বাঞ্চলে যাইতে চাহিবেন, গবর্নমেণ্ট তাঁহার জীবনের জন্য দায়ী হইবেন না।' তখন ডাঙাপথে যাওয়ার আশা ছাড়িয়া তিনি জলপথে যাওয়া স্থির করিলেন। জলপথে যাত্রা করিয়া ১৮৫৮ খৃস্টাব্দে (১৭৮০ শক) ১লা অগ্রহায়ণ তিনি নির্বিঘ্নে কলিকাতায় পৌঁছিলেন। তখন তাঁহার একচল্লিশ বছর বয়স।

ইহার পর তাঁহার জীবনে ও ব্রাহ্মসমাজের জীবনে এক নূতন পর্বের আরম্ভ। সুতরাং এইখানেই চরিত-কথার এক অংশের ছেদরেখা টানিতে হইল।

দ্বিতীয় খণ্ড

(১৮৫৯—১৮৭৩)

প্রথম পরিচ্ছেদ

দেশে নবযুগের অভ্যুদয় কেশবচন্দ্র সেন

ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুত্থান

দেবেন্দ্রনাথের জীবনের এক পর্বের শেষ হইয়া আর-এক পর্বের আরম্ভ। এতদিন পর্যন্ত ঝরণার মতো 'গুহাহিত গহ্বরেষ্ঠ' হইয়া তাঁহার জীবনটি পরিপুষ্ট হইতেছিল এবং সামনের বড়ো বড়ো পাথরের বাধাকে লঙ্ঘন করিয়া আর-পাঁচটা ঝরণার সঙ্গে মিলিত হইয়া ক্রমশ নিজের পথ প্রশস্ত করিয়া লইবার চেষ্টাও করিতেছিল। এবার ঝরণা নদী হইয়া নীচে নামিল; এবার লোকালয়ের দিকে তাহার যাত্রা।

তত্ত্ববোধিনী সভা ও ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া দেবেন্দ্রনাথ এতদিন ধরিয়া কাজ করিলেও তাঁহার কাজের প্রভাব অল্প লোকের মধ্যেই বদ্ধ ছিল। তিনি একলাই ভাবিতেছিলেন, একলাই কাজ করিতেছিলেন— তাঁহার ভাবনার সঙ্গে সমস্ত দেশের ভাবনা, তাঁহার কাজের সঙ্গে সমস্ত দেশের কাজ আসিয়া মেলে নাই। এতদিন পর্যন্ত তাঁহার যাহা-কিছু সংগ্রাম ছিল, তাহা নিজের সঙ্গে নিজের সংগ্রাম, পরিপূর্ণ আত্ম-প্রকাশের জন্য সংগ্রাম। তাঁহার কাজের ক্ষেত্রে তিনি এক রকম একলাটিই ছিলেন, তাঁহার বন্ধুরা সেখানে তাঁহারই অনুগমন করিয়াছেন। দু-এক সময় মত লইয়া দু-এক জনের সঙ্গে সামান্য খিটিমিটি বাধিলেও তাহা একটা প্রচণ্ড বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম বলিয়া কোনোদিনই তাঁহার মনে হয় নাই। অর্থাৎ দেশশক্তি বা কালশক্তি এতদিন জাগে নাই। নানা আদর্শ, নানা অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘাত দেখা দেয় নাই। সেই-সব উল্টাপাল্টা দশদিককার দশ রকমের হাওয়ার মধ্যে কর্ম-তরীটিকে চালনা করা যে কী ব্যাপার, তাহার কোনো অভিজ্ঞতাই এতদিন পর্যন্ত দেবেন্দ্রনাথের হয় নাই।

অদৃশ্য ভাবে, সমাজশক্তিগুলার পরস্পরের উপর পরস্পরের চাপ যখন প্রচণ্ড হইয়া উঠে, তখনই উপরের দিকে তাহাদিগকে ঠেলিয়া দেখা দিতে হয়— পর্বতের অভ্যুত্থানের মতো তখন বড়ো বড়ো শক্তির লীলা প্রকাশ পায়। সেই-সকল শক্তিসংঘাতসমুত্থিত পর্বতের চূড়াগুলি এক-এক জন বড়োলোক— সমস্ত সমাজশক্তি তাঁহাদিগকে উপরের দিকে তুলিয়া ধরে। এইজন্য এক-একটা বড়ো বড়ো কালে, একজন মাত্র বড়োলোক দেখা দেন না, অনেকে দেখা দেন।

তাঁহাদের গায়ে দেশের ভাববাষ্প জমিয়া নূতন নূতন ধারা হইয়া দেশের মধ্যেই তাহারা আবার নামিয়া আসে। এই সময়ে, এমনি একটি বড়ো কাল দেশের সামনে আসিয়াছিল।

কিসে তাহার পরিচয়?

পরিচয় নানান্ দিকে।

দেবেন্দ্রনাথ যখন হিমালয় হইতে নামেন, তখন সিপাহী-বিদ্রোহ চলিতেছিল। সিপাহী-বিদ্রোহের আগুন শীঘ্র নিভিয়া গেল বটে, কিন্তু বাংলাদেশের মাটিতে তাহা একটা নূতন সার রাখিয়া গেল। এ দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের সেই সময় হইতেই শুরু। সিপাহী-বিদ্রোহের আগুনের পরিণামস্বরূপ সারেই তাহার ফলন।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। তাহা রাজনৈতিক আন্দোলনের নীহারিকার অবস্থা। সেই নীহারিকাকেই জ্যোতিষ্কে পরিণত করিবার সম্পাদন-ভার দেবেন্দ্রনাথ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা তো দেখিয়াছি। এখন সেই নীহারিকার অবস্থা পার হইয়া রাজনৈতিক আন্দোলন রূপ ধরিল।

এই রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে হরিশ মুখুয্যের 'হিন্দু-পেট্রিয়ট' চিরস্মরণীয়। সিপাহী-বিদ্রোহের পর লর্ড ক্যানিং সকল ইংরাজের পরামর্শের বিরুদ্ধেও যে ক্ষমার নীতি অবলম্বন করিয়া "ক্লিমেন্সি ক্যানিং" অর্থাৎ দয়াময় ক্যানিং এই ব্যঙ্গ উপাধি পাইয়াছিলেন, ক্যানিংএর সেই ক্ষমা-নীতির মূলে হিন্দু-পেট্রিয়ট ছিল। সিপাহী-বিদ্রোহের সঙ্গে যে দেশের প্রজাদের কোনো যোগ নাই হিন্দু-পেট্রিয়টে হরিশ এই কথাই বিশেষ জোরের সহিত প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু নীলকর হাঙ্গামায় এ দেশে যে রাজনৈতিক আন্দোলন সত্যসত্যই জাগিয়াছে, সে কথাটা হিন্দু-পেট্রিয়ট এ দেশের রাজ-পুরুষদের কাছে প্রমাণ করিয়া দিয়াছিল। ইংরাজ ব্যবসায়ীরা অনেকগুলি কোম্পানি খুলিয়া বাংলার জেলাতে জেলাতে নীলের চাষ শুরু করিয়াছিলেন। তাঁহারা "দাদন" অর্থাৎ আগাম টাকা দিয়া চাষাদিগকে ক্রীতদাসের মতো এক রকম কিনিয়া লইতেন ও জোর করিয়া খাটাইতেন। ইংরাজ-উপনিবেশ-গুলিতে এখনো যে টাকা দিয়া শ্রম কিনিবার প্রথা চলিতেছে, তাহার এক নমুনা আর কি! নীলকর সাহেবেরা প্রজাদিগকে মারিয়া ঘর জ্বালাইয়া কয়েদ করিয়া এমন অসহ্য অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন যে, হাজার হাজার প্রজা ধর্মঘট করিয়া "দাদন" লইতে অস্বীকার করিয়াছিল। তাহাতে অত্যাচার দশগুণ

বাড়িয়া গেল। হরিশ হিন্দু-পেট্রিয়টে সেই অত্যাচারের খবর প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এই সময়েই আবার দীনবন্ধু মিত্রের বিখ্যাত 'নীলদর্পণ' নাটক বাহির হয়। তাহার ইংরাজী অনুবাদ নিজের নামে প্রকাশ করিয়া পাদ্রী লং সাহেব জেলে যান। 'নীলদর্পণ' সমস্ত দেশে যে তুমুল হুলস্থুল উপস্থিত করিয়াছিল, এমন বোধ হয় দ্বিতীয় কোনো গ্রন্থ করে নাই।

ইহার একটা বড়ো কারণ, বাংলাদেশে এই সময়ে এক নূতন সাহিত্যেরও অভ্যুদয় হইতেছিল। ইহার পূর্বে বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত এবং তত্ত্ববোধিনীর ভিতর হইতে বাংলায় যে গদ্যসাহিত্যের জন্মলাভ হইয়াছিল, তাহাকে ঠিক রস-সাহিত্য বলা যায় না। তাহা "Life immense in passion, pulse and power"-এর সৃষ্টি নয়; তাহার মধ্যে জীবনের প্রচুর আবেগ, শক্তি ও নাড়ীর চঞ্চলতা কোথাও অনুভব করা যায় না। সেই সাহিত্য হয় ইংরাজী বইয়ের তর্জমা, নয় ধর্মকথা ও তত্ত্বকথা বলিয়া দেশের লোকের মনকে তেমন করিয়া ধরে নাই। এখন যাত্রা ও কবির গানের গ্রাম্য আমোদের পর রঙ্গমঞ্চে নূতন নূতন নাট্যের অভিনয় দেশের লোকের মনে এক আশ্চর্য উন্মাদনা সঞ্চার করিল। প্রথমে প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি নিজেদের বাগানবাড়িতে সংস্কৃত নাটক তর্জমা করাইয়া তাহার অভিনয় দেখাইতেছিলেন। তার পরে পাইকপাড়ার রাজারা যখন একটা রঙ্গালয় স্থাপন করিলেন, তখন মাইকেল মধুসূদন দত্ত আসিয়া তাহাতে যোগ দিলেন। অভিনয়ের জন্য মাইকেল নূতন নূতন নাটক লিখিতে লাগিলেন।

মাইকেল ও দীনবন্ধু মিত্র, বাংলার এই দুই প্রথম নাটককারের নাট্যগুলির বেশির ভাগই সামাজিক প্রহসন ছিল। ইহার কারণ কি? কারণ, তখন পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্রবে এ দেশের প্রাচীন রীতিনীতির যে একটা উল্টাপাল্টা কাণ্ড ও মানুষের চরিত্রের মধ্যে একটা উচ্ছৃঙ্খল উন্মত্ততা দেখা দিয়াছিল, তাহা বাস্তবিকই প্রহসনের বিষয়। তাহা দেশের চিত্তস্রোতের নিতান্ত উপরকার অংশে একটা কৃত্রিম উত্তেজনাকে ফেনায়িত করিয়াছিল। তখনো বিচিত্র শক্তির বিপরীতমুখী বেগে ঝড় ওঠে নাই এবং দেশের অন্তস্তল হইতে এক আদর্শের সঙ্গে অন্য আদর্শের, এক আন্দোলনের সঙ্গে অন্য আন্দোলনের রীতিমত তরঙ্গনাট্যলীলা জমে নাই। মাইকেল ও দীনবন্ধু দুজনেই এইজন্য সামাজিক ব্যঙ্গচিত্রই তাঁহাদের নাটকের ভিতর দিয়া আঁকিয়াছিলেন। কিন্তু মনে রাখা

দরকার যে, ইহা তখন একটা শক্তি এবং সমস্ত দেশময় সেই শক্তির প্রভাব ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

এই তিন-চার বছরের মধ্যে একদিকে রাজনৈতিক আন্দোলন, অন্য দিকে নাট্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও নূতন রসসাহিত্যের অভ্যুদয় দেশকে যেমন মাতাইয়াছিল, তেমনি আর-একটি আন্দোলন ইহার কিছুকাল আগে জাগিয়া দেশকে শুধু এক নূতন রসে ও নূতন ভাবে ভাবুক করিয়া না তুলিয়া তাহার চিরপোষিত সংস্কারের পিঠে কসিয়া চাবুক লাগাইল। তাহা বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহের আন্দোলন। ১৮৫৬ সালে এই আন্দোলন উঠে।

১৭৭৬ শকের ফাল্গুনের তত্ত্ববোধিনীতে, অর্থাৎ ১৮৫৬ খৃস্টাব্দে, "বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না"— বিদ্যাসাগরের এই প্রবন্ধ বাহির হয়। তখনো দেবেন্দ্রনাথ হিমালয়ে যান নাই। ঐ বছরের চৈত্রের সংখ্যায় বিদ্যাসাগরের মতকে সমর্থন করিয়া আর-এক প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছে দেখা যায়। ১৮৫৬ খৃস্টাব্দে ১৭৭৭ শকের অগ্রহায়ণের পত্রিকায় বিদ্যাসাগরের লেখা 'বিধবা-বিবাহবিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকের উপক্রমভাগ' বাহির হয়। সেই প্রবন্ধে তিনি বিধবা-বিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত, এ কথা দেশের লোকে শুনিতেছে না এবং শাস্ত্রের চেয়ে দেশাচারকেই বড়ো করিয়া তুলিতেছে বলিয়া বিস্তর আক্ষেপ করিয়াছেন। এই লেখা আগ্নেয়গিরির অগ্নি-উচ্ছ্বাসের মতো দেশাচারের সমস্ত সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, নীচতা, হৃদয়হীনতাকে পোড়াইয়া চলিয়াছে। এত বড়ো একটা বীর্য, পৌরুষ ও মহত্ত্বের বাণী বাংলা সাহিত্যে আর কখনো শোনা গিয়াছে কি না সন্দেহ। যে দেশে অন্তত স্ত্রীর পক্ষে বিবাহ ব্যাপারটা এমন একটা ধর্মব্রত যাহা কোনো কালেই লজ্ঘন করা যায় না, সে দেশে কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলে হইয়া বিদ্যাসাগর বিধবার আবার বিবাহ হইতে পারে এই প্রস্তাব যে তুলিলেন— ইহাই আশ্চর্য। শাস্ত্রসম্মত হোক আর নাই হোক, বিধবা স্ত্রীলোক যে স্ত্রীলোক, তাহার যে ইচ্ছা আছে, প্রবৃত্তি আছে, সব আছে— সুতরাং তাহাকে কল্পিত ব্রহ্মচারিণী না ভাবিয়া স্ত্রীলোক মাত্র মনে করিয়াই তাহার জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করা সমাজের যে ধর্মনৈতিক কর্তব্য এ কথা বলাই যথেষ্ট দুঃসাহস। কারণ এ দেশের লোকের কাছে বিধবা হওয়া মাত্র, স্ত্রীলোক আর নারী থাকে না, সে একেবারে দেবী হইয়া বসে। বহু সাধনায় মানুষকে দেবতা হইতে হয়; স্ত্রীলোকের পক্ষে একমাত্র সাধনার বিষয় বৈধব্য— কারণ তাহা হইলেই সে দেবী হইতে পারে।

সমাজের বাঁধা কলের নিয়মে চলা যাহাদের পুরুষানুক্রমে অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, বাংলাদেশের সেই আচারভীরু মানুষগুলির চোখের সামনে বিদ্যাসাগরের এই পৌরুষের আদর্শ একেবারে আচমকা বাজপড়ার মতো একটা ব্যাপার হইয়াছিল। এমন একটা কাণ্ড যে কখনো এ দেশের সমাজে সম্ভব হইতে পারে, তাহা মানুষের মনেও হয় নাই। বিধবা-বিবাহের আইন পাস হওয়ার পর যখন প্রথম বিধবা-বিবাহ হয়, সেদিন রাজনারায়ণবাবু লিখিয়াছেন, "কলিকাতার লোক এমন চমকিত হইয়াছিল যে, যুগ উল্টানোর ন্যায় একটা কি ভয়ানক ঘটনা ঘটিতেছে।" তৃতীয় বিধবা-বিবাহ ও চতুর্থ বিধবা-বিবাহ রাজনারায়ণবাবুর জেঠ্তুত ভাই দুর্গানারায়ণ বসু ও তাঁহার সহোদর মদনমোহন বসু করেন। রাজনারায়ণ বসু তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন, "এই বিধবা-বিবাহ জন্য মাতাঠাকুরাণী ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিলেন। বিধবা-বিবাহের সময় তিনি মথুরায় ছিলেন। তিনি সেই সময়ে বাটীতে থাকিলে আমার দুই ভায়ের বিধবা-বিবাহ দিতে পারিতাম না। ঐ সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও পশ্চিমে ছিলেন। আমি তাঁহাকে বিধবা-বিবাহের সংবাদ দেওয়াতে তিনি আমায় লিখিয়াছিলেন যে, 'এই বিধবা-বিবাহ হইতে যে গরল উত্থিত হইবে তাহা তোমার কোমল মনকে অস্থির করিয়া ফেলিবে; কিন্তু সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায়।'" এই চিঠির তারিখ ২৪এ ফাল্গুন ১৭৭৮ অর্থাৎ ইংরাজী ১৮৫৭ সাল। তখন দেবেন্দ্রনাথ অমৃতসরে। বিধবা-বিবাহ আইন হইবার সময় তাহার সমর্থন করিয়া যাঁহারা নাম সই করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার তাঁহার কেশবচরিতে লিখিয়াছেন, "Devendra, however, could never reconcile himself to the idea of marrying widows."…"Widow marriage was to him a disagreeable thing." অর্থাৎ দেবেন্দ্রনাথ বিধবা-বিবাহ কোনো মতেই অনুমোদন করিতে পারিতেন না—বিধবা-বিবাহ জিনিসটা তাঁহার মোটেই ভালো লাগিত না।

এইরূপে প্রায় সিপাহী-বিদ্রোহের সময় হইতে তিন-চার বছরের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলন, নূতন সাহিত্যের আন্দোলন, সামাজিক আন্দোলন প্রভৃতি একে একে উঠিয়া সমস্ত বাংলা দেশকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়া তাহাকে সচল ও সচেতন করিয়া তুলিল। সমস্ত দেশ অনুভব করিল যে, তাহার মধ্যে একটা বড়ো যুগের আবির্ভাব হইয়াছে এবং সেই যুগশক্তির বিচিত্র লীলা এই-

সকল আন্দোলনের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতেছে। হিমালয় সম্বন্ধে যেমন কবি লিখিয়াছেন যে, হিমালয় একদা—

"..দুর্দম অগ্নিতাপবেগে,
আপনারে উৎসারিয়া মরিতে চাহিয়াছিল মেঘে?"

ঠিক সেই রকমের একটি "অগ্নিতাপবেগ" এই সময়ে সমস্ত দেশটাকে ঊর্ধ্বে উৎসারিত করিতেছিল এবং সেই প্রচণ্ড উৎসারের চূড়ায় চূড়ায় বড়ো বড়ো লোক দেখা দিয়াছিলেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে মাইকেল, দীনবন্ধু এবং তার পরে বঙ্কিম; রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রামগোপাল ঘোষ, হরিশ মুখুয্যে; সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর এবং তার পরেই কেশবচন্দ্র। এবং এই-সমস্ত আন্দোলনগুলির এক হিসাবে জন্মদাতা—ব্রাহ্মসমাজের ক্ষেত্রেও—গৌরীশঙ্কর-কাঞ্চনজঙ্ঘার যুগল চূড়ার মতো দেবেন্দ্রনাথের পাশাপাশি দাঁড়াইলেন কেশবচন্দ্র। দেশের সমস্ত শক্তিগুলিকে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মের উপলব্ধি, বড়োর উপলব্ধির, মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, সমাজ সমস্তকেই বিশ্ব-মানবের বিরাট মহাসভায় উত্তীর্ণ করিয়া দিবার জন্য এই দুই মহাপুরুষ মিলিলেন।

এত কাল ধরিয়া একলাটি দেবেন্দ্রনাথ এই যুগশক্তির উদ্‌বোধনেরই আয়োজন করিতেছিলেন। সামাজিক মনকে জাগাইবার জন্য সামাজিক স্মৃতির (Social memory) ভাণ্ডারের বন্ধ দরজার কুলুপগুলি তিনি খুলিতেছিলেন। কারণ অব্যক্তচৈতন্যের উপরে তবে তো ব্যক্তচৈতন্য, স্মৃতির উপরে তবে তো বুদ্ধি ও যুক্তির কাজ। সামাজিক স্মৃতি মানেই ইংরাজীতে যাহাকে বলে traditions—অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব যুগের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সঞ্চয়। ধর্মের, দর্শনের সৌন্দর্যবোধের, সমাজের—সমস্তের যুগসঞ্চিত আদর্শের ও অভিজ্ঞতার স্মৃতি-ভাণ্ডারের মধ্যে আধুনিক যুগকে তিনি প্রবেশ করাইয়া এ যুগের মানুষের পুষ্টির জন্য কত বড়ো যে একটি জাতীয় সঞ্চয় জমিয়া আছে, তাহা দেখাইয়া দিলেন। কিন্তু তিনি কি মানুষের ব্যক্তিত্বকে এই অতীতের অভিজ্ঞতা-ভাণ্ডারের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিবার জন্যই তাহার দরজা খুলিয়াছিলেন? তাহা যদি হইত, তবে তিনি বেদের অভ্রান্ততার মতকে আঘাত করিয়া ধর্মের যে-সকল প্রাচীন অভিজ্ঞতা একালের মানুষের জীবনের মধ্যে সঞ্জীবিত হইতে পারে, অর্থাৎ যে অভিজ্ঞতাগুলি নিত্য অভিজ্ঞতা—সেইগুলিকে রক্ষা করিয়া শাস্ত্রের একান্ত শাসনকে (Authority) অগ্রাহ্য করিতেন না। তাঁহার কাছে প্রাচীন স্মৃতি (Tradition) এবং যুক্তি (Reason) এ দুয়ের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী বিরোধ

ছিল না। এ দুইই পরস্পরাপেক্ষী। এক নহিলে অন্য বাঁচে না। যুগসঞ্চিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা-ভিন্ন যুক্তি খোরাক না পাইয়া মরে এবং আপনার গণ্ডীর মধ্যে বাঁধা পড়িয়া শীর্ণ কঙ্কালসার হইয়া যায়। যুক্তি ভিন্ন যুগসঞ্চিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা মৃত ভারমাত্র, তাহাদের কোনো গতি কোনো জীবন থাকে না।

এই কথাটি দেবেন্দ্রনাথ বেশ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া নবযুগের পথ প্রস্তুত করিতেছিলেন। এ দেশের সাহিত্যে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিবার জন্য যে-দুজনকে তিনি টানিয়া লইয়াছিলেন এবং যাঁহাদের একজনের কৃতিত্বের মধ্যে তাঁহার নিজের কৃতিত্ব যথেষ্ট পরিমাণে আছে— আশ্চর্য এই যে, সেই দুই ব্যক্তিই ধর্মমত সম্বন্ধে হয় 'ডীস্ট্' নয় সংশয়বাদী (agnostic) ছিলেন। অক্ষয়কুমার প্রথম জীবনে 'ডীস্ট্' ছিলেন, শেষ জীবনে সংশয়বাদী হন। বিদ্যাসাগর বরাবরই সংশয়বাদী ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ জন স্টুয়ার্ট মিলের রচনা পড়িয়াছিলেন ; তিনি জানিতেন যে, ঈশ্বরপ্রত্যয় না থাকিলেও লোকশ্রেয়ঃ লোকসংগ্রহের ভাব হইতে কত বড়ো একটা পৌরুষ ও উদারতার আদর্শ জাগিতে পারে। সেই আদর্শই সাহিত্যের মধ্যে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিবার পক্ষে একান্ত উপযোগী। অক্ষয়কুমারের 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার' ও 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়' এই দুইটি বইয়ের মধ্যে যুক্তির কুঠারের ঘায়ে সমাজ ও ধর্মসম্বন্ধীয় সংস্কার ছিন্ন করিবার চেষ্টা যদি না থাকিত, তবে বাংলা সাহিত্যের বন্ধন মোচন হইত না, বাংলা দেশের মন সচেতন হইয়া জীবনের ভিতর হইতে কোনো সাহিত্য সৃষ্টি করিত না। তেমনি বিদ্যাসাগরের 'বিধবাবিবাহ' গ্রন্থ না বাহির হইলে সেই সংস্কারের বন্ধনমোচনের কাজটি আরো পিছাইয়া থাকিত, এবং সাহিত্যে নূতন ভাব, নূতন প্রাণ, নূতন আশা ও আকাঙ্ক্ষা দেখা দিত না। এই দুইজন মহারথী ধর্ম কিংবা সমাজ সম্বন্ধে সংস্কারগুলিকে ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন বলিয়াই বাংলা দেশের মনের জাগরণ হইয়াছিল এবং মাইকেল, দীনবন্ধু ও বঙ্কিমের সাহিত্য দেখা দিয়াছিল।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতির সঙ্গে মিলিয়া দেবেন্দ্রনাথ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত করেন এবং হিমালয়ে যাইবার পূর্ব পর্যন্ত তাহার সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। হরিশ মুখুয্যে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে যেমন প্রবেশ করেন, তেমনি ভবানীপুরে একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিতেও তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী ব্যক্তি ছিলেন। এই সূত্রে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহারও সম্বন্ধ হয়।

সমাজসংস্কারের আন্দোলনের একেবারে গোড়া হইতে দেবেন্দ্রনাথ তাহার সহিত যুক্ত ছিলেন। প্রথম আন্দোলন, স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলন, তাহার কথা তো পূর্বেই বলিয়াছি। তার পরে বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহের আন্দোলন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা তাহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তার পরে ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠানের আন্দোলন, সে কথায় আমরা এখনো আসি নাই। তাহারও দেবেন্দ্রনাথই প্রবর্তক। টুকরা টুকরা ভাবে সমাজসংস্কারের পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না; সমাজকে একেবারে আমূল নূতন করিয়া তৈরি করিবারও দিকে তাঁহার উৎসাহ ছিল না। তিনি সমাজ ও ধর্মের উপর যে-সকল জীর্ণতা, মৃত আচার, মিথ্যা সংস্কার জমা হইয়াছে সেগুলিকে সরাইয়া সমাজের প্রাচীনকে আধুনিকের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে পরিণত করিয়া সেই আধুনিককে ভবিষ্যতের দিকে উত্তীর্ণ করিয়া দিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন। তাঁহার সংস্কার মানে ছিল অভিব্যক্তি। প্রাচীনের সংসর্গ হইতে ছাড়াইয়া তিনি আধুনিককে দেখিতেন না। এ জায়গায় বার্কের সঙ্গে তাঁহার সাদৃশ্য ছিল, বেন্থামের সঙ্গে নয়।

কিন্তু এই কোনো আন্দোলনই যে দেশে স্বতন্ত্রভাবে প্রাণ পাইবে না, ধর্মের সঙ্গে যুক্ত না হইলে যে ইহারা ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো এক অখণ্ড শরীরের অন্তর্গত হইয়া কাজ করিতে পারিবে না, ইহা তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন। সেই-জন্য এক নবযুগ দেশে আবির্ভূত হইয়াছে ইহা অনুভব করিয়াই তিনি ব্রাহ্ম-সমাজকে এই যুগশক্তির উদ্‌বোধক ও চালক করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। তিনি বুঝিলেন এতদিন তাহা উপাসকমণ্ডলী মাত্র ছিল, এখন তাহাকে সমাজ হইতে হইবে। এতদিন তাহা মাথা ছিল, হৃদয়ও ছিল বটে, এখন তাহাকে হাত পা ও সমগ্র শরীর হইয়া মাথা ও হৃদয়ের নির্দেশ অনুসারে কাজ করিতে হইবে। সমস্ত দেশ এই একটি আধারের ভিতর দিয়া আপনার সাধনার সারকে লাভ করিবে, এই একটি আয়নার ভিতর দিয়া আপনার স্বরূপকে দেখিতে পাইবে।

বাস্তবিক এ কাজ কাহারো একলার কাজ নয়। দেশশক্তিকে ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে আকর্ষণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে তাহার নেতা করিতে গেলে একদল ধর্মোৎসাহী তেজস্বী যুবকের দরকার ছিল। তাহারা সমাজের চিরাগত প্রথা ও আচারের মধ্যে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিবে না। তাহারা সন্দেহ করিবে, প্রশ্ন করিবে, পরীক্ষা করিবে। তাহারা চলিবে এবং চলার পথে যে-সকল বাধা তাহাদিগকে ঠেলা দিবে, যে-সকল জঞ্জাল তাহা সরাইয়া দিবে। তাহারা প্রাচীনকে ভাঙিবে এবং নূতনকে গড়িবে। মাইকেল যেমন পয়ারের বেড়ি

ভাঙিয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য রচনা করিলেন, তেমনি তাহারাও বাঙালী সমাজের বেড়ি ভাঙিয়া প্রশস্ত করিয়া সমাজ গড়িবে। এমনি একটি যুবকদলের দলপতি হইয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলেন কেশবচন্দ্র।

কেশবচন্দ্র কলুটোলার বিখ্যাত রামকমল সেনের পৌত্র। তাঁহার পিতা প্যারীমোহন পরম ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন; তাঁহার সর্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ থাকিত। তাঁহার মাতাও অত্যন্ত ধর্মশীলা রমণী ছিলেন। সাত বছরের সময় কেশব হিন্দু-কালেজে ভর্তি হইয়া, মধ্যে কিছুকাল মেট্রপলিটান বিদ্যালয়ে পড়েন এবং আবার হিন্দুকালেজেই ফিরিয়া আসেন। সেই অল্প বয়সেই তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভার পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছিল। বয়সের তুলনায় পড়াশুনায় তিনি অনেক বেশি অগ্রসর হইয়াছিলেন। সতেরো-আঠারো বছর বয়স হইতেই তাঁহার বেদনাপ্রবণ চিত্তে এক তীব্র পাপবোধ ও বৈরাগ্যের ভাব জাগিয়া উঠিল। তিনি যাত্রা শুনিতে খুব ভালোবাসিতেন, যাত্রা শোনা বন্ধ করিলেন। একটি বেহালা বাজাইতেন, নিজের হাতে তাহা ভাঙিয়া ফেলিলেন। উপন্যাস পড়া তাঁহার কাছে পাপ কাজের মতো হয় মনে হইত; প্রণয়সংগীত তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। এমন-কি, হাসাটা তাঁহার কাছে পাপ বলিয়া মনে হইত। 'জীবনবেদে' তিনি লিখিয়াছেন, "আমি পাপী, আমি পাপী— মন কেবল এই-রূপই বলিত। প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে জাগিয়া হৃদয় যদি কোন কথা বলিত; কেবল বলিত আমি পাপী।...যতক্ষণ জাগ্রত থাকিতাম, ততক্ষণই পাপবোধ। ...ভিতরে এত লম্বা লম্বা দীর্ঘ দীর্ঘ পাপাকৃতি দেখি, ঠিক যেন নরকের কীট কিল্‌বিল্‌ করিতেছে। এখন জানি প্রত্যহ একশত পাপের কম করি না।" আঠারো বছর বয়সে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল— কিন্তু তিনি লিখিতেছেন, "সংসারে প্রবেশ করিবার কাল আমার পক্ষে শ্মশানে প্রবেশ করিবার কাল।... সংসারের রূপকে ভীষণ দেখিলাম, স্ত্রী বলিয়া যে পদার্থ তাহাকে ভয় হইত। হাস্য আমার নিকট হইতে বিদায় লইল।...আত্মনিপীড়ন ও ভার্যানিপীড়নের দ্বারা ধর্মজীবন আরম্ভ হইল।"

কেশবের যৌবনকালের এই অসুস্থ পাপবোধ ও 'আত্মনিপীড়ন' কতক পরিমাণে বয়ঃসন্ধিকালের স্বাভাবিক ধর্ম ও কতক পরিমাণে প্রকৃতিগত। কিন্তু ইহার আতিশয্য দেখিয়া মনে হয় যে, খৃস্টান ধর্মের প্রভাব হয়তো ইহার একটা গোড়াকার কারণ। খৃস্টানধর্মে জীব ও ভগবানের দ্বৈত, পাপ ও পুণ্যের দ্বৈত-রূপে প্রধানভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। এই দ্বৈতের এক কোটিতে অনন্ত পাপ,

অন্য কোটিতে অনন্ত পুণ্য ; এক কোটিতে নরক, অন্য কোটিতে স্বর্গ। মানুষের আত্মাকে এই অনন্ত পাপ হইতে অনন্ত পুণ্যের দিকে ক্রমশ অগ্রসর হইতে হয়। তাহাকে আত্মশুদ্ধির মার্গে (Purgative way) পাপের মূলকে একেবারে নির্মূল করিয়া সমস্ত আবরণ ঠেলিয়া ফেলিয়া নগ্ন হইয়া তবে ভগবানের কাছে যাইতে হয়। এইজন্য খৃস্টান সাধু ও সাধ্বীদের জীবনে দেখা যায় যে, তাঁহারা চিত্তশুদ্ধির জন্য চূড়ান্ত কৃচ্ছ্র সাধনায় লাগিয়া গিয়াছেন। সেণ্ট ফ্রান্সিস্, সেণ্ট টেরেসা প্রভৃতি সকলেই শরীরকে নানা রকমে কষ্ট দিয়া, সংসারের সকল সুখকে দূরে রাখিয়া একেবারে রিক্ত হইয়া শুদ্ধ হইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কোনো বড়ো হিন্দু সাধকের জীবনে এই পাপবোধ যে এমন উৎকট আকারে দেখা দেয় নাই, তাহার কারণ তাঁহারা জানেন যে এই রিক্ততার সাধনা ঋণাত্মক সাধনা। "বাহর ভীতর সকল নিরন্তর"— ঈশ্বর বাহির ও অন্তর এই দুইকে নিরন্তর করিয়া আছেন ; এই দুই ক্ষেত্রেই ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের যোগ। সাধু বার্নাড পাছে সুইট্‌জারল্যাণ্ডের রমণীয় হ্রদপর্বতের মিলনদৃশ্য চোখে পড়ে এবং মন ভুলায়, সেজন্য সমস্ত পথ চোখ বুজিয়া গিয়াছিলেন। অথচ তাঁহারি মতো মধ্যযুগীয় সাধক কবীর বলিয়াছেন, "ভীতর কহুঁ ত জগময় লাজৈ"— যদি বলি তিনি ভিতরে তবে জগৎ যে লজ্জা পায়। সকল দ্বৈতের মধ্যে অদ্বৈততত্ত্ব যে ধর্মে ফোটে নাই, সেই ধর্মেই এই পাপ ও পুণ্যের দ্বৈত যেন কোনোমতেই আর ঘুচিতে চায় না। সেমেটিক্ ধর্মগুলিতে তাই দ্বন্দ্বমূলক ধর্মনীতির ভাব প্রধান ; নির্দ্বন্দ্ব অদ্বৈত-বোধের ভাব প্রধান নয়।

দ্বন্দ্বমূলক ধর্মনীতির ভিতরকার লক্ষণ যেমন পাপবোধ ও পাপের সঙ্গে সংগ্রাম, ইহার বাহিরের লক্ষণও তেমনি জগতের সকল অন্যায়কে দূর করিবার চেষ্টা, অন্যায়ের সঙ্গে নিয়ত লড়াই। এই কারণে ধর্মনীতি যে-সকল ধর্মের ভিত্তিতে আছে, সেই-সকল ধর্মের মধ্যে প্রচারের উৎসাহ সকলের চেয়ে বেশি দেখা যায়। আমাদের হিন্দুধর্মসাধনায় এই প্রচারের দিক একেবারে নাই বলিব না, কিন্তু ইহার তেমন ঝাঁঝ যে নাই সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা বলি জগতের যত-কিছু পাপ ও মলিনতা, সমস্তের মূল আমার আপনার মধ্যে। আমি যে-পরিমাণে হৃদয়গ্রন্থিগুলিকে খুলিয়া ফেলিতে পারিব ও বিশুদ্ধ হইব, সেই পরিমাণে আমার চারি পাশের অবস্থারও উন্নতি হইবে। অবশ্য আমাকে যে অন্যায় দূর করিবার জন্য কোনো চেষ্টা করিতে হইবে না তাহা নয় ; অন্যায় দেখিলে যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে এমন নয়। কিন্তু লুব্ধভাবে লোকহিত করিলে হিত কল্যাণ

চেয়ে অহিত করাই বেশি হয়। ধর্মপ্রচারের উত্তমের মধ্যে সেই ফললুব্ধতা উগ্র হইয়া উঠিতে পারে; তাহাতে আধ্যাত্মিক শান্তি নষ্ট হয়। তাহাতে আপাতঃ ফল যাহাই লাভ হৌক-না কেন, চিরন্তন ফল লাভ হয় না।

দেবেন্দ্রনাথের জীবনের মধ্যে আমরা এই কথারই বিশেষ সাক্ষ্য দেখিতে পাইয়াছি। তিনি ধর্মপ্রচার করিয়াছেন; কিন্তু ফলের প্রতি লোভ যে ঝাঁঝের সৃষ্টি করে, তাহা তাঁহার প্রচারের মধ্যে বা তাঁহার কোনো কাজের প্রণালীতে দেখা যায় নাই। এইজন্য যখনি তিনি কাজের মধ্যে বেশি জড়াইয়া পড়িয়াছেন, তখনি তাঁহাকে সেই জাল ছিঁড়িয়া বনপর্বতের নির্জনতার মধ্যে ডুব দিতে হইয়াছে। কখনো লোকালয়, কখনো বিশ্বপ্রকৃতি— কখনো নির্জনতা, কখনো সজনতা— কখনো ধ্যান, কখনো কর্ম— এই দুয়ের ছন্দে তাঁহার জীবন বাঁধা হইয়াছিল।

কিন্তু আমি বলিয়াছি যে, দেশে তখন একটা নূতন যৌবনের বসন্তের হাওয়া একদিকে সমাজের জীর্ণ আচারের শুকনো পাতার রাশি উড়াইয়া লইয়া চলিয়াছিল, এবং আর-এক দিকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ও সাহিত্যের শাখায় এক অপূর্ব রসছুটানো ও অজস্র ফুলফুটানো শুরু করিয়া দিয়াছিল। সেই নূতনের প্রবল হাওয়ায় সকলেরি মন কিছু-না-কিছু উতলা হইয়া উঠিয়াছিল।

সুতরাং এই তরুণ যুবক কেশবচন্দ্র যখন ব্রাহ্মসমাজে আসিলেন, তখন তাঁহার মধ্যে পাপের বোধ এবং অন্যায়ের সঙ্গে লড়াইয়ের ভাবটা পুরা মাত্রায় থাকার জন্যই তিনি সেই বিদ্রোহী কালের বিজয়ী রথের সারথি হইয়া যেন ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলেন। তিনি জীবন-বেদে লিখিয়াছেন, "বাল্যকালাবধি আমি অগ্নিমন্ত্রের উপাসক, অগ্নিমন্ত্রের পক্ষপাতী"— সে কথা ঠিক। সেই উনিশ বছর বয়সেই তিনি বন্ধুদের সঙ্গে মিলিয়া নিজের বাড়িতে ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও ধর্মালোচনার জন্য "গুড উইল ফ্রেটারনিটি" নামে এক সমিতি খাড়া করেন। সেইখানেই তাঁহার ভাবী বাগ্মিতার প্রথম মহড়া চলিতে থাকে। দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে কেশবচন্দ্র হিন্দুকালেজে পড়িয়াছিলেন; দুজনের মধ্যে বিশেষ পরিচয় ছিল। সত্যেন্দ্রনাথের অনুরোধে দেবেন্দ্রনাথ সেই সমিতির এক বৈঠকে সভাপতির কাজ করেন এবং সেখানে একটি উজ্জ্বল শিখার মতো কেশবচন্দ্রের মূর্তি সেই প্রথম দেখিতে পান। তার পর দেবেন্দ্রনাথ সিমলা পাহাড়ে চলিয়া গেলেন এবং সেই বছরেই কেশব ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশের জন্য গোপনে প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। ইহার পরের বছরে দেবেন্দ্রনাথ

পাহাড় হইতে এক নূতন কাজের প্রেরণা লইয়া যখন নামিলেন, ঠিক সেই সময়ে তাঁহার কাছে মূর্তিমান উৎসাহের মতো সেই যুবককে দেখিয়া তিনি যেন আপনারই প্রেরণাকে বাহিরে সাকার মূর্তিতে দেখিলেন। প্রবীণের সঙ্গে নবীনের যোগ হইল— সে এক আশ্চর্য যোগ।

শুধু কেশবচন্দ্র নয়, এই সময়ের ইতিহাসে আর-এক জন যুবকের নাম করা নিতান্ত দরকার। কেশবচন্দ্র যদি তখন দেবেন্দ্রনাথের ডান হাত হন, তো এই যুবক ছিলেন বাঁ হাত। এই দুই তরুণ মাঝি দুদিকের দাঁড় ধরিলেন এবং কর্ণধার হইলেন প্রবীণ দেবেন্দ্রনাথ। তখন দেশের নদীতে প্রবল তুফান, তাহার ভিতর দিয়া ব্রাহ্মসমাজের তরীটিকে ইঁহারা চালনা করিতেছিলেন। সেই যুবকটি আর কেহ নন— দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ।

এ সময়ে সত্যেন্দ্রনাথের বয়স মাত্র আঠারো বছর। আশ্চর্য, সেই অল্প বয়সেই তাঁহার মধ্যে এমন একটা ধর্মোৎসাহ দেখা দিয়াছিল যে, তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের কাজে তাঁহার পিতার একজন মস্ত সহায় লইয়া দাঁড়াইলেন। দীর্ঘকাল পরে দেবেন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিয়াছেন— মাঘোৎসব সামনে— সকলেরই উৎসাহের সীমা নাই! সেই উৎসবে যখন সত্যেন্দ্রনাথ কিছু কাজ করিবার ইচ্ছা তাঁহার পিতাকে জানান, তিনি তো অবাক্! সত্যেন্দ্রনাথ বক্তৃতা লিখিয়া দেখাইলে তিনি খুশি হইলেন। তখন হইতেই সত্যেন্দ্রনাথ সমাজের কাজ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু এই উপদেশগুলিতে তাঁহার তেমন বিশেষত্ব ফোটে নাই যেমন ফুটিয়াছে তাঁহার গানে। পিতার ধর্মভাব ও ধর্মোপদেশের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া যে-সকল ব্রহ্মসংগীত তিনি এই সময়ে রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের বাস্তবিকই তুলনা নাই। যেমন দেবেন্দ্রনাথের ব্যাখ্যান, তেমনি এই গানগুলি— যেন এক সুরে বাঁধা। ব্যাখ্যানের কথায় আমরা এখনো পৌঁছি নাই। ব্যাখ্যানের এক জায়গা তবু এই গানের প্রসঙ্গে উদ্ধার করিতেছি—

"অনুতাপিত হৃদয়ে তাঁহার নিকটে অশ্রুপাত করুন— তাহা হইলেই তাঁহার যন্ত্রণা যাইবে, পাপের আকর্ষণ থাকিবে না, শোকের তীব্রতা থাকিবে না।… আত্মাতে দেখাই তাঁহাকে নিকট করিয়া দেখা।…বাহিরে যে তাঁহার প্রকাশ দেখা, সেও তাঁহাকে দূরে দেখা। যখন তাঁহাকে হৃদয়ে দেখি, তখনই নিকটে দেখি।"[১]

১ তৃতীয় ব্যাখ্যান : ৩২ শ্রাবণ ১৭৮২ শক

সত্যেন্দ্রনাথের একটি গান ঠিক এই ভাবে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে—

প্রেমমুখ দেখ রে তাঁহার।
শুভ্র, সত্যস্বরূপ, সুন্দর, নাহি উপমা তাঁর।
যায় শোক, যায় তাপ, যায় হৃদয়-ভার;
সর্ব সম্পদ তাহে মেলে, যখন থাকি তাঁর সাথ।
না থাকে সংসার-তাপ, করেন ছায়া দান;
সকল সময়ে বন্ধু তিনি এক, সম্পদে বিপদে।
যদি আসে তাঁর কাজে, দিয়াছেন যে প্রাণ,
ছাড়ি যাব অনায়াসে, তাঁরে করিব দান॥

এই-সকল গান তখনকার উপাসনায় এক নূতন প্রাণসঞ্চার করিয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজের সেই বেদান্তপ্রভাবের পর্বে—মোহমুদ্গরজাতীয় গান আর এই-সকল গানে কত তফাত! তখন গান ছিল তত্ত্বকথা, এখন গান হইল হৃদয়ের কথা।

জান না রে কত তাঁর করুণা!
যে জন দেখে না, চাহে না তাঁকে, তারেও করিছেন প্রেমদান।
রসনা, যাও তাঁর নাম প্রচারো;
তাঁর আনন্দ-জনন সুন্দর আনন, দেখ রে নয়ন, সদা দেখ রে!

ব্রাহ্মধর্মে যখন হইতে প্রেমের উৎস, ভক্তির উৎস খুলিয়া গেল, তখন হইতেই তাহার মধ্যে গান আসিল। এই গানের ধারাটিও একটানা নয়। জ্ঞানের বালুস্তূপে যেমন এক সময়ে ইহার কলধ্বনি চাপা পড়িয়া গিয়াছিল, ভক্তির বন্যায় তেমনি আর-এক সময়ে ইহার তটের বাঁধ এবং ছন্দ ধসিয়া গিয়াছিল। এক সময় যেমন মোহমুদ্গর ছিল গানের আদর্শ; আর-এক সময় তেমনি খৃস্টানী hymn গানের আদর্শ হইয়াছিল। কিন্তু এই নানা বিচিত্রতার মধ্য দিয়া আজও পর্যন্ত এই ধারাটি চলিয়াছে। জ্ঞান এবং রসের মিলন ঘটাইবার জন্য গানের বাঁশি আজও বাজিতেছে—এ বাঁশি কোনো কালে থামিবে বলিয়া মনে হয় না। গান আসিয়াছে, শিল্প আসে নাই। ভক্তি নানা কলাকাণ্ডে এখনো আপনাকে সার্থক করে নাই।

গানের মন্দাকিনীর নিরুদ্ধ ধারা যে শুধু সত্যেন্দ্রনাথই খুলিয়া দিলেন, তাহা নয়। বিশুদ্ধ সংগীতের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের নিজেরই অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। আমাদের দেশের সংগীত যে লোপ পাইতে বসিয়াছে, তাহা যাহাতে রক্ষা পায়

সে দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল। রামমোহন রায়ের সমাজের গায়ক বিষ্ণু চক্রবর্তীকে তিনি কলিকাতা সমাজের গায়ক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বিষ্ণুর গান তিনি বড়োই ভালোবাসিতেন। মধ্যে মধ্যে সন্ধ্যার পর তিনি বিষ্ণুর গান শুনিতেন। ভালো ভালো গায়ককে বাড়িতে আশ্রয় দেওয়াও তাঁহার একটি রীতি ছিল। যদু ভট্ট, একজন বিখ্যাত সংগীতের ওস্তাদ ছিলেন; তিনি বহুকাল তাঁহার আশ্রয়ে ছিলেন। এই-সকল ওস্তাদের হিন্দী গান ভাঙিয়াই বিস্তর ব্রহ্মসংগীত তৈরি হইয়াছে। এ দেশের গীত-সরস্বতীর এই যে উদ্ধার সাধন— এ যে কত বড়ো একটা কাজ নিঃশব্দে সম্পন্ন হইয়াছে তাহা আজ আমরা বুঝিতেছি। এই গানের দেবীটি বিরলে বসিয়া একালের শিশু গীতিকাব্য-সাহিত্যকে স্তন্য দান করিয়া মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন। গান না জাগিলে গীতিকাব্যের সম্ভাবনা ছিল কোথায়? শুধু তাই নয়— গান হইতেই গানের সৃষ্টি হয়, আগুন হইতে আগুনের সৃষ্টির মতো। সেই সৃষ্টির আগুন অল্পে অল্পে ধোঁয়াইতেছে, বাংলার ভাবাকাশের দিকে তাকাইলেই তাহা বোঝা যায়।

কেশবচন্দ্রের 'গুড উইল ফ্রেটারনিটি'র অনেকগুলি যুবকবন্ধু তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কেশব নিজে তরুণ এবং এই তরুণদলের নেতা— এই তরুণদের দ্বারা বাংলাদেশের নবযুগের সিংহদ্বার উদ্‌ঘাটন করাইয়া ব্রাহ্মধর্মের জয়োৎসব সম্পন্ন করাইবার জন্য তাঁহার মন মাতিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু গোড়ায় দেশের যুবাদলকে ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তোলা চাই— উৎসাহে তাহাদের বুক ভরিয়া দেওয়া চাই। এইজন্য ১৮৫৯ খৃস্টাব্দে কেশবচন্দ্রের প্রস্তাবে উচ্চশিক্ষিত যুবকদিগকে ধর্মশিক্ষা দিবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র "ব্রহ্মবিদ্যালয়" নামে এক বিদ্যালয় খুলিলেন। প্রতি রবিবারে সকালে ৭টা হইতে ৯টা পর্যন্ত ধর্মোপদেশ দেওয়া হইত। বিজ্ঞাপন বাহির হইল যে, দেবেন্দ্রনাথ "ব্রহ্মের স্বরূপ ও তাঁহার প্রতি প্রীতি ও তাঁহাতে আত্মসমর্পণ বিষয়ে" বাংলায় উপদেশ দিবেন এবং কেশবচন্দ্র "ঈশ্বরের প্রিয় কার্য সাধন এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্মের লক্ষণ ও তদনুষ্ঠান" বিষয়ে ইংরাজীতে বক্তৃতা করিবেন। প্রথমে সিন্দুরিয়াপটীর গোপাল মল্লিকের বাড়িতে এই বিদ্যালয় বসিত, কিছুদিন পরে আদি ব্রাহ্মসমাজের দোতলার ঘরে ইহার কাজ চলিতে লাগিল। এই-সকল উপদেশে অনেক শিক্ষিত যুবকের মন ব্রাহ্মসমাজের দিকে ঝুঁকিল।

দেবেন্দ্রনাথের এই ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশগুলি 'ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস' এই নামে গ্রন্থাকারে বাহির হইয়াছিল। সত্যেন্দ্রনাথ এই উপদেশগুলি বঙ্গ

করিয়া লিখিয়া না রাখিলে এই গ্রন্থ হইতে বাংলা সাহিত্য চিরদিনের মতো বঞ্চিত থাকিত। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যালয় ও ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ সম্বন্ধে এখন কিছু বলিব না। কারণ ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনের কয়েক মাস পরেই ১৮৫৯ খৃস্টাব্দে পুজার সময়ে দেবেন্দ্রনাথ— কেশবচন্দ্র ও সত্যেন্দ্রনাথ— যে দুইজন যুবক ব্রাহ্মসমাজের কাজে তাঁহার দুই হাতের মতো হইয়াছিলেন বলিলাম, তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া সিংহলে গেলেন। ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কাজ তখনো বিশেষ জমিয়া উঠে নাই।

সিংহলের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের স্মৃতি জড়িত। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের উদ্যোগ-পর্বের দুই তরুণ প্রচারককে সেখানে লইয়া যাওয়ার বিশেষ একটি সার্থকতা ছিল। কিন্তু এ উদ্দেশ্যের কথা মনে করিয়াই যে দেবেন্দ্রনাথ সিংহলযাত্রা করেন তাহা নয়। ৭ই আশ্বিনে তিনি রাজনারায়ণবাবুকে এক চিঠিতে লিখিতেছেন— "পুজার সময়ে ভ্রমণকল্পের সূচনা হইতেছে। এবার আমি সিলোন দ্বীপে যাইবার মানস করিয়াছি। ১২ই আশ্বিনে এখান হইতে বোধ হয় যাত্রা করিতে হইবে। যদিও আমার বাটীতে এবার পুজা বারণ করিতে সমর্থ হইয়াছি এবং আমার তৎকালে বাটীতে থাকার বাধা নিরাকরণ হইয়াছে, তথাপি মন আমার মানে না, ঈশ্বরের অনন্ত ভাবের প্রতিবিম্ব দেখিবার জন্য নীলোজ্জ্বলগভীর সমুদ্রের দিকে আমার মন হেলিয়া পড়িয়াছে।"

বাড়ি হইতে পুজা উঠিয়া যাওয়ার ইতিহাসটা এই: সিমলা পাহাড় হইতে তিনি যখন হঠাৎ ফিরিলেন, তখন বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পুজা হইতেছিল। তিনি বাড়িতে না আসিয়া ব্রাহ্মসমাজে গিয়া বসিয়া রহিলেন। বাড়ির সকলেই অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ঠাকুর বিসর্জন দেওয়া হইলে তবে তিনি বাড়িতে প্রবেশ করিলেন। তাহার পর হইতে প্রতিমাপুজা জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বন্ধ হইল। কিন্তু প্রতিবছর ঐ সময়ে তাঁহার ভ্রমণ বন্ধ হইল না। তাহার কারণ আমরা তো জানি। তাঁহার পক্ষে মানুষের সঙ্গ ও কর্মের যতখানি প্রয়োজন ছিল, বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গ ও বিরতির ততখানিই প্রয়োজন ছিল। এই দুই জগতেই তিনি বাস করিতেন। কখনো তিনি পরিবারের ও সমাজে নানা বিচিত্র সম্বন্ধ ও কর্তব্যজালে জড়িত; কখনো তিনি সকল সম্বন্ধহারা বিশ্বতীর্থের নিঃসঙ্গ যাত্রী।

সিংহলের ভ্রমণবৃত্তান্ত কেশবচন্দ্র ও সত্যেন্দ্রনাথ দুজনেই লিখিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র ও কালীকমল গাঙ্গুলী নামে আর-একজন যুবক গোপনে যাইতেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "তাঁহারা বাষ্পীয় নৌকাতে চড়িয়া তাহার কুঠরির এক কোণে লুকাইয়া রহিলেন। সেখান হইতে উপরে কোন বাঙালিকে দেখিবা মাত্র

বাড়ীর লোক মনে করিয়া চমকিয়া উঠিতে লাগিলেন।" যাইবার সময় সামুদ্রিক রোগে তাঁহাদের সকলেরই অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। সেখানে গিয়াও নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। সত্যেন্দ্রনাথের একটি দিনের ডায়ারিতে দেবেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে উল্লেখ আছে— তাহা বোধ হয় এখানে উদ্ধার করা যাইতে পারে—

"৩০ আশ্বিন, শনিবার।...দুই প্রহরের সময় পিতামহাশয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মের কথা হইল। তিনি বলিলেন, এই ধর্মবৃক্ষের বৃদ্ধির জন্য বলিদান চাই। দুই তিন জনের রক্ত পাইলে তবে ইহা সারবান্ হইবে। আমরা যে দেশে আসিয়াছি, এখানকার রাক্ষসসমান লোকের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রচার কি প্রকারে হইল? এই ধর্মের প্রচার জন্য কত কত লোক জন্মভূমি পরিত্যাগপূর্বক দেশ বিদেশে নির্ভয়ে ভ্রমণ করিয়া আয়ু শেষ করিয়াছে। প্রচারকদিগের আপনারদের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি থাকিলে তাহাদের পরিশ্রম কখনই সফল হয় না। পিতামহাশয় বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ হইতে এক নীতি শুনাইলেন। 'কোন সময়ে অসুরদিগের দমনের জন্য এক যজ্ঞারম্ভ স্থির হইল। প্রথমে চক্ষু যজ্ঞকরণে প্রবৃত্ত হইল। চক্ষু অন্য সকল ইন্দ্রিয়ের উপকার সাধন করিল, কিন্তু সে আপন অধিকারে আপনি গর্বিত হইল; এই জন্য তাহার যজ্ঞ বিফল হইল। পরে বাক্য তাহাতে উদ্যত হইল; বাক্য সকলেরি তুষ্টি সাধন করিল। কিন্তু আমি একজন সুকথক বলিয়া বাক্যেরও অহংকার হইল; এই হেতু তাহার যজ্ঞও সফল হইল না। এই প্রকারে অন্য সকলে হার মানিলে প্রাণ যজ্ঞারম্ভ করিল। প্রাণ সাধারণের উপকারী— প্রাণ সমস্ত শরীরের জন্য, কিন্তু আপনার জন্য নয়। প্রাণেরই যজ্ঞ সফল হইল।'...ত্যাগই ধর্মের প্রাণস্বরূপ। সকলই স্বপদে থাকিবে— ধর্মও রক্ষা পাইবে; এ প্রকার করিয়া ধর্মরক্ষা হয় না। মহাত্মা রামমোহন রায় যদি ত্যাগ স্বীকার না করিতেন— জন্মভূমি হইতে নির্বাসিত না হইতেন...তবে ব্রাহ্মধর্ম বঙ্গদেশে রোপিতই হইত না!...কোন জাতির মধ্যে ঈশ্বরের এমন বিশুদ্ধ উপাসনা প্রচার হয় নাই। ব্রাহ্মধর্ম যেমন উচ্চ, বঙ্গভূমি তেমন ইহার উপযুক্ত বোধ হয় না। এ ধর্মবৃক্ষ এখানে শুষ্ক হয়, কি ফলে ফুলে সুশোভিত হয়, বলা যায় না। ঈশ্বরে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য সাধন এই দুই মহদ্ভাবই এ ধর্মের মূলাধার— ইউরোপ এবং এ দেশের ভাব এ দুইই ইহাতে একত্রিত হইয়াছে।"[১]

সিংহলযাত্রা নিষ্ফল হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ঐতিহাসিক প্রেরণায়

১. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বোম্বাই চিত্র, পৃ. ৫১৩-১৪

ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের উদ্দীপনা জাগিয়া উঠিল। ব্রাহ্মধর্ম এবং তাহার প্রচার সম্বন্ধে এই কথাবার্তায় দেবেন্দ্রনাথের মনের ভাব যতটা স্পষ্ট বুঝা যায়, এমন কোনো লেখা হইতে বুঝা যায় না। বেশ বুঝা যায়, তিনি কতখানি ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন এবং ব্রাহ্মধর্মকে কেমন উদারক্ষেত্রে রাখিয়া কত বড়ো করিয়াই দেখিতেছিলেন!

সুতরাং সিংহল হইতে নির্বিঘ্নে ফিরিয়া আসার পরেই পৌষমাসের সাধারণ সভায়, ব্রাহ্মসমাজের এককালে কতগুলি গুরুতর পরিবর্তন হইয়া গেল দেখিতে পাই।

এ পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের ভার তত্ত্ববোধিনী সভার উপরেই ছিল। ১৮৫৮ সালে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সেই সভার সম্পাদক হন। ১৮৫৯ সালে এই তত্ত্ব-বোধিনী সভা উঠিয়া গেল এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সেই সভার সম্পাদকতার পদ ত্যাগ করিলেন। ব্রাহ্মসমাজে এক নূতন দলের আবির্ভাব এই সভা উঠিয়া যাইবার কারণ কি না, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও কেন যে ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মসমাজ হইতে সরিয়া পড়িলেন, তাহার কারণও জানা শক্ত। হয়তো ইহার পরে কয়েক বছরের মধ্যে কেশবচন্দ্র প্রভৃতি নূতন যুবকদলের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের ব্যবস্থায় যে-সকল পরিবর্তন হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা বিদ্যাসাগরের পছন্দ হয় নাই। যাহাই হোক, সভা তো উঠিয়া গেল এবং সভার অধীনে যে ছাপাখানা, গ্রন্থাগার ও অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি ছিল সে সমস্তই সভা ব্রাহ্মসমাজের ট্রাস্টিদিগকে দান করিলেন। পৌষমাসের সভায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জায়গায় দেবেন্দ্রনাথ এবং কেশবচন্দ্র দুজনে ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। রমাপ্রসাদ রায় সভাপতি, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্রিকাধ্যক্ষ, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ সহকারী সম্পাদক এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্রিকা-সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। সমাজের কার্যপ্রণালী প্রভৃতিও নূতন রকমে বিধিবদ্ধ হইল।

এইবার ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কথা বলিবার সময় আসিয়াছে। সিংহল হইতে ফিরিয়া দেবেন্দ্রনাথ এবং কেশবচন্দ্র দুজনেই ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কাজে দ্বিগুণ উৎসাহের সঙ্গে লাগিলেন। আদিব্রাহ্মসমাজের দোতলার ঘরে এক লম্বা টেবিল পাতা থাকিত, তাহার উত্তর দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে বেঞ্চের উপর দুই সারি দিয়া ছাত্ররা বসিতেন এবং পূর্ব দিকে দুইখানি চেয়ারের উপর উপদেষ্টা দুই জন আসন গ্রহণ করিতেন। ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত হইবার দুই বছর পরে ১৭৮৩ শকে

(১৮৬১ খৃস্টাব্দে) শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে দেবেন্দ্রনাথ যে-সকল উপদেশ দেন সেগুলিকে 'ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস' এই নাম দিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে কথা বলিয়াছি। এই নামকরণ ঠিকই হইয়াছিল। কারণ এই বইটিতে দেবেন্দ্রনাথকে প্রধানত ধর্মতত্ত্ববিৎ (Theologian) রূপেই দেখা যায়। হিমালয়ে যাইবার পূর্বে এবং হিমালয়ে বাস করিবার সময়ে বেদান্ত-দর্শন, উপনিষদ্, বাট্‌লার, পেলি, চামার্স, নিউম্যান প্রভৃতির রচনা, স্কচ দর্শন-কারদের লেখা, বেন্থাম হইতে মিল পর্যন্ত 'ইউটিলিটি'বাদের রচনা, কাণ্ট ও ও ফিক্তের তত্ত্বগ্রন্থ প্রভৃতি যে-সকল দর্শনশাস্ত্র তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন, সেই-সমস্ত তত্ত্বের মালমসলার সাহায্যে তিনি এই ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাসগুলিকে (dogmas and beliefs) গড়িয়া পিটিয়া একালের উপযোগী করিয়া দাঁড় করাইয়া গিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে অন্যান্য ধর্মের বিরুদ্ধ মত ও বিশ্বাসকেও খণ্ডন করিতে হইয়াছে। রামমোহন রায় বিশ্বমানবের সকল ধর্মতত্ত্বের মূল সত্যগুলি দেখিতে পাইয়াছিলেন বলিয়া বেদান্তধর্মের মূলসত্য-গুলিকেও সেই বিশ্বজনীন উদারক্ষেত্রে সহজেই তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাসগুলিকে বেশ প্রণালীবদ্ধ করিয়া স্পষ্ট করিয়া তিনি দিয়া যান নাই। এ কাজ একমাত্র দেবেন্দ্রনাথই করিয়াছেন। ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ভিতর দিয়া এই বড়ো কাজটিই করিবার ছিল। পরিশিষ্টভাগে সবিস্তারে আমরা এই গ্রন্থের আলোচনা করিলাম।

'আচার্য কেশবচন্দ্র' গ্রন্থে[১] কেশবচন্দ্রের একজন ভক্তের স্মৃতিরচনা হইতে ব্রহ্মবিদ্যালয় সম্বন্ধে একটুখানি বিবরণ উদ্ধার করা হইয়াছে। সেই ভক্ত লিখিতেছেন, "মহর্ষির সুগভীর জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে শেষ হইত, কিন্তু কেশবচন্দ্রের উপদেশের শেষ কোথায়?··· কখনো তিন ঘণ্টা, কখনো চারি ঘণ্টা, কখনো পাঁচ ঘণ্টা অতিবাহিত হইত, দিবালোক রজনীর অন্ধকারে পরিণত হইত, তথাপি তাহার বিরাম হইত না।··· বক্তৃতাকালে কখনো চীৎকার করিতেন আর বলিতেন, তোমরা ধর্মেতে পাগল হইবে না? ···তোমরা উন্মত্ত হও, উন্মত্ত না হইলে কিছু হইবে না। পূজ্যপাদ প্রধানাচার্য মহাশয়ের উপদেশ তদীয় দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিপিবদ্ধ করিতেন।··· কেশবচন্দ্রের উপদেশ লিপিবদ্ধ করে কাহার সাধ্য?"

---

১. গৌরগোবিন্দ রায়-প্রণীত আচার্য কেশবচন্দ্র গ্রন্থ।

কেশবচন্দ্রের চার-পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী উন্মাদকর বক্তৃতার সারাংশও উদ্ধার করা যখন কাহারো সাধ্য ছিল না, তখন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে তিনি ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কী বলিতেন তাহা জানিবার কোনো উপায় নাই। তবে আমরা জানি যে, তখন তিনি রীড্ প্রভৃতি স্কচ দর্শনকারদিগের তত্ত্বগ্রন্থ আলোচনা করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মধর্মের তত্ত্বকে সহজজ্ঞানের (Intuition, Innate Idea) ভিত্তির উপর দাঁড় করাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সহজ জ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয় সম্বন্ধেও আমরা পরিশিষ্টভাগে আলোচনা করিলাম।

ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে ছাত্রদিগকে এমন অগ্রসর করিয়াছিল যে, অনেক ছাত্র মনোবিজ্ঞান বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উঁচু জায়গা অধিকার করিয়াছিলেন। প্রতি বছর একবার করিয়া ব্রহ্মবিদ্যালয়ের পরীক্ষাও লওয়া হইত। কেশবচন্দ্র প্রশ্ন দিতেন ও পরীক্ষা করিতেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে একটা প্রতিষ্ঠাপত্র (certificate of honour) দেওয়া হইত। ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ যে এই ছাত্রদের মনের উপর খুব কাজ করিয়াছিল, তাহার একটা প্রধান প্রমাণ এই যে, এই ব্রহ্মবিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র উত্তরকালে ব্রাহ্মধর্মপ্রচারে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

১৮৬০ সালে ভবানীপুর ও চুঁচুড়াতেও ব্রহ্মবিদ্যালয় খোলা হইল। ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের কথা পুর্বেই বলা হইয়াছে। এই সময়ে প্রতি সোমবার ভবানীপুর সমাজে দেবেন্দ্রনাথ উপাসনা করিতেন এবং রবিবার সকালে ৬॥০টার সময় ব্রহ্মবিদ্যালয়ে পড়াইতে আসিতেন। তাঁহার ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের এক ছাত্র শ্রীযুক্ত সিতিকণ্ঠ মল্লিক মহাশয়ের কাছে শুনিয়াছি যে, তিনি ধর্মতলায় গাড়ি হইতে নামিয়া সমস্ত গড়ের মাঠটি হাঁটিয়া আসিতেন এবং সারকুলার রোডে আসিয়া আবার গাড়িতে উঠিতেন। অথচ ঠিক ৬॥০টার সময় নিয়মিত ব্রহ্মবিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতেন। এমনি তাঁহার সময়নিষ্ঠা ছিল। একবার ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব শনিবার দিন পড়ে—উৎসব অনেক রাত্রে ভাঙে। সেই সাম্বৎসরিক উৎসবে দেবেন্দ্রনাথই আচার্যের কাজ করিয়াছিলেন। পরদিন সকালবেলায় ছাত্রদের আসিতে বিলম্ব হয়; কিন্তু তিনি ঠিক সময়ে আসিয়া বসিয়া আছেন। ছাত্ররা তো সকলেই বিষম লজ্জিত হইলেন। তার পর যখন উপদেশে তিনি বলিতে শুরু করিলেন যে, জগৎসংসারে নিয়মের বাঁধ কোথাও আলগা নয়, এই নিয়মই জগৎকে সুন্দর করিয়া রাখিয়াছে—তখন তো লজ্জায় তাঁহাদের মাথা হেঁট! এখানে ছাত্রসংখ্যা প্রায় চল্লিশ জন ছিল,

বেশির ভাগই কালেজের ছাত্র। উপদেশের পর তাঁহাদিগকে তিনি ব্রাহ্মধর্ম পাঠ অভ্যাস করাইতেন এবং ঠিকমত অভ্যাস হইলে মাসিক ব্রাহ্মসমাজে বেদীর সামনে ছাত্রদিগকে স্বাধ্যায় পড়িতে হইত। এখানেও পরীক্ষা হইত। বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ছাপা প্রশ্ন দেওয়া হইত এবং কেশববাবু পরীক্ষা লইতেন। পাস হইলে পার্চমেণ্ট কাগজে প্রতিষ্ঠাপত্র দেওয়া হইত। প্রশ্নের উত্তর যাহার ভালো হইত, তাহার রচনা তত্ত্ববোধিনীতে ছাপানো হইত। 'ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাসের' শেষে এইরকম কতকগুলি প্রশ্ন ও ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রদের দ্বারা সেই প্রশ্নগুলির উত্তর ছাপানো আছে, দু-একটা প্রশ্ন নীচে দেওয়া যাইতে পারে— তাহা হইতে শিক্ষার ধরনটা পাঠকেরা কতকটা বুঝিতে পারিবেন—

"১। আত্মজ্ঞানের সহিত ব্রহ্মজ্ঞানের কিরূপ সম্বন্ধ ?

"২। আত্মার পরিমিত ভাব হইতে কোন পরিমিত আশ্রয়কে মনে না হইয়া অনন্ত অপরিমিতকে মনে হয় কেন ?"

ব্রহ্মবিদ্যালয়ে দেবেন্দ্রনাথের কাজ হইল ধর্মতত্ত্ববিৎ বা Theologian-এর কাজ। তিনি সেখানে উপনিষদ্-বেদান্তের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া, দেকার্ত হইতে কাণ্ট পর্যন্ত পশ্চিমের সমস্ত দর্শনশাস্ত্রগুলিকে বিচার ও আত্মসাৎ করিয়া তাহাদের সাহায্যে নিজের অধ্যাত্ম-উপলব্ধির দ্বারা পরীক্ষিত ঔপনিষদ ধর্মমত ও বিশ্বাসের ভিত্তিকে প্রশস্ততর ও দৃঢ়তর করিলেন। কিন্তু এ কাজ খুব বড়ো হইলেও ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া এ কাজের চেয়ে বড়ো কাজ তিনি এ সময়ে করিতেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ হিমালয়ে তাঁহার দীর্ঘকালের নির্জন সাধনার গভীর অভিজ্ঞতাসকল সপ্তাহে সপ্তাহে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার সময়ে বলিতে লাগিলেন। হিমাচল শিখরেরই মতো ধ্যানগম্ভীর সেই নির্মল-বিরল অধ্যাত্মলোকের বার্তা তাঁহার শ্রোতাদের অন্তরে ধর্মোৎসাহের বিদ্যুৎ সঞ্চার করিয়া তাহাদের সমস্ত চেতনাকে প্রদীপ্ত করিয়া তুলিল। আত্মা-পরমাত্মার নিগূঢ় যোগের কথা এ দেশের মানুষ এমন করিয়া কখনো শোনে নাই। এ ব্যাখ্যানগুলি তো শুধু ধর্মতত্ত্ব ও নীতিতত্ত্বের বিচার ও মীমাংসা নয়, এ একেবারে সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির কথা। এ তো শুধু দর্শনশাস্ত্রের তত্ত্বকথা নয়, এ যে একেবারে সর্বেন্দ্রিয় হৃদয় মন ও আত্মা সমস্ত দিয়া দর্শনের কথা।

তাঁহার পূর্ব পূর্ব রচনায় (অবশ্য 'ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাসে' নয়) জীবাত্মাকে পরমাত্মা হইতে অনন্তগুণে ভিন্ন বলা হইয়াছিল। 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানে' বলা হইল যে আত্মাতে তাঁহার রূপ, জগতে প্রতিরূপ। তিনি ব্যাখ্যানে বলিতেছেন,

"কেহ বলেন, তাঁহার সহিত সহবাস কি প্রকারে হইতে পারে? মনুষ্য মনুষ্যেরই সঙ্গী হইতে পারে, কিন্তু কোথায় সেই ভূমা অনাদ্যনন্ত পুরুষ আর কোথায় আমরা এই সকল ক্ষুদ্র জীব— আমারদের আবার নানা অভাব, নানা দুর্গতি।... কিন্তু সহবাস কি? না, একত্রে থাকা। দূরের বস্তুর সঙ্গেই সহবাস হয় না; কিন্তু অন্তরতমের সঙ্গে কেন না একত্রে থাকা যাইবে?...তিনি আমারদের এত নিকটে আছেন যে, আত্মা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া জানিতেছে; তাঁহার সঙ্গে সংস্পৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে।...তাঁহার সহিত এমন নিকট সম্বন্ধ যে জীবাত্মাতে ও তাঁহাতে আকাশের ব্যবধান নাই; কেননা, তাঁহারা উভয়েই আকাশের অতীত।"... তিনি আকাশে যে রহিয়াছেন—"বাহিরে সর্বত্রই তাঁহার যে প্রতিরূপ রহিয়াছে সৃষ্টির সৌন্দর্যে, মনুষ্যের মঙ্গল-কার্যে, বন্ধুদিগের প্রণয়ে, তাঁহার মঙ্গল-ভাবের যে আদর্শ রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া আমরা কৃতার্থ হইতেছি। কিন্তু অন্তরে যে তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিতে দেখিতে পাইতেছি, এই আমারদের মহৎ অধিকার। বাহিরে তাঁহার প্রতিরূপ; অন্তরে তাঁহার রূপ দর্শন করিতেছি।"[১]

সুতরাং এই ব্যাখ্যানে দেখিতে পাই যে, দেবেন্দ্রনাথের আগেকার দ্বৈত মত ঘুচিয়া গিয়া পুরা অদ্বৈত মত না দাঁড়াইলেও অদ্বৈত-ঘেঁষা মত দাঁড়াইয়াছে বলিতে হইবে। পুরাপুরি অদ্বৈত মতে পীজ্‌মের স্থান চলিয়া যায়; ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ বা আশ্রয়-আশ্রিত সম্বন্ধ আর থাকে না। ব্যক্তিত্বের স্বাধীন কর্তৃত্বের স্থান থাকে না। মুক্তি স্থিতিশীল মুক্তি হয়, মুক্তির ক্রমিক উন্নতির কোনো কথা থাকে না। ব্যাখ্যানে যেমন জীবের একটি ঐকান্তিকত্ব ও একটি অসীম মূল্য আছে, এ কথা বলা হইয়াছে, তেমনি জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ যে একটি নিবিড় প্রীতির যোগ এ কথাও বলা হইয়াছে। সেই প্রীতির যোগেরও ক্রমিক উন্নতি, ক্রমিক বিকাশ। "অনন্তকালই আমরা আনন্দের উপর আনন্দ, প্রেমের উপর প্রেম লাভ করিতে থাকিব।"

ইহার চেয়ে প্রত্যক্ষতর রূপে আত্মা-পরমাত্মার যোগের পরমানন্দময় উপলব্ধির সাক্ষ্য আর কোথায় দেখিয়াছি? অথচ আমাকে লজ্জার সঙ্গে এখানে বলিতে হইতেছে যে, কেশবচন্দ্রের জীবনচরিত-লেখকেরা কেশবচন্দ্রের প্রতি ভক্তির অন্ধতাবশত নানা জায়গাতেই দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অবিচার করিয়াছেন। কেশবচন্দ্রের চরিতলেখক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেন, ব্রাহ্ম সমাজে

১. চতুর্থ ব্যাখ্যান : ৭ ভাদ্র ১৭৮২ শক

প্রবেশ করিবার সময়, "He (Keshub) found in it a few elementary particles of uncertain Deism"— কেশব দেখিতে পাইলেন যে, খুব একটা অনিশ্চিত কেবলমাত্র যুক্তিমূলক ঈশ্বর-প্রত্যয়ের গোটাকতক টুকরা ব্রাহ্মসমাজের ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে ছড়াইয়া আছে। 'আচার্য কেশবচন্দ্র' গ্রন্থের রচয়িতা গৌরগোবিন্দ রায় লিখিয়াছেন, "উপনিষদের 'আত্মপ্রত্যয়' শব্দ অবলম্বন করিয়া স্বাভাবিক বিশ্বাসেও বিশ্বাস করা হইত কিন্তু এ বিশ্বাস— জগদ্রূপ কার্যের একজন কারণ আছেন— এইরূপ পরোক্ষ জ্ঞান ছিল, সহজ জ্ঞানে যে প্রকার বাহ্য জগৎ বিধৃত হয়, সেই প্রকার ঈশ্বরও আত্মাতে বিধৃত হন, এরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান তখন ব্রাহ্মসমাজে স্থান লাভ করে নাই।"

"ব্রাহ্মসমাজ" বলিতে তো দেবেন্দ্রনাথকে বাদ দেওয়া বুঝায় না। Theism ও অপরোক্ষ জ্ঞান কেশবচন্দ্রের সময় হইতেই ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিল কি না, তাহা এই গ্রন্থের পাঠকেরা হিসাব করিয়া দেখিবেন।

ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানের প্রভাব সম্বন্ধে ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী লিখিয়াছেন, "ব্রাহ্মসমাজ দেখিবার পূর্বে আমার সংস্কার ছিল যে, ব্রহ্মজ্ঞানীরা কেবল তবলা বাজাইয়া গান করে, বেদ পাঠ করে, অবশেষে সুরাপান ও মাংস ভোজন করে। ...সায়ংকাল উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মসমাজে গেলাম।...ভক্তিভাজন বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বর্গীয় ভাবে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। পাপীর দুর্দশা, ঈশ্বরের বিশেষ করুণা এই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া... আমার সমস্ত শরীর গলদ্‌ঘর্মে কম্পিত হইতে লাগিল, অশ্রুজলে হৃদয় ভাসিতে লাগিল।...মনে মনে দেবেন্দ্রবাবুকে ধর্মজীবনের গুরু বলিয়া ভক্তিযোগে প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মসমাজ হইতে চলিয়া আসিলাম।.. অবিলম্বে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে ভক্তিভাজন দেবেন্দ্রবাবুর নিকট দীক্ষিত হইলাম।"

দেবেন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যান শুনিবার জন্য সমাজে তখন দলে দলে লোক ভাঙিয়া পড়িত এবং এই সময়ে বহুলোকের জীবনে ধর্মভাব ও ধর্মলাভের জন্য ব্যাকুলতা জাগিয়াছিল। দীক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমশই বাড়িয়া যাইতে লাগিল।

৬ই ফাল্গুন ১৭৮১ শক রাজনারায়ণবাবুকে এক চিঠিতে তিনি নিজে লিখিতেছেন, "কলিকাতার সমাজে পূর্বে যেমন কেবল ১১ই মাঘের দিবসে লোক হইত, এইক্ষণে প্রতি সমাজেই সেই প্রকার লোক হইয়া থাকে, অনেকে ব্রাহ্মধর্ম অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অনেকে ইহাতে নূতন উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন। আমাদের দালানে এইক্ষণে প্রতিদিন প্রাতঃকালে আমরা সকলে

মিলিয়া সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকি ; সেখানে আর পরিমিত দেবতার উপাসনার সম্ভাবনা নাই। এইক্ষণে আমাদের গৃহ পবিত্র হইয়াছে, আমাদের দালান হইতে প্রতিদিন ঈশ্বরের মহিমা ধ্বনিত হইতেছে।…"

পরিবার সমাজের স্তম্ভের মতো—পরিবার যত উন্নত ও দৃঢ় হইবে, সমাজও ততই সমুচ্চ ও সুপ্রতিষ্ঠ হইবে। দেবেন্দ্রনাথ এই সত্যটি বেশ করিয়া জানিতেন বলিয়া এতদিন যেমন পারিবারিক ব্যাপার সম্বন্ধে কতকটা উদাসীন ছিলেন, এখন আর তেমন উদাসীন রহিলেন না। এতদিন পর্যন্ত তিনি কেবল আপনার একলার মোক্ষ লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন—সেইজন্য ধনের বন্ধন, জনের বন্ধন, দেশের বন্ধন, দশের বন্ধন, শাস্ত্রের বন্ধন, সমস্ত বন্ধন ছিঁড়িয়া সমস্ত হইতে উপরত হইয়া আপনার আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে উপলব্ধির দিকেই তাঁহার সব মনোযোগ ছিল। কিন্তু মুক্তি যে সব ছাড়িয়া নয়, সব গ্রহণ করিয়া—মুক্তি যে "অসংখ্য বন্ধন মাঝে"—মুক্তি যে বিশেষ এবং বিশ্বের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের সম্পূর্ণতায়—মুক্তি যে ক্রমিক, সর্বমানবের উন্নতির ভিতর দিয়া যে তাহাকে ক্রমে ক্রমে লাভ করা যায়—মুক্তির এ আদর্শ এতদিন পর্যন্ত তাঁহার ছিল না। এখন যে তিনি হিমালয় হইতে নামিয়াছেন এবং সংসারের সঙ্গে একেবারে মিশিয়াছেন, এখন তাঁহার ব্যক্তিত্বকে বৃহৎ সামাজিক ব্যক্তিত্ব বলিয়া অনুভব করিয়া সকলের মুক্তির মধ্যেই যে তাঁহার মুক্তি—এই কথাটি তিনি বুঝিয়াছেন। সুতরাং পরিবারের প্রতি তাঁহার এখন পুরা মনোযোগ, জমিদারির প্রতিও এখন তিনি বিমুখ নন। সে আমরা পরে দেখিতে পাইব। পূর্বের সেই ধনবৈরাগ্য, বিষয়বিতৃষ্ণা একেবারে দূর হইয়া গিয়াছে। সমস্ত সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ, সবই তাঁহার পূজা, এই ভাবের সাধনাই তাঁহার এখনকার জীবনের সাধনা। তাঁহার পরিবারের মধ্যে তাঁহার পুত্রকন্যাদের মধ্যে সেই ভাবটি আনিবার জন্য তাই এ সময়ে তাঁহার চেষ্টা দেখা যায়। এতদিন পর্যন্ত তাহা একেবারেই ছিল না। অথচ এই সময়ে তাঁহার ছেলেমেয়েদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ ছাড়া আর সকলেরি নিতান্ত অল্প বয়স ছিল। তিনি যখন সিমলা যান, তখন কেবল সোমেন্দ্র, রবীন্দ্র ও তাঁহার ছোটো মেয়ে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তখন তাঁহার দশটি ছেলেমেয়ে—ছয়টি ছেলে ও চারজন মেয়ে। সিমলা থাকার সময়েই পুণ্যেন্দ্র নামে তাঁহার একটি ছেলের মৃত্যু হয়। ১৭৮৩ শক ১৮৬১ খৃস্টাব্দে, অর্থাৎ সিমলা হইতে ফিরিবার তিন বছর পরে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তার পরেও তাঁহার একটি পুত্র সন্তানের

জন্ম হয় এবং জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মৃত্যু হয়। এ সময়ে দ্বিজেন্দ্রনাথের বয়স ২০, সত্যেন্দ্রনাথের বয়স ১৮, হেমেন্দ্রনাথের বয়স ১৬, বীরেন্দ্রনাথের বয়স ১৪ এবং তাঁহার বড়ো মেয়ে শ্রীমতী সৌদামিনীর বয়স ১২ হইবে।

অথচ কি আশ্চর্য যে শুধু সত্যেন্দ্রনাথ নয়, তাঁহার সকল ছেলেমেয়েরাই সিমলা হইতে ফিরিবার পর হইতেই হঠাৎ তাঁহার অত্যন্ত কাছাকাছি আসিয়া পড়িলেন। নিজেদের জীবনের অজ্বালা দীপমুখগুলি তাঁহার দীপশিখার মুখে ধরিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার পরিবার তাঁহার সমাজের অঙ্গীভূত হইল, সমাজের কাজই হইল পরিবারের সব চেয়ে বড়ো কাজ। এটি স্বাভাবিক উপায়ে না হইলে পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মধর্মকে স্বীকার করা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার হইত।

অবশ্য এখন হইতে পরিবারে ধর্মশিক্ষা দিবার জন্য তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। তিনি প্রত্যহ স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদিগকে লইয়া উপাসনা করিতেন—রাজনারায়ণবাবুর চিঠি হইতেই তাহা জানিতে পারি। নিতান্ত শিশুরা ছাড়া তাঁহার সকল ছেলেমেয়েকেই একে একে ব্রাহ্মধর্মের শ্লোক বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিয়া পড়িতে তিনি অভ্যাস করাইতেন এবং সময়ে সময়ে জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করিয়া যাইতেন। তাহাদিগকে সেই উপদেশগুলি লিখিতে হইত। লেখা ভালো হইলে তাহার পাশে তিনি উৎসাহবাক্য লিখিয়া দিতেন। এই উপায়ে তাহাদের মনে তাঁহার উপদেশগুলি দৃঢ়ভাবে বসিয়া যাইত। তাঁহার শাসনপ্রণালীও বড়ো আশ্চর্য ছিল। ছেলেমেয়েদের কাহারো কোনো দোষ বা ত্রুটির কথা তাঁহার কানে গেলে তিনি প্রতিদিনকার পারিবারিক উপাসনার সময়ে উপদেশের ছলে এমনভাবে তাহার উল্লেখ করিতেন যে, যে দোষী সে লজ্জিত হইত। তিনি কাহাকেও প্রত্যক্ষভাবে বড়ো শাসন করিতেন না; তাঁহার দৃষ্টান্তই সকলকে সংযত রাখিত। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সকল বিষয়ে তিনি আলোচনা করিতেন বলিয়া তাহাদের চিত্তের একটা স্বাধীন বিকাশ হইত। সেইজন্যই বোধ হয় দেখিতে পাই যে, এই সময়ে এত অল্প বয়সেও তাঁহার ছেলেমেয়েদের মধ্যে এমন-একটা আশ্চর্য ধর্মোৎসাহ জাগিয়াছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, বীরেন্দ্রনাথ—ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মসমাজের কাজে বিশেষ উৎসাহী হইয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সৌদামিনী দেবীও লিখিয়াছেন যে, উপাসনার ঘর তাঁহারা সাফ কাপড় পরিয়া প্রতিদিন ঝাড়িয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিতেন এবং উৎসবের

দিনে সেই ঘর সমস্ত রাত জাগিয়া ফুলপাতা দিয়া সাজাইতেন। তিনি লিখিয়াছেন, "একদিন কেশববাবু যখন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়া পিতার সঙ্গে যোগদান করিলেন, তখন চারি দিকে ধর্মোৎসাহ যে কিরূপ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা মনে পড়ে। পিতা তাঁহাকে ব্রহ্মানন্দজি বলিয়া ডাকিতেন ও পুত্রের অধিক স্নেহ করিতেন। বুধবারে সমাজে উপাসনার পর ফিরিয়া আসিয়া আমাদের বাড়ির দালানে যখন সকলে মিলিয়ে গান ধরিতেন—

'সবে মিলে মিলে গাও রে
তাঁর পবিত্র নাম লয়ে জীবন কর সফল,
কেহ থেকো না নীরবে'—

তখন কী উৎসাহের আনন্দে আমাদের মন উদ্‌বোধিত হইয়া উঠিত। ··তখন আমরা ছেলেমানুষ— কিন্তু উপদেশে গানে বক্তৃতায় ঈশ্বরের প্রেমরসে মানুষের মন যে কেমন করিয়া অভিষিক্ত হইত তাহা আজও ভুলিতে পারি নাই।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন   অনুষ্ঠান ও অনুষ্ঠানপদ্ধতি

কেশবচন্দ্র দেশের যৌবনকে রাজটীকা পরাইতে চাহিয়াছিলেন। যাহাদের প্রাণ একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া স্থির হইয়া গিয়াছে, সেই "সনাতনী" প্রবীণ দলের পরে তাঁহার বরাবরই একটা অবজ্ঞা ছিল। তাঁহার নিজের মধ্যে যৌবনের আবেগ প্রাণের চাঞ্চল্য ছিল প্রবল, তাঁহার শক্তি কোথাও বাধা মানিতে জানিত না। সেইজন্য নিজের ভিতর হইতে তিনি অনুভব করিয়াছিলেন যে, দেশের যৌবনের মধ্যে প্রাণ এখনো মরে নাই। দেশের যৌবন সমাজের কারখানা-ঘরের ঢালাই পেটাই করা সনাতনী কল হইয়া যায় নাই। তাহাকে ডাক দিলে সে এখনো সমাজের এত কালের বেড়াবেড়ি ভাঙিয়া সমস্ত উল্টাপাল্টা করিয়া নূতন নূতন সৃষ্টির পথে ছুটিবে, নূতন নূতন পরীক্ষায় লাগিবে।

ইংরাজী ১৮৬০-১৮৬১ সালের মধ্যে তিনি ক্রমান্বয়ে তেরোখানি ইংরাজী চটি বই বাহির করেন। তাহার প্রথম বইটির নাম, *Young Bengal, this is for you*।

কেশবচন্দ্রের এই-সব প্রবন্ধে যুবকদের মধ্যে খুব একটা চাঞ্চল্য ও উৎসাহের সঞ্চার হয়। একদিকে Be prayerful, Atonement and Salvation, প্রভৃতি প্রবন্ধে অনুতপ্ত পাপীর অবস্থা, প্রার্থনার উপকারিতা ও ঈশ্বরের করুণা প্রভৃতি খৃস্টধর্মের প্রেরণা-প্রসূত কথা উপনিষদের আত্মা-পরমাত্মার অধ্যাত্ম-যোগের কথার চেয়ে তাহাদের কাছে অনেক সহজ ছিল। অন্য দিকে "Signs of the Times"—কালের লক্ষণ প্রবন্ধে, স্বাধীনতার বাণী যে একালের বাণী, এই কথাতে তাহাদের সমস্ত মন সায় দিয়া উঠিয়াছিল। এই দ্বিতীয় বাণী যে সত্যসত্যই তখনকার কালের বাণী, তাহা আমি পূর্ব পরিচ্ছেদেই বলিয়াছি।

আমি বলিয়াছি যে, দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতি স্বভাবতই রক্ষণশীল হইলেও কালের এই বাণীকে যে তিনি অস্বীকার করিয়াছিলেন তাহা নয়। বহুপূর্ব হইতেই তাঁহারও মন সামাজিক প্রশ্ন লইয়া আন্দোলিত হইতেছিল। বিধবা-বিবাহের আন্দোলনের বছর-দুই পূর্বে ১৮৫৪ খৃস্টাব্দে রাজনারায়ণবাবুকে এক চিঠিতে (৮ই মাঘ ১৭৭৫ শক) তিনি লিখিতেছেন—

"আমার মতে ব্রাহ্মদিগের উপনয়ন স্বধর্মসম্মত নহে। অতএব অবশ্য তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। যদি ব্রাহ্মদিগের উপনয়নই পরিত্যাগ করিতে হইল, তবে আর ব্রাহ্মণ, শূদ্র প্রভৃতি জাতিভেদ কোথায় থাকে যে, বিবাহের সময় জাতিভেদ করা যায়?...বোধ হয় এখন এমত সময় উপস্থিত হইয়াছে যে, কাহারও পরিবর্ত্তনে বাধা দিবার সাধ্য নাই।"

রাজনারায়ণ বসু ইহার জবাবে কি লিখিয়াছিলেন জানি না, কিন্তু তাঁহার এ বিষয়ে কি মত ছিল তাহা আমরা জানি। তিনি জাতিভেদ সম্বন্ধে তাঁহার এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"জাতিভেদ একেবারে উঠাইয়া দেওয়া কর্তব্য নহে, বস্তুত ইহা একেবারে উঠাইয়া দিবার উপায়ও নাই। জাতিবিভেদ মনুষ্যের প্রকৃতিগত; সকল মনুষ্য সমান নহে।...বর্তমান জাতিবিভেদ প্রথা উঠাইয়া দাও আর-এক প্রকার জাতিবিভেদ প্রথা আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিবে।" এ মত তাঁহার বরাবর ছিল। সমাজ-সংস্কারের যে প্রয়োজন নাই, এ কথা তিনি বলিতেন না; তবে সমাজ-সংস্কারে তিনি যতটা পারা যায় সংরক্ষণ নীতির পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার "সমাজ সংস্কার" প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "যে ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারক সংহার অপেক্ষা রক্ষার প্রতি অধিক মনোযোগী তিনিই সংস্কারকার্যে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন।"

দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে যৌবনের প্রাণপ্রাচুর্যের দুঃসাহসিকতা জিনিসটা ছিল না। যে দুঃসাহস প্রাচীনের সমস্ত বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া নব নব পরীক্ষার পথে ধাবিত হয়, সেই দুঃসাহসের দুর্দমনীয় বিপুল বেগ বরং কেশবচন্দ্রের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়—দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে নয়। তিনি স্বভাবত রক্ষণশীল ছিলেন; অথচ সকল বিষয়ে উন্নতির জন্য তাঁহার আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত প্রবল ছিল। সেই আকাঙ্ক্ষা হইতেই সমাজ-সংস্কারের জন্য তিনি প্রস্তুত হইতেছিলেন। এই দুই বিপরীত ঝোঁকের মিশল তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে থাকায় তাঁহাকে এক দিকে প্রবীণ অন্য দিকে নবীন করিয়াছিল। এক দিকে প্রাচীনের দিকে তাকাইয়া তাঁহার ভয় ভাবনা দ্বিধার অন্ত ছিল না, অন্য দিকে নবীন কালের প্রয়োজনের তাগিদে সব ভয় ভাবনা ঠেলিয়া তিনি এতদূর অগ্রসর হইতেন যে, মনে হইত যে তাঁহার মধ্যে যেন কোনো রকমের ভয় ভাবনা নাই।

তিনি রাজনারায়ণ বসুর কাছে জাতিভেদ ভাঙার সম্বন্ধে কোনো সায় না পাইয়া পরের চিঠিতে তাঁহাকে লিখিতেছেন—

কলিকাতা
১৫ই মাঘ ১৭৭৫ শক

প্রীতিপূর্বক নমস্কারা নিবেদনমিদং—

তোমার ১৩ই মাঘের পত্র পাইয়া সদ্‌যুক্তি লাভ করিলাম। তুমি বহুদর্শী, জাতিভেদ বিষয়ে তুমি যাহা লিখিয়াছ তাহা যথার্থ। এক্ষণে এমত সময় উপস্থিত হয় নাই যাহাতে জাতিভেদ ভঙ্গ করা যায়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে কালে যে জাতিভেদ থাকিবে না তাহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে; যেহেতু নানা ঘটনা সেই জাতিভেদ ভঙ্গ বিষয়ে উন্মুখ হইয়াছে। আমি যখন লিখিয়াছিলাম যে, এমত কাল উপস্থিত হইয়াছে যে, কাহারও পরিবর্তনে বাধা দিবার সাধ্য নাই— তাহার এ তাৎপর্য নহে যে, এক দিবসেই সম্যক্ পরিবর্তন হইবেক। কিন্তু যে পরিবর্তন হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে কাহারও বাধা দিবার সাধ্য নাই। ব্রাহ্ম করিয়া উপবীত দেওয়া বড় নূতন কথা লিখিয়াছ। বড় কুতূহলজনক। আমরা কোথায় উপবীত ত্যাগ করাইয়া ব্রাহ্ম করিতে ব্যগ্র; তুমি ব্রাহ্ম করিয়া উপবীত দিবার নিয়ম করিতে চাহিতেছ। যাহা হউক জাতিভেদ ভঙ্গ করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। শ্রীযুক্ত অক্ষয়বাবুরও এই মত। তিনি বলেন যে, মাতা পিতা স্ত্রী-পুত্রকে দুঃখ দিয়া স্বজাতি হইতে পৃথক হওয়া কর্তব্য নহে। এ বিষয়ে তুমি আপনার যথার্থ অভিপ্রায় যে লিখিয়াছ, ইহাতে আমি অত্যন্ত সন্তোষ প্রাপ্ত হইলাম এবং ইহাতে আমার লাভ জ্ঞান হইল।…জাতিভেদ যে না থাকে তাহা কিছু আমাদের মুখ্য লক্ষ্য নহে, আমারদিগের লক্ষ্য যে, জ্ঞানস্বরূপ মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা প্রচার ও ব্যাপ্ত হয়, কিন্তু জাতি-সংস্কারের মধ্যে পৌত্তলিকতা থাকাতেই এত অনর্থ হইয়াছে। ইতি।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

আমার মনে হয়, রাজনারাণবাবু ও অক্ষয়বাবুর মধ্যে দেশপ্রীতি জিনিসটা যে পরিমাণে প্রবল ছিল, অধ্যাত্মবোধ কখনোই সে পরিমাণে জাগ্রত ছিল না। সেইজন্য তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়াও জাতিত্যাগ করিতে রাজি ছিলেন না। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, জাতছাড়া হইলে তাঁহারা সমাজছাড়া দেশছাড়া হইয়া পড়িবেন। সুতরাং জাতিভেদের অনিষ্টটা কোথায় তাহা বুঝিলেও তাঁহাদের মনে সমাজ হইতে আপাতঃ বিচ্ছেদের বেদনা, জাতিভেদ প্রথার দ্বারা সমস্ত মনুষ্যত্বের অবমাননার বেদনার চেয়ে বেশি ছিল। নিজের দেশকে এবং সমাজকে যে তাঁহারা বাস্তবিকই ভালোবাসিতেন ইহা তাঁহাদের মহত্ত্ব ছিল

সন্দেহ নাই। কিন্তু মানুষকে যদি তাঁহারা সকল মহাপুরুষদের মতো "অমৃতের পুত্র" বলিয়া জানিতেন, তবে সংসারে যে-লোকটি যেমন জায়গায় আছে তাহাকে ঠিক তেমনি করিয়া দেখিবার কেজো পরামর্শ না দিয়া তাঁহারা এই পরামর্শই দিতেন যে, আপনার মতো করিয়া সকলকে দেখা সকল ধর্মেরই শ্রেষ্ঠ অনুশাসন। কোনো সংকীর্ণ দেশকালের প্রয়োজনের খাতিরে সত্যকে ছোটো করিতেন না।

যাহা হউক, ইহা বেশ দেখা যাইতেছে যে, ১৮৫৪ সালেই দেবেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এমন একটা পরিবর্তন দেশে আরম্ভ হইয়াছে যাহাতে "কাহারও বাধা দিবার সাধ্য নাই।" অথচ তখন আমাদের সমাজের আকাশের কোনো দিক্‌প্রান্তে কোনো পরিবর্তনের রেখাটি মাত্র দেখা দেয় নাই। তখনো চিরাগত প্রথার কালো আঁচলে সমাজের মুখ ঢাকা—সে একেবারে নীরন্ধ্র আঁচল। হঠাৎ যে দু-তিন বছরের মধ্যে সিপাহী-বিদ্রোহের আগুন পশ্চিম দিক্‌প্রান্তে জ্বলিয়া উঠিবে এবং তার পরে রাজনীতি, সাহিত্য ও সমাজের নানাবিধ উন্নতির আলোর তরঙ্গ সমাজের মুখের কালো ঢাকাটিকে একেবারে ঠেলিয়া সরাইয়া দিবে, এ কথা কে মনে করিতে পারিয়াছিল! ব্রাহ্মসমাজে কেবল কেশবচন্দ্রই কালের এই প্রবল আবির্ভাব আপনার জীবনের মধ্যে অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা নয়। এ সময়ে দেবেন্দ্রনাথও যদি তাহা অনুভব না করিতেন তবে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ের যোগ যেমন সুদৃঢ় হইয়াছিল, তাহা কখনোই হইতে পারিত না। ১৮৬০ সালে রাজনারায়ণবাবুকে লিখিত একখানি চিঠির কিছু অংশ এখানে উদ্ধার করিলেই দেবেন্দ্রনাথের মধ্যেও সে কালের নবযৌবনের হাওয়ায় সংস্কারের জীর্ণ পর্দাগুলি যে কেমন করিয়া দশ দিকে উড়িয়া যাইতেছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে—

কলিকাতা ৫ই ভাদ্র ১৭৮২ শক

"অভিন্নহৃদয়েষু,

প্রীতিপূর্বক নমস্কারা নিবেদনমিদং—

…আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দ্বারা উপাচার্যের কার্য সুন্দররূপে কোন প্রকারেই সুসম্পন্ন হয় না। এখনকার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সেকালের ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ন্যায় নয়, আবার সেকালের ব্রাহ্মণপণ্ডিত এইক্ষণকার নব্য সম্প্রদায়দিগের নিকটে কখনই প্রিয় হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নামধারীরা এইক্ষণে অত্যন্ত লোভী হইয়া উঠিয়াছে…কলিকাতার ব্রাহ্ম-সমাজে ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে উপাচার্য রাখিয়া তাঁহাদের এ ধর্মবিষয়ে ঔদাস্য দেখিয়া

এইক্ষণে তাঁহাদের প্রতি নিরাশ হইয়াছি।... আমি যে মধ্যে মধ্যে সমাজে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতাম তাহা আমার বন্ধুদিগের অনুরোধে ত্যাগ করিয়া বেদীতেই বসিতে হইয়াছে। প্রথম প্রথম কেমন বোধ হইত, এইক্ষণে অভ্যাস হইয়া যাইতেছে।...লোক দেখান ব্রাহ্মণপণ্ডিতে কি কার্য।...যে ধর্মে যাহার শ্রদ্ধা নাই, তাহার নিকট হইতে সে ধর্মের কথা শুনা কি ? যে কথায় ধর্ম বলে, কার্যে তাহার অনুষ্ঠান করিতে সম্মত নহে, তাহাকে সমাজের মধ্যে প্রধান আসন দেওয়াই বা কোন্ বিধি। আমি উপাসনায় যে প্রণালী প্রস্তাব করিতেছি ইহাতে ব্যয়েরও লাঘব হয়, কার্যও উত্তম হয়। সমাজের মধ্যে বক্তৃতা পাঠ করা অপেক্ষা বেদীতে বসিয়া বলিলেই ভাল। তাহাতে লোকের শ্রদ্ধা হয়। ব্রাহ্মণ না হইলে উপাচার্য হইবে না, এ কথারও মুণ্ডে বজ্রাঘাত করা যায়। শ্রদ্ধাবান ব্রাহ্ম অপেক্ষা কি কপট ব্রাহ্মণ ভাল ?"

দেবেন্দ্রনাথের নিজের বেদীগ্রহণ এবং ব্রাহ্মণেতর লোকদিগকে বেদী দেওয়ার ব্যাপার ব্রাহ্মসমাজে একটা ছোটোখাটো বিপ্লবগোচের ব্যাপার। কারণ, রামমোহন রায়ের সময় হইতে এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছিল যে, ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে শাস্ত্রজ্ঞ কোনো ব্রাহ্মণপণ্ডিত বসিয়া আচার্যের কাজ করিবেন। দেবেন্দ্রনাথ নিজে এ পর্যন্ত বেদীতে বসেন নাই। কারণ তিনি নিজেকে ঠিক সে-শ্রেণীর ব্রাহ্মণপণ্ডিত বলিয়া মনে করিতেন না, সুতরাং বেদীগ্রহণের অধিকারী বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি এ পর্যন্ত বেদীর নীচে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেন—মন্ত্রোচ্চারণ বা উপাসনা করিতেন না। ১১ই শ্রাবণ ১৭৮২ শক (১৮৬০ খৃস্টাব্দে) যেদিন তিনি প্রথম ব্যাখ্যান দেন, সেদিনই তিনি প্রথমে বেদীতে বসেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার সংস্কার যথেষ্ট দৃঢ় ছিল, সংকোচও কম ছিল না। কেশববাবু প্রভৃতির একান্ত অনুরোধে তিনি আচার্য হইতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি যখন নিজে বসিলেন, তখন অন্যান্য 'শ্রদ্ধাবান ব্রাহ্ম' ভিন্ন জাতির লোক হইলেও বেদীগ্রহণ করিতে পারিবেন, তাহার পথ খোলসা হইল।

এই বছরে পুজার সময়ে দেবেন্দ্রনাথ নৌকা করিয়া রাজমহল যাত্রা করেন। সঙ্গে তাঁর চার ছেলে, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, বীরেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন, ছেলেদের গৃহশিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী এবং বন্ধুদের মধ্যে কেশবচন্দ্র ও রাজনারায়ণ ছিলেন। রাজনারায়ণ বসু তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন, "আমাদিগের এই ভ্রমণ সময়ে সর্বদা ধর্মপ্রসঙ্গ হইত ও হারমোনিয়ম বাজাইয়া গান হইত—কি সুখে যে দিন যাইত তাহা বলিতে পারি না।...দেবেন্দ্রবাবু

স্বভাবতঃ অত্যন্ত শিষ্ট। এই সময়ে কেশববাবুকে তিনি সকল অপেক্ষা ভালো-বাসিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু আমি পুরাতন বন্ধু বলিয়া তিনি আপনার নিকট আমাকে শোয়াইতেন, অন্য সকলে নীচে শুইত। তিনি আমাকে বলিতেন, 'দেখ যুবকদিগের সহিত আমার মনের মিল হয় না।' কেশববাবু এক কোণে বসিয়া বাইবেল পড়িতেন, এদিকে দেবেন্দ্রবাবু বসিয়া উপনিষদ্ পড়িতেন।··· কেশববাবুর এই সময়ে ধর্মবিষয়ে নবোৎসাহ, উৎসাহের আর সীমা ছিল না। তিনি ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের নানা উপায় বিষয়ে দেবেন্দ্রবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করিতেন, আমি তাহাতে যোগ দিতাম।"

এই বছরের শেষভাগে উত্তর-পশ্চিম দেশে এক ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। সেই দুর্ভিক্ষের বিবরণে দেখিতে পাই, হাজার হাজার লোক অনাহারে মারা পড়িয়াছিল, যোজন যোজন ভূমি মরুভূমি হইয়া গিয়াছিল। কেশবচন্দ্র এই দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজে এক বিশেষ উপাসনার ব্যবস্থা করিবার জন্য দেবেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন। ডফ্ সাহেব প্রভৃতি খৃস্টান পাদ্রীরা দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকদিগের সাহায্যের জন্য খুবই চেষ্টা করিয়াছিলেন— কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে দেশের দুঃখদারিদ্র্য দূর করিবার উদ্যোগ বোধ হয় এই প্রথম। অর্থাৎ ধর্মকে সমাজমুখীন করিবার উদ্যোগ এই প্রথম।

১২ই চৈত্র সেই বিশেষ উপাসনার সভা হয়। দেবেন্দ্রনাথ যে-কোনো অনুষ্ঠান করিতেন, তাহার রূপটি খাঁটি দেশীয় হওয়া চাই, এতটুকু বৈদেশিক ভেজাল তাহার সঙ্গে মিশিতে পারিত না। ব্যাপারটা দুর্ভিক্ষের জন্য উপাসনা ও উপাসনার পরে দুর্ভিক্ষের জন্য অর্থসংগ্রহ। কিন্তু শুধু এমনটি হইলে এ অনুষ্ঠানের এ দেশীয় বিশেষত্বটুকু ফোটে কোথায়? তাই তিনি স্তূপাকার চাল এবং রাশি রাশি টাকার বোঝা পুজাঘরের নৈবেদ্যের মতো করিয়া উপাসনা ঘরে সাজাইয়াছিলেন। ঈশ্বরের পূজায় এই নৈবেদ্য দিতে হইবে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, "সেই সভায় পিতৃদেব বেদী হইতে যেরূপ মর্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন তাহা আমি কখন ভুলিব না। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া লোকেরা এমনি মুগ্ধ ও উত্তেজিত হইয়াছিল যে, যাহার কাছে যাহা কিছু ছিল, তৎক্ষণাৎ সে দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থে দান করিল। কেহ আঙুল হইতে আংটি খুলিয়া দিল, কেহ ঘড়ি ও ঘড়ির চেন খুলিয়া দিল। আমার স্মরণ হয়, ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার বহুমূল্য উত্তরীয় বস্ত্র (বোধ হয় শাল) তৎক্ষণাৎ খুলিয়া দান করিলেন।" দেবেন্দ্রনাথের সেই বক্তৃতার সারাংশ ১৭৮৩ শকের বৈশাখের তত্ত্ববোধিনীতে বাহির হইয়াছিল। সে এক

আশ্চর্য বক্তৃতা। তাহার সবটা না তুলিয়া কিছু কিছু অংশ এখানে উদ্ধার করিতেছি— "…আজ আমাদের মহৎদিন। ঈশ্বর আমারদিগের নিকট হইতে পুজা চান, প্রীতি চান এবং আমারদের প্রীতির দান চান।…আমরা ঈশ্বরের উপাসনার সময় বলি ; তোমার যে করুণা, তাহার প্রতিক্রিয়া কি করিব?… তাহার প্রতিক্রিয়া কি, শুন। যিনি ক্ষুধা তৃষ্ণা শান্তির নিমিত্তে তোমারদিগকে অজস্ররূপে অন্নপান পরিবেষণ করিতেছেন, তাঁহার অমৃতপুত্রদিগের দুঃখ শান্তির নিমিত্তে তাহার কতক অর্পণ কর।…আমরা এই সমাজে আসিয়া প্রীতির সহিত যে নৈবেদ্য প্রদান করিতেছি, ঈশ্বর তাহা দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিতেছেন। আমরা কোনো মনুষ্যকে দিতেছি না, আমরা তাঁহার ধন তাঁহাকেই প্রত্যর্পণ করিতেছি। তিনি আমারদের প্রীতির ধন আদরপূর্বক গ্রহণ করিতেছেন।…অন্য লোকে লোককেই দান করে, আমরা ঈশ্বরের দক্ষিণ হস্তে এই সকল অর্পণ করিতেছি। যিনি ক্ষুধার জন্য অন্ন দিতেছেন, তৃষ্ণার জন্য পানীয় দিতেছেন ; তাঁহার অন্ন পানীয় তাঁহার অমৃতপুত্র সকলের দুঃখ নিবারণের জন্য আমরা তাঁহারই হস্তে প্রত্যর্পণ করিতেছি। দেখিও, যেন আমারদের সাধ্যের কোন ক্রটি না হয়। এস আমরা মুক্তহস্তে পিতার চরণে সকলি সমর্পণ করি—ভ্রাতৃবর্গের দুঃখ শান্তি করি—প্রীতি ও প্রিয়কার্য একত্রে সংসাধন করি।

"একবার চাহিয়া দেখ, দেখিবে যে চতুর্দিকে দুঃখদাবানল জ্বলিতেছে। তোমার দয়াবৃত্তি কি হৃদয়ে বারম্বার আঘাত করিয়া বলিতেছে না, তোমার সম্মুখে সহস্র সহস্র লোক অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিতেছে, তুমি কি সুখে ভোজন করিতেছ? কত কত লোক স্তব্ধ শূন্য গৃহে মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিয়াছে, আহা একটি লোক নাই যে তাহাদের প্রতি চাহিয়া দেখে, তুমি কি সুখে শয়ন করিতেছ? সাধু দয়াবৃত্তি কি আমারদিগকে বারম্বার এই প্রকার আঘাত করিতেছে না? দেখ, আমারদের দেশের কি প্রকার অবস্থা হইয়াছে। পশ্চিমে যোজন যোজন ভূমি মরুভূমি হইয়া রহিয়াছে, হরিৎবর্ণ আর কোথাও দেখা যায় না।…এই সকল দেখিলে কি আমরা ক্ষণকালের জন্য সুস্থ থাকিতে পারিতাম? আমারদের ভ্রাতৃগণের হৃদয়বিদারণ দুঃখের ক্রন্দন শুনিয়া, তাহারদের রক্তশূন্য অস্থিসার দেহ দেখিয়া, কি আমারদেরও এই দেহ বিকল হইয়া পড়িত না? মাতা ভূমির উপরে মৃতশরীর হইয়া শয়ান রহিয়াছে, আর শিশু সেই মৃতদেহোপরি পড়িয়া রহিয়াছে। ইহা দেখিলে আমারদের হৃদয়ে কি শোণিত থাকিত? না, আমারদের নিশ্বাস আর বহন হইত? জীবন্ত মনুষ্য গলিত মাংস ভোজন করিবার

জন্ত শৃগাল শকুনির সহিত বিবাদ করিতেছে, ইহা দেখিয়া কি হৃদয়ের রক্ত শীতল হইয়া যাইত না?…

"আমরা শ্রদ্ধার সহিত দান করি, তাহাই আমারদের সর্বস্ব। ঈশ্বরের নিমিত্তে প্রীতির সহিত, শ্রদ্ধার সহিত, শ্রেয়স্কামেতে আমরা যাহা কিছু দিই, তাহাই আমাদের যথার্থ দান। ঈশ্বর তাহা আদরের সহিত গ্রহণ করিবেন। যশমান খ্যাতিপ্রতিপত্তির যে দান, তাহা ব্রাহ্মসমাজের দান নহে।…আমারদের দানে যদি এক বেলার জন্য একজনেরো ক্ষুধা শান্তি হয়, তথাপি তাহার ফল অনন্ত ফল। আমারদের সাধু ইচ্ছাই সর্বস্ব।… কৃপণতা ক্ষুদ্রভাব পরিত্যাগ করিয়া উদার ভাব ধারণ কর। ঈশ্বরের সেই উদার মঙ্গল ভাব মনে করিয়া দেখ। দেখ তাঁহার বৃষ্টি আসিয়া কেমন সমুদায় পৃথিবীকে শস্যশালিনী করিতেছে। সেই বৃষ্টি এক বৎসর আসে নাই বলিয়া দেখ কি হইয়াছে। যে দেশে মেঘ এক বৎসর যায় নাই, আমারদের দয়া গিয়া কি তথায় এক বৎসরের কার্য করিতে পারিবে না? আমরা কি বাষ্প হইতেও লঘু, মেঘ হইতেও অপদার্থ?…আমরা সকলে দীন দরিদ্র— ধনীমানী আমারদের মধ্যে অতি অল্প। ঈশ্বর ধন সম্পত্তি দেখেন না; তিনি হৃদয় দেখেন, তিনি সাধু ইচ্ছা দেখেন।…ঈশ্বরের নিকটে ধনীমানী পদশালীর মান নাই। আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত যে যাহা দান করে, তাহাই তিনি গ্রহণ করেন। যে ব্যক্তি অনুরোধে পড়িয়া লক্ষ মুদ্রা দেয়, ঈশ্বর তাহার মনের ক্ষুদ্রভাব দেখেন; যে আপনি দুই দিবস উপবাস করিয়া একজন ক্ষুধার্তকে এক বেলার অন্ন দেয়, তিনি তাহার উদার ভাব দেখেন।"

খৃস্টানধর্ম কি ইহার চেয়ে কোনো নূতন কথা বলে?— ঈশ্বরের পুত্রদের সেবাই যে তাঁহার সেবা, তাহাদের প্রীতি করা যে তাঁহাকেই প্রীতি করা— ইহাই তো সে ধর্মের সার কথা। ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরের পুজা যে শ্রেষ্ঠ পূজা নয়; পরিবারে, সমাজে, দেশে তাঁহার স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠাই যে তাঁর শ্রেষ্ঠ পূজা— এ কথাটাই কি এ কালের ভিতরে সবলে প্রকাশ পাইবার জন্য উপক্রম করিতেছিল না? দেবেন্দ্রনাথের এই উপদেশের মধ্যে সেই কথাই কি বিশেষ করিয়া ফোটে নাই?

এই দুর্ভিক্ষের সাহায্যের জন্য প্রায় তিন হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছিল। অনেক স্ত্রীলোক আপনাদের গায়ের অলংকার দিয়াছিলেন। অনেকে টাকা না দিতে পারিয়া ব্যবহারের জিনিসপত্তর পর্যন্ত দান করিয়াছিলেন।

এই-সকল ব্যাপারে দেখা গেল যে, উপাসনার নির্ঝর-শীতল কুঞ্জটুকুতে শুধু স্তবগুঞ্জরণে আর কুলাইল না। দুঃখমরুপথে ভাবের পসরা বহিয়া দূরদূরান্তরে

ক্ষুধিতদের জন্য অন্ন এবং তৃষিতদের জন্য জল পৌছিয়া দিতে তরুণ যাত্রীদলের মন ব্যাকুল হইল।

সেইজন্য দেখিতে পাই, কেশবচন্দ্র কেবল ব্রহ্মবিদ্যালয়ে সপ্তাহে একবার করিয়া উপদেশ দিয়া ও গোটাকতক চটি বই প্রচার করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার বন্ধু যুবকদিগকে লইয়া একটি ধর্মমণ্ডলী স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিলেন। শিখদের ধর্মপ্রসঙ্গের সভার নাম সঙ্গত সভা। দেবেন্দ্রনাথ এই প্রস্তাবিত নূতন সভার সেই নাম রাখিলেন। প্রথমে তিনটি সঙ্গত সভা প্রতিষ্ঠিত হয়— কলিকাতার তিন ভিন্ন ভিন্ন জায়গায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেশবচন্দ্রের কলুটোলার সভাই জ্বলিয়া রহিল। আরগুলি দুদিনেই নিবিয়া গেল। মানুষকে আকর্ষণ করিবার শক্তি কেশবচন্দ্রের অসাধারণ রকমের ছিল। চুম্বক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে তেমনি তাঁহার কাছাকাছি একবার কেহ আসিলে তাঁহার ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট না হইয়া কাহারো পার পাইবার জো ছিল না। ইংরাজীতে যাহাকে বলে personal magnetism, ব্যক্তিত্বের আকর্ষণী শক্তি, সে জিনিসটা কেশবচন্দ্রের মধ্যে অত্যন্ত বেশি পরিমাণে ছিল। তিনি যেন জননায়ক হইবার স্বাভাবিক অধিকার লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বেলা পাঁচটা হইতে রাত ২।৩টা, কোনো কোনো সময়ে ভোর পর্যন্ত কেশবচন্দ্রের বাড়িতে এই সঙ্গত বসিত। যুবকদের গোলমালে বাড়ির লোকের ঘুমের ব্যাঘাত হইত। এই সভার সূত্রে কেশবের সঙ্গে একদল যুবকের নিবিড় অন্তরঙ্গতা জন্মিল। তাঁহার চরিত্র ও ধর্মজীবনের প্রভাব তাহাদের জীবনের উপর বিশেষভাবে পড়িল। ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশে ও কেশবের ইংরাজী প্রবন্ধ সকলে যাহারা মাতিয়াছিল, তাহারা তাঁহার কাছাকাছি আসিয়া তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগী হইল। সঙ্গত তাহার নাম সার্থক করিল, সমস্ত সভ্যগুলি একেবারে সঙ্গত হইয়া এক হইয়া একটা শক্তি হইয়া উঠিল। ভাবের বাষ্প যখন বয়লারের মধ্যে জমে, তখনি এঞ্জিনকে তাহা নাড়া দেয়। তখন তাহার সঙ্গে যাহারা নিজেদের জোড়ে, তাহারাও চলিতে থাকে। সঙ্গতেও তাহাই হইল। যুবকেরা সমস্ত জীবন, জীবনের সকল কর্মানুষ্ঠান, সংসার, সমাজ, সমস্তকেই ধর্মের সম্পূর্ণ অনুগত করাই যথার্থ ধর্মসাধনা— কেশবচন্দ্রের এই আদর্শকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। ধর্মে মানুষ সর্বমানবের প্রতি ভ্রাতৃভাবের কথা বলিবে অথচ সামাজিক জীবনে সেই ভ্রাতৃভাবের উল্টা কাজ করিবে, ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে অনুষ্ঠানের কোনো সম্বন্ধ থাকিবে না— ইহা তাহাদের পক্ষে দিন দিনই অসহ্য হইয়া উঠিল। সেইজন্য

খৃস্টের উপদেশ ও আদর্শ তাহাদের মনকে যেমন করিয়া ধরিল এমন আর কিছুই নয়। কারণ সে উপদেশ তো কেবলমাত্র পূজার্চনা করিয়া দিনরাত কাটাইবার উপদেশ নয়; সে উপদেশ বলে— মানুষের সেবাই ঈশ্বরের যথার্থ পূজা। এ তো দেখা গিয়াছে যে, সেই মানবসেবার কঠিন ব্রত যাঁহারা জীবনে গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা প্রাণের ভয় দূর করিয়া অসভ্য নরখাদকের মধ্যে কুষ্ঠরোগীর মধ্যে পর্যন্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। সমস্ত মানুষের যোগে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করাই খৃস্টের আদর্শ ছিল বলিয়া তিনি ও তাঁহার শিষ্যেরা পাপীকে, দরিদ্রকে ও অস্পৃশ্যকে পরিত্যাগ না করিয়া তাহাদেরি দরজায় গিয়া দাঁড়াইয়াছেন। দুঃসহ দুঃখ স্বীকারের দ্বারাই ভগবানের প্রেমের মহিমাকে তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন। এ তো নির্জনে ভাবাবেশে চোখের জলে ভাসিয়া ভক্তিরস সম্ভোগের ধর্ম নয়। এ যে স্বেচ্ছায় দুঃখের কাঁটার মুকুট মাথায় পরিয়া 'ক্ষুরধারনিশিত' দুর্গম পথে তিল তিল করিয়া আপনাকে ত্যাগ করিয়া করিয়া অগ্রসর হওয়ার ধর্ম। এই দুর্গম পথে যাত্রার জন্য সেই তরুণ যাত্রীর দল প্রস্তুত হইল। তাহারা জাতিভেদ মানিবে না, জাতিভেদসূচক পৈতা ধারণ করিবে না, স্ত্রীজাতিকে জীবনের উন্নত অধিকার দিবে, এবং কর্তব্য ও নীতির পথে দিন দিন অগ্রসর হইবে— গভীর রাত্রি পর্যন্ত এই-সব পরামর্শ ও সংকল্প তাহাদের মধ্যে চলিতে লাগিল।

সঙ্গত সভার এই সভ্যদের মধ্যে সত্য রক্ষার সংকল্প সম্বন্ধে সতর্কতা এমন মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছিল যে কোনো-একটা কথা নিঃসন্দিগ্ধ রূপে জানা থাকিলেও তাহা বলিবার সময় তাঁহারা 'বোধ হয়' এই কথাটি ব্যবহার করিতেন। গল্প আছে, একজন সভ্য ব্যাঙ্কের হিসাব মিলাইয়া তাঁহার উপরওয়ালার কাছে লইয়া গেলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন— কেমন, হিসাব ঠিক হইয়াছে তো? সভ্যটি উত্তর করিলেন 'বোধ হয় ঠিক হইয়াছে।' উপরওয়ালা কর্মচারী বলিলেন, 'বোধ হয় কি? ঠিক করিয়া বল।' কিন্তু অনেক প্রশ্ন করিয়াও তিনি 'বোধ হয়' 'সম্ভব' ছাড়া আর-কোনো উত্তর পাইলেন না। এই-সব গল্প ইংলণ্ডের সেই ষোড়শ শতাব্দীর পিউরিটানদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বাস্তবিক তাহাদের মতো উগ্র পাপবোধ, কঠোর কর্তব্যপরায়ণতা, সকল রকমের আমোদ প্রমোদ হইতে বিরত থাকিবার ভাব, ও এক রকমের অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য, 'বোধ হয়' 'চেষ্টা করিব' জাতীয় সত্যবাদিতার চূড়ান্ত—এক কথায় নৈতিকতার পরাকাষ্ঠা এই সময়ে এই এক দলের মধ্যে দেখা গিয়াছিল। জন স্টুয়ার্ট মিল পিউরিটানদের ন্যায়পরতার আদর্শকে 'impious' বলিয়াছেন। তার মানে তাহা আপনার সম্বন্ধে এবং অন্যের

সম্বন্ধে এমন একটা নিষ্ঠুরতায় গিয়া পৌঁছায় যাহাতে মনের সমস্ত সুকুমার বৃত্তি একেবারে দলিয়া পিষিয়া যায় এবং সেই শুকনো মনের ভূমিতে ঈশ্বরের বিমল প্রসাদ আর অবতীর্ণ হইতে পারে না। পিউরিটানদের জীবনে চরিত্রের দৃঢ়তা যেমনি আশ্চর্য হোক-না কেন, আসলে সে দৃঢ়তা অন্যের প্রতি একটা ভয়ংকর অসহিষ্ণুতা ও অনুদারতার আকারে প্রকাশ পাইয়াছিল। এই সঙ্গতের সভ্যরা পিউরিটানদের মতো হাসাটাকেও পাপ বলিয়া গণ্য করিতেন। দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্গতের একজন প্রধান সভ্য ছিলেন। এই উৎকট পাপবোধ তাঁহার তরুণ মনকে এমনি আক্রমণ করিয়াছিল যে, শুনিতে পাই তাহার পর হইতেই তাঁহার মধ্যে উন্মাদ হইবার লক্ষণ সকল প্রকাশিত হইল।

আমাদের দেশে এই রকমের একটা নৈতিক কঠোরতা দেখা দিবার কারণ কি তাহা ভাবিতে গেলে এই কথাই আমার মনে হয় যে, পৃথিবীতে যখনই ধর্ম বা সমাজ সংস্কারের একটা প্রয়োজন হইয়াছে, তখন্‌ মানুষের প্রকৃতির আর আর সমস্ত দিক চাপা পড়িয়া ঐ উদ্যত নীতিপরায়ণতার দিকই বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। তখন সৌন্দর্যবোধ অপমানিত— রসচর্চার তখন কোনো অবকাশ নাই। ইউরোপে রেফরমেশনের সময়ে ঠিক এই দশাই হইয়াছিল— ক্যাথলিক ধর্মে যে রসটুকু ছিল তাহা লুথার ক্যাল্‌ভিনের দলের উৎসাহের উত্তাপে একেবারে বাষ্প হইয়া উবিয়া গেল। ধর্মমন্দিরে শিল্পের যে একটুখানি কোণ ছিল, সেখানে সংস্কারের মুষল আসিয়া তাহার বহু যুগের সঞ্চয়গুলিকে চুরমার করিয়া দিল। ধর্ম ও সমাজ সংস্কার একটা যুদ্ধের ব্যাপার কিনা, তখন সমস্ত মানুষটাই একটা উদ্যত মুষলবিশেষ। তাহার সমগ্র প্রকৃতির চেহারা দেখিবার তখন কোনো অবকাশ নাই।

সঙ্গত সভায় যে-সকল বিষয়ের আলোচনা হইত, তাহা কেশবচন্দ্র লিপিবদ্ধ করিয়া 'ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান' নামে এক বই ১৮৬১ সালে প্রকাশ করেন। এই বইয়ের 'অনুষ্ঠান' নামটি সংগত নামই হইয়াছে, কারণ ধর্মের সঙ্গে জীবনকে সকল দিক দিয়া মিলাইতে গেলে আমাদের কর্তব্যগুলি কী কী হয়, এই ছোটো বইটিতে তাহারি তালিকা পাওয়া যায়। উপাসনা, আত্মপরীক্ষা, আমোদ, অর্থব্যয়, অভ্যর্থনা, সময়, সত্যবাক্য, নির্ভর, কর্তৃত্ব, কৌতূহল, পৌত্তলিকতা, সংসার, প্রীতি, মোহ, ভ্রাতৃসৌহার্দ্য, পবিত্রতা— ইত্যাদি বিভাগ করিয়া প্রত্যেক বিভাগের নীচে কতগুলি নীতিসূত্রকে ১, ২, ৩, ৪ সংখ্যায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

দু-একটি সূত্র নীচে উদ্‌ধৃত করিলাম—

"আমোদ (৫) যাহারা আমোদপ্রমোদে অধিক আসক্ত তাহাদের আত্মার হ্লাস।

"সত্যবাক্য (২) কোন গুরুতর বিষয়ে 'এ কর্ম করিব' না বলিয়া 'ইহা করিতে চেষ্টা করিব', 'আমি ঠিক জানি' না বলিয়া 'আমার এ প্রকার বোধ হইতেছে' ইহাই বলা বিধেয়।

"পৌত্তলিকতা (৪)···উপনয়নের সময়ে উপবীত গ্রহণ করিবেক না।"

"কর্তব্যশ্রেণী"।— এই বিভাগে কর্তব্যতালিকার এক প্রকাণ্ড নকশা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঈশ্বরের প্রতি, আপনার প্রতি ও মনুষ্যের প্রতি— এই তিন অংশে সমস্ত কর্তব্যকে ভাগ করা হইয়াছে।

এই 'ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান' কতগুলি শুষ্ক নীতিসূত্রের তালিকার মতো এখন আমাদের মনে হইতে পারে এবং স্থানে স্থানে হাস্যরসিকের মনে হাস্যরসেরও উদ্রেক হইতে পারে। কিন্তু যখন চিন্তা করিয়া দেখি যে, এই সূত্রগুলি এক-একটি জ্বলন্ত তারার মতো সঙ্গতের সেই যুবাদলের অন্তরের আকাশে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তখন এই গ্রন্থের গুরুত্ব সহজে বুঝিতে পারি। 'পৌত্তলিকতা' ভাগে যে সূত্রটি আছে 'উপনয়নের সময়ে উপবীত গ্রহণ করিবেক না' তাহা পড়িয়া দেবেন্দ্রনাথ নিজের পৈতার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'তবে আর ইহা কেন?' এই বলিয়া তিনিও পৈতা ত্যাগ করিলেন।

এই সঙ্গতের যুবকদল ও তাহাদের নেতা কেশবচন্দ্র তখন দেবেন্দ্রনাথের বাড়িতে নিত্য অতিথি। ছেঁড়া ও ময়লা কাপড় পরা আপিসের সামান্য কেরানী যুবকদের ধর্মালোচনা ও আমোদপ্রমোদের স্থান তাঁর বাড়ি। হলে মাদুর পাতা থাকিত, সন্ধ্যার সময়ে যুবকেরা আসিলে তাঁহারা সেইখানে চা-পান করিতেন। কখনো কখনো তাঁহাদিগকে রীতিমত ভোজও দেওয়া হইত। সন্ধ্যার পর নানা কথাবার্তা ও আলোচনা হইতে হইতে কখনো কখনো রাত ২।৩টা বাজিয়া যাইত। সেই সময়কার একজন যুবক লিখিয়াছেন, "অধিক রাত্রি হইলে সভা ভঙ্গ করিবার উদ্দেশে কেহ ঘড়ি দেখিতে গেলে মহর্ষি বলপূর্বক সেই ব্যক্তির হাত হইতে এই বলিয়া ঘড়ি কাড়িয়া লইতেন যে, ঘড়ির সময় কি ঠিক থাকে?···

"ব্রহ্মানুরাগ, যোগ, ঈশ্বর-প্রেম, পরলোক, ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি এই-সমস্ত আলোচনার বিষয় ছিল। মহর্ষি যখন বেরেলি ব্রাহ্মসমাজ পরিদর্শন করিয়া

প্রত্যাগত হন তখন সৎপ্রসঙ্গচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে, যদি পথে পরলোকে যাইতাম তবে কি আমোদই হইত। তখন এই বলিয়া টেলিগ্রাফ করিতাম যে 'কেশব বাবু শীঘ্র শীঘ্র এস, দেখ কেমন আনন্দ করিতে করিতে গৃহে চলিয়া যাইতেছি।'...

"কেশবচন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিলে মহর্ষি আস্তেব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইতেন, কেশবচন্দ্র অন্যান্য লোকের সহিত সম্মুখস্থ চেয়ারে বসিতে চাহিতেন, কিন্তু বৃদ্ধ তাঁহার হস্তধারণ পুর্বক আপন কোচের উপর নিজপার্শ্বে বলপুর্বক এই বলিয়া বসাইতেন যে, 'তোমার এই স্থান।' যখন মাখন মিছরী বা অন্য কোন খাদ্য মহর্ষির জন্য আনীত হইত, তখন তিনি এই বলিয়া এক চামচ ব্রহ্মানন্দের মুখে অপর চামচ নিজমুখে প্রদান করিতেন যে, 'একবার তুমি খাও, একবার আমি খাই।'... মহর্ষির পুত্রগণ কেশবচন্দ্রকে ব্রহ্মানন্দদাদা বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে ভ্রাতৃনির্বিশেষে প্রেম করিতেন এবং সময়ে সময়ে এরূপ কথাও শুনা যাইত যে, মহর্ষির অন্যান্য পুত্রের ন্যায় কেশবচন্দ্রও বিষয়ের এক অংশ পাইবেন।"

কেশবচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধু ও অনুবর্তী দলের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের সম্বন্ধ যে কেমন ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল, তাঁহাদের সকল কাজে সকল আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার যে কি রকম সহানুভূতি ছিল, তাহা এই উদ্‌ধৃত স্মৃতিলিপি হইতে বেশ বোঝা যায়। ১৮৬১ সালে (১৭৮৩ শকে) কেশবচন্দ্র অসুস্থ হইয়া বায়ুপরিবর্তনের জন্য কৃষ্ণনগরে যান। ঠাকুর-পরিবারের কেহ কেহ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের পরেই কৃষ্ণনগরের ব্রাহ্মসমাজ বিখ্যাত ছিল। সেখানে কেশবচন্দ্র কয়েকটি বক্তৃতা করিয়া সেখানকার কালেজের যুবকদিগকে মাতাইয়া তুলিলেন এবং সেখানকার পাদ্রী ডাইসন সাহেবের সঙ্গে ধর্মসম্বন্ধে তুমুল বাদপ্রতিবাদ করিয়া তাঁহাকে একেবারে পরাস্ত করিয়া দিলেন। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা খৃস্টান পাদ্রীর হারে ভারি খুশি! সেই সময়কার তত্ত্ববোধিনীতে এই খবর বাহির হয়—"যেদিন তিনি (কেশবচন্দ্র) ঈশ্বরপ্রণীত শাস্ত্র বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন, সেদিন ডাইসন নামক তথাকার মিশনারি উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাঁহার কোন কথায় সায় দিতে পারিলেন না। সে কথা আর কিছু নহে, তাহা এই—ঈশ্বর প্রতি মনুষ্যের হৃদয়ের স্বাভাবিক সহজ বাক্য সকল প্রেরণ করিতেছেন, তাহাই আমাদের আপ্ত বাক্য, তাহাই আমাদের শাস্ত্র। কোন বিশেষ পুস্তককে আমরা শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করি না।...

"বাইবেল না পড়িলে যে ঈশ্বরকে জানা যায় না এ কথার কোন অর্থই নাই।... ঈশ্বরপ্রেরিত শাস্ত্র পাঠ করিয়া কি জানিতে হইবে যে, ঈশ্বর আছেন?... ডাইসন বলিয়াছিলেন যে খৃস্টধর্মের বিরোধী সকল ধর্ম কালেতে করিয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। অবশেষে খৃস্টধর্মেরই জয় হইবে। আমরাও সমুদায় আত্মার সহিত বলিতেছি— 'সত্যমেব জয়তে নানৃতং।'...ঈশ্বরের পিতৃভাব এবং মনুষ্যের ভ্রাতৃভাব ঈশা যাহা খৃস্টধর্মের সার বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন... তাহা চিরকালই সত্য থাকিবে। এই সকল ভাবই যদি খৃস্টধর্ম হয় তবে সে খৃস্টধর্মের কোনকালেই বিনাশ হইবে না। সে খৃস্টধর্ম সনাতন ব্রাহ্মধর্ম।"

এ কাহার লেখা তাহা জানিবার কোনো উপায় নাই— খুব সম্ভবত এটা দেবেন্দ্রনাথের লেখা হইবে, কারণ কেশবচন্দ্র কৃষ্ণনগরের ধর্মপ্রচারের বিবরণ তাঁহাকেই পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেই চিঠি পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া তাহার উপরে খৃস্টধর্মের সঙ্গে বিরোধ সম্বন্ধে এই মন্তব্য বাহির হইয়াছিল। ব্রাহ্মধর্ম যে অন্য কোনো ধর্মের সার্বভৌমিক সত্যের বিরোধী নয়— এ মত যেমন রামমোহন রায়ের ছিল, তেমনি দেবেন্দ্রনাথেরও ছিল। কিন্তু আমরা পূর্বে ডফ্ সাহেবের সঙ্গে তাঁহার বাদপ্রতিবাদে দেখিয়া আসিয়াছি যে, খৃস্টানধর্মে একজন মানুষকে যে আত্মা ও ঈশ্বরের মাঝখানে আনা হয় এবং তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া ভজনা করা হয়, ইহা তিনি কোনোমতেই সহ্য করিতে পারিতেন না। সেইজন্য তিনি বৈষ্ণব-ধর্ম ও খৃস্টধর্ম এই দুয়েরি প্রতি একান্ত বিমুখ ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁহার মন হইতে এই 'খৃস্টবিভীষিকা' দূর হয় নাই।

এ কথা এখানে এইজন্য বলা দরকার যে, তখন কেশবচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধু-দলের আদর্শ ছিলেন খৃস্ট। বাইবেল হইতে তাঁহারা যে উদ্দীপনা লাভ করিতেন, উপনিষদ্ হইতে নিঃসন্দেহ সেই উদ্দীপনা তাঁহারা পাইতেন না। কিন্তু ভাবিয়া দেখা উচিত যে, ইংরাজী শিক্ষার প্রথমাবস্থায় খৃস্টান মিশনারিদের সঙ্গে যে লড়াইয়ের অত্যন্ত দরকার ছিল, পরবর্তীকালে তাহার তেমন দরকার ছিল না। দেবেন্দ্রনাথের যৌবনকালে ডিরোজিয়োর প্রভাবে সমস্ত শিক্ষিত মন আন্দোলিত। আমাদের ধর্মের মধ্যে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক কোনো উচ্চ সত্য নাই এই বিশ্বাস তখন শিক্ষিত লোকদিগের মনের মধ্যে দৃঢ়মূল হইয়া তাহা-দিগকে দেশদ্রোহী করিয়াছিল। সেই সময়ে খৃস্টান মিশানারিরা তাঁহাদের ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিবার জন্য জোট হইয়া যে প্রবল চেষ্টা শুরু করিয়াছিলেন, তাহাকে ঠেকাইবার মতো কোনো সামর্থ্য আমাদের হাতে ছিল না। সুতরাং

সেই সময়েই "Vaidantic Doctrines Vindicated" হইবার বিশেষ দরকার ছিল। হিন্দুধর্মের সমস্ত শাস্ত্র ও পুজাবিধি যে কুসংস্কার ও দুর্নীতিতে আচ্ছন্ন নয়, এই কথাটি জোর করিয়া দেবেন্দ্রনাথকে বলিতে হইয়াছিল এবং পাদ্রীদের সঙ্গে লড়িতেও হইয়াছিল। তার পর অবশ্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, তত্ত্ববোধিনী সভার দ্বারা দেশের লোকের নিজ অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে ও নিজের ধর্মের সম্বন্ধে সেই সংশয় ও অশ্রদ্ধার ভাব অনেকটা পরিমাণে কাটিয়া গেল। সুতরাং কেশববাবুর সঙ্গে পাদ্রী ডাইসন প্রভৃতির লড়াই ঠিক সে-রকমের লড়াই নয়, দেবেন্দ্রনাথকে যে-রকম লড়াইয়ে কিছুকাল পুর্বে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। সেইজন্যই তাঁহাদের সময়ে তাঁহাদের পক্ষে নির্ভয়ে খৃস্টের বাণীকে ধর্মজীবনের সহায়রূপে গ্রহণ করা সম্ভব হইয়াছিল।

পাদ্রী ডাইসন সাহেব ব্রাহ্মধর্মের বিরুদ্ধে যে-সকল তর্ক তোলেন তাহার মধ্যে একটা তর্ক এই ছিল যে, যাহারা পৌত্তলিক অনুষ্ঠান করে তাহারা কি প্রকৃত ব্রাহ্ম? "Are they true disciples of Brahmoism who receive the Sacraments of idolatry?" এ তর্কের জবাব দেওয়া তখনকার ব্রাহ্মদের পক্ষে শক্ত ছিল, কারণ তখনো ব্রাহ্মরা পৌত্তলিক অনুষ্ঠান ছাড়েন নাই। এ-জন্য রাখালদাস হালদার প্রভৃতি ক্রমাগতই আন্দোলন করিয়াছেন—১৮৫৫ খৃস্টাব্দেও তিনি দেবেন্দ্রনাথকে এক চিঠিতে ইহা লিখিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজ ক্রমশ জাঁকাইয়া উঠিতে খৃস্টান পাদ্রীরা একটু শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা কোমর বাঁধিয়া ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে লাগিলেন বলিয়া এই সময়ে একটা ইংরাজী কাগজের বিশেষ প্রয়োজন দেখা গেল। একমাত্র কাগজ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, তাহাতে ইংরাজী অংশ কতটুকুই বা থাকে! কেশবচন্দ্রের উৎসাহে ও যত্নে এবং দেবেন্দ্রনাথের অর্থসাহায্যে ১৮৬১ খৃস্টাব্দের ১লা আগস্ট 'ইণ্ডিয়ান মিরর' নামে এক ইংরাজী খবরের কাগজ বাহির হইল। মনোমোহন ঘোষ তাহার প্রথম সম্পাদক হইলেন। তখনকার দিনে ধর্মমত লইয়া লড়াইয়ের জন্য দুইখানি কাগজ মাথা তুলিয়া উঠিয়াছিল—একটি ব্রাহ্মসমাজের কাগজ, ইণ্ডিয়ান মিরর, অন্যটি খৃস্টানদের কাগজ, ইণ্ডিয়ান রিফরমার। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে তাহার সম্পাদক ছিলেন। সরস হাস্যরসপূর্ণ ইংরাজী রচনায় তখন তাঁহার জুড়ি পাওয়া এ দেশে ভার ছিল। তিনি ব্রাহ্মধর্মের বিরুদ্ধে যে-সকল আপত্তি তোলেন তাহাতে একটু নূতনত্ব ছিল। আগে ব্রাহ্মরা বেদান্তশাস্ত্রের দোহাই মানিতেন। এখন তাহা ছাড়িয়া দিয়া আত্মপ্রত্যয় ও সহজ জ্ঞানেই

ধর্মের ভিত্তি স্থির করায় লালবিহারী আপত্তি তুলিলেন— অমুক চিন্তা করিয়াছেন এবং অমুক চিন্তা করিয়াছেন, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সেই-সব চিন্তাই যদি ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি হয়, তবে আর তাহাকে ধর্ম বলা যায় কেমন করিয়া? এই ব্যক্তিগত অনুভূতি বা "Subjective Individualism" কখনোই ধর্মমতের ভিত্তি হইতে পারে না বলিয়াই একটা শাস্ত্র চাই। যদিও কেশবচন্দ্র 'Brahmo Samaj Vindicated' এই নামে এক বক্তৃতা দিয়া পাদ্রীদের এই-সব তর্ক খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন তবুও এ তর্কের পুরা মীমাংসা হয় নাই। দেবেন্দ্রনাথের তরফে এ সম্বন্ধে কি বলিবার আছে, তাহা আমরা পরিশিষ্টভাগে আলোচনা করিয়াছি। যাহাই হোক, কেশবচন্দ্রের সেই বক্তৃতার পর ডাক্তার ডফ্ বলিয়াছেন, "The Samaj is a Power and a power of no mean order"— এ সমাজ একটা শক্তি এবং সামান্য শক্তি নয়। এবং ইহার পর হইতে পাদ্রীরা এক রকম নিরস্ত হন। কিন্তু এ-সকল ঘটনা ১৮৬৩ খৃস্টাব্দে ঘটে— যে বছরের কথা আমরা বলিতেছি সে বছরে নয়।

ডাইসনের সঙ্গে এই বাদপ্রতিবাদে আর কোনো ফল না হোক, একটা ফল এই হইল যে, তাঁহার ঐ খোঁচাটুকু যে যাঁহারা পৌত্তলিক অনুষ্ঠান করেন তাঁহারা কি প্রকৃত ব্রাহ্ম?— ব্রাহ্মসমাজের চাকে খুব একটা গুঞ্জনধ্বনি জাগাইয়া দিল। অনেক ব্রাহ্মই ব্রাহ্ম অনুষ্ঠানের জন্য ব্যস্ত হইলেন। কেশবচন্দ্রের সঙ্গতের দলই এ সম্বন্ধে সকলের আগে অগ্রসর হইলেন। সুতরাং এ বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে চিন্তা করিতে হইল। ডাইসনের তর্ক হইতেই যে তাঁহার মনে এ চিন্তার উৎপত্তি, এ কথা মনে করা ভুল। কারণ তাঁহার চিঠিপত্র পড়িয়া দেখিতে পাই যে, ইহার প্রায় আট বছর পূর্বে হইতে, ১৮৫৪ খৃস্টাব্দ হইতে তিনি এ বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন। কিন্তু এখন সময় ঠিক তৈরি হইয়া উঠিয়াছে; সামাজিক অনুষ্ঠানগুলির সংস্কার নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কারণ একদল ব্রাহ্মের মধ্যে ইহার জন্য একটা প্রবল তাগিদ দেখা গেল।

আমরা দেখিয়াছি যে, সামাজিক ব্যাপারে কালের নিয়মে যে নানা পরিবর্তন হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এ কথা দেবেন্দ্রনাথ বেশ বুঝিয়াছিলেন। অন্য কোথাও দেখা দিবার পূর্বে, তাঁহার নিজের বাড়িতেই সেই-সকল পরিবর্তনের নানা লক্ষণ দেখা দিতেছিল। তাঁহার মধ্যম পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা সম্বন্ধে অত্যন্ত উৎসাহী হইয়া উঠিলেন। স্ত্রী-স্বাধীনতা বলিয়া একটা চটি বই সেই অল্প বয়সেই তিনি লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। তখন মেয়েদের বাহিরে কোথাও যাইতে

হইলে ঢাকা দেওয়া পাল্কীকে যাওয়াই রীতি ছিল। মেয়েদের পক্ষে গাড়ি চড়া বিষম লজ্জার কথা ছিল। একখানি পাতলা শাড়িমাত্রই তখন মেয়েদের পরিধেয় ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ বাড়িতে এ সমস্ত রীতিই উল্টাইয়া দিলেন। দেবেন্দ্রনাথের বাড়ির মেয়েরা যখন সেমিজ জামা জুতা মোজা পরিয়া গাড়ি চড়িয়া প্রথম বাড়ির বাহির হইতে লাগিলেন তখন চারি দিক হইতে যে কি রকম ধিক্কারটা উঠিয়াছিল তাহা এখনকার দিনে কল্পনা করা সহজ নয়। দেবেন্দ্রনাথ নিষেধ করিলে তাহা লঙ্ঘন করা একেবারেই অসাধ্য হইত, কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা লিখিয়াছেন, "তিনি ইহাতে কোন বাধা দেন নাই। তিনি যখন দেখিতেন, ছেলেমেয়েরা কোন মন্দের দিকে যাইতেছে না তখন কোন আচারের পরিবর্তন সম্বন্ধে তিনি নিষেধ করিতেন না।"

তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা লিখিয়াছেন যে, দেবেন্দ্রনাথের পিসতুত ভাই চন্দ্রবাবু জোড়াসাঁকোর বাড়ির সামনের বাড়িতে বাস করিতেন। একদিন তিনি দেবেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "দেখ, দেবেন্দ্র, তোমার বাড়ির মেয়েরা বাহিরের খোলা ছাতে বেড়ায়, আমরা দেখিতে পাই; আমাদের লজ্জা করে। তুমি শাসন করিয়া দাও না কেন?" দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন— "কালের পরিবর্তন হইয়াছে। নবাবের আমলে যে নিয়ম খাটিত এখন আর সে নিয়ম খাটিবে না। আমি আর কিসেব বাধা দিব, যাঁহার রাজ্য তিনিই সমস্ত ঠিক করিয়া লইবেন।" ইহার পরে তাঁহার পঞ্চম পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী যখন জোড়াসাঁকোর বাড়ি হইতে ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন তখন পুত্রবধূর এই আচরণকে অন্যায় বা অশোভন বলিয়া সংশোধন করিবার কোনো প্রয়োজনই তিনি অনুভব করেন নাই।

শ্রীযুক্ত হরদেব চাটুয্যে এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। অনেক সময় দেখা যায় যে, এক-একজন মানুষের দৃষ্টান্ত, এমন-কি, কাহারো একটা মুখের উৎসাহবাক্য মনের সংশয় বা দ্বিধার কুয়াশাকে এক মুহূর্তে দূর করিয়া দিতে পারে এবং কর্তব্যের পথকে চোখের সামনে পরিষ্কার করিয়া ধরিতে পারে। দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতি অত্যন্ত রক্ষণশীল ছিল, অথচ তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে উন্নতির আকাঙ্ক্ষাও অত্যন্ত প্রবল ছিল সে কথা বলিয়াছি। সেইজন্য কোনো কর্তব্য স্থির করিতে তাঁহার সময় লাগিত। তাঁহাকে বিস্তর অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিতে হইত। পা বাড়াইবার আগে তিনি সামনে সমস্ত পথটা একেবারে পরিষ্কার রকম দেখিতে না পাইলে পা বাড়াইতেন না। কিন্তু পথ যেটি পরিষ্কার দেখিতে পাইতেন, সেখানে এমনি সোজা চলিতেন যে,

তখন কোনো বিপদ বা বাধা সামনে আসিলে তাঁহাকে কিছুমাত্র টলাইতে পারিত না। আমরা দেখিয়াছি যে, পিতৃশ্রাদ্ধের সময় একদিকে আত্মীয়বর্গের দাবী, অন্য দিকে নিজের ধর্মবিশ্বাস— এ দুয়ের একটাকে যখন বিসর্জন দিতেই হইবে, তখন মনের সেই অশান্তির অবস্থায়, লালা হাজারীলালের একটিমাত্র ভরসার কথা তাঁহার অশান্তি ও দ্বিধাকে এক মুহূর্তে দূর করিয়া দিল। বস্তুত এই রকম দ্বিধার সময় তাঁহার জীবনে তাঁহার বন্ধুদের প্রয়োজন তিনি সব চেয়ে বেশি অনুভব করিতেন। বড়ো একটা কোনো সংস্কার করিতে গিয়া যখন তাঁহাকে বিস্তর ভাবিতে হইতেছে ও মনের দ্বিধা ঘোচে নাই, তখন তাঁহার বন্ধুরা তাঁহার প্রকৃতির 'উন্নতিশীল' বা 'রক্ষণশীল' যে-কোনো দিকে ঝোঁক দিলে, সেই দিকটাই অনায়াসে অন্যটার চেয়ে প্রবলতর হইয়া উঠিতে পারিত। এই পরিচ্ছেদের আরম্ভেই যেমন দেখা গেল যে, তিনি যখন জাতিভেদ ভাঙিবার প্রস্তাব করিলেন, তখন রাজনারায়ণ বসু রক্ষণশীলতার দিক হইতে জাতিভেদ ভাঙা উচিত নয় ইহা দেখাইয়া দেওয়ামাত্র তিনি তাঁহার কথাটাকেই যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছিলেন। তাই সে কথাটা তখনকার মতো চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। আবার কেশববাবুদের সংসর্গে যখন কথাটা মাথা জাগাইয়া উঠিল, তখন তাহা আবার তাঁহার মনকে দোলা দিতে লাগিল। তিনি নিজে পৈতা ত্যাগ করিলেন। কিন্তু শুধু পৈতা ছাড়িলে তো হইবে না, বিবাহ প্রভৃতি সমস্ত সামাজিক অনুষ্ঠানকে ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ অনুসারে সংস্কৃত ও বিশুদ্ধ করিতে হইবে। সুতরাং সেই বিষয়ে তখন তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তাঁহার এই সময়ের বন্ধু হরদেব চাটুয্যে এক আশ্চর্য মানুষ ছিলেন। একবার দামোদর নদীতে বন্যা হয় এবং মেদিনীপুর অঞ্চলের কোনো কোনো জায়গা বন্যায় ডুবিয়া যাওয়ায় প্রজাদের অত্যন্ত দুর্দশা হয়। তখন সেই প্রজাদের খাজনা হইতে মুক্তি দিবার প্রার্থনা জানাইবার জন্য তিনি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন। সেই তাঁহার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ। তার পর ত্রিবেণীতে ভয়ানক মড়ক হয়— সেই মড়কে চাটুয্যে মহাশয় দিনের পর দিন রোগীর শুশ্রূষায় ব্যাপৃত ছিলেন। শুধু যে মানবপ্রেম ও মানবসেবার ভাবই তাঁহার মধ্যে প্রবল ছিল তাহা নয়— ব্রহ্মজ্ঞানেরও উন্মেষ তাঁহার মধ্যে দেখা দিয়াছিল। সেই একটি বড়ো উৎস হইতে তাঁহার মানবপ্রেম ও মানবসেবা উৎসারিত হইত। অথচ খৃস্টানধর্মের কোনো প্রভাব তাঁহার উপরে ছিল না। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে হৃদয়ের সম্বন্ধ হওয়া অবধি, তিনি তাঁহার বাড়িতে আসিয়া আহারাদি করিতেন এবং

আপনার গ্রামে গিয়া সকলের সামনে ইহা স্পষ্টই স্বীকার করিতে তাঁহার মনে কোনো কুণ্ঠা উপস্থিত হইত না। তাঁহার গ্রামের লোকেরা যখন এজন্য নানারকমে তাঁহার উপর উৎপীড়ন করিতে শুরু করিল, তখন তিনি তাঁহার ভায়ের হাতে সম্পত্তি দিয়া অন্য গ্রামে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই তেজস্বী ব্রাহ্মণ-সন্তানকে সমাজের কোনো বাধাই তাঁহার সংকল্প হইতে টলাইতে পারিত না।

বেথুন সাহেব বালিকা বিদ্যালয় খুলিলে, একদিন সেখানে গিয়া সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলেন। তিনি ইংরাজী জানিতেন না, কোনো মতে সাহেবকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি তাঁহার দুই মেয়েকে তাঁহার ইস্কুলে ভর্তি করিতে ইচ্ছা করেন। এই কারণে, গ্রামের লোকেরা যখন রাগিয়া তাঁহার সঙ্গে আহারাদি বন্ধ করিবার ভয় দেখাইল, তিনি বলিলেন, 'তোমরা না খেলেও আমার খাবার লোক যথেষ্ট আছে।' এই কথা বলিয়া তিনি মিছরি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া পিঁপড়েদের খাওয়াইতে লাগিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মমতে যখন কন্যার বিবাহ দিয়া প্রথম অনুষ্ঠান করিলেন, তখন তাঁহার সমস্ত আত্মীয়স্বজন তাঁহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। ইহার পর তাঁহার তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথের বিবাহের জন্য কন্যা আর কোথাও পাওয়া যায় না। চাটুয্যে মহাশয় এ কথা শুনিয়া তাঁহাকে আসিয়া বলিলেন, "আমার কন্যাকে আপনার পুত্রের সঙ্গে যদি বিবাহ দেন, তবে আমি কৃতার্থ হইব।" দেবেন্দ্রনাথ জানিতেন যে এজন্য তাঁহার বন্ধুর উপর সমাজের কি রকম নিগ্রহটা হইবে। তিনি তাঁহাকে এমন কাজ করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের জেদ অটল। কোনো দিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। পুলিসের সাহায্যে হেমেন্দ্র-নাথের সঙ্গে তাঁহার কন্যার বিবাহ দিয়া তবে তিনি ক্ষান্ত হইলেন।

এমন লোকের সঙ্গে যে দেবেন্দ্রনাথের এই সময়ে বন্ধুত্ব জমিবে, তাহাতে আশ্চর্য কিছুই নাই। এমনিতর একটি তেজস্বী অথচ ঈশ্বরনিষ্ঠ চরিত্রের জ্যোতির্ময় স্পর্শে দেবেন্দ্রনাথের ভিতরকার সমস্ত দ্বিধার মেঘ একেবারে কাটিয়া গিয়া নূতন আশার নীলাকাশ তাঁহার মনের দিকে দিকে প্রসারিত হইল। ১৮৬৬ খৃস্টাব্দে হরদেব চাটুয্যে পরলোকগমন করেন। সেই রাত্রেই তাঁহার ছেলেরা আসিয়া দেবেন্দ্রনাথকে খবর দিলেন। চাটুয্যে মহাশয় মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্রদিগকে বলিয়াছিলেন, "তিনি এসে যাহা বলিবেন, তাহাই করিয়ো।" দেবেন্দ্রনাথ ভোর বেলা ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন এবং পরলোকগত বন্ধুর মুখে তাঁহার চরিত্রের তেজস্বী পুণ্যজ্যোতি মৃত্যুর দ্বারা কিছুমাত্র বিকৃত

হয় নাই দেখিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মৃতদেহকে শুভ্র বস্ত্র পরানো ও মাল্যচন্দনে সাজানো হইলে, দেবেন্দ্রনাথ নিজের হাতে তাহার উপরে ফুল ছড়াইলেন। এবং তার পরে মৃতদেহের শিয়রে দাঁড়াইয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে একটি প্রার্থনা ও বক্তৃতা করিলেন। সেই বক্তৃতায় প্রথম জানা গেল যে, তাঁহার সঙ্গে এই মহাত্মার কতটা অন্তরের যোগ হইয়াছিল এবং ইঁহারও জীবনের ইতিহাস কেমন আশ্চর্য ইতিহাস ছিল।

একদিকে সমস্ত কালের প্রচণ্ড প্রভাব, অন্য দিকে ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্র প্রভৃতি নব্যদলের মধ্যে ধর্মের সঙ্গে সমাজের বিচ্ছেদ দূর করিবার জন্য একান্ত উৎসাহ ও আশা এবং হরদেব চাটুয্যের ন্যায় বন্ধুর ধর্মের জন্য লোকভয়কে একেবারে তুচ্ছ করিবার অসাধারণ দৃষ্টান্ত—এই-সমস্ত কারণ জড়ো হইয়া দেবেন্দ্রনাথকে সমাজ-সংস্কারের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত করিল। তাঁহার জীবনের গোড়ার দিকে যেমন বেদের অভ্রান্ততাকে দূর করিয়া ধর্মের যথার্থ প্রতিষ্ঠাভূমি স্থির করিতে তাঁহার প্রায় আট-দশ বছর সময় লাগিয়াছিল, জীবনের এই পর্বেও সমাজ সংস্কার করিবার জন্য অগ্রসর হইতে তাঁহার তেমনি বিলম্ব ঘটিল। কিন্তু একবার যখন তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া পা বাড়ান, তখন তাঁহাকে কিছুতেই পিছু হটাইতে পারে না—ইহা আমরা তাঁহার জীবনে বরাবর দেখিয়া আসিতেছি এবং এবারেও দেখিতে পাইব।

কেশবচন্দ্রের কৃষ্ণনগর হইতে ফিরিবার দুই মাস পরেই ১৮৬১ খৃস্টাব্দে (১৭৮৩ শক) শ্রাবণ মাসে দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কন্যা সুকুমারীর ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে বিবাহ হইল। ব্রাহ্মধর্মমতে বিবাহের অনুষ্ঠান সেই প্রথম। রাখালদাস হালদার তখন ইংলণ্ডে ছিলেন, সেখানে চার্লস্ ডিকেনস্-সম্পাদিত *All the year round* কাগজে 'A Brahmo Marriage' বলিয়া তিনি এই বিবাহের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করেন। এই বিবাহে হিন্দুরীতি সমস্তই প্রায় রক্ষা করা হইয়াছিল—কেবল পৌত্তলিক অনুষ্ঠানগুলি বাদ গিয়াছিল। বিবাহসভায় দান-সজ্জাদি সাজানো ছিল। স্বস্তি বাচন করিয়া অর্ঘ্য, অঙ্গুরীয়, মধুপর্ক ও বস্ত্রাদি দ্বারা কন্যাকর্তা দেবেন্দ্রনাথ বরের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। স্ত্রী-আচার প্রভৃতি বাদ দেওয়া হয় নাই। নূতন অনুষ্ঠানের মধ্যে, কেবল ব্রহ্মোপাসনা ও উপদেশ। ব্রহ্মোপাসনার পর সম্প্রদান হিন্দুরীতি অনুসারেই সম্পন্ন হয়। শুভদৃষ্টি, গ্রন্থিবন্ধন প্রভৃতি হিন্দু বিবাহের সুন্দর অনুষ্ঠানগুলিও কিছুই বাদ পড়ে নাই।

সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিকে বিশুদ্ধ করিবার জন্য দেবেন্দ্রনাথকে অল্প পরিশ্রম

করিতে হয় নাই। যেমন ব্রহ্মোপাসনার পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গ সাধনের জন্য তাঁহাকে অনেক দিন ধরিয়া চিন্তা করিতে হইয়াছিল, তেমনি সামাজিক অনুষ্ঠানপদ্ধতি তৈরি করিতেও তাঁহাকে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের মন্ত্রগুলি ও প্রচলিত রীতিগুলি বিশেষভাবে আলোচনা করিতে হইয়াছিল। বিবাহ, উদীচ্যকর্ম, অন্ত্যেষ্টি, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সংস্কারকর্মে তিনি প্রচলিত রীতিকে যতটা পরিমাণে রাখা যায় তাহা রাখিয়াছেন। এ যে শুধু হিন্দুসমাজের সঙ্গে আপস করিয়া থাকার জন্য, যাহাতে হিন্দুসমাজ এ-সকল অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে রুখিয়া না দাঁড়ায় সেজন্য— তাহা একেবারেই নয়। হিন্দুসমাজের নিত্যকালের ব্যবস্থাবিধির প্রতি তাঁহার একটি মমতা ছিল বলিয়াই তিনি কোনো প্রথার সংশোধনের সময় প্রচলিত ও প্রাচীনের দিকে শ্রদ্ধার সহিত তাকাইতেন। তিনি জানিতেন যে, সেই মমত্বটুকুর কতখানি দরকার। সমাজের পরিবর্তন নির্মম আঘাতের দ্বারা ঘটানো যায় না, সেখানে মমত্ব ও ধৈর্যের দরকার আছে। কারণ সমাজের অগ্রসর হইতে বিলম্ব ঘটে— মানুষ যে-পরিমাণে অগ্রসর হয়, সমাজ সেই পরিমাণে অগ্রসর হইতেই পারে না। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের এইজন্য বিরোধ বাধে এবং ব্যক্তিকে সমাজের নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়। তখন সমাজকে একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া তাহার বহির্ভুক্ত বলিয়া নিজেকে মনে করিতে আরাম বোধ হইতে পারে, কিন্তু সেই উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ব্যক্তিত্বের সত্য বিকাশ নয়। কারণ নিজের পরিবেশের মধ্যে নিজের সাধনা প্রবর্তিত করিতে পারিলেই ব্যক্তিত্বের সাধনা চরিতার্থ হইতে পারে। পরিবেশকে ছাড়িয়া গেলে সে সাধনা প্রাণ পায় না।

তবু যে-ধর্মের ভিত্তি কোনো শাস্ত্রের উপর নয়, সে ধর্ম হইতে কোনো অনুষ্ঠানপদ্ধতি যে তৈরি হইতে পারে ও কাজে পরিণত হইতে পারে, ইহা যে-কোনো সভ্যদেশে আজও মনে করা শক্ত। খৃস্ট ও বাইবেল ছাড়িয়া কোনো অনুষ্ঠান ইউরোপে হইতে পারে, এমন কথা ইউরোপের মতো সভ্য মহাদেশেও কেহ ভাবিতে পারে কি না সন্দেহ। কোরান সরিফ ছাড়িয়া মুসলমান অনুষ্ঠান হইতেই পারে না। সেইজন্য 'পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্তে' রক্ষণশীল দেবেন্দ্রনাথ জোরের সহিত, বিদ্রোহের সহিত লিখিতেছেন, "যে ধর্ম সহজজ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয়ের উপর নির্ভর করে, সে ধর্ম হইতে যে অনুষ্ঠানপদ্ধতি নিবদ্ধ হওয়া ও কার্যেতে তাহা পরিণত হওয়া, ইহা পৃথিবীর কোন পুরাবৃত্তে নাই। ভারতবর্ষেই কেবল এই নূতন সৃষ্টি। ভারতবর্ষ ব্যতীত এমন দৃষ্টান্ত আর পৃথিবীতে নাই।"

যে দেবেন্দ্রনাথের চিরজীবনের কথা ছিল এই যে, "হিন্দুদিগের হইতে বিচ্ছিন্ন না হইয়াই তাহাদের মধ্যেই থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে হইবে— হিন্দুধর্মকেই উন্নত করিয়া ব্রাহ্মধর্মে পরিণত করিতে হইবে" তিনিই ধর্ম ও সামাজিক অনুষ্ঠানের চিরকালের ভিত্তিকে ভাঙিয়া দিয়া একেবারে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার নূতন ভিত্তির উপরে তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এক দিকে প্রাচীনের বিরুদ্ধে এতদূর পর্যন্ত বিদ্রোহ, অন্য দিকে প্রাচীনের প্রতি এতদূর পর্যন্তই মমতা। এমন আশ্চর্য বিরুদ্ধ ভাবের সমাবেশ অল্প লোকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। বার বার এই কথাই আশ্চর্য বলিয়া মনে হয় যে, প্রাচীন প্রথার রক্ষণ ও তাহার সংস্কার এ দুইই দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রে কেমন দৃঢ় ছিল। দেশের সামাজিক প্রথা বা অনুষ্ঠানের মধ্যে যেখানে যেটুকু সৌন্দর্য আছে তাহাকে সযত্নে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। স্ত্রী-আচার প্রভৃতি বিবাহের নির্দোষ ও অপৌত্তলিক অনুষ্ঠানগুলি এইজন্য তিনি বাদ দেন নাই। তাঁহার 'ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান পদ্ধতি' বইখানি তাঁহার কন্যার এই বিবাহের পর হইতেই ক্রমে ক্রমে তৈরি হইয়া উঠিতে লাগিল। সেই অনুষ্ঠান পদ্ধতি পড়িলে তাঁহার রক্ষণশীল প্রকৃতির মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যায় এবং সর্বান্তঃকরণে তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারা যায় না। সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিতে আমাদের দেশের প্রতিভার একটি বিশেষ পরিচয় আছে। বস্তুত এগুলি শিল্পরচনারই মতো— মনের মঙ্গলভাবকে বাহিরে সৌন্দর্যের বিচিত্র কলা-কাণ্ডের আয়োজনের দ্বারা প্রকাশ করিবার চেষ্টা। যাহাদের মনের মধ্যে মঙ্গলের সেই সুন্দর রূপটি নাই, তাহারাই অনুষ্ঠানকে ছাঁটিয়া কাটিয়া হতশ্রী করিবার চেষ্টা করে। নব্য ব্রাহ্মদের মধ্যে এই শিল্পরসবোধ জিনিসটার অভাব ছিল। উপাসনার সময়ে বিশুদ্ধভাবে মন্ত্রোচ্চারণ, তাল-মান-লয়যোগে সংগীত, উপাসনা-ঘরের বাহ্য সৌষ্ঠবের সৌন্দর্য— এ-সকল যে দরকার এদিকে তাঁহাদের খেয়াল ছিল না। অনুষ্ঠানের বেলাতেও তাঁহারা কলাকাণ্ড যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত করিয়া কতক বিলিতি কতক দিশি আচারের মিশল করিয়া কোনো গতিকে কাজ উদ্ধার হইলেই হয়, মনে করিতেন। ব্রাহ্মকে চিনিতে গেলেই আলুথালু কেশ, একরাশ দাড়ি, ছেঁড়া ময়লা কাপড়, এই-সকল বাহিরের লক্ষণ ছিল। জামাইষষ্ঠী ভাই-ফোঁটা প্রভৃতি নির্দোষ অনুষ্ঠান অনেক ব্রাহ্ম পরিবার হইতে তুলিয়া দিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ এ-সকল অনুষ্ঠান তাঁহার বাড়ি হইতে কখনো নির্বাসন দেন নাই। এক সময়ে ইহা লইয়াও আপত্তি উঠিয়াছিল, কিন্তু তিনি সে-সকল আপত্তি

শোনেন নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা লিখিয়াছেন যে, তিনি যখন তাঁহার পিতাকে খবর দিতেন আজ ভাইফোঁটা, তিনি শুনিয়া হাসিতেন, বলিতেন "তুমি ফোঁটা দিয়াছ—আমরা যমরাজের দুয়ারে কাঁটা দিতে যাই না, যিনি যমরাজের রাজা তাঁহার কাছে ভাইয়ের মঙ্গল কামনা করি।"

যাহাই হৌক, তাঁহার কন্যা সুকুমারীর বিবাহ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হওয়ায় তাঁহাকে বিষম সামাজিক নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল। একে একে তাঁহার সমস্ত আত্মীয়স্বজন তাঁহাকে ছাড়িয়া গেল। তিনি একেবারে একলা পড়িলেন। রাজনারায়ণবাবুকে তিনি লিখিতেছেন—"পবিত্র ব্রাহ্মধর্মের ব্যবস্থানুসারে আমার কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, তিনি আমার আশার অতীত ফল প্রদান করিয়াছেন। আমি যে জীবন্ত থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম ব্যবস্থার অনুযায়ী অনুষ্ঠান দেখিলাম ইহাতেই আমার জীবন সার্থক বোধ হইতেছে।...আমার নিজ পরিবারে আর পৌত্তলিকতার গন্ধও রহিল না। ইহাতে আমার আর আর জ্ঞাতি কুটুম্ব সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। গণেন্দ্র পর্যন্ত সেই বিবাহের দিনে উপস্থিত ছিলেন না। কত লোক কত কথাই বলিতেছে। .. ২৫এ ভাদ্র ১৭৮৩ শক।"

শিলাইদহ হইতে তাহার পরের চিঠিতে লিখিতেছেন—"যাঁহারা ব্রাহ্মধর্মব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের ব্রত কি কঠিন ব্রত।...যদি তুমি ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও, যদি দ্রঢ়িষ্ঠ হইয়া তোমার ব্রত পালন কর, তবে তোমার মাতা ক্ষিপ্তা হইবেন, তোমার ভ্রাতারা তোমাকে পরিত্যাগ করিবেন, তোমার স্ত্রী তোমার বর্তমানে সহায়হীনা হইবেন। কিন্তু তোমার হৃদয়ের ব্রহ্মাগ্নি যখন আমি মনে করি, তখন বুঝিয়া উঠিতে পারি না যে, তুমি কেমন করিয়া সম্প্রদানশালাতে সর্বস্রষ্টা পরব্রহ্মের স্থানে ক্ষুদ্র অযোগ্য সৃষ্টবস্তু আনিয়া পবিত্র হৃদয়ে প্রাণপ্রতিমা স্বর্ণলতার শুভ বিবাহ সম্পন্ন করিবে। ইহা আমার অত্যন্ত শোচনার বিষয় হইয়াছে।...তুমি আমার অকৃত্রিম বন্ধু. তোমাকে আমার মনের কথা সকল খুলিয়া লিখিলাম। এই গুরুতর বিষয়ে যাহা আমার বক্তব্য তাহা আমি লিখিলাম। এই সকলই তুমি জানিতেছ, আমার বলা বাহুল্য। তথাপি যাহাতে তোমার ব্রত রক্ষা হয়, তাহাতে আমার যত্ন করিতে হয় বলিয়া এত লিখিলাম। আমাকে কঠোর অভিবাদী মনে করিবে না। কঠোর সংসারের প্রতিকূলে দ্রঢ়িষ্ঠতাকে অবলম্বন করিতে হয়। সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের সাক্ষাতে কন্যা সম্প্রদান করিলে সে বিবাহ সিদ্ধ হইবে না, আর কীটাবাস শিলাকে পূজা করিয়া বিবাহ

দিলে তাহা সিদ্ধ হইবে, ইহা হইতে বিপরীত কথা আর কি হইতে পারে? ব্রাহ্ম-ধর্মের বিবাহ-ব্যবস্থা প্রচলিত জন্য রাজনিয়মের সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইবে, তাহার সন্দেহ নাই ; কিন্তু যদি সে প্রার্থনা সিদ্ধ না হয়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি?”

সুকুমারীর বিবাহের পর হইতেই ব্রাহ্মসমাজে অপৌত্তলিক অনুষ্ঠান সকলের আরম্ভ হইল। এখনকার হিন্দুসমাজের চক্ষে এ বিবাহ একেবারেই অসিদ্ধ। কারণ শালগ্রামশিলা বা অগ্নি এই দুটির একটি পৌত্তলিক চিহ্ন না থাকিলে কোনো হিন্দুবিবাহই সিদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের উপরের চিঠি হইতে বেশ দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি এই বিবাহ আইনের চক্ষে বৈধ কি অবৈধ, সেজন্য লেশমাত্রও চিন্তিত হন নাই। এমন-কি, তিনি লিখিতেছেন, রাজনিয়মের সাহায্য প্রার্থনা যদি সিদ্ধ না হয়, তাহাতেই বা কি? তিনি জানিতেন যে, এখন হিন্দুসমাজ এ বিবাহসংস্কারকে অবৈধ বলিতে পারে, কিন্তু চিরকালই হিন্দুসমাজ যে এ অবস্থায় ঠেকিয়া থাকিবে তাহা নয়। ভবিষ্যৎ হিন্দুসমাজ এই বিবাহসংস্কারকেই গ্রহণ করিবে। সেই অনাগত হিন্দুদের চক্ষে এ বিবাহ বৈধ। হিন্দুসমাজের প্রাণের উপর তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল বলিয়াই এত বড়ো একটা দুঃসাহসিক কাজে তিনি অনায়াসে প্রবৃত্ত হইতে পারিয়াছিলেন। সংস্কারকমাত্রেই এই অনাগতের দিকে তাকায়, নইলে তাহাদিগের আর ভরসা কোথায়? ইউরোপে বিজ্ঞানের উন্মেষের সময়ে পোপেরা স্বাধীনচিন্তাশীল যত লোককে অবিশ্বাসী বলিয়া পুড়াইয়া মারিয়াছে, তাহারা কোন্ ভরসায় আগুনের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল? তাহারা জানিত, অনাগত কাল তাহাদিগকে স্বীকার করিবে, তাহারা ভবিষ্যতের মধ্যে চিরজীবী হইয়া বাঁচিয়া রহিল। শুধু এখন যাহারা আপনাদিগকে হিন্দু বলিতেছে তাহারাই হিন্দু, আর অনাগত কালে যে অসংখ্য লোকেরা এ দেশে জন্মিবে তাহারা হিন্দু হইবে না— এ তো আর হইতে পারে না। সেই অনাগত অসংখ্য হিন্দুরাই রামমোহনের বাণীকে গ্রহণ করিবে এই ভরসায় রামমোহন আপনাকে হিন্দু বলিয়াছেন, রাজা রাধাকান্ত দেবের হিন্দুসভার লোকদের ভরসায় নয়। সেই অনাগত হিন্দুরাই দেবেন্দ্রনাথের অপৌত্তলিক অনুষ্ঠানকে স্বীকার করিবে এই ভরসায় দেবেন্দ্রনাথ নিজেকে হিন্দু বলিয়াছেন, যে-সকল লোক তাঁহাকে নিগ্রহ করিয়াছিলেন তাহাদের ভরসায় নয়। কারণ হিন্দুসমাজের নিগ্রহটা অত্যন্ত স্পষ্ট ব্যাপার, কিছুমাত্র কাল্পনিক নয়। সেই বর্তমানটাই তুচ্ছ, আর ভবিষ্যৎটাই সব? অথচ মহাপুরুষমাত্রেরই কাছে তো তাই!

কেবল এই অপৌত্তলিক বিবাহের অনুষ্ঠান করিবার উদ্যোগেই যে তিনি লাগিলেন তাহা নয়। সঙ্কর বিবাহের প্রবর্তনের জন্যও তিনি চিন্তা করিতেছিলেন। ৭ই আষাঢ় ১৭৮৩ শকে (১৮৬১ খৃস্টাব্দ) তিনি রাজনারায়ণবাবুকে এক চিঠিতে লেখেন, "রাজনিয়ম দ্বারা যাহাতে সঙ্কর বর্ণে বিবাহ সিদ্ধ হইতে পারে এমত চেষ্টা করা এই ক্ষণে বিহিত বোধ হইতেছে।" বোধ হয় তাঁহার আশঙ্কা ছিল যে, এ ক্ষেত্রে রাজবিধির সাহায্য না পাইলে খুব একটা গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। ইহার পরের বছর ১৮৬২ সালে রাজনারায়ণবাবু তাঁহার কন্যার বিবাহে ব্রাহ্মধর্মকে অতিক্রম করিবেন না এই খবর পাইয়া তিনি পুনরায় তাঁহাকে লিখিতেছেন—"যে ব্রাহ্ম আপনার তাবৎ সাংসারিক শুভকার্যে অনন্তস্বরূপ ঈশ্বরের নিকট প্রণত হয় এবং কোন প্রকারেই তাঁহার পরিবর্তে কোন সৃষ্ট বস্তুর পূজা না করে, সেই ব্রাহ্মধর্মকে রক্ষা করে। শর্মন, বসু, মিত্র প্রভৃতি যে সকল কুলের পদবী ক্রমাগত আবহমান চলিয়া আসিতেছে তাহা পরিবর্তন করা কিছু ব্রাহ্মধর্মের অভিসন্ধি নহে।…আবহমান প্রচলিত পদবী থাকিতে পারে কিন্তু ব্রাহ্মদিগের মধ্যে তাই বলিয়া জাতিভেদ থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে জাতিভেদ নাই, ব্রাহ্মণ-শূদ্রের মধ্যে পরস্পর আদানপ্রদান হইতে পারে। তাই বলিয়া সমান জাতির মধ্যে আদানপ্রদান হইলে যে, ব্রাহ্মবিবাহ হইল না ইহা স্বীকার করা যায় না। তোমার যদি অভিপ্রায় থাকে যে, ভিন্ন জাতিতে তোমার কন্যাকে বিবাহ দিবে, তবে এ প্রস্তাবে সকল ব্রাহ্মণ আহ্লাদিত হইবেন এবং এমত পাত্রও আছে যে, সে কন্যাকে গ্রহণ করিতে পারে।

"আমরা পূর্বপুরুষের নির্দোষ প্রথা যাহা কিছু গ্রহণ করি, তাহা কিছু লোকের ভয়ে করি না, কিন্তু সেই প্রথা ভাল বলিয়াই গ্রহণ করি। পূর্বপুরুষদিগের সকল প্রথাই পরিত্যাগ করিতে হইবে, ইহাতে যেমন আমরা সম্মত নহি, সেইরূপ পূর্বপুরুষদিগের সকল প্রথা গ্রহণ করিতেই হইবেক, ইহাতে আমরা সম্মত নহি। পূর্বপুরুষ হইতে আবহমান প্রচলিত যদি নির্দোষ প্রথা পাই, তবে আহ্লাদ পূর্বক তাহা গ্রহণ করিব। প্রচলিত প্রথাকেই পৌত্তলিকতা বলা যুক্তিযুক্ত হয় না। পিতার মৃত্যু হইলে এক প্রকার শোকচিহ্ন অবশ্যই ধারণ করিতে হইবে। প্রচলিত রীত্যনুসারে পিতার মৃত্যু হইলে পাদুকাদি পরিত্যাগ করিয়া শোকচিহ্ন ধারণ করিলে যে, সে ব্রাহ্মধর্মের বিরুদ্ধ কার্য হয়, ইহা তো আমার বোধ হয় না।"

১৭৮৩ শক (১৮৬২ খৃস্টাব্দ) মাঘোৎসবের সময় কেশবচন্দ্র নিজের স্ত্রীকে তাঁহার শ্বশুরালয় হইতে দেবেন্দ্রনাথের বাড়িতে লইয়া আসেন। তখন হইতেই কেশবচন্দ্রের মনে এক 'ধর্মপরিবার' গড়িবার কল্পনা জাগিতেছিল। বহু পরে "ভারতাশ্রম" প্রতিষ্ঠার সময়ে তাঁহার এই কল্পনা সার্থক হয়। তিনি স্ত্রীকে লইয়া দেবেন্দ্রনাথের অন্তঃপুরে যে উপাসনা করিয়াছিলেন তাহাতে সেই আশার কথা বলিয়াছিলেন—"সময়ক্রমে গৃহে গৃহে যোগ হইয়া সকলেই প্রীতিরসে মিলিত হইবে, সকল পরিবারই এক হইবে। · অদ্য এই বঙ্গদেশের মধ্যে তাহার সূত্রপাত হইল।" কেশববাবুর স্ত্রীর ঠাকুর-পরিবারে আসার এই বৃত্তান্ত শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তুলিয়া দিই—"একবার মাঘোৎসবের আগের দিনে মামা আসিয়া আমাকে বলিয়া গেলেন—'কর্তা বলিয়া দিলেন, কাল কেশববাবুর স্ত্রী ও আর দুই জন মেয়ে আসিবেন— তোমরা তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া খাওয়ানো ও দেখাশোনা করিবে— কোন ত্রুটি না হয়।' তাহার পরদিন কেশববাবু, প্রতাপবাবু ও অক্ষয় মজুমদার মহাশয়ের স্ত্রী আমাদের বাড়িতে আসিলেন।

"কেশববাবুর স্ত্রী তিন-চার মাস আমাদের কাছে ছিলেন। তখন আত্মীয়-স্বজনেরা আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন, কেহ আমাদের বাড়িতে আসিতেন না। সেই সময়ে কেশববাবুর স্ত্রীকে আমাদের আত্মীয়রূপে পাইয়া আমরা বড়ো আনন্দে ছিলাম। প্রথমটা তাঁহার মন বিমর্ষ ছিল— বিশেষত তাঁর একটি ছোটো ভাইয়ের জন্য তাঁর হৃদয় ব্যাকুল হইত। সেই সময় সোম, রবি ও সত্য* শিশু ছিল— তাঁহাদিগকেই তিনি সর্বদা কোলে করিয়া থাকিতেন—বলিতেন, রবিকে তাঁহার সেই ছোটো ভাইটির মতো মনে হয়। সত্য তাহাকে মাসী বলিতে পারিত না, "মাচি" বলিত, তাহাতে তিনি আমোদ বোধ করিতেন। তাঁহাকে আমাদের ভগিনীর মতোই মনে হইত— তিনি যাইবার সময় আমরা বড়ো বেদনা পাইয়াছিলাম।" এবং এই প্রসঙ্গে গৌরগোবিন্দ রায় প্রণীত 'আচার্য কেশবচন্দ্র' গ্রন্থ হইতেও এই ঘটনা সম্বন্ধে একটুখানি অংশ উদ্ধার করি—'কিছুদিন পরে ১লা বৈশাখের উৎসব উপলক্ষে স্বীয় পত্নীকে ঠাকুর-পরিবারে আনয়ন জন্য কেশবচন্দ্রকে গৃহত্যাগ করিতে হয়। অল্প দিন পরেই তাঁহার বিষম একটি ফোঁড়া হইয়াছিল, এবং তজ্জন্য তাঁহাকে দীর্ঘকাল রোগশয্যায় পড়িয়া থাকিতে হয়।

* শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়—শ্রীমতী সৌদামিনী দেবীর পুত্র।

মহর্ষি সুদক্ষ ডাক্তারদিগের দ্বারা তাঁহার চিকিৎসা করাইয়াছিলেন এবং সকলে এত যত্ন করিতেন যে, কেশবচন্দ্র তিলার্ধও বুঝিতে পারেন নাই যে, তিনি পরগৃহে বাস করিতেছেন। অন্তঃপুরে মহিলাগণ এবং গৃহের বালকগণ তাঁহার পত্নীর সহিত এরূপ সস্নেহ ব্যবহার করিতেন যে, তাহা বর্ণনাতীত। স্বীয় পরিবারে আহূত হইয়া সেই পীড়ার অবস্থায় আচার্যদেবকে মহর্ষির গৃহ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। আচার্যদেবের নিজমুখে অনেকবার শুনা গিয়াছে যে, কন্যাকে শ্বশুর বাড়ি পাঠাইবার সময় যেরূপ সজ্জিত করিয়া পাঠাইতে হয়, তাঁহার পত্নীকে মহর্ষি নিজ গৃহ হইতে সেই রূপে সাজাইয়া বিদায় দিয়াছিলেন।"

আমি মনে করি এও একটা বড়ো অনুষ্ঠান। আমাদের দেশে পরিবার দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয় কুটুম্বদিগকে আপনার বলিয়া টানে, কিন্তু কোনো নিঃসম্পর্ক বাহিরের লোককে আপনার করিতে তাহার বাধে। যাহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ কেবলমাত্র সামাজিক—ভাবের সম্বন্ধ বা কাজের সম্বন্ধ—পরিবারের এলাকার সম্পূর্ণ বাহিরে তাহাদের সঙ্গে পরিবারের যিনি স্বামী তিনি মেশেন। এইজন্য আমাদেব দেশে পরিবারের মধ্যে বাহিরের হাওয়াটা যথেষ্ট বহিতে পারে না। পরিবারের দ্বারা সমাজ, সমাজের দ্বারা পরিবার পূর্ণতর হয় না। বাড়ির ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্য বাইরের লোকের আনাগোনা যে অত্যন্ত দরকার, খুব একটি প্রশস্ত রকমের আলাপ-আলোচনার আবহাওয়ার মধ্যেই যে তাহারা ঠিকমত মানুষ হইতে পারে এ কথা দেবেন্দ্রনাথ বেশ জানিতেন। সেইজন্য তিনি বন্ধুদিগকে আপনার পরিবারের অঙ্গ করিয়া লইয়াছিলেন। 'আচার্য কেশবচন্দ্রে'র গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "কেশবচন্দ্রের অনুযায়িগণের পক্ষে প্রধানাচার্যের গৃহ সামান্য আকর্ষণের স্থান ছিল না।"

সুতরাং এই পারিবারিক অনুষ্ঠানকে আমি সামাজিক কোনো অনুষ্ঠানের চেয়ে সামান্য বলিয়া মনে করিতে পারি না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাচীন ও নবীন দলের সংঘাত

১৮৬১ খৃস্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র যখন ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, তখন কোনো একজন ব্রাহ্ম তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে এক চিঠি পাঠান এবং সেই চিঠিতে তিনি ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে গোটাকতক অভিযোগ উপস্থিত করেন। একটি অভিযোগ ছিল এই—"সমাজ নির্বাহের ভার ২।৪ জনের উপরে রহিয়াছে, সাধারণ ব্রাহ্মের তাহাতে কোন হস্ত নাই।" তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক ইহার উত্তরে লেখেন—"এইটি তাঁহার লেখা যথার্থ হয় নাই। যে কয়জনের উপর সমাজ-নির্বাহের ভার সমর্পিত হয়, সাধারণ ব্রাহ্মের সম্মতিতেই হইয়া থাকে। সমাজের কার্যবিবরণ বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিবার জন্য ও সম্পাদক প্রভৃতি কর্মচারী নিযুক্ত করিবার জন্য পৌষ মাসে এক সাধারণ সভা হইয়া থাকে।"*

১৭৮৩ শকের ২৭এ চৈত্রে অর্থাৎ ১৮৬২ খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকে ব্রাহ্ম-সমাজের সাধারণ সভায় বছরের কর্মচারীনিয়োগের সময় একটা মস্ত পরিবর্তন দেখিতে পাওয়া যায়। কতগুলি কর্মচারীর উপরে "সমাজের বৈষয়িক কার্যের ভার" দেওয়া হয়, এবং "ধর্মসম্বন্ধীয় কাযের ভার" দেবেন্দ্রনাথের উপর অর্পণ করা হয়। এ ভাগ মধ্যযুগীয় খৃস্টান চর্চের Spiritual and temporal ভাগের মতো। পোপ যেমন চর্চের সর্বময় কর্তা, তেমনি দেবেন্দ্রনাথকে ব্রাহ্মরা "ব্রাহ্মসমাজপতি ও প্রধান আচার্য" এই উপাধি দিয়া ধর্মবিষয়ে সমস্ত কাজের ভার তাঁহার উপর ফেলিলেন। ব্রাহ্মসমাজপতি ও প্রধান আচার্যের কাজ চারি ভাগে ভাগ করা হইল—

১ ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা প্রস্তুত করা।

২. ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাপ্রণালী প্রস্তুত করা।

৩. ব্রাহ্মধর্মবিষয়ক গ্রন্থ সকল মুদ্রিত হইবার পূর্বে পরীক্ষা করা।

৪. বিবিধ উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করা।

স্থির হইল যে, ব্রাহ্মসমাজপতি ও প্রধান আচার্য এক "ব্যবস্থাপক সভা" স্থাপন করিবেন এবং ইহার সভ্যদের সাহায্য লইয়া অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ও

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ১৭৮৩ শক।

উপাসনাপ্রণালী প্রস্তুত করিবেন। এই সভার কার্যনির্বাহের নিয়ম তৈরি করিবার ভার প্রধানাচার্যের উপরেই রহিল। একটি নিয়ম কেবল করা হইল এই যে, যাঁহারা ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠানে অক্ষম তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইতে পারিবেন না।"

ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে গ্রন্থাদি পরীক্ষা করিবার জন্য আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, কেশবচন্দ্র সেন ও তারকনাথ দত্ত মহাশয়েরা সমাজপতিকে সাহায্য করিবেন স্থির হইল। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মপ্রচারের সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। শেষ প্রস্তাব যাহা সেই সভায় স্থির হয় তাহাও বলা দরকার—"উপাচার্য ও অধ্যায়ক নিযুক্ত করিবার ভার সমাজপতির উপর অর্পিত হইল।"

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ভিন্ন ধর্মবিষয়ে সমাজের যে-সকল কাজ আছে, তাহাতে দেবেন্দ্রনাথকে সাহায্য করিবার অধিকার আর কোনো ব্রাহ্মের রহিল না। ব্যবস্থাপক সভা হইতে তাঁহারা বাদ পড়িলেন—সুতরাং অনুষ্ঠান ও উপাসনাপ্রণালী সম্বন্ধে তাঁহাদের কোনো বক্তব্যই থাকিল না। সমাজের উপাচার্যনিয়োগে তাঁহাদের কোনো হাত রহিল না। দেবেন্দ্রনাথ যাহাকে আচার্য বা উপাচার্য করিতে চাহিবেন, তিনিই আচার্য বা উপাচার্য হইবেন।

অথচ সকল ব্রাহ্মের সম্মতিতে সাধারণ সভায় এই যে-সকল ব্যবস্থা স্থির করা হইল, তাহাকে অবৈধ (unconstitutional) বলিবার কোনো কারণ নাই। দেবেন্দ্রনাথ কিছু নিজের ইচ্ছায় "ব্রাহ্মসমাজপতি" বা "প্রধান আচার্য" উপাধি গ্রহণ করেন নাই। তিনি কিছু "বৈষয়িক" ও "ধর্মসম্বন্ধীয়", temporal ও spiritual ভাগে সমাজের কাজ ভাগ করিবার উপদেশ দেন নাই। ব্রাহ্মসাধারণ-সভায় এই ভাগ করার প্রস্তাব উঠিল এবং প্রস্তাব গৃহীতও হইল। অথচ ইহার কারণ কি? ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এমনতর মধ্যযুগীয় ভাব আসার মানে কি? বৈষয়িক ব্যাপারকে আধ্যাত্মিকতার বিরুদ্ধ বলিয়া তো ব্রাহ্মসমাজ মনে করিতে পারেন না। তাহা হইলে জমিদার দেবেন্দ্রনাথকে কেমন করিয়া তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজপতি নাম দেন?

কারণ কোথাও পরিষ্কার রকমে বলা না হইলেও, যে ইতিহাসটুকু আমরা পূর্বের দুই পরিচ্ছেদে দিয়া আসিয়াছি, তাহার ভিতর হইতে কারণ আঁচিয়া লওয়া বিশেষ শক্ত নয়। ব্রাহ্মসমাজে তখন দুই দল— একদল প্রাচীন, একদল নবীন। একদল সমাজ-সংস্কারের জন্য ব্যস্ত, আর-একদল সমাজ বাঁচাইয়া চলিতে

চান। প্রাচীন দলের মধ্যে অবশ্য কেহ কেহ পৌত্তলিক অনুষ্ঠান ছাড়িতে প্রস্তুত ছিলেন ; কেহ কেহ আবার ততদূরও অগ্রসর হইতে রাজি ছিলেন না। সুতরাং এই উন্নতিশীল বা অগ্রসর ও রক্ষণশীল বা অনগ্রসর ব্রাহ্মদের মধ্যে ভিতরে ভিতরে একটা ঝগড়া চলিতেছিল। প্রাচীন দলের ব্রাহ্মরা ধর্মকে ও সমাজকে পৃথক পৃথক করিয়াই দেখিতেন। সামাজিক জীবনকে ধর্মসাধনের অঙ্গীভূত করিবার কোনো মানেই তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ধর্মজীবনে খুবই অগ্রসর হইয়াছিলেন। আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ বা অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয়ের মতো জ্ঞানী ও ধার্মিক লোক তখন ব্রাহ্মসমাজে পাওয়া শক্ত ছিল। এই এক ধরনের ধর্মজীবন ; তাহা ভিতরের দিকে জ্ঞানের ও ভক্তির সাধনায় যতই উন্নত হইতে থাকে, সংসার ও সমাজের দিকে ততই স্পষ্ট বিমুখ না হইলেও অভিমুখ যে হয় না সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সমাজকে এই শ্রেণীর ধার্মিকেরা লোকস্থিতি, লোকরক্ষার দিক হইতে দেখেন। সমাজের আচার নিয়ম ক্রিয়াকর্ম প্রভৃতি পালন না করিলে লোকস্থিতিই ভঙ্গ হয় বলিয়া মনে করেন। সেইজন্য সমাজকে কোথাও ঘাঁটাইতে তাঁহাদের মন চায় না। তাহাতে যে বিপ্লব উপস্থিত হয়, সেই বিপ্লবে তাঁহাদের আধ্যাত্মিক শান্তি ক্ষুব্ধ হইতে থাকে। শান্ত দান্ত হইয়া আত্মাকে পরমাত্মাকে লাভ করিয়া একটি নিত্য স্থিতি ও ধ্রুব শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য তাঁহাদের সমস্ত প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। সেই ভিতরকার স্থিতি ও শান্তি পাছে নষ্ট হয় এইজন্যই বাহিরের সংসার হইতে তাঁহারা উপরত হইতে চান, সংসারেরও একটা স্থিতি ও শান্তি স্থিরপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে চান। তাঁহাদের মুক্তির আদর্শ স্থিতিশীল বলিয়াই তাঁহাদের সমাজের আদর্শও স্থিতির আদর্শ। কিন্তু ঈশ্বর যে স্বয়ং "এজতি," তিনি যে বিশ্বমানবের ইতিহাসের বিজয়-অভিযানের স্বয়ং নেতা। তিনি যেমন কত ভূমিকম্প, আগ্নেয় উচ্ছ্বাস, জলপ্লাবন, প্রভৃতি বিচিত্র শক্তির লীলার দ্বারা স্তরে স্তরে এই পৃথিবীর ভূমিকে গড়িয়া তুলিয়াছেন, তেমনি যে কত প্রলয়শক্তির দ্বারা মানুষের ইতিহাসকেও অসভ্য বর্বরতা হইতে সুসভ্য অবস্থায় পরিণত করিয়াছেন তাহা ভাবিলে তো তাঁহাকে জগৎ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া এক নির্গুণ নির্বিকল্প অবস্থায় ঠেলিয়া রাখা যায় না। তিনি শিব বলিয়াই প্রলয়ংকর। তাঁহার একমূর্তি, নিবাতনিষ্কম্প ধ্যানমূর্তি ; তাঁহার আর মূর্তি, তাণ্ডবনৃত্যপর প্রলয়মূর্তি। যে শিব, যে শান্তি, এই প্রলয়ের মধ্য দিয়া এই ভাঙা-গড়ার রুদ্রলীলার মধ্য দিয়া প্রকাশ না পায়, তাহা আসল শিব আসল শান্তিই নয়। কিন্তু যাহাদের

মুক্তির আদর্শ স্থিতিশীল, তাহারা বিশ্বমানবের ইতিহাসের ভিতর দিয়া ব্রহ্মের এই বড়ো প্রকাশকে দেখিতে পায় না।

কবি টেনিসন যে বলিয়াছেন—

"That one far off divine event
To which the whole creation moves"—

সেই এক সুদূর স্বর্গীয় পরিণামের দিকে সমস্ত বিশ্বসৃষ্টি ছুটিয়া চলিয়াছে—এ কথার তাৎপর্য তাহারা বুঝিতে পারে না। পৃথিবীর ইতিহাসের সমস্ত উত্থান-পতন, জয়পরাজয়, যুদ্ধবিগ্রহ, রক্তপাত সেই এক সুদূর মহা পরিণামকে ক্রমশ সম্ভাবিত করিতেছে এবং একদিন দেশের সঙ্গে দেশের, সভ্যতার সঙ্গে সভ্যতার এবং উচ্চ জাতির সঙ্গে নিম্ন জাতির, সভ্য জাতির সঙ্গে অসভ্য জাতির এমন এক মহাপ্রীতির মিলন হইবে যে, সেই প্রীতির বিচিত্র আদান-প্রদানই তখন মানুষেব প্রধান ধর্মকর্ম হইবে—এ স্বপ্ন কাহাদের মনকে উতলা করিতে পারে? যাহাদের কাছে মুক্তির আদর্শ ক্রমোন্নতির আদর্শ, যাহাদেব কাছে ব্রহ্ম নিত্য-ক্রিয়াশীল, নিত্যবিগ্রহবান।

ধর্মের এই নূতন আদর্শ তখন ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া পড়িয়াছে এবং দেবেন্দ্রনাথই এই নূতন আদর্শের ব্যাখ্যাতা। "অনন্তকালই আমরা আনন্দের উপর আনন্দ, প্রেমের উপর প্রেম লাভ করিতে থাকিব"—তাঁহার ব্যাখ্যানের মধ্যে এই তো মুক্তির আদর্শ। সেইজন্য এই সময়ে তাঁহার সকল লেখার মধ্যে উন্নতির জন্য কি একটা দুরন্ত ও ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার পবিচয় পাওয়া যায়—"আমাদের ক্রমিক উন্নতিই হইবে।" এই মুক্তির আদর্শ তিনি বেদান্ত হইতে পান নাই—পাশ্চাত্ত্য শাস্ত্র হইতে এই আদর্শ তাঁহার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। পরিশিষ্টভাগে ইহার পুরাপুরি আলোচনা আমরা করিয়াছি।

যাহাই হৌক, ব্রাহ্মসমাজের নবীনদল তখন এই নূতন আদর্শ পাইয়াছেন। তাঁহাদের কাছে ধর্ম ও সমাজের বিচ্ছেদ ঘুচিয়া গিয়াছে। খৃস্টানধর্মের মহাবাক্য—to establish the Kingdom of Heaven upon Earth—পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে—তখন তাঁহাদের জীবনের মূলমন্ত্র। অবশ্য দেবেন্দ্রনাথের সমস্ত উপদেশ প্রত্যক্ষভাবে এই ধর্মের মন্ত্রকে কোথাও অবলম্বন করে নাই। কিন্তু পশ্চিমের দর্শন শাস্ত্র হইতে এই তত্ত্ব ও বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্বের এক আশ্চর্য মিলন হইতে সেই উপদেশগুলি উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া এই মন্ত্রেরই সুরে তাহারাও সুর মিলাইয়াছিল।

দেবেন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ মনের টান যে নবীনদলের উপর ছিল, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ, তাঁহার এ সময়ের উপদেশগুলি ততটা পরিমাণে নয়, যতটা পরিমাণে তাঁহার চিঠিগুলি। চিঠিতেই মানুষ আপনাকে ঠিকমত ধরা দেয়। ৭ই আষাঢ় ১৭৮৩ শক ইংরাজী ১৮৬১ সালে তিনি লিখিতেছেন, "রাজনিয়ম দ্বারা যাহাতে সঙ্কর বর্ণে বিবাহ সিদ্ধ হইতে পারে এমত চেষ্টা করা এইক্ষণে বিহিত বোধ হইতেছে"—তাহা পূর্বেই উদ্ধার করিয়া দেখানো হইয়াছে। ১৩ই মাঘ ১৭৮৪ শক— ইংরাজী ১৮৬৩ সালে তিনি পুনবায় লিখিতেছেন— "ব্রাহ্মদিগের মধ্যে জাতিভেদ নাই ; ব্রাহ্মণ শূদ্রের মধ্যে আদান প্রদান হইতে পারে।" ইহাও পুর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। সুতরাং তিনি যে তখন নূতন দলেরই "প্রধান আচার্য ও সমাজপতি" হইয়াছিলেন, ইহা বেশ বলা যাইতে পাবে।

কিন্তু নূতন দল, প্রাচীন দলের সমাজ-সংস্কাবে ও জাতিভেদ প্রভৃতি ভাঙার ব্যাপারে উৎসাহ নাই দেখিয়া তাঁহাদের ধর্মভাবেব সত্যতা সম্বন্ধেই অবিশ্বাস করিতেন, তাঁহাদিগকে কপট মনে কবিতেন। অথচ দেবেন্দ্রনাথ তেমন মনে করা দূরে থাকুক, তাঁহাদিগকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। ১৮৬৩ খৃস্টাব্দে, তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত 'অনুষ্ঠানের প্রয়োজন' এই নামে ধারাবাহিক কতগুলি প্রবন্ধের মধ্যে একটি প্রবন্ধে একজায়গায় বলা হইয়াছে, "যদি সংসারের কার্য ও ধর্ম পৃথক পৃথক থাকে, যদি সংসারের কাযের সময় সংসারী ও ব্রহ্মোপাসনার সময় ব্রাহ্ম হও, যদি ধর্মকে উদাসীন করিয়া বাখ, তাহা হইলে ধর্মের ফল তোমার নিকট কিছুই থাকিবে না।" এত বড়ো শক্ত কথা প্রাচীন বা অনগ্রসর দল সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথেব কলম হইতে কখনোই বাহির হইত না। কারণ, তাঁহার ভিতরে উন্নতির জন্য আকাঙ্ক্ষা যত প্রবল ছিল, রক্ষণশীল প্রবৃত্তি ততই প্রবল ছিল। ভারতবর্ষে অধ্যাত্ম-সাধনাকে যাঁহারা সমাজের সঙ্গে জড়ান নাই, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যে অধ্যাত্মজীবনে খুবই উন্নত হইয়াছেন, তাহা তিনি বেশ জানিতেন। তিনি জানিতেন, এই ধরনের সাধকের সংখ্যাই আমাদের দেশে সব। শুধু আমাদের দেশে কেন! ইংরাজ মনীষী কার্লাইল ও এমারসন্‌ও অধ্যাত্ম-সাধনাকে সমাজের সঙ্গে তেমন করিয়া জড়ান নাই। কার্লাইল ক্রমাগতই "silence and secrecy" নির্জনতা ও গোপনতাই যে অধ্যাত্মজীবনের পক্ষে একান্ত দরকার এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। কার্লাইল তবু সমাজের একটা বড়ো আদর্শের কল্পনা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, সমাজের প্রাণস্বরূপ "nervous tissue" স্নায়ুতন্ত্র যে ধর্ম,

তাহাকে ছেঁদা করিয়া ফুটা করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাই ক্ষয়গ্রস্ত সমাজ ক্রমশ প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে। "Call ye that a society where there is no longer any social idea extant?" সুতরাং সমাজকে যখন ব্যক্তিই বড়ো করে, তখন সেই ব্যক্তিত্বের সাধনাকে জাগ্রত করিবার কথাই কার্লাইল ঘোষণা করিয়াছিলেন। এমার্সনের সমাজের সম্বন্ধে বিশ্বাস আরো কম। তিনি বলিয়াছেন, "All men plume themselves on the improvement of society, and no man improves"—সব মানুষই সামাজিক উন্নতির পালক চড়াইয়া সেই উন্নতিতে নিজেকে উন্নত মনে করে বলিয়া কোনো মানুষই সত্য সত্যই উন্নত হয় না। কারণ "society never advances," সমাজ কখনোই অগ্রসর হয় না। সুতরাং "self-reliance" সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরই এমার্সনের মতে জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত— আমার মধ্যেই সমস্ত শক্তি ও আমার মধ্যেই সমস্ত মুক্তি। সেই-জন্য নির্জন সাধনার উপর তাঁহার যত বিশ্বাস, এমন সামাজিক সাধনা বা সমাজ-সংস্কারের উপর নয়।

দেবেন্দ্রনাথ এই সাধনায় সিদ্ধ, তাঁহার কাছে এ-সকল কথা কিছুমাত্র নূতন নয়। সমাজসংস্কারক হইলেই যে অধ্যাত্মজীবনেও উন্নতি লাভ হয়, তাহা মনে করিবার কোনো হেতু তাঁহার ছিল না। বরং সমাজসংস্কারক হওয়ার বিপদ কী তাহা তিনি জানিতেন। ভাঙিবার প্রচণ্ড উৎসাহে মানুষের ভিতরের শক্তিগুলি এমন নাড়া পায় যে, তাহাদিগকে দুদণ্ড ঠাণ্ডা করিয়া গুছাইয়া সমাহিত করিবার চেষ্টা করাই তাহার পক্ষে এক মহা হাঙ্গামার ব্যাপার হয়। মার্টিন লুথারের স্ত্রী তাঁহার প্রটেস্ট্যান্ট হইবার পরে তাঁহাকে বলিতেন, "দেখ, তুমি আগে যখন প্রটেস্ট্যান্ট হও নাই, তখন আমাদের উপাসনায় কেমন একটা ভক্তির রস থাকিত, এখন যেন সমস্তই শুকনো— এমন কেন হইল?" আসল কথা সমাজ-সংস্কারকের মনে যে ঝাঁঝটুকু থাকে, তাহাতে রস উবিয়া যায়, সেই ঝাঁঝের জন্য তাহার কথায় ও কাজে একটা ভয়ংকর তাপ দেখা দেয়। সে তাপ একেবারেই অসহ্য। সুতরাং যুবকদলের যৌবনের ঝাঁঝের মধ্যে পড়িয়া দেবেন্দ্রনাথ অন্যদলের অ-ঝাঁঝকে তাহাদের মতো আগাগোড়াই ব্যাজ বলিয়া মনে করেন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর দিন ও রাত্রির মতো, জল ও স্থলের মতো, স্থিতিশীল ও গতিশীল— এই দুই দলেরই দরকার সমাজের পক্ষে আছে—একটার দ্বারাই আর-একটার পূর্ণতা। কেবল স্থিতি, গতি নাই— তাহা মৃত্যু। কেবল গতি, স্থিতি নাই, তাহাও আর-এক রকমের মৃত্যু—কারণ তাহা মুহূর্তে মুহূর্তেই মরে।

সমস্ত বিশ্বের মধ্যে এই যুগ্ম লীলা করিতেছে বলিয়াই বিশ্ব এমন আশ্চর্য সুন্দর, আশ্চর্য মঙ্গলভাবে ভরা। তিনি তাই পুরানো দলের ছায়ায় বিশ্রাম করিতেন আর নূতন দলের রৌদ্রময় পথে তাহাদের সাথে সাথে চলিতেন।

তবু যাহারা পথের সঙ্গী তাহাদের সঙ্গে যেমন মনের যোগ হয়, যাহারা পথে চলিবে না ও গণ্ডী রচনা করিয়া তাহার মধ্যে বসিয়া থাকিবে তাহাদের সঙ্গে কি আর তেমন যোগটি থাকে? বোধ হয় সেই কারণেই ১৮৬২ খৃস্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজে 'বৈষয়িক' ও 'ধর্মসম্বন্ধীয়' কাজের একটা ভাগ হইয়া গেল এবং ধর্মসম্বন্ধীয় সমস্ত কাজের ভার দেবেন্দ্রনাথের উপর দেওয়া হইল। এবং নিয়ম হইল যে, "যাঁহারা ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠানে অক্ষম" তাঁহারা এ-সকল কাজে দেবেন্দ্রনাথকে সাহায্য করিতে পারিবেন না। অর্থাৎ কেশবচন্দ্রের দলই সমাজের আসল ভাব গ্রহণ করিলেন এবং দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাদের নেতা হইলেন।

দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে রায়পুরের সিংহ পরিবারের এই সময়ে বিশেষ বন্ধুতা হয়— প্রতাপ সিংহ তাঁহার কাছে পড়িতেন। তাঁহার পিতা ভুবনমোহন সিংহের বীরভূমের বাড়িতে এই বছরের শেষে চৈত্রমাসে দেবেন্দ্রনাথ একবার নিমন্ত্রিত হইয়া যান এবং সেখানে উপাসনা করেন। তার পরে সেখানে বর্ধমানের অন্তর্গত গুস্‌করার কাছে একটি আম্রকুঞ্জে তিনি তাঁবু ফেলিয়া নির্জনে কিছুকাল যাপন করেন। তাঁহার মনে তখন ব্রাহ্মধর্ম প্রচার সম্বন্ধে নূতন উৎসাহ। সেই তাঁহার দিবারাত্রির ধ্যান। নির্জনে ধ্যানের অবস্থায় যখন সাধকের স্বাভাবিক চৈতন্য ডুবিয়া যায়, আর অতীন্দ্রিয় জগতের সঙ্গে সেই নিবিড় নিবিষ্ট চৈতন্যের আনাগোনা চলিতে থাকে, তখন ভিতরকার সেই clairvoyant intuitionsগুলি সেই ধ্যানজ অপরোক্ষ অনুভবগুলি ক্রমশ দানা বাঁধিয়া সাকার হইতে থাকে এবং হয় বাণী নয় মূর্তিরূপ পরিগ্রহ করিয়া হঠাৎ সাধককে চমকিয়া দেয়। এমনি অবস্থাতেই তিনি 'আদেশ' শুনিতেন, তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। এই অবস্থায় তাঁহার prophetic দৃষ্টি খুলিয়া যাইত, তিনি ভবিষ্যদ্দর্শী হইতেন। এই আদেশের শক্তি যে কত বড়ো তাহা হিমালয় হইতে নামিবার জন্য যে আদেশ পাইয়াছিলেন, তাহার ইতিহাসটুকু হইতেই আমরা বুঝিয়াছি। তাহার প্রবলতার কারণ এ জিনিসটা কতকটা আগ্নেয় উচ্ছ্বাসের মতো কি না। ভিতরকার অব্যক্ত চৈতন্য (subliminal consciousness) এবং অভিব্যক্ত চৈতন্য (supraliminal consciousness) এই দুয়ের সংঘাতে যাহা ভিতরে ভিতরে অনেক দিন হইতে গোপনে জমিতেছিল তাহা হঠাৎ উপরের অতীন্দ্রিয় চৈতন্যের চাপে

একেবারে মূর্তি গ্রহণ করিয়া বিগ্রহের মতো (symbol) ঠেলিয়া ভাসিয়া উঠে। তাহাকে তখন বাণীর মতো শোনা যায়, তাহাকে তখন রূপের মতো দেখা যায়। তাহা তখন স্বাভাবিক চৈতন্যের বুদ্ধি ও যুক্তির এলাকার মধ্যে নয়—তাহার চেয়ে অনেক বড়ো চৈতন্যের অন্তর্গত। তখন তাহার গতি বোধ করবে কে?

সেই গুস্‌করার আম্রকুঞ্জে একদিন এমনি এক আদেশ দেবেন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছিল—"কেশবচন্দ্রকে সমাজের আচার্য কর, তাহাতেই সমাজের কল্যাণ হইবে।" ২৭এ চৈত্রের যে সভায় ব্রাহ্মসমাজের ব্যবস্থায় নানা গুরুতর পরিবর্তন হইল, সেই সভার সভাপতি দেবেন্দ্রনাথের এক চিঠি পড়িলেন। তাহাতে তিনি কেশবচন্দ্রকে ১লা বৈশাখ হইতে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্যের পদে অভিষিক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া সে বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মদিগের মত জানিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনীতে সেই সভার বিবরণে লেখা আছে, "এ বিষয়ে অধিকাংশের মত হইল"। সুতরাং "দেবেন্দ্রনাথ কাহারও কথা না মানিয়া ১৭৮৪ শক ১লা বৈশাখে কেশবচন্দ্রকে আচার্যের পদ প্রদান করিলেন" এ কথা সত্য নয়। যদিও তখন তাঁহারি উপরে আচার্য-উপাচার্য নিয়োগের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ব্রাহ্মসাধারণ দিয়াছিলেন, তবু তিনি তাঁহাদের সম্মতি না লইয়া কেশবচন্দ্রকে আচার্যপদে নিয়োগ করেন নাই। অবশ্য ইহাতে প্রাচীন দলের কেহ কেহ হয়তো ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন— কিন্তু সে ক্ষোভের দ্বারা এ কাজে কোনো বাধা দিবার ইচ্ছা তাঁহাদের ছিল না। যদি তাহা থাকিত, তবে সাধারণ সভায় ধর্মসম্বন্ধীয় সমস্ত কাজের ভার দেবেন্দ্রনাথের উপর তাঁহারা দিতেন না। এবং সেই কাজ চালাইবার জন্য ব্যবস্থাপক সভায় যাঁহারা ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান করিবেন না তাঁহারা স্থান পাইবেন না, এ প্রস্তাবেও তাঁহারা রাজি হইতেন না। আসলে তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে জাতি ত্যাগ না করিলেও ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন। পণ্ডিত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ব্রাহ্মধর্মের মতে পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের এই নূতন ব্যবস্থায় প্রাচীন দলের মধ্যে যাঁহারা প্রধান তাঁহারা বাদ পড়িবেন এ আশঙ্কা ছিল না। তবে যাঁহারা শ্যাম ও কুল দুই বাঁচাইয়া চলিতে চাহিতেছিলেন তাঁহারা যে বাদ পড়িয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

১লা বৈশাখ সমাজঘরে আর লোক ধরে না। যেমন উপাসনা হইয়া থাকে তাহা হইয়া গেলে, দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে আচার্যপদে কেন নিয়োগ করিতেছেন তাহার কারণ খুলিয়া বলিলেন—"ঈশ্বরপ্রসাদে ব্রাহ্মসমাজের আয়তন ক্রমশ বৃদ্ধি হইতেছে। পূর্বের ন্যায় কেবল ইহা কলিকাতাতেই বদ্ধ নাই; কিন্তু

দেশবিদেশে গ্রামে গ্রামে তাঁহার মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, বঙ্গভূমির সর্বত্রই সেই ঈশ্বরের পবিত্র নাম কীর্তিত হইতেছে— কেবল বঙ্গদেশে কেন; উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হিন্দুস্থানের মধ্যেও ঈশ্বরের মঙ্গলময় ব্রাহ্মধর্ম ঘোষণা হইতেছে। ক্রমে আমাদের ব্রাহ্মসমাজের কর্মক্ষেত্র প্রশস্ত হইতেছে; এখন সমস্ত বঙ্গভূমি যাহাতে পবিত্র ধর্মেতে উন্নত হয় তাহাব উপায় চেষ্টা করিতে হইবে। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে একটি ঐক্যবন্ধন স্থাপিত করিতে হইবে, দূরাদূবের ব্রাহ্মসমাজসকল সুপ্রণালীতে বদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু আমি কেবল কলিকাতায় বদ্ধ থাকিলে সকল সমাজের সম্যক্‌রূপে তত্ত্বাবধারণ হয় না। যেখানে যেখানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে আমার স্বয়ং যাইবাব প্রয়োজন। আমি এখন আর কলিকাতায় বদ্ধ থাকিতে পারি না, সুতবাং এখানে একটি আচার্যের প্রয়োজন হইতেছে, অতএব এক্ষণে আমি আহ্লাদপূর্বক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দকে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্যপদে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি। ঈশ্বরপ্রসাদাৎ ব্রাহ্মধর্মে ইঁহার যে প্রকার অনুরাগ, যে প্রকার নিষ্ঠা, তাহাতে সমাজের অবশ্যই উন্নতি হইবে। এই ক্ষণ সকলে মিলিত হইয়া অভিষেক কার্য সম্পন্ন করুন।"

তার পরে কেশবচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শ্রীমান্‌ কেশবচন্দ্র! তুমি মহদ্ভার গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, আমি জানিতেছি যে, তাহাতে তোমার দ্বারা এ ধর্মের অশেষ উন্নতি হইবে। তুমি এই গুরুভার অপরাজিতচিত্ত হইয়া অহোরাত্র বহন করিবে। কিসে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ উন্নত হয়, কিসে ব্রাহ্মদিগের মনের মালিন্য দূর হয়, এ প্রকার যত্ন করিবে। অন্য কোন প্রচলিত ধর্মের প্রতি দ্বেষ কি নিন্দাবাদ করিবে না, কিন্তু যাহাতে সকল ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ঐক্যবন্ধন হয় এমত উপদেশ দিবে। আপনার আন্তরিক ভাব অকপট হৃদয়ে নির্ভয়ে ব্যক্ত করিবে, সদা নম্র স্বভাব হইবে। বৃদ্ধদিগকে সমাদর করিবে। যাহার যে প্রকার মর্যাদা তাহাকে সেই প্রকার মর্যাদা দিবে। তুমি যে কর্মে অগ্রসর হইয়াছ এ অতি দুরূহ কর্ম। কিন্তু অল্পবয়স্ক মনে করিয়া আপনাকে অবজ্ঞা করিয়ো না। আমাদের ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক মহাত্মা রামমোহন রায় ধর্মের জন্য ষোড়শ বৎসরে দেশত্যাগী হইয়াছিলেন। সেই ষোড়শ বৎসরে তিনি যে ভাব-দ্বারা নীয়মান হইয়াছিলেন, সেই ভাব তাঁহার হৃদয়ে চিরদিনই ছিল। প্রথম বয়সে যাঁহারা ধর্মের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন, তাঁহারা কদাপি অবসন্ন হন না। তুমি আপনার ইচ্ছার সহিত প্রাণ হৃদয় মন সকলি ঈশ্বরেতে সমর্পণ কর।

না ধনের দ্বারা, না প্রজার দ্বারা, কিন্তু কেবল ত্যাগের দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়। ধর্মের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে ক্ষুব্ধ হইবে না। কলিকাতার ব্রাহ্মদিগের হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্মের বীজ প্রাণপণে রোপণ করিবে।

"এক্ষণে তুমি আপনার আত্মাকে সেই অমৃতসাগরে নিমগ্ন কর। সেই জগৎ-প্রসবিতা পরমদেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান কর, যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন।

"ঈশ্বর তোমাকে এক্ষণ আপনার অমৃতসলিলে অভিষিক্ত করিতেছেন। তাঁহার আদেশে আমিও তোমাকে এই আচার্যপদে অভিষিক্ত করিতেছি। তুমি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্যপদ ধারণ করিয়া চতুর্দিকে শুভফল বিস্তার কর।

"এই ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ গ্রহণ কর। যদিও হিমালয় চূর্ণ হইয়া ভূমিসাৎ হয়, তথাপি ইহার একটিমাত্র সত্য বিনষ্ট হইবে না। যদি দক্ষিণ সাগর শুষ্ক হইয়া যায়, তথাপি ইহার একটি সত্যেরও অন্যথা হইবে না। যে প্রকারে পূর্বে অগ্নিহোত্রীরা রক্ষা করিতেন, তুমি এই ব্রাহ্মধর্মকে তদ্রূপ রক্ষা করিবে। হে ব্রাহ্মগণ! তোমরা অদ্যাবধি এই কলিকাতার আচার্যের প্রতি অনুকূল হইয়া ইহার কথা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিবে, তাহাতে ব্রাহ্মধর্মের অবশ্যই গৌরব বৃদ্ধি হইবে।"

কেশবচন্দ্রকে দেবেন্দ্রনাথ যাহা সম্বোধন করিয়া বলিলেন ও অধিকারপত্রে যে উপদেশ দিলেন, তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের দুই দলের মধ্যে যে একটা মনকষাকষি চলিতেছিল তাহার স্পষ্ট আভাস আছে। "কিসে ব্রাহ্মদিগের মনের মালিন্য দূর হয়, এ প্রকার যত্ন করিবে।" "বৃদ্ধদিগকে সমাদর করিবে।" "যাহাতে দ্বেষ কলহ অন্তরিত হইয়া ব্রাহ্মদিগের মধ্যে একটি ঐক্য বন্ধন স্থাপিত হয়, এ প্রকার সদুপদেশ দিবে এবং সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবে।" কেশবচন্দ্র তাঁহার মতো দুই দলের মাঝখানে সেতুর মতো হইতে পারিবেন, এই ভরসা তাঁহার উপর ছিল বলিয়াই, দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে কলিকাতা সমাজের আচার্য করিয়া দিলেন। সে ভরসা না থাকিলে তাঁহাকে এমন সময়ে সমাজের ভার দিতে দেবেন্দ্রনাথ কখনোই সাহস করিতেন না।

আচার্য হওয়ার পরে কেশবচন্দ্রের জ্যেঠা এবং বড়ো ভাই তাঁহাকে চিঠি লিখিয়া জানাইলেন যে, তিনি নিজের বাড়িতে আর ফিরিতে পাইবেন না। কেশব হাসিয়া সেই চিঠি দেবেন্দ্রনাথকে পড়িতে দিলেন। দেবেন্দ্রনাথ চিঠিখানি পড়িয়া বলিলেন, "আমার গৃহ তোমার গৃহ, তুমি সুখে এই গৃহে বাস কর।" যদিও ইহার পূর্বেই কেশব সপরিবারে দেবেন্দ্রনাথের গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন

তাহা আমরা দেখিয়াছি, তবু এই সময় হইতে তিনি দেবেন্দ্রনাথের পরিবারের একেবারে অঙ্গীভূত হইয়া গেলেন। এই বছরের পৌষে দেবেন্দ্রনাথ যখন সপরিবারে নৈনানের বাগানে ছিলেন, তখন কেশবচন্দ্রের বড়ো ছেলে করুণাবাবুর জাতকর্ম খুব সমারোহের সঙ্গে তিনি সম্পন্ন করেন।

আমরা দেখিলাম যে, কেশবচন্দ্রকে কলিকাতা সমাজে আচার্য করিবার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতা সমাজ হইতে কতকটা মুক্ত হইয়া দেশবিদেশে ধর্মপ্রচার করিবার অবকাশ পাইবেন। তাঁহার তখন ৪৫ বছর বয়স, অথচ যুবার মতো কর্মশক্তি। কোথায় বেরেলি, কোন্ সুদূরে, সেখানে তিনি ধর্মপ্রচারের জন্য ছুটিয়াছেন। তাঁহার ভাইপো গণেন্দ্রনাথকে সেখান হইতে চিঠি লিখিতেছেন—

"…কেবল ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্যে এতদূরে এত ব্যয় করিয়া এত কষ্টে আসিয়াছি, ইহাতে তাহারা সকলেই আশ্চর্য হইয়াছে এবং আমার প্রতি ও ব্রাহ্মধর্মের প্রতি তাহারদের শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। আমি এখানে আসিয়া দেখিলাম যে, এখানে রবিবারে অপরাহ্নে এক সভা হয়, এবং ইহার নাম ইহারা তত্ত্ববোধিনী সভা রাখিয়াছে। …গত রবিবারের সভাতে আমি উপস্থিত ছিলাম, আমারও হিন্দিভাষাতে একটি উপদেশ দিতে হইয়াছিল। হিন্দি ভাষাতে সাধারণ সভাতে বক্তৃতা করা যদিও আমার এই প্রথম বার হইল তথাপি তাহারা সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছিল। বেরেলির সকল স্থানেই ব্রাহ্মধর্ম লইয়া মহা আন্দোলন হইয়াছে। ধনী, দরিদ্র, যুবা, বৃদ্ধ সকলেরই ব্রাহ্মধর্মের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে। আমি গত বুধবারে এখানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলাম। কলিকাতা সমাজের ন্যায়, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার স্থানে হিন্দি ভাষাতে এখানে উপাসনা কার্য সমাধা হইল। তাহাতে সকলেই আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন।" এইমতো নানা জায়গায় ভ্রমণ ছাড়া কলিকাতার কাছাকাছি ব্রাহ্মসমাজগুলিতে তিনি প্রায়ই গিয়া আচার্যের কাজ করিতেন, কলিকাতা, ভবানীপুর ও চুঁচুড়াতে ব্রহ্মবিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে পড়াইতেন এবং সমাজপতি হওয়ার জন্য ব্রাহ্মসমাজের সমস্ত কাজ দেখিতেন।

রাজনারায়ণ বসু দেবেন্দ্রনাথের চিরকালের বন্ধু— এ সময়ে মেদিনীপুরে রাজনারায়ণ কাজ করিতেছিলেন। তিনি ১৮৫২ সালে সেখানকার মৃতপ্রায় ব্রাহ্মসমাজটিকে জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ সেইখানে যাহাতে ব্রাহ্মধর্মের প্রচারের একটা কেন্দ্র হয়, সেজন্য ১৮৬১ সালে নিজে আট শত টাকা সাহায্য করিয়া সেখানকার মন্দিরটি রাজনারায়ণবাবুর দ্বারা তৈরি করান এবং

এই বছরে, ১৮৬২ সালে শ্রাবণ মাসে মেদিনীপুরে গিয়া সেখানকার সমাজের মধ্যে একটা নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়া আসেন। দেবেন্দ্রনাথ এই প্রচারবৃত্তান্ত বিষয়ে নিজে লিখিয়াছেন, "এখন হইতেই মেদিনীপুরখণ্ডের পল্লিগ্রামেও ব্রাহ্ম-ধর্মের আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। তথাকার ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রধান ছাত্র শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিবার ভার লইতে অগ্রসর হইয়াছেন এবং তদুপযুক্ত শিক্ষালাভের জন্য আমার সহিত সম্প্রতি ভ্রমণ করিতেছেন।" রাজনারায়ণ বসুও এ সম্বন্ধে তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন, "কতকগুলি ব্রাহ্ম গার্হস্থ্য ক্রিয়াতে পৌত্তলিকতার সহিত সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই সকল অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মদিগের মধ্যে···অখিলচন্দ্র দত্ত···ছিলেন। অখিলচন্দ্র দত্ত প্রচারক হইবার মানস করিয়াছিলেন।··· রাস্তায় পীড়িত হওয়াতে প্রধান আচার্য মহাশয় স্বহস্তে তাঁহাকে পাখার বাতাস করিতে দৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি এত স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল। এই অখিলচন্দ্র দত্ত পরে 'মেদিনী' নামক মেদিনীপুরের বিখ্যাত সংবাদপত্রের সম্পাদক হইয়াছিলেন। তিনি সম্পাদকের কার্য অত্যন্ত নির্ভীকতার সহিত সম্পাদন করিতেছিলেন।"

বাস্তবিক এই সময়ে সমস্ত দেশে ধর্মপ্রচারের উৎসাহের একটা জোয়ার আসিয়াছিল। তাহার একমাত্র কারণ ধর্মটা আর তত্ত্বালোচনার বা সাধনের বিষয় ছিল না, তাহা অনুষ্ঠানের বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। সমাজ হইতে ধর্ম যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন, ততক্ষণ তাহা বিলের জলের মতো শান্ত— তাহাতে তরঙ্গভঙ্গ নাই। সমাজের মধ্যে ধর্মের প্রবেশব্যাপার নদী-খালের মধ্যে মহাসমুদ্রের প্রবেশ-ব্যাপারের মতো— তখন কূল ভাসায়, বাঁধ ভাঙায়। এ সময়ে যে ব্রাহ্মসমাজে সেই বান ডাকিয়াছিল, তাহা বাংলার গ্রামে গ্রামে জেলায় জেলায় সবাই অনুভব করিয়াছিলেন। শুধু বাংলায় নয়, ভারতবর্ষের সমস্ত কূলে-উপকূলে তাহার কলধ্বনি গিয়া পৌঁছিয়াছিল। এখন ব্রাহ্মসমাজ জনকতকের মধ্যে আবদ্ধ একটা সভা বা সম্প্রদায় নয়, এখন সে একটা শক্তি, একটা দেশশক্তি বা কালশক্তি। এখন মানুষ আর তাহাকে চালায় না, সে-ই মানুষকে চালায়। মানুষ ভাবে, কিন্তু সে ভাবনা জোগায়; মানুষ করে, সে শক্তি ও উপকরণ জোগায়; মানুষ বলে, সে বাণী জোগায়। এমন একটা মুহূর্তে, দেবেন্দ্রনাথ যে মাতিয়া উঠিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য কি আছে! কারণ তিনি যে তখন সেই কালশক্তির কল!

রাজনারায়ণবাবুকে তিনি মহা উৎসাহের সঙ্গে লিখিতেছেন, "এইক্ষণে প্রচারের ধ্বনি সর্বত্র হইতে উত্থিত হইতেছে। ব্রাহ্মধর্মে অনেকের স্বত্ব জন্মিয়াছে।

প্রচারের উদ্দেশে কেহ কেহ নির্দিষ্ট জীবিকা পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এ-সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া তুমি অবশ্য কালের উন্নতি বুঝিতে পারিয়া সন্তোষ লাভ করিতেছ। ব্রহ্মানন্দজির দৃষ্টান্তে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বসু বিষয়কার্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে দণ্ডায়মান হইয়াছেন।"

প্রাচীন বা অনগ্রসর দলকে অগ্রসর করিবার চেষ্টায় এসময় তিনি উদাসীন ছিলেন না এবং তাঁহারাও যে কালের আহ্বান না শুনিয়া উদাসীন হইয়া ছিলেন তাহা নয়। পাকড়াশী মহাশয়, বেচারামবাবু প্রভৃতি তখন প্রচারের কাজে উৎসাহের সঙ্গে লাগিয়াছেন তাহা দেখিতে পাই। তাঁহাদিগকে আরো সামনে ঠেলিয়া দিবার জন্য দেবেন্দ্রনাথের যে প্রাণপণ আগ্রহ, তাহা তাঁহার চিঠিগুলি হইতে বেশ বোঝা যায়। বেচারামবাবুকে এ সময়ে যে চিঠিগুলি লিখিয়াছিলেন তাহার একটা এখানে কতক তুলিয়া দিলেই পাঠকেরা দেখিবেন যে, তাঁহার ভাষার মধ্যেও একটা উত্তেজনা ও ওজস্বিতা দেখা দিয়াছে, যেটা একেবারেই তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নয়। চিঠিখানি এইরূপ— "তুমি ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য তোমার সকল সময় দিবার যে মানস করিয়াছ, ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা যে, তিনি তোমার সেই মানস পূর্ণ করুন।...'কি ভয় লোকভয়ে' সাংসারিক তোমাকে যে যাহা বলুক, তুমি নিন্দাস্তুতিতে সমান থাকিয়া, সত্যকে আশ্রয় করিয়া সত্যের পথে চল।...শত শত ব্রাহ্মেরা তোমাকে প্রীতি-আলিঙ্গন করিতে হস্ত প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছে, তুমি অন্ধকার আগারে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছ বলিয়া তাহারা বিষণ্ণ ও ব্যাকুলিত হইয়া রহিয়াছে। আর কতদিন তুমি আমারদের আশাকে অপূর্ণ রাখিবে। অসুরেরা চতুর্দিকে স্পর্ধা করিয়া বেড়াইতেছে। আমারদের এমন ভারতভূমি রাক্ষসভূমির ন্যায় হইয়া যাইতেছে, আর কতদিনে তুমি অসুরদিগের অত্যাচার হইতে এই ভারতভূমিকে উদ্ধার করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইবে। আর কত কাল, বিলম্ব সহ্য হয় না। উঠ, দণ্ডায়মান হও। তোমার রসনাকে উন্মুক্ত কর। সত্যের জ্যোতিতে চতুর্দিকে উজ্জ্বল কর। সত্যের জয়ে তুমি জয়যুক্ত হও। তোমার মানের অভিলাষ নাই, তোমার প্রভুত্বের অভিলাষ নাই, তুমি কেবল এক প্রীতির ভিখারী...তবে কেন সত্যের সহচর অনুচর হইয়া ব্রাহ্মধর্মের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান না হও, ব্রাহ্মধর্মের প্রাণ না হও। জননী, পিতা, লোক, সুত, বনিতা, কেহ কাহাকেও ধরিয়া রাখিতে পারে না। আর কাম্যকর্ম তোমার কর্ম নহে।

তোমার কর্ম ব্রাহ্মধর্ম প্রচার। এই আমার বাক্য, এই আমার প্রত্যয়, এই আমার বিশ্বাস।"

আমাদের দেশে স্ত্রী-শূদ্র বেদের অধিকার হইতে বঞ্চিত হওয়া অবধি সমাজের মাথা অর্থাৎ উচ্চবর্ণ ও উচ্চশিক্ষিত সাধারণ, সমাজের হৃদয় অর্থাৎ স্ত্রীজাতি এবং সমাজের হাত-পা অর্থাৎ জনসাধারণ সমাজ-দেহের এই তিন অংশ তিন টুকরা হইয়া আছে। মাথা পায় না হৃদয়ের সায়, হৃদয় পায় না মাথার বল এবং মাথার চালনার অভাবে হাত-পা গুলি আর নড়িতে চায় না। এই তিন টুকরার মধ্যে অঙ্গাঙ্গী যোগ স্থাপন ধর্ম-সমাজের এক প্রধান কাজ। যে ধর্ম সমাজমুখীন সেই ধর্মের দ্বারাই এই বিচ্ছেদগুলি দূর হইতে পারে। সমাজ-সংস্কারের যুগে এইটে ছিল তাই ব্রাহ্মদের সামনে প্রধান সমস্যা। ব্রাহ্মধর্ম কি শুধু পুরুষের জন্য, স্ত্রীলোকের জন্য নয়? শুধু শিক্ষিতদের জন্য, অজ্ঞদের জন্য নয়? তা যদি না হয়, তবে বাংলার সমাজ কেমন করিয়া এক অখণ্ড সমাজ হইবে, কেমন করিয়া সমাজ-দেহের শিরায় শিরায় ধর্মের রক্তপ্রবাহ সঞ্চালিত হইয়া দেশের সর্বত্র পৌঁছিবে এবং সমস্ত দেহটাকে বলিষ্ঠ করিয়া তুলিবে? এই সমস্যার কথা চিন্তা করিয়াই বোধ হয় ১৮৬৩ খৃস্টাব্দে নবীন ব্রাহ্মযুবকেরা 'ব্রাহ্মবন্ধুসভা' নামে এক সভা স্থাপন করেন। ঐ বছরের অগ্রহায়ণের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তাহার খবর বাহির হয় এইরূপ: "কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের অধীনে ব্রাহ্মবন্ধুসভা নাম্নী একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কলিকাতার যত সাধুচরিত্র ও কৃতবিদ্য ব্রাহ্ম আছেন অনেকেই ইহার সভ্য…বয়ঃস্থা নারীগণের শিক্ষার্থে সভ্যেরা এক প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, এবং ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারার্থে স্থানে স্থানে প্রচারক প্রেরণ করিতে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন, কিন্তু অর্থাভাবে সম্যক্‌রূপে কৃতকার্য হইতে পারিতেছেন না।… ব্রাহ্মধর্ম প্রচার সম্বন্ধে ব্রাহ্মবন্ধু সভা দ্বারা নিম্নলিখিত উপায়সকল স্থিরীকৃত হইয়াছে—

"১। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ এবং অন্য সকল স্থানস্থ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে বিশেষ যোগ সংস্থাপন করা, যদ্দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম প্রচার কার্য সর্বত্রই এক প্রণালীতে সম্পন্ন হইতে পারে।

"২। স্ত্রীলোকদিগের হিতার্থে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ ও কথোপকথনচ্ছলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করা।

"৩। সাধারণের উপকারার্থে ব্রহ্মবিদ্যালয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা, বক্তৃতা।

লোকদিগের উপকারার্থে সহর এবং পল্লিগ্রামে নির্দিষ্ট স্থানে সরল ভাষায় উপদেশ।

"৪। সময়বিশেষে অবস্থাবিশেষে চিকিৎসালয়স্থ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের শারীরিক সুস্থতা এবং ধর্মোপদেশ ও আত্মার শান্তি সম্পাদনের চেষ্টা পাওয়া।

"৫। ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধীয় বিবিধ গ্রন্থ রচনা করা।"

১৮৬৪ খৃস্টাব্দের বৈশাখে দেবেন্দ্রনাথ এই ব্রাহ্মবন্ধুসভাতে তাঁহার "ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত" পড়েন। তাহা একটি ছোটোখাটো ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত এবং সেই বক্তৃতায় রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে অনেক নূতন খবর প্রথম পাওয়া গিয়াছিল। সেই "পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্তে" তিনি এই ব্রাহ্মবন্ধুসভার উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিতেছেন—"বোম্বাই নগর হইতে ভাওদাজি নামক একজন কৃতবিদ্য এখানকার সমাজে আসিয়া বলিলেন যে, ব্রাহ্মেরা বৌদ্ধের ন্যায় শুষ্ক হইয়া কেবল উপাসনা করে। উপাসনার সময় ব্রাহ্মেরা আর কি করিবে? তাহারা কি ইতস্তত: বেড়াইয়া বেড়াইবে? তিনি বীটন্ সভা দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। ব্রহ্মানন্দ তো কোন অভাব রাখেন না। তিনি মনে করিলেন আমারদেরও বীটন্ সভার ন্যায় একটি সভা চাই। এই মনে করিয়া তিনি এই ব্রাহ্মবন্ধুসভা স্থাপিত করিলেন। এখন বিদেশী কেহ আসিয়া মনে করিতে পারিবেন না যে, আমরা কেবল উপাসনাই করি; এখন জানিতে পারিবেন যে, আমরা চলি বলি এবং আমাদের শরীরে জীবন আছে।"

স্ত্রী-শিক্ষার জন্য এসময়ে নবীন ব্রাহ্মদের খুব উৎসাহ— তাহা তাঁহাদের ধর্মপ্রচারেরই একটা প্রধান অঙ্গের মতো হইয়াছিল। অন্তঃপুরে স্ত্রী-শিক্ষার আয়োজন করিয়া সভা পাঠ্যপুস্তক সব তৈরি করিয়া স্থির করিয়া দিলেন এবং সময়ে সময়ে পরীক্ষা ও পুরস্কারেরও ব্যবস্থা করিলেন। ব্রাহ্মসঙ্গতের সভ্য স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত এই সময়ে স্ত্রীলোকদের জন্য এক মাসিক পত্র বাহির করিয়াছিলেন, তাহা আজ পর্যন্ত চলিতেছে—বামাবোধিনী পত্রিকা[১]। বাস্তবিক ব্রাহ্মবন্ধুসভার কাজের তালিকা দেখিয়া মনে হয় যে, লোকহিতের একটা বিরাট আয়োজনের সংকল্প তখন নবীন ব্রাহ্মদের মনে জাগিয়াছিল। স্ত্রী-শিক্ষা, লোকশিক্ষা, লোকমধ্যে শারীরিক সুস্থতা যাহাতে রক্ষা পায় সেজন্য চেষ্টা— কিছুই তাঁহাদের 'প্রোগ্রাম' হইতে বাদ পড়ে নাই। ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এই জনহিতসাধন

১ প্রকাশ: আগস্ট ১৮৬৩ (ভাদ্র-চৈত্র ১২৭০)। বৈশাখ-চৈত্র ১৩২৯ সংখ্যা পর্যন্ত প্রচারিত হইয়াছিল।

(Social service) যুক্ত হওয়ার জন্য ধর্মের দ্বারা সমাজ এবং সমাজের দ্বারা ধর্ম নূতন প্রাণ পাইতেছিল। শুধু ধর্মচর্চায় মানুষকে একপেশে, কুণো, আত্মসেবী ও কর্মবিমুখ করিয়া দেয়; শুধু সামাজিক সাধনায় মানুষকে তেমনি অস্থির, দোলো, দ্বন্দ্বশীল ও ধ্যান-বিমুখ করিয়া দেয়।

কেন বলা যায় না, এই বছরের অগ্রহায়ণ মাসে সমাজের 'বৈষয়িক' কাজ দেখিবার সম্পাদক-পদ হইতে আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার জায়গায় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। বৈষয়িক বা temporal কাজ হইতেও পুরানো দলের একজন প্রধান ব্যক্তি সরিয়া পড়িলেন—সুতরাং 'বৈষয়িক' ও 'ধর্মসম্বন্ধীয়' ভাগটা ক্রমশ লোপ পাইয়া গেল। অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজ-চর্চের ইতিহাসে মধ্যযুগের অবসান হইয়া বর্তমান যুগের পত্তন হইল। সবই হইল ধর্মসম্বন্ধীয় ব্যাপার—সে কি লোকশিক্ষা, কি স্ত্রী-শিক্ষা, কি সমাজ-সংস্কার, কি অন্য কোনো সামাজিক বা পারিবারিক অনুষ্ঠান। বোধ হয় পুরাণী দলেরা দেখিলেন যে, এঁদের স্রোতে তাঁহারা ভাসিয়া যান। সেই-জন্য তাঁহারা সবাই অন্যান্য কাজ হইতে অবসর লইয়া কেবল উপাচার্যের কাজটুকু, কেবল উপাসনার খোঁটাটুকু, শক্ত করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিলেন। বেচারামবাবু, বেদান্তবাগীশ মহাশয়, ইঁহারা সকলেই উপাচার্য—সেই সমাজের উপাসনা-কুলায়টুকুর মধ্যে তখন তাঁহাদের আশ্রয়। বাহিরে তখন "ফেনহিল্লোল কল-কল্লোলে দুলিছে।"

বাংলাদেশে তখন ৪১টি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে। নিজ কলিকাতাতেই চারিটা ব্রাহ্মসমাজ। উড়িষ্যায় কটকে একটি, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এলাহাবাদ, লখনউ, বেরিলি এবং লাহোরে এক-একটি সমাজ স্থাপিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের তখন এমন বিস্তার, তাহার তখন ভারতবর্ষব্যাপী প্রভাব। এই প্রত্যেকটি ব্রাহ্ম-সমাজের জন্মের ইতিহাসের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতি জড়িত। কোনোটির বা তিনি প্রতিষ্ঠাতা, কোনোটির প্রতিষ্ঠায় তিনি পরামর্শদাতা বা প্রধান সহায় এবং প্রায় প্রত্যেকটি সমাজে তিনি একবারের চেয়ে বেশিবার গিয়াছেন ও আচার্যের কাজ করিয়াছেন। তখন তাঁহার উৎসাহ ও কর্মশক্তির কোনো বিরাম নাই।

নূতন দলের মধ্যে এই প্রচারের কাজে তখন ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সর্বপ্রধান। বাগআঁচড়া হইতে কতকগুলি পরিবার ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের জন্য ব্যগ্র হইয়া দেবেন্দ্রনাথের কাছে খবর পাঠাইলেন। বিজয়কৃষ্ণ সেখানে গেলেন—সেই নিরক্ষর লোকদিগের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিয়া তাহাদিগের মন ভক্তিরসে

এমনি গলাইয়া দিলেন যে, নয়দিনের মধ্যে তেইশটি পরিবার ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলেন। তত্ত্ববোধিনীতে লেখা হইয়াছে যে, বাগআঁচড়া গ্রামে "১৫০টি পরিবারে ব্রাহ্মধর্ম গৃহীত হইয়াছে।" ইহার পরে এই বাগআঁচড়াতে ইস্কুল, ব্রাহ্ম-সমাজ, দাতব্য চিকিৎসালয় সমস্ত তিনি নিজের চেষ্টায় তৈরি করিয়া তোলেন। মেডিক্যাল কালেজের তখন তিনি ছাত্র। প্রচারের জন্য পড়াশুনা ছাড়িয়া সেই বাগআঁচড়ায় গিয়া তিনি বাস করিতে লাগিলেন। প্রভাতে করিতেন চিকিৎসা, দুপুরে ইস্কুলমাস্টারি, রাত্রিতে নৈশবিদ্যালয়ের শিক্ষকতা, ও সপ্তাহে একদিন করিয়া ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা। সেই নিরক্ষর গ্রামটিকে তিনি একা নিজের চেষ্টায় একটা আদর্শ গ্রাম করিয়া তুলিলেন। সেখানকার দোকানীরা দরদস্তুর করা ছাড়িয়া দিল, মামলা মকদ্দমা গ্রাম হইতে উঠিয়া গেল। স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে আমাদের দেশের একটা প্রধান চিন্তার বিষয় হইয়াছে এই যে, কেমন করিয়া নিরক্ষর গ্রাম্য লোকদিগকে শিক্ষা দেওয়া যায়, কেমন করিয়া তাহাদের উন্নতি সাধন করা যায়। এক-একটি গ্রামের হৃদয় জয় করিয়া গ্রামবাসীদের ভিতরেই শিক্ষা ধর্ম নীতি সমস্তই যে কেমন করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, গ্রামের শ্রী কেমন করিয়া ফেরানো যাইতে পারে, গোস্বামী মহাশয়-কর্তৃক এই বাগআঁচড়া গ্রামের উন্নতি সাধনই তাহার হাতে-কলমে দৃষ্টান্ত। তবে এটা ঠিক যে, খুব নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে এই রকমের ধর্মপ্রচারের কাজ ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা খুব বেশি পরিমাণে হয় নাই। ব্রাহ্মসমাজের কাজ সেইজন্যই দেশের মধ্যে প্রাণ পায় নাই।

সেই বাগআঁচড়ার সরল গ্রামবাসীরা একদিন গোস্বামী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করে, "যদি উপবীত রাখা জাতিভেদের চিহ্ন হয়, সুতরাং অন্যায় হয়, তবে ব্রাহ্ম-সমাজের উপাচার্য বেদান্তবাগীশ মহাশয় ও বেচারামবাবুরা উপবীত ছাড়েন নাই কেন ?"

গোস্বামী মহাশয় তখন কেশবচন্দ্রের সঙ্গতের দলের একজন প্রধান। তখন তাঁহারা উগ্র Individualist—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। তখন তাঁহাদের কাছে সমাজ জিনিসটা একটা যন্ত্রের মতো, তাকে যেমনি চালাও, তেমনি চলে। তাহার যে একটা বহুকালের ইতিহাস আছে ; একটা বড়ো সভ্যতার যে তাহা সৃষ্টি এবং যুগে যুগে যে তাহার মধ্যে একটা বিবর্তন-ক্রিয়া লক্ষ করা যাইতেছে, সেই সমস্ত ইতিহাসের ভিতর হইতে তাহাকে না দেখিলে যে তাহার যথার্থ স্বরূপ বুঝা যায় না এবং স্বরূপ না বুঝিলে যে তাহার মধ্যে ঠিকমত সংস্কার সাধন করা যায় না—

এ-সব সমাজতত্ত্বের কথা তখন তাঁহাদের কাছে কোনো আমলই পাইত না। গোস্বামী মহাশয় তাঁহার আত্মবিবরণে লিখিতেছেন যে, তিনি সংকল্প করিলেন, "যদি ব্রাহ্মসমাজে এই কুরীতি সংশোধন না হয় তাহা হইলে যে সমাজে অসত্যের প্রশ্রয় দেয় তাহার সহিত যোগ দিব না।" যেন তাঁর একলার ইচ্ছাতেই সমস্ত সমাজের (এ ক্ষেত্রে একটা সম্প্রদায়ের) পরিবর্তন ঘটিতে হইবে— তিনিই যেন সেই সম্প্রদায়ের একমাত্র ব্যক্তি। এই আমি চাই— যদি তোমরা কর— তবে তোমাদের সঙ্গে আমার যোগ। যদি না কর তবে আমার সঙ্গে তোমাদের যোগ নাই। এমন চালে চলিলে সমাজ-সংস্কার হয় না, সমাজ হইতে বহিষ্কার হয়। ইহাতে নির্ভীকতা যথেষ্ট থাকিতে পারে, কিন্তু উদারতা যথেষ্ট নাই; অন্যের প্রতি অসহিষ্ণুতার ভাবই ইহাতে প্রবল। গোস্বামী মহাশয়ের মধ্যে এই যে ভাব, তাহা তখনকার নূতন দলের সকলেরি মধ্যে কম-বেশি একই রকমের ছিল। কেশবচন্দ্রের মধ্যেও তখন এই ভাব পুরাপুরি প্রবল।

সুতরাং ব্রাহ্মধর্মের প্রচার ও ব্রাহ্মসমাজের বিস্তার যেমন দ্রুতবেগে হইতে লাগিল, ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে দুইদলের বিরোধ তেমনিই দ্রুতবেগে বাড়িয়া যাইতে লাগিল। অনগ্রসর দল ব্রহ্মোপাসনার খোঁটাটুকুকে কোনোমতে আশ্রয় করিয়া তরঙ্গ-তুফান হইতে তফাতে থাকিতেছিলেন, অথচ সেখানেও ঝড় তুফান পৌঁছিবার আয়োজন হইতে লাগিল।

পৃথিবীতে অনেক রকমের লড়াই আছে— কোনো লড়াই দুর্বলের বিরুদ্ধে প্রবলের গায়ের জোরের লড়াই, কোনো লড়াই আত্মরক্ষার লড়াই, আবার কোনো লড়াই 'প্রিন্সিপল্' বা একটা নৈতিক আদর্শকে জয়ী করিবার জন্য লড়াই। মানবসমাজে এই তিন রকমের লড়াই বরাবরই চলিয়াছে— এবং ইহাদের মধ্যে দুর্বলের বিরুদ্ধে সবলের লড়াইকেই চিরকাল সকলে নিন্দা করিয়াছে। কিন্তু যেখানে লড়াই মতের লড়াই, সেখানেও যে দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার আছে, সে কথাটা প্রায়ই ভুলিয়া যাওয়া হয়। ব্যক্তিগত ভাবে কোনো লোকের বা কোনো সমাজের বা রাষ্ট্রের কোনো একটা আদর্শ যদি আর-একটা আদর্শের সংঘাতে টিঁকিতেই পারে না এমন হয়, তখন আত্মরক্ষার জন্য লড়াই চলিতে পারে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যখন তাহার আদর্শকে আর-পাঁচজনের উপর, একটা দেশের সমাজ, ধর্ম বা রাষ্ট্র যখন তাহার আদর্শকে অন্য দেশের সমাজ, ধর্ম বা রাষ্ট্রের উপর জোর করিয়া জবরদস্তি করিয়া চাপাইবার চেষ্টা করে, তখন যে লড়াই বাধে, সে লড়াই সকলের চেয়ে ভীষণ লড়াই। তখন সে মারের মতো

শারীরিক মারও নয়। এই মিশনারি লড়াইকে ঠেকানো শক্ত। এই লড়াইয়ের জন্যই পৃথিবীর দুর্বল ও সৌভাগ্যসম্পদে হীন জাতিগুলিকে ক্রমশ হটিতে হয়—তাহাদের সভ্যতার বিশিষ্ট চেহারা ক্রমশ লুপ্ত হইয়া তাহাদিগকে নকল করিতে প্রবৃত্ত করায় এবং নকল হইতে ক্রমশ মৃত্যু আসিয়া পৃথিবী হইতে তাহাদিগকে সরাইয়া দেয়। সাদার সঙ্গে কালোর লড়াই এই লড়াই, প্রতীচীর সঙ্গে প্রাচীর এই লড়াই, খৃস্টানধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের এই লড়াই।

এমন একটা লড়াই যে আসন্ন, দেবেন্দ্রনাথ তাহা মোটেই বুঝিতে পারেন নাই। তিনি তখন দেখিতেছেন, ব্রাহ্মধর্মের উন্নতি ও ব্রাহ্মসমাজের বিস্তার। তাঁহার এত কালের সাধনা—তত্ত্ববোধিনী সভায় বসিয়া তিনি যে জ্ঞানের বীজ বুনিয়াছেন ও জীবনে এত ঝড় বাদ্‌লা সহিয়াছেন, আজ সেই সাধনা সেই বীজবপন সার্থক। আজ সোনার ফসলে দিক্‌দিগন্ত ছাইয়া গিয়াছে। ১৮৬৪ খৃস্টাব্দে মাঘোৎসবের পর কেশবচন্দ্র যখন প্রচার-যাত্রায় মান্দ্রাজ ও বোম্বাই চলিয়াছেন তখন দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বিদায় দিবার সময় পরম আনন্দের সঙ্গে বক্তৃতায় বলিতেছেন, "প্রথমে এই বঙ্গদেশে এই একমাত্র ব্রাহ্ম-সমাজ ছিল, সমুদায় অরণ্যের মধ্যে এই একটিমাত্র চম্পকবৃক্ষ ছিল··· যেদিন কৃষ্ণনগর হইতে শব্দ আসিল যে, সেই পৌত্তলিকতার দুর্গমধ্যে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার উদ্যোগ হইতেছে, সেদিনের আনন্দ আমি অদ্যাপি বিস্মৃত হই নাই।··· পরে ঢাকাতে, বিক্রমপুরে এই শুভ সমাচার গেল, পরে মেদিনীপুরে। এখন দেখ বঙ্গভূমি ব্রাহ্মধর্মের রত্নভূষণে, ব্রহ্মজ্ঞানের দীপমালায়, দিন দিন কেমন অলঙ্কৃতা হইতেছে।··· তখন একজনের মনে ব্রাহ্মধর্ম প্রকাশ পাইতেছিল, এখন দেখ যত লোকে ইহার অনুচর হইয়াছে, রোগী শীর্ণ হইয়াও বলবান্ বিপথ-গামীকে ব্রাহ্মধর্মের শীতল আশ্রয়ে আনিতেছে, নির্ধন কুটীরবাসী হইয়াও শ্রীসম্পন্ন মহাশীল ধনাঢ্যকে স্বধর্মে অনুরক্ত করিতেছে, পিতা কর্তৃক তাড়িত হইয়াও নিরাশ্রয় যুবা পরম পিতার নিকট প্রার্থনা করিতেছে যে, হে পরম-পিতঃ, আমার পিতার মনকে তোমার দিকে আকর্ষণ কর। কি আনন্দ! কি আনন্দ! চতুর্দিকে তাঁহার গুণগান হইতেছে, তাঁহার নাম কীর্তন হইতেছে। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সকল বিবাদ তিরোহিত হইয়া এইমাত্র উগ্র বিবাদ রহিয়াছে যে, কে অধিক পরিমাণে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে পারে। কেহ বা পরিব্রাজক প্রচারক ভাবে পরিভ্রমণ করিতেছেন, কেহ বা উপদেষ্টা হইয়া আচার্যের আসন গ্রহণ করিয়াছেন। এই স্বর্গীয় ধর্মপ্রচারের জন্য, যার ধন আছে, সে তাহা

অকাতরে অজস্র বিতরণ করিতেছে; যার বিদ্যা বুদ্ধি, তর্কশক্তি, বাক্‌পটুতা আছে, সে লোকদিগের কুসংস্কার-কণ্টক সকল ছেদন করিতেছে, মোহ অন্ধকার নিরাস করিতেছে, তাহাদিগকে বিপথ হইতে সৎপথে আকর্ষণ করিতেছে; যার গান-শক্তি ও স্বরসৌষ্ঠব ও তাল মান বোধ আছে, সে লোকের সরল মনকে বিশুদ্ধ ভক্তি-রসে আর্দ্র করিতেছে। যেখানে যে প্রকার ক্ষেত্র, সত্য প্রচারের জন্যে ব্রাহ্মেরা সেখানে সেইরূপ উপায় অবলম্বন করিতেছেন। বিদ্বানের জন্যে বিদ্বান্ ব্রাহ্ম, কৃষকের জন্যে কৃষক ব্রাহ্ম দণ্ডায়মান হইয়াছেন। এই প্রকারে দেখ, বঙ্গভূমি কেমন উজ্জ্বল পবিত্র বেশ ধারণ করিয়াছে, ব্রহ্ম উপাসনা কেমন ঘরে ঘরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, দেবভাব কেমন পশুভাবকে অতিক্রম করিতেছে। কিন্তু কেবল কি এই বঙ্গদেশে আমারদের সকল ভাব সকল স্নেহ বদ্ধ থাকিবে? ইহা হইতে কি দূরে যাইবে না? প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, অনেকের ভাব বঙ্গদেশ হইতে অন্য প্রদেশে প্রসারিত হইতেছে, বঙ্গদেশে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, ভারতবর্ষময় তাহা ক্রমে বিকীর্ণ হইতেছে। অযোধ্যা ও বেরিলিতে তাহা প্রবেশ করিয়াছে, লাহোরে ও পেশওয়ারে তাহা দীপ্তি পাইতেছে। এই ক্ষণে তাহার সমুদ্র অতিক্রম করিবার উপক্রম দেখিতেছি। আমার প্রিয় সুহৃৎ এই কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য যিনি এইক্ষণে আমার সম্মুখে বিনীত বেশে ভক্তিভাবে ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ হইয়া পরম পুরুষের আরাধনা করিতেছেন, তিনি নানা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সত্যধর্ম প্রচারের জন্য এই মাসের অষ্টাবিংশ দিবসে বোম্বাই নগরে যাত্রা করিবেন। কিন্তু আপনার কিসের জন্যে? শরীরের সুস্থতার জন্যে, কি প্রতিষ্ঠালাভের জন্যে, কি প্রভুত্ব বিস্তারের জন্যে, না পরিবারের সন্তুষ্টির জন্যে? ইহার কিছুরই জন্যে নহে। ঈশ্বর তাঁহার হৃদয়ে যে ব্রহ্মাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছেন, সেই তাঁহাকে সমুদ্রতীরে প্রক্ষেপ করিতেছে। সেখানে যে কি প্রকারে তাহা প্রচার করিবেন, তাহার কিছুই তিনি অবগত নহেন; এই জানিতেছেন যে যাইতেই হইবে।

"হে ব্রাহ্মসকল! তোমরা তোমাদের আচার্যের এই মহদ্দৃষ্টান্তের অনুগামী হও, তিনি যদি স্বীয় দুর্বল শরীর লইয়া পৌত্তলিকতার দুর্গম দুর্গ দ্বারকাধামে ঈশ্বরের জয়স্তম্ভ নিখাত করিতে দণ্ডায়মান হন, তবে তোমরা কি স্বচ্ছন্দ শরীরে বঙ্গভূমিতে স্বীয় গৃহে থাকিয়া তাঁহার পবিত্র রাজ্য বিস্তার করিবে না? যেখানে যেখানে নদীপ্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে, যেখানে যেখানে লৌহবর্ত্ম প্রসারিত হইতেছে সেই সকল স্থানে যাও, সেই মহদ্‌যশের যশঘোষণা কর।"

বিয়োগান্ত নাটকে চরমপরিণামে (Climax) পৌঁছিবার পূর্বে অনেক সময়ে বিরোধের সমস্ত জটিলতাগুলি একেবারে সরল হইয়া আসে—তখন পাঠকের মনে এই আশ্বাস জন্মে যে, পরিণাম নিশ্চয়ই সুখের হইবে। যেমন ঝড় জাগিবার পূর্বে একবার সমস্ত দিক্ ঠাণ্ডা হইয়া যায়; সেই স্তম্ভিত নিরুদ্ধ বায়ুকে তখন মানুষ ভুল করিয়া শান্ত মনে করে, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে তাহার প্রলয় মূর্তি দশ দিক্‌কে সচকিত করিয়া অনাবৃত হইয়া পড়ে। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস-নাট্যের বিচ্ছেদান্ত চরম পরিণাম তেমনি আকস্মিক ভাবে দেখা দিয়াছিল। শরতের মেঘের মতো তার আনন্দের রৌদ্রোজ্জ্বল হাসিটুকু কখন যে মিলাইয়া গিয়া সমস্ত কালো হইয়া উঠিল, তাহা বুঝাই গেল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিচ্ছেদের ইতিহাস

দেবেন্দ্রনাথ সত্যই মনে করিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সকল বিবাদ দূর হইয়াছে। কিন্তু যখন এই কথাই তিনি বলিতেছিলেন, তখনই যে বিবাদ বিচ্ছেদরূপে একেবারে দরজায় আসন্ন, তাহা তিনি জানিতেও পারেন নাই। পুরাতন দল যে মুখ বুজিয়া চুপ করিয়া সব সহ্য করিতেছেন এবং তাঁহারা যে নিতান্ত কোণঠাসা হইয়া আছেন, এটাও তিনি ভালো করিয়া যেন দেখিতেই পান নাই। তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার সর্বদাই দেখাশোনা হইতেছে, ধর্মপ্রচারে তাঁহাদেরও খুবই উৎসাহ। সুতরাং তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, এই প্রচারের উৎসাহে দুই দলের মধ্যে সমস্ত বিরোধ একেবারে ঘুচিয়া গিয়া সকলেই ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্য সমস্ত মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন। নূতন দলের লোকেরা যে প্রাচীন দলকে সমাজের সকল কাজ হইতে একেবারে দূর করিবার সংকল্প করিয়াছেন— তাঁহারা যে মনে করিতেছেন যে, যেহেতু তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পৈতাধারী অতএব তাঁহারা উপাচার্য হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিবার অযোগ্য— এক পক্ষের অন্য পক্ষের সম্বন্ধে এমনতর একটা অনুদারতার ভাব তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই।

এই বিরোধের মূলে ছিলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। তিনি বাগআঁচড়া হইতে কেশবচন্দ্রকে এক চিঠি লিখিলেন, "কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্যগণ যদি উপবীতধারী হন তবে আমি সমাজকে অসত্যের আলয় বলিয়া পরিত্যাগ করিব।" কি আশ্চর্য, যিনি প্রথম বয়সে পৈতাধারী উপাচার্যকে ব্রাহ্মসমাজ হইতে তাড়াইবার জন্য এমন উদ্যত, তিনি শেষ বয়সে পৌত্তলিক অপৌত্তলিক, হিন্দু ব্রাহ্ম, যে যে ধর্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী সে ঠিক পথেই চলিতেছে, এই কথা বলিয়া কোনো ধর্ম বা সমাজের কোনো প্রথাকেই নিন্দা করিলেন না। একেবারে উল্টা প্রণালী ধরিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন, "দেবেন্দ্রবাবু তখন উপবীত ত্যাগ করিয়াছেন। এজন্য তিনিও এই আবেদনে অনুমোদন করিয়া বলিলেন যে, বেদান্তবাগীশ মহাশয় ও বেচারামবাবু কোন ক্রমেই উপবীত ত্যাগ করিবেন না। অতএব দুই জন উপবীতত্যাগী উপাচার্য পাইলেই তাঁহারাই কলিকাতা

ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য হইবেন। ইহা শুনিয়া আসিয়া কেশববাবু আমাকে এবং অন্নদাবাবুকে উপাচার্য হইতে অনুরোধ করিলেন।... পরে বিশেষ দিন ধার্য করিয়া অন্নদাবাবু, পাকড়াশী মহাশয় এবং আমি উপাচার্য হইব বলিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। পাকড়াশী মহাশয় দেবেন্দ্রবাবুর নিকট ব্যক্ত করিলেন যে, তিনি উপবীত ত্যাগ করেন নাই।... যে তত্ত্ববোধিনীতে পাকড়াশী মহাশয়ের নাম ছিল, তাহা দগ্ধ করিয়া পুনর্বার পত্রিকা মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করা হইল।...পরে দেবেন্দ্রবাবু নির্দিষ্ট দিবসে আমাদিগকে উপাচার্যপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।"*

কেশবচন্দ্রের চরিতলেখক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ও উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় দুজনেই গোস্বামী মহাশয়ের উপরে উদ্ধৃত উক্তিটি সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং দেবেন্দ্রনাথ এক সময়ে বিজয়কৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের অনুরোধে পৈতাধারী উপাচার্যদিগকে ছাড়াইয়া দিয়া পৈতাত্যাগী উপাচার্য তাঁহাদের জায়গায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এই কথাটি বিশুদ্ধ তথ্যের মতো ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিবৃত্তগুলিতে চলিয়া গিয়াছে।

অথচ এত বড়ো একটা সংস্কার যে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ঘটিল, তাহার কোনো উল্লেখ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় দেখিতে পাই না। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যাহা-কিছু প্রবর্তন, পরিবর্তন, সংস্কার, বহিষ্কার ও অন্যান্য ঘটনা ঘটিয়াছে, এ পর্যন্ত বরাবর পত্রিকাতে তাহার খবর পাওয়া গিয়াছে। এবার তাহার অন্যথা হইবার কোনো কারণ নাই। শ্রাবণ ১৭৮৬ শকের (১৮৬৪ খৃস্টাব্দের) তত্ত্ব-বোধিনীতে বিজ্ঞাপন বাহির হয় কেবল এইটুকুমাত্র—"আগামী ৬ই ভাদ্র রবিবার প্রাতঃকালে ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণ ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্যপদে অভিষিক্ত হইবেন।" ইহার পরের মাসে ভাদ্রের পত্রিকায় সংবাদের কোঠায় কেবল এই কথার প্রকাশ যে, শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্যপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। অভিষেককালে প্রধান আচার্য তাঁহাদিগকে যে নিয়োগপত্র দিয়াছিলেন তাহা পত্রিকায় উদ্ধার করা হইয়াছে। তার পরে সংবাদের নীচে একটুখানি টিপ্পনি আছে যে, "যাঁহারা কি বাহ্যিক কি আধ্যাত্মিক

* "ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান অবস্থা এবং আমার জীবনে ব্রাহ্মসমাজের পরীক্ষিত বিষয়।" পৃ ১৮-১৯।

সকল প্রকার অনুষ্ঠানেই ব্রাহ্মমণ্ডলীর আদর্শরূপে দণ্ডায়মান হইতে পারেন, যাঁহারা কি জ্ঞানে, কি প্রীতিতে, কি প্রতিজ্ঞায় সকল সময় অটলভাবে ধর্মব্রত পালন করেন তাঁহারাই উপাচার্যপদের উপযুক্ত। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যাঁহারা উন্নত পদান্বিত হইয়া এতদিন স্বীয় স্বীয় অনুষ্ঠানের দোষের প্রতি উপেক্ষা করিতেন তাঁহারা যেন অচিরে চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করেন, কারণ বর্তমান সময়ে জ্ঞান এবং প্রীতি, অনুষ্ঠান এ তিনই না থাকিলে লোকের চিত্তাকর্ষণ বা শ্রদ্ধা গ্রহণ করা যায় না।"

এই টিপ্পনি পড়িয়া এ কথা মনে হয় না যে, উপবীতধারী উপাচার্যদিগকে বিদায় করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কারণ এই টিপ্পনির পুচ্ছদেশে যে হুলটুকু আছে সেটুকু তাঁহাদিগকেই বিঁধিবার জন্য। তাঁহারা উন্নতপদ হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন, ইহা যদি সত্য হয়, তবে ঐ খোঁচাটুকু নিতান্ত বাজে খরচ হইয়াছে বলিতে হইবে। তবু এ সম্বন্ধে জোর করিয়া কোনো কথা বলা যায় না। চিন্তা করিয়া শুধু এই কথাই মনে হয় যে, কেশবচন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি এই ব্যাপারে দেবেন্দ্রনাথের মনের অভিপ্রায়টি কী ছিল তাহা হয়তো বা ঠিকমত না বুঝিয়া একটা গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং নিজেরাও সেই গোলমালের প্যাঁচের মধ্যে পড়িয়াছেন। মনের কোণে একবার ভুলবোঝা জমিলে ভুলবোঝার সেই কোণটা (angle) ক্রমশ বাড়িয়াই যাইতে থাকে ; তাহা আর ঋজু হয় না।

আমি বলিয়াছি যে, ব্রাহ্মসমাজের দুই দলের মধ্যে অনেকদিন হইতে ভিতরে ভিতরে যে বিরোধ জমিয়া উঠিতেছিল, দেবেন্দ্রনাথ ক্ষণে ক্ষণে তাহার আভাস পাইলেও তাহার গুরুত্ব তেমন করিয়া বোঝেন নাই। কখনো দু-এক টুকরা মেঘ দেখা দিয়াছে, দু-একটা দমকা হাওয়া উঠিয়াছে, প্রাচীন বটঅশ্বত্থশাখায় এক-আধটু আর্ত মর্মরধ্বনি শোনা গিয়াছে। এই পর্যন্ত নূতন দলের সঙ্গেই তাঁহার মনের সম্পূর্ণ যোগ, এবং ব্রাহ্মসমাজের সমস্ত ভার তাহাদেরি উপরে তিনি ফেলিয়া দিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রই তখন ব্রাহ্মসমাজের সর্বময় কর্তা। ১৮৬৪ খৃস্টাব্দে, সেই বছরেই সাধারণ সভায় বছরের মতো কর্মচারী যাঁহারা নিযুক্ত হইলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই কেশবচন্দ্রের বন্ধু ও অনুচর। সভাপতি, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত তারকনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী। সম্পাদক— শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন। সহকারী সম্পাদক— শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। ধনাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন। এক পাকড়াশী মহাশয় ছাড়া কর্মচারীদের মধ্যে প্রাচীন দলের একজনও

প্রতিনিধি নাই। অথচ প্রাচীন দলই তখন সংখ্যায় ভারী। নূতন দলের আবেদনের জবাবে দেবেন্দ্রনাথের চিঠি হইতেই জানিতে পারি যে, প্রাচীন দলই সংখ্যায় বেশি এবং নূতন দল সংখ্যায় অল্প। তার পরে ঐ বছরেই ১৮৬৪ খৃস্টাব্দে ভাদ্র মাসে নূতন দলের মধ্যে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ইঁহারা দুইজনে উপাচার্য নিযুক্ত হইলেন। এখন এ কথা যদি সত্য হয় যে, প্রাচীন দলের শেষ আশ্রয় যে উপাচার্য হইয়া উপাসনা করিবার অধিকার তাহাও তাঁহাদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইল তবে তো ব্রাহ্মসমাজে তাঁহাদের কোনোই স্থান রহিল না। এত বড়ো একটা অন্যায় তাঁহাদের উপর জানিয়া শুনিয়া যে দেবেন্দ্রনাথ করিবেন, ইহা কিছুতেই সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

নূতন দলের সঙ্গে সামাজিক বিষয়ে তিনি যে কতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার -রচিত কেশবচন্দ্রের জীবনী পড়িলে বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতাপচন্দ্র স্পষ্টই লিখিয়াছেন, "Even intermarriages had begun to be tolerated according to the ritual of the Brahmo Samaj under the sanction of Debendra Nath"। দেবেন্দ্রনাথের অনুমোদনে ব্রাহ্মবিবাহ পদ্ধতি অনুসারে অসবর্ণ বিবাহ সম্পন্ন হইতেছিল। ১৮৬২ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে, আমরা যে-সময়ের কথা বলিতেছি তাহার দুই বছর পূর্বে প্রথম অসবর্ণ বিবাহ ব্রাহ্মসমাজে সম্পন্ন হয়। আমরা দেখিয়াছি যে, ইহার পরের বছরে ১৮৬৩ খৃস্টাব্দে রাজনারায়ণ বসুকে দেবেন্দ্রনাথ যে চিঠি লিখিয়াছেন তাহাতে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন যে, "ব্রাহ্মণ শূদ্রের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান হইতে পারে।" সুতরাং অসবর্ণ বিবাহ ব্রাহ্মসমাজে চলিতে থাকিল বলিয়া তিনি যে শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন এবং সেই কারণেই যে তাঁহার সঙ্গে কেশবচন্দ্রের ভিতরে ভিতরে মনের অমিল ঘটিল এ কথার কোনো ভিত্তি নাই। ১৮৬৪ খৃস্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ভাদ্রের সংখ্যায় দেখিতে পাই যে, একটি বিধবা মেয়ের পার্বতীচরণ গুপ্ত নামে ভিন্নজাতির একটি যুবকের সহিত বিবাহের খবর প্রকাশিত হইয়াছে।

'আচার্য কেশবচন্দ্রে'র গ্রন্থকার গৌরগোবিন্দ রায় লিখিয়াছেন যে, এই দ্বিতীয় অসবর্ণ বিবাহের ব্যাপারে প্রাচীন ব্রাহ্মেরা কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে দেবেন্দ্রনাথের মনে "বিরাগ উৎপন্ন" করিবার জন্য কলিকাতা হইতে তাঁহার অনুপস্থিতির সময়ে বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছিলেন। "১৯ শ্রাবণ অসবর্ণ বিবাহ

হয়, ৬ ভাদ্র উপবীতত্যাগী উপাচার্যদ্বয় নিযুক্ত হন। এত সংক্ষিপ্ত কালের মধ্যে দুইটি গুরুতর বিষয়ে সংস্করণ কেশবচন্দ্রের প্রতিযোগিগণকে তাঁহার বিরুদ্ধে মহর্ষির মনে সন্দেহ উৎপাদন করিয়া দিবার পক্ষে অবসর দান করিল।…

"যাহা হউক মহর্ষির মন দোলায়মান হইল এবং কেশবচন্দ্র বুঝিতে পারিলেন যে, কলিকাতা সমাজে আর তাঁহার নিরাপদ অবস্থা নহে। তিনি বুঝিতে পারিলেন, অল্প সময়ের মধ্যে প্রধানাচার্যের প্রাচীন বন্ধুগণ প্রবল হইয়া তাঁহাকে এবং তাঁহার বন্ধুগণকে ব্রাহ্মসমাজ হইতে নিষ্কাশিত করিবেন, এ সময় যদি কোন উপায় থাকে, তবে তাহা সমুদায় ব্রাহ্মসমাজের একতা নিবন্ধন করিয়া তাঁহাদিগের পক্ষ সুদৃঢ় করা।…তিনি এইজন্য ১৭৮৬ শকের ১৪ই আশ্বিন (১৮৬৪ খৃস্টাব্দে) নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় দেন।

" 'বিবিধ উপায়ে ব্রাহ্মধর্মপ্রচার ও ভারতবর্ষস্থ সমুদয় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ঐক্য সংস্থাপন উদ্দেশ্যে আগামী ১৫ই কার্তিক রবিবার সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকার সময় কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে ব্রাহ্মদিগের একটি "প্রতিনিধি সভা" প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রতি শাখাব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকদিগের প্রতি নিবেদন যে, তাঁহারা সমাজসংক্রান্ত ব্রাহ্মদিগের অভিমতানুসারে কলিকাতাপ্রবাসী (অথবা নিবাসী) কোন ব্রাহ্মকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া সেই সেই প্রতিনিধির নাম নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইয়া দেন, এবং ঐ দিবসে উক্ত সভায় উপস্থিত থাকিতে উপদেশ প্রদান করেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন,
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক।' "

কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রাচীন দল দেবেন্দ্রনাথের মনে সংশয় জাগাইয়া দিবার জন্য খুব চেষ্টা করিতেছিলেন, এ কথা অবিশ্বাস করিবার আমি কোনো কারণ দেখি না। কারণ ইহা তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। দেবেন্দ্রনাথের সমাজ-সংস্কারের আদর্শ ছিল বার্কের মতো conservative reformএর আদর্শ— সংরক্ষণ করিয়া সংস্কারের আদর্শ। তিনি ব্রাহ্মবন্ধুসভায় "পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্তে" সে আদর্শ পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করিয়া বুঝাইয়াছিলেন। তিনি বলিতেছেন —"হিন্দুধর্ম অতি প্রশস্ত ও উদার ধর্ম— ইহা সকল প্রকার উন্নতি আপনার মধ্যে নিবিষ্ট করিতে পারে। অতএব হিন্দুদিগের হইতে বিচ্ছিন্ন না হইয়া তাহাদের মধ্যে থাকিয়াই ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে হইবে। হিন্দুধর্মকেই উন্নত করিয়া

ব্রাহ্মধর্মে পরিণত করিতে হইবে। হিন্দুদিগের হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে এদেশে ব্রাহ্মধর্মের প্রচার বিষয়ে নিঃসংশয় হইতে পারিবে না। এই কারণেই বৌদ্ধধর্ম এখানে স্থান পায় নাই।... এক সময়ে চৈতন্যের উদয়ে সহসা জাতিভেদ উন্মূলিত হইয়া স্বতন্ত্র বৈষ্ণব সম্প্রদায় স্থাপিত হয়, তাহাতে দেশের কত গুরুতর অমঙ্গল উৎপন্ন হইল; বৈষ্ণব নাম বঙ্গদেশে যেন অধর্মের অন্বর্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য করিয়া কার্য করা উচিত; সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হওয়া উচিত। আমা কর্তৃক দেশের উন্নতি হইবে— এই উৎসাহে লোকাচার দেশাচার উন্মূলন ও বিজাতীয় সভ্যতা আনয়ন করিবার নিমিত্তে সময়ের ব্যবধান সংকোচ করিতে গেলে আমাদের লক্ষ্য সিদ্ধি আরো সুদূরপরাহত হইবে।* ফরাসিস্ বিপ্লবের সময় সহস্র বৎসরে যে লক্ষ্য সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা এক দিনে করিতে গিয়াছিল এই জন্য সময়ের ব্যবধান আরও অধিক হইয়া গেল। ইংলণ্ডে ইহার বিপরীত— সেখানে যে সময় যাহা নহিলে নয়, তাহার জন্য লোকেরা দণ্ডায়মান হয় এবং বিনা বিপ্লবেও তাহা সিদ্ধ হয়। এই হেতু ফরাসিস্ দেশ হইতে ইংলণ্ড অধিক স্বাধীন।" এড্মাণ্ড বার্ক, *Reflections on the French Revolution*এ ঠিক উপরি-উদ্ধৃত ভাবের কথাগুলি বলিয়াছেন। অতএব প্রাচীন দল তাঁহার মনে নিঃসন্দেহ এই সংশয় জাগাইবার চেষ্টা করিলেন যে, নূতন দল হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যপরায়ণ আদর্শের দ্বারা চালিত হইয়া ফরাসিস্ বিপ্লবের মতো একটা হঠকারী গোছের সমাজ-সংস্কার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। সেই কারণেই প্রাচীন দলের সম্বন্ধে তাঁহাদের অবিচার অবজ্ঞা ও অনুদারতা মাত্রা ছাড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে।

আমার তাই মনে হয় যে, দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের মধ্যে প্রকৃতিভেদ ও আদর্শভেদ গোড়ায় তেমন স্পষ্ট না হইলেও ক্রমশ একেবারে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। যতদিন পর্যন্ত এই ভেদটা স্পষ্ট ছিল না, ততদিন পর্যন্তই তাঁহাদের একত্রে কাজ করা সম্ভব হইয়াছিল। এক জনের সামাজিক আদর্শ বার্কের মতো conservative reform— সংরক্ষণ করিয়া সংস্কারের আদর্শ; আর-এক জনের আদর্শ রুশোর মতো radical reform বা revolution— একেবারে আমূল সংস্কার কিংবা বিদ্রোহের আদর্শ— এ দুই কি মিলিতে পারে? একজনের দৃষ্টি প্রধান ভাবে অতীতের দিকে, আর-এক জনের দৃষ্টি প্রধান ভাবে ভবিষ্যতের দিকে। একজনের মধ্যে সমাজচৈতন্য জিনিসটা অত্যন্ত প্রবল, অন্য জনের মধ্যে

* চিহ্নিত রেখা আমার— গ্রন্থকার।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বোধ অত্যন্ত উগ্র। একজনের তাই ভাবনার অন্ত নাই; পদে পদেই তাঁহাকে ভাবিতে হয়, বিচার করিতে হয়, হিসাব করিতে হয়। আর-এক জনের নির্ভাবনার অন্ত নাই, সুবিবেচনাকে তুড়ি মারিয়া উড়াইয়া প্রাণের বিপুল বেগে সামনের দিকে সমস্ত বাধাবন্ধকে ভাঙিয়া চুরিয়া অগ্রসর হওয়াই তাঁহার একমাত্র কাজ। দুজনেই দুই প্রচণ্ড ও প্রবল সমাজশক্তির প্রতিনিধি; দুজনের মিলনে বাস্তবিক দেশের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল ঘটিত।

বিদ্রোহের আদর্শ যাঁর, তাঁর কাছে লোকে ধৈর্য, স্থৈর্য, সুবিবেচনা ও সুহিসাব প্রত্যাশা করিতেই পারে না। বরং এ-সকলের উল্টোটাই পাইবার আশা করিতে পারে। সুতরাং ঘরে-বাইরে এমনিতর লোকের সম্বন্ধে মানুষের অসন্তোষ ও ক্ষোভই জমিয়া উঠে। শুধু ব্রাহ্মসমাজে প্রাচীন দলের লোকেরা যে কেশবচন্দ্রের কর্তৃত্ব সম্বন্ধে অসহিষ্ণু হইয়াছিলেন তাহা নয়। দেবেন্দ্রনাথের পারিবারিক ব্যাপারে কেশবচন্দ্র অনেক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে শুরু করিয়াছিলেন। তাহা লইয়া দেবেন্দ্রনাথের পরিবারের ভিতরেও অসন্তোষ দেখা দিয়াছিল। এই-সব ছোটোখাটো ঘটনাগুলি দেখিতে নিতান্ত সামান্য।—কিন্তু বৃষ্টির ফোঁটা ফোঁটা জল যেমন পাহাড়ের ভিতরে পথ করিয়া বড়ো বড়ো পাথরকেও খসাইয়া ফেলে এবং শৈলস্খলন ঘটায়, তেমনি এই ছোটোখাটো ঘটনাগুলি জমিতে জমিতে এক সময়ে প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত করে। ইতিহাসে আমরা মনে করি শুধু আদর্শভেদেই লড়াই বাধে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ সত্য কথা নয়। বড়ো বড়ো লড়াইয়ের মূলে বড়ো বড়ো ব্যক্তি থাকেন এবং ব্যক্তি থাকিলেই ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রভুত্বলালসা, রাগদ্বেষাদি কারণও থাকে। পারিবারিক কলহ ভিন্ন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের একটা বড়ো কারণ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সেই বড়ো কারণের সঙ্গে এই ছোটো কারণ বেমালুম মিশিয়া আছে দেখা যায়। মানবপ্রকৃতি বলিয়া একটা ব্যাপার সমস্ত বড়ো বড়ো আদর্শের চেয়ে ঢের বেশি প্রত্যক্ষ। সেইজন্য কেশবচন্দ্রের ভক্তেরা যখন দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিচ্ছেদের ইতিহাস লিখিতে বসেন কিংবা কেশবচন্দ্রের বিরোধীরা যখন সাধারণ ব্রাহ্মদিগের তাঁহার সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার ইতিহাস লিখিতে বসেন, তখন এই ব্যক্তিগত মোটা অঙ্কের হিসাবটা বাদ দেওয়া বড়ো শক্ত হয়। সকলেই আদর্শের দোহাই দেন, কিন্তু সেই দোহাই পাড়ার মধ্যেই অন্য সুরের সাড়া এমনি তীব্র হইয়া উঠে যে, বিচ্ছেদ বিরোধ কতটা যে আদর্শের জন্য এবং কতটা যে ব্যক্তিগত কারণে—তাহার চুলচেরা বিচার একেবারে অসম্ভব হয়।

বরং বাইরের লোকের পক্ষে শান্তভাবে বিরোধের বিচার করা সহজ। কারণ তাঁহারা দুই পক্ষেরই শক্তি ও দুর্বলতা, ভালো ও মন্দ সম্যক্‌রূপে দেখিতে পারেন। যেমন দেবেন্দ্রনাথ ব্যক্তিটির সম্বন্ধে কেশবচন্দ্রের বন্ধু ও ভক্তদের যে-সকল মনের খোঁচা লেখনীর ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে, সেগুলিকে আগাগোড়া বাজে ও মিথ্যা বলিয়া মনে করার কোনো হেতু নাই। নিশ্চয়ই তাঁহার প্রকৃতির কোনো-না-কোনো জায়গায় তাঁহারা বাধা বোধ করিয়াছেন, সেই বাধাগুলি মনকে ঘা দিয়াছে ও বিমুখ করিয়াছে। যেমন একটা বাধা— তাঁহার আদব-কায়দা দ্বারা সুরক্ষিত রাশভারী ভাব। এই ভাবটাকে কেহ বা আভিজাত্যের গর্ব, কেহ-বা 'একতন্ত্রপ্রভুত্ব' মনে করিয়া আঘাত পাইয়াছেন। কেন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মানুষ জীবনের নানা সুখ দুঃখ আঘাত, নানা অভিজ্ঞতা, নানা প্রশ্ন ও বেদনা লইয়া সহজেই তাঁহার কাছে আসিতে পারে নাই, তাঁহার নিবিড় সাহচর্য ও সহানুভূতি পায় নাই? কেন এই-সব ভগ্ন, রুগ্‌ণ, পতিত, ক্ষুধিত, তৃষিত, নরনারীর দল কেশবচন্দ্রকেই বন্ধু বলিয়া আঁকড়িয়া ধরিয়াছে, দেবেন্দ্রনাথকে ধরে নাই? এই যে নিজেকে সকলের মধ্যে বিলাইয়া দিবার ভাব, সকলের সব রকমের অভিজ্ঞতাকে নিজের অভিজ্ঞতা করিয়া তুলিবার ভাব— এটি দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে না পাইয়া তাঁহাকে অনেকেই ভুল বুঝিয়াছে। তাঁহার প্রকৃতি যে স্বভাবতই নিঃসঙ্গ ও একক ছিল, সেইটি ঠিকমত ধরিতে না পারিয়া কেহ-বা মনে করিয়াছে তিনি নিজের আভিজাত্যের জন্য অভিমানী (aristocratic), কেহ-বা মনে করিয়াছে তিনি প্রভুত্বপরায়ণ (autocratic)। সেই মনে করার মধ্যেও যে ষোল আনাই ভুল তাহাও বলা যায় না। কিন্তু যেমন করিয়াই বলি, এটা যে একটা বাধা সে বিষয়ে তো কোনো সন্দেহ নাই।

অন্য দিকে কেশবচন্দ্রের প্রকৃতির মধ্যেও এমন অনেক দিক ছিল, যেখানে দেবেন্দ্রনাথ স্বভাবতই বাধা পাইয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে নিজের ছেলের মতো নিজের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন এবং ছেলের মতোই তাঁহাকে স্নেহ করিয়াছেন। কেশবের প্রবল দুর্দম স্বাধীন ব্যক্তিত্ব পারিবারিক কেন, কোনোরকমের বন্ধনকে স্বীকার করিয়া সংযত হইয়া থাকিবার মতো বস্তুই ছিল না। যাহাদের ব্যক্তিত্ব এমনি স্বতন্ত্র ও প্রবল, তাহাদের মনে একটা স্বাভিমান অল্পবয়সে খুবই জাগ্রত থাকে। কেশবচন্দ্রের মধ্যে এই স্বাভিমান জিনিসটা ছিল এ কথা বলিলে তাঁহার প্রতি কোনো অবিচার করা হয় না।

দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ যখন ইংলণ্ডে যান, তখন বিদায়কালে

দেবেন্দ্রনাথ নিজে উপাসনা করিয়া তাঁহাকে কিছু উপদেশ দেন। পুত্রের প্রবাস-যাত্রায় পিতা তাঁহাকে উপদেশ দিতেছেন, ইহার চেয়ে সুন্দর ব্যাপার আর কী হইতে পারে! কিন্তু কেশবচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল তিনি তাঁহাকে উপদেশ দেন। তাহার সুযোগ না ঘটায় তিনি ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হন। সত্যেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের সহপাঠী, বন্ধু ও প্রায় সমবয়স্ক— তাঁহাকে উপদেশ দেবার ইচ্ছাটা কেশবচন্দ্রের পক্ষে খুব স্বাভাবিক ও সংগত ছিল বলা যায় না।

ইহার পর এই বছরেরই আষাঢ় মাসে দেবেন্দ্রনাথের পঞ্চম পুত্র শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দীক্ষার সময় উপস্থিত হইলে দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে বলেন— অমুক দিন জ্যোতির দীক্ষা হইবে, তোমরা সেদিন সকলে উপস্থিত থাকিয়া উপাসনায় যোগ দিয়ো। কেশবচন্দ্র কোনো উত্তর না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, কোনোরকমের আনন্দ প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার একজন সহচর বলিলেন, সেদিন বাগআঁচড়াতে একটা নিমন্ত্রণ আছে, সেদিন তাঁহাদের এখানে দীক্ষার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা সম্ভব হইবে না। কেশব বলিলেন— তাই তো, সেদিন তা হলে এখানে আর আসা হয় না। দেবেন্দ্রনাথ ইহার পর তাঁহাকে একখানা চিঠি লিখিলেন। তাহাতে তিনি লিখিলেন, "জ্যোতির দীক্ষা সম্বন্ধে তোমার কোন উৎসাহ দেখিলাম না কেন? আমাদের এখানকার ক্রিয়া উপেক্ষা করিয়া তুমি বাগআঁচড়ায় যাবে, তারই বা কারণ কি?" চিঠিখানি পাইয়া কেশবচন্দ্র অবশেষে অনুষ্ঠানের সময় উপস্থিত হইলেন। দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"আমি বুঝলুম জ্যোতির দীক্ষা সম্বন্ধে কেশব বাবুর পরামর্শ না নেওয়াতেই তাঁর এই রাগ। আমিও মনে মনে বিরক্ত হলুম। দীক্ষার সময় আমি পাকড়াশীকে আসন গ্রহণ করতে বললুম। কেশব বাবু অত্যন্ত বিষণ্ণ। খাবার সময়ে তাঁরা সদলে অনুপস্থিত।" এই-সব সামান্য ঘটনায় পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদের মেঘ ক্রমশ ঘনাইয়া উঠিতে লাগিল। সেই অবসরে প্রাচীন দলের মধ্যে যাঁহারা কেশববাবুর বিরুদ্ধপক্ষ, তাঁহারা যে কেশববাবু ও তাঁহার সহচরদিগের আদর্শ ও কাজের প্রণালী সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের মনে সংশয় জাগাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন— এটা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক বা আশ্চর্য নয়।

এই ছোটোখাটো খিটিমিটি, কাণাঘুষা কথাবার্তা, এখানে একটু মেঘ সেখানে একটু মেঘ, প্রতিনিধি সভা বলিয়া আত্মরক্ষার জন্য একটা উল্টা হাওয়ার আন্দোলন, এই সমস্তগুলি জমিতে জমিতে আকাশটা ক্রমেই কালো হইয়া আসিল এবং একটা ঝড় যে আসন্ন সেটা দুইপক্ষেই বেশ বুঝিতে পারিলেন।

অবশেষে ঝড় আসিল। কেবল ব্রাহ্মসমাজের আকাশে নয়, বাহিরের আকাশেও। ১৭৮৬ শকের ২১এ আশ্বিনে (১৮৬৪ খৃস্টাব্দে) এমন একটা ভয়ংকর ঝড় কলিকাতার উপর দিয়া বহিয়া গেল যে, বড়ো বড়ো বাড়ি ভূমিসাৎ হইয়া গেল, ব্রাহ্মসমাজের বাড়িও প্রায় পড়পড় অবস্থায় দাঁড়াইল। দেবেন্দ্রনাথ ব্যবস্থা করিলেন যে, যতদিন-না ব্রাহ্মসমাজের বাড়ি মেরামত হইবে, ততদিন তাঁহার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে সাধারণ উপাসনা হইবে। কার্তিক ১৭৮৬ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন বাহির হইল—

"ব্রাহ্মসমাজ গৃহ সংস্কারের প্রয়োজন হইয়াছে। যে অবধি ইহার সংস্কার সম্পন্ন না হয় সেই অবধি এখানে ব্রহ্মোপাসনা স্থগিত থাকিবেক। অতএব সাধারণ সজ্জনকে অবগত করা যাইতেছে, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে প্রতি বুধবারে সায়ংকালে ব্রহ্মোপাসনা হইবেক। যাঁহারা মানস করেন, তথায় যাইয়া উপাসনা করিবেন।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।"

এখানে একটা প্রশ্ন এই যে, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় যখন সম্পাদক বা সহকারী সম্পাদক নন, অধ্যক্ষও নন, এমন-কি উপাচার্যও নন— কারণ তাঁহার ও বেচারামবাবুর স্থানেই গোস্বামী মহাশয় ও অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উপাচার্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন শোনা যায়— তখন এই বিজ্ঞাপন দিবার কী অধিকার তাঁহার আছে? যিনি পদচ্যুত, তিনি উপাসনার বিজ্ঞাপন কেমন করিয়া দিবেন? বেদান্তবাগীশের নামে এই বিজ্ঞাপনটি পৈতাধারী উপাচার্যদিগকে পদচ্যুত করা হয়, ঐ তথাকথিত তথ্যটিকে নির্বিচারে মানিয়া লইবার পক্ষে আর-একটি মহা বাধা।

তার পরের ঘটনা সংশয়কে আরো দৃঢ়তর করে। যদিও সে ঘটনার পাঁচ রকমের বিবরণ পাওয়া যায়। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের এক রকমের বিবরণ, শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের আর-এক রকমের বিবরণ, 'ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত'কার মহাশয়ের তৃতীয় রকমের বিবরণ, আদি ব্রাহ্মসমাজের তরফের চতুর্থ রকমের বিবরণ এবং শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত -প্রণীত দেবেন্দ্রনাথের জীবনীতে "একজন প্রাচীন সুশিক্ষিত, ধার্মিক ও দেবেন্দ্রনাথের সমসাময়িক ব্যক্তির লিখিত ইতিবৃত্ত হইতে" সংগৃহীত পঞ্চম রকমের বিবরণ। হিন্দুস্থানে যে কেন ইতিহাস জিনিসটা তৈরি হয় নাই,

তাহার কারণ ইহা হইতেই বেশ বুঝা যায়। তথ্য এবং কল্পনা এমনি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আমাদের ইতিহাস-ইতিবৃত্তের মধ্যে মিলিয়া যায় যে, তাহাদিগকে পৃথক্ করে সাধ্য কার! যাক, প্রকৃত ঘটনাটা কি তাহা একে একে পাঁচটি বিবরণ পরে পরে সাজাইয়া তার পরে এই পাঁচ রকমের বিবরণের ভিতর হইতে তুলনামূলক প্রণালীর দ্বারা সত্যকে টানিয়া বাহির করিলে তবে বুঝা যাইবে। কাজটি শক্ত, কিন্তু না করিয়া উপায় কি!

১. বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের বিবরণ: "বুধবার অপরাহ্নে দেবেন্দ্র বাবু আমাকে বলিলেন যে, অন্নদা বাবু পীড়িত আছেন আসিতে পারিবেন না, অতএব তুমি ও পাকড়াশী মহাশয় অদ্য বেদীর কার্য কর। এই মর্মে কেশব বাবুকেও একখানি পত্র লিখিলেন। কেশব বাবু উত্তর দিলেন যে, ব্রাহ্মসমাজের পবিত্র বেদীকে পৌত্তলিকতার চিহ্ন দ্বারা আর অপবিত্র করা উচিত নহে। আমি দেখিলাম যে, দেবেন্দ্র বাবু কতকগুলি পৌত্তলিক ব্রাহ্মের পরামর্শে পুনর্বার উপবীতধারী ব্রাহ্মকে উপাচার্য করিয়া ব্রাহ্মসমাজের পবিত্রতা নষ্ট করিতেছেন। সুতরাং আমি ব্রাহ্মসমাজে গমন না করিয়া একটি বন্ধুর বাটীতে উপাসনা করিলাম। কারণ আমি ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইবার পূর্বেই দেবেন্দ্র বাবু পাকড়াশী মহাশয় দ্বারা উপাসনা আরম্ভ করিয়াছিলেন।"*

২. উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়ের বিবরণ:

"এখানে উপবীতত্যাগী উপাচার্যের উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে উপবীতধারী ব্যক্তিগণ উপাচার্যের কার্যারম্ভ করিলেন। এরূপ কেন হইল জিজ্ঞাসিত হওয়াতে তদুত্তর এই প্রদত্ত হইল যে, এ তো আর সমাজগৃহ নহে, এ একজনের বাটীতে উপাসনা। প্রকাশ্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়া উপাসনার দিন নির্দিষ্ট হওয়াতে এ উত্তর বৃথা উত্তর সকলেই বুঝিলেন।"

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বিবরণ:

(ইংরাজী হইতে তর্জমা)—"দেবেন্দ্রনাথের বাড়িতে উপাসনার সময়ে নভেম্বর মাসের এক বুধবারে, নূতন পৈতাত্যাগী উপাচার্য দুইজন পৌছিবার পূর্বেই, যে দুই জন পূর্বেকার উপাচার্য পৈতা ত্যাগ না করার জন্য দেবেন্দ্রনাথের আদেশক্রমেই পদচ্যুত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে বেদীতে বসাইয়া দেওয়া হইল। এ কাজটি যাহাতে অবাধে নির্বাহ হইতে পারে, সেজন্য নির্দিষ্ট সময়ের কয়েক মিনিট পূর্বেই উপাসনা আরম্ভ করা হইয়াছিল। উপাসনাস্থলে পৌছিয়াই

* "ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান অবস্থা এবং আমার জীবনে ব্রাহ্মসমাজের পরীক্ষিত বিষয়।"

কেশব ও তাঁহার বন্ধুগণ এই নিয়ম ভঙ্গ দেখিয়া উপাসনা স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন এবং উত্তেজিত ভাবে ইহার প্রতিবাদ করিলেন। প্রতিবাদের উত্তরে দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, তাঁহার নিজের বাড়িতে যখন উপাসনা হইতেছে তখন তিনি যেমন ইচ্ছা তেমন ব্যবস্থা করিতে পারেন। কেশবের দল জোর করিয়া বলিলেন যে, ইহা ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ উপাসনা, উপাসকমণ্ডলীর সম্মতি অনুসারে কিছু কালের মতো তাঁহার বাড়ীতে উপাসনার স্থান বদল হইয়াছে মাত্র— এখন তাঁহার নিজের সভাপতিত্বে যে-সকল নিয়ম স্থির হইয়াছে তাহা যদি তিনি নিজেই ভঙ্গ করিতে চান তবে ভবিষ্যতে এ রকমের উপাসনায় তাঁহারা কেহ যোগ দিতে পারিবেন না। এইরূপে জোড়াসাঁকোর সমাজ হইতে বিচ্ছেদ শুরু হইল।"

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে প্রতাপবাবুর বিবরণকেই একমাত্র প্রামাণ্য নজির রূপে উদ্ধার করিয়া তাহার সঙ্গে দু-একটা নূতন কথা জুড়িয়া দিয়াছেন এইরূপ :

"কিন্তু যথার্থ বিচ্ছেদ আরো অনেক পরে ঘটিয়াছিল। এই ঘটনার দিনে, কেশবচন্দ্র সেন উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে নিঃশব্দে বসিয়াছিলেন। তাঁহার উৎসাহী বন্ধু, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী দরজায় দাঁড়াইয়া যুবকদলের মধ্যে যাঁহাদিগকে তিনি বলিয়া কহিয়া নিবৃত্ত করিতে পারেন তাঁহাদিগকে সেই উপাসনায় যোগ দান হইতে বিরত করিয়া, তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া একজনের বাড়ির ছাদের উপরে স্বতন্ত্র উপাসনা সম্পন্ন করেন। এটাও এখানে লেখা উচিত যে, পুনঃপ্রতিষ্ঠিত উপাচার্যদের মধ্যে একজন ছিলেন অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, যাঁহার হঠাৎ পদচ্যুতিতে প্রাচীন সভ্যদিগের অভিযোগের কারণ ঘটিয়াছিল।" (ইংরাজী হইতে তর্জমা)।

৩. 'ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত' প্রণেতার বিবরণ :

"সেই স্থানে একদিন হঠাৎ উপবীতধারী পুরাতন উপাচার্যগণ দেবেন্দ্রবাবুর অনুমতি লইয়া বেদী গ্রহণ করাতে নূতন উপাচার্যদ্বয় একেবারে বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং বিপক্ষদিগের চক্রান্ত ও দেবেন্দ্রবাবুর মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন। ঐ দিবস উপাসনার নির্দিষ্ট কালের প্রায় দশ মিনিট পূর্বে কার্য আরম্ভ হয়। নূতন উপাচার্য ও কতিপয় ব্রাহ্ম এই অন্যায় ব্যবহার সন্দর্শন করিয়া আর তথায় প্রবেশ করিলেন না; বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদিগকে বিদায় দিবার জন্যই নির্ধারিত সময়ের পূর্বে পুরাতন উপাচার্যদিগকে বেদীতে বসান

হইয়াছে। অতঃপর তাঁহারা অপর এক স্থানে গমন করিয়া সেদিন উপাসনার কার্য সম্পন্ন করিলেন। এই কার্যটি সমুদায় অগ্রগামী ব্রাহ্মের পক্ষে অপ্রীতিকর হইয়াছিল; কেননা বিজয়বাবু ও অন্নদাবাবুকে উপাচার্য পদে নিয়োগ করিবার সময় প্রধান আচার্য মহাশয় নিয়ম করেন যে, আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ভিন্ন কেহ কলিকাতা সমাজের বেদীতে বসিতে পাইবে না। উক্ত নিয়ম সহসা এইরূপে ভঙ্গ করাতে যুবকেরা আপনাদের ভীমমূর্তি পরিগ্রহ করিলেন।”

৪. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—ফাল্গুন ১৮০৩ শক—ইংরাজী ১৮৮২ খৃস্টাব্দ—(ইংরাজী হইতে বঙ্গানুবাদ): “প্রধান আচার্যের বিরুদ্ধে এক ভিত্তিহীন অভিযোগ।

“সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম. এ. সম্প্রতি ‘নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ’ নামে এক পুস্তিকা প্রকাশিত করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের একটি ক্ষুদ্র ইতিবৃত্ত দিয়া বইটির আরম্ভ। আদি ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তের উপসংহারে তিনি নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিয়াছেন—

“আমাদের ভক্তিভাজন পিতার (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়) নিকট হইতে বিদায় লইবার কালে আমি আমার এই প্রতীতিটিকে কিছুতেই গোপন করিতে পারিতেছি না যে, এক অশুভক্ষণে তিনি সমাজের চিন্তার গতি ও উন্নতির স্রোত রুদ্ধ করিবার জন্য তাঁহার কর্তৃত্ব চালনা করা বিহিত মনে করিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি জীবনেরই প্রবেশপথ বন্ধ করিয়া দিয়া তাঁহার নিজের সমাজকে অবশ্যম্ভাবী বিনাশের দিকে ফেলিয়া দিলেন।”

“ভক্তিভাজন প্রধানাচার্যের বিরুদ্ধে উপরে উদ্ধৃত এই যে অভিযোগ যে, ‘তিনি সমাজের চিন্তার গতি ও উন্নতির স্রোত রুদ্ধ করিবার জন্য তাঁহার কর্তৃত্ব চালনা’ করিয়াছিলেন— তাহা ভিত্তিহীন।…সমাজের সভ্যদিগের স্বাধীনতাকে প্রতিহত করিবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার কর্তৃত্ব কখনও চালনা করেন নাই। ব্রাহ্মসমাজের বিচ্ছেদের ইতিহাসের তথ্যগুলি আলোচনা করিলেই ইহা প্রমাণিত হইবে। কেশববাবু দেবেন্দ্রনাথের কাছে এক আবেদন করেন যে, পৈতাধারী ব্রাহ্মদিগকে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার কাজ করিতে দেওয়া উচিত নয়। এখন কলিকাতা সমাজের কয়েকজন প্রাচীন উপাচার্য পৈতা ত্যাগ করেন নাই। দেবেন্দ্রনাথ বিষম সমস্যার মধ্যে পড়িয়া গেলেন। একদিকে তিনি এবং তাঁহার সমাজ পৈতাধারী উপাচার্যদিগের নিকটে কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ, কারণ তাঁহারা সমাজের সহিত দীর্ঘকাল ধরিয়া যুক্ত এবং ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের জন্য

তাঁহারা অনেক নিগ্রহ সহ্য করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই খাঁটি ব্রাহ্ম; যদিচ তাঁহাদের নিকটতম আত্মীয়দিগকে ক্লেশ দিবার ভয়ে তাঁহারা পৈতা ত্যাগ করেন নাই। এদেশের সমাজসংস্কারকের যে কি ক্লেশকর অবস্থা তাহা বিবেচনা করিলে সেই ভয়টাকে খুব কঠিন ভাবে বিচার করা যায় না। এক দিকে এই—অন্য দিকে আবার দেবেন্দ্রনাথ উৎসাহী কেশবচন্দ্রের সনির্বন্ধ অনুরোধের বিরুদ্ধে কাজ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন—কারণ তিনি কেশবের কাছে অনেক আশা করিতেন। এই সঙ্কটের অবস্থায়, প্রধানাচার্য যে প্রণালী অবলম্বন করিলেন তাহা যে এ অবস্থায় সর্বোত্তম ও সুবিজ্ঞতম এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। তিনি নিয়ম করিলেন যে, ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে প্রতিবারই এক জন উপবীত-ধারী ও এক জন উপবীতত্যাগী ব্রাহ্ম বসিবেন। কেবল যে সমাজের প্রাচীন এবং নবীন সভ্যদিগের প্রতি সম্পূর্ণ সুবিচার করিবার জন্যই তিনি এই উপায় অবলম্বন করিলেন তাহা নয়। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, সমাজের উন্নতিশীল ও রক্ষণশীল দুইপক্ষকেই রক্ষা করিয়া দুই দিকের সামঞ্জস্য বিধান করা। ইহা নিশ্চয় বলা দরকার যে, দেবেন্দ্রনাথ উন্নতিশীল দলকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন যে, কালক্রমে যখন আর সমাজে উপবীতধারী রক্ষণশীল প্রচারক থাকিবে না তখন তাঁহারাই বেদীর সম্পূর্ণ অধিকার পাইবেন। যাহাই হোক, এই প্রস্তাব অনুসারে এক সাপ্তাহিক উপাসনার দিনে দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের তখনকার অন্তরঙ্গ অনুচর পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে একজন পৈতাধারী উপাচার্যের সহিত বেদী গ্রহণ করিতে বলেন। নির্দিষ্ট দিনে দেবেন্দ্রনাথ উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের আগমন এবং তাঁহার অনুরোধপালন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ পৈতাধারী ব্রাহ্মের সহিত বেদী গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া আদিব্রাহ্মসমাজ দালানের সিঁড়ির উপর উঠিয়া রাস্তার লোকের কাছে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পোপের ন্যায় সর্বময় কর্তৃত্বের সম্বন্ধে উত্তেজিত ভাবে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন।··· এইরূপে ব্রাহ্মসমাজের প্রথম বিচ্ছেদ ঘটে।··· প্রত্যেক নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, 'পৈতা প্রশ্ন' বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ যে মীমাংসা স্থির করিয়াছিলেন, তাহাতে এক অতি আশ্চর্য ঔদার্য এবং ব্রাহ্ম-দিগের মধ্যে স্বাধীন চিন্তাকে উন্মুক্ত রাখিবার একান্ত ইচ্ছা—এই দুই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। এবং ইহাও বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, এই প্রশ্নের মীমাংসার সময়ে তিনি সমাজের দুই দলেরই মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন।"

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পুস্তিকার এই সমালোচনাটি ব্রাহ্মসমাজের

প্রথম বিচ্ছেদের ঘটনার একটা বিবরণ। এবং ইহা আদিব্রাহ্মসমাজের তরফের কথা। ইহা যে সময়ে বাহির হয়, সে সময়ে দেবেন্দ্রনাথের ৬৫ বছর বয়স। সুতরাং এ বিবরণ তাঁহার চোখে পড়ে নাই, এ কথা মনে করা শক্ত। ইহা সম্ভবত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের লেখা এবং ইহার তথ্যগুলি দেবেন্দ্রনাথের কাছে পাওয়া। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে প্রতাপচন্দ্রের বিবরণকেই একমাত্র প্রামাণ্য নজির মনে করিয়া তাহাই উদ্ধৃত করিলেন এবং অন্য পক্ষের এই নজিরের উল্লেখমাত্র করিলেন না—ইহা ঐতিহাসিকের পক্ষে সংগত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারি না।

৫. "একজন প্রাচীন, সুশিক্ষিত, ধার্মিক ও দেবেন্দ্রনাথের সমসাময়িক ব্যক্তির লিখিত ইতিবৃত্ত" হইতে গৃহীত বিবরণ: "সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইল। অন্যান্য বুধবাসরে সন্ধ্যার পুর্বেই নব্যব্রাহ্মেরা দেবেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে আসিয়া মিলিত হইতেন এবং অনেকক্ষণ সদালাপের পর ব্রাহ্মসমাজে গমন করিতেন। অদ্য উপাসনা আরম্ভের নিয়মিত সময় পর্যন্ত তাঁহাদের মধ্যে কাহারও দেখা নাই। দেবেন্দ্রবাবু কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া পুরাতন উপাচার্যদিগকে উপাসনাকার্য নির্বাহ করিতে বলিলেন। যখন উপাসনা আরম্ভ হইয়াছে, তখন নব্যদলের কয়েকজন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরে তাঁহারা আর সমাজস্থল পর্যন্ত আইলেন না। দূর হইতে যখন তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, উপাচার্যের স্থান অধিকৃত হইয়াছে অমনি সেই স্থান হইতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং অপর এক স্থানে গিয়া সেদিনকার উপাসনার কার্য সম্পন্ন করিলেন।"

এইবার এই কয়েকটি বিবরণ হইতে প্রকৃত ঘটনাটিকে টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করা যাক। প্রথম বিবরণে পাই, উপাসনার পুর্বে বিকালবেলায় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে দেবেন্দ্রনাথ পাকড়াশী মহাশয়ের সঙ্গে বেদীর কাজ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন ও সেই মর্মে কেশববাবুকেও তখনই চিঠি লিখিয়াছিলেন। সুতরাং কেশববাবু ও বিজয়বাবু পুর্ব হইতেই জানিতেন যে, উপবীতধারী উপাচার্য সেদিনকার উপাসনায় বেদীতে বসিবেন। অথচ গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় ও প্রতাপচন্দ্রের বিবরণ পড়িলে মনে হয় যে, কেশব-বাবু ও তাঁহার বন্ধুরা এ বিষয়ে কিছুই জানিতেন না। তাঁহারা উপাসনাস্থলে আসিয়া দেখেন যে, উপবীতধারী উপাচার্য বেদীতে বসিয়া গেছেন এবং তখন তাঁহারা বিস্মিত, অপমানিত, ক্রুদ্ধ ইত্যাদি।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কেই যখন সেদিনকার বেদী গ্রহণ করিতে

অনুরোধ করা হইয়াছিল এবং উপাসনার পূর্বে অপরাহ্ণেই যখন দেবেন্দ্রনাথ নিজের মুখে তাঁহাকে সে অনুরোধ করেন, এবং কেশববাবুকেও সেই একই সময়ে চিঠি লেখা হয় ও তাঁর চিঠির উত্তরও আসে, তখন এ ক্ষেত্রে গোস্বামী মহাশয়ের চাক্ষুষ প্রমাণ অন্যের শ্রুত প্রমাণের চেয়ে নিশ্চয়ই বলবত্তর। অতএব তিনি ও কেশববাবু আগেভাগেই যখন জানিতেন যে, পৈতাধারী উপাচার্য বেদীতে বসিবেন, তখন কেশববাবুর উপাসনাস্থলে পৌছিয়া বিস্ময়, ক্রোধ, প্রতিবাদ প্রভৃতি বাজে খরচ করার কোনো মানেই থাকে না।

তার পরে পৈতাধারী উপাচার্য বেদী গ্রহণ করিবেন এ কথা পূর্ব হইতেই যখন তাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন ও কেশববাবু তাহার প্রতিবাদও করিয়াছেন, তখন কয়েক মিনিট পূর্বে নির্বিবাদে এই কাজটি সমাধা করিবার মতলবে উপাসনা আরম্ভ করার কোনো প্রয়োজনও দেখা যায় না। সে সম্বন্ধেও আবার প্রত্যেক বিবরণকারের ঘড়ি সেদিন একটু-আধটু বোধ হয় বেঠিক ছিল। কেহ কেহ বলেন, "অব্যবহিত পূর্বে", কেহ বলেন, "few minutes earlier", কেহ বলেন, "প্রায় দশ মিনিট পূর্বে", কেহ বলেন, নূতন দলের জন্য "কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া" তার পরে। যেটা পূর্ব হইতেই স্থির হইয়া আছে এবং যথাস্থানে জানানোও হইয়াছে, তাহার জন্য এত কলকৌশল খাটাইবার প্রয়োজন দেবেন্দ্রনাথের কেন থাকিবে তাহা ভালো বুঝা যায় না। প্রতাপবাবু প্রভৃতি যাহা লিখিয়াছেন তাহা সত্য হইলে, অর্থাৎ কাহাকেও না জানাইয়া গোপনে এই কাজটি সমাধা করিয়া তার পরে সকলকে চমকিত করিবার অভিপ্রায় দেবেন্দ্রনাথের থাকিলে, এই কয়েক মিনিট বা দশমিনিট বা অব্যবহিত পূর্বে উপাসনার কাজ আরম্ভ করার তবু একটা মানে পাওয়া যায়। কিন্তু একেবারে সকলেরি অগোচরে বা গোপনে যখন এ কাজ হয় নাই, তখন ও রকমের কৌশল খাটানোর চেষ্টা কৌশলের একেবারেই অপপ্রয়োগ। আমি একজনকে না জানাইয়া হঠাৎ এমন কোনো কাণ্ড করিতে যাইতেছি যাহাতে তাহার বিলক্ষণ অপ্রতিভ হইবার কথা। আমার সে মতলব সিদ্ধ করিবার উপায় কি আগে হইতে তাহাকে জানানো যে তাহাকে অমুক দিন অমুক সময়ে অপ্রস্তুত করার চেষ্টা হইতেছে? তার পরেও এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। পঞ্চম বিবরণকার বলেন যে, নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে উপাসনা আরম্ভ হয় নাই, বরং নির্দিষ্ট সময়ের পরেই উপাসনা হইয়াছিল।

গোস্বামী মহাশয় অবশ্য লিখিয়াছেন যে, তিনি "ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইবার পূর্বেই দেবেন্দ্রবাবু পাকড়াশী মহাশয় দ্বারা উপাসনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন।"

অথচ তাহার একটু আগেই লিখিয়াছেন, "আমি ব্রাহ্মসমাজে গমন না করিয়া একটি বন্ধুর বাটীতে উপাসনা করিলাম।" এই দ্বিতীয় বাক্যটির দুই রকমের মানে হইতে পারে। প্রথম মানে হইতে পারে, তিনি আদৌ ব্রাহ্মসমাজে সেদিন যান নাই, অন্যত্র গিয়া উপাসনা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় মানে হইতে পারে, তিনি ব্রাহ্মসমাজে গিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানকার উপাসনায় যোগ দেন নাই—সেই অর্থে লিখিয়াছেন, "আমি ব্রাহ্মসমাজে (অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায়) গমন না করিয়া একটি বন্ধুর বাটীতে উপাসনা করিলাম।"

'ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত'কার লিখিয়াছেন যে, পৈতাধারী উপাচার্যদিগকে বেদী গ্রহণ করিতে দেখিয়া "নূতন উপাচার্যদ্বয় একেবারে বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং বিপক্ষদিগের চক্রান্ত ও দেবেন্দ্রবাবুর মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন।" অথচ নূতন উপাচার্যদ্বয়ের মধ্যে অন্নদাবাবু ছিলেন পীড়িত এবং বিজয়বাবু উপস্থিত ছিলেন কিনা সন্দেহের বিষয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহার সঙ্গে তত্ত্ববোধিনীর বিবরণের মিল হয় যে, গোস্বামী মহাশয় সমাজের দরজায় দাঁড়াইয়া যুবকদলকে সেই উপাসনায় যোগদান হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি যদি একেবারেই উপস্থিত ছিলেন না এই কথা সত্য হয়, তবে এ-সকল কথা বাজে গল্প। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন যে, পুনঃপ্রতিষ্ঠিত উপাচার্যদের মধ্যে একজন ছিলেন অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, তাঁহার হঠাৎ পদচ্যুতিতে প্রাচীন সভ্যদিগের অভিযোগের কারণ ঘটিয়াছিল। অথচ গোস্বামী মহাশয়ের বিবরণে দেখা যায় যে, পাকড়াশী মহাশয়ের উপাচার্য হইবার কথা ছিল বটে—বিজ্ঞাপনও দেওয়া হইয়াছিল—কিন্তু তিনি পৈতা ত্যাগ করেন নাই বলিয়া উপাচার্য হন নাই!

এই-সমস্ত বিবরণগুলি ছাঁকিয়া এইটুকু মাত্র তথ্য তলায় থিতাইয়া দাঁড়ায় যে, পৈতাধারী উপাচার্যগণ সেদিনকার উপাসনায় বেদীতে বসার দরুন নূতন দল বিশেষ অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা অনেকে উপাসনায় যোগ দেন নাই। তাঁহাদের এ ধারণাও হইয়াছিল যে, দেবেন্দ্রনাথ পৈতাধারী উপাচার্যদিগকে আর বেদীতে বসিতে দিবেন না বলিয়াই দুই জন নূতন উপাচার্য নিযুক্ত করেন, কারণ এ পর্যন্ত তাঁহারাই সমাজের উপাসনার কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। এখন হঠাৎ দেবেন্দ্রনাথ নিজের নিয়ম নিজেই ভঙ্গ করিয়াছেন। কিন্তু নূতন উপাচার্য নিযুক্ত করিবার সময়ে পুরাতন উপাচার্যদিগকে যে পদচ্যুত করা হইয়াছিল এবং এই বিশেষ "নিয়ম" করা হইয়াছিল যে পৈতাত্যাগী উপাচার্য

ভিন্ন ভবিষ্যতে কেহ বেদীতে বসিতে পাইবেন না, এ কথার কোনো বিশেষ প্রমাণ নাই তাহা পূর্বেই দেখাইয়াছি। এ সম্বন্ধে সন্দেহ করা যাইতে পারে অথচ জোর করিয়া অস্বীকারও করা যায় না। তবু এই কথা মনে হয় যে, সেই সময় হইতে কেশববাবুদের মনে বোধ হয় একটা ভুল ধারণা চলিয়া আসিতেছিল। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাদের আবেদন স্বীকার করিয়া পৈতাত্যাগী উপাচার্য দুইজন নিযুক্ত করার জন্য তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, পৈতাধারী উপাচার্যদিগের স্থানেই এই দুই জন পৈতাত্যাগী উপাচার্য নিযুক্ত করা হইয়াছে। চতুর্থ সংখ্যক বিবরণ অর্থাৎ তত্ত্ববোধিনীর বিবরণ পড়িলে বেশ মনে হয় যে, তিনি কেশববাবু প্রভৃতিকে এ আশ্বাসও দিয়াছিলেন যে কালক্রমে সমাজে পৈতাত্যাগী উপাচার্যই উপাসনার কাজ করিবেন। সুতরাং তাঁহারা এটা একটা 'অলিখিত নিয়মের' মতো ধরিয়া লইয়াছিলেন। লিখিত নিয়ম যে কিছু নাই তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে—লিখিত নিয়ম থাকিলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেই তাহা দেখা যাইত। এবং শুধু কলিকাতা সমাজে নয়, মফঃস্বলে ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য শাখায় সেই নিয়ম প্রচলিত হইত। ৬ই ভাদ্র নূতন উপাচার্য দুই জন নিযুক্ত হন, আর কার্তিক মাসে এই ঘটনাটি ঘটে—দুইটি ঘটনার মধ্যে দুই মাসের কিছু বেশি ব্যবধান। এই দুই মাসের মধ্যে বড়ো জোর আট বুধবার উপাসনা হইয়াছে। সেই আটটি বুধবারেই নূতন উপাচার্যেরা বেদীর কাজ করিয়াছেন, পুরাতন উপাচার্যেরা করেন নাই। তাহার কারণ বেশ বোঝা যায়। দুই দলের মধ্যে একটা মন-কষাকষি চলিতেছিল। প্রাচীন দল তাঁহাদের তরফের অভিযোগ দেবেন্দ্রনাথের কাছে উপস্থিত করিতে-ছিলেন এবং তিনিও তাহার একটা সহজ পূরণের উপায় খুঁজিতেছিলেন। হঠাৎ দুই দলের এক সঙ্গে মেলা শক্ত ছিল। বিশেষত প্রাচীন দলের লোকদের সমাজসংক্রান্ত সকল বিষয়েই কিছুই অধিকার ছিল না বলিলেই হয়। সমাজের সমস্ত ভার কেশবচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুদের উপরে। তাঁহারাই সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক, আচার্য, উপাচার্য, অধ্যক্ষ, সমস্তই। সেইজন্য বোধ হয় দেবেন্দ্রনাথ মনে করিয়াছিলেন যে, সমাজবাড়ি সংস্কারের জন্য যখন তাঁহার বাড়িতে উপাসনার ব্যবস্থা স্থির হইল, তখন সেইখানে দুই দলকে মিলাইতে পারিবেন। কার্তিকের পত্রিকাতে সেই কারণেই বোধ হয় আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের নামে উপাসনার বিজ্ঞাপন বাহির হয়। তার পরে দেবেন্দ্রনাথ বিজয়কৃষ্ণকে পাকড়াশী মহাশয়ের সহিত বেদীর কাজ করিতে অনুরোধ করেন। পাকড়াশী মহাশয় সম্বন্ধে গোস্বামী মহাশয় নিজে লিখিয়াছেন, "পাকড়াশী মহাশয়ের সাধু ব্যবহারে তৎকালে

সকলেরই মন আকৃষ্ট হইয়াছিল।" সুতরাং বিজয়কৃষ্ণের যে তাঁহার সঙ্গে বেদীতে বসিয়া উপাসনা করিতে এতদূর পর্যন্ত আপত্তি হইবে, ইহা বুঝিতে পারিলে দেবেন্দ্রনাথ কখনোই তাঁহাকে এমন অনুরোধ করিতেন না। তাঁহার অভিপ্রায় বেশ বুঝা যায় যে একজন পৈতাত্যাগী ও একজন পৈতাধারী দুই দলের দুইজন উপাচার্য একত্রে মিলিয়া বেদী গ্রহণ করেন ও উপাসনা করেন। পৈতাত্যাগী উপাচার্যদিগকে "বিদায় দিবার জন্যই নির্ধারিত সময়ের পূর্বে পুরাতন উপাচার্যদিগকে বেদীতে বসানো" তাঁহার "মনোগত অভিপ্রায়" কখনোই ছিল না। বিজয়কৃষ্ণকে যে তিনি বেদীতে বসিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং সে অনুরোধ যে তিনি রক্ষা করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, এ-সকল কথা নূতন দলের অনেকেই হয়তো জানিতেন না। এই কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া পৈতাধারী উপাচার্যগণ বেদীতে বসেন নাই দেখিয়া তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন যে তাঁহাদিগকে আর বেদীতে বসিতে দেওয়া হইবে না। হঠাৎ প্রাচীন দলের দুই জন উপাচার্যই বেদী গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া তাঁহারা মহা গোলযোগ শুরু করিয়া দিলেন। দেবেন্দ্রনাথও তাঁহাদের অনুদারতার এই পরাকাষ্ঠা দেখিয়া যারপরনাই ক্ষুব্ধ ও নিজেকে অপমানিত বোধ করিলেন। কারণ তাঁহাদের এই ব্যাপার যে প্রাচীন দলের প্রতি প্রকাশ্য অপমান, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই। নূতন দল ভাবিলেন যে পৈতা রাখাটাই পৌত্তলিকতা; অতএব তাঁহারা একটা ধর্মনৈতিক 'প্রিন্সিপ্‌লের' জন্য লড়িতেছেন। দেবেন্দ্রনাথ পৈতা রাখাটাকে ধর্মব্যাপারের সঙ্গে তেমন করিয়া জড়ান নাই। সুতরাং সে সম্বন্ধে এই ঝগড়ার মূল তিনি মনে করিলেন—নূতন দলের প্রাচীন দল সম্বন্ধে ঔদার্যের একান্ত অভাব এবং সামাজিক ব্যাপারে তাঁহাদের একাধিপত্য লাভের ইচ্ছা।

১৫ই কার্তিক প্রতিনিধি সভার প্রথম অধিবেশন বসে এবং দেবেন্দ্রনাথকে সেই সভার সভাপতি নির্বাচন করা হয়। 'প্রতিনিধি সভা'র ভিতরকার উদ্দেশ্য কী ছিল তাহা উপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত 'আচার্য কেশবচন্দ্র' বইটিতেই খোলসা করিয়া বলা হইয়াছে। উপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "প্রতিনিধি সভা নির্বিবাদে স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু এটি একটি বিশেষ আয়োজন বলিয়া উহা মহর্ষির মনের সংশয় সুদৃঢ় করিল।" ইতিমধ্যে ঐ মাসেই 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকা বাহির হয় "তদ্দ্বারা উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ আপনাদের স্বাধীন ধর্মমত প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন।"*

* ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত

"ইহার কিছু দিন পূর্বে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' 'ব্রাহ্মসমাজ' শিরোনামা দিয়া ব্রাহ্মদিগের কপট ব্যবহারের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব লিখিত হয়, তাহাতে অনেকে চটিয়া যান।"* এই-সকল ব্যাপার হইতে বেশ বোঝা যায় যে দুই দলের মধ্যে বনিবনাও হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই, ইহা দেবেন্দ্রনাথ পরিষ্কার দেখিতে পাইলেন। সুতরাং সামাজিক উপাসনার ভার কেশবচন্দ্র প্রভৃতি নূতন দলের হাতে রাখিলে বিরোধ ক্রমশই বাড়িয়া যাইবে এবং অশান্তি ক্রমশই জমিয়া উঠিবে ইহা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিয়া তিনি ব্রাহ্মসমাজে উপাসনাগৃহের ট্রষ্টি হিসাবে উপাসনাব্যাপারের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ও ব্যবস্থার ভার নিজের হাতে লইলেন। এ সম্বন্ধে পৌষের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় দুইটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইল। যথা—

"কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের কার্যের ভার তাহার ট্রষ্টি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় স্বয়ং গ্রহণ করাতে তৎসংক্রান্ত সম্পত্তির সহিত আমারদের সম্বন্ধ অদ্যাবধি শেষ হইল।

শ্রীতারকনাথ দত্ত।
শ্রীউমানাথ গুপ্ত,
অধ্যক্ষ।
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন,
সম্পাদক।

১লা পৌষ, ১৭৮৬ শক।

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার,
সহকারী সম্পাদক।"

"কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টডিড্ অনুযায়ী উপাসনা কার্য সম্পাদনের জন্যে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তাহার সম্পাদকীয় কার্যে নিযুক্ত করা গেল এবং যাবতীয় ট্রষ্ট সম্পত্তি তাঁহার হস্তে অর্পিত হইল।"

"কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের সহায়তার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয়কে সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করিলাম।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টি।"

কলিকাতা সমাজের ব্যবস্থার এই হঠাৎ বদল সম্বন্ধে 'ইংলিশম্যান' পত্র প্রশ্ন

* ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত।

করিয়া এক লম্বা প্রবন্ধ বাহির করেন। তাহার জবাবে কেশবচন্দ্র নিজে ১লা ফেব্রুয়ারি ১৮৬৫ খৃস্টাব্দের মিররে যাহা লেখেন তাহা এখানে তুলিয়া দেওয়া দরকার। তিনি লিখিতেছেন— "তত্ত্ববোধিনী সভা ভঙ্গ হইবার পর কলিকাতার ব্রাহ্ম সাধারণ কর্তৃক অর্থাৎ বৎসরে বৎসরে সাধারণ সভার যে-সকল অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইতেন তাঁহাদিগের কর্তৃক ব্রাহ্মসমাজের কার্য নির্বাহ হইত। গত ছয় বৎসর যাবৎ এইরূপে কার্য চলিয়া আসিতেছে এবং এই সময়ের মধ্যে সকলেই এই বুঝিয়াছেন যে, কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, এবং উপাসনাস্থান স্থানীয় ব্রাহ্মগণের সহিত সম্বদ্ধ এবং উহার কর্মচারিগণ তাঁহাদিগের প্রতিনিধি। যদিও ট্রাষ্টিগণের হস্তে সম্পত্তি ন্যস্ত ছিল, তথাপি উহার কার্য সাধারণের নিযুক্ত কর্মচারিগণ কর্তৃক নির্বাহ হইত এবং উহার ব্যয় সাধারণের টাকায় হইত। বস্তুত ইহার সমগ্র ভাণ্ডার এবং সম্পত্তি, ইহার বৈষয়িক এবং আধ্যাত্মিক কার্য সমুদায়ই সাধারণের নির্বাহাধীন ছিল। বর্তমানে প্রধান সভাগণের মধ্যে কোন বিষয়ে ভাবান্তর উপস্থিত হওয়াতে ট্রাষ্টিগণ কোন বিজ্ঞাপন না দিয়া হঠাৎ সমাজের সমুদায় সম্পত্তি ও ধন নিজ হস্তে লইয়াছেন এবং ব্রাহ্মসাধারণ নিযুক্ত কার্যনির্বাহক সভাকে অস্বীকার করিয়া সাধারণের কার্যনির্বাহকতার প্রতিবাদ করিয়াছেন।...

"সহব্যবস্থান সম্বন্ধে এইরূপে মীমাংসা হইতে পারে— সমাজকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হউক, এক বিভাগে ট্রাষ্টিগণ উপাসনাব্যয়নির্বাহার্থ যে বিশেষ দান পাইবেন তদ্দ্বারা ট্রাষ্ট সম্পত্তির কার্য নির্বাহ করিবেন, আর এক বিভাগে ব্রাহ্মগণের সভা ধর্মবিস্তারের জন্য যে অর্থ সংগৃহীত হইবে সেই অর্থ প্রকাশ্যে মনোনীত কর্মচারিগণ দ্বারা তৎকার্যে ব্যয়, এবং ইহার সমুদায় কার্য নির্বাহ করাইবেন। এইরূপে দুই বিভাগ নিজ নিজ অর্থ ও কার্য নির্বাহ সম্বন্ধে পৃথক থাকিবে।"*

কেশবচন্দ্র প্রভৃতির প্রধান অভিযোগ এই যে, 'ব্রাহ্মসাধারণ' কলিকাতা সমাজের কার্যনির্বাহক সভার যে-সকল সভ্য নির্বাচন করিয়াছেন, তাহাদিগকে হঠাৎ বিদায় করিয়া দেওয়ার দ্বারা দেবেন্দ্রনাথ সেই 'ব্রাহ্মসাধারণের' মতামতকেই একেবারে অগ্রাহ্য করিয়াছেন এবং নিজেকেই সমাজের একমাত্র প্রভু করিয়া তুলিয়াছেন। সাদা কথায়, দেবেন্দ্রনাথ ট্রস্ট সম্পত্তির মালেক বলিয়া নিজেকে

* আচার্য কেশবচন্দ্র, মধ্য-বিবরণ, প্রথম অংশ, পৃ ৭

ব্রাহ্মসমাজ বা ব্রাহ্ম উপাসকমণ্ডলীরও মালেক মনে করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রচলিত 'কন্‌স্‌টিট্যুশন' বা প্রতিষ্ঠানের বিধিব্যবস্থাদি তাঁহার একলার উল্টাইয়া দিবার ক্ষমতা আছে এই কথা ভাবিয়া কেশবচন্দ্র প্রভৃতিকে পদচ্যুত করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের বিধিব্যবস্থায় কোনো বদল করিতে হইলে তিনি ব্রাহ্ম সাধারণ সভার সাহায্যে সে-সকল বদল কেন করিলেন না? ব্রাহ্মসমাজকে নিজের বিষয় সম্পত্তির মতো মনে করিয়া তাহার উপর নিজের শাসন জারি করিতে গেলেন কেন? এতদিন পর্যন্ত কি ট্রস্টসম্পত্তি ব্রাহ্মসাধারণের 'নির্বাহাধীন' ছিল না?

এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এ অভিযোগ খুব গুরুতর অভিযোগ। দেবেন্দ্রনাথের তরফে ইহার উত্তরে কী বলিবার আছে তাহা ভালো করিয়া খোলসা করিয়া না যাচাই করিয়া কেবল "তিনি সমাজরক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন" এবং "বাধ্য হইয়া তাঁহাকে এই ট্রস্টির ন্যায্য অধিকারের সাহায্য লইতে হইল"— এই কথা বলিলে তাঁহাকে অভিযোগ হইতে মুক্ত করা যায় না। তিনি যে উপায় অবলম্বন করিলেন, তাহা ভিন্ন আর কোনো উপায়ে বিরোধের সমাধান সম্ভব ছিল কি না, তাহা ভালো করিয়া আলোচনা করিয়া দেখা দরকার।

১৭৮৩ শকের ২৭এ চৈত্রে অর্থাৎ ১৮৬২ খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকে "ব্রাহ্ম-সমাজের সাধারণ সভায়" দেবেন্দ্রনাথকে ব্রাহ্মরা "ব্রাহ্মসমাজপতি ও প্রধান আচার্য" এই উপাধি দিয়া ধর্মবিষয়ে সমস্ত কাজের ভার তাঁহার উপর ফেলিয়া দেন। পূর্ব পরিচ্ছেদের গোড়ায় আমরা ইহা দেখিয়া আসিয়াছি। ব্রাহ্মসমাজপতির সাহায্যের জন্য এক ব্যবস্থাপক সভা ছিল বটে, কিন্তু সেই সভার "কার্যনির্বাহের নিয়ম সকল প্রস্তুত করিবার ভার সমাজপতির উপর অর্পিত হইল।" এবং "উপাচার্য ও অধ্যায়ক নিযুক্ত করিবার ভার সমাজপতির উপর অর্পিত হইল।"

এই সমাজপতির কর্তৃত্ব ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভা নিয়মের দ্বারা স্থির করিয়া দিয়াছিলেন এবং স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা তো প্রত্যক্ষ। দেবেন্দ্রনাথের এই কর্তৃত্বটি না থাকিলে নূতন দলের পক্ষে ব্রাহ্মসমাজে ক্রমে ক্রমে আচার্য উপাচার্য অধ্যক্ষ সম্পাদক প্রভৃতি শক্তি ও অধিকার লাভ করা যে নিতান্ত দুঃসাধ্য হইত, তাহা বেশ বোঝা যায়। যতদিন পর্যন্ত নূতন দলের সঙ্গে তাঁহার সম্পূর্ণ মনের যোগ ছিল, ততদিন পর্যন্ত এই কর্তৃত্বটা যে তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে, তাহা নূতন দলের কেহই ভালো করিয়া যেন বুঝিতেই পারেন

নাই। একটু-আধটু যাহা বুঝিয়াছেন তাহা প্রাচীন সভ্যেরাই— কারণ নূতন দলের প্ররোচনায় দেবেন্দ্রনাথ যে সকল কাজ করিয়াছেন, তাহা সব সময়ে তাঁহাদের মনের মতো হয় নাই।

সমস্ত 'ব্রাহ্মসাধারণ'কে দেবেন্দ্রনাথ অগ্রাহ্য করিয়া নিজের অদ্বিতীয় ক্ষমতাকে প্রকাশ করিলেন ইত্যাদি অভিযোগের উত্তর দেওয়ার পূর্বে দেখা যাক 'ব্রাহ্মসাধারণ' বলিতে কি বুঝায়। ব্রাহ্মসাধারণ বলিতে কি কেশবচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুবর্গকেই বুঝায়, না, কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজেব সমস্ত সভ্যদিগকে বুঝায়? কাহারা সংখ্যায় বেশি? ইহার পরে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-প্রণালী পরিবর্তন করিবার জন্য এক আবেদন যখন কেশবচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুরা দেবেন্দ্রনাথকে পাঠান তখন সেই আবেদনের উত্তরে তিনি যে চিঠি লেখেন তাহাতে তিনি স্পষ্ট করিয়া লেখেন—"তোমরা যে কয়েকটি ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান অবস্থাতে অসন্তুষ্ট হইয়াছ, সেই অতি অল্পসংখ্যক কয়েকটিকেই সাধারণ ব্রাহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিতেছ, বাস্তবিক তোমাদের সহিত মিলিত হন নাই এমন এত ব্রাহ্ম রহিয়াছেন যে, তাঁহাদের সংখ্যা তোমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক।" এই চিঠিই প্রমাণ যে ব্রাহ্মসাধারণের মধ্যে বহুসংখ্যক ছিলেন প্রাচীন দল এবং অল্পসংখ্যক ছিলেন নূতন দলের ব্রাহ্মবা।

কিন্তু কথা এই যে, ব্রাহ্মসমাজপতি হিসাবে তো দেবেন্দ্রনাথ কোনো শাসন জারি করেন নাই, ট্রাস্টি হিসাবে করিয়াছেন। তাহার কারণ ব্রাহ্মসমাজপতির যে শক্তি ও অধিকার ব্রাহ্মসাধারণ সভা স্থির করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা সভার কর্মচারীরা নিজেবাই অস্বীকার ও অমান্য করিয়াছেন। "উপাচার্য ও অধ্যায়ক নিযুক্ত করিবার ভার সমাজপতির উপর অর্পিত হইল।" এ ভাবে ব্যবস্থাপক সভার সম্মতি বা অসম্মতির কোনো কথাই ছিল না— এ একেবারে তাঁর নিজের কর্তৃত্বাধীন। এই নিয়ম অনুসারেই তিনি বিজয়কৃষ্ণ ও অন্নদাপ্রসাদকে সমাজের উপাচার্য নিযুক্ত করেন এবং এই নিয়ম অনুসারেই তিনি নিজের বাড়িতে যখন সমাজের উপাসনার ব্যবস্থা হয়, তখন পাকড়াশী মহাশয়কে বেদীতে বসিতে বলেন। সেই উপাসনায় নূতন দলেরা যখন অনেকেই যোগ দেন নাই এবং কেশবচন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি উপবীতধারী উপাচার্যেরা সমাজের উপাসনা করেন বলিয়া প্রবল আপত্তি ও প্রতিবাদ উপস্থিত করেন, তখন দেবেন্দ্রনাথের অধিকার তাঁহারা অমান্য করিয়াছেন ইহা বলিতেই হইবে। বিজয়কৃষ্ণ ও অন্নদাপ্রসাদকে যখন উপাচার্য করা হয়, তখন প্রাচীন 'ব্রাহ্মসাধারণে'রা আপত্তি

করেন নাই ? তাঁহারা তার পর হইতে যে বেদীতে বসিতে পান নাই, ইহা তাঁহাদের উপর জুলুম নয় ?

ব্রাহ্মসমাজপতিকে ব্রাহ্মসাধারণ যে অধিকার দিয়াছিলেন, নূতন দল সেই অধিকারকেই অস্বীকার করিয়াছেন এবং প্রকাশ্যে অবমাননা করিয়াছেন। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজপতি হিসাবে সমাজের দুই দলের বিরোধ মিটাইবার চেষ্টা করা দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হইয়াছিল। নূতন দল প্রাচীন দলকে এতটুকু রেয়াৎ করিয়া বা খাতির করিয়া চলিতে রাজি নন। সুতরাং সমাজের বেশির ভাগ প্রাচীন সভ্যদের পক্ষ সমর্থন করিয়া সমাজে তাঁহাদের ন্যায্য অধিকার দিতে গেলে প্রচলিত ব্যবস্থার যে নড়চড় করিতে হয়, তাহা সমাজপতি হিসাবে করার আর যখন উপায় নাই, তখন ট্রাস্টি হিসাবেই করিতে হইবে। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। রামমোহন রায়ের সময়ে ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মদল তৈরি হয় নাই, তখন সকল ধর্মের লোকেরই সমাজের উপর অধিকার ছিল ; তার পরে তত্ত্ববোধিনী সভার আমলে দীক্ষিত ব্রাহ্মদলের হাতেই ব্রাহ্মসমাজ গেল ; সুতরাং রামমোহন রায়ের ট্রস্টডিড্ অনুসারে তাঁহার সমাজের সঙ্গে ব্রাহ্মসাধারণকে এক করিয়া ফেলিবার কোনো কারণ নাই— কেশবচন্দ্র এই-সকল যুক্তি দেখাইয়া ব্রাহ্মসমাজের ট্রাস্টিহিসাবে দেবেন্দ্রনাথের সমস্ত সমাজের ভার গ্রহণ করার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি একটি কথা বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, রামমোহন রায়ের ট্রস্টডিড্ অনুসারে পৈতাধারী ব্রাহ্মরা সমাজে উপাসনার কাজ করিতে পারিবেন না— এমন অনুদার ব্যবস্থা ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-মন্দিরে কখনোই দাঁড় করানো যায় না। 'ব্রাহ্মসাধারণের' উপাসনার প্রশস্ত অধিকার যাহাতে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাগৃহে সংকুচিত না হয়, সেইজন্যই তো ব্রাহ্মসমাজের ট্রাস্টির নিজের শক্তিপ্রয়োগের দরকার হইয়াছিল। মনে রাখিতে হইবে যে, কেবলমাত্র উপাসনার অধিকার সমগ্র ব্রাহ্মসাধারণকে দিবার জন্যই উপাসনাগৃহের ট্রাস্টি দেবেন্দ্রনাথ নিজের ট্রস্ট অধিকার প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র প্রভৃতি সেই অধিকার সংকোচ করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়াই ট্রস্টডিড্ তাঁহারা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন বলিতে হইবে।

কেশবচন্দ্রের মিররের লেখার যে অনুবাদ উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহা পড়িলে বেশ দেখা যায় যে, এতদিন পর্যন্ত "ট্রাস্টিগণ ট্রস্টসম্পত্তি লইয়া আর এক দিকে ব্রাহ্মসাধারণ টাকা দিয়া এবং কার্য নির্বাহ করিয়া উভয়ে সমাজের কল্যাণ

এবং প্রচারের ভূমি বর্ধিত করিয়া আসিতেছিলেন।" সুতরাং সেই প্রবন্ধে বিরোধের মীমাংসা তিনি স্থির করেন এই যে, "সমাজকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হৌক্, এক বিভাগে ট্রষ্টিগণ উপাসনাব্যয় নির্বাহার্থ যে বিশেষ দান পাইবেন তদ্দ্বারা ট্রষ্টসম্পত্তির কার্য নির্বাহ করিবেন, আর এক বিভাগে ব্রাহ্মগণের সভা ধর্মবিস্তারের জন্য যে অর্থ সংগৃহীত হইবে সেই অর্থ প্রকাশ্যে মনোনীত কর্মচারিগণ দ্বারা তৎকার্যে ব্যয় এবং ইহার সমুদায় কার্য নির্বাহ করাইবেন।" অথচ এই মীমাংসা কেশবচন্দ্র স্থির করিবার পূর্বে দেবেন্দ্রনাথ নিজে ট্রষ্টিরূপে এই একই মীমাংসা স্থির করিয়াছিলেন এবং ব্যবস্থাও করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার প্রমাণ পরিষ্কার ভাষায় "ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টডিড্ অনুযায়ী উপাসনা-কার্য সম্পাদনের জন্যে" যখন তিনি সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন দ্বারা পরিবর্তন করেন, তখন সেই একই সংখ্যার পত্রিকায়* সেই বিজ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি বিজ্ঞাপন বাহির হয়। তাহা কোথাও উদ্ধৃত না হইলেও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দলিল :

"ব্রাহ্মধর্ম প্রচার উদ্দেশে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের দান সংগ্রহের ভার শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের প্রতি অর্পিত হইল। তিনি দাতাদিগের অভিমত লইয়া ব্রাহ্মধর্মের প্রচার কার্যে তাহা ব্যয় করিবেন। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা কার্যের ব্যয় নির্বাহ নিমিত্ত দান করিতে ইচ্ছা করেন, সেই দান তাঁহারা শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকটে প্রেরণ করিবেন।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টি।"

এই বিজ্ঞাপন হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তিনি নূতন দলকে সমাজের উপাসনা নির্বাহ ব্যাপারে কর্তৃত্বের অধিকার না দিলেও ধর্মপ্রচার ব্যাপারে সম্পূর্ণ অধিকারই দিয়াছিলেন। সেখানে তিনি অধিকারের সংকোচ করেন নাই। কিন্তু এ অধিকার নূতন দল গ্রহণ করেন নাই। কেন করেন নাই তাহার কোনো কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। 'আচার্য কেশবচন্দ্রে'র গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "ট্রষ্টি কর্তৃক প্রচারের দানসংগ্রহের ভার শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্রের হস্তে অর্পিত হয়, কয়েক দিন পরে তিনিও সে ভার পরিত্যাগ করেন। ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রতিপালন

* তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা, পৌষ, ১৭৮৬ শক।

করিতে গিয়া কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল, বিবেকের জয় হইল, নূতন সংগ্রামের সূত্রপাত হইল।" এ ভার গ্রহণ করিতে গিয়া যে কোথায় ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনের ব্যাঘাত ঘটিল ও বিবেক ক্ষুণ্ণ হইল তাহা বোঝা গেল না। সুতরাং "সম্মিলিত থাকিবার যত্ন" যে কোন্ দিক দিয়া করা হইয়াছিল, তাহাও বুঝিয়া ওঠা দুষ্কর।

নূতন দল নিজেদের "পক্ষ সুদৃঢ়" করিবার উদ্দেশে যে 'প্রতিনিধি সভা' খাড়া করেন, তাহার তৃতীয় অধিবেশনে স্পষ্টই দেখা গেল যে, তাঁহারা স্থির করিলেন যে, "ব্রাহ্মসাধারণ" (অর্থাৎ তাঁহারা কয়েক জন) "ধর্মসম্পর্কীয় সমুদায় কার্যের ভার আপনারা গ্রহণ করিয়া ট্রষ্টসম্পত্তি ট্রষ্টিগণের হাতে ছাড়িয়া দেন।" মিররে দুই দলের বিরোধের যে মীমাংসা কেশবচন্দ্র স্থির করিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে এই সংকল্পের সামঞ্জস্য থাকিল কোথায়? এ তো স্পষ্টই স্বতন্ত্র একটা দল বাঁধিবার আয়োজন। এবং সেই উদ্দেশ্যেই বোধ হয় প্রচার বিভাগের যে ভার প্রতাপচন্দ্রের উপর দেওয়া হয় তাহা তিনি কিছুদিন বাদে ছাড়িয়া দেন। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিনিধি-সভার এই তৃতীয় অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রস্তাব করেন যে, "যেহেতুক ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিগণের অনেকে উপস্থিত না হওয়াতে বর্তমান সভা অপূর্ণ; অতএব শ্রীযুক্ত প্রধানাচার্যকে অনুরোধ করা হয় যে, তিনি উপযুক্ত মতে বিজ্ঞাপন দিয়া সভা আহ্বান করেন।" কিন্তু এ প্রস্তাব আমাদের কাছে সংগত মনে হইলেও সভায় অগ্রাহ্য হয়। কারণ স্পষ্টই দেখা যায় যে, এ প্রতিনিধি-সভা প্রাচীন ব্রাহ্মদিগকে বাদ দিবার জন্যই— এবং কলিকাতা সমাজকে ট্রষ্টিদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া মফঃস্বলের সমাজগুলিকে একত্র করিয়া এক স্বতন্ত্র সমাজ খাড়া করিয়া তুলিবার জন্যই। অথচ ইহার ভাবখানা এই যে, যেহেতু ট্রষ্টিগণ 'ব্রাহ্মসাধারণের' অধিকার খর্ব করিয়াছেন, সেইজন্য তাঁহারা ট্রস্টসম্পত্তির নির্বাহের ভার ট্রষ্টিদের হাতে রাখিয়া ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্য নিজেরা যাহা করিতে পারেন, তাহাই করিবার চেষ্টা করিতেছেন। 'ব্রাহ্মসাধারণ' কথাটা বলা ঠিক হয় নাই। কারণ 'ব্রাহ্মসাধারণের' মধ্যে বেশির ভাগ ব্রাহ্মই বাদ পড়িয়াছেন।

নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিতে গেলে এই কথা বলিতে হয় যে, "সম্মিলিত থাকিবার যত্ন" যদি নূতন দলের সত্যসত্যই থাকিত, তবে তাঁহারা কলিকাতা সমাজের বহুসংখ্যক সভ্যদিগকে বাদ দিয়া 'প্রতিনিধি সভা' খাড়া করিতেন না। তাঁহাদের প্রতিনিধিত্ব সকলের আগে যাচিয়া লইতেন। কলিকাতা সমাজ হইতেই

ট্রাষ্টি হিসাবে দেবেন্দ্রনাথ যে প্রচারবিভাগকে স্বতন্ত্র করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাকে তাঁহারা প্রতিনিধি-সভার ভিতরে টানিয়া লইবার আয়োজন করিতেন না। 'আচার্য কেশবচন্দ্রে'র গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "ব্রাহ্মসাধারণকে স্বাধীন ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ক্রমান্বয়ে যতই যত্ন হইতে লাগিল, চারি দিকের ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে সহানুভূতি করিয়া পত্রাদি আসিতে লাগিল, এবং প্রচারে দান-সংখ্যা ক্রমে স্ফীত হইয়া উঠিল, ততই ধর্মপিতা দেবেন্দ্রনাথের চিত্ত ক্রমে কেশবচন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল।" যে সমাজটিকে তিনি চিরজীবনের সাধনার দ্বারা গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহার ভিতেই বিচ্ছেদের ছিদ্র প্রবেশ করিয়া সমস্ত ভিৎটাকে আল্‌গা করিয়া তাহার ছাদ হইতে থাম পর্যন্ত সমস্ত গাঁথুনিটাকে থর থর করিয়া নাড়া দিল। আর যে লোক এতকাল ধরিয়া একটির পর একটি করিয়া ইঁট সাজাইয়াছে, সে কি তখন নির্বিকার চিত্তে চুপ করিয়া বসিয়া নিজের গড়া জিনিসের ভাঙন দেখিবে? তবু যাহা একেবারে অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, তাহাও দেবেন্দ্রনাথ সম্ভব করিয়াছেন। তিনি নির্বিকার চিত্তেই সমাজের ভাঙনের লীলা দেখিয়াছেন। তাঁহার মনের সমস্ত বেদনা তাঁহার বিশাল অন্তরের মধ্যে বোবা হইয়া রহিয়াছে— নিকটতম বন্ধুর কাছেও তাহা ভাষা পায় নাই। তাঁহার বিরুদ্ধে এত অভিযোগ, এত অনুযোগ— তিনি নিরুত্তর। এত বাদ প্রতিবাদ বিসংবাদ— তিনি স্তব্ধ। তাঁহার নিজের লিখিত আত্মচরিত ১৮৫৮ সালে অর্থাৎ কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজের প্রবেশের সময় শেষ হইয়াছে। একবার পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "ইহার পরেই তো কেশবের সহিত বিরোধ। ইহার পরের বিবরণ দিতে গেলে, এমন কিছু বলিতে হইবে যাহাতে কেশবের উক্তির উত্তর দিতে হয়। সত্যেন্দ্র যদি আমার বিরুদ্ধে কিছু বলেন তার উত্তর দিবার জন্য কি আমার আসরে নামা ভাল দেখায়?" শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, "প্রশান্তচিত্ততা ও স্থিতপ্রজ্ঞতা" তাঁহার জীবনের "এক দর্শনীয় বিষয়" ছিল। "তিনি কি এক উন্নত বায়ুর মধ্যে বাস করিতেন, যাহাতে কোন ক্ষুদ্রতা যেন তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না।"

ব্রাহ্মসমাজের এই প্রথম বিচ্ছেদের মূল কারণ যে, এক পক্ষের অন্যের সম্বন্ধে অনুদারতা ছাড়া আর কিছুই নয় তাহা ইহার ইতিহাসটিকে নিরপেক্ষভাবে উদ্ধার করিতে পারিলে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায়। দেবেন্দ্রনাথ দুই পক্ষেরই স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া দুই পক্ষকেই মিলাইতে চাহিয়াছিলেন। যদি কোনো ঐতিহাসিক

তুলনা দিতে হয়, তবে বোধ হয় তাঁহার আদর্শ কতকটা অলিভার ক্রমোয়েলের ন্যাশন্যাল চর্চের আদর্শের মতো ছিল। ক্রমোয়েল যেমন অ্যাংলিক্যান প্রেস্‌বিটেরিয়ান সকল দলকেই এক চর্চের অন্তর্ভূক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, দেবেন্দ্রনাথও তেমনি প্রাচীন ও নবীন, অগ্রসর ও অনগ্রসর দুই দলকেই এক সমাজের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ধর্মের ক্ষেত্রে এ মিলন হইতে পারে, এ মিলন হওয়া নিতান্ত উচিত, এই কথা মনে করিয়া তিনি পৈতাধারী ও পৈতাত্যাগী, অগ্রসর ও অনগ্রসর দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মের জন্যই উপাসনার বেদী খোলা রাখিয়াছিলেন। সাপ্তাহিক উপাসনা ছাড়া প্রচার বিভাগ তিনি নূতন দলের হাতেই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কারণ সে দিকে তাঁহারা প্রাণপণে পরিশ্রম করিতেছিলেন। কেবল উপাসনার বেলায় কোনো দলাদলি নাই, সেখানে সকলেরি সমান অধিকার থাকিবে—ইহাই ছিল তাঁহার অভিপ্রায়। এবং ব্রাহ্মসমাজের ট্রস্টডিডেরও তাহাই ভিতরকার অভিপ্রায়। যখন নূতন দল সেই বেদীতে বসিয়া উপাসনা করিবার অধিকার প্রাচীনদিগকে দিতে আপত্তি করিলেন ও জোর করিয়া কাড়িয়া লইতে গেলেন, তখনই ট্রস্টি হিসাবে দেবেন্দ্রনাথকে সেই অধিকারকে সকলের জন্য উন্মুক্ত ও প্রশস্ত করিতে হইল। তাঁহার ঔদার্যের জন্য তিনি নূতন ও অগ্রসর দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে বাধ্য হইলেন এবং তাহার ফলে হইল এই যে, অনগ্রসরেরাই তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিল, অগ্রসরেরা তাঁহাকে ছাড়িয়া গেল। সমাজের মুখ ফিরিল অতীতের দিকে, ভবিষ্যতের দিকে নয়। অতীতের ধারাটাকে বর্তমানের মধ্যে টানিয়া আনিয়া, সেই জীবন্ত বর্তমান ঐতিহাসিক ধারাকে আবার ভবিষ্যতের দিকে ঠেলিয়া দিবার চেষ্টা আর দেখা গেল না।

নূতন দল ধর্মকে সমাজমুখীন করিবার প্রচণ্ড উৎসাহে ধর্মের সঙ্গে সমাজের যেখানে স্বাভাবিক ভেদ আছে, সেটাকে পর্যন্ত অস্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। অধ্যাত্মবোধ জিনিসটা উজ্জ্বল না থাকিলেও, এমন-কি, তাহার একেবারে অভাব হইলেও মানুষের একটা সামাজিক জীবন থাকে। আবার অধ্যাত্মবোধ যথেষ্ট থাকিলেই যে তাহা সামাজিক জীবনকেও সব সময়ে দখল করিতে পারে তাহার কোনোই কারণ নাই। অধ্যাত্মবোধ সমস্ত এক ধরনের নয়, তাহার নানা শ্রেণীভেদ আছে। সুতরাং অধ্যাত্মবোধের উৎকর্ষের দ্বারাই যে সমাজের সংস্কার হইতেই হইবে, তাহার কোনো মানে নাই। শুধু সমাজের বর্তমান অবস্থা, পূর্ব ইতিহাস এবং গঠন ও প্রকৃতি আলোচনা করিয়াও এক দল লোক

সমাজ-সংস্কারের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতে পারে, ইহা ইতিহাসে একেবারেই দুর্লভ নয়। এ কালের সমাজ-বিজ্ঞানশাস্ত্রের দুই জন প্রধান প্রতিষ্ঠাতা, অগস্ত কোঁত ও হর্বার্ট স্পেন্সার অধ্যাত্মবোধে ভরপুর ছিলেন না তাহা সকলেই জানেন। আবার অন্য দিকে সমাজ-সংস্কারে অগ্রসর না হইলেই কোনো ব্যক্তির অধ্যাত্মবোধ যথেষ্ট বিকশিত হয় নাই, এমন সিদ্ধান্ত না করাই শ্রেয়ঃ।

অথচ তাই বলিয়া ধর্মকে সমাজমুখীন ও সমাজকে ধর্মসংগত করিবার জন্য এই যে নূতন দলের আন্দোলন, কেশবচন্দ্র যাহার নেতা— তাহাকে খুব বড়ো একটি আন্দোলন না বলিয়া থাকা যায় না। তাহার সমস্ত পন্থা প্রণালী ঠিক হইয়াছে কি না, সে বিচারের চেয়ে বড়ো করিয়া দেখিবার বিষয় এই যে, তাহা বাংলাদেশের বন্ধন মোচন করিয়াছে। তাহা অভ্যস্ত আচারের ও জীর্ণ সংস্কারের রুদ্ধ ঘরের একটি একটি করিয়া আগল খুলিয়া ফেলিয়া বিশ্বের রাজপথের উদার হাওয়া তাহার মধ্যে দেদার বহাইয়া দিয়াছে। যে পথে কেহ চলে নাই সেই পথে চলিয়াছে; যে পরীক্ষা করিবার কল্পনাও কাহারো মাথায় আসে নাই, সেই পরীক্ষা অনায়াসে করিয়া গিয়াছে; যাহা ভাঙিতে সকলেই ভয় পায়, ভাঙিলে নিজেদের পায়ের তলার মাটিই ভাঙিয়া যায়, প্রবল দুঃসাহসিকতার বেগে তাহাও ভাঙিয়া বসিয়াছে। এই পরীক্ষার সাহস বাংলাদেশের পক্ষে একান্ত দরকার ছিল। এ পথে পায়ে পায়ে ভুল হোক না, তবু এই পথই পথ— এই 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা'তেই "যুগযুগ ধাবিত যাত্রী"। কি ধর্মে কি কর্মে নব নব সত্যের দেশ আবিষ্কার করিবার জন্য এই পথচিহ্নহীন পরীক্ষার সমুদ্রে যে-সকল নির্ভীক নাবিক জাহাজ ভাসাইয়াছে, চিরকাল তাহাদের বিস্তর জাহাজডুবি হইবে, তবু এমনি করিয়াই নব নব সত্যের দেশ আবিষ্কৃত হয়। বাপপিতামহের ভিটার কোণে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে হয় না। দেবেন্দ্রনাথ এই নাবিকদলের অগ্রণী ছিলেন; ইহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া গেলেও ইহাদের প্রতি তাঁর মনের টান যে কিছুমাত্র কমে নাই তাহা ক্রমে ক্রমে আমরা দেখিতে পাইব। কিন্তু সেই-জন্যই এই প্রশ্ন আর মরিতে চায় না—ইহারা কেন তাঁহাকে ছাড়িয়া গেল? অনগ্রসরদের বাধা কি ইহাদের কাছে এতই বড়ো ছিল? পুঞ্জীভূত অন্ধকারের চেয়ে কি একটি দীপশিখার জোর বেশি নয়? তাহাদের বাধা কি পরাস্ত করিবার মতো শক্তি ইহাদের মধ্যে ছিল না? তাহাদের প্রতি ঔদার্যের তবে এত অভাব কেন? "তাঁহারাও তোমাদের সাহায্য অভাবে আরো মৃদু গতি হইয়া পড়িবেন" —অগ্রসর দলের আবেদনের উত্তরে দেবেন্দ্রনাথের চিঠির এই একটি বাক্যের

মধ্যে কতখানি বেদনা ও আশঙ্কা ভরিয়া আছে! "তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে যে সকল অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তোমরা যদি ঔদার্যগুণে তাহা সহ্য করিতে পার এবং প্রীতিপূর্বক শ্রেষ্ঠ ভ্রাতার তুল্য তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া গমন করিতে পার, তাহা হইলে প্রথম প্রস্তাব দ্বারা যে সকল উন্নতির কল্পনা করিতেছ, তাহা অপেক্ষাও অধিকতর উন্নতি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে।" এই কথাগুলির মধ্যেই বা কতখানি ব্যাকুল অনুনয় রহিয়াছে!

কিন্তু এই দলাদলির ইতিহাস এইখানেই সম্পূর্ণ খতম করিয়া দেওয়া যায় না। এই দলাদলির ইতিহাসের অন্তর্গত আর-একটি ইতিহাস কেশবচন্দ্র-দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ইতিহাস, জীবনচরিতের হিসাবে তাহার মূল্য যথেষ্ট। এই দুই জনের মধ্যে মনোমালিন্য কেমন করিয়া ঘটে তাহা বলিয়াছি। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের বিচ্ছেদের ব্যাপারে ইঁহাদের পরস্পরের সম্বন্ধে পরস্পরের মনের ভাব কী ইঁহাদের চিঠিপত্র হইতে তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দেবেন্দ্র-কেশবের ভিতরকার সম্বন্ধ ও আদর্শভেদ

ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের মত

ব্রাহ্মসমাজের বিচ্ছেদব্যাপার লইয়া দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের মধ্যে এ সময়ে যে-সমস্ত চিঠি লেখালেখি চলিয়াছিল, তাহা এখন এখানে উদ্ধার করা কর্তব্য। সেই চিঠিগুলি পড়িলেই এই বিচ্ছেদের ইতিহাসে, মত ও আদর্শগত বিরোধের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত অমিল ও ভুল বোঝাবুঝি যে কী পরিমাণে মিশিয়া ছিল তাহা ভালো করিয়া দেখিবার সুযোগ হইবে।

এ-সকল দেখিবার দরকার কি? খুব দরকার আছে। আমরা যে দেবেন্দ্রনাথ মানুষটিরই পুরাপুরি পরিচয় চাই। মত ও আদর্শ তো সমস্ত মানুষটিকে অখণ্ডভাবে প্রকাশ করে না। ব্রাহ্মসমাজপতি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টি দেবেন্দ্রনাথ, "হিন্দুসমাজের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন থাকিয়া" হিন্দুসমাজকে ব্রাহ্মসমাজ করিয়া তুলিবার জন্য উদ্যোগী দেবেন্দ্রনাথ— এ-সমস্তই তাঁহার বাহিরের দিক, কর্মের দিক। ব্রাউনিং তাঁহার কাব্যে বলিয়াছেন যে, "মানুষের আত্মার দুটি দিক— একটি শক্তির দিক ও কর্মের দিক— সহস্র মানুষের ভিড়ের মধ্যে সেই-খানে মানুষের একরকমের প্রকাশ; আর-একটি নিভৃত প্রেমের দিক— অন্তরের দিক— সে দিকটি মানুষের খোলে আপনার অন্তরঙ্গ প্রিয়জনদের কাছে। সেই-জন্য বন্ধু দেবেন্দ্রনাথ, পিতা দেবেন্দ্রনাথ, স্বামী দেবেন্দ্রনাথ, তাঁহার বন্ধুজনদের সঙ্গে, পুত্রকন্যাদের সঙ্গে, স্ত্রীর সঙ্গে কেমন সম্বন্ধে বাঁধা ছিলেন; সেখানকার ঝড়ঝাপট মেঘকুয়াশা হাসিকান্নার বিচিত্র রকমের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া তাঁহার জীবনযাত্রার ইতিহাসটি কেমনতর; সেখানকার ঝড়ে কি তাঁহার নোঙর ছিঁড়িয়াছিল, মেঘে তাঁহার মনকে মলিন করিয়াছিল, কুয়াশায় তাঁহার দৃষ্টি ঢাকা পড়িয়াছিল; তাঁহার ক্ষমা, তাঁহার সহিষ্ণুতা, তাঁহার কল্যাণভাব কি শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকে নাই? জীবনচরিত-লেখকের পক্ষে এ সমস্তের নজির যথেষ্ট পরিমাণে চাই— শুধু ব্রাহ্মসমাজের দপ্তরের নজির তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

ব্রাহ্মসমাজের বিচ্ছেদব্যাপারে দেবেন্দ্রনাথের দৃঢ়নিষ্ঠতা যে ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা তো দরকারই ছিল। ব্রাউনিংয়ের ভাষায়, সাধারণের মধ্যে কাজ করিবার সময়ে, "Right arm's rod sweep" দক্ষিণবাহুর দণ্ড-

চালনা চাই। কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে? কাজের সম্বন্ধের মধ্যে যে সংঘাত-সংঘর্ষ বাধে, তাহাতে প্রেম মলিন হইতে পারে কিন্তু একেবারে পরাভব মানে কি? দুর্যোগের রাতের সমস্ত ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যেও তাহার মন্দিরের স্নিগ্ধ দীপটি অনির্বাণ থাকিয়া যায়।

কেশবচন্দ্রকে দেবেন্দ্রনাথ যে ভালোবাসিয়াছেন সে ভালোবাসার সামনে পরীক্ষা কি একটি আসিয়াছিল! দুজনের মত ভিন্ন হইল, পথ ভিন্ন হইল, এক জনের এত বছরের গড়া জিনিস আর-এক জন ভাঙিতে বসিলেন। সেই দলনের চেষ্টায় বাঁধিল দল এবং দলের বিরুদ্ধে দল জাগিয়া উঠিয়া পরস্পরের চরিত্র সম্বন্ধে কত কালিমাই লেপিয়া দিল। ছাপার কালীতে সেই কালিমা আজও নিবিড় হইয়া আছে। এমন অবস্থায় ভালোবাসা কি টেঁকে, এত বিষ পরিপাক করিবার শক্তি কি তার আছে? যদি দেখা যায় যে, হাঁ এতদূর পর্যন্তই আছে— আপনার কৃত-কীর্তির বিনাশেও সে প্রেম অক্ষুব্ধ; সেই বিনাশ ঠেকাইবার জন্য হাতটি পর্যন্ত তুলিল না, কোনো কৌশলজাল বিস্তার করিল না; তবে যে মানুষ এমন ভালো-বাসিতে পারে, সেই মানুষটির অন্তরের দিকের সে কেমন পরিচয় পাই? যদি দেখা যায় যে, এতদূর পর্যন্ত স্নেহ যে নিজের অলকঙ্ক চরিত্রের উপরে কলঙ্কের আরোপ— যাহা ইচ্ছা করিলেই, দুটো কথা লিখিলেই, অনায়াসে মুছিয়া ফেলা যায়— স্নেহের জন্য সেই মানুষ সেই কলঙ্কের ডালি মাথায় তুলিয়া লইল এবং বিশ্বজগতের কাছে লজ্জিত হইয়া রহিল— তবে অন্তরের দিকের সে কেমন পরিচয়? দেবেন্দ্রনাথের এই পরিচয় একেবারে নূতন। বাস্তবিক মানুষের সঙ্গে প্রেমের সম্বন্ধে যে মানুষ এতদূর পর্যন্ত যাইতে পারে, তাহারই সঙ্গে ভগবানের প্রেমের সম্বন্ধ যথার্থ সম্বন্ধ হয়। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার পুণ্যপুঞ্জের মধ্যে এই প্রেম-ধনটিকেই লাভ করিয়াছিলেন। যে প্রেম তাঁহার সঙ্গে ভগবানের, সেই প্রেমেরই ছায়া তাঁহার সমস্ত লৌকিক প্রেমের মধ্যে পড়িয়াছিল।

কেশবচন্দ্রকে দেবেন্দ্রনাথ যে কি একান্তভাবে ভালোবাসিতেন তাহা এ-সব বিচ্ছেদ-বিরোধের অনেক পরে প্রতাপচন্দ্রকে মসুরীপর্বত হইতে তিনি যে এক-খানি চিঠি লিখিয়াছিলেন, কেবল তাহারি মধ্যে কতকটা প্রকাশ পাইয়াছে। কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন—"সে মুখশ্রী আমার হৃদয়ে অদ্যাপি জাগ্রৎ রহিয়াছে। যদি আমার এই মনে কাহারও প্রতিমা থাকে, তবে সে তাঁহারই প্রতিমা। তাঁহার আপাদমস্তক— তাঁহার পদের উজ্জ্বল নখ অবধি মস্তকের কেশ পর্যন্ত— এখনি যেন— এই পত্র লিখিতে লিখিতে— জীবন্তরূপে প্রতিভাত

হইতেছে। যদি কাহারও নিমিত্তে আমার প্রেমাশ্রুর বিসর্জন হইয়া থাকে, তবে সে তাঁহারই জন্যে। এখন আর সে প্রেমাশ্রু নাই—আমার হৃদয়ের শোণিত এত অল্প রহিয়াছে, তাহা আর চক্ষুর অশ্রুরূপে পরিণত হইতে পারে না। আমার চক্ষু শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, নতুবা এই পত্র অশ্রুতে ভিজিয়া যাইত।”

কিন্তু বিরোধের সময়কার চিঠিগুলি এবং তার পরবর্তী বাদপ্রতিবাদগুলি না পড়িলে এই আবেগপূর্ণ চিঠিখানির মর্ম তো বুঝা যাইবে না। কত বড়ো অন্তঃকরণ হইলে তবে দারুণতম আঘাত ও অপমান সহ্য করিয়া অন্তরের প্রেমকে অম্লান অপরাজিত রাখা যায়, কেশবচন্দ্রের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের প্রেম যে তাহারি দৃষ্টান্ত। ছোটোখাটো আঘাতে, একটু-আধটু ভুলবোঝাবুঝিতে কত বছরের স্থায়ী প্রীতির সম্বন্ধের নড়চড় হইয়া যায়। লৌকিক প্রেমের বাতিটির তো এতটুকু বাতাসের ঘা সয় না। তার কারণ সে-সমস্ত প্রীতির সম্বন্ধ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেইজন্য তাহা প্রেমের পাত্রকে আপনার বিষয় করিয়া তুলিতে গিয়া যেখানে বাধা পায় সেখানেই সরিয়া যায়। দেবেন্দ্রনাথ স্বভাবত নিঃসঙ্গ নিঃস্পৃহ ছিলেন বলিয়াই তাঁহার প্রেমের সম্বন্ধের মধ্যেও একটি নিষ্কাম ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। প্রত্যেককেই তাহার নিজের স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া নিজের পথে চলিতে তিনি সাহায্য করিতেন। তিনি আপনার আদর্শ, মত, সংস্কার, রুচি প্রভৃতি অন্যের উপর চাপাইয়া অন্যের জীবনের গতিকে অজ্ঞাতসারে এতটুকু বাধা দিবার চেষ্টা করিতেন না। এইটেই ছিল তাঁহার জীবনযাত্রার আর্ট। এটা তাঁহার পরিবারে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সম্বন্ধে যেমন বারম্বার দেখা গিয়াছে, তেমনি তাঁহার বন্ধুদের সঙ্গে ব্যবহারেও প্রত্যক্ষ হইয়াছে। এক দিকে অমন একান্ত সহিষ্ণু ভালোবাসিবার শক্তি, অন্য দিকে এমন নির্বিকার নিঃসঙ্গ ভাব —এদুটো বিপরীত ভাব যে একই প্রকৃতির মধ্যে কেমন করিয়া স্থান পাইয়াছিল, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য বোধ হয়।

কলিকাতা সমাজ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্বে কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথকে ১৮৬৫ খৃস্টাব্দে (১৭৮৭ শক) ২৪ বৈশাখ তারিখে শিবপুর হইতে এক চিঠি লেখেন। এ চিঠিতে যে-সমস্ত অভিযোগ আছে, সে-সমস্ত অভিযোগের মূলে যে-সব ঘটনা ঘটিয়াছিল, যে-সব ভুলবোঝাবুঝি জমিয়াছিল তাহা আমরা পূর্ব পরিচ্ছেদেই আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ অবান্তর প্রসঙ্গ হইবে। চিঠিখানি স্থানে স্থানে উদ্‌ধৃত করা গেল—

শিবপুর,
২৪ বৈশাখ ১৭৮৭ শক।

"প্রণামা নিবেদনঞ্চ।

"আমার প্রতি আপনার পুর্বে যেরূপ স্নেহ ও প্রীতি ছিল, তাহার সহিত আপনার বর্তমান ব্যবহার তুলনা করিলেও যে, কি পর্যন্ত বিস্ময়াপন্ন ও দুঃখিত হইতে হয়, তাহা বলিতে পারি না।··· কয়েক দিবস হইল প্রতিনিধি সভা সম্বন্ধে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি অবজ্ঞা করিয়া তাহার উত্তর দেন নাই। সে পত্রের উত্তর লেখাতে সমাজের মানের হানি বা মহত্ত্বের হ্রাস হইত, ইহা কোন মতেই স্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ আপনি আমার বিষয় যাহা কিছু জানেন তাহাতে কখনই আমাকে এত নীচ বলিয়া ঘৃণা করিতে পারেন না এবং আমার সহিত সামান্য ভদ্রতা রক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হইতে পারেন না। ইহাতে আমার যে বিশেষ অনিষ্ট বা ক্ষতি হইয়াছে তাহা নহে; এ বিষয়ের উল্লেখ করিবার এইমাত্র তাৎপর্য যে, যদি আমরা উভয়েই ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া স্বীয় স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি তাহা হইলে পরস্পরকে ঘৃণা বা ভয় করা নিতান্ত অকর্তব্য; প্রশান্ত চিত্তে সাহসপুর্বক সত্য পালন করিলে সকল দিক শোভা পাইবে। আমার দোষ দেখেন ভর্ৎসনা করুন, আমার অসঙ্গত মত থাকে প্রকাশ্যরূপে নির্ভয় মনে তাহা খণ্ডন করুন; কিন্তু বিদ্বেষ, ঘৃণা বা ভয় এ-সকল ঈশ্বরের কার্যের প্রকৃত লক্ষণ কখনই নহে। যাহা হউক এ বিষয়ে অধিক বলিবার আর প্রয়োজন নাই; পুর্বে আপনি যে অসামান্য মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাহার উপর এই বিষয়টি নির্ভর করিতেছে, আপনি ইহার ন্যায়ান্যায় বিবেচনা করিবেন।···

"(৩) যখন বর্তমান গোলমালের সূত্রপাত হয় তখনই আমি বলিয়াছিলাম যে এই কলহ ক্রমশঃ বর্ধিত হইবে এবং সতর্ক না হইলে ইহা হইতে অবশেষে দলাদলি হইবে। কিন্তু তখন আপনি এ কথায় উপেক্ষা করিয়াছিলেন। এখন সেই কলহ-অগ্নি যেরূপ প্রজ্বলিত হইতেছে তাহা প্রত্যক্ষের বিষয়। সামান্য বিবাদ হইতে কেমন ভয়ানক দলাদলি উৎপন্ন হইতেছে। ভাবান্তর ও মতান্তর দুই-ই দেখা যাইতেছে। আপনি ভবানীপুরে যে উপদেশ দিয়াছিলেন* (যদিও তাহা

* ভবানীপুরের এই উপদেশটি ১৪ই চৈত্র ১৭৮৬ শকে অর্থাৎ এই চিঠি লেখার এক মাস আগে ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে দেওয়া হয়। তাহার মধ্যে আপত্তিকর যে-সকল কথা বলা হইয়াছে তাহা কিছুমাত্র নূতন নয়—"পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্তে" সেই একই কথা বলা হইয়াছে।

হইতে কিয়দংশ বাদ দেওয়া হইয়াছে) তাহা লইয়া বিলক্ষণ আন্দোলন হইতেছে। ইহাতে আপনার যথার্থ মত ও বিশ্বাস বিবৃত হইয়াছে, এবং এতৎপাঠে আমার পূর্বের সংস্কার দৃঢ়ীভূত হইয়াছে যে আপনি অনুষ্ঠানকারীদলের প্রতি যে কেবল অপ্রসন্ন তাহা নহে, তাহাদের উন্নতির পথ অবরোধ করিতেও আপনার একান্ত চেষ্টা। এ অবস্থায় যে দলাদলি ভাব আরো প্রগাঢ় হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? আপনি আমাদের কার্যের কিছুমাত্র ব্যাঘাত না করিয়া যদি কেবল সমাজের ট্রস্ট-সম্পত্তি সম্বন্ধীয় কার্যে নিযুক্ত থাকিতেন, এবং বিরোধী না হইয়া পৃথক ভাবে স্বীয় লক্ষ্য সংসাধন করিতেন, তাহা হইলে এত গোলের সম্ভাবনা থাকিত না।···সমাজে এরূপ বিরোধ অত্যন্ত ভয়ানক, কিন্তু উভয়দিকেই আত্মপক্ষ সমর্থনে অপ্রতিহত চেষ্টা থাকিলে এ বিরোধ হইবেই হইবে, নিশ্চয়ই হইবে। ভাবে ভাবে, কথায় কথায়, উপদেশে উপদেশে, বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে, লেখায় লেখায় অশেষ বিবাদ চলিবে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

"এ অবস্থায় কি করা কর্তব্য? আমাদের পরস্পরের মধ্যে যে বৈষয়িক সম্বন্ধ তাহা পরিষ্কার করা কর্তব্য?··· কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের অর্থ কি, ইহাতে কেবল উপাসনা হইবে কি প্রচারও হইবে, ব্রাহ্মসমাজগৃহে আমাদের কোন সভার অধিবেশন বা আমাদের প্রচার সম্বন্ধীয় কোন কার্য হইবে কি না, ইহার দান কিরূপে ব্যয়িত হইবে, ইহার সহিত সাধারণের কি প্রকার যোগ থাকিবে, আপনি প্রতিনিধি-সভা ও আমাদের তাবৎ প্রচারকার্যের সহিত কিরূপ সম্বন্ধ রাখিবেন; এ-সমুদায় আপনি পরিষ্কার করিয়া লিখিলে আমরা আমাদের কার্যক্ষেত্র বুঝিয়া লইতে পারি, এবং যাহাতে বৈষয়িক বিরোধ না থাকে এরূপ চেষ্টা করা যাইতে পারে। অতএব বিনীত ভাবে আপনার নিকট প্রার্থনা

তবে এ সময়ে উত্তেজনার আগুন হাজার শিখায় জ্বলিতেছিল বলিয়া তাহার মুখে সেই পুরানো কথাই নূতন ইন্ধনের মতো বোধ হইয়াছিল মনে হয়। যাহা হৌক, উপদেশের শেষভাগে এই কথাগুলি ছিল: "ব্রাহ্মধর্ম বিবাদ কলহের স্থান নহে— যেহেতু 'গচ্ছদপাদং বিগতবিবাদং' স্বয়ং ব্রহ্মই এই ধর্মের প্রবর্তক।···মহাত্মা রামমোহন রায় এই উদ্দেশ্যেরই অনুসরণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের সূত্রপাত করেন।···চিরবদ্ধ কুসংস্কার হইতে হিন্দুসমাজকে পরিশুদ্ধ করা তাঁহার প্রাণগত যত্ন ছিল।···যদি তোমরা এই ক্ষণে সকলে মিলিয়া শান্তভাবে তাঁহার এই উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় সম্পন্ন করিবার জন্য চেষ্টা কর, তবে নিশ্চয় এই শকাব্দার দুই সহস্র বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই এই বৃহদায়তন হিন্দুসমাজই ব্রাহ্মসমাজ হইবে। স্বজাতির প্রতি নির্দয় হইয়া ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিয়ো না; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুসমাজের নেতা কর।"

করিতেছি এ বিষয়ে আপনি সত্বর মনোযোগী হইবেন। আগামী রবিবারে সাধারণ সভা হইবার কথা আছে, যদি ইহার পূর্বে আপনি লিখিয়া দেন তাহা হইলে বড় ভাল হয়। সত্যের জয়, সত্যের জয়, সত্যের জয়।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।"

ইহার উত্তরে দেবেন্দ্রনাথ যে চিঠি লেখেন তাহাও নীচে দিলাম—

"প্রাণাধিকেষু,

"সান্ত্বনাপূর্বকম্ সম্ভাষণমিদম্।

"আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইও না, আমার কথায় বিরক্ত হইও না। তোমার মনোহর কান্তি ও উজ্জ্বল মুখ যখনি মনে হয়, তখনি তোমার প্রতি আমার স্নেহ-অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া ধাবিত হইতে যায়, কিন্তু পরক্ষণেই আমার প্রতি তোমার নিষ্ঠুর নির্যাতনের চেষ্টা স্মরণ হইয়া অমনি তাহা নির্বাণ হইয়া যায় এবং তাহা হইতে ধূম বিনির্গত হইয়া আমার হৃদয়কে ব্যথিত করিয়া তুলে। আমার জীবনে বঙ্গভূমিমধ্যে তোমার অপেক্ষা বিশুদ্ধ চরিত্র ও মহৎ ব্যক্তি আমি দেখি নাই, বিশুদ্ধতার সঙ্গে মহত্তের সঙ্গে ঘৃণাভাব কখনই থাকিতে পারে না। অতএব তোমাকে আমি কখনই ঘৃণা করিতে পারি না— বিশেষতঃ তোমার হৃদয়ে যখন পবিত্রস্বরূপ বাস করিতেছেন। প্রতিনিধি-সভার অধিবেশনের জন্যে সম্পাদককে যে পত্র লিখিয়াছিলে, তিনি তাহার উত্তর দিয়াছিলেন, সে বিষয়ে আমার কোন মত দেওয়া নিষ্প্রয়োজন ভাবিয়া পুনর্বার তাহার উল্লেখ করিতে সম্পাদককে বলি নাই। তোমাকে আমি নীচ ভাবিয়া তোমার প্রতি আমি ঘৃণা করিয়া যে সম্পাদককে তাহার উত্তর লিখিতে বলি নাই ইহা কদাচ মনে করিবে না। তুমি চিরকালই আমার সমাদরভাজন আছ ও থাকিবে। তোমার বুদ্ধি, কৌশল, তোমার মনের কল্পনা, তোমার বাক্‌পটুতা, নিপুণতা, একাগ্রতা, প্রভৃতি যে-সকল প্রচুর সদ্‌গুণ আছে, ইহাতে তুমি যে জয়লাভ করিবে, ইহাতে আমার একটুকুও সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি তুমি আপনাকে ভুলিয়া এবং জয় পরাজয় ভুলিয়া কেবল ঈশ্বরের মহিমাকে মহীয়ান্ করিতে প্রবৃত্ত থাক, তবে এই বঙ্গভূমিতে অমৃতবারির বর্ষণ হইবে ও ইহার মহোপকার সাধিত হইবে— নতুবা আপনার গৌরবের জন্যে আপনার দলপুষ্টির জন্যে, আপনার জয়লাভের জন্যে যদি ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা উপায় মাত্র করা হয়, তবে তাহা হইতে কালকূট গরল উৎপন্ন হইয়া সকল লোককে অভিভূত করিবে। আমার ভয় হইতেছে যে পাছে তোমার হৃদয়

অতীব কঠোর হইয়া তোমার সদ্‌গুণ-সকলকে অযোগ্যরূপ ব্যবহার করে এবং লোকের অনিষ্ট উৎপন্ন হয়। এজন্য বলিতেছি যে, যাহাতে "ভাবে ভাবে, কথায় কথায়, উপদেশে উপদেশে, বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে, লেখায় লেখায় অশেষ বিবাদ" না চলে এমন বিধান সর্বাগ্রে করিবে। আমার কথা যদি শ্রবণ কর, তোমার এই করা কর্তব্য যে তুমি আমার কোন কার্যে হস্তক্ষেপ না কর। আমি তোমার কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে চাহি না। এই ছয় বৎসর যেরূপ প্রাণে প্রাণে হৃদয়ে হৃদয়ে মনের সহিত তোমার সহিত যুক্ত হইয়া কর্ম করিয়া আসিতেছিলাম, এখন আর তোমার সহিত সেপ্রকার যোগ হইবার সম্ভাবনা নাই। কেবল মৌখিক যোগ দিলে হিতে আরো বিপরীত হইয়া পড়িবে। তোমার অভিপ্রায়-মতে আমি কর্ম না করাতেই বর্তমান গোলযোগের সূত্রপাত হয়। এ বিষয়ে তুমি লিখিয়াছ যে, 'যখন বর্তমান গোলযোগের সূত্রপাত হয়, তখনই আমি বলিয়াছিলাম যে, এই কলহ ক্রমশঃ বর্ধিত হইবে।' পরে তুমি লিখিতেছ যে, 'আপনি এই কথায় উপেক্ষা করিয়াছিলেন।' যথার্থই আমি তখন এই কথায় উপেক্ষা করিয়াছিলাম, যেহেতু তখন আমি জানিতে পারি নাই যে তোমার মনে মনে এত ছিল। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ আমার কার্যের পরিমিত ক্ষেত্র, আমি তথায় ব্রাহ্মদিগের ও ঈশ্বরপরায়ণ সাধুদিগের সঙ্গে একত্র হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিব; তথা হইতে যাহাতে ব্রহ্মবিদ্যার শিক্ষা হয়, তাহার সদুপায় অবলম্বন করিব; পত্রিকা দ্বারা ও অন্যান্য উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম যাহাতে প্রচার হয়, তাহাতে যত্ন করিব। ইহা করিলে যদি তোমার বিপক্ষতা করা হয়, তবে ইহার উপায় নাই। আমার দল নাই, আমার বল নাই, আমার এ পৃথিবীর জীবন অতি অল্পই অবশিষ্ট আছে, আমি সেই কয়দিনের জন্য যতটুকু পারি একাকী বা আমার সুহৃদ্‌দিগের সঙ্গে ঈশ্বরের আদিষ্ট কার্য ও তাঁহার নির্ণীত ভার অপরাজিত চিত্তে বহন করিব, এই আমার প্রিয় অভিলাষ। কর্মেতে আমার অধিকার, কিন্তু ইহার ফল ফলদাতার হস্তে, আমি সে ফল উৎপন্ন হইবার পূর্বেই এখান হইতে প্রস্থান করিব। তোমার সহিত যুক্ত থাকিয়া এই ছয় বৎসর তোমার নিকট হইতে যে-কিছু উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার জন্য তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া নমস্কার করিয়া এই পত্র শেষ করিতেছি। সুবিজ্ঞকে আর অধিক লিখিবার প্রয়োজন কি।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্মণঃ।"

এই চিঠি পাইয়া কেশবচন্দ্র দ্বিতীয় চিঠি লেখেন—

"প্রণামা নিবেদনমিদং—

আপনার সরলভাবপূর্ণ পত্রপাঠে কত আরাম ও সন্তোষ লাভ করিলাম বলিতে পারি না। যখন আপনি হৃদয়ের যথার্থ ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে সহস্র কটু বা কঠোর কথা বা গ্লানিসূচক ভর্ৎসনা থাকিলেও আমি "ক্রুদ্ধ" হইতে পারি না, "বিরক্ত" হইতে পারি না। ···আপনি পত্রের শেষ ভাগে আমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বিদায় লইবার ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। ··· আপনি যেন আমাকে পৃথক্ করিয়া দিলেন কিন্তু আপনি কি আমার কার্যের প্রতি উপেক্ষা করিতে পারেন, না আমি আপনার কার্যের প্রতি উপেক্ষা করিতে পারি? ইহা নিশ্চয় জানিবেন যতদিন ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক্ষেত্রে আমাদের উভয়েরই কার্য করিতে হইবে, ততদিন কেহ কাহাকে মৌখিক বিদায় দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না।···

"(৩) আপনি লিখিয়াছেন যে, আমার প্রতি আপনার যেটুকু স্নেহ-অগ্নি আছে—তাহা আমার নিষ্ঠুর নির্যাতনের চেষ্টা স্মরণমাত্র নির্বাণ হইয়া যায়। আমি যে নির্যাতন করিতেছি তাহা আমি অস্বীকার করিব না। কিন্তু আপনাকে নহে, আপনার মত ও সংস্কারকে নির্যাতন করিতে হইতেছে। তজ্জন্য আপনি ঈশ্বরের নিকট অভিযোগ করুন, আমি তাঁহার আদেশ ভিন্ন তাহা হইতে বিরত হইতে পারি না। যতদিন আপনার সংস্কার অন্যায় ও অনিষ্টকর বোধ হইবে, যতদিন তাহা ব্রাহ্মধর্মের উন্নতির প্রতিবন্ধক বলিয়া বোধ হইবে, ততদিন তাহাকে নির্যাতন করা, তাহাকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করা আমার পক্ষে নিতান্ত কর্তব্য। হিন্দুধর্মকে নির্যাতন করা যেমন কর্তব্য, কল্পিত ব্রাহ্মধর্মের শিথিল ভাবকে নির্যাতন করা তেমনি কর্তব্য, উন্নতিশীল ব্রাহ্মধর্মকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করিবার চেষ্টাকে নির্যাতন করা তেমনি কর্তব্য। সর্বসাক্ষী পরমেশ্বর জানেন যে, আমি আপনাকে নির্যাতন করিতে প্রবৃত্ত হই নাই।

"(৪) আপনি এক স্থলে লিখিয়াছেন, আমার মনে মনে এত ছিল তাহা আপনি জানিতেন না। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। ···আমার এইরূপ সংস্কার ছিল যে, আপনি দূরদৃষ্টির সহিত সকল দিক দেখিয়া আমার সহিত যোগ দিয়াছিলেন।' এখন বুঝিতেছি যে তাহা যথার্থ নহে। ···এই জন্য এখনও বলিতেছি আমার মনে যাহা আছে তাহা আপনার সূক্ষ্ম বুদ্ধি সহকারে সম্যক্‌রূপে আলোচনা করুন এবং আমার সহিত, ব্রাহ্মসমাজের সহিত,

স্বদেশের সহিত তদনুরূপ ব্যবহার করুন। ...আমাকে আপনি বুঝিতে না পারাতেই তত্ত্ববোধিনী সভার মত, অক্ষয়কুমার দত্তের মত আমাকে বিঘ্ন জ্ঞান করত আমাকে বিদায় করিয়া নিশ্চিন্ত ও নিষ্কণ্টকরূপে ব্রাহ্মসমাজকে স্বীয় ইচ্ছানুসারে শাসন করিবেন এরূপ কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। আমাকে না জানাতেই আপনি আমাকে বলপুর্বক বা কৌশলপুর্বক কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলেন; আমাকে না জানাতেই আপনার এই বিশ্বাস হইয়াছিল যে ট্রষ্ট ক্ষমতা প্রকাশ করিলে আপনি নির্বিঘ্নে আপনার মত রক্ষা ও প্রচার করিতে পারিবেন। ...যখন আপনি আমাকে ব্রাহ্মসমাজের কার্যক্ষেত্র হইতে দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তখন বুঝিলাম যে, আপনি আমার প্রাণবধে উদ্যত হইয়াছেন, আমার সর্বনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এ অবস্থায় যে আমি সর্বপ্রযত্নে এবং ঈশ্বরের সাহায্যে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিব তাহাতে আর আশ্চর্য কি? আপনি ভিতরে সকল দিক ঠিক করিয়া হঠাৎ আমাকে বলিলেন—হয় আমার মতে মত দেও, নয় চলিয়া যাও। আপনার মতে সায় দিতে পারিলাম না, কিন্তু চলিয়া যাইব কোথায়? এ কথার উত্তর না দিয়া একেবারে আমাকে বিদায় করিয়া দিলেন; চতুর্দিক অন্ধকার দেখিলাম; পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া পরম পিতাকে আহ্বান করিলাম, তিনি রক্ষা করিলেন, পথ দেখাইয়া দিলেন এবং অভয় দান করিলেন। ঈশ্বর যখন সহায়, তখন আর আমার ভয় কি? ...যাহা হউক যাহা হইবার হইয়াছে। যাহাতে ভবিষ্যতে আর গোলযোগ বৃদ্ধি না হয় তাহার সদুপায় অবলম্বন করুন। সে সদুপায় কি? আপনি লিখিয়াছেন—“আমার কথা যদি শ্রবণ কর তোমার এই করা কর্তব্য যে তুমি আমার কোন কার্যে হস্তক্ষেপ না কর। আমি তোমার কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে চাহি না।” আপনি যদি বিবাদ মিটাইবার এই মাত্র উপায় স্থির করিয়া থাকেন, নিশ্চয় জানিবেন ইহা কোন কার্যকর হইবে না। ...আপনি যদি আপনার মত কেবল নিজের জন্য ও নিজের সুহৃদ্‌দিগের জন্য রক্ষা করিতে চান তাহা হইলে বড় বিবাদের সম্ভাবনা নাই; কিন্তু যদি তাহা ব্রাহ্মধর্মের মত বলিয়া প্রচার করেন, এবং সমুদায় ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়কে তাহাতে বদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে আমি কখনই চুপ করিয়া থাকিতে পারিব না। ...বিনীত ভাবে আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি আপনি শীঘ্র প্রতিবিধানের চেষ্টা দেখুন, আমাকে এ যন্ত্রণাদায়ক অবস্থাতে নিক্ষেপ করিবেন না। এখনও উপায় আছে; বারবার নিবেদন

করিতেছি, "অশেষ বিবাদ" নিরাকরণের চেষ্টা দেখুন। .. এ জন্য বারবার শতবার বলিতেছি কৃপা করিয়া ঈশ্বরের জন্য, আপনার জন্য, ব্রাহ্মসমাজের জন্য, ভারতবর্ষের জন্য, সমুদায় পৃথিবীর জন্য— এই কলহ বিবাদের যাহাতে শেষ হয় এরূপ বিধান করুন।

যিনি আত্মনির্ভরের জন্য দাম্ভিক হইলেন এবং
নতার জন্য অনেকের অপ্রিয় হইলেন
তিনি পূর্বেও যেমন এখনো তেমনি আপনার
শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ্ ও অনুগত দাস—

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।"

১লা জ্যৈষ্ঠ ১৭৮৭ শক
শনিবার

দুজনের প্রকৃতির ভিন্নতা চিঠির ভিতর হইতে কেমন আশ্চর্য ফুটিয়া বাহির হইয়াছে! দেবেন্দ্রনাথ যেখানে পথের ভেদ মতের ভেদ ঘটিয়াছে, সেখানে তাহা সবিনয়ে স্বীকার করিয়া লইয়া বলিতেছেন—তুমি তোমার ভাবে তোমার পথে চল, আমি আমার ভাবে আমার পথে চলি। "তুমি আমার কোন কার্যে হস্তক্ষেপ না কর, আমি তোমার কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে চাহি না।" কিন্তু অন্যের মত ও পথের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে কেশবচন্দ্রের পুরাদস্তুর লড়াইয়ের ভাব। "আমি যে নির্যাতন করিতেছি তাহা আমি অস্বীকার করিব না। কিন্তু আপনাকে নহে, আপনার মত ও সংস্কারকে নির্যাতন করিতে হইতেছে।" কিন্তু দুই পক্ষে এমনতর লড়াই বাধিলে, তাহা যে ব্যক্তিগত দিকগুলি বাঁচাইয়া শুধু মতগত বা প্রণালীগত দিকগুলিরই প্রতি গোলাগুলি বর্ষণ করিতে পারে, তাহা সব সময়ে সম্ভাবনীয় হয় না। কারণ মতামত ব্যক্তির সঙ্গে এমন একান্তভাবে জড়াইয়া থাকে যে একটাকে কোপ মারিতে গেলেই অজ্ঞাতসারে বা জ্ঞাতসারে অন্যটার গায়েও কোপ পড়ে। পার্বত্য নদীর বন্যা যখন পাহাড়ের তলাটাকে ধসাইয়া ফেলে, তখন পাহাড়ের গায়ে যে-সব পুষ্পিত তরু সমস্ত অরণ্যটিকে সুগন্ধে ভরিয়া রাখিয়াছে তাহারা শুদ্ধ যে ভাসিয়া যায়, বন্যা কি তাহার কোনো খবর রাখে? কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের মতকে আঘাত করিতে গিয়া দেবেন্দ্রনাথ ব্যক্তিকে যে কোথাও আঘাত করেন নাই, এমন কথা নিরপেক্ষ পাঠক বলিতে পারেন না। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার সব লেখায় শুধু নিজের মত ও আদর্শের কথা বলিয়াছেন।— কোনো পক্ষের সম্বন্ধে এতটুকু মনের খোঁচা তাঁহার লেখায় বা বক্তৃতায় কোথাও প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্র-

নাথের প্রকৃতি, শিক্ষা, সংস্কার, কার্যপ্রণালী সমস্তই আলোচনা করিতে গিয়াছেন এবং সেই কারণে তাঁহার "নিষ্ঠুর নির্যাতন" মতামত ছাড়াইয়া অনেক সময়ে ব্যক্তির উপর প্রত্যক্ষভাবে গিয়া পড়িয়াছে। ইহার উদাহরণ আমরা পরে দেখিতে পাইব। এই চিঠির মধ্যেও তাহার উদাহরণ আছে। ট্রস্টক্ষমতা প্রকাশের ভিতরকার অভিপ্রায় কেশব মনে করিয়াছিলেন, তাঁহাকে বিদায় করিয়া "নিশ্চিন্ত ও নিষ্কণ্টকরূপে ব্রাহ্মসমাজকে স্বীয় ইচ্ছানুসারে শাসন" করিবার সংকল্প।

ইহার পরের মাসে নূতন দল কলিকাতা সমাজের কার্যপ্রণালী বদলের প্রস্তাব করিয়া দেবেন্দ্রনাথের কাছে এক আবেদন পাঠান। তাহার প্রধান প্রস্তাব এই যে, ব্রাহ্মসমাজকে "উন্নতিশীল" করিতে হইবে, সুতরাং "ব্রাহ্মসমাজের আচার্য বা উপাচার্য বা অধ্যেতা, কেহ সাম্প্রদায়িক বা জাতিভেদসূচক কোন চিহ্ন ধারণ করিবেন না।" এ প্রস্তাবে দেবেন্দ্রনাথ রাজি না হইলে এক স্বতন্ত্র দিনে ব্রাহ্ম-সমাজগৃহে নূতন দলের উপাসনা হইবে, এই অনুমতি তাঁহাকে দিতে হইবে। অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজ দুই দলে ভাগ হইয়া যাইবে— এক দলের একদিন উপাসনা; অন্য দলের অন্য দিন উপাসনা হইবে। তাঁহারা তিনটি আবেদন করিলেন, যথা—

"আমরা বিনীতভাবে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রস্তাব আপনার উদার বিবেচনার উপর নির্ভর করিতেছি, আপনি যথাবিহিত বিধান করিবেন।

"১ম। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য বা উপাচার্য বা অধ্যেতা, কেহ সাম্প্রদায়িক বা জাতিভেদসূচক কোন চিহ্ন ধারণ করিবেন না।

"২য়। সাধু, সচ্চরিত্র ও জ্ঞানাপন্ন ব্রাহ্মেরাই কেবল বেদীর আসনের অধিকারী হইবেন।

"৩য়। ব্যাখ্যান, স্তোত্র ও উপদেশে ব্রাহ্মধর্মের উদার, প্রশস্ত ও নিরপেক্ষ ভাব প্রকাশ পাইবে। কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি অবজ্ঞা বা ঘৃণাসূচক বাক্য উহাতে ব্যবহৃত হইবে না, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করা উহার উদ্দেশ্য থাকিবে।

"যদ্যপি উপাসনা সম্বন্ধে উল্লিখিত নূতন প্রণালী অবলম্বনে আপনি স্বীকৃত না হন তাহা হইলে সাধারণ ব্রাহ্মদিগকে ঐ প্রণালী অনুসারে অপর এক দিন ব্রাহ্মসমাজগৃহে উপাসনা করিতে অনুমতি দিয়া বাধিত করিবেন, ইহা হইলে উভয় দিক রক্ষা হইবে এবং ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে তৎপরিবর্তে সদ্ভাব সঞ্চারের সম্ভাবনা হইবে। যদ্যপি ইহাতেও আপনি

অস্বীকৃত হন তাহা হইলে আমাদিগকে পৃথক ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন বিষয়ে সৎপরামর্শ দিবেন।

কলিকাতা ১৯ আষাঢ় শকাব্দ ১৭৮৭। } নিতান্ত বশম্বদ
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন, শ্রীউমানাথ গুপ্ত,
শ্রীমহেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযদুনাথ চক্রবর্তী,
শ্রীনিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার।"

ইহার উত্তরে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে এই চিঠিখানি লেখেন—

"ওঁতৎসৎ।

"প্রীতিভাজন

"শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সমীপেষু।

"সাদর নিবেদন,

"১। তোমারদের ১৯ আষাঢ়ের পত্র পাইয়া তোমারদের অভিপ্রায় ও সেই অভিপ্রায় অনুযায়ী প্রার্থনা অবগত হইলাম। তোমরা যে ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান প্রণালীতে অসন্তুষ্ট হইয়া নূতন প্রণালী সংস্থাপনে উদ্যত হইয়াছ, ইহা ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিরই লক্ষণ; আমিও বিলক্ষণ অবগত আছি যে, কেবল ব্রাহ্মসমাজে নয়, কোন প্রকার জনসমাজেই চিরকাল একবিধ প্রণালী প্রচলিত রাখিবার নিমিত্তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া সামাজিক নিয়মের নিতান্ত বিরুদ্ধ, কালসহকারে মনুষ্যের অবস্থা পরিবর্ত হইয়া উঠে, সেই পরিবর্তসহকারে পুরাতন সামাজিক প্রণালীও পরিবর্তিত করিতে হয়, তাহা না করিলে উন্নতির পক্ষে অনেক ব্যাঘাত উপস্থিত হইতে পারে। ব্রাহ্মসমাজে কদাপি এ নিয়মের অন্যথা হয় নাই। যখন যখন সে বিষয়ের যে প্রকার পরিবর্ত আবশ্যক হইয়াছিল, সাধ্যানুসারে তাহা সম্পন্ন করা গিয়াছে এবং এইক্ষণেও সেইরূপ নিয়ম চলিতেছে।...

"২। অনেকে ব্রাহ্মধর্মকে পৌত্তলিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা এবং সামাজিক গৃহসম্বন্ধীয় সকল প্রকার পাপ ও অনিষ্টের সম্পূর্ণ বিরোধী বলিয়া যেপ্রকার বিশ্বাস করিয়াছেন, তাহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। এপ্রকার বিশ্বাস না থাকিলে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের ফললাভ হয় না। এই বিশ্বাসের অনুবর্তী হইয়া সুশিক্ষিত নব্য-সম্প্রদায়ের অনেকেই যে, ব্রাহ্মসমাজের শাসনপ্রণালী, উপাসনাপ্রণালী অপ্রশস্ত

ও সাম্প্রদায়িক লক্ষণাক্রান্ত ও উন্নতির প্রতিরোধক জানিয়া তাহার সহিত যোগ রাখিতে অক্ষম ও তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রণালী অবলম্বনে উন্মুখ হইয়াছেন এবং তন্নিমিত্তে তোমরা একত্র হইয়া যে তিনটি প্রস্তাব করিয়াছ, তাহা আহ্লাদের সহিত বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

"৩। তোমারদের প্রথম প্রস্তাব এই যে, 'ব্রাহ্মসমাজের আচার্য বা উপাচার্য বা অধ্যেতা কোন সাম্প্রদায়িক বা জাতিভেদসূচক চিহ্ন ধারণ করিবেন না।' জাতি-বিভাজক ও গোত্রপ্রকাশক যে-সকল উপাধি সাম্প্রদায়িক ও জাতিভেদ-সূচক দীপ্যমান চিহ্নস্বরূপ রহিয়াছে, বোধ হয় তাহা রহিত করা তোমাদের উদ্দেশ্য নয়। জাতিভেদ-সূচক একমাত্র উপবীতই তোমারদের লক্ষ্য। আমি এক্ষণে এ প্রস্তাবে নানা কারণে সম্মত হইতে পারি না। যে সকল কারণে ইহাতে অসম্মতি প্রদান করিতেছি, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে :—

"৪। অনুষ্ঠান-প্রণালী প্রচার ও প্রচলিত হইবার পূর্বে ব্রহ্মোপাসনা প্রচলিত হইয়াছিল, সেই সময় অবধি যাঁহারা উৎসাহপূর্বক শ্রদ্ধার সহিত ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলেন এক্ষণকার কৃতানুষ্ঠান ব্রাহ্মদিগের ন্যায় তাঁহারা দুর্বিষহ তাড়না সহ্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন এবং অনেককে তাহা সহ্য করিতেও হইয়াছিল। বর্তমান অনুষ্ঠানপ্রণালী এবং তোমাদের ন্যায় উন্নত ব্রাহ্মদিগকে লাভ করা তাঁহাদিগেরই উৎসাহ ও আন্দোলন ও ধৈর্যের ফল। তোমরাও প্রথমে কেবল ব্রহ্মোপাসনার নিমিত্তে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলে, এবং অদ্যাপি হয় তো তোমাদের মধ্যে এমত লোক আছেন যে ব্রহ্মোপাসনা ব্যতীত আর কিছুতেই যোগ দিতে পারেন না। পুরাতন ও নব্যদিগের মধ্যে অনেকে অদ্যাপি অনুষ্ঠানে অগ্রসর হইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহারা ও তোমরা কেহই আমার অনাদরের বস্তু নহ। তোমরা উভয় পক্ষই সদ্ভাবে ও সাধুভাবে মিলিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিসাধন কর, তাঁহারদের বল তোমারদের নূতন বলে মিলিত হইয়া তাহাকে আরো পোষণ করুক এবং তোমারদের দৃষ্টান্তে তাঁহারদের উৎসাহ বর্ধিত হউক, এই আমার অভিলাষ। তোমারদের পরস্পর বিচ্ছেদ উপস্থিত হইলেও তোমরাও অপেক্ষাকৃত হীনবল হইয়া পড়িবে এবং তাঁহারাও তোমারদের সাহায্য-অভাবে আরো মৃদুগতি হইবেন। এই উভয় ঘটনাই আমার ক্লেশকর ও ব্রাহ্মসমাজের অহিতকর। যে সকল কার্য অনুষ্ঠিত হইলে এইরূপ ঘটনার সম্ভাবনা, তাহা পরিহার করা আমার পক্ষে নিতান্ত কর্তব্য। তোমারদের প্রথম প্রস্তাবের অভিপ্রায় অনুসারে কার্য আরম্ভ হইলেই এই

অনিষ্ট ঘটনা সংঘটিত হইবার আর কোন কারণই অবশিষ্ট থাকিবে না। আবার তোমারদের অভিপ্রায় সম্পন্ন না হইলে তোমরাও পৃথক হইয়া সেইরূপ সংঘটিত করিতে পার, এই ভাবিয়া তোমারদের ইচ্ছার অনুরোধে যদি তাঁহারদের প্রতি উপেক্ষা করি, তাহা হইলে নিতান্ত পক্ষপাত করা হয়। তাঁহারা যে ভাবের সহিত এতকাল পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারদের সেই ভাব সত্ত্বে কি প্রকারে তাঁহারদিগকে পূর্বাধিকার হইতে বঞ্চিত করি। তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে যে সকল অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তোমরা যদি ঔদার্যগুণে তাহা সহ্য করিতে পার এবং প্রীতিপূর্বক শ্রেষ্ঠ ভ্রাতার তুল্য তাঁহারদিগকে সঙ্গে লইয়া গমন করিতে পার, তাহা হইলে প্রথম প্রস্তাব দ্বারা যে সকল উন্নতির কল্পনা করিতেছ, তাহা অপেক্ষাও অধিকতর উন্নতি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। তোমরা যে প্রকার অগ্রসর হইতেছ, এরূপ করিলে তাহার আনুকূল্য ব্যতীত ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা নাই। তোমরা যে সাধু লক্ষ্য সিদ্ধ করিবার জন্য ধাবমান হইতেছ, ইঁহারদেরও তাহাই লক্ষ্য। কেবল উপায়-অবলম্বন-বিষয়ে তোমারদের পরস্পর মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে।

"৫। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাব উত্থাপন করা বাহুল্য। জ্ঞানানুসারে সম্ভবমত উক্ত দুই প্রস্তাবের অনুগামী কার্য চিরকালই হইয়া আসিতেছে এবং চিরকালই তদনুসারে চলিতে হইবে।

"৬। তোমরা লিখিয়াছ যে, 'যদ্যপি উপাসনা সম্বন্ধে উল্লিখিত নূতন প্রণালী অবলম্বনে আপনি অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে সাধারণ ব্রাহ্মদিগকে ঐ প্রণালী অনুসারে অপর এক দিন ব্রাহ্মসমাজগৃহে উপাসনা করিতে অনুমতি দিয়া বাধিত করিবেন।' ইহার দ্বারা বোধ হইতেছে যে, তোমরা যে কয়েকটি ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান অবস্থাতে অসন্তুষ্ট হইয়াছ, সেই অতি অল্পসংখ্যক কয়েকটিকেই সাধারণ ব্রাহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিতেছ। বাস্তবিক তোমারদের সহিত মিলিত হন নাই, এমন এত ব্রাহ্ম রহিয়াছেন যে, তাঁহারদের সংখ্যা তোমারদের অপেক্ষা অনেক অধিক। তোমারদের ও তাঁহারদের সকলেই সাধারণ ব্রাহ্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। যদি সকলকে সাধারণ মনে করিয়া তাঁহারদের জন্যে অপর দিনে উপাসনা করিবার প্রস্তাব করিয়া থাক, তাহা হইলে এ প্রস্তাব নিতান্ত অনাবশ্যক হইয়াছে। কেন না, উপাসনার জন্যেও যে যে দিন নির্দিষ্ট আছে, তাহা সাধারণ ব্রাহ্মগণেরই জন্যে। কেবল ব্রাহ্মসাধারণের জন্যেও নয়, সর্বসাধারণের জন্যে। সেই সেই দিনে ব্রাহ্মদিগের— সাধারণ ব্রাহ্মদিগের দ্বারা উপাসনা-মণ্ডপ

অলঙ্কৃত হইয়া থাকে। তাহাতে তাঁহারা আপনাদের মনের আনন্দই ব্যক্ত করেন।

"৭। তোমরা যদি আপনাদের জন্যে আর একটি দিন প্রার্থনা করিয়া থাক, তাহাতেও সম্মত হইতে পারি না বলিয়া দুঃখিত হইতেছি। তোমরা লিখিয়াছ যে, 'ইহা হইলে উভয় দিক রক্ষা হইবে এবং ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, তৎপরিবর্তে সদ্ভাব সঞ্চারের সম্ভাবনা হইবে।' আমার নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে যে, ইহা হইলে আরো অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে তাহা হওয়ায় সুসঙ্গত বোধ হয় না। ইতিপূর্বে এইরূপ নিয়ম করিয়াছিলাম যে, মাসের প্রথম বুধবার তোমারদের অভিলষিত ব্যক্তিরা বেদীতে আসন গ্রহণ করিয়া উপাসনা সম্পন্ন করিবেন, ইহা হইলে অতিরিক্ত দিনের আবশ্যক তোমারদের মনে হইত না, অথচ নির্বিঘ্নে একটি পরিবর্তনের ও উন্নতির সোপান নির্ধার্য হইত। এইরূপ নিয়মে একবার উপাসনা-কার্যও চলিয়াছিল এবং কয়েকবার তোমারদের জন্যে প্রতীক্ষা করাও হইয়াছিল, কিন্তু তৎকালে তাহাতেও তোমারদের অভিরুচি না হওয়াতে আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলাম। এইক্ষণে পূর্ববৎ একত্র মিলিয়া উপাসনা ব্যতীত ঐক্যের আর কোন সম্ভাবনা নাই।

"৮। তোমারদের শেষকথা এই যে আমি কিছুতেই সম্মত না হইলে তোমরা পৃথক ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিবে এবং তন্নিমিত্ত আমার নিকট সৎ পরামর্শ প্রার্থনা করিয়াছ। একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্মের উপাসনা বিস্তারের জন্য ব্রাহ্মসমাজ স্থানে স্থানে যত সংস্থাপিত হয়, ততই মঙ্গল। ব্রাহ্মধর্মের প্রথম প্রবর্তক মহাত্মা রামমোহন রায়ের উপদেশ অবলম্বন করিয়া ইহাতে আমি এই পরামর্শ দিতেছি যে, যাহাতে পরমেশ্বরের প্রতি মন ও বুদ্ধি, হৃদয় ও আত্মা উন্নত হয়, যাহাতে ধর্ম, প্রীতি, পবিত্রতা ও সাধুভাবের সঞ্চার হয়, সেই সমাজের উপাসনা-সময়ে এই প্রকারের বক্তৃতা, ব্যাখ্যান, স্তোত্র ও গান ব্যবহৃত করিবে।

"৯। উপরিউক্ত সকল হেতুতে বাধ্য হইয়া তোমারদের ইচ্ছার অনুকূল অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারিলাম না, ইহাতে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবে না। স্বস্তি হউক, শান্তি হউক, মঙ্গল হউক, তোমারদের নিকট ঈশ্বর সর্বদা প্রকাশিত থাকুন।

কলিকাতা ২৩ আষাঢ় } নিতান্তশুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
১৭৮৭ শক। } শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্মণঃ।"

উপরের চিঠি হইতে আর-একটি নূতন তথ্য পাওয়া গেল এই যে, দেবেন্দ্রনাথ নূতন দলের জন্ম নিয়ম করিয়াছিলেন যে, মাসের প্রথম বুধবার তাঁহাদের দলের লোকেরা বেদী গ্রহণ করিয়া উপাসনা করিবেন। এই নিয়মে একবার উপাসনার কাজ চলিয়াছিল, কিন্তু নূতন দল ইহাতে সন্তুষ্ট হন নাই। তাঁহারা চান বেদীর সম্পূর্ণ অধিকার— পৈতাধারী উপাচার্যদিগের সম্পূর্ণ বর্জন। দেবেন্দ্রনাথ তাহাতে রাজি না হওয়ায় তিনি "উন্নতিশীল ব্রাহ্মধর্মকে শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিবার চেষ্টা" করিয়াছেন— তাঁহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ।

এই চিঠির পরেই ইণ্ডিয়ান মিরর কাগজের অধিকার লইয়া একটা গোলযোগ বাধে। ১৫ই জুলাই ১৮৬৫ সাল হইতে কেশবচন্দ্র মিররের স্বত্বাধিকারী হন। সেই সংখ্যার কাগজে তিনি নিজে ঝগড়ার বিবরণ দিতেছেন এই রকম : "অল্পদিন হইল কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহাতে ট্রষ্টিগণ যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তন্মধ্যে ইণ্ডিয়ান মিররকে ট্রষ্টিগণের কার্যবিভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া উহার নিজ তত্ত্বাবধানে উহাকে ছাড়িয়া দেওয়া একটি প্রধান। এরূপ করিবার অভিপ্রায় এই হইতে পারে যে, আনুকূল্য এবং পৃষ্ঠপোষণ বিনা উহা ক্ষীণ হইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হইবে। অনুকূল দৈবকে ধন্যবাদ, সেই দুর্ভাগ্যের দিন হইতে আজ পর্যন্ত মিরর বাঁচিয়া রহিয়াছে।···ট্রষ্টি এবং সমাজের সভ্যগণের বিবাদের কারণ কি তাহার আমূল বৃত্তান্ত একটি প্রবন্ধে লিখিয়া উহা সকলকে অবগত করান হয়। অনন্তর ১লা জুলাইয়ের পত্রিকায় রামমোহন রায়ের মণ্ডলীর হিন্দুভাবাপন্নতার বিপক্ষে কিছু বলা হয়।···ব্রাহ্মসমাজের ক্রমপরিবর্তনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া একজন পত্রপ্রেরকের একখানি পত্র আসিল— যাহা অদ্যকার পত্রিকায় মুদ্রিত করা গেল— এবং আমরা যেমন পূর্বেও করিতাম তেমনি মুদ্রিত করিবার জন্য দিলাম। 'কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের কার্যাধ্যক্ষগণ' দ্বারা একটি নিষ্পেষক আদেশ বাহির হইল যে, ভবিষ্যতে মিররে যে কোন লেখা যাইবে, তাহা অগ্রে তাঁহাদিগকে দেখাইয়া লইতে হইবে। অবশ্য আমরা ইহার সুদৃঢ় প্রতিবাদ করিলাম, এবং সুস্পষ্টবাক্যে বলিলাম যে, আমরা আমাদিগের স্বাধীনতার প্রতি এরূপ যথেচ্ছ হস্তক্ষেপের কখন আনুগত্য স্বীকার করিব না!"*

ইহার পর কেশবচন্দ্র মিরর সম্পর্কীয় কাগজপত্র আপনার বাড়িতে তুলিয়া

* আচার্য কেশবচন্দ্র, মধ্যবিবরণ : প্রথম অংশ, পৃ ৩২-৩৩।

আনিলেন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার কেশবচরিতের প্রথম সংস্করণে লিখিতেছেন যে, দেবেন্দ্রনাথ টাকা দিয়া মিররকে সাহায্য করিতেন বলিয়া ইহার স্বত্বাধিকার তিনি দাবি করিলেন। কেশব এতকাল ধরিয়া মিররের সম্পাদকতার দায়িত্ব স্বীকার করিবার জন্য ও কাগজটি প্রথম বাহির করিবার সময় তাঁহার চেষ্টা ও যত্নের জন্য ধর্মত তিনিই যে কাগজের স্বত্বাধিকারী এই কথা বলিলেন। কাগজটি সমাজের ছাপাখানায় ছাপা হইত বলিয়া দেবেন্দ্রনাথ অন্য এক জন যুবককে কাগজের সম্পাদন-ভার দিয়া ছাপাখানায় বা অফিসে কেশবের অধিকার রোধ করিলেন। কাগজটি পাক্ষিক ছিল; তাঁহারা ভাবিলেন, পক্ষান্তে কাগজ তাঁহারাই বাহির করিবেন। সপ্তাহ না যাইতে যাইতে তাঁহারা আশ্চর্য হইয়া দেখেন যে, অন্য এক ছাপাখানা হইতে মিররের এক অতিরিক্ত সংখ্যা বাহির হইয়া গিয়াছে এবং সেই সংখ্যায় কেশবকে অধিকারচ্যুত করিবার জন্য যে অন্যায় আচরণ করা হইয়াছে সে সম্বন্ধে এক তীব্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তখন হতাশ হইয়া কলিকাতা সমাজ বিবাদ হইতে সরিয়া পড়িলেন কিন্তু সেই পরাভবের জন্য কেশবকে তাঁহারা কখনোই ক্ষমা করেন নাই।

এ গেল প্রতাপবাবুর কথা। গৌরগোবিন্দ বাবু লিখিয়াছেন যে, শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ রায় নামে এক ব্যক্তিকে মিররের অধিকারীরূপে দাঁড় করাইবার জন্য তাঁহার দ্বারা সমাজের কর্তৃপক্ষ চিঠি লিখাইলেন যে, মিরর তাঁহার সম্পত্তি। এই চিঠির জবাবে কেশবচন্দ্র লিখিলেন যে, মিররপত্র তাঁহারই অধিকারে। মিরর সম্বন্ধে কোনো লেখাপড়া হইয়াছে কি না জানিবার জন্য তিনি খোঁজ লইলেন এবং শুনিলেন যে, মিরর নামে পাঁচখানা কাগজ প্রকাশ হইলেও তাহাতে আইনত কোনো দোষ হয় না।

যাহাই হোক, মিরর কাগজখানি এমনি করিয়া কেশবচন্দ্রের হাতে গেল।

এত গোলমালের পরেও তবু দেখিতে পাই যে, সামনের মাঘোৎসবে ১১ই মাঘে দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রনাথ দুই জনকে দুই পাশে লইয়া বেদীতে বসিলেন। এবং এই উৎসবে ব্রাহ্মিকাদিগের বিশেষ উৎসব এই কলিকাতা সমাজেই সম্পন্ন হইল।

বোধ হয় ১৮৬৬ খৃস্টাব্দের ১৫ই জুলাই, ১লা আগস্ট ও ১৫ই আগস্ট তারিখের মিররে প্রকাশিত তিনটি প্রবন্ধে কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের মত ও আদর্শকে এবং ব্যক্তিগতভাবে দেবেন্দ্রনাথকেও যেমন কঠিন ভাবে আক্রমণ করিয়াছেন এমন আর কোথাও করেন নাই। দেবেন্দ্রনাথ ভিন্ন অন্য কেহ কখনোই এ আক্রমণ সহ্য

করিতে পারিত না। এবং ইহার পর ভালোবাসার সম্বন্ধ রক্ষা করা দূরে থাকুক, শিষ্টতার সম্বন্ধ রক্ষা করিতেও পারিত না। সেই-সকল লেখার কয়েকটি জায়গা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি— "বাহিরে দেখিতে তাঁহারা সমাজ গৃহের ট্রষ্টি, ভিতরে ভিতরে তাঁহারা সমুদায় ব্রাহ্মমণ্ডলীর অধ্যক্ষ ও নিয়ামক। ...ইনি (কলিকাতা সমাজ) বলেন, ইহা কেবল উপাসনার স্থান, কিন্তু কর্তৃত্ব সহকারে ব্রাহ্মধর্মের মত বিশ্বাসাদি ব্যাখ্যান করিয়া পুস্তকপুস্তিকা এবং মাসিক পত্রিকা বাহির করেন।... ইনি মুখে বলেন, সামাজিক বিষয়ের সহিত ইনি সম্বন্ধ পরিহার করেন, ইনি কেবল ধর্মসম্পর্কীয় অন্তর্ব্যবস্থান মাত্র, অথচ ইনি কর্তৃত্বসহকারে সামাজিক ও গৃহসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান পদ্ধতি প্রকাশ করিয়াছেন।"

"(১) এই ধর্ম কোন বিশেষ গ্রন্থকে ঈশ্বরপ্রণীত বলিয়া গ্রহণ করে না, যে কোন গ্রন্থে সত্য প্রাপ্ত হওয়া যায় উহাকেই গ্রহণ করে। কার্যতঃ ইহা হিন্দুশাস্ত্র বিনা অন্য কোন শাস্ত্র স্পর্শ করে না; শঙ্করাচার্য প্রভৃতিকে গ্রহণ করে এবং ক্রাইষ্ট পল্ প্রভৃতিকে ঘৃণা করে এবং অবমাননাসূচক কথায় আক্রমণ করে। উপনিষদের যে সকল বাক্যে অদ্বৈতবাদাদি আছে, সেগুলির অর্থান্তর করিয়া অথবা বিরুদ্ধ বাক্যাংশ পরিহার করিয়া খণ্ডিত বাক্য গ্রহণ করা হইয়া থাকে।

(২) ইহার ভিতরে জাতিভেদ বা বর্ণভেদ নাই, সকল নরনারীই ঈশ্বরের সন্তান, সমুদায় পৃথিবী ব্রহ্মের গৃহ, সমুদায় মনুষ্য ভ্রাতা। এ মত যে কথার কথা তাহা সকলেই জানেন। কলিকাতা সমাজ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব দৃঢ়তার সহিত রক্ষা করেন।...

(৩) সমাজের আচার্যগণ গৃহে পৌত্তলিক অনুষ্ঠান করেন, সমাজে আসিয়া একেশ্বরবাদ প্রচার করেন, অথচ তাঁহাদিগের এই কপটতা ভীরুতা ও অসারল্য অনায়াসে সমাজ সহ্য করেন, উৎসাহ দেন।" "সাংসারিকতার জন্য পার্থিব অসত্যের নিকটে ঈশ্বরের সত্যকে হীন করিয়া একটি সুবিধার ধর্ম করিয়া লওয়া হইয়াছে, যে সুবিধার ধর্মে বিবেককে অপদস্থ করা হইয়াছে এবং সৎতা ও ঋজুতাকে সাংসারিক বুদ্ধির বেদীসন্নিধানে বলি অর্পণ করা হইয়াছে।"*

কলিকাতা সমাজের নামে এই যে-সকল আক্রমণ, এগুলি যে দেবেন্দ্রনাথের প্রতিই আক্রমণ তাহা পড়িলেই বেশ বোঝা যায়। অথচ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইবার পরের বছরেই (১৮৬৭ খৃস্টাব্দে) কেশবচন্দ্র যখন পুনরায় ব্রহ্ম-

* আচার্য কেশবচন্দ্র, মধ্য বিবরণ: প্রথম অংশ, পৃ ৭৯-৮৩।

বিদ্যালয় খুলিলেন, এবং দেবেন্দ্রনাথকে সেখানে উপদেশ দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন, দেবেন্দ্রনাথ তখনি আনন্দের সহিত পূর্বের মতো কেশবচন্দ্রকে পাশে বসাইয়া এই নূতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে বাংলায় উপদেশ দিতে লাগিলেন। এ-সকল আক্রমণ যে তাঁহাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিয়াছে, তাহার কোনো লক্ষণ তাঁহার বাহিরের ব্যবহারে বা ভিতরকার সম্বন্ধে প্রকাশ পাইল না।

কলিকাতা সমাজ ছাড়িবার পর কিছুকাল নব্য ব্রাহ্ম প্রচারকদের মধ্যে অনেকেই বড়োই শুষ্কতা অনুভব করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের নেতা কেশবচন্দ্রকে অনুযোগ করিয়া অস্থির করিয়া তুলিলেন। কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথকে তাঁহাদের কারো কারো মধ্যে এই যে আধ্যাত্মিক সংশয় ও শুষ্কতা উপস্থিত হইয়াছে ইহা জানাইবা মাত্র, দেবেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে আদি ব্রাহ্ম-সমাজের তেতলার ঘরে একদিন একত্র হইতে বলিলেন। ধর্মপিপাসু সেই যুবার দল যখন তাঁহাকে বলিলেন যে, ব্রহ্মদর্শনের উপদেশ শুনিবার জন্য তাঁহারা আসিয়াছেন, তখন তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন, ব্রহ্মদর্শন বিনা ব্রাহ্ম হয় না, আজও তোমরা ব্রহ্মকে দেখ নাই? কেহ কেহ বলিলেন, না, আমরা তো ব্রহ্মকে দেখি নাই। তখন তিনি বলিলেন, যাঁহারা ব্রহ্মকে দেখেন নাই কিন্তু দেখিবার জন্য ব্যাকুল, তাঁহারাও ব্রাহ্ম। বলিতে বলিতে তাঁহার দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, তিনি হাতখানি প্রসারিত করিয়া বলিতে লাগিলেন, এই তো চারি দিকে ব্রহ্ম— আমরা সূর্যালোকের মধ্যেই সর্বদা বাস করিতেছি, অথচ আমরা তো সর্বদা বলি না এই সূর্য, এই সূর্য। পরলোকগত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে শুনিয়াছি, একটি দীপ দেখাইয়া তিনি বলিলেন, এই দীপটি যেমন প্রত্যক্ষ, তেমনি তিনি আমার কাছে প্রত্যক্ষ। তখন বিস্ময়ে কাহারো মুখে কথা সরিল না। নগেন্দ্রবাবু বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের মনে যেটুকু সংশয় জমিয়াছিল, দেবেন্দ্রনাথের আশ্চর্য ব্রহ্মপ্রত্যয়ের প্রত্যক্ষ পরিচয়ে সেদিন সে সমস্ত সংশয় কাটিয়া গেল। আর-এক দিন তাঁহার সহিত কথা হইল যে, আরাধনায় যে-সকল ব্রহ্মস্বরূপ আছে, তাহার মধ্যে পুণ্যস্বরূপের কোনো কথা নাই— সে স্বরূপ সম্বন্ধে কি কোনো উপনিষৎ-বাক্য নাই? তিনি অমনি বলিয়া উঠিলেন— আছে বৈকি— শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্। এই কথার পর হইতে ঐ বাক্যটি সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্মের সঙ্গে নব্য ব্রাহ্মরা যুক্ত করিয়া লইলেন।

১৮৬৭ খৃস্টাব্দে নব্য ব্রাহ্মদের মধ্য ভক্তির আন্দোলন এমনি প্রবলভাবে জাগিয়া উঠিল যে দুঘণ্টা তিন ঘণ্টা উপাসনা করিয়াও তাঁহাদের তৃপ্তি হইল না।

তখন মাঝে মাঝে সমস্ত দিনব্যাপী ব্রহ্মোৎসবের আয়োজন হইল। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় অদ্বৈত মহাপ্রভুর বংশধর; তিনি খোল করতাল যোগে সংকীর্তন ব্রাহ্মসমাজে প্রবর্তিত করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ এই বৈষ্ণবী প্রমত্ততার পক্ষপাতী ছিলেন না। ভক্তিকে তিনি কখনোই অসম্বৃত অসংযত হইতে দিতেন না। কিন্তু এই ব্রহ্মোৎসবের ব্যাপারে নব্য ব্রাহ্মরা তাঁহাকে ডাকিবামাত্র তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে ঘিরিয়া তাঁহারা প্রমত্তভাবে কীর্তন করিলেন। তিনিও ভাবে পূর্ণ হইয়া সেই উৎসবের সন্ধ্যাবেলার উপাসনা সম্পন্ন করিলেন।

তবেই দেখা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ এমন ভাবে যোগ রক্ষা করিলেন যে, এ সমাজের সঙ্গে যে তাঁহার সমাজের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে এবং এ সমাজের লোকেরা যে তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষ, এ ভাব তাঁহার মনের ত্রিসীমায় স্থান পাইল না। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইঁহাদের ধর্ম বা সমাজের আদর্শ ও সাধনার সঙ্গে তাঁহার আদর্শ ও সাধনার তখন যথেষ্ট অমিল। একেবারে গুরুতর রকমের অমিল।

দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুসমাজের ইতিহাসেরই একটি স্বাভাবিক বিশ্বজনীন বিকাশ বলিয়া মনে করিতেন। তিনি জানিতেন যে, কোনো ধর্ম বা ধর্মসমাজ বিশেষ কোনো কালের বিশেষ প্রয়োজন সাধনের জন্য দেখা দিলেও তাহার মধ্যে অভিব্যক্তির নিয়ম লক্ষ্য করা যায় এবং সেইজন্যই তাহাকে প্রাচীন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা আর সম্ভব নয়। প্রাচীনের সঙ্গে তাহার যোগ আছেই। সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম বা ব্রাহ্মসমাজ এই অভিব্যক্তির নিয়মক্ষেত্রের বাহিরে নাই। ভারতবর্ষে যখন তাহার আবির্ভাব, তখন ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারার মধ্যেও তাহার বিকাশ ঘটিয়াছে।

অথচ মুসলমান খৃস্টানের মতো হিন্দু কোনো বিশেষ ধর্ম নয়—হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি জাতিগত পরিণাম। এই হিন্দু-সভ্যতার ধারায় ধর্মের নব নব বিকাশ দেখা দিয়াছে এবং সমাজেরও নব নব পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজ এই হিন্দু-সভ্যতার ধারার মধ্যে যে এখনকার কালের প্রয়োজন অনুসারে দেখা দিয়াছে, এ বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথের মনে কোনো সংশয় ছিল না। অতএব ইহাকে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজেরই একটি স্বাভাবিক বিকাশ বলিয়া তিনি মনে করিতেন। এ-সকল কথা আমরা "জীবনচিত্রের খসড়া" অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং পুনরাবৃত্তির দরকার নাই। হিন্দুসমাজকে একটা মৃত নিশ্চল সমাজ বলিয়া তিনি অশ্রদ্ধা করিতেন না বলিয়া কোনো অন্যায়

আচার বা প্রথা বা কোনো বিশেষ ধর্মবিশ্বাস যে কখনোই হিন্দুজাতির নিত্য লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, ইহা তিনি জানিতেন। পৌত্তলিকতা যদি ভ্রান্ত ধর্মবিশ্বাস হয় বা জাতিভেদ যদি একটা কুপ্রথা হয় তবে তাহা সমস্ত হিন্দুধর্মেরই ভ্রান্ত বিশ্বাস ও হিন্দুসমাজেরই কুপ্রথা এবং হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজের বিকাশের পথে প্রকাণ্ড এক বাধার মতো। হিন্দুসমাজের সমস্ত লোক যদি সে সম্বন্ধে উদাসীন থাকে, তবে যে দু-পাঁচজন লোক ইহার অনিষ্ট বুঝিয়া ইহাকে দূর করিবার জন্য লড়িবে, তাহারাই হিন্দুসমাজকে প্রাণবান চেতনাবান করিয়া রাখিবে।

কিন্তু এখানে দেবেন্দ্রনাথের নিজের এ সম্বন্ধে একটা উক্তি উদ্ধার করা দরকার। তাহাই করা যাইতেছে :

"...প্রত্যুত একেশ্বরবাদই হিন্দুধর্মের উৎকৃষ্ট অংশ ও হিন্দুশাস্ত্রানুসারেই তাহা হিন্দুধর্মের বিশুদ্ধ মত। হিন্দুধর্মের সেই একেশ্বরবাদই আমাদের ব্রাহ্মধর্ম। একেশ্বরপ্রতিপাদক ধর্মে নানা দেবদেবীর উপাসনাত্মক কনিষ্ঠ ধর্ম হইতে মহান্ প্রভেদ প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই আমরা ব্রাহ্মধর্ম এই নামে মনোনীত করিয়া লইয়াছি।

"যদি হিন্দুধর্মের সমুদায় অংশ আমরা বিশুদ্ধ যুক্তি দ্বারা রক্ষা করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমরা আপনাদিগকে যারপরনাই সৌভাগ্যশালী বোধ করিতাম। যে যে অংশে ভ্রম প্রমাদ দেখিতে পাওয়া যায়, আমরা অতি দুঃখিত হইয়া সেই সেই অংশ পরিত্যাগ করি এবং তদ্দ্বারা হিন্দুধর্ম সংশোধিত হইতেছে ইহাই বিশ্বাস করিয়া থাকি। যদি আমাদের পুরাতন শাস্ত্রসকলের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম না পাইতাম তাহা হইলেও ব্রাহ্মধর্ম আমাদের আশ্রয়স্থান হইতেন সন্দেহ নাই; কিন্তু সেরূপ হইলে হিন্দুধর্মের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগকে অত্যন্ত ক্ষোভ পাইতে হইত। ...যদিও ব্রাহ্মধর্মে এরূপ উদারতা আছে যে, ইহা জাতিবিশেষে কখনই আবদ্ধ হইয়া থাকিবে না; তথাপি হিন্দুজাতির সহিত ইহার সবিশেষ সম্বন্ধ চিরকালই বিদ্যমান থাকিবে।..."

কিন্তু এভাবে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজকে স্থাপিত করিয়া দেখা যে নিতান্ত দরকার তাহা যে কেশবচন্দ্র ও নব্য ব্রাহ্মরা অনুভব করেন নাই, তাহাও আমরা এই জীবনচরিতের গোড়ার প্রবন্ধে দেখিয়া আসিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে, কেশবচন্দ্র মনে করিতেন যে, ইতিহাসের মধ্যে বিশেষ বিশেষ মহাপুরুষকে প্রেরণ করিয়া বিধাতা যে বিশেষ ধর্মবিধানকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেই-সকল বিধান-পরম্পরাকে জৈব সমন্বয়ে

("organic synthesis") গ্রথিত করিয়া দেখিতে হইবে। কেশবচন্দ্রের ভাষায় সেই বিধান-পরম্পরামালার ("concatenation of Dispensation") ভিতর দিয়া ঐতিহাসিক ব্রহ্মের ("God in History") বিরাট স্বরূপকে উপলব্ধি করিতে হইবে। ইহাই কেশবচন্দ্রের বিশেষ বাণী। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মবিধানে সত্যের ভিন্ন ভিন্ন দিক প্রকাশ পাইয়াছে ; সেগুলি পরস্পর পরস্পরের যোগে পূর্ণ হইতে পারে। এই যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাঙ্গের ঐক্য সাধন, এ ঐক্যকে তিনি জোড়াতালির ঐক্য বলিতে রাজি নন। কারণ সহজ জ্ঞানের দ্বারা প্রত্যেক ধর্মের সত্যকে নির্ধারণ করিয়া তার পর অধ্যাত্ম-অভিজ্ঞতার দ্বারা সেই সত্যকে আয়ত্ত করিয়া তবে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাঙ্গের যে অখণ্ড ঐক্যে পৌছানো যায়, এ সেই ঐক্য। কেশবচন্দ্র তাঁহার নববিধানে ইহার পরে এই মহাপুরুষবাদ ও বিধানবাদকেই আরো স্ফুটতর-রূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এখন প্রশ্ন এই, দেবেন্দ্রনাথ কি শুধু হিন্দুর ইতিহাসের ভিতর দিয়া হিন্দুধর্ম-বিধানের ক্রমপরম্পরাকেই দেখিতে পাইয়াছিলেন? বিশ্ব-ইতিহাসে বিশ্বধর্ম-বিধানের বিচিত্র গতি কি তাঁহার দৃষ্টিকে এড়াইয়া গিয়াছিল? সত্য সে সর্বত্র, সেই সর্ব তীর্থ হইতেই যে তাহাকে লইতে হইবে—এ কথা কি তাঁহার কথা ছিল না? শুধু এ দেশের ঋষিদিগের তত্ত্ব ও সাধনাই তাঁহার কাছে পর্যাপ্ত ছিল, অন্য দেশের মহাপুরুষদিগকে তিনি কি স্বীকার করেন নাই?

ঈশ্বরের বিশেষ বিধান যে দেবেন্দ্রনাথ স্বীকার করিতেন এবং তাঁর সেই বিশেষ বিধান যে এক-এক জন মহাপুরুষকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায় তাহাও স্বীকার করিতেন, তাহার প্রমাণ ব্যাখ্যানের একটি জায়গা উদ্ধার করিয়া আমরা আমাদের গোড়াকার প্রবন্ধে দিয়াছি। এবং আমরা দেখিয়াছি যে, কেশবচন্দ্রের "গ্রেটমেন" বক্তৃতার ইহাই সার কথা হইলেও, তাঁহার মহাপুরুষবাদ একটু বেশি দূর পর্যন্ত গিয়াছিল। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, "Yes! I look upon a prophet as a divine incarnation in this sense, that he is the spirit of God manifest in human flesh।" অর্থাৎ হাঁ, আমি প্রফেটকে এই অর্থে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া মনে করি যে, তাঁহার নরদেহের মধ্যে ঈশ্বরের আত্মা প্রকাশ পাইতেছেন। তার পরে "যিশুখৃস্ট, ইউরোপ এবং এশিয়া" বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন 'খৃস্টের রক্ত এবং মাংস খাইয়া' খৃস্টের বিশ্বাস, আত্মবলিদান, প্রেম ও স্বর্গীয় ভাবকে আমাদের অধ্যাত্মজীবনের উপাদান করিয়া লইতে হইবে। খৃস্টকে আমাদের মধ্যে বাঁচিতে হইবে। এ এক ধরনের মহাপুরুষবাদ—ইহাকে

ঠিক অবতারবাদ বলা না গেলেও অবতারবাদ-ঘঁ্যাসা মত বলিতেই হইবে। দেবেন্দ্রনাথ কোনোকালেই ইহাকে স্বীকার করিতে পারেন না, এ জিনিস তাঁহার কাছে সত্যসত্যই "বিভীষিকা"। তিনি ব্যাখ্যানে যে মহাপুরুষবাদের আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে বিশেষ বিধানের কথা বলা হইলেও মহাপুরুষেরা সেই বিশেষ বিধানের প্রবর্তক মাত্র— সেই প্রবর্তন বা প্রেরণার মূলেও স্বয়ং ঈশ্বর।

এমনি করিয়া সেই ব্যাখ্যানে দেবেন্দ্রনাথ জগতের সমস্ত ধর্মবিধানগুলির একটা সাধারণ চেহারা আমাদের চোখের সামনে ধরিয়াছেন। তার পরে আমি পূর্বেই উদ্ধার করিয়াছি যে, ব্রহ্মবিদ্যালয়ের এক উপদেশে তিনি স্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়াছেন যে, "যত ধর্ম আছে সকল ধর্ম হইতেই সাহায্য পাইয়া তাহাদের উপরে ব্রাহ্মধর্ম স্থাপিত হইয়াছে।" এবং পরিশিষ্ট ভাগে 'ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস', 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানে'র বিস্তৃত আলোচনাতে আমরা দেখিয়াছি যে, এক দিকে দেকার্ত হইতে কাণ্ট পর্যন্ত পাশ্চাত্ত্য দর্শনের সমস্ত ধারা এবং পাশ্চাত্ত্য ধর্মতত্ত্বের সমস্ত ধারা এবং অন্য দিকে বেদ হইতে বেদান্ত দর্শন পর্যন্ত ভারতবর্ষের ধর্মচিন্তা ও ধর্মসাধনার সমস্ত ধারা—এই দুই ধারাকে দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্বজ্ঞান ও অধ্যাত্মসাধন এই দুই দিক হইতে মিলাইয়াছেন এবং তার পরে বর্তমান যুগের জন্য চিন্তার নূতন নূতন ছাঁচ রচিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে ছাঁচ একেবারেই বৈদেশিক হয় নাই, বিশেষ ভাবে এ দেশীয় হইয়াছে। সেইজন্যই তিনি যে অন্য দেশের শাস্ত্রের কাছে কতটা ঋণী তাহা ধরা পড়ে নাই।

অর্থাৎ দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের আসল তফাতটা এই জায়গায় যে— দুজনেই ইতিহাসের মধ্যে মহাপুরুষদের ভিতর দিয়া ধর্ম-বিধানপরম্পরা যে চলিয়াছে ইহা স্বীকার করিলেও কেশবচন্দ্র মনে করিয়াছিলেন যে, সেই প্রত্যেক বিধানের যে সত্য সে আংশিক সত্য, পূর্ণ সত্য কোনো বিধানেই নাই। সেইজন্য প্রত্যেক বিধানের আংশিক সত্যগুলিকে মিলাইয়া এক অখণ্ড পরিপূর্ণ ধর্মবিধানে পৌঁছানো দরকার। দেবেন্দ্রনাথ মনে করিতেন যে, প্রত্যেক বিধানই ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ইতিহাসের ভিতর দিয়া ক্রমশ পূর্ণতর হইয়া চলিয়াছে। এই বিধানগুলি পরস্পরের বিকাশে পরস্পরের সাহায্য লইতে পারে— কিন্তু ইহাদের বিকাশের পথ বিশেষ বিশেষ ইতিহাসের ভিতর দিয়া।

প্রত্যেক ধর্মবিধানের আংশিক সত্যগুলিকে মেলানো ছাড়া কেশব প্রত্যেক ধর্মবিধানের অন্তর্গত আচার-অনুষ্ঠান (rituals) বিগ্রহ (Symbols) প্রভৃতিকেও ছাড়েন নাই, সেগুলিকেও মিলাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে ধর্মের যে অংশ

সার্বজাতিক এবং যে অংশ বিশেষভাবে জাতীয় ইতিহাসের অন্তর্গত—এই দুই অংশের মধ্যে যে অত্যন্ত একটা পার্থক্য আছে, তাহা তিনি স্বীকার করেন নাই। এ জায়গাতেও দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার ঘোরতর প্রভেদ।

রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে এক প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন যে, তাঁহার ভাবেই বিশ্বধর্মবিধানগুলিকে রামমোহন রায় আলোচনা করিয়া তাহাদের ভিতরকার সার্বভৌমিক তত্ত্ব ও লক্ষ্যকে উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন। তিনি ভিন্ন ধর্মবিধানগুলির তত্ত্বকে জোড়া দিবার চেষ্টা করেন নাই ; তিনি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম-বিধানের অন্তর্গত আচার-অনুষ্ঠানগুলিকে মিলাইবার চেষ্টা করেন নাই।

ব্রাহ্মসম্মিলনসভা যখন স্থাপিত হয়, তখন তাহার সভ্যেরা দেবেন্দ্রনাথকে "ব্রাহ্মদিগের ঐক্যস্থান" বিষয়ে প্রথম বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করেন। সেই বক্তৃতার কথা আমরা স্থানান্তরে বলিব। তাহার একটি জায়গা এখানে উদ্ধার করিতেছি। উপরে দেবেন্দ্রনাথের বিধানবাদের ভাব যে রকমের ছিল বলিলাম, আমার সেই কথাটির সমর্থনের জন্য। সেই বক্তৃতায় তিনি বলিতেছেন, "ব্রাহ্ম-ধর্ম পৃথিবীর ধর্ম ; সুতরাং যে যে দেশের ব্রাহ্মধর্ম হইবে, তাহা সেই সেই দেশের সমাজভুক্ত হইবে। ঈশ্বরের রাজ্যে বিচিত্র ভাব, এই বিচিত্রতাই ঈশ্বরের রাজ্যের অলঙ্কার, এই বিচিত্রতাকে কেহই উন্মূলন করিতে পারিবেন না। আপন আপন দেশীয় ভাবে প্রতি দেশের লোককে ব্রাহ্মধর্ম পালন করিতে হইবে। আমাদের আপনাদের মধ্যে ব্রাহ্মধর্মকে আনিতে হইবে বলিয়া আমাদের পক্ষে ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুসমাজের ধর্ম করিতে হইবে।"

বিধানপরম্পরা যখন ক্রমপরিণামী ক্রমোন্নতিশীল, তখন বেদান্তকেই বা ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের ধারায় চরম বিধান কেন বলা হইবে? অবশ্য *Vaidantic Doctrines Vindicated* গ্রন্থে দেবেন্দ্রনাথ "final vedantic dispensation" বলিয়াছিলেন—বেদান্ত-বিধানকে ভারতের ইতিহাসে চরম বিধান বলিয়াছিলেন। কিন্তু বিধান যখন উন্নতিশীল (progressive revelation, progressive dispensation) তখন পুরানো কাঠামোকে বর্জন করিয়া নূতন বিধানও তো দাঁড়াইতে পারে। তাহা পুরাতনের নিত্য সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত অথচ নূতন যুগের বিচিত্র প্রয়োজন-সংগত হইবে। সেই বিধান দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মীবিধান এবং সেই বিধানের উপনিষদ্ ব্রাহ্মী উপনিষদ্। ইহা ভারতের পক্ষে এ কালের বিধান। ইহারি সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "আমরা কিছু নূতন ধর্ম প্রচার করিতেছি না।... চিরকাল হইতে যে ধর্ম উন্নত হইয়া চলিয়া আসিতেছে তাহাই ব্রাহ্মধর্ম।"

আধুনিক মনীষী অয়কেন খৃস্টধর্ম সম্বন্ধে ঠিক এই কথাই বলিতেছেন যে, চিরকাল হইতে যে ধর্ম (তাঁহার সভ্যতার ইতিহাসে) উন্নত হইয়া চলিয়া আসিতেছে, তাহাই খৃস্টানধর্ম। এবং তিনি দেবেন্দ্রনাথের মতো ঐতিহাসিক প্রণালী অবলম্বন করিয়াই খৃস্টান ধর্মবিধানের ক্রমোন্নতি দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

ধর্ম ও ইতিহাসের সম্বন্ধ বিষয়ে অয়কেনের মতের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের মতের সম্পূর্ণ ঐক্য দেখা যায়। দেবেন্দ্রনাথ পুরানী পন্থা অনুসরণ করেন নাই। ধর্মতত্ত্ব যে ইতিহাসের কোনো-এক পর্বে চূড়ান্তরূপে নিষ্পন্ন হইয়া চুকিয়া গিয়াছে এবং উত্তরকালে সেই একই জিনিসের যে অন্তহীন পুনরাবৃত্তি মাত্র চলিতেছে— এই কথা বলিয়া তিনি ধর্মকে আড়ষ্ট ও মৃত হইতে দেন নাই। সেইজন্য অভ্রান্ত শাস্ত্র বা গুরুকে মানিতে তিনি শেষ পর্যন্ত পারেন নাই— তিনি দেখিয়াছেন যে, ধর্মতত্ত্ব কালে কালে নূতন নূতনরূপে ব্যাখ্যাত হইবে। ধর্মের মহাশাস্ত্র যথার্থ ধর্মজীবন এবং যথার্থ ধার্মিক ইহার ব্যাখ্যাতা। এমনি করিয়া তিনি হিন্দুসমাজের জড় সংস্কারকে আঘাত দিলেন। অন্য দিকে তিনি নব্যদলের সঙ্গেও যোগ দিয়া এই কথা বলিতে পারিলেন না যে, হিন্দুধর্মের ইতিহাসে পর্বে পর্বে কেবল অসংখ্য পরিবর্তনই লক্ষ্য করা যায়— সেই পরিবর্তন পরম্পরাকে এক নিত্য সত্যের মধ্যে সম্পূর্ণ করিয়া দেখিবার উপায় নাই; অতএব আমাদিগকে নানা ধর্মের নানা সার সংগ্রহ করিয়া আমাদের ধর্মের সারকে তাহাদিগের সহিত জোড়া দিতে হইবে। তিনি দেখিলেন, প্রত্যেক ধর্মই নানা জায়গা হইতে তাহার পুষ্টি সংগ্রহ করিয়া লয়। কিন্তু কোনো ধর্মই নিজের ইতিহাসের ধারাকে অস্বীকার করিয়া, নিজের বিশিষ্টতাকে মুছিয়া ফেলিয়া, অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে খিচুড়ি পাকাইয়া একাকার হইয়া যাইতে পারে না। ধর্ম সম্বন্ধে যেমন সমাজ সম্বন্ধেও তেমনি— ইতিহাসের ভিতর দিয়াই ইহাদের অভিব্যক্তি ও বিকাশ ঘটিয়া থাকে। দেবেন্দ্রনাথ এই কথাটি বিশেষভাবে বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুসমাজের পরিণাম বলিতে তাঁহার মনে কুণ্ঠামাত্র হয় নাই। তিনি জানিতেন, "অতীত একটি সমাপ্ত কাহিনী নয় বর্তমান সর্বদাই ইহার মধ্যে নূতন কিছু আবিষ্কার করিতে ও জাগাইয়া তুলিতে পারে। অতীত এখনো বর্তমানের মধ্য দিয়া নূতন করিয়া তৈরি হইয়া উঠিতেছে।"*

---

* "The past is by no means a finished story. It is always open to the present to discover, to stir up, something new in it. Even the past is still in the making."—অয়কেন।

দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম ও সমাজের আদর্শ ভালো করিয়া না বোঝার জন্যই রাশীকৃত ভুল ধারণার বোঝা তাঁহার স্মৃতির ঘাড়ে চাপিয়া আছে। তাঁহার স্মৃতি সেইজন্য দেশের মধ্যে সজীব হইতে পারিতেছে না; তাঁহার আদর্শ দেশে কাজ করিতেছে না। তাঁহার প্রতি এই অন্যায়টি সব চেয়ে বড়ো অন্যায়। তিনি সমস্ত সহ্য করিয়া লোকচক্ষুর আড়ালে নিজেকে রাখিয়া গিয়াছেন—তাঁহার সে মহত্ত্ব, সে ঔদার্যের কোথাও তুলনা মিলে না। কিন্তু তাঁহার জীবনের সত্যকে তিনি আড়াল করিবার চেষ্টা করিলেও সে চেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য—একালের পক্ষে এবং এদেশের ভবিষ্যতের পক্ষে তাহার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দেবেন্দ্রনাথের বৈষয়িক দিক জমিদারি পরিচালনা

পুঙ্খানুপুঙ্খবিষয়েষ্বনুতৎপরোপি।
ধীরো ন মুঞ্চতি মুকুন্দপদারবিন্দং॥
সঙ্গীত নৃত্যকতি তানবংশগতাপি।
মৌলিস্থ কুম্ভপরিরক্ষণধীর্নটীব॥

যেমন সুধীরা নটী সংগীত, নৃত্য ও কত প্রকার তানের বশবর্তী হইয়াও মস্তকস্থিত কুম্ভ পতিত হইতে দেয় না, সেইরূপ ধীর ব্যক্তি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিয়াও মুক্তিদাতা ঈশ্বরের পদারবিন্দ পরিত্যাগ করেন না।

দেবেন্দ্রনাথের প্রথম বয়সে, আমার মনে হয় আত্মজীবনীর পর্বের শেষ পর্যন্ত, বিষয়-বৈরাগ্য পুরা মাত্রায় ছিল। দেনার দায়ে যখন সমস্ত বিষয়ই দেবেন্দ্রনাথ বিকাইয়া দিলেন, তখন ইচ্ছা করিলে সৎপথে থাকিয়াও বিস্তর বিষয় তিনি রক্ষা করিতে পারিতেন। অনেকে তাঁহাকে পরামর্শ দিয়াছিল যে আর কিছুই না হোক, রানীগঞ্জের কয়লার খনিগুলি তিনি হাতছাড়া না করেন; ইহার পরে তাহা হইতেই প্রচুর অর্থাগমের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তখন তিনি বিষয় সম্পত্তি যাক্ — এই মন্ত্রই জপিতেছিলেন। সুতরাং প্রায় ৪১ বছর পর্যন্তই বিষয়-বৈরাগ্য তাঁহার জীবনে পুরা মাত্রায় ছিল বলিতে হইবে। নিতান্ত সংসার ছাড়িয়া লোকালয় ছাড়িয়া ধর্মসাধনের মধ্যযুগীয় আদর্শ তাঁহার কাছে অপূর্ণ আদর্শ মনে হইত বলিয়া তিনি একেবারে দণ্ডকমণ্ডলু হাতে ফকির হইয়া বাহির হন নাই। অবশ্য ফকির না হইবার আরো কারণ ছিল। তাঁহার অত্যন্ত তীক্ষ্ণ সৌন্দর্যবোধ ছিল বলিয়া নির্দোষ ইন্দ্রিয়সুখ হইতে তিনি নিজেকে কোনোমতেই বঞ্চিত করিতে চাহিতেন না, কারণ সে বঞ্চনায় তাঁহার সৌন্দর্যবোধেরই তৃপ্তি সাধন হইত না। এইজন্য কোনো রকমের শ্রীহীনতা তিনি একেবারে সহ্য করিতে পারিতেন না। একটুখানি দুর্গন্ধে তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিত। সুগন্ধ দ্রব্য সর্বদা তাঁহার কাছে থাকা চাই, ফুল সর্বদা সামনে থাকা চাই। সেই সুগন্ধের ঘ্রাণ তিনি প্রাণ ভরিয়া লইতেন এবং হাফেজের কবিতা আবৃত্তি করিয়া বলিতেন ফুলের গন্ধে আমি তাঁরি গন্ধ পাই। ভালো রকমের রান্না ভিন্ন তাঁহার আহার হইত না। তাঁহার চারি দিক, তাঁহার সমস্ত কাজকর্ম, তাঁহার আসবাবপত্র

পোশাক-পরিচ্ছদ ঘরসজ্জা সমস্তই একেবারে নিখুঁৎ রকমের পরিপাটি হওয়া চাই। এমন সৌন্দর্যরসগ্রাহী লোকের পক্ষে ফকির সাজা অসম্ভব। সেই কারণেই তাঁহার সন্ন্যাস এক নূতন ধরনের সন্ন্যাস বলিতে হইবে। তাহাতে ভোগও আছে পুরামাত্রায়, ত্যাগও আছে পুরামাত্রায়।

এই-সকল কারণে ৪১ বছর বয়স পর্যন্ত বিষয়-বৈরাগ্য যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও তাঁহার পক্ষে সন্ন্যাসী হওয়া কোনোমতেই সম্ভব ছিল না। তাঁহার সৌন্দর্যভোগ-প্রবৃত্তি, তাঁহার পারিবারিক স্নেহপ্রেমের বন্ধন এবং লোকালয়ে সকলের মধ্যে থাকিয়া ধর্মসাধনার ভাব তাঁহাকে মধ্যযুগীয় সংসারবিরাগী সাধক করিয়া তুলিবার পক্ষে বাধা ছিল। সংসারের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সিমলায় যাইবার পূর্বে তাঁহার চারিটি ছেলেকে সঙ্গে লইয়া তিনি কিছুকাল পদ্মানদীতে ছিলেন। সেখান হইতে সিমলায় যাইবার সময় ছেলেদের বিদায় দিবার বেলায় তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। কারণ তিনি মনে করিয়াছিলেন হয়তো এই তাহাদের সঙ্গে শেষ বিদায়! সংসারের প্রতি বিরাগের লক্ষণ এ তো নয়।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, হিমালয় হইতে ফিরিয়া আসিবার পর হইতে তাঁহার ঐ বিষয়-বৈরাগ্য একেবারে ঘুচিয়া গেল। আমরা দেখিয়াছি সেই সময়েই তাঁহার পরিবারের সঙ্গে তাঁহার যোগ ঘনিষ্ঠতর হইল এবং তিনি পুরাদস্তর সংসারী সাজিলেন। তাঁহার ছেলেদের তখন বয়স হইয়াছে, দ্বিজেন্দ্র-নাথের বয়স ১৯, সত্যেন্দ্রনাথের ১৭, হেমেন্দ্রনাথের ১৫।

পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেবেন্দ্রনাথ ছেলেদের খুব কাছাকাছি পাইলেন। সেইজন্য পরিবারটা শুধু তাঁহার কাছে একটা বোঝা মাত্র না হইয়া তাঁহার জীবনের অঙ্গস্বরূপ হইল। তাঁহার স্ত্রী, তাঁহার পুত্রকন্যা, তাঁহার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব সমস্ত সম্বন্ধের ভিতর দিয়া তিনি আপনার ধর্মসাধনাটিকে পূর্ণতর করিবার একটা সুন্দর অবকাশ পাইলেন। সমাজের সঙ্গে ধর্মের সম্বন্ধ ইহার পূর্বে তাঁহার চিন্তার বিষয় হয় নাই। সমাজ-চৈতন্য তাঁহার চৈতন্যকে অধিকার করে নাই। এখন পরিবারের সঙ্গে জড়িত হইয়া তিনি দেখিলেন পরিবার যে সমাজেরই একটি বড়ো স্তম্ভ— যে দালানের মধ্যে সেই স্তম্ভটি দাঁড়াইয়া সে দালানটি নির্ভরযোগ্য বটে তো? তার ভিৎ কি পাকা? তার মধ্যে এতকাল ধরিয়া যে এদেশের মানুষ আশ্রয় পাইয়াছে, সে আশ্রয় কি বড়োর আশ্রয়— ব্রহ্মের আশ্রয়? সমাজতত্ত্ব সকল এমনি করিয়া তাঁহার মনের সামনে দেখা দিতে লাগিল, সমাজ-সংস্কারের জন্য তাঁহাকে প্রস্তুত করিল। তাঁহার ব্যক্তিত্ব আগে

ছিল স্বতন্ত্র। তাহার কাছে তখন নিজেই নিজের নিয়ম, নিজের মধ্যেই সমস্ত সত্য। এখন তাঁহার ব্যক্তিত্ব প্রসারিত হইয়া হইল সামাজিক ব্যক্তিত্ব। ভূতকাল হইতে বর্তমান পর্যন্ত যে সমাজ-চৈতন্যের ধারা বহিয়া আসিয়াছে নিজের ব্যক্তিত্বের মধ্যে সেই-সমস্ত চৈতন্যকে ধারণ করিয়া শোধন করিয়া সংস্কার করিয়া পূর্ণ করিয়া পুনরায় ভবিষ্যতের দিকে তাহাকে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য নূতন নূতন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করিতে হইবে। সেই বড়ো কাজেই তিনি এখন লাগিলেন।

এ সাধনায় বিষয়-বৈরাগ্য তো চলে না। এ যে একেবারে আধুনিক কালের সাধনা। এ সাধনা সমাজ-বিমুখ নয়, সমাজ-অভিমুখ। এই বড়ো সামাজিক ব্যক্তিত্বকেই বিকশিত করিবার জন্য সমাজ— ব্যক্তিত্বকে বিনাশ করিবার জন্য নয়।

এ সাধনায় অর্থ জিনিসটাকে অনর্থ মনে করিবার কোনো দরকার নাই। এ সাধনায় অর্থের বিশিষ্ট অর্থ আছে— অর্থটা নিতান্ত আবশ্যক। কারণ কোনো সমাজ শুধু বৈরাগ্যের দ্বারা বড়ো হয় না। গৃহী মানুষকে খাইয়া পরিয়া বাঁচিয়া বর্তিয়া থাকিতে হইবে এবং ভালোমতেই বাঁচিতে হইবে। সমাজের সেই জীবন-ধারণের জন্যই অর্থ দরকার। অর্থ বা wealth— সেই weal বা মঙ্গলের নিদান— তাহাকে ভগবানের দান বলিয়া কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মাথায় তুলিয়া লওয়া উচিত, তাহাকে জঞ্জাল বলিয়া ফেলিয়া দিলে সেইসঙ্গে নিজেকেও ফেলিয়া দিতে হয়। অর্থের শীর্ণতায় মানুষের শীর্ণতা, জাতির শীর্ণতা দেখা যায়।

দেবেন্দ্রনাথ প্রথম বয়সে জমিদারির দিকে ফিরিয়াও তাকাইতেন না, এখন দেখি জমিদারির দিকে তিনি মন দিয়াছেন। তার আয়-ব্যয়, হিসাব-পত্র, মামলা-মকদ্দমা, বিলি-ব্যবস্থা, শাসন-বিচার সমস্তই তিনি নিজে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে, সামাজিক ব্যাপারে তাঁহার উৎসাহের জন্য এ দিকে তাঁহার মনোযোগের কোনো কমতি নাই।

হঠাৎ এ কথা শুনিলে আমাদের দেশের চিরপ্রচলিত সাধু-সন্ন্যাসীর আদর্শে ঘা লাগে— মনে হয়, তবেই তো, সেই বিষয়বাসনা যদি জড়াইয়া রহিল, সেই ধনজন সৌভাগ্য-সম্পদ সুখ-ভোগ সমস্তই যদি রহিল, তবে আর ধর্ম হইল কোথায়? সর্বত্যাগী না হইলে কি সাধু হওয়া যায়? বলিতেছ মহর্ষি— অথচ শুনিতেছি, তিনি জমিদারি পরিচালনা করিতেন— এ কেমন মহর্ষিত্ব?

এ মহর্ষিত্বের আদর্শ আমাদের দেশের পক্ষে নূতন, এ কথা মানি। এ আদর্শ

রাজা রামমোহন রায় প্রথম এ দেশে প্রচার করেন এবং নিজের জীবনের দ্বারা প্রথম ইহার সম্ভাবনীয়তাকে প্রমাণিত করেন। ধর্মকে সমাজমুখীন এবং সমাজকে ধর্মমুখীন করিবার আদর্শ, তাঁহারই আদর্শ ছিল। সেইজন্য তিনি যেমন একেশ্বরবাদ যে হিন্দুশাস্ত্রের চরম কথা ইহা প্রমাণ করিয়া দিলেন, তেমনি সমাজতত্ত্ব, বিধিশাস্ত্র, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতির আলোচনা দ্বারা সেই একেশ্বরবাদকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য পথ প্রস্তুত করিলেন। এ কালের মানুষ যে শুধু হিমালয়ে গুহায় বসিয়া ধ্যান করিবে না, তাহাকে যে সামাজিক মানুষ হইয়া 'লোকশ্রেয়ঃ'— সাধনের দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্রকে উন্নততর করিতে হইবে— ধর্মসাধনার এই নূতন আদর্শ রামমোহন রায় নিজের জীবনের সর্বতোমুখী সাধনার দ্বারা আমাদের সামনে রাখিয়া গেলেন। তিনি শঙ্করশিষ্য অথচ বেস্থামের বন্ধু। তিনি গান লিখিলেন "মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর", অথচ সকল দেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে তাঁহার একান্ত সহানুভূতি। স্ত্রীলোকেরা তাহাদের ন্যায্য অধিকার পাইয়া সমাজে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে এজন্য ব্যবহারশাস্ত্র হইতে তিনি নজির হাজির করিতেছেন। পিতার সম্পত্তির অধিকারী যাহাতে জ্যেষ্ঠপুত্র হয় এবং অর্থটা দশ জায়গায় না ছড়াইয়া এক জায়গায় মূলধনের মতো সঞ্চিত থাকে ও দেশে ক্রমে ব্যাবসা-বাণিজ্যের অবাধ প্রসার হয়, এজন্যও বিধিশাস্ত্রের বিধান তিনি হাজির করিতেছেন। এই-সব বৈপরীত্য মিলিয়াছিল সেই এক মানুষে— যে মানুষ মুমুক্ষু হইয়াও ব্যবহার-জীবী ছিলেন, সমাজসংস্কারক ছিলেন, রাষ্ট্রনৈতিক ছিলেন এবং 'লোকশ্রেয়ঃ'র জন্য দিনরাত আপনাকে কাজের জালে জড়াইয়া রাখিয়াছিলেন। পুরানো কালের সাধু-সন্ন্যাসীর আদর্শের চেয়ে এই আদর্শই এখনকার কালের পক্ষে পূর্ণতর, এ কথা আমাদের দেশকে শীঘ্র হোক বিলম্বে হোক বুঝিতেই হইবে। ধার্মিক হইতে গেলেই যে সংসারত্যাগী হইতে হইবে এবং সংসারটাকে বিষয়াসক্ত লোকদের হাতে নষ্ট হইবার জন্য ফেলিয়া দিতে হইবে তাহার কোনো সার্থকতা নাই। সংসারের উন্নতির জন্য ধার্মিক লোকেরই বেশি দরকার। তাঁহারাই সমাজকে রাষ্ট্রকে আইনকে শিক্ষাকে দীক্ষাকে ধর্মের সঙ্গে সংগত করিয়া মানুষের সমস্ত সাধনাকে ভূমার সাধনা করিয়া তুলিবেন। সর্বমুক্তি বিনা কাহারো একলার মুক্তি নাই। সমস্ত মানুষ যে-পরিমাণে মুক্ত হইবে, সেই পরিমাণেই সাধক মুক্ত।

জমিদারি করিয়াও যে অধ্যাত্মযোগযুক্ত হওয়া যায়, এ কথা আমাদের দেশের

লোক সহজে বিশ্বাস না করিলেও দেবেন্দ্রনাথের জীবনই ইহার প্রমাণস্থল। প্রথম জীবনে যে তাঁহার প্রবল বিষয়-বৈরাগ্য ছিল, তাহা খুবই ভালো ছিল; কারণ বোধ হয় সমস্ত গ্রহণ করিবার পূর্বে একবার সমস্ত ছাড়িবার প্রয়োজন আছে। আমরা যে অনেক সময় বলি সংসারে থাকিয়া ধর্মসাধন আমাদের আদর্শ, তাহাতে আমরা ধর্মকে সংসারের সঙ্গে আপস করাই। পনেরো আনা থাকে সংসার, এক আনা ধর্মের জন্য ছাড়িয়া দিই। প্রশ্ন এই, সংসার আগে না ধর্ম আগে? ধর্ম আগে হইলে সংসার ধর্মের অনুকূল হইবার চেষ্টা করে; তখনই বাস্তবিক বিষয়বাসনা মরে এবং সমস্তই ভগবানের পূজা হইয়া উঠে। সংসার আগে হইলে ধর্মকে সংসারের সঙ্গে আপস করিতে হয়। তখনই ধর্ম মরে; বিষয়-বাসনাগুলিই বড়ো হইয়া উঠে। সেইজন্য একবার রিক্ত হইয়া তার পর গ্রহণ করিলে তখন এই দ্বিতীয় বিপদের হাত এড়ানো যায়। এ বিপদ প্রকাণ্ড বিপদ—এর মতো বিপদ আর নাই।

গিরীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর নগেন্দ্রনাথ ঋণ করিতে শুরু করেন এবং দেবেন্দ্রনাথ সেই ঋণ শোধ দিতে পারিবেন না বলায় তিনি দাদার উপর রাগ করিয়া বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যান, তাহা আমরা পূর্বেই শুনিয়াছি। গিরীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র গণেন্দ্রনাথও বোধ হয় এই-সব বৈষয়িক ব্যাপারে শত্রুপক্ষের উত্তেজনায় কিছুকালের মতো তাঁহার জ্যেঠামহাশয় দেবেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধপক্ষ হইয়াছিলেন। অবশেষে দুই পরিবার পৃথগন্ন হইবার কথা ওঠে; বসতবাড়িরও ভাগ হয়। বাড়ি ভাগের জন্য আদালত হইতে যখন বিশিষ্ট উচ্চপদস্থ একজন কর্মচারী আসিলেন, তখন দুই পরিবারের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটানোই যাহাদের উদ্দেশ্য এমন কতকগুলি তৃতীয় পক্ষের লোক সেই কর্মচারীকে গণেন্দ্রবাবুদের পক্ষে অনুকূল করিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে লাগিল। দেবেন্দ্রনাথকে যখন খবর দেওয়া হইল যে, বাড়ি ভাগের জন্য আদালত হইতে কর্মচারী আসিয়াছেন, তখন তিনি তেতলার ঘরে বসিয়া তত্ত্ববোধিনীর প্রুফ দেখিতেছিলেন। তিনি একবার নামিয়া আসিয়া বাড়ির সরকারকে বলিলেন, 'সাহেবকে বাড়ির চারি দিকের জমিজমা সমস্ত দেখাও।' এই কথা বলিয়া নিঃশব্দে উপরে চলিয়া গেলেন। তাঁহার বাড়ির লোকদেরও মনে হইতেছিল যে, এমন একটা গুরুতর ব্যাপারে তাঁহার নিজের তদ্‌বির ও খবরদারি করা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি কিছুই করিলেন না! একে কি বিষয়াসক্তি বলে?

ইহার পর গণেন্দ্রনাথ নিজের অপরাধ বুঝিতে পারিয়া আপনিই আসিয়া এক-

সময়ে দেবেন্দ্রনাথের কাছে ধরা দিলেন। গণেন্দ্রনাথ বরাবরই বিষয়-সম্পত্তি দেখিতেন। যা হোক, সেই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে একখানি চিঠি লেখেন— সে চিঠিখানি এক অপূর্ব চিঠি! চিঠিখানি এমন আশ্চর্য সরলতাপূর্ণ! সাংসারিক সম্বন্ধ কত রকমের কারণে নষ্ট হয়, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ সব সম্বন্ধের মধ্যেই ঈশ্বরের কল্যাণরূপ দেখিতে পাইতেন বলিয়া সংসারের কোনো নিষ্ঠুর আঘাতেও তাঁহার স্নেহপ্রীতির সম্বন্ধ একেবারে ভাঙিয়া যাইত না। চিঠিখানি অবিকল তাঁহার হস্তাক্ষরে এখানে তুলিয়া দিলাম।

গিরীন্দ্রনাথ জীবিত থাকিতেই গণেন্দ্রনাথ বিষয়কর্ম দেখিবার ভার গ্রহণ করেন। তখন হইতেই দেবেন্দ্রনাথ বিষয়কর্ম অল্প অল্প করিয়া দেখিতে আরম্ভ করেন— সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধান তখনো করিতেন না। প্রজাদের কল্যাণ সম্বন্ধে তিনি যে কত ভাবিতেন, তাহা তাঁহার নীচে উদ্‌ধৃত গোটাকতক জমিদারি সংক্রান্ত চিঠির টুকরা পড়িলেই বুঝা যাইবে। চিঠিগুলি সমস্তই গণেন্দ্রনাথকে লেখা হয়।

শিলাইদহ

৫ ফাল্গুন ১৭৭৪

(১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৮৫৩)

প্রাণাধিকেষু,

পরম শুভাশীষাং রাশয়ঃ সন্তু—

তোমার ২৭ মাঘের পত্রে নূতন প্রস্তাব হঠাৎ শুনিলাম। কেনী সাহেব ২০০০০০৲ টাকা দিয়া ছয় বৎসরের নিমিত্ত বিরাহিমপুর ইজারা লইবেক। কেনী সাহেব যে ইজারা লইয়া অগ্রে এত টাকা দিতে পারে তাহা তো সম্ভব হয় না। কেনী সাহেবের অধীনে অধুনা যে সকল প্রজা আছে তাহার মধ্যে অনেক প্রজা তাহার দৌরাত্ম্য জন্য তাহার এলাকা হইতে পালাইতেছে। বিরাহিমপুর তাহার হস্তগত হইলে এখানকারও অবস্থা তদ্রূপ হইবেক তাহার সন্দেহ নাই। ছয় বৎসর হস্তগত হইবার পরে এ জমিদারী প্রজাশূন্য দেখিতে হইবেক।…

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্মা

শাহাজাদপুর
১৬ই ফাল্গুন ১৭৭৪
(২৬এ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৩)

প্রাণাধিকেষু,

পরম শুভাশীষাং রাশয়ঃ সন্তু—

শ্রীযুক্ত মধ্যম বাবুর পত্র পাইয়া হঠাৎ জ্ঞাত হইলাম যে, তিনি কুমারখালিতে আসিতেছেন। কিন্তু কি নিমিত্ত যে এখানে এ সময়ে এতদূর আসিতেছেন তাহা কিছু বিশেষ লেখেন নাই। কিন্তু এদিকে বিরাহিমপুরে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে যে, শ্রীযুক্ত মধ্যম বাবু কেনী সাহেবকে বিরাহিমপুর ইজারা দিবার জন্য আসিতেছেন। যদি এজন্য তাঁহার এখানে আসা হয়, তবে তাহার পুর্বে এত গোলযোগ হওয়া ভাল হয় নাই। এখানকার প্রজারা সকলে সশঙ্কিত হইয়াছে। কুমারখালির প্রজারা এতদূর বলিতেছে যে, কেনী সাহেবের ইজারা হইলে তাহারা কুমারখালি ছাড়িয়া যাইবে। শ্রীযুক্ত মধ্যম বাবু এ পর্যন্ত এখানে আসিয়া পঁহুছেন নাই। তিনি আইলে এ বিষয় সবিশেষ অবগত হইব।···

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্মা

কুমারখালি
১৮ই ফাল্গুন ১৭৭৪
(২৮এ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৩)

প্রাণাধিকেষু,

পরম শুভাশীষাং রাশয়ঃ সন্তু—

এখানে শ্রীযুক্ত মধ্যম বাবু আসিয়া পঁহুছিয়াছেন।···কেনী সাহেব ভিন্ন অন্য কাহাকে ইজারা দিয়া টাকা সংস্থান করিবার উপায় হইলে ভাল হয়, তাহারই পরামর্শ করা যাইতেছে।···

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্মা

উপরের এই চিঠিগুলি ১৮৫৩ সালের চিঠি। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, এক দুর্বৃত্ত অত্যাচারী সাহেবের হাতে প্রজারা যাহাতে না পড়ে, সেজন্য তাঁহার মন উদ্‌বিগ্ন, অথচ সেই সাহেব প্রচুর অর্থ দিয়া ইজারা লইতে চাহিতেছে। কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, এ বিষয়ে সে সময়ের দু-একটা চিঠির নমুনা দেখা দরকার—

৪ পৌষ ১৭৮৫
(১৮ই ডিসেম্বর ১৮৬৩)
পদ্মার চর

প্রাণাধিক গণেন্দ্রনাথ,

…আমি তাম্বু হইতে তাড়াতাড়ি তোমাকে পত্র লিখিতেছি। সকল আমলারা হিসাব দেখাইবার জন্য এইক্ষণ আমাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

কালীগ্রামের প্রজারা এক্ষণে আমাকে তথায় যাওয়ার প্রার্থনায় দরখাস্ত করিল। যদি সুবিধা হয় তবে সেখানে যাইবার অত্যন্ত মানস। সেখানে চক্ষে না দেখিলে ইহাদের কথা কিছুই বুঝা যায় না। ইতি

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

১২ ফাল্গুন ১৭৮৫
(২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৪)

প্রাণাধিক গণেন্দ্রনাথ,

‥কালীগ্রামের ভগ্নাবস্থা দেখিয়া অতীব দুঃখিত হইলাম। নায়েব ও পেস্কারের উপদ্রবে প্রায় পাঁচ ছয় হাজার টাকার প্রজা পলাইয়া গিয়াছে এবং ফৌজদারী মোকদ্দমায় দুই তিন হাজার টাকা বৃথা খরচ হইয়াছে এবং মফঃস্বলে অপযশ হইয়াছে। যাহাতে এই সকল দোষ উদ্ধার হয় তাহার এক প্রকার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আসিয়াছি।…

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরে দেবেন্দ্রনাথের পঞ্চম পুত্র শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর দীর্ঘকাল ধরিয়া জমিদারি পরিচালনা করেন। তাঁহার কাছে শুনিয়াছি যে, দেবেন্দ্রনাথই তাঁহাকে বিষয়কর্ম কেমন করিয়া চালাইতে হইবে সে সম্বন্ধে নিজে উপদেশ দিতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যখন যান, তখন দেখিলেন যে, প্রজারা সকলেই তাঁহাদের শাসনে সন্তুষ্ট, বলে—আমরা রামরাজত্বে বাস করিতেছি। তাঁহার কাছে শুনিয়াছি যে, দেবেন্দ্রনাথ জমিদারিতে কতগুলি নিয়ম নিজে প্রথম প্রবর্তিত করেন। তাহার মধ্যে প্রধান নিয়ম এই যে, প্রজারা তাহাদের অভাব অভিযোগ সাক্ষাৎভাবে তাহাদের প্রভু জমিদারকে জানাইতে পারিবে। আর একটি নিয়ম এই যে, শুধু নায়েবের উপরই যে সমস্ত জমিদারির চালনা থাকিবে এবং আর কেহ তাহার কাজের ভালোমন্দ জানিতে পারিবে না তাহা হইবে না। জমিদারিতে একজন করিয়া পরিদর্শক (Inspector) থাকিবেন, তিনি নায়েব

হইতে সকল আমলার কাজকর্ম দেখিবেন এবং রিপোর্ট দিবেন। ইহাতে নায়েবদের যথেচ্ছাচার সংযত হইতে বাধ্য হয়। এ ছাড়া গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, ভালো জলাশয় প্রভৃতির সুব্যবস্থা তাঁহার দ্বারাই জমিদারিতে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার নামে এখনো বড়ো পুষ্করিণীর নাম আছে—দেবেন্দ্র-সরোবর।

দুরন্ত দুষ্ট প্রজাকে যে তিনি শাসন করিতেন না তাহা নয়। কিন্তু আগে ভালো করিয়া খোঁজ লইতেন, বিশিষ্ট প্রমাণ না পাইলে কোনো প্রজাকে শাসন করিতেন না। জ্যোতিবাবু বলেন যে, প্রজাদের সঙ্গে মামলা-মকদ্দমা করিতে তিনি পারতপক্ষে নারাজ ছিলেন— প্রায়ই মামলা তুলিয়া লইতেন।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী তাঁহার প্রণীত 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কর্মজীবন' বইটিতে লিখিয়াছেন যে, তিনি যখন গ্রামের পাঠশালায় পড়েন, তখন দেবেন্দ্র-নাথের জমিদারিতে একটি ঘটনা ঘটে যাহাতে বাংলার গ্রামে গ্রামে তাঁহার সাধুভাবের কথা ছড়াইয়া পড়ে। একবার তাঁহার জমিদারি হইতে একজন ব্রাহ্মণ সমস্ত পথ পায়ে হাঁটিয়া কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করেন এবং বলেন, "এ কেমন ধারা ব্যবহার! আপনকার জমিদারি কাছারির নায়েব আমাকে অক্ষম দেখিয়াও আমার কাছ থেকে খাজনা আদায় করিতে জোর জবরদস্তি করিয়া থাকে! শুনিয়াছি আপনি ধার্মিক পুরুষ, তাই সমস্ত পথটা হাঁটিয়া এখানে আসিলাম। আমাকে সময় না দিলে বাকি খাজনার টাকাটা শোধ করিতে পারিব না।" দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে স্নানাহার করাইয়া সুস্থ করিয়া পরে দেখা হইলে বলিলেন, "খাজনার টাকাটা নায়েবকে ফেলে দিলেই যখন গোলমাল চুকিয়া যায়, তখন আর কি? নিন এই টাকা, এ টাকা আমি আপনাকে দিলাম, আপনি এটা নায়েবকে দিলেই হইবে।" এই ঘটনার কথা তখন বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে রটিয়া গিয়াছিল।

একবার সাহাজাদপুরে থাকিতে প্রজাদিগকে লইয়া তিনি ১১ই মাঘের উৎসব সম্পন্ন করেন। সে সম্বন্ধে বেচারামবাবুকে লিখিতেছেন—

সাহাজাদপুর,
১৬ মাঘ ১৭৮৮ শক

"...আমি এখানে ১১ মাঘের উৎসবের দিবস একাকী উপাসনা না করিয়া, এখানকার আমার ভদ্র প্রজাদিগকে আহ্বান করিয়া একত্র উপাসনা করিয়া-

ছিলাম। তাহাতে আশ্চর্য নূতন প্রকার আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম। এই সাহাজাদপুর ঘোর পল্লীগ্রাম, এখানে সায়ংকালে যে ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছিল, তাহাতে ৩০০।৪০০ ভদ্রলোক একত্র হইয়াছিল।…এখানকার উপাসনা-গৃহও দীপান্বিত হইয়াছিল। এবং এই গৃহের ভিতরে বাহিরে লোকে পরিপূর্ণ, কিন্তু আশ্চর্য এই যে এখানেও সকলে নিস্তব্ধ হইয়া উপাসনাতে মনোনিবেশ করিয়াছিল। মধ্যাহ্নে ভোজনে ও সায়ংকালে উপাসনার পর জলপানে শতাবধি লোক হইয়াছিল এবং ১৫০০।২০০০ কাঙ্গালির ভোজন হইয়াছিল। যাঁহারা এখানে এই উৎসবে আসিয়া উপাসনা করিয়াছিলেন, বোধ হয় ধর্মবিষয়ে তাঁহাদের কিছু না কিছু উপকার হইয়া থাকিবে।…

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্মা।"

বছরে বছরে পুণ্যাহের সময়েও তিনি সমস্ত প্রজাদিগকে লইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতেন এবং বিশেষ উৎসবের আয়োজন করিতেন।

এ তো গেল প্রজাদের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধের দিকের কথা। জমিদারির আমলা কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁহার কি রকমের সম্বন্ধ ছিল সেটাও জানা দরকার।

প্রজাদের উপর কোনো অন্যায় বা অত্যাচার কোনো কর্মচারীর দ্বারা হইতেছে ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাইলে দেবেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ সেই কর্মচারীকে ছাড়াইয়া দিতেন। গণেন্দ্রনাথকে এক চিঠিতে তিনি লিখিতেছেন—

সিরাজগঞ্জ
২৩এ পৌষ ১৭৮৫
(৬ই জানুয়ারি ১৮৬৪)

"…কৃষ্ণলালকে নায়েবি পদ হইতে পরিচ্যুত করিতে বাধ্য হইলাম। তাহাকে সাহাজাদপুরে নায়েবি কর্মে রাখিলে ক্রমিকই গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা। আপাততঃ হরেন্দ্রবাবুকে সাহাজাদপুরের নায়েবি পদে রাখিয়া আসিয়াছি।…

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্মণঃ।"

এই কৃষ্ণলাল, কৃষ্ণলাল মৈত্রেয় কি না জানি না। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর কাছে শুনিয়াছি যে, কৃষ্ণলাল মৈত্রেয় নামে এক নায়েবের কাজে তিনি এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাহাকে দুইখানি গ্রাম মৌরসী করিয়া দান করিয়াছিলেন। আজ পর্যন্ত তাঁহার উত্তরাধিকারীরা সেই সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন।

পূজার সময় পার্বণী হিসাবে কর্মচারীরা যাহাতে এক মাসের বেতন বেশি

পায় জমিদারিতে তিনি এই নিয়ম স্থির করিয়া দেন। সে সম্বন্ধে এক চিঠিতে তিনি লিখিতেছেন—

বোলপুর
১৩ই ভাদ্র ১৭৮৭
(৩০এ আগস্ট ১৮৬৫)

"প্রাণাধিক গণেন্দ্রনাথ,

…পূজার সময়ে পার্বণি সকলে এক মাসের বেতন পায় এই নিয়ম ধার্য করিলে ভাল হয়। দেওয়ানজীও এক মাসের বেতন পরিমাণ পার্বণি পাইতে পারেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্মণঃ।"

আমলা কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁহার ব্যবহার বিষয়ে একটা অপবাদ এই আছে যে, তিনি যখন-তখন কর্মচারী ছাড়াইয়া দিতেন। কাহার যে কখন কাজ যাইবে তাহার স্থিরতা ছিল না। কিন্তু এ বদল কেবল সেই-সকল কর্মচারীদের সম্বন্ধে হইত, যাহারা প্রভু ও প্রজা উভয়ের হিতের দিকে তাকাইয়া কাজ করিত না। বেশির ভাগ সময়ে প্রজাদের প্রতি অন্যায় অত্যাচারের খবর প্রকাশ হইয়া পড়িলেই তিনি সেই কর্মচারীকে আর রাখিতেন না। কিন্তু যাহারা বিশ্বস্ত কর্মচারী হইত, তাহাদিগকে তিনি অভাবে পড়িলে সাহায্য তো করিতেনই, বৃদ্ধ বয়সে পেন্‌সনের পর্যন্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। কৃষ্ণলাল মৈত্রেয়ের কথা যেমন শোনা গেল, তেমনি শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিশ্বাস দেওয়ানকেও তিনি নানা সময়ে অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। একবার প্রসন্নবাবুর কন্যার বিবাহের খবর পাইয়া তিনি লিখিতেছেন—

"প্রিয় বিশ্বাস,

তোমার দ্বিতীয় কন্যার বিবাহের সাহায্যে তোমাকে এক হাজার টাকার চেক দিতেছি—আমার স্বতন্ত্র কেশে এ টাকা জমাখরচ করিতে যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়কে বলিব।…

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্মা।"

এমন কত বার যে তিনি ইহাকে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন তাহা বলিবার নয়।

তবু জমিদারিসংক্রান্ত ব্যাপারে প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধে উচ্চনীচের ব্যবধানের একটা খিরকিচ্ থাকিয়াই যায়—সেটা এখনকার কালের গণতন্ত্রের ভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। সব মানুষের সমান অধিকার; কেহ যে ধনী হয় এবং কেহ হয়

নির্ধন, সেটা কেবলমাত্র একটা আকস্মিক ঘটনা; সুতরাং ধনীর চিরকাল ধন ভোগ এবং দরিদ্রের চিরকাল দারিদ্র্য ভোগ এ জগতের শাশ্বত বিধান হইতেই পারে না— এ-সকল ভাব দেবেন্দ্রনাথের মনে স্থান পায় নাই। সোশ্যালিজ্‌মের কথা তিনি জানিলেও সে সম্বন্ধে তাঁহার যে সহানুভূতি খুব অগ্রসর হইয়া যাইত, এমন আমার মনে হয় না। আমরা দেখিয়াছি ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রতিই তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না, সোশ্যালিজ্‌ম্ সম্বন্ধে আরো না থাকিবার কথা। এখনকার সমবায় বা Co-operation-এর প্রণালী তিনি গ্রহণ করিতেন কি না সন্দেহ। কাউণ্ট টলস্টয় যেমন জমি কৃষকের, সুতরাং জমিদারের তাহাতে কোনো ন্যায়সংগত অধিকার নাই বলিয়া নিজের বিষয়-সম্পত্তি চাষীদিগকে বিলাইয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং নিজে লাঙ্গল ধরিয়াছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ তেমনি করিয়া জমিদারি করা একটা হেয় ব্যাপার এ ধারণায় কোনোদিন উপনীত হইতেন বলিয়া আমার মনে হয় না। কেন, ইহার কারণ কি? জমিদারি সম্বন্ধে এই একটা মস্ত বড়ো ভাবিবার দিক কি তাঁহার মনের মধ্যে কখনো রেখাপাত করে নাই? এ কালের এত বড়ো একটা ভাব কি তিনি ধরিতে পারেন নাই।

কোথায়, তাহার তো কোনো আভাস মাত্র তাঁহার কোনো লেখায় বা চিঠিতে পাই না। আসল কথা, এ কালের কোনো রকমের বিপ্লবের ভাব কোনো দিন তাঁহার মনের সহানুভূতিকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। বিপ্লবকে তিনি সর্বদাই ভয় করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন, "আমা কর্তৃক দেশের উন্নতি হইবে— এই উৎসাহে লোকাচার দেশাচার উন্মূলন ও বিজাতীয় সভ্যতা আনয়ন করিবার নিমিত্তে সময়ের ব্যবধান সংকোচ করিতে গেলে আমারদের লক্ষ্য সিদ্ধি আরো সুদূরপরাহত হইবে।" সুতরাং বিপ্লব মাত্রকেই তিনি বার্কের মত "সময়ের ব্যবধান সংকোচ" করিবার ব্যর্থ প্রয়াস মনে করিতেন। এ দেশীয় ব্যবস্থা, আচার-ব্যবহার, আদবকায়দা সমস্তই যথাসম্ভব রক্ষা করিয়াও তাহাতে প্রয়োজনমত পরিবর্তন সকল প্রবেশ করাইয়া তিনি চলিবার ইচ্ছা করিতেন। সেই-সকল ব্যবস্থা ধর্ম ও নীতি-সংগত হইলেই তাঁহার মনের সন্তোষ ছিল। জমিদার প্রভু থাকিয়া নিজের প্রজাদের মঙ্গল সাধন করিবেন, এ ব্যবস্থা ধর্মসংগত ও নীতিসংগত; সুতরাং ইহাতে কোনো দোষ নাই। যে বিপ্লবে সমাজে এই-সকল চিরকালের স্থায়ী মঙ্গল সম্বন্ধের একেবারে মূলে গিয়া ঘা দেয়, যাহা সকল বাধ্যবাধকতার সম্বন্ধকে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া প্রত্যেক মানুষকে একেবারে স্বতন্ত্র স্বাধীন করিয়া দাঁড় করায় এবং সেই স্বতন্ত্র হইবার চেষ্টায় নিয়মের নির্লজ্জ ব্যভিচারকে যাহা একান্ত

প্রয়োজনীয় বলিয়াই মনে করে, সেই আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের ইব্‌সেন হাউপ্‌ট্‌ম্যান ডস্টয়ভ্‌স্কির সমাজবিপ্লবের প্রস্তাব দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতি কোনো দিনই অনুমোদন করিতে পারিত কিনা সন্দেহ। সুতরাং জমিদারি ব্যাপারে ধর্মের পথে চলিয়াও তিনি আভিজাত্যকে বিসর্জন দেন নাই। দরিদ্র প্রজাদের সঙ্গে যে-পরিমাণ ব্যবধান রাখা দরকার, সেই পরিমাণ ব্যবধানই তিনি রাখিয়াছিলেন।

অথচ আভিজাত্যের যে কোনো গর্ব তাঁহার মনে ছিল, এ কথা মনে করা ভুল। কারণ, এ বিষয়ে তিনি একেবারেই সচেতন ছিলেন না। দেশের আদবকায়দা রক্ষার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত মনোযোগ ছিল। কোনো রকমের অশিষ্টাচার বা অসংগত বাক্য ও ব্যবহার হইলে তিনি বিরক্ত হইতেন। সেই শিষ্টাচারের দিক হইতে সকলের প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহারের নিয়ম তাঁহার নির্দিষ্ট ছিল। সে নিয়ম সম্বন্ধে তিনি বিষম কড়াক্কড় ছিলেন। যেমন-তেমন পোশাক পরিয়া তাঁহার ছেলেরাও তাঁহার সামনে উপস্থিত হইতে পারিতেন না। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছে শুনিয়াছি যে, তিনি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছেন; দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বসাইয়া পিতাকে খবর দিতে যাইবেন বলিয়া জোব্বা পরিতেছেন। এই রকম দু-তিনবার দেখার পর তিনি বুঝিলেন যে, ইহাই দেবেন্দ্রনাথের ছেলেদের সম্বন্ধে রীতি। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়, রাজনারায়ণবাবু, দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে খুব গল্প জমাইয়াছেন, হাসি-তামাসা চলিতেছে, রাজনারায়ণবাবুর অট্টহাস্যে ঘর ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে, দ্বিজেন্দ্রবাবু সেখানে ঠায় দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার হাসিবার জো নাই। দ্বিজেন্দ্রবাবুকে যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে, হাসি সংবরণ করা তাঁহার পক্ষে কি দুঃসাধ্য সাধন—হাসির সামান্য কারণ মাত্রেই তাঁহার সমস্ত মানুষটা শুদ্ধ হাসিয়া ওঠে। তিনি প্রাণপণে পিতার কাছে দাঁড়াইয়া হাতের ইশারায় রাজনারায়ণ-বাবুকে ও শাস্ত্রী মহাশয়কে হাসিতে নিষেধ করিতেছেন, কারণ হাসিবার উপায় নাই। এতটুকু আদব-কায়দার ব্যতিক্রম দেবেন্দ্রনাথের কাছে ঘটিতে পাইত না। প্রজাদের সম্বন্ধে, নায়েব দেওয়ান প্রভৃতি কর্মচারীদের সম্বন্ধে এই রকমের ব্যবহারের নিয়মই নির্দিষ্ট ছিল। বাড়ির ভৃত্যদের সম্বন্ধেও নিয়ম সব বাঁধা। তাঁহার ভৃত্য থাকিত অনেক; কাহাকেও বেশি খাটিতে হইত না। কিন্তু যাহার যখন যে কাজ তাহাকে নির্দিষ্ট নিয়মে সেই কাজটি করিতে হইবে। সেখানে কোনো ঢিলেমি, কোনো ফাঁক, কোনো অশিষ্টাচার তিনি সহ্য করিতেন না। তিনি যেখানে বসিতেন তাঁহার সামনের টিপায়ে একটা জেব-ঘড়ি খোলা থাকিত।

বিরাহিমপুর

১২৭৬ সালে স্থিত জমা বাদ ওজর ও বাদ বকেয়া ৭২,৫১৮।
১২৭৭ সালে স্থিত জমা বাদ ওজর ও বাদ বকেয়া ৭৫,১৪৭

১২৭৬ সালে উশুলাত হাল বকেয়া ও বকেয়া সমেত ৭৭,৭৫৯
১২৭৭ সালে উশুলাত হাল বকেয়া ও বকেয়া সমেত ৭৬,২৮৯

১২৭৬ সালে ইস্তফা [illegible] ৪৬,৪৪৮। সদর খাজনা ১১৬০২। অবশিষ্ট [illegible]
খরচ ১১৯৫৮ = ৮০৪০৫।
১২৭৭ সালে ইস্তফা [illegible] ৪৩,৩২৭। সদর খাজনা ১১৬০২। অবশিষ্ট [illegible]
খরচ ১৩৮৮৪ = ৭৬৮৫১।

কালীগ্রাম

১২৭৯ সালের ৬ চৈত্রে আমি কালীগ্রামে যাইয়া [illegible] [illegible]
[illegible] যে সকল পরগণার [illegible] [illegible] প্রজাদিগের
[illegible] [illegible] জমী জমা [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] জমী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

জমি ৬০০/বিঘা জমা ৪২২।।
[illegible] জমি জমা [illegible] [illegible] প্রজা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

১১ চৈত্র
সন ৭৯ সাল

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের হিসাব রাখার নমুনা

তিনি ঘড়ি দেখিয়া ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে স্নানাহার করিতেন। এ একটা তাঁহার চরিত্রের বিশেষ দিক— এই নিয়মপরায়ণ নিয়মনিষ্ঠ দিক। ইংরাজীতে যাহাকে বলে martinet, তিনি তাহাই ছিলেন।

শ্রীযুক্ত রবিবাবু তাঁহার 'জীবনস্মৃতি'তে লিখিয়াছেন, "বহুকাল প্রবাসে থাকিয়া পিতা অল্প কয়েক দিনের জন্য যখন কলিকাতায় আসিতেন তখন তাঁহার প্রভাবে যেন সমস্ত বাড়ি ভরিয়া উঠিয়া গম্ গম্ করিতে থাকিত। দেখিতাম, গুরুজনেরা গায়ে জোব্বা পরিয়া, সংযত পরিচ্ছন্ন হইয়া, মুখে পান থাকিলে তাহা বাহিরে ফেলিয়া দিয়া তাঁহার কাছে যাইতেন। সকলেই সাবধান হইয়া চলিতেন। রন্ধনের পাছে কোনো ত্রুটি হয়, এইজন্য মা নিজে রান্নাঘরে গিয়া বসিয়া থাকিতেন। বৃদ্ধ কিনু হরকরা তাহার তকমাওয়ালা পাগড়ি ও শুভ্র চাপকান পরিয়া দ্বারে হাজির থাকিত। পাছে বারান্দায় গোলমাল দৌড়াদৌড়ি করিয়া তাঁহার বিরাম ভঙ্গ করি, এজন্য পূর্বেই আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা ধীরে ধীরে চলি, ধীরে ধীরে বলি, উঁকি মারিতে আমাদের সাহস হয় না।"

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, "একদিন আমাদের বাড়ির পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের সম্মুখে বসিয়া তালপাতায় ক, খ প্রভৃতি অক্ষরে দাগা বুলাইতেছিলাম—বোধ হয় আমার বয়স তখন ৫ বৎসর— সেই সময় পিতৃদেব আমাদের পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। গুরুমহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমি দাঁড়াইলাম না। তিনি ফিরিয়া আসিয়া, আমাকে দাঁড়াইতে বলিলেন। আদব-কায়দার প্রতি এমনি তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।…

"তাঁহার 'রাশভারী' ছিল। তিনি যখন বাড়ি থাকিতেন, তখন যেন বাড়ি 'গম্‌গম্' করিত। পাছে কোনো কর্তব্যের ত্রুটি হয়, চাকর-বাকর সকলেই সর্বদা সশঙ্ক থাকিত। সব কাজ ঠিক নিয়মে চলিত। তিনি কাহাকেও শাসন করিতেন না অথচ সমস্ত কাজ সুশৃঙ্খলরূপে নির্বাহ হইত। তিনি যখন বাড়ি হইতে চলিয়া যাইতেন তখন চাকর-বাকরদিগের মন হইতে যেন একটা পাষাণ-ভার নামিয়া যাইত। ইণ্ডিয়ান মিরারের লেখক কাপ্তেন পামার কখনো কখনো আমাদের বাড়িতে আসিতেন। পিতৃদেব বিদেশে চলিয়া গেলে পামার সাহেব বাড়ির ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া একদিন বলিয়াছিলেন— 'When the cat is away, the mice will play'।"[১]

দেবেন্দ্রনাথের এই কড়া নিয়মপরায়ণ দিকটাকেই আভিজাত্য বলিয়া অনেকে

১ "পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনস্মৃতি", প্রবাসী, মাঘ ১৩১৮

ভুল বুঝিয়াছেন। এ নিয়মপরায়ণতা কেবল অন্যের কর্তব্য সম্বন্ধেই যে প্রকাশ পাইত তাহা নয়, অন্যের প্রতি তাঁহার নিজের কর্তব্যেও পুরা মাত্রায় প্রকাশ পাইত! নহিলে এতবড়ো বহুসম্বন্ধবিশিষ্ট বৃহৎ সংসারের 'কর্তা মহাশয়' হইয়া সকলকে বাঁধিয়া রাখা তাঁহার দ্বারা সম্ভবপর হইত না। এতবড়ো বৃহৎ জমিদারির প্রত্যেক প্রজার ও আমলা-কর্মচারীর সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে সহায় ও আশ্রয়-দাতা হওয়ার দায়িত্বও তিনি সম্পন্ন করিতে পারিতেন না। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার কাছে শুনিয়াছি যে, এক তাঁহার দ্বিতীয় কন্যা সুকুমারীর স্বামী ছাড়া আর তাঁহার সকল জামাই এক সময়ে তাঁহার বাড়িতেই বাস করিতেন। ১৮৬১ খৃস্টাব্দে সুকুমারীর বিবাহ হয়, ১৮৬৪ খৃস্টাব্দে সুকুমারীর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার খবর তত্ত্ববোধিনীতে বাহির হয়। সুতরাং বিবাহের পর তিনি বোধ হয় বছর-দুই বাঁচিয়া ছিলেন। জামাইরা তাঁহার সঙ্গে বাস করিতেছেন বলিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে ব্যবহারের লেশমাত্র ইতরবিশেষ দেবেন্দ্রনাথ ঘটিতে দিতেন না। সকলের সম্বন্ধেই যথাযোগ্য ব্যবস্থা স্থির হইয়া আছে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র-বাবু লিখিয়াছেন যে, কলিকাতায় তাঁহার বড়োদিদিমার একখানা ভালো বাড়ি ছিল এবং সেই দিদিমার এক পালিতা কন্যা মাত্র ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ছাড়া তাঁহার প্রকৃত উত্তরাধিকারী আর কেহই ছিল না। দিদিমার মৃত্যু হইলে সেই বাড়ির স্বত্ব দেবেন্দ্রনাথে আসিয়া বর্তিল ও বাড়ি দখল করিবার কথা উঠিল। কাহারো কাহারো সেই বাড়ির উপর লুব্ধ দৃষ্টি ছিল। বাড়িটির দাম ২০।৩০ হাজারের কম হইবে না। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ সেই বাড়ি দিদিমার পালিতা কন্যাকেই দান করিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের একটি হিসাবের খাতা আমার হাতে আসিয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাই যে পারিবারিক এবং জমিদারি সংক্রান্ত সমস্ত হিসাব তিনি নিজের হাতেই রাখিতেন। সেই খাতাটির আরম্ভে একটি ধর্মপ্রসঙ্গ এবং শেষে একটি ধর্মপ্রসঙ্গ তাঁহার নিজের হাতে লেখা রহিয়াছে। গোড়ার উপদেশটি তাঁহার হস্তাক্ষরে উদ্‌ধৃত করিলাম। এ উপদেশটিতে তাঁহার আদর্শের পূর্ণ ছবিটি পড়ে নাই। কিন্তু হিসাবের খাতার গোড়ায় ইহা যে লেখা হইয়াছে, তাহার একটি গভীর তাৎপর্য মনে উদয় না হইয়া যায় না।

তার পরের প্রথম পাতার অবিকল ছবিটিও দিলাম।

সংসারের মাসহারা খরচের হিসাব পড়িয়া দেখি যে তাঁহার নিজের স্ত্রীপুত্র-কন্যাদের জন্য কত সামান্য অর্থই বরাদ্দ ছিল। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারকদের মাসিক বৃত্তি ৩২৫ টাকা, আর দ্বিজেন্দ্রবাবু, হেমেন্দ্রবাবু, জ্যোতিরিন্দ্রবাবু প্রভৃতির পরিবারের

জন্য এবং বাড়ির অন্যান্য আশ্রিত লোকদের জন্য মাসিক বৃত্তি ৩৫৬ টাকা মাত্র বরাদ্দ। স্ত্রী এবং কন্যাদের জন্য ২১৫ টাকা। অবশ্য এই বৃত্তিগুলি ছাড়া সমস্ত সংসারের মোট ব্যয়ভার ছিল, কারণ সমস্ত পরিবার তখন একান্নবর্তী পরিবার—কিন্তু সে ব্যয়ও খুব বেশি নয়।

অথচ তাঁহার দানের তালিকা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। দান সম্বন্ধে তিনি একেবারে মুক্তহস্ত ছিলেন। দানের একটা খসড়া তালিকা আমি তাঁহার হিসাবের খাতাগুলি হইতে খাড়া করাইয়াছি— সব হিসাব পাওয়া যায় নাই। কারণ বাইবেলের উপদেশ মতে তাঁহার ডান হাত যাহা দিত, বাম হাত তাহার খবর রাখিত না। তাঁহার বাড়ির লোকের কাছে শুনিয়াছি যে, একবার তিনি একজন লোককে খুব ভারী গোচের দান করিবেন বলিয়া তাহাকে লইয়া নৌকায় চলিয়া যান, সেখানে সকলের দৃষ্টির অগোচরে তাহাকে দান করেন এবং সে সম্বন্ধে কোনো কথা কাহাকেও না বলিবার জন্য বিশেষভাবে সাবধান করিয়া দেন।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন যে, একবার দেবেন্দ্রনাথ যখন দেরাদুনে ছিলেন, তখন কোনো বিষয়কর্ম উপলক্ষে তাঁহার সঙ্গে তিনি দেখা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি ৺সীতানাথ ঘোষের চিঠি বাহির করিয়া বলিলেন "বেচারা বড় কষ্টে পড়েছে।" সীতানাথবাবু একজন বৈজ্ঞানিক ছিলেন—তিনি তাড়িত চিকিৎসার জন্য এক রকমের নূতন যন্ত্র উদ্‌ভাবন করিয়াছিলেন। হিন্দু তাড়িত জ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ অনেকগুলি প্রবন্ধ তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ করেন। দেবেন্দ্রনাথ সীতানাথবাবুকে ১০০০ টাকা দিতে অনুমতি করিলেন। সীতানাথবাবু অত টাকা পাইবেন বলিয়া আদৌ প্রত্যাশাও করেন নাই।

দানের তালিকা হইতে বিশিষ্ট দানগুলি বাদে অন্যান্য অসংখ্য দানের ফর্দ ছাঁটিয়া দিলাম। বলা বাহুল্য, এ তালিকা কোনোমতেই সম্পূর্ণ নয়। প্রতি মাসে তাঁহার দানের খরচ অন্যান্য খরচের চেয়ে বেশি বই কম ছিল না। শুনা যায় যে, ঋণ শোধ বাদে তিনি জীবনে ২২ লাখ টাকা দান করিয়াছিলেন।

দানের তালিকা

১২৭৬ সাল		১২৭৭ সাল	
২১শে কার্তিক		১৭ই বৈশাখ	
ত্রিম্বক শাস্ত্রী, বোম্বাই		রাজনারায়ণ বসু	
সাহায্য	২০০৲	ধর্মশালা হইতে পাঠান	৩০০৲

১২৭৮ সাল		
প্রসন্নকুমার বিশ্বাসকে		
বাড়ী খরিদ জন্য		
দেওয়া হয়		২৮০০৲
১২৮১ সাল		
২রা বৈশাখ		
রাজনারায়ণ বসু		
দং কন্যার বিবাহে		
সাহায্য	৩০০৲	
১৬ই বৈশাখ	৩০০৲	৬০০৲
২রা অগ্রহায়ণ		
ঈশানচন্দ্র বসু		
বাটী মেরামত		
বাবদ	১০০৲	
২৮শে মাঘ	১০০৲	২০০৲
২৬শে পৌষ		
অক্ষয়কুমার মজুমদার		
দং মাতার শ্রাদ্ধের		
সাহায্য		২০০৲
২৮শে ফাল্গুন		
নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়		
দং জার্মানীতে উপাধি গ্রহণের		
জন্য দান		৬০০৲
১২৮৩ সাল, ইং ১৮৭৬।৭৭ সাল		
১১ই বৈশাখ		
বঃ রাজনারায়ণ বসু		
দং তাহার বক্তৃতা ছাপানো খরচ		
দান		২৫০॥/৬
বঃ ঈশানচন্দ্র বসু		
দং তাহাকে সাহায্য		৩৪০৲
৭ই ভাদ্র ২২শে আগস্ট ১৮৭৬		
ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার		
সায়েন্স এসোসিয়েশনে		
সাহায্য		১০০০৲
২১শে মাঘ		
নবগোপাল মিত্র		
(বৎসরে ২বার দেওয়া হইত)		
ন্যাসনেল মেলায় দান		১০৲
১২৮৫ সাল		
৮ই আষাঢ়		
বাবু শিবচন্দ্র দেব		
কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ		
নির্মাণ জন্য		৪৯০৲
প্রসন্নকুমার বিশ্বাস		
দং প্রথম কন্যার বিবাহের		
সাহায্য	১৫০০৲	
৯ই আশ্বিন	১৫০০৲	৩০০০৲
১২৮৬ সাল		
৫ই চৈত্র		
Dr. Reverend Charles		
Voysey		
দং আয়রলণ্ডে দুর্ভিক্ষ উপশমের		
জন্য ৯০ পাউণ্ড		১৩৫০৲
ব্লাইণ্ড ফণ্ডে দান		
"গবর্ণমেণ্ট কাগজ" খরিদ করিয়া		
দেওয়া হয়		১০৩০০০৲

১২৮৭ সাল

১১ই আষাঢ় ২৪শে জুন
১৮৮০ খৃস্টাব্দ
প্রসন্নকুমার বিশ্বাসকে দান ২০

১৫ই আষাঢ়
বঃ H. R. Wood Esqr.
Hony. Treasurer, Irish
Famine Relief Fund
দং উক্ত ফণ্ডে দান ১০০৲

২১শে আশ্বিন
কালনার ব্রাহ্ম সমাজে দান
(প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে
দেওয়া হইত) ১০০৲

১২৮৮ সাল

৩রা বৈশাখ
অকস্‌ফোর্ড ইণ্ডিয়ান
ইনষ্টিটিউটে দান ৬০৩৬৪

১৮ই জ্যৈষ্ঠ
বঃ রাজনারায়ণ বসু
দং কন্যার বিবাহে সাহায্য ৪০০৲

বঃ উমেশচন্দ্র দত্ত
দং দ্বারকানাথ রায়ের পরিবারের
সাহায্য ২০০৲

১২৯১ সাল

২৪শে ভাদ্র
বং কালীবর বেদান্তবাগীশ
দং পাতঞ্জল দর্শন ছাপানো
জন্য ১০০৲

৩রা পৌষ
বঃ প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়
দং National Congress
Reception ফণ্ডে দান ৩০০৲

২৬শে অগ্রহায়ণ
কাপ্তেন হেয়ারসন সাহেবকে
সাহায্য ১০০৲

৫ই পৌষ
বঃ রাজকুমার সর্বাধিকারী
দং Prince Albert Victor
মহাশয়ের আগমন উপলক্ষে ৫০০

১২৯৭ সাল

আশ্বিন মাস
বঃ অক্ষয়কুমার মজুমদার
দং স্ত্রীর শ্রাদ্ধে সাহায্য ৩০০৲

বং হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন
দং পুত্রের বিবাহে ১০০৲

১২৯৯ সাল

বঃ শিবনাথ শাস্ত্রী
দং দুর্ভিক্ষের সাহায্য জন্য ২০০৲

২২শে ফাল্গুন
বঃ রাজকুমার সর্বাধিকারী
দং দুর্ভিক্ষের সাহায্য ২০০৲

১৩০০ সাল

বঃ হেমচন্দ্র মল্লিক
দং আসামের হত্যাঘটিত
মোকদ্দমার সাহায্য ১০০৲

১৩০০ সাল

বঃ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন
দং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের
মেমোরিয়েল ফণ্ডে দান ১০০৲

১৩০২ সাল

১৭ই শ্রাবণ
বঃ আর. সি. দত্ত, হুগলি
দং বাঙ্গালা কাব্য প্রকাশ জন্য
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে
দান ১০০৲

১৩০৩ সাল

১১ই অগ্রহায়ণ
বঃ নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়
দং উঁহাকে দান ৩০০৲

১৩ই অগ্রহায়ণ
বঃ হেমেন্দ্রনাথ সিংহ
(প্রতিমাসে ৫০৲ টাকা করিয়া
দেওয়া হইত)
দং এককালীন দান ১০০৲

১৯শে ভাদ্র
বম্বের তিলক সাহেবের
মোকদ্দমার সাহায্য ২০০৲

বেহালা ব্রাহ্মসমাজ মেরামত
জন্য ৬ই কগ্রহায়ণ ১০০৲

২৮শে ১৩১০ ১০০৲ ২০০৲

৮ই ভাদ্র
ইণ্ডিয়ান সঙ্গীত সমাজে
দান ৩০০৲

২৮শে আশ্বিন ৩০০৲ ৬০০৲

২৪শে পৌষ
রণজিৎ সিং, ক্রিকেটওয়ালা
দং দান ১০০৲

১৩০৬ সাল

২০শে জ্যৈষ্ঠ
মাদ্রাজ ব্রাহ্মসমাজের
গৃহ মেরামত জন্য ১০০৲

১২ই শ্রাবণ
বঃ প্রিয়নাথ শাস্ত্রী
দং-কন্যার বিবাহে সাহায্য
(প্রথম কন্যা) ৲

১৭ই আশ্বিন
বঃ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী
দং খাসিয়ার ব্রাহ্মসমাজের
বাটী তৈয়ারি দান ২০০৲

২২শে আশ্বিন ১৩০৬
বঃ কে. জি. গুপ্ত
দং ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে
দান ৫০০৲

২৭শে অগ্রহায়ণ
বঃ British Indian Association
দং বুয়র যুদ্ধের সময় দান ১০০৲

২২শে চৈত্র
দং মহারাণী ভারতেশ্বরীর
স্মৃতিফণ্ডে সাহায্য ৩০

১৩ই বৈশাখ ১৩০৮
বঃ বিনয়েন্দ্রনাথ সেন
দং ফ্লেচার উইলিয়মের বিদায়
অভ্যর্থনা ফণ্ডে দান ৪০০.

১৮ই বৈশাখ
শিউড়ির লাইব্রেরিতে
দান ১০০.

বঃ শিবনাথ শাস্ত্রী
দং বাঁকীপুর অনাথ আশ্রমে
দান ১০০৲

২৪শে অগ্রহায়ণ
বঃ ভূপেন্দ্রনাথ বসু
দং কংগ্রেসে এককালীন
দান ১০০০.

১৬ই মাঘ
বঃ উমেশচন্দ্র দত্ত
দং ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান উর্দু তে
তরজমা করার ব্যয় ৲

৯ই শ্রাবণ
হেমেন্দ্রনাথ সিংহ
এককালীন দান ১০০০৲

১০ই পৌষ
বঃ কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায়
দং পুষ্করিণী খনন জন্য ৭০০৲

১১ই ফাল্গুন
জাপানের কন্‌ফারেন্সের
চাঁদা ১০০০৲

১৭ ফাল্গুন
গুরুচরণ মহলানবিশ
ব্রাহ্ম বালক বিদ্যালয়ে
সাহায্য ৫০০৲

১২৯০ সাল
১৩ই চৈত্র
বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ
দং প্যারিচাঁদ মিত্রের ট্রষ্টি ফণ্ড
১০০০৲

১২৯১ সাল
৩১শে ভাদ্র
শ্রীকণ্ঠ সিংহ ৬০০০৲

২১শে অগ্রহায়ণ
বাবু আনন্দমোহন বসু
সিটিকালেজের সাহায্যের
জন্য

১১ই ভাদ্র
প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ৫০০০৲

যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়
দং বাড়ী ক্রয় জন্য ১০০০৲

৪ঠা পৌষ
প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টর
মেমোরিয়েল কমিটিতে দান
বঃ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
২০০০৲

৮ই ফাল্গুন
সখী সমিতি ফণ্ডে
দান ৫০০৲

১২৯৭ সাল

৭ই ভাদ্র

বাবু শিবচন্দ্র দেব

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রচারক

ফণ্ডে দান ৪০০৲

১লা কার্ত্তিক

কংগ্রেসে দান—

জ্ঞেঃ ঘোষাল ২০০০৲

১২৯৮ সাল

২৪শে পৌষ

বৈদ্যনাথ কুষ্ঠাশ্রমের জন্য দান

বঃ রাজনারায়ণ বাবু ১০০৲

৫ই ভাদ্র

বিলাতের থিষ্টিক চার্চ্চের

সাহায্য ১৬ পাউণ্ড ১ হুণ্ডি

চার্টার মার্কেন্‌টাইল ব্যাঙ্কের

১ ড্রপ ২২২॥/৯

১২৯৯ সাল

৫ই চৈত্র

বঃ প্রসন্নকুমার বিশ্বাস ২০০০৲

১৭ই চৈত্র

বিলাতের থিষ্টিক চার্চ্চের

সাহায্য ১৬৫॥৩

১৩০০ সাল

২রা আশ্বিন

বঃ কালীবর বেদান্তবাগীশ

১০০৲

১২ই পৌষ

বঃ শিবনাথ শাস্ত্রী

দং হ্যামারগ্রেন সাহেবকে

দিবার জন্য ১০০৲

১৩০১ সাল

১২ই ভাদ্র

বঃ উমেশচন্দ্র দত্ত

দং কালা বোবাদিগের

স্কুলের সাহায্য ১০০০৲

১৪ই কার্ত্তিক

বিলাতে থিষ্টিক চার্চ্চের সাহায্য

১০ পাউণ্ড ১৭৯।৶০

১৩ই অগ্রহায়ণ

বঃ চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়

দং বেহালার ব্রাহ্মসমাজ

মেরামত জন্য ১০৫৲

১লা মাঘ

বঃ বিপিনচন্দ্র পাল

দং ব্রাহ্মধর্ম্ম ইংরাজীতে

অনুবাদ জন্য সাহায্য ২০০৲

৩০ ফাল্গুন

ডায়মণ্ডহারবারের নিকট

পারুলিয়া গ্রাম অগ্নিদগ্ধ

হওয়ায় তাহার সাহায্য

২০০৲

১৩০২ সাল		১৩০২ সাল	
১০ই শ্রাবণ		২৮শে চৈত্র	
বঃ হেমেন্দ্রনাথ সিংহ		কলিকাতার আর্য সমাজের	
দং উঁহার "প্রেম" বহি ছাপানোর		বাটী নির্মাণ জন্য দান	
সাহায্য	৩০০৲	বঃ মহাবীর প্রসাদ, সেক্রেটারি	
২১শে আশ্বিন	১০০৲ ৪০০৲		১০০০৲

তাঁহার দান সম্বন্ধে আর-একটি কথা বলা দরকার। তাঁহার আশ্রিত কোনো লোককেই যখন তিনি অর্থ সাহায্য করিতেন, তখন তাহার কাছে কোনো কৃতজ্ঞতা ফিরিয়া পাইবার ইচ্ছা মনের মধ্যে রাখিতেন না। তাহা ছাড়া সেই অর্থ আগে ঈশ্বরকে নিবেদন করিয়া পরে তাঁহার প্রসাদ তাঁহার নৈবেদ্যের মতো তাহা সেই আশ্রিত ব্যক্তিকে দিতেন। ঠিক এই কথাগুলিই তাঁহার একটি চিঠিতে পড়িয়াছি—একজনকে তিনি লিখিতেছেন—

শিলাইদহের পরপার
পদ্মানদীর উপর
১লা মাঘ, ১৭৮৫ শক

প্রীতিভাজনেষু,

শ্রদ্ধাপূর্বক নমস্কারা বহবঃ সন্তু—

এই মাঘ মাসের সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই শতমুদ্রা প্রীতিপূর্বক ঈশ্বরকে নিবেদন করিয়া দিয়া সেই নৈবেদ্য তোমার পবিত্র সন্নিধানে প্রেরণ করিতেছি; প্রসন্ন ভাবে ইহা গ্রহণ করিয়া আমার মনেতে সন্তোষ দিবে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্মণঃ।

শ্রীযুক্ত রবিবাবু লিখিয়াছেন যে, দেবেন্দ্রনাথ "মনের মধ্যে কোনো জিনিস ঝাপসা রাখিতে পারিতেন না" বলিয়াই "তিনি যাহা সংকল্প করিতেন তাহার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তিনি মনশ্চক্ষুতে স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া লইতেন" এবং "এইজন্য কোনো ক্রিয়াকর্মে কোন্ জিনিসটা ঠিক কোথায় থাকিবে, কে কোথায় বসিবে, কাহার প্রতি কোন্ কাজের কতটুকু ভার থাকিবে, সমস্তই তিনি আগাগোড়া মনের মধ্যে ঠিক করিয়া লইতেন এবং কিছুতেই কোনো অংশে

তাহার অন্যথা হইতে দিতেন না।” তিনি লিখিয়াছেন, “এই কারণেই তাঁহার সঙ্গে ব্যবহারে সকলকেই ভীত ও সতর্ক থাকিতে হইত।…কারণ তাঁহার সংকল্পে, চিন্তায়, আচরণে ও অনুষ্ঠানে তিলমাত্র শৈথিল্য ঘটিবার উপায় থাকিত না।” আমি বলিয়াছি, তাঁহার এ দিকটা একেবারে ইংরাজীতে যাহাকে বলে martinet দিক— কঠোর নিয়মপরায়ণ দিক। কিন্তু ইহার কারণ রবিবাবু যাহা মনে করেন যে, ছোটো হইতে বড়ো পর্যন্ত সমস্ত কল্পনা ও কাজ দেবেন্দ্রনাথের যথাযথ ছিল বলিয়াই তিনি যাহা সংকল্প করিতেন তাহার নড়চড় হইতে দিতেন না, সে কারণ সম্পূর্ণ কারণ নয়। ইহার যে কারণ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাই আমার কাছে সম্পূর্ণতর কারণ বলিয়া মনে হয়।

তিনি লিখিয়াছেন, “সময়ে সময়ে মাঘোৎসবের সময় আমরা তাঁহার ভবনে ব্রাহ্মগণের সম্মিলিত অধিবেশন করিতাম। আমাদের কার্যের যেমন রীতি হঠাৎ স্থির হইল তাঁহার ভবনে সম্মিলিত অধিবেশন করিলে ভালো হয়, অমনি তৎপর দিন মহর্ষির সন্নিধানে গিয়া উপস্থিত। মহর্ষি বলিলেন—‘আসিবে, সকলে আসিয়া এক সঙ্গে বসিবে, ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় কি, কিন্তু সাত আট দিন সময় দেওয়া চাই।’ এই বলিয়া তিনি উপাসনা কালে সেই বিষয় চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ; ঈশ্বরের সত্তা ও সান্নিধ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সম্মিলিত অধিবেশনের প্রত্যেক বিষয় স্থির করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভবনে কোন্ বিশেষ স্থানে ঐ অধিবেশন হইবে, তাঁহার পরিবারবর্গের মধ্যে কে কে সেখানে থাকিবেন, কে কে কী করিবেন, আতিথ্য ও পরিচর্যার কী বন্দোবস্ত হইবে, ইত্যাদি সমুদয় বিষয় ধ্যানাবস্থাতে মনে ধারণা করিয়া একখানি সমগ্র ছবি প্রস্তুত হইল। সমুদয়ই তাঁহার উপাসনার অঙ্গীভূত হইল। তৎপরে পরিবার-পরিজনকে ডাকিয়া তদনুরূপ আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

“একবার একটি বিশেষ কারণে এই বিষয়টি আমার মনে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হইয়াছিল, সে বিষয়টি এই। বোলপুরের শান্তিনিকেতনে আশ্রমের যখন প্রতিষ্ঠা হয়, তখন প্রায় একমাস পূর্বে মহর্ষি আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন—‘প্রতিষ্ঠার দিনে প্রাতঃকালীন উপাসনার পরে তোমাকে কিছু বলিতে হইবে।’ আমি বলিলাম—‘যে আজ্ঞা আপনি যাহা আদেশ করিতেছেন, তাই আমি করিব।’ তৎপরে বাড়িতে আসিয়া ঐ উৎসবের কার্যপ্রণালী বিষয়ে ভাবিতে গিয়া মনে হইল যে, আমি যাহা বলিব তাহা বৈকালে ৫টার সময় বলিলে ভালো হয়,

কারণ কার্যপ্রণালীতে তখন কিছু কাজ দেখিলাম না, আর তখনই চারি দিকের গ্রামের লোকের জনতা হইবার সম্ভাবনা। ইহা মনে হওয়াতে দুই-তিন দিন পরে মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এইরূপ প্রস্তাব করিলাম। শুনিয়া মহর্ষি কিয়ৎক্ষণ নয়ন মুদ্রিত করিয়া রহিলেন। অবশেষে মাথা নাড়িয়া এরূপ প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। আমি আশ্চর্যান্বিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, যে আমি বক্তা সেই আমার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলেন না। এই অনুভব করিলাম যে একবার উপাসনা কালে ঈশ্বরের সত্তা ও সান্নিধ্যে যে সমগ্র কার্যপ্রণালী স্থির করিয়াছেন তাহার একটি বদলাইলে অপরগুলি বদলাইতে হয়, সেটা তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার, তাই সম্মত হইলেন না।"

সকল কর্তব্যকার্যই তাঁহার এইপ্রকার ঈশ্বরের সত্তা ও সান্নিধ্য জ্ঞানের সহিত করার রীতি ছিল। তাঁহার পরিচারক ও বহুদিনের সঙ্গী প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে একটি ঘটনার বিবরণ শুনিয়াছি। সেটি এই, একবার তাঁহাদের এজমালি বিষয়ের কোনো বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন হয়। তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র-দিগকে ডাকিয়া বলিলেন—"তোমরা উভয়পক্ষ একমত হইয়া কোন একজন আইনজ্ঞ ব্যক্তিকে মধ্যবর্তী করিয়া চিরদিনের মত এজমালি বিষয়ের একটা ব্যবস্থা করিয়া লও, যেন ভবিষ্যতে আর বিবাদ বিসম্বাদ না হয়।" তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণ শুনিয়া বলিলেন—"আমাদের নির্ভর আপনার উপর; আপনি যাহা করিয়া দিবেন, তাহাই শিরোধার্য, আইনজ্ঞ ব্যক্তিকে পয়সা দিবার প্রয়োজন কি?"—ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের এই ভাব দেখিয়া মহর্ষি সেই ভার গ্রহণ করিলেন। এজমালি বিষয়ের প্রধান কর্মচারীকে কাগজপত্র লইয়া নিজভবনে আসিয়া থাকিতে আদেশ করিলেন; লোকজন যাতায়াত ও দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ করিয়া দিলেন; এমন-কি, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়েরও নিকটে যাওয়া বন্ধ হইল। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—তাঁহারা উঁকি মারিয়া দেখেন মহর্ষি ধ্যানস্থ আছেন, মধ্যে মধ্যে চক্ষু খুলিতেছেন ও সম্মুখস্থ কাগজপত্র দেখিতেছেন, মধ্যে মধ্যে এজমালি বিষয়ের কর্মচারীকে ডাকাইয়া কোনো কোনো অংশ বুঝিয়া লইতেছেন। এইরূপে চারি-পাঁচ দিন গেল; মহর্ষি ঈশ্বরের সত্তা ও সান্নিধ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বিশেষ চিন্তাপূর্বক একটা কর্তব্য নির্ধারণ করিলেন। তৎপরে ভ্রাতুষ্পুত্র-দিগকে ও স্বীয় সন্তানদিগকে আহ্বান করিয়া সেই ব্যবস্থার কথা জানাইলেন, শুনিয়াছি তাহা সকলের সন্তোষকর হইল! এইরূপে সর্বকার্যে ঈশ্বরদর্শন তাঁহার সাধনের এক প্রধান সংকেত ছিল।

এই দিক হইতে দেখিতে গেলে আর বুঝিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না যে, তাঁহার বৈষয়িকতা তাঁহার আধ্যাত্মিকতার বিরোধী ছিল না, আধ্যাত্মিকতার অন্তর্ভূত ছিল। আগে ঈশ্বরের পায়ে নিবেদন করিয়া পরে তাঁহার নৈবেদ্যের মতো যিনি গ্রহীতা তাঁহাকে তিনি দান করিয়াছেন। তাঁহার দান এইরূপে ঈশ্বরের পূজা ছিল। তাঁহার আদানও পূজা ছিল; কারণ সেও তিনি তেমনিভাবেই তাঁহারি প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করিতেন। ঈশ্বরের সত্তা ও সান্নিধ্যের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া তবে তিনি বিষয়কর্ম করিতেন এবং পারিবারিক কর্তব্য সকল স্থির করিতেন। সুতরাং বিষয়কর্মও তাঁহার পূজার অঙ্গীভূত ছিল। এ-সমস্তই পূজার অঙ্গীভূত ছিল বলিয়াই কোনো ব্যবস্থার শৈথিল্য, কোনো নিয়মভঙ্গ, কোনো অশিষ্টাচরণ তাঁহাকে এমন করিয়া আঘাত করিত। তাহাতে যেন সমস্ত পূজার পরিপূর্ণ সংগীতটির তাল কাটিয়া যাইত; সমস্ত পূজার অখণ্ড ছবিটির অঙ্গহানি হইত। আমরা মুখে বলি 'যদ্ যদ্ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ'। কিন্তু ব্রহ্মে কর্ম সমর্পণের আদর্শ যে কি তাহা দেবেন্দ্রনাথের জীবনেই আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ   হিমালয় ও কাশ্মীর ভ্রমণ
ব্রাহ্মসমাজের সম্মিলনের নিষ্ফল চেষ্টা

দেবেন্দ্রনাথের শরীর পঞ্চাশ পার হইবার পূর্বেই ভাঙিয়া পড়ে— চোখ এবং কান দুই ইন্দ্রিয়ের দুর্বলতা দেখা দেয়। একবার হিমালয়ে থাকিবার সময় তিনি বরফ-গলা কনকনে ঠাণ্ডা ঝরনার জলে স্নান করিয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহার কানের ইন্দ্রিয়ের বিশেষ জখম হয়। শরীরের দুর্বলতার প্রধান কারণ অবশ্য অতিরিক্ত মানসিক শ্রম। তাহা ছাড়া আর-একটি বড়ো কারণ ছিল, তাঁহার অর্শের রোগ। অর্শ হইতে এত বেশি পরিমাণে রক্তপাত হইত যে, তাহাতেই তিনি ক্রমশ দুর্বল হইয়া পড়িতেছিলেন। তাই দেখিতে পাই যে, ১৮৬৪ খৃস্টাব্দে ৪৭ বছর বয়সেই তিনি রাজনারায়ণবাবুকে লিখিতেছেন, "আমার চক্ষুরিন্দ্রিয় আর বড় দেখিতে পায় না, কর্ণেন্দ্রিয় আর বড় শুনিতে পায় না, বাক্য আর অধিক কথা কহিতে চায় না। আমার ইন্দ্রিয় সকল বিষয় হইতে অবসর লইবার জন্যে আমাকে বড়ই ব্যস্ত করিতেছে।"

এই ভাঙা শরীরেই তিনি যুবাদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতেছিলেন তাহা আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। শরীরের অবসাদ, বয়সের জরা, তাঁহার মনকে অবসন্ন বা জীর্ণ করিতে পারে নাই।

তবু এই সময় হইতেই তিনি কর্মজীবন হইতে এক রকম অবসর লইলেন বলিতে হইবে। 'পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ'— বাস্তবিকই ঠিক পঞ্চাশ বছর বয়সেই তিনি পরিব্রাজক হইলেন। এখন হইতে আর লোকালয়ের ঘাটে ঘাটে ভাবের পসরা বহিয়া বিকিকিনি নয়, এখন সেইখানে পাড়ি জমাইবার চেষ্টা—যেখানে কূলহীন কালো জলের অনন্ত বিস্তার, যেখানে সহযাত্রী তরী আর নাই!

কর্মজীবন হইতে এত তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িবার কারণ কি? এই এক বছর আগেও সমাজের সর্ববিধ উন্নতিতে যাঁহার পুরাদস্তুর উৎসাহ ও উদ্যম, এক বছর পরে একেবারে সে মানুষের জীবনের এমনতর সম্পূর্ণ বদল, এর মানে কি? অবশ্য বয়সের যখন ভাঁটা পড়ে, তখন পাকা ফলটি যেমন বোঁটা হইতে ক্রমে আলগা হইয়া আসে, তেমনি সংসার হইতে একটা বিরতির ভাব এদেশের লোকের মনে আসা খুবই স্বাভাবিক। যাহারা বলে জীবনটা সংগ্রামের

ব্যাপার, তাহারা শেষ পর্যন্ত জিন আঁটিয়া জোয়াল পরিয়া দৌড়াইয়া মরাটাকেই বীরত্ব বলিয়া মনে করে; যতক্ষণ না হাঁটু ভাঙিয়া মুখ থুবড়াইয়া পড়িবে ততক্ষণ তাহারা থামিতে চায় না। তাহাদের হিসাবে এইটেই "লাইফ্"। আমাদের দেশে বলে যে, মৃত্যু যখন আসিবেই, তখন তাহার জন্য প্রস্তুত হওয়া চাই। তাহার পূর্বে কিছুকাল নিজেকে সমস্ত সম্বন্ধ-জাল হইতে ছিন্ন করিয়া বিশ্বের নিঃসঙ্গ নির্জনতার মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া চাই। সেইজন্যই প্রব্রজ্যা, সেইজন্যই বনবাসের ব্যবস্থা। একবার সমস্ত জগতের মর্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জীবন-মৃত্যুকে মুখোমুখি করিয়া দাঁড় করাইয়া সমস্ত জীবনটাকে মৃত্যুর সঙ্গে মিলাইতে হইবে, মৃত্যুর ছন্দে জীবনের রাগিণী কেমন বাজে তাহা শুনিতে হইবে। সেই যে জীবনের মধ্যে থাকিয়াই জীবনকে একটু তফাত হইতে দেখা, মৃত্যুর চোখ দিয়া দেখা— তাহাতেই জীবনের বড়ো একটি করুণ মধুর সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠে। প্রব্রজ্যার জীবনের সেই সৌন্দর্য। এ সৌন্দর্য সূর্যাস্তের পরে সন্ধ্যাকাশের রক্তিমার মতো— তার পরেই একেবারে অন্ধকার এবং অন্ধকারের মধ্যে লোকলোকান্তরের অনন্ত বিস্তার।

তবু কর্মজীবন শেষ না হইতেই এই ভোগবিরতি আসার কোনো মানে নাই। ফলটি না পাকিলে তাহার বোঁটা আল্‌গা হইবে কেমন করিয়া? দেবেন্দ্রনাথের কর্মজীবন আরম্ভ হইতে না হইতেই যে তাহা অঙ্কুরেই বিনাশ পাইবে ইহার মানে কি? ১৮৫৮ খৃস্টাব্দে তাঁহার কর্মজীবনের সূর্য একেবারে মাঝ গগনে প্রদীপ্ত, আর ১৮৬৪ খৃস্টাব্দেই তাহার অস্ত যাইবার জোগাড়?

দেবেন্দ্রনাথের অকালবার্ধক্য এবং প্রব্রজ্যা দুয়েরি কারণ ব্রাহ্মসমাজের বিবাদবিচ্ছেদ, কারণ তাহার পর হইতেই তিনি নিজের সমাজকে কেবলমাত্র উপাসনার একটা জায়গা করিয়া রাখিলেন, তাহার পিছনে আর খাটিলেন না।

রাজনারায়ণ বসু তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন, "আমি ব্রাহ্মধর্মবোধিনী সভা সংস্থাপন করি। আদিব্রাহ্মসমাজ কেবলমাত্র উপাসনার স্থান, যে খুসি এস উপাসনা করিয়া চলিয়া যাও।...আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত প্রচার কার্যের কোন সংস্রব নাই। ব্রাহ্মধর্ম প্রচার জন্য আমি ঐ সভা সংস্থাপন করি। ...নানা কারণবশতঃ আর অধিক দিন সভা টেঁকিল না। সেই সকল কারণের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঔদাসীন্য একটি কারণ। কেশব বাবু আদিসমাজ পরিত্যাগ করা অবধি তিনি কেমন একরকম ভগ্নোত্তম হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি সর্বদা আমাদিগকে বলিতেন আমাদিগের এক্ষণে দুই মাত্র কার্য—আদিব্রাহ্মসমাজ গৃহে

প্রতি বুধবার নিয়মিত উপাসনা করা এবং প্রতি মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করা।"

১৮৬৭ খৃস্টাব্দের নভেম্বরে (১৭৮৯ শক) দেবেন্দ্রনাথকে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের সভ্যগণ এক অভিনন্দন পত্র পাঠান, সেই অভিনন্দন পত্রে প্রথম 'মহর্ষি' এই উপাধি তাঁহার নামের ললাটে দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয় সেই সময় হইতেই ব্রাহ্মসাধারণের মধ্যে এবং এ দেশে তিনি 'মহর্ষি' বলিয়া সকলের কাছে পরিচিত ও সম্মানভাজন হইয়া আসিতেছেন। অভিনন্দন পত্রটিতে দেবেন্দ্রনাথ ত্রিশ বছর ধরিয়া ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্য যে-সকল কাজ করিয়াছেন, তাহারই একটি সকৃতজ্ঞ স্বীকার দেখিতে পাওয়া যায়। এই অভিনন্দনের জবাবে দেবেন্দ্রনাথ যে চিঠিখানি লেখেন তাহাতেও তাঁহার ধর্ম-জীবনের বিকাশের ইতিহাস সংক্ষেপে তিনি ব্যক্ত করেন—কেমন করিয়া তাঁহার অধ্যাত্মজীবনের প্রথম উদ্‌বোধন হইল, কেমন করিয়া তিনি উপনিষদের সাক্ষাৎ পাইলেন, কেমন করিয়া বেদান্ত দর্শনের মত উপনিষদে দেখিতে পাইয়া সমস্ত উপনিষদ্‌কে ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি করিতে পারিলেন না এবং ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ সংকলন করিতে লাগিলেন, ইত্যাদি—এ সমস্তই আমাদের জানা কথা। এই চিঠির শেষে তিনি লেখেন, "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ভারতবর্ষের এক কোণ হইতে সম্প্রতি উঠিতেছে, পরে হয়ত ইহা নামানুযায়ী কার্য করিবে, হয়ত এতকাল যাহা হয় নাই, ইহা দ্বারা তাহা হইবে—এক ঈশ্বরের উপাসনা ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইবে; সকলে একবাক্য হইয়া পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিবে; এই দুইটি আমার কামনা।"

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অভিনন্দনের উত্তরে এই চিঠিতে ব্রাহ্মসমাজকে তাহার আদর্শের ভিত্তিতে দৃঢ় রকমে প্রতিষ্ঠিত করিবার কাজে দেবেন্দ্রনাথ যে কৃতকার্য হন নাই, এক রকম করিয়া তিনি নিজেই সে কথা কবুল করিয়াছেন। এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা তাঁহার অসম্পূর্ণ কাজ যে একদিন সম্পূর্ণ হইতে পারে, এই আশার কথাও তিনি আশ্চর্য ঔদার্যের সঙ্গে বলিয়াছেন।

এই অকৃতকার্যতাই তো তাঁহার জীবনের সব চেয়ে বড়ো কৃতকার্যতা। এই "অকৃত কার্য অকথিত বাণী অগীত গান বিফল বাসনারাশি"ই যুগে যুগে সমস্ত মহাপুরুষদের জীবনে, ভাবুকদের জীবনে জমিয়া জমিয়া উঠিয়াছে। কারণ, যত বড়ো তাঁহাদের আদর্শ, যত বড়ো দৃষ্টি, যত বড়ো উপলব্ধি, তত বড়ো তাঁহাদের

কাজ হয় না। কাজের মধ্যে তাঁহাদের ভাব সম্পূর্ণ বাঁধা পড়িতে পারে না। সেইজন্যই কাজের হিসাবে সংসারে তাঁহাদের ব্যর্থতা ঘটে।

সুতরাং কৃতকার্যতার হিসাবের ফর্দ ধরিয়া যদি পৃথিবীর মহাপুরুষদের এবং ভাবুকদের মূল্য কষিতে হয়, তবে পৃথিবীর কোনো ভাবুকের কোনো মূল্য নাই; কারণ "ভাবের সাথে ভবের মিলন" আজ পর্যন্ত হয় নাই। সেইজন্য ভাবুকদিগকে লোকে পাগল বলিয়া উপহাস করিয়াছে, তাঁহাদিগের কাহাকে কাহাকেও কত রকমের নিগ্রহ সহ্য করিতে হইয়াছে। অথচ কবি ওশেনেসির ভাষায় বলিতে গেলে চিরকাল ধরিয়া এই ভাবুকেরা এই কবিরাই কি "movers and shakers of the world" নন? জগতের সমস্ত আন্দোলনের বিদ্রোহবিপ্লবের পরিবর্তনের মূলে কি ইঁহারা নাই? ইঁহাদের যে কাজ তাহা "প্রমাণের অগোচর, প্রত্যক্ষের বাহিরেতে বাসা" এবং "তর্ক তারে পরিহাসে, মর্ম তারে সত্য বলি জানে।" বাহিরে ইঁহাদের ব্যর্থতা বলিয়াই ভিতরের দিক হইতে ইঁহাদের সার্থকতা; সংসারে ইঁহাদের ঠাঁই হয় নাই বলিয়াই ব্রহ্মের মধ্যে ইঁহাদের অত্যন্ত বড়ো আসন; কাজের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে ইঁহাদের পর্যবসান নয় বলিয়াই ভাবের অনন্ত আকাশে ইঁহাদের পাখা দুটার স্বচ্ছন্দ মুক্তি ও বাধাহীন বিহার।

ব্রাহ্মসমাজের বিচ্ছেদের পর হইতেই দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের কাজ হইতে অবসর লইলেন। কলিকাতা সমাজের নাম আদিব্রাহ্মসমাজ হইল, এবং তাহা কেবলমাত্র রামমোহন রায়ের ট্রস্টডীড অনুযায়ী উপাসনার স্থান হইয়া রহিল। তাহার সামাজিক অংশ প্রায় লোপ পাইতে বসিল। রাজনারায়ণবাবু প্রভৃতি ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য কিছুকাল চেষ্টা করিয়াছিলেন সত্য। কিন্তু যিনি মূল তিনি যে গাছে রস জোগাইতেছেন না, সে গাছে আর ফল ফলে কেমন করিয়া? পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন এবং অনেক সময় অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজের লোকের মুখেও এই কথা শোনা যায় যে, সমাজ-সংস্কারের কাজকে গ্রহণ না করার জন্যই আদিব্রাহ্মসমাজ ক্রমশ নিস্তেজ ও ক্ষীণপ্রাণ হইয়া পড়িয়াছে। এবং সেই হেতু ইহার সভ্যসংখ্যা অন্যান্য সমাজের সভ্যসংখ্যার চেয়ে অনেক কম এবং সভ্যদের মধ্যেও বেশির ভাগই উপাসনার বেলায় ব্রাহ্ম এবং অনুষ্ঠানের বেলায় পৌত্তলিক হইয়া আছেন। এ কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়, কারণ আদিব্রাহ্মসমাজ আদিব্রাহ্মসমাজ নাম গ্রহণ করার পর হইতেই প্রায় কেবলমাত্র উপাসনার স্থান হইয়া আছে। সুতরাং তাহা যে এক সময়ে ভারি সতেজ ছিল এবং ক্রমশ নিস্তেজ হইয়া পড়িল তাহা নয়। ব্রাহ্মসমাজের বিচ্ছেদের পূর্বে

তাহা প্রকৃতই সমাজ ছিল, তখন তাহার মধ্যে সমাজ-সংস্কারের নানা আয়োজন-অনুষ্ঠান ছিল, প্রচারের নানা উদ্যম-উদ্যোগ ছিল, তখন তাহা শুধু একটা উপাসনার জায়গা ছিল না। কিন্তু বিচ্ছেদের পর হইতে আদিব্রাহ্মসমাজ নাম লইয়া তাহা কেবলমাত্র উপাসনার ব্যাপারে আপনাকে আবদ্ধ রাখিয়াছে।

অবশ্য শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় এ কথা স্বীকার করেন নাই। তিনি তাঁহার "The Adi Brahmo Somaj as a Church" প্রবন্ধে আদিব্রাহ্মসমাজকে "National Hindu Theistic Church" অর্থাৎ জাতীয় হিন্দু একেশ্বরবাদী ধর্মসমাজ বলিয়াছিলেন এবং "conservativo-progressive church", অর্থাৎ রক্ষণশীল ও উন্নতিশীল দুই দলের সম্মিলনভূমি ধর্মসমাজও বলিয়াছিলেন। তিনি সেই প্রবন্ধে এক জায়গায় লিখিয়াছিলেন, "যেমন অত্যুন্নতিশীল ব্রাহ্মেরা এক সময়ে রক্ষণশীল দলকে এই সমাজ হইতে সরাইয়া দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন বলিয়াই সমাজ হইতে তাঁহাদিগকে বিচ্ছিন্ন হইতে হইয়াছিল, তেমনি যদি এই সমাজের বক্ষে কোনো সময়ে একটা অত্যুগ্র রক্ষণশীল দল জাগিয়া ইহার উন্নতিশীল অংশকে সরাইয়া দিতে চায় এবং সমস্ত সমাজকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষণশীল সমাজ করিতে চায়, তবে সে দলকেও এই সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে বাধ্য হইতে হইবে।"

তার পরে তিনি লিখিয়াছেন, "The members of this body can be fairly expected to introduce intermarriage and other such momentous social reforms amongst themselves in time, but in a Hindu spirit and in a Hindu form"—এই সমাজের সভ্যেরা যে কালক্রমে অসবর্ণবিবাহ এবং এই রকমের অন্যান্য প্রয়োজনীয় সমাজ-সংস্কার নিজেদের মধ্যে প্রবর্তিত করিবেন তাহা বেশ আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু হিন্দুভাবে এবং হিন্দু আকারেই সেই-সকল সংস্কার এ সমাজে আসিবে।

কিন্তু আমার মনে হয় যে, রাজনারায়ণবাবুর দ্বারা চিত্রিত এই আদর্শ আদিব্রাহ্মসমাজের পরিকল্পনার সঙ্গে বাস্তব আদিব্রাহ্মসমাজের ছবির যথেষ্টই ভেদ আছে।

আমরা দেখিয়াছি যে, এক সময়ে সমস্ত ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধেই দেবেন্দ্রনাথের এই আশা এবং আকাঙ্ক্ষাই ছিল। কিন্তু সে আশা যখন পূর্ণ হইল না, তখন আদিব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া রাজনারায়ণবাবু প্রভৃতি তাহাকে পূর্ণ করিবার জন্য যে একটু-আধটু চেষ্টা করিতেছিলেন, তিনি সে চেষ্টায় আর যোগ

দিলেন না। এবং সেইজন্যই সেই চেষ্টাও অল্প সময়ের মধ্যেই মরিয়া গেল। দেবেন্দ্রনাথ কর্মজীবন হইতে একেবারেই অবসর লইলেন। ক্রমে তাই দেখিতে পাই যে, আদিব্রাহ্মসমাজ যে কেবলমাত্র উপাসনার স্থান, ইহা আদিব্রাহ্মসমাজের কাগজ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেও স্পষ্ট করিয়া বলা হইতে লাগিল।

তার পরে, আদিব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন যে, তিনি যতদূর জানেন, আদিসমাজের বেদীতে কেবল ব্রাহ্মণেরাই বসিবার অধিকার পাইয়াছেন। সুতরাং আদিব্রাহ্মসমাজ যদি সকল জাতির সাধারণ উপাসনার স্থান মাত্র হয়, তবে বেদীতে বসিবার অধিকার ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির লোককে দেওয়া হয় না কেন? এ প্রশ্ন মনে ওঠা স্বাভাবিক। কিন্তু পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের এই কথাটাও সম্পূর্ণ ঠিক কথা নয়। শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় যতকাল আদিব্রাহ্মসমাজের সভাপতিত্ব করিয়াছেন, ততকাল তিনি বেদীগ্রহণ করিয়া উপাসনা করিয়াছেন। তার পরে আদিব্রাহ্মসমাজের ১১ই মাঘের উপাসনায় ভারতবর্ষীয় সমাজ এবং পরে নববিধান সমাজের আচার্যেরা বেদীর কাজ করিয়াছেন। প্রতাপবাবু অনেকবার এই উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। তবে ব্রাহ্মণ উপাচার্যই যে প্রায় আদিব্রাহ্মসমাজের বেদীতে বসিয়াছেন, তাহার একমাত্র পরিষ্কার কারণ তাঁহারাই আদিব্রাহ্মসমাজে থাকিয়া গিয়াছিলেন; ব্রাহ্মণেতর উপাচার্যগণ বা পৈতাত্যাগী উপাচার্যগণ অন্য সমাজে চলিয়া গিয়াছিলেন। সেইজন্যই রাজনারায়ণ বসু আদিব্রাহ্মসমাজকে "conservativo-progressive church", অনগ্রসর-অগ্রসর দলের সম্মিলন সমাজ নাম দিলেও ইহা বাস্তবিকই প্রথম পক্ষেরই সমাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আর সেই কারণেই তাঁহার এই আশা যে, "এই সমাজের সভ্যেরা কালক্রমে অসবর্ণবিবাহ এবং এই রকমের অন্যান্য প্রয়োজনীয় সমাজ-সংস্কার নিজেদের মধ্যে প্রবর্তিত করিবেন"—কোনো দিনই পূর্ণ হয় নাই। দেবেন্দ্রনাথ যে কেশবচন্দ্র প্রভৃতিকে লিখিয়াছিলেন যে, অনগ্রসরেরা অগ্রসর দলের "সাহায্য অভাবে আরো মৃদুগতি হইবেন", তাঁহার সে আশঙ্কা সত্য হইয়াছিল। অপৌত্তলিক ভাবে সামাজিক অনুষ্ঠান তাঁহার নিজের পরিবার ছাড়া আদিসমাজের সভ্যদের দু-পাঁচ জনের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। সমাজের অধিকাংশ উপাচার্যরাও শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠানপদ্ধতি অনুসারে অনুষ্ঠানের ক্রিয়া সকল সম্পন্ন করেন নাই।

১১ই কার্তিক ১৭৮৯ শক (১৮৬৭ খৃস্টাব্দ) ব্রাহ্মসম্মিলন সভা নামে এক

সভা নব্য ব্রাহ্মদলেরা স্থাপন করেন এবং ঐ দিন সভার প্রথম অধিবেশনে বক্তৃতা দিবার জন্ত দেবেন্দ্রনাথকে তাঁহারা নিমন্ত্রণ করেন। তিনি "ব্রাহ্মদিগের ঐক্যস্থান" বিষয়ে এক বক্তৃতা দেন, তাহার কথা আমরা পুর্বেই জানিয়াছি।

এই সভায় পুনরায় তিনি "হিন্দুপ্রথা হিন্দুরীতি ব্রাহ্মধর্ম দ্বারা পরিশুদ্ধ করিতে হইবে" এবং "হিন্দু সমাজের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন থাকিয়া যাহাতে হিন্দু রীতিনীতি ব্রাহ্মধর্মের অনুযায়ী হয়, চেষ্টা করিতে হইবে" তাঁহার সেই পুরানো আদর্শের কথাই বলেন। তবে এ বক্তৃতায় শুধু সংরক্ষণের দ্বারা ধীরে ধীরে সংস্কারের আদর্শের কথাটা মাত্র তিনি বলেন নাই— কথাটাকে নানা দৃষ্টান্তের দ্বারা পরিষ্কার করিয়া ফলাইয়া দেখাইয়াছেন। প্রবন্ধ হইতে কতক কতক জায়গা উদ্ধার করিয়া নীচে দিতেছি :

"পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া অথচ হিন্দুসমাজের যোগ রক্ষা করিয়া ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠানে এইক্ষণে প্রবৃত্ত হইতেই হইবে। এমন সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে আর কালবিলম্ব সহ্য হয় না। সন্তান হইলে পৌত্তলিক মতে ষষ্ঠীপূজা হয়, তাহার স্থানে ব্রাহ্মধর্মের মতে ব্রহ্মপুজা হয় ইহাতে হিন্দুসমাজের বড় আপত্তি নাই। ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া পুত্রের নামকরণ ও অন্নপ্রাশন দিলেও হিন্দুসমাজের তত বিরক্তি নাই। ব্রাহ্মধর্মের মতানুযায়ী উপনয়নের অনুষ্ঠানই হিন্দুসমাজের অতি বিরুদ্ধ। তথাপি উপবীত পরিত্যাগ হিন্দুসমাজের নূতন রীতি নহে। পুর্বেও যখন যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে তিনি জাত্যভিমানশূন্ত হইয়া ব্রাহ্মণের চিহ্ন পরিত্যাগ করিয়াছেন ; তাহাতে হিন্দুসমাজে আরো নমস্ত ও আদৃত হইয়াছেন। এক্ষণেও যাঁহারা শুদ্ধ-সত্ত্ব ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্ম হইয়া কেবল ধর্মের অনুরোধে উপবীত পরিত্যাগ করিতে বাধিত হইতেছেন, তাঁহারাও হিন্দুসমাজে মান্ত থাকিবেন ; কিন্তু যথেচ্ছাচার করিলে তাঁহারা তাহাদের নিকট আরো হেয় হইবেন। পৌত্তলিক ভাগ পরিত্যাগ করিয়া প্রাচীন ব্যবস্থানুগত ব্রাহ্ম-বিবাহ-পদ্ধতি প্রচলিত করিলে তাহাতে হিন্দুসমাজের বড় অমত হইতে পারে না। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় হিন্দুধর্মে দাহের বিধান, ব্রাহ্মধর্মেও দাহের বিধান আছে, বরং পুরাণের মন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বেদের মন্ত্র তাহাতে যুক্ত করিয়া দেওয়াতে সাধারণের আরো মনঃপুত হইয়াছে। এমন শুনা গিয়াছে, কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, যদিও আর কোন অনুষ্ঠান ব্রাহ্মধর্ম-মতে না হউক, আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যেন ব্রাহ্মধর্মমতে হয়। তেমনি শ্রাদ্ধের সময় পিণ্ডদানের পরিবর্তে পিতামাতার আত্মার মঙ্গলের জন্ত প্রার্থনা করিয়া দেখিয়াছি

যে কোন কোন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সেই প্রার্থনা শুনিয়া অশ্রুপাত করিয়াছেন। ব্রাহ্মেরা এই প্রকার দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিলে অপৌত্তলিক ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান হিন্দুসমাজে ক্রমে যুক্ত হইতে পারিবে— তবে কেন তাহা হইতে বিযুক্ত হইব। আমি সংক্ষেপে গৃহকর্মের বিবরণ বলিলাম, বিস্তার করিয়া বলিবার সময় নাই। অপৌত্তলিক ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুসমাজে রক্ষা করিতে যত্ন করিয়া দেখ, ক্রমে অবশ্যই এই যত্ন সিদ্ধ হইবে, ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুসমাজের মধ্যে ভুক্ত করিতে হইবে, হিন্দু-সমাজে রক্ষা করিতে হইবে— এই ব্রাহ্মসম্মিলন সভার তৃতীয় উদ্দেশ্য মাত্র। …আত্মার উন্নতিই প্রধান লক্ষ্য, ইহাতে হিন্দুসমাজের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম রক্ষা করা যদি অসাধ্য হইয়া পড়ে, তবে যায় যাউক হিন্দুসমাজ। যাহা প্রত্যক্ষ অভাব, যে অভাব মোচন না করিলে ধর্মভাবের হানি হয়, তাহাকে অতিক্রম করিতেই হইবে। আমাদের মাতৃভূমি হিন্দুস্থান প্রিয়তর, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম প্রিয়তম। কিন্তু এই অষ্টাত্রিংশৎ বৎসরের ভূয়োদর্শন দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ যে হিন্দুসমাজে প্রবেশ হইতে পারে, তাহার গতি দেখিতেছি। যে হিন্দুসমাজ রামমোহন রায়ের নাম শুনিবামাত্র খড়্গহস্ত হইত, সেই হিন্দুসমাজের মধ্যে ব্রহ্মোপাসনা প্রচলিত হইয়াছে— ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠানে কেহ কেহ উৎসাহ দিতেছেন, কেহ কেহ অশ্রুপাত করিতেছেন। যখন হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মসমাজে ক্রমে ক্রমে প্রবিষ্ট হইতেছে, তবে কি নিরাশার সময়? আরো অধিকরূপে চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে, প্রিয়তর হিন্দুসমাজে প্রিয়তম ব্রাহ্মধর্ম যাহাতে প্রবেশ করিতে পারে। কিন্তু হে প্রিয় ব্রাহ্মসকল! মনে করিও না যে ইহা অতি সহজ। ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুসমাজে যদিও আনিতে পারা যায়, এমত আশা হইতেছে, কিন্তু ইহা অতি সহজ মনে করিও না। ইহার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে— অকাতরে ধন দান করিতে হইবে। ক্লেশ অকাতরে সহ্য করিতে হইবে— পদে পদে অপমান স্বীকার করিতে হইবে—তবে ইহাকে হিন্দুসমাজে আনিতে পারিবে।… কালেতে অবশ্যই হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মধর্ম প্রবেশ করিবে।"

এই প্রবন্ধে তিনি সঙ্কর বিবাহের অনুষ্ঠান করিয়াও কেমন করিয়া হিন্দু-সমাজের সঙ্গে যোগ রক্ষা করা যাইতে পারে সে সম্বন্ধে কোনো কথাই বলিলেন না। কেবল সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি হইতে পৌত্তলিকতার অংশ ছাঁটিয়া ফেলিতে হইবে, এই কথার উপরেই তাঁহার সমস্ত জোর। সুতরাং নূতন ব্রাহ্মদলের সামনে যেটা সকলের চেয়ে বড়ো সমস্যা, তাহার কোনো মীমাংসাই তাঁহার বক্তৃতায় পাওয়া গেল না। আসল কথা তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে রক্ষণশীল দিকটা

বেশি রকম প্রবল ছিল বলিয়া হিন্দু প্রথা ও আচারগুলিকে একেবারে উল্টাপাল্টা করিয়া দিয়া সমাজবিপ্লব ঘটানোর চেষ্টাকে তিনি ভয়ের চক্ষে দেখিতেন। সঙ্কর বিবাহ যে তাঁহার মতের বিরুদ্ধ ছিল না তাহা আমরা দেখিয়াছি। এমন-কি, জাতিভেদ রক্ষার একান্ত পক্ষপাতী হইয়াও রাজনারায়ণবাবু আদিব্রাহ্মসমাজে সঙ্কর বিবাহ প্রবর্তিত হইবে এই আশার কথা লিখিয়াছেন দেখিলাম। কিন্তু এখনি তড়িঘড়ি সমস্ত সংস্কারের উদ্যোগ শুরু হোক— হিন্দুসমাজের পাকা-বাড়িটাকে একেবারে ভিত্তিতে নাড়া দেওয়া যাক— এ-সকল আকাঙ্ক্ষা হইতে কোনো শুভ ফলের আশা দেবেন্দ্রনাথ করিতেন না। নূতন দলের সঙ্গে এই-খানেই তাঁহার প্রণালীর পার্থক্য ছিল।

এ পার্থক্য হওয়ার একটা বড়ো কারণ ছিল মনে হয় যে স্বদেশের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল, সে শ্রদ্ধা নব্য ব্রাহ্মদের মধ্যে তখন জাগে নাই। সে কালটাই স্বদেশ-প্রেমের কাল নয়। তখন যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা দেশের ভাব এবং দেশের ভাষা দুটাকেই বাদ দিয়া চলিবার চেষ্টায় ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ চিরকাল যেমন দেশীয় ভাব তেমনি দেশীয় ভাষার অনুরাগী। তাঁহাকে একবার তাঁহার এক জামাই ইংরাজীতে চিঠি লিখিয়াছিলেন, সে চিঠি লেখকের কাছে তখনি ফেরত গিয়াছিল।

আমার মনে হয় যে, একদিকে নব্য ব্রাহ্মরা ধর্মে, সমাজানুষ্ঠানে সকল বিষয়ে বিশ্বজাগতিক হইবার ইচ্ছায় পাশ্চাত্ত্য অনুকরণের দিকে বেশিমাত্রায় ঝোঁক দিতেছিলেন বলিয়াই, তাহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অন্য দিকে স্বাদেশিকতার একটা ঢেউ এই সময়ে দেশের মধ্যে উঠিয়াছিল। ক্রমে সেই ঢেউটুকু হইতে তুফান, তুফান হইতে বান জাগিয়া বিশ্বজাগতিক ব্রাহ্মসমাজের তরীটিকে দেশের কূল হইতে দূরে লইয়া গিয়া একটা ছোটো সম্প্রদায়ের দ্বীপের গায়ে ঠেলিয়া দিল। এক দিকে বেশি ঝোঁক দিলেই অন্য দিকে তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিবেই— ইহা স্বভাবের ধর্ম, ইহা মানুষের ইতিহাসে বারম্বার লক্ষ করা গিয়াছে।

মিরর কাগজখানি কেশবচন্দ্রের হাতে সম্পূর্ণরূপে যাওয়ার পর হইতেই আদিব্রাহ্মসমাজের তরফ হইতে 'ন্যাশন্যাল পেপার' নামে একখানি কাগজ বাহির করা হয় এবং শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র সেই কাগজের সম্পাদক হন। এই নবগোপাল মিত্রের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের বিচ্ছেদের সময়ে নব্য ব্রাহ্মদের খুবই ঠোকা-ঠুকি চলিত। বাক্যের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিবার অজস্র শক্তি নবগোপালবাবুর

ছিল। ইংরাজী লেখায় তাঁহার হাত দিব্য পাকা ছিল এবং স্বদেশ-প্রেমে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল। সেইজন্য মিররে যে-সকল প্রবন্ধে খৃষ্টীয় আদর্শের শ্রেষ্ঠতা দেখানো হইত, নবগোপাল সেই-সকল প্রবন্ধকে তাঁহার কাগজে প্রতিবাদের তীব্র বাক্যবাণে একেবারে জর্জর করিয়া ছাড়িয়া দিতেন। দেবেন্দ্রনাথকে এক চিঠিতে একবার তিনি লিখিতেছেন, "Not only are they (The Mirror party) determined to write thundering articles against me but have also set a regular espionage on my character and dealings." দেবেন্দ্রনাথ সেই চিঠি রাজনারায়ণ বাবুকে পাঠাইয়া দিয়া লিখিতেছেন, "ব্রাহ্ম সমাজ লইয়া এ কি হইল!!!"

এই নবগোপাল মিত্র মহাশয় অনেক দিন হইতে অনুভব করিতেছিলেন যে, দেশের লোককে রাজার প্রসাদ লাভের জন্য বৃথা চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত করিয়া নিজের "আত্মশক্তি"র উপর ভর করিবার দিকে উৎসাহিত করিতে হইবে। ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ। ন্যাশন্যাল পেপারে এই "আত্মশক্তি"র সুরটা তীব্র নিখাদে বাজিত। দেশের লোক দেশের অভাবমোচনের জন্য আপনারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সচেষ্ট হইবে এই দিকে তিনি দেশের লোকের মনটাকে ফিরাইবার চেষ্টা করিতেন। বলা বাহুল্য, দেবেন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতারও এই আদর্শই বরাবর ছিল। সামাজিক ব্যাপারে আমাদের দেশ স্বাধীন বলিয়া সমাজহিতের সকল অনুষ্ঠানগুলি দেশের লোক আপনারা গড়িয়া তুলিবে এবং চালাইবে, এইটেই হওয়া উচিত বলিয়া তিনি মনে করিতেন। সেইজন্যই অপৌত্তলিক ব্রাহ্মবিবাহ অনুষ্ঠানকে আইন করিবার জন্য তিনি রাজদ্বারে ছুটেন নাই। দেশীয় সমাজ ইহাকে শীঘ্রে হোক বিলম্বে হোক স্বীকার করিয়া লইবে, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন।

১৭৮৮ শকের চৈত্র সংক্রান্তিতে (১৮৬৭ খৃস্টাব্দে) "হিন্দুমেলা" বলিয়া একটা মেলার আয়োজন হয়। এই ১৭৮৮ শকেই রাজনারায়ণ বসু "শিক্ষিত বঙ্গবাসিগণের মধ্যে জাতীয় গৌরবেচ্ছাসঞ্চারিণী সভা স্থাপনের এক প্রস্তাব" ইংরাজী ভাষায় চটি বইয়ের আকারে প্রকাশিত করেন। সেই প্রস্তাব হইতে এই হিন্দুমেলার উৎপত্তি হয়। তাহাতে জাতীয় ব্যায়াম, শিল্প, পুরাবৃত্ত প্রভৃতির যাহাতে চর্চা হয় এবং ইংরাজী ভাষার বদলে বাংলাভাষার আলোচনা হয় সেই দিকে দেশের লোককে রাজনারায়ণবাবু উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তিনি নিজে একটি ছোটোখাটো "জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা"ও খাড়া করিয়াছিলেন।

তবে তাহা হইতে যে এত বড়ো একটা মেলার উৎপত্তি হইবে, ইহা তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই। হিন্দুমেলার উদ্যোগকর্তা ছিলেন নবগোপাল মিত্র এবং দেবেন্দ্রনাথের পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রেরাই তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই হিন্দুমেলার সম্পাদক ও নবগোপাল মিত্র সহকারী সম্পাদক হন। দেশের সাহিত্যের চর্চা, দেশের সংগীতের চর্চা, দেশীয় শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতির প্রদর্শনী, দেশীয় গুণীলোকদিগকে পুরস্কৃত করা সেই মেলার উদ্দেশ্য ছিল। মেলার উৎসাহদাতাদের মধ্যে দুর্গাচরণ লাহা, কৃষ্ণদাস পাল, পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, পণ্ডিত ভারতচন্দ্র শিরোমণি, রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর প্রভৃতির নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পরের বছরে ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে বেলগাছিয়ার বাগানে মেলার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। সেই দিন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত "মিলে সবে ভারতসন্তান" সেখানে গাওয়া হয়। এই "হিন্দুমেলা" বাংলার জাতীয় ইতিহাসের একটি প্রধান ঘটনা ; কারণ স্বদেশ-প্রেমের সেই বোধ হয় প্রথম উদ্‌বোধন। স্বদেশী আন্দোলনের সেই উদ্যোগ-পর্ব।

এইরূপে নব্য ব্রাহ্মদের আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া হিন্দুসমাজের মধ্যেও অচিরেই দেখা দিল। হিন্দুধর্মের রক্ষার জন্য সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা দাঁড়াইল এবং 'হিন্দুহিতৈষিণী' নামে এক সাপ্তাহিক কাগজ বাহির হইল।

এই হিন্দুমেলার সঙ্গে সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের বাড়ির এ-সময়কার আবহাওয়া সম্বন্ধেও দু-একটা কথা বলা দরকার। দ্বিজেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ, গুণেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি বাড়ির বয়স্ক যুবাদের তখন সাহিত্য ও ললিতকলায় উৎসাহের সীমা ছিল না। পোশাক-পরিচ্ছদে, কাব্যে-সাহিত্যে, শিল্পে নাট্যে স্বাদেশিকতায়, সকল বিষয়েই একটি পরিপুর্ণ দেশীয় আদর্শকে জাগাইয়া তুলিবার জন্য তখন তাঁহারা ব্যস্ত। ১৮৬৭ খৃস্টাব্দে গণেন্দ্রনাথ রামনারায়ণ তর্করত্নকে দিয়া 'নব-নাটক' লিখাইয়া বাড়িতে তাহার অভিনয় করাইয়াছিলেন। সে সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে উৎসাহ জানাইয়া পত্র লিখিতেছেন এইরূপ :

ওঁ নাটোর

কালীগ্রাম ৪ঠা মাঘ ১৭৮৮

[১৬ জানুয়ারি ১৮৬৭]

প্রাণাধিক গণেন্দ্রনাথ,

তোমাদের নাট্যশালার দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে, সমবেত বাদ্য দ্বারা অনেকের হৃদয় নৃত্য করিয়াছে, কবিত্বরসের আস্বাদনে অনেকে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে। নির্দোষ আমোদ আমাদের দেশের যে একটি অভাব, তাহা এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইবে। পূর্বে আমার সহৃদয় মধ্যম ভায়ার[১] উপরে ইহার জন্য আমার অনুরোধ ছিল, তুমি তাহা সম্পন্ন করিলে। কিন্তু আমি স্নেহপূর্বক তোমাকে সাবধান করিতেছি যে, এ প্রকার আমোদ যেন দোষে পরিণত না হয়। সদ্ভাবের সহিত এ আমোদকে রক্ষা করিলে আমাদের দেশে সভ্যতার বৃদ্ধি হইবে তাহার সন্দেহ নাই। ইতি

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্মণঃ

পুনশ্চ—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমারকে আমার ধন্যবাদ দিবে।

*এই শিরোবেষ্টনটি অতি পরিপাটী হইয়াছে।

ইতিহাস চর্চায় গণেন্দ্রনাথের আশ্চর্য রকমের অনুরাগ ছিল। তিনি বাংলায় অনেক ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করিয়া শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। বিক্রমোর্বশী নাটকের তিনিই প্রথম অনুবাদ করেন। তাঁহার রচিত অনেকগুলি ধর্মসংগীতও অতি চমৎকার। "গাও হে তাঁহার নাম, রচিত যাঁর বিশ্বধাম।" —এই প্রসিদ্ধ গানটি তাঁহারই। রবিবাবু তাঁহার জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন যে, "তাঁহার [গণেন্দ্রনাথের] ভারি একটা প্রভাব ছিল। সে-প্রভাবটি সামাজিক প্রভাব। তিনি আপনার চারি দিকের সকলকে টানিতে পারিতেন, বাঁধিতে পারিতেন।" তাঁহার ছোটো ভাই গুণেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "তিনিও বাড়িটিকে একেবারে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আত্মীয়, বন্ধু, আশ্রিত অনুগত অতিথি অভ্যাগতকে তিনি আপনার বিপুল ঔদার্যের দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছিলেন। তাঁহার দক্ষিণের বারান্দায়, তাঁহার দক্ষিণের

১ গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বাবুবিলাস' নামক একটি নাটক রচনা করেন।

* ধন্বন্তরি ক্ষপণকামরসিংহ শঙ্কুবেতালভট্ট ঘটকর্পরকালিদাসাঃ খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নববিক্রমস্য।

বাগানে, পুকুরের বাঁধাঘাটে মাছ ধরিবার সভায় তিনি মূর্তিমান দাক্ষিণ্যের মতো বিরাজ করিতেন। সৌন্দর্যবোধ ও গুণগ্রাহিতায় তাঁহার নধর শরীর-মনটি যেন ঢলঢল করিতে থাকিত। নাট্য-কৌতুক আমোদ-উৎসবের নানা সংকল্প তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া নব নব বিকাশ লাভের চেষ্টা করিত।...

"বড় দাদা [শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর] তখন দক্ষিণের বারান্দায় বিছানা পাতিয়া সামনে একটি ছোটো ডেস্ক লইয়া স্বপ্ন-প্রয়াণ লিখিতেছেন। গুণদাদাও রোজ সকালে আমাদের সেই দক্ষিণের বারান্দায় আসিয়া বসিতেন। রসভোগে তাঁহার প্রচুর আনন্দ কবিত্ব-বিকাশের পক্ষে বসন্ত বাতাসের মতো কাজ করিত। বড় দাদা লিখিতেছেন আর শুনাইতেছেন, আর তাঁহার ঘনঘন উচ্চহাস্যে বারান্দা কাঁপিয়া উঠিতেছে।"

স্বপ্ন-প্রয়াণের নায়ক কবির আত্মপরিচয় হিসাবে রূপকচ্ছলে যে একটি শ্লোক লেখা হইয়াছে, তাহা স্বপ্ন-প্রয়াণের লেখকেরও যথার্থ আত্মপরিচয় বটে। সেই শ্লোকটি নীচে তুলিয়া দিলাম—

"ভাতে যথা সত্য হেম[১], মাতে যথা বীর[২]
গুণজ্যোতি[৩] হরে যথা মনের তিমির।
নব শোভা ধরে যথা সোম আর রবি[৪]
সেই দেব[৫]-নিকেতন আলো করে কবি॥"

কিন্তু বাড়ির ছেলেরা যখন বাড়ির মধ্যে এমনিতর একটি সর্বাঙ্গসুন্দর জাতীয়তার আবহাওয়াকে তৈরি করিয়া তুলিয়াছে, তখন দেবেন্দ্রনাথ দূরে। হিন্দুমেলাতেও তিনি নাই, বাড়ির উৎসবে আনন্দেও তিনি নাই। তিনি তখন বোলপুর শান্তিনিকেতনের নির্জন প্রান্তরে যাপন করিতেছেন। এবং ১৭৯০ শকে তিনি লোকালয় হইতে আরো দূরে মারী পর্বতে ও কাশ্মীরের হ্রদ-পর্বত -বেষ্টিত সৌন্দর্যের অলকাপুরীর মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। সেই সময় হইতেই তিনি বিশ্বতীর্থের একক যাত্রী— সমাজ এবং সংসারের সঙ্গে এক রকম সম্বন্ধ-

---

১ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২ শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩ শ্রীযুক্ত গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৪ শ্রীযুক্ত সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৫ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিচ্ছিন্ন। শাস্ত্রে আছে 'পঞ্চাশোধ্বে বনং ব্রজেৎ'— বাস্তবিক ঠিক পঞ্চাশ বছর বয়স পার হইয়াই তিনি হিমালয়ে যাত্রা করেন।

হিমালয়ে যাইবার পূর্বে ১৭৮৯ শকে, ১৮৬৭ খৃস্টাব্দে তিনি একটুখানি নূতন ধরনের দুইটি সামাজিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। একটি তাঁহার সাম্বৎসরিক পিতৃশ্রাদ্ধ, শুক্লনবমী ২৪ শ্রাবণ তারিখে তাহা সম্পন্ন হয়। আর-একটি তাঁহার চতুর্থ কন্যা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর বিবাহ, ২রা অগ্রহায়ণ তারিখে তাহা সম্পন্ন হয়। নূতন ধরনের মধ্যে এই যে, এই দুই অনুষ্ঠানেই হিন্দুসমাজের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। পিতৃশ্রাদ্ধের রাত্রে দেবেন্দ্রনাথের প্রার্থনা শুনিয়া ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের বিশুদ্ধতা দেখিয়া মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় চোখের জল ফেলিয়াছিলেন। তার পরে এই শ্রাদ্ধে তিনি "দ্ব্যধিক শত ভোজ্য" উৎসর্গ করেন, এও এক নূতন ধরন। কন্যার বিবাহের অনুষ্ঠানে সপ্তপদীগমন এক নূতন অঙ্গ পদ্ধতিতে যোগ করা হইয়াছিল।

হিন্দুসমাজের মধ্যে যাহাতে ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান প্রবেশ করিতে পারে, সেই দিকে দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টি ছিল বলিয়াই তিনি এই অনুষ্ঠানগুলিতে হিন্দু-সমাজের প্রধান লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেন এবং অনুষ্ঠানে যথাসম্ভব হিন্দুরীতি ও আচারগুলি রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেন। ইহাই তাঁহার মতে সমাজের ভিতরে থাকিয়া সমাজের সংস্কার-সাধনের চেষ্টা। অনেক ব্রাহ্মের মধ্যে এই চেষ্টা দেখা দিলে এ চেষ্টা যে নিষ্ফল হইত, এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না। কিন্তু ইহার বিপদ এই যে, এ প্রণালীতে রক্ষা করিবার দিকেই ঝোঁকটা পড়ে বেশি, সংস্কারের দিকে এবং কালের প্রয়োজন অনুসারে নূতন নূতন রীতিনীতি আবিষ্কারের দিকে তেমন ঝোঁক থাকে না। অথচ তাহা থাকিলেই সমাজের গতিবেগ কতকটা হ্রাস হইয়া পড়ে এবং বিচিত্র প্রথার জঞ্জাল জমিয়া উঠিয়া সমাজের উন্নতির স্রোতকে আটকায়। দেবেন্দ্রনাথ সমাজ-সংস্কারে অপৌত্তলিক ভাবে সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন করা ভিন্ন আর বেশি দূর অগ্রসর হন নাই। অবশ্য তাহার একটা প্রধান কারণ ব্রাহ্মসমাজের হঠাৎ বিচ্ছেদ এবং তাঁহার কর্মজীবন হইতে সম্পূর্ণ অবসর গ্রহণ। অপৌত্তলিক অনুষ্ঠান ব্যাপারেও তিনি প্রায় একলাই পড়িয়াছিলেন। সুতরাং এত অল্প-সংখ্যক লোকের মধ্যে আর-কোনো নূতন সংস্কার প্রবর্তন করা একেবারেই অসম্ভব ছিল। সংকীর্ণ সমাজ হইলেই সংস্কারের চেয়ে সংরক্ষণের দিকেই

মনোযোগ বেশি দিতে হয়। সেইজন্য ক্রমে আমরা দেখিতে পাই যে, কেবলমাত্র পৌত্তলিক অংশ বাদ দেওয়া ভিন্ন আর সমস্ত রকমের অনুষ্ঠানই আদিব্রাহ্মসমাজে গৃহীত হইয়াছে। যে-সকল অনুষ্ঠান কেশবচন্দ্রের সময়ে বাদ দেওয়া হইয়াছিল, সেগুলিও আবার নূতন করিয়া খাড়া করা হইয়াছে। যেমন উপনয়ন সংস্কার, তাহার কথা আমরা যথাস্থানে বলিব।

১৮৬৮ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে দেবেন্দ্রনাথ হিমালয়ে যাত্রার জন্য বাহির হইয়া পড়েন এবং এপ্রিলের মাঝামাঝি মারী পর্বতে আসিয়া পৌছেন। ৮ই মে তারিখে তাঁহার পথভ্রমণের বিবরণ দিয়া এক চিঠি তিনি গণেন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন এইরূপ :

Willow Banks
Murree Hills

প্রাণাধিক গণেন্দ্রনাথ,

আমি তোমাকে অমৃতসর পহুঁছিয়াই লিখিয়াছিলাম যে, দেখি এদেশের রৌদ্র আমার শরীরে সহ্য হয় কি না। সমুদয় মার্চমাস এক প্রকার শীতে শীতে কাটান গেল। এপ্রিল মাস আরম্ভ হইতে না হইতেই রৌদ্রের যাই তীব্রতা বোধ হইল, অমনি অর্শের রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। তিন চারি বার করিয়া বহু পরিমাণে রক্তপাত হইয়া আমাকে একেবারে দুর্বল করিয়া ফেলিল। আমি তখন লাহোরে। কলিকাতার মেডিক্যাল কালেজে শিক্ষিত একজন মোসলমান লাহোরে চিকিৎসা ব্যবসায় করিয়া থাকেন, তিনি আসিয়া আমার বাড়ীতে জ্বরভাব দেখিয়া ঔষধ দিলেন, তাহাতে ঘর্ম হইয়া আমি মূর্ছা গেলাম। আমার শরীরের অল্প ব্যতিক্রমেই তো মূর্ছা হয়—ডাক্তার আমার মূর্ছার সংবাদ পাইয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া কেবল বলিতে লাগিলেন যে, "আপনি ভাবিবেন না"। আমি তো দেখিলাম যে আর লাহোরে থাকা হয় না—তাড়াতাড়ি একটা ডাকের গাড়ী করিয়া ৬ এপ্রিল সোমবার সন্ধ্যার সময়ে লাহোর হইতে বহির্গত হইলাম। সেই সমস্ত রাত্রি গাড়ীতে চড়িয়া প্রাতঃকালে উজিরাবাদ স্থানে উত্তীর্ণ হইলাম। সন্ধ্যার সময়ে আবার গাড়ীতে চড়িয়া চলিলাম। কতদূর যাইয়া পথের মধ্যে এমনি ঝড় উঠিল যে, আর চলা যায় না—সুতরাং এক সরাইয়ের বাঙ্গলাতে সে রাত্রি থাকিলাম। তিনটা রাত্রিতে ঝড় থামিলে সেখান হইতে চলিয়া প্রাতঃকালে গুজরাট নামক স্থানে আইলাম। সেখান হইতে

আবার ১১টা বেলাতেই গাড়ীতে চলিলাম। রাত্রিতে পথে বিভ্রাট দেখিয়া দিবসেই চলিতে লাগিলাম। পথের মধ্যে আরো অর্শের পীড়া বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সোমবারে লাহোর ছাড়িয়া এই প্রকারে শুক্রবারে রাওলপিণ্ডিতে আসিয়া পহুঁছিলাম। সেখানে অবসন্ন হইয়া শয্যাতে পড়িলাম। শুক্র, শনি, রবি, সোম, মঙ্গল এই পাঁচ দিন রাওলপিণ্ডিতে কেবল দুগ্ধপান করিয়া থাকিলাম—কিছুই জীর্ণ করিতে পারি না। একে কিছুই আহার করিতে পারি না, তাহাতে তিন চারিবার করিয়া অর্শের রক্ত পড়ে—ভাবিতে লাগিলাম এ পীড়া কে আরাম করিবে। এখানে কোথায় বা গণেন্দ্র, কোথায় বা ডাক্তার ওয়েব, কোথায় বা দ্বারি বাবু। তথাপি এখানকার ডাক্তারকে ডাকিয়া পাঠাইলাম—তাহাকে বলিলাম যে, যাহাতে দুগ্ধ জীর্ণ করিতে পারি এমন কোন ঔষধ দেও। সে সেই প্রকার ঔষধ দেওয়াতে কিছু উপকার হইল। পরে আর সেখানে না থাকিয়া একেবারে এই পর্বতশিখরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কি আশ্চর্য, এখানে আসিয়া একেবারে ভাল হইয়া গিয়াছি। এখানে আর অর্শের পীড়া নাই, যাহা খাই তাহা জীর্ণ হইতেছে, পর্বতে পর্বতে অনায়াসে বেড়াইয়া বেড়াইতেছি। আমি ১৭ এপ্রিলে এখানে আসিয়া পহুছি—আমি এখানে আসিয়া পহুঁছিয়াছি আর অসম্ভব শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। তাহার পর দিন মেঘ কাটিয়া রৌদ্র হইল—তাহার পর তিন দিন বাষ্পেতে মেঘেতে আচ্ছন্ন হইয়া শিলা বৃষ্টি বর্ষিত হইতে লাগিল, এই হিমালয়ের হিম লইয়া ঝড় বহিতে লাগিল, বিদ্যুৎ মেঘমধ্যে এক একবার আলোক দিয়া গর্জন করিতে লাগিল। পথে যেমন রৌদ্র পাইয়াছিলাম, এখানে তেমনি শীত দ্বারা আক্রান্ত হইলাম—কিছুতেই সে শীত ভাঙে না। পরীক্ষাতে দেখিলাম যে, আমার শরীর শীত খুব সহ্য করিতে পারে—কিন্তু রৌদ্রের উত্তাপ কিছুই সহ্য করিতে পারে না। এই শীতেতে ক্রমে ক্রমে আমার শরীর ভাল হইয়া উঠিল। বাটীতে এ প্রকার হইলে এক বৎসরের চিকিৎসার বোধ হয় প্রয়োজন হইত। "দুর্বলের বল তুমি নির্ধনের ধন। রোগীর ঔষধ তুমি শ্রান্তের আসন।" ইহা কেবল মনের কল্পনা নহে, বুদ্ধির সিদ্ধান্তও নহে, কিন্তু হৃদয়ের প্রত্যয়। আমি দেখিয়াছি যে, যখন রোগে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি, তখন ক্রোড়ে মস্তক দিয়া আরাম পাইয়াছি। Thou feel'st thy treasure, when thou feel'st thy Lord! ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছি। আর এ শরীরে প্রাণ কি লঘু! একটু রক্তের যোগে এই প্রাণ রহিয়াছে। কিন্তু ঈশ্বরের করুণা ইহলোকে পরলোকে। "দয়ার যাঁর নাহি

বিরাম, ঝরে অবিরত ধারে।" তোমার প্রেরিত দুইটি গান আমি অতি প্রীতির সহিত গ্রহণ করিলাম। তাহা পরিপাটী হইয়াছে। যাহারা ব্রাহ্মসমাজে ইহার প্রথম গান শুনিয়াছে তাহারা অতিশয় সন্তোষ লাভ করিয়াছে।...

নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্মণঃ

২৭শে বৈশাখ ১৭৯০ শক।

মে, জুন দুই মাস মরীতে থাকিয়া দেবেন্দ্রনাথের কাশ্মীরে যাইবার ইচ্ছা হইল। মরী দিয়া কাশ্মীর যাইতে হইলে বিতস্তা নদী পার হইতে হয়। জুন মাসে বরফ গলিয়া নদীর জল এত বাড়ে যে, তখন স্রোতের উজানে যাওয়া শক্ত। রোজই নদী পার হইতে গিয়া বিস্তর লোক ডুবিয়া যাইতেছে, এই খবর আসিতে লাগিল। অবশেষে দেবেন্দ্রনাথ ঝাঁপানে চড়িয়া কোলাঘাটে গিয়া দেখিয়া আসিলেন, নদী পার হইবার সুবিধা আছে কি না। দেখিলেন, নদীতে নৌকা চলাচল হইতেছে, বিশেষ ভয়ের কারণ নাই। ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে ২রা সেপ্টেম্বর তিনি মরী ছাড়িলেন।

তাঁহার কাশ্মীর ভ্রমণের বৃত্তান্তের একটুখানি টুকরা দৈবাৎ আমার কাছে আসিয়াছে— দু-একটি ছিন্নপত্র। কিন্তু কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পূর্ণ শতদলের গন্ধ ও রঙ তাহাদের গায়ে মাখা। টুকরাভাবেই সেই পাতাগুলি এখানে উদ্ধার করা গেল :

"৪ঠা সেপ্টেম্বর মরী ছাড়িলাম। কোলাঘাটে আসিয়া এবার ডাক-বাঙ্গালায় স্থান পাইলাম। পরদিন প্রাতঃকালে বিতস্তা নদীতীরে আসিলাম, দেখি পারের নৌকা প্রস্তুত। নদীর বিস্তার কৃষ্ণনগরের নীচে খড়ের মত, কিন্তু খুব গভীর। জলের ভিতরে মাঝে মাঝে পাথর আছে। স্রোতের তেজে নৌকা ঐ পাথরের উপর আসিয়া পড়িলেই নৌকা চূর্ণ হইয়া যায় ও আরোহীরা সকলেই ডুবিয়া ভাসিয়া যায়। ঝাঁপান ঝাঁপানী জিনিসপত্র লইয়া নৌকায় উঠিলাম। নৌকার হাল যেন একটা বড় কড়ি কাষ্ঠ। দুই জন নাবিক সেই হাল ধরিয়া বিশেষ সাবধানে আমাকে পার করিয়া দিল। নদী পার হইতে আধ ঘণ্টা লাগিল। ভয়ে ভয়ে নির্বিঘ্নে পার হইলাম। ওপারে গিয়া নৌকা হইতে ঝাঁপান নামাইয়া তাহাতে উঠিলাম। ক্রমে ক্রমে এত দূর উর্ধ্বে উঠিলাম যে, সেখান হইতে নীচের খদের দিকে চাহিয়া দেখি সেখানকার বড় বড় কেলু গাছ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারা

গাছের ন্যায় দেখাইতেছে। শুনিতেছি ঝাঁপানীরা এই বুলি বলিতেছে "ভরোসা নাহি, ভরসা নাহি।" সত্য সত্যই সেখান থেকে একটু পদস্খলন হইলে আর জীবনের কোন ভরসা থাকে না। আবার খানিক দূর গিয়া দেখি যে, পাহাড় এখান হইতে খদের অভিমুখে উচ্চ হইতে ক্রমে নীচু হইয়া আসিতেছে। তাহার উপর সূর্যকিরণ প্রসারিত হইয়া বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে—যেন একটা প্রকাণ্ড ময়ূরপুচ্ছ।...

"একদিন বেলা দুই প্রহরের সময় মঞ্জিলের ভিতর হইতে বাহির হইয়া দেখি, সেই মহোচ্চ পর্বতের সুদূর খদ হইতে শিখর পর্যন্ত প্রান্তর হইতে প্রান্তরকে আপাদ-মস্তক ব্যাপ্ত করিয়া যব, গোধূম প্রভৃতি শস্য, লালবর্ণের শাক, কত বর্ণের পুষ্প প্রদীপ্ত সূর্যকিরণে প্রতিফলিত হইয়া হাস্য করিতেছে। যে দিকে তাকাই সেই এক মনোরম শোভা। আমি সে দৃশ্য দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া পড়িলাম। মনে হইল লক্ষ্মী যেন তাঁহার দিব্য সিংহাসন আলো করিয়া রহিয়াছেন। আমি আর চক্ষু ফিরাইতে পারিলাম না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া গেল, আমি সেইখানেই বসিয়া আছি। সন্ধ্যার পূর্বে আবার ঘরের মধ্যে আসিলাম। কিছু পরে মনে হইল আর একবার সেই দৃশ্য দেখিয়া আসি। বাহিরে গেলাম, কিন্তু তখন আর সে শোভা নাই। লক্ষ্মী চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার শ্যামোজ্জ্বল সিংহাসন যেন কে কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রে ঢাকিয়া রাখিয়াছে!...

"আবার ঝাঁপানে উঠিলাম। পর্বত ডিঙ্গাইয়া এবার শ্রীনগরে আসিয়া পৌছিলাম। দেখি অপর তিন দিকে পাহাড় উঠিয়া সমস্ত শ্রীনগরকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। এবং সূর্যকিরণ পর্বতের মস্তকে মুকুটের ন্যায় জ্বলিতেছে আর একটা পাহাড়ে উঠিয়া দেখি, বিতস্তা রূপার পাতের ন্যায় ঝিকমিক্ করিয়া জ্বলিতেছে। শুনিলাম বিতস্তার বক্রভঙ্গী দেখিয়া শালের কল্‌কা আবিষ্কৃত হইয়াছে।...

"নদীর কিনারায় সরল গাছ শ্রেণীবদ্ধ লইয়া আছে। দেখিতে বড়ই সুন্দর। রাজধানীর ভিতর দেখিতে বাহির হইলাম। রাস্তা সংকীর্ণ, বড়ই পিচ্ছিল। বাটীগুলি দেখিতে সুশ্রী নহে। পা পিছলাইয়া পতনের আশঙ্কায় ফিরিতে হইল। রাজার অট্টালিকা দেখিলাম, প্রাসাদের সৌন্দর্য থাকিলে হইবে কি? তাহার চারিধারেই পর্ণকুটীর। ঈশ্বরের হাতের শ্রীনগর মনুষ্য বিশ্রী করিয়া রাখিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম বাটীর অবস্থা এরূপ মন্দ কেন? তাহারা বলিল, ভূমিকম্প হয়, এজন্য ব্যয়সাধ্য অট্টালিকা কেহ এখানে প্রস্তুত করে না।... আমি দেখিলাম এখানে থাকা আমার পক্ষে ভাল নয়! নৌকা করিয়া বাহির হইলাম।...

"আমি জলস্রোতের প্রতিকূলে বিতস্তা দিয়া চলিতেছি। স্রোতের কিছুমাত্র .তেজ নাই। জল ১৪ হাত গভীর, সমুদ্রের ন্যায় নীলবর্ণ। আমি প্রভাতে তাহার ধারে বসিয়া স্নান করিয়া লইতাম।...

"একদিন ৭।৮ বৎসরের একটি ছোট বালিকা নৌকার গুণ টানিয়া চলিয়াছে। প্রতিমার দেবীমূর্তির ন্যায় তাহার চুলগুলি বিনান, মস্তকে টুপি, গৌরবর্ণের উপর সূর্যকিরণ পড়িয়াছে। বোধ হইল যেন সৌন্দর্যস্নাত দেবীপ্রতিমা স্বয়ং নৌকা টানিয়া চলিতেছেন। আমি বলিলাম 'বালিকার উপরে এ কঠোরতা কেন?' তাহারা বলিল 'ও না শিখিলে চলিবে না।' মেয়েটির পালা ফুরাইয়া গেলে আর একটি বালক গুণ টানিয়া চলিল। কিন্তু বালিকা নৌকায় উঠিল না। দৌড়িয়া দৌড়িয়া তুঁতফল সংগ্রহ করিতে লাগিল। অঞ্জলি পূর্ণ হইলে নৌকায় উঠিয়া আমাকে উপহার দিল। মনে হইল, ইহাকে দেশে লইয়া গেলে ইহাকে দেখিয়া দেবকন্যা বলিয়া সকলের ভ্রম জন্মাইবে।...

"নদী দিয়া যাইতে একটি সরোবরে আসিয়া উপনীত হইলাম। সরোবরটি গোলাকৃতি। পার হইতে দেড় ঘণ্টা সময় লাগে। জল নীলবর্ণ। তীর হইতে জলগর্ভে দশহাত পর্যন্ত স্থান লইয়া পদ্মবন— কাশ্মীরী শালের পাড়ের ন্যায় সমস্ত সরোবরকে অলঙ্কৃত করিয়া বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ইহাতে সরোবরের যে কি শোভা হইয়াছে তাহা বর্ণনা করা যায় না। পদ্মবনের সীমার বাহিরেই জল অতলস্পর্শ। জল এমন পরিষ্কার যে তাহাতে কোন একটি দ্রব্য ফেলিয়া দিলে বহুদূর পর্যন্ত তাহার গতি নিরীক্ষণ করা যায়। কাশ্মীরের লোকেরা তাহার নাম মানস সরোবর দিয়াছে, অতি উপযুক্ত নাম।

"এখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া নৌকায় উঠিলাম ও সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সন্ধ্যার সময়ে উলার সরোবরের মোহানায় আসিয়া পঁহুছিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে সেই সরোবরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।...

"১২ই কার্ত্তিক শ্রীনগর পরিত্যাগ করিলাম। আসিবার সময় মরীর পথ ধরিয়া আসিয়াছিলাম, ফিরিবার কালীন পীরপঞ্চাননের পথ ধরিলাম।...এ সময়ে অনেক নদীই শুষ্ক হইয়াছিল। সেই সকল নদীগর্ভ দিয়া ঝাঁপান চলিল। কখনো উঁচু কখনো নীচু কখনো নদীগর্ভ কখনো পর্বতচূড়া ভেদ করিয়া যাইতে লাগিলাম। এক দিন নিম্নভূমি দিয়া চলিয়া যাইতেছি, অল্প অল্প বৃষ্টিপাতও হইতেছিল, দেখিলাম বরফ পড়িতে আরম্ভ হইল। বেলা ৮।৯ টার পর ৩।৪ ঘণ্টা ধরিয়া ক্রমাগত বরফ পাত হইল। আমি ঝাঁপানীদিগকে বলিলাম, 'আমাকে একটি

ঘরে নিয়ে চল।' পথের ধারে একটি ঘর দেখিতে পাইয়া তাহারা আমাকে সেই খানে লইয়া চলিল। আমি দোতলায় উঠিলাম। কেহ নিবারণ করিল না।...

"তিন চার দিন কয়েদ রহিলাম। ক্রমে বরফ পড়া কমিয়া আসিল। বাহকদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা বলিল চলা ভার, বরফ কাঁচা আছে। যাইতে হইলে বরফে পা ডুবিয়া যাইতে পারে, অথবা পর্বতের চূড়া হইতে বরফ খসিয়া পড়িয়া ডুবাইয়া দিতে পারে। তবে যদি খড়ের জুতা দিতে পারেন তবে যাইবার চেষ্টা করিতে পারি। আমাদের ৪০ জোড়া জুতা চাই।

"আমি বলিলাম, জুতা কোথায় পাইব? তাহারা বলিল, যদি শ্রীনগরের তত্ত্বাবধারককে পত্র দেন আমরা জুতা আনিতে পারি। আমি অগত্যা বাধ্য হইয়া পত্র দিলাম। পরদিন দেখি, এক বোঝা জুতা আসিল। জুতা নূপুরের মত গড়ন। বেলা ১১।১২টার পর বাহির হইলাম। পাহাড়ের উপর দিয়া ঝাঁপান চলিল। এমন এক সঙ্কীর্ণ পথের ভিতর আসিয়া পড়িলাম যে আমার দুই হাতের কনুই উভয় পার্শ্বের বরফ স্পর্শ করিতে লাগিল। এই সংকীর্ণ পথ ভেদ করিয়া আবার প্রশস্ত পথে আসিয়া পড়িলাম।...

"দূরে দেখি পুতুলের মত মানুষ বেড়াইতেছে। ক্রমে পুতুল বড় হইয়া আসিল। শেষে পুতুল মানুষে পরিণত হইল। যখন তাহারা নিকটে আসিয়া আমার মুখের প্রতি তাকাইল তাহাদের মুখভঙ্গী দেখিয়া বোধ হইল যেন তাহারা বলিতেছে যে, এমন কি কর্ম পড়িয়াছে যে প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া এ লোকটা এই ভীষণ পথে চলিয়াছে। আমিও তাহাদের সম্বন্ধে ঠিক তাই মনে করিতেছিলাম।

"যাইতে যাইতে দেখি, মিউল মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। বুঝিলাম, আমার পূর্বে যাঁহারা গিয়াছেন তাঁহারা নির্বিঘ্নে পৌঁছিতে পারেন নাই। এইরূপে যখন আমি আত্মহারা হইয়া রহিয়াছি, সহসা দৃষ্টি পশ্চিম গগনে পড়িল, দেখি সূর্য প্রায় অস্তমিত। সূর্যকিরণ বার্নিশ-করা সাদা বরফে পড়িয়া জ্বলিতেছে। চারিদিকে সমতল বিস্তৃত ভূমি, বরফে ঢাকা— চারিদিকে তার কূল-কিনারা নাই, তাহার উপর সূর্যকিরণ। সে শোভা সৃষ্টির ভিতরে আর দেখা যায় না।"

এই বৃহৎ উদার বিশ্বপ্রকৃতির চিরন্তন সৌন্দর্যনিকেতনের মধ্যে সমস্ত সাময়িক ঘটনার আক্ষেপবিক্ষেপ কলকোলাহল এক নিমেষে কোথায় ডুবিয়া গেল। এমার্সন বলিয়াছেন এমনি সময়ে এমনি জায়গায় "I am part or particle of God", আমরা ঈশ্বরের অংশ হই। "The name of the nearest friend

sounds then foreign and accidental"— তখন নিকটতম বন্ধুর নামও কেমন অপরিচিত ও আকস্মিক বলিয়া ঠেকে। কর্মজীবনের মধ্যে থাকিবার সময়ই এক-একবার করিয়া প্রকৃতি-তীর্থের এই নির্জন সৌন্দর্যের নির্মল স্নান দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে দরকার হইত। কর্মের সমস্ত দাহ, সমস্ত গ্লানি এমনি করিয়া তিনি এক-একবার ধুইয়া লইতেন। কিন্তু এখন হইতে এই তীর্থে তাঁহার বাস কায়েম হইল। কারণ এখন হইতে তিনি অনন্ত লোকলোকান্তরের পথে যাত্রী। সংসারযাত্রা তাঁহার শেষ হইয়াছে। এই পৃথিবীর অমৃত তীর্থে তীর্থে এখন হইতে তাঁহাকে ঘুরিয়া সর্বত্র সেই অসীমসুন্দর পুরুষকে প্রণাম করিয়া সর্ব-তীর্থোদকে তাঁহার জীবনেব পাত্রটি পূর্ণ করিয়া তবে লোকান্তরযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। এখন হইতে তাঁহাব যাত্রা "Passage to more than India", —বিশ্বমানবের ইতিহাসের ভিতর দিয়া আর নয়, বিশ্বপ্রকৃতির একেবারে মর্মের ভিতবে।

"O morning red! O clouds! O rain and snows! O day and night, passage to you!"

হে রক্তিম প্রভাত, হে মেঘমালা, হে বৃষ্টি ও তুষারপাত! হে দিন ও রাত্রি —তোমাদের সকলের মধ্যে যাত্রা।

মরী পর্বতে থাকিবার সময় ১৯এ শ্রাবণ ১৭৯০ শক (১৮৬৮ খৃস্টাব্দ) তিনি একখানি চিঠি লেখেন— কাহাকে তাহা জানা নাই। চিঠিখানি আশ্চর্য। তাহার শেষে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রসিদ্ধ একটি কবিতা হইতে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি তিনি উদ্ধার করিয়াছেন। সেই চিঠিখানি এখানে না তুলিয়া দিয়া পাবিলাম না—

পবিত্র বুধবার ২৯ শ্রাবণ ১৭৯০ শক।

প্রীতিভাজনেষু,

…"তং সং প্রশ্নং ভুবনা যন্ত্যান্যা" পৃথিবী জানিবার নিমিত্তে তাঁহাকে প্রতিদিন প্রদক্ষিণ করিতেছে, কিন্তু সেই "পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যা" তাহার নিকটে "তমসি তিষ্ঠন তমসোন্তরোয়ম্‌" হইয়া রহিয়াছেন। সমুদ্রগর্ভ হইতে পর্বত সকল তাঁহাকে জানিবার নিমিত্তে মেঘ ভেদ করিয়া উন্নত মস্তকে উর্ধ্বে উত্থিত হইল, তাহারা না জানিতে পারিয়া চিরকাল স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে, "ধ্যায়ন্তীব পর্বতাঃ।" তাঁহাকে জানিবার নিমিত্তে শিরাজের উদ্যানে গোলাব প্রস্ফুটিত হইল, মানস সরোবরে পদ্ম বিকশিত হইল— কিন্তু তাঁহাকে না জানিতে পারিয়া তাহারা

প্রাণ দান করিল। সুপর্ণ হোমায়ুন অনাহারে আকাশে আকাশে সঞ্চরণ করিয়াও তাঁহাকে জানিতে পারিল না— মৃগরাজ সিংহও কোন বন-দেবতার নিকট হইতে তাঁহার বিষয়ে উপদেশ পাইল না। মাতা ভূমি যুগে যুগে স্তরে স্তরে অসংখ্য জীব জন্তু উৎপাদন করিলেন, কেহই তাঁহার অনুসন্ধান পাইল না। আশ্চর্য হইয়া নিষ্কাম অপ্রমত্ত মনুষ্যই সকলের প্রশ্নের উত্তর দিলেন। "বেদাহম্ এতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি নান্যঃপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" তিনি তাঁহার আবির্ভাব বাহিরে দেখিলেন, তিনি তাঁহার নিগূঢ় ভাব অন্তরে দেখিলেন— তিনি জানিলেন যে "সনোবন্ধুর্জনিতা স বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা। যত্র দেবো অমৃতমানশানাস্তৃতীয়ে ধামন্নধ্যৈরয়ন্তঃ॥" তিনি সেই সকল সুখের আকর, সকল কল্যাণের প্রস্রবণ জগৎপিতার পরম পদে নমস্কার করিয়া কৃতার্থ হইলেন। "নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ। নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ। নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদং।

Whose dwelling is the light of setting suns, and the round ocean, and the living air, and the blue sky, and in the mind of man, and rolls through all things.

নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণ।"

কাশ্মীর হইতে ফিরিয়া দেবেন্দ্রনাথ অগ্রহায়ণ মাসে প্রয়াগে আসিয়া উপস্থিত হন। এবং সেখান হইতে কলিকাতায় আসিয়া পৌছেন।

কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ যখন পরিব্রাজকের মতো তুষারনির্জন হিমালয়ের পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন এদিকে দেশের মধ্যে কি হইতেছিল?

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে খোলকরতাল যোগে সংকীর্তন এবং সমস্ত দিনব্যাপী ব্রহ্মোৎসবের আয়োজনের কথা আমরা তো পূর্বেই শুনিয়াছি। সেই ভক্তির আন্দোলন এ সময়ে সমস্ত দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ১৮৬৮ সালের গোড়ায় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মন্দির তৈরির জন্য জমি কিনিয়া মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করা হইল। সেই উপলক্ষে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মদিগকে লইয়া এক নগরকীর্তন বাহির করেন— সেই কীর্তনে প্রথম ঘোষণা করা হয়—

"নরনারী সাধারণের সমান অধিকার
যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাহি জাতিবিচার।"

"যিশুখৃষ্ট ইউরোপ এবং এশিয়া" এবং "গ্রেটমেন"— কেশবচন্দ্রের এই দুইটি বক্তৃতার কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। তাহাদের সার কথাটা যেমনি হোক, তাহাদের মধ্যে খৃস্টভক্তি এবং মহাপুরুষবাদ যে ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নির্বিচারে মানিয়া লওয়া শক্ত, সে কথাও আমরা পূর্বেই দেখিয়া আসিয়াছি।

সুতরাং একদিকে বৈষ্ণব কীর্তনের মতো মাতামাতি অন্য দিকে উপদেশে উপাসনায় খৃস্টানী ভাব ও ভাবাব প্রাচুর্য— এ দুয়ের যোগে এ সময়ের ভক্তির আন্দোলন এক অদ্ভুত রসোন্মত্ততায় গিয়া পৌঁছিয়াছিল। 'আচার্য কেশবচন্দ্রের' গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, মুঙ্গেরে ব্রাহ্ম ভক্তদের "পরস্পরের চরণে অবলুণ্ঠন করিয়া তৃপ্তির পরিসমাপ্তি হইল না, পরিশেষে চরণ ধৌত করিয়া দিয়া পত্নীর সুদীর্ঘ কেশ দ্বারা আর্দ্র পদ শুষ্ক করিয়া দেওয়া পর্যন্ত চলিল।" এই পরিশেষের অনুষ্ঠানটির কারণ বোধ হয় বাইবেলে আছে যে মেরী যিশুব পায়ে সুগন্ধ তেল ঢালিয়া দিয়া নিজের চুলের দ্বারা তাঁহার পা মুছাইয়া দিযাছিলেন। তার পরে, মুঙ্গেরেব কোনো কোনো ভক্ত "স্বপ্নদর্শীর ন্যায় ঈশা চৈতন্যকে হাত ধরাধরি করিয়া অবতরণ করিতে দেখিতে লাগিলেন। সময়ে সময়ে কপোতের অবতরণও ইঁহারা দেখিতেন।" এ-সব কপোতের অবতরণ প্রভৃতি ব্যাপারও বাইবেলেই দেখিতে পাওয়া যায়। তাই বলিতেছি যে, একদিকে কীর্তন ও নৃত্য— সেটা বৈষ্ণবদের ধর্ম হইতে পাওয়া গেল এবং বাঙালীর রক্তের মধ্যেও তাহার সংস্কার ভরিয়া আছে, কারণ সেটা বাঙালীরই সৃষ্টি। অন্য দিকে পবিত্রাত্মার আবির্ভাব, মহাপুরুষদের অবতরণ প্রভৃতি ব্যাপার খৃস্টানধর্ম হইতে পাওয়া গেল। এ দুয়ের সমন্বয়ে ভক্তির আন্দোলন এক অনির্বচনীয় আকার ধারণ করিল।

বেশ বুঝিতে পারি যে, দেবেন্দ্রনাথের কাছে এই-সকল কতক খৃস্টানী কতক বৈষ্ণব ভাব ও অনুষ্ঠানের মিশলে উৎপন্ন এই নূতন ভক্তির আন্দোলন খুবই আশঙ্কার ব্যাপার বলিয়া মনে হইতে বাধ্য। ভক্তির এই রকমের রসোন্মত্ত আতিশয্যকে তিনি কখনোই ব্রাহ্মধর্মের উন্নতি বলিয়া মনে করিতে পারেন না। এই অসংযত অসম্বৃত ভক্তি যে যথার্থই একনিষ্ঠ ঐকান্তিকী ভক্তি, এ তিনি কেমন করিয়া স্বীকার করিবেন? রাজনারায়ণ বসু ইহাকে ঠাট্টা করিয়া "ব্রহ্মগোল করিয়া বেড়ান" নাম দিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "যাঁহারা উৎসব উৎসব

করিয়া এত উন্মত্ত হন, তাঁহারাই আবার অন্যের প্রতি অশান্ত ও উগ্র ব্যবহার করেন।" বাস্তবিকই ভক্তির দ্বারা মানুষের অন্তরবাহির তো সরস ও মধুর হইবার কথা। অথচ এ সময়ে যাঁহারা ভক্তির আন্দোলন করিয়া বেড়াইতে-ছিলেন তাঁহাদের অনেকেরই উগ্রতা, অনুদারতা, অসহিষ্ণুতা ও বিদ্বেষভাবের উনপঞ্চাশ হাওয়া একেবারে কথা, বক্তৃতা, উপদেশ ও রচনার পালে পালে হুহু শব্দে বহিতেছিল। এইজন্য মনে হয় যে, বাহিরের উত্তেজনার উপর যখন ভক্তির অপেক্ষা থাকে, তখন সেই উত্তেজনার পেয়ালাটাকে কেবলি ভরিয়া রাখিতে হয়। এবং এমনি করিয়া যে মাদকতার সৃষ্টি হয় তাহা যে মানুষকে ভিতরে ভিতরে দুর্বল করিয়া তোলে, মানুষ সে কথা ভুলিয়া যায়। সেই দুর্বলতাই তখন অন্য উত্তেজনার আকার লয়। এক উত্তেজনা হইতে অন্য উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। সুতরাং বিদ্বেষভাবের উত্তেজনাও মানুষকে এমনি নাচান নাচায় যে তাহা যে লজ্জার বিষয় সে কথা একেবারেই মনে থাকে না। ধর্মের এই "সেন্টিমেন্টালিটি" যেমন এই-সব ভক্তির আতিশয্যে, তেমনি মতামতের লড়াইয়ে ও বাদ-প্রতিবাদে দুই ব্যাপারেই ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে মূর্তিমান হইয়া আছে।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মন্দির যখন প্রায় তৈরি হইয়া উঠিয়াছে, তখন কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথকে মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন আচার্যের কাজ করিতে অনুরোধ করিয়া চিঠি লিখিলেন। সেই চিঠির জবাবে দেবেন্দ্রনাথ লিখিলেন যে, মুঙ্গেরের ব্রাহ্মসমাজে খৃস্টের উপাসনা হইয়াছে জানিয়া তাঁহার মনে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ব্রহ্মের সহিত খৃস্ট প্রভৃতি অবতারদিগেরও আরাধনা হইতে পারে। কেশবচন্দ্র ইহার উত্তরে লিখিলেন যে, ব্রহ্মমন্দির কেবল ব্রহ্মের উপাসনার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কোনো মানুষের আরাধনার জন্য নয়। তার পরে তিনি লেখেন যে, মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজে খৃস্ট সম্বন্ধে গান হয় নাই এবং তাঁহার উপাসনাও হয় নাই। ব্যক্তিবিশেষের বাড়িতে খৃস্ট সম্বন্ধে দুইটি গান হয়। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের তরফ হইতে কেশবচন্দ্র নিজে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন, 'মিরর' পত্রেও প্রতিবাদ বাহির হইয়াছে। ৭ই ভাদ্র রবিবার উপাসনার দিন স্থির হইয়াছে— অতএব সেদিন দেবেন্দ্রনাথ আসিবেন তাঁহারা এই আশা করিয়া রহিলেন।

ইহার উত্তরে দেবেন্দ্রনাথ 'ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া'তে প্রকাশিত ২২এ জুলাইয়ের এক পত্রের কথা উল্লেখ করিয়া লেখেন যে, খৃস্ট সম্বন্ধে সেই দুইটি গানের

তর্জমা স্বয়ং প্রতাপচন্দ্র 'ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া'র সম্পাদককে চিঠির সঙ্গে ছাপিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। 'ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া'য় প্রকাশিত খৃস্টস্তুতি সম্বন্ধীয় যে কাগজের অংশ কাটিয়া দেবেন্দ্রনাথ নিজের কাছে বরাবর রাখিয়া দিয়াছিলেন—সেই কাগজের অংশে প্রকাশ এই :

THE BRAHMISTS.

Dear Sir,— In your editorial remark on my letter published in your issue of the 1st July, you say that the Brahmos use the expression "Resort of sinners not to Christ, but to other men, both living and dead." Whether those against whom you lay this charge really deserve it, will appear from the following translation of two hymns sung at Monghyr, on Christmas day and Good Friday, respectively. The Brahmos, those among them, I mean, who are truly spiritual, and anxiously labour to attain their salvation, regard Christ as the "Prince of Prophets", the greatest of great men, "divinely commissioned" by God to bring salvation unto mankind by the lessons of his life and death. Him they place at the head of those men who, as the "resort of sinners", came to save the erring and unrighteous. This doctrine may not agree with your convictions, but you owe me and my friends a fair representation of it, which your words on the occasion referred to, do not afford. And, now to the hymns.

(1) CHRISTMAS DAY, 1868. A poor man is near his end, O (Jesu). Without thy mercy I see no way. This life which people with (even much) devotion attain, I waste in sin ; O thou moon of righteousness, bring and give me forgiveness, seeing (that I am) helpless. O thou art the immaculate incarnation of holiness, behold the wretched condition of this blackened sinner. In the torment of threefold misery, my being is consumed. Thy feet are like the hundred-petalled lily, place them on the heart of this vile man. With thy touch, O Lord, the leprosy of sin shall leave me. O (Jesu) thy compassion is excited in the sinner's sorrow. I speak to thee, therefore, the sorrows of my heart. For the sake of thy love, thou didst give thy life and save the world : The wounds of a hundred weapons were upon thy person ;

without any offence thy blood was shed. At thy father's nod, myriads of angels run (as heralds) before thee.

(2) O thou moon of righteousness! with clasped hands I call thee. Wilt thou vouchsafe unto me thy manifestation? Lord! in sin my body consumes, I hold the lilies of thy feet. My fortune is not good, and so, I fear, lest the vices and sorrows of this awful sinner should cause pain to those feet. "Jesu is the sinner's friend", so say all men, therefore, I call thee, O Lord! I am a very great sinner, where shall I go but to thee? Bring, O bring, unto me the water of forgiveness that I may bathe, and be soothed. Loosen the bonds of my unrighteousness and take me to the Father's house.

Yours obediently,

Brahmo Somaj of India
July 12th, Calcutta.

PRATAP CHANDER MOZOOMDAR.

এই চিঠির উত্তরে কেশববাবু লিখিলেন যে, ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়ার প্রেরিত পত্র পড়িয়া দেবেন্দ্রনাথের মনে যে ঐরূপ ধারণা হইবে তাহা আশ্চর্য নয়। তিনি প্রতাপবাবুকে ইহার প্রতিবাদ করিতে বলিয়াছিলেন। যাহাই হৌক, শেষ পর্যন্ত দেবেন্দ্রনাথ মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ভারতবর্ষীয় সমাজের উপাসনায় সেবারে আচার্যের কাজ করেন নাই।

ইহার পর এই বছরের কার্তিক মাসে দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারীর সঙ্গে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। এক হিসাবে এইটিই দেবেন্দ্রনাথের শেষ অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানের পরে তাঁহার ছেলেমেয়েদের মধ্যে এক রবিবাবুর বিবাহ হয়, তখন তিনি বৃদ্ধ, স্থবির।

১৭৯১ শক ৮ই মাঘ তারিখে (১৮৭০ সাল) তিনি কাশী হইতে রাজনারায়ণবাবুকে চিঠি লিখিতেছেন, "ভ্রমণে ভ্রমণেই আমার শরীর নিপাত হইল।... এবার কোথায় যাইয়া পড়ি তাহার কিছুই ঠিকানা নাই।" তার পরে এই ১৭৯১ শকের চৈত্রে আবার লিখিতেছেন, "আমি ভ্রমণ করিতে করিতে ধর্মশালা পর্বতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।" ধর্মশালা পর্বতে পরের বছর ১৭৯২ শকেও শীত না পড়া পর্যন্ত তিনি ছিলেন—বোধ হয় অগ্রহায়ণের শেষাশেষি কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছেন।

এই সময়ে কেশবচন্দ্রও ইংলণ্ডে ছিলেন ; সেখানে কয়েক মাস নানা বিষয়ে বক্তৃতা দিয়া তিনি অসাধারণ যশস্বী হইয়াছিলেন। বিশেষভাবে খৃস্টের প্রতি আশ্চর্য অনুরাগের কথা এবং খৃস্টান ধর্মের উদার ব্যাখ্যা তাঁহার মুখে শুনিয়া সে দেশের বহু লোক অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। তবে সেখানে তাঁহার সকলের চেয়ে বড়ো কাজ হইয়াছিল— পূর্ব ও পশ্চিমের ভাবী মহামিলনের বার্তা প্রচার। পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি মনে করিতেন যে কোনো ধর্মবিধানেই পূর্ণ সত্য নাই, সেইজন্য কোনো সভ্যতাই পূর্ণ সত্যকে পায় নাই। সকল ধর্মবিধানের আংশিক সত্যগুলিকে মিলাইলেই এক বিশ্বভৌমিক নূতন ধর্মবিধানের মহাস্থচনা হইবে এবং এক মহান্ পূর্ণ সত্যের সাক্ষাৎকার হইবে। অতএব সেই সমন্বয় গড়িতে গেলেই সভ্যতার সঙ্গে সভ্যতাকে মিলিতে হইবে, পূর্বের সঙ্গে পশ্চিমকে মিলিতে হইবে। তাঁহার মুখে এই পূর্ব-পশ্চিমের মিলনের বার্তা সে দেশের ভাবুকদিগের মনকে খুবই নাড়া দিয়াছিল। আজও পর্যন্ত তাঁহার সকল বাণীর মধ্যে এই বাণী অমর হইয়া আছে। পূর্ব ও পশ্চিমকে যে মিলিতেই হইবে এ কথা এমন দিব্যদৃষ্টিতে দেখিয়া এমন ভরসার সহিত তাঁহার পূর্বে আর কেহই বলেন নাই।

যাহা হৌক, কেশবচন্দ্র যখন পশ্চিমের যশোমাল্য গলায় পরিয়া গৌরবে দেশে ফিরিলেন, তখন দেবেন্দ্রনাথও হিমালয় হইতে বাড়িতে ফিরিলেন। দুজনে দেখা হইল এবং কিছুদিন ধরিয়া দুই সমাজের মিলনের প্রস্তাব চলিতে লাগিল।

এ মিলনের প্রস্তাবে দেবেন্দ্রনাথের পূর্ণ সহানুভূতি ছিল, সে কথা বলাই বাহুল্য। তবে একটি বিষয়ে কেবল তাঁহার আপত্তি ছিল— সে ঐ খৃস্টের প্রতি ভারতবর্ষীয় সমাজের অতিরিক্ত ভক্তি। যাহাই হৌক, কেশবচন্দ্র একটি সন্ধিপত্র তৈরি করিলেন, তাহাতে মনুষ্যপুজা, মধ্যবর্তিবাদ, অবতারবাদ কোনো ভাবে এবং কোনো আকারে যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ অনুমোদন করেন না সে কথা স্পষ্ট করিয়া ঘোষণা করা হইল। তাহার শেষ সংকল্প এই :

"আদিব্রাহ্মসমাজ যথাসাধ্য হিন্দুজাতির সহিত যোগ রাখিয়া পুরাতন প্রণালীতে ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিতেছেন, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সকল জাতির মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার এবং যাবতীয় সামাজিক কার্য ব্রাহ্মধর্মের মতানুসারে অনুষ্ঠান করিতে যত্নবান হইয়াছেন ; প্রত্যেকে আপন আপন স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া পরস্পরের সহিত যোগ দিবেন।"

সন্ধিপত্রখানি পড়িয়া দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে লিখিলেন :

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ
আচার্য মহাশয় কল্যাণবরেষু

প্রাণাধিকেষু

আদিব্রাহ্মসমাজের প্রধান প্রধান ব্রাহ্মদিগের মত লইয়া প্রতীতি হইল যে, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে পরস্পরের সহিত আন্তরিক প্রণয় সঞ্চার ব্যতীত কোন সন্ধিপত্র প্রকাশ করিলে আমাদের ইচ্ছা সম্পন্ন হইতে পারে না, এই সাম্বৎসরিক উৎসবে তদ্রূপ ঘনিষ্ঠতা হইবার একটি উপায় আমার মনে হইতেছে। তাহা এই যে, এই উপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনা এক দিনে দুই স্থানে না হইয়া দুই দিনে হয়। ১১ই মাঘ আদিব্রাহ্মসমাজে আদিব্রাহ্মসমাজেব নির্দিষ্ট রীতিতে তাহা সম্পন্ন হউক, আর ১০ই অথবা ১২ই মাঘ যে দিন ভাল বোধ হয় তথাকার নির্দিষ্ট রীতিতেই সাম্বৎসরিক উপাসনা অনুষ্ঠিত হউক। তাহা হইলে সকল ব্রাহ্মই পর্যায়ক্রমে একস্থানে মিলিত হইতে পারেন। এইরূপ হইলে কোন ব্রাহ্মের মন কোন বিষয়ে ক্ষুব্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। এ প্রস্তাবে তোমার অভিপ্রায় জানিতে পারিলে আহ্লাদিত হইব।

আদিব্রাহ্মসমাজ
২রা মাঘ ১৭৯২ শক।

নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্মণঃ।

কেশবচন্দ্র ১১ই মাঘেব উপাসনা আদিসমাজে হয়, এ প্রস্তাবে রাজি হইলেন না, তিনি দেবেন্দ্রনাথকে ভারতবর্ষীয় সমাজে উপাসনা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

খৃস্টের প্রতি ভক্তিব যে-রকমের আতিশয্য এবং খৃস্টান চর্চ-ব্যবহৃত (Ecclesiastical) যে-সকল বাক্য ও পদের অদ্ভুত ব্যবহার ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের উপদেশে গানে এবং বক্তৃতায় দেখা দিয়াছিল, দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে তাহা একেবারেই অসহ্য ছিল। এ বছরের মাঘ মাসে "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনীতে বাহির হয়। প্রবন্ধটিতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের যে-রকমের প্রশংসাবাদ আছে, এমন-কি, আদিব্রাহ্মসমাজের তুলনায় কোথাও কোথাও তাহার শ্রেষ্ঠতার কথা যেমন করিয়া বলা হইয়াছে, তাহাতে নিঃসন্দেহই মনে হয় যে, প্রবন্ধটি দেবেন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারো দ্বারা লিখিত হইতেই পারে না। তাহা ছাড়া ভাষা ও রচনারীতির ভিতরকার প্রমাণও সেই কথাই সমর্থন করে। সুতরাং প্রবন্ধটি এখানে জায়গায়

জায়গায় তুলিয়া দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন মনে করিতেছি। প্রবন্ধকার লিখিতেছেন—

"ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন দ্বারা একটি যে বিশেষ অভাব পূর্ণ হইয়াছে, আদিব্রাহ্মসমাজ হইতে তাহা সহজে পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না, প্রত্যুত তাহার জন্য অনেক সময় আমাদিগকে চিন্তিত হইতে হইয়াছিল— সর্বসাধারণ লোকের মধ্যে ব্রাহ্মধর্মকে প্রবিষ্ট করিবার কোন সহজ উপায় দৃষ্ট হইতেছিল না। আদিব্রাহ্মসমাজের কার্যপ্রণালী— বেদ-বেদান্তের রীতিতে সংস্কৃত ভাষায় উপাসনা, বেদোদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোকের পাঠ, জ্ঞানগর্ভ উপদেশ, কলাবতী ধারাতে সংগীত, ইহার একটিও সুশিক্ষিত ভিন্ন সর্বসাধারণ লোকের উপযোগী নহে। আদিব্রাহ্মসমাজের যেরূপ ধারা চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে এই সকল ভাবের পরিবর্তন করিলে হীন হইয়া পড়িত। কিন্তু এই অভাব ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপন দ্বাবা পরিপূর্ণ হইতেছে।...

"এইরূপ স্বাতন্ত্র্য ভাব দ্বারাই জনসমাজে বিস্তৃত মঙ্গল উৎপন্ন হইবে। এইরূপ প্রকৃতিগত ভেদ বাস্তবিক অমিল নহে।...

"এক বিষয়ে ভাবতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কখনই আমাদের পোষকতা পাইবেন না। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন খৃস্টকে যে ভাবে গ্রহণ করিতেছেন, তাহাতে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্মের বিঘ্ন উৎপন্ন হইতেছে। খৃস্টানেরা খৃস্টকে যেরূপ মধ্যবর্তী বলিয়া গ্রহণ করেন, তিনি সেরূপ করেন না বটে, কিন্তু যতদূব করিতেছেন, তাহাও ঠিক হইতেছে না। খৃস্ট ব্রাহ্মসমাজের মস্তক, খৃস্ট ব্যতিরেকে ভারতবর্ষের পরিত্রাণ নাই, খৃস্টের দ্বারা এশিয়া ও ইউবোপ একত্রিত হইবে, যথার্থ খৃস্টধর্মই ব্রাহ্মধর্ম— এই সকল বাক্য দ্বারা ব্রাহ্মধর্মকে যে আকার প্রদান করা হইতেছে, তাহা প্রচলিত খৃস্টীয় ধর্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইতেছে বটে, কিন্তু প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম ইহাতে খর্ব হইয়া যাইতেছে। ইউরোপের পক্ষে তাহা ব্রাহ্মধর্মের সোপান হইতে পারে কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের পক্ষে অবনতির কারণ হইয়া উঠিবে। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন যেরূপ বলেন যে, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ উপাসনাতে আট-দশজন ব্যতীত প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ইহা যদি সত্য হয়, তবে হতাশ্বাস হইয়া কহিতেছি যে, এখনও পৃথিবীতে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সময় উপস্থিত হয় নাই এবং অনুরোধ করিতেছি যে, পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ উপাসনাতে অসমর্থদিগের জন্য আর খৃস্টকে মধ্যে রাখিবার আবশ্যকতা নাই, আমাদের স্বদেশীয় পৌত্তলিকতাই তদ্বিষয়ে যথেষ্ট হইয়া আছে।...

"আর একটি বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করা আবশ্যক। ভারতবর্ষে যত ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে, সে সকলগুলি ভারতবর্ষীয় ভাবেতেই বিভূষিত থাকা নিতান্ত আবশ্যক, নতুবা ভারতবর্ষের প্রাণ ব্রাহ্মসমাজের প্রাণ হইবে না এবং ইহার ভার ভারতবর্ষের পক্ষে গলগ্রহস্বরূপ হইবে এবং ইহার গর্ভে এমন ঘুণ প্রবিষ্ট হইয়া থাকিবে যে, কালেতে ইহার অন্তঃসার চূর্ণ করিয়া ফেলিবে। ভরসা করি ঈশ্বর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজকে যত বয়সে অগ্রসর করিয়া দিবেন, এ বিষয়ে অনৈক্য ভাব ততই দূরীকৃত হইবে।...

"পরিশেষে ব্যক্ত করিতেছি যে, মাতার সহিত পুত্রগণের যেরূপ সম্বন্ধ, আদি-ব্রাহ্মসমাজের সহিত সমুদায় ব্রাহ্মসমাজের সেইরূপ সম্বন্ধ। যাহাতে আদিব্রাহ্ম-সমাজ সেই সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া চলেন, ইহার মূল নিয়ম রক্ষা করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাও আমাদের লক্ষ্য হইয়া আছে— ঈশ্বর করুন যাহাতে সেই লক্ষ্যের কোন ব্যাঘাত না থাকে।"

এই প্রবন্ধে দুইটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ করা দরকার। একটি জিনিস প্রবন্ধকার স্বীকার করিতেছেন যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ খৃস্টকে যেভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা "ইউরোপের পক্ষে ব্রাহ্মধর্মের সোপান হইতে পারে।" এ একটা প্রকাণ্ড কথা। বস্তুত কেশবচন্দ্রের ইংলণ্ডে অমন অসাধারণ যশ লাভ করিবার ইহাই একটা প্রধান কারণ ছিল। তিনি খৃস্টকে ও খৃস্টানধর্মকে এমন করিয়া সে দেশের লোকের কাছে ধরিয়াছিলেন যাহাতে তাহারা নিজেদের আদর্শের একটি সার্বজনীন বিশুদ্ধ দিক দেখিতে পাইয়া আশ্চর্য হইয়াছিল। দ্বিতীয় লক্ষ করিবার জিনিস এই যে, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ উপাসনায় আট-দশজন ছাড়া পাওয়া যায় না— কেশবচন্দ্রের এই কথার উত্তরে প্রবন্ধকার লিখিতেছেন যে, "অসমর্থদিগের জন্য আর খৃস্টকে মধ্যে রাখিবার আবশ্যকতা নাই, আমাদের স্বদেশীয় পৌত্তলিকতাই তদ্বিষয়ে যথেষ্ট হইয়া আছে।" পৌত্তলিকতা যে অসমর্থদের জন্য এবং সে দিক দিয়া তাহার যে একটা স্থান আছে, এ কথা দেবেন্দ্রনাথ কোনোকালেই বিস্মৃত হন নাই। সেইজন্য স্বদেশীয় পৌত্তলিকতাকে আঘাত করিয়া সরাইয়া দিয়া বিদেশীয় পৌত্তলিকতাকে তাহার জায়গায় আদর করিয়া বসানোকে তিনি কোনোমতেই সমর্থন করিতে পারেন নাই। খৃস্টানধর্মের মধ্যে খৃস্টপুজা পৌত্তলিক অংশ— সেইটুকু বাদ দিলেই খৃস্টানধর্ম ব্রাহ্মধর্ম হইয়া যায়। অবশ্য তবুও তাহার একটি বিশিষ্ট জাতীয় রূপ থাকে— সেটাকে শুদ্ধ ঘাড়ে করিয়া ভারতবর্ষে টানিয়া আনিবার কোনো সার্থকতাই দেবেন্দ্রনাথ দেখিতে

পাইতেন না। সুতরাং সামনের মাঘোৎসবে ১১ই মাঘের উপাসনায় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে এই বিষয়েই ব্রাহ্মসাধারণকে সাবধান করিয়া দেওয়া তিনি নিতান্ত কর্তব্য বলিয়া বোধ করিলেন। তিনি দেখাইলেন যে, পশ্চিম মহাদেশে খৃস্টান-ধর্মের নামে কত রক্তপ্লাবন হইয়া গিয়াছে এবং প্রটেস্ট্যান্টধর্ম পোপের ধর্ম হইতে মুক্ত হইলেও ধর্মবিষয়ে ইউরোপ আজিও স্বাধীন হয় নাই। বাস্তবিকই খৃস্ট ছাড়া যে আর-কোনো মহাপুরুষ পৃথিবীতে থাকিতে পারে, খৃস্টের উপদেশের মতো উপদেশ যে অন্য-কোনো ধর্মশাস্ত্রে পাওয়া যাইতে পারে, এ বিশ্বাস সে দেশের মহাজনদের মনে আজ পর্যন্তও কোনো ক্রমেই আসিতে চায় না। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব (comparative religion) বা ধর্মের অভিব্যক্তি (evolution of religion) প্রভৃতি বিষয় সে দেশে যাঁহারা দার্শনিক ভাবে আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মনের মধ্যেও খৃস্টানধর্মের ও খৃস্টের অদ্বিতীয় শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে সংস্কার একেবারে দৃঢ়মূল। এই-সকল পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত বুদ্ধকে নিরীশ্বরবাদী শুষ্ক নীতি-মার্গের সাধক ও মোহম্মদকে প্রবঞ্চক ক্ষমতাপ্রিয় দলনায়ক করিয়া চিত্রিত করেন। বৌদ্ধ ও মুসলমানধর্মে যে খৃস্টান ধর্মেরই মতো ভক্তির নব নব সাধনা ও অভিজ্ঞতা, রসের নব নব আশ্চর্য উপলব্ধি ও জ্ঞানের নব নব তত্ত্ব স্তরে স্তরে দেখা দিয়াছে, সে কথা তাঁহারা প্রাণ গেলেও স্বীকার করিতে পারেন না। হিন্দুধর্ম তাঁহাদের মতে মায়াবাদের ধর্ম। ইহা শান্তিনিষ্ঠ নৈষ্কর্ম্যের ধর্ম এবং ইহারা মনে করেন সেই কারণেই হিন্দুজাতির নানা বিষয়ে উন্নতি হয় নাই। সুতরাং যে খৃস্টের শ্রেষ্ঠতা লইয়া পূর্ব-পশ্চিমে আজ পর্যন্ত এত বিবাদ, তাহার প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগ দেখাইলে ব্রাহ্মসমাজেও বিবাদ বিচ্ছেদ পাকা হইয়া থাকিবে ইহা দেবেন্দ্রনাথ স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন বলিয়াই এ বিষয়ে ব্রাহ্মদিগকে সতর্ক করা অত্যন্ত দরকার মনে করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম লইয়া তো বিবাদ হইতে পারে না, অবতার লইয়াই যত বিবাদ বাধে।

ব্রাহ্মধর্মের এই বিজাতীয় ভাবের জন্যই যে দেশের কাছে তাহা ক্রমশ অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা পাইয়াছে এ বিষয়ে আজিকার দিনে কি আর সন্দেহ করিবার কোনো কারণ আছে?

এইবার সেই মাঘোৎসবের বক্তৃতাটি উদ্ধার করিয়া দিই—আমার এই কথাগুলির সঙ্গে সেই বক্তৃতাটি মিলাইয়া পাঠকেরা পড়িয়া বিচার করিয়া দেখিবেন দেবেন্দ্রনাথের উপদেশের মধ্যে অত্যন্ত ক্ষোভের কারণ এমনি কী

ছিল। বক্তৃতাটির যে যে অংশগুলি আপত্তিকর মনে হইয়াছিল, সেই সেই অংশগুলি নীচে তুলিয়া দিলাম:

"এই ১১ই মাঘের উৎসব কিসের জন্য? ইহারই জন্য যে এই দিবসে আমরা সকলপ্রকার পরিমিত দেবতার উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া সেই অনন্ত ঈশ্বরের উপাসনায় যোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছি। ১১ই মাঘ ইহারই জন্য স্মরণীয়, ১১ই মাঘ ইহারই জন্য বরণীয় যে সকলপ্রকার পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনাতে প্রবৃত্ত হইলাম। ...ধন্য কেশবচন্দ্রকে যে তিনি এই-সমুদয় সাধুমণ্ডলী একত্রিত করিয়া ঈশ্বরের মহিমা কীর্তনের জন্য আমাদিগকে অবসর দিয়াছেন। সমুদ্র ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য তাঁহাকে বাধা দিতে পারে নাই। পর্বত তাঁহাকে বাধা দিতে পারে নাই। পৃথিবীময় ব্রাহ্মধর্ম ঘোষণা করা তাঁহার ব্রত। তাঁহার যেমন উৎসাহ, তেমনি উদ্যম। যাহা তিনি কল্যাণ মনে করেন তাহাই তিনি অনুষ্ঠানে পরিণত করেন। দূরদেশ তাঁহাব নিকট দূর নয়। ধন্য কেশবচন্দ্রকে যে তিনি প্রণয়সূত্রে এত সাধুলোককে বদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে আমি এই অনুনয়পূর্বক বলিতেছি যে তিনি ইহার সঙ্গে সঙ্গে খৃস্টকে না আনেন, এশিয়া ইউরোপের মধ্যবর্তী খৃস্টকে না করেন। আত্মা পরমাত্মার মধ্যে খৃস্ট ব্যবধান না হয়। আমরা কতপ্রকার অবতার অতিক্রম করিয়া ১১ই মাঘে ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠা করিয়াছি; অতএব আমরা কোন প্রকার অবতারের নামগন্ধও সহ্য করিতে পারি না। অবতারেরা ক্রমে ক্রমে হৃদয় মন সকলই কাড়িয়া লয়। অতএব সাবধান হইতে হইবে। যদিচ ব্রহ্মমন্দিরের মধ্যে কোন পুত্তলিকা আক্রমণ করিতে পারে নাই, তথাপি তাহার বাহিরে খৃস্ট-বিভীষিকা সকলকে ভয় প্রদর্শন করিতেছে, কত ব্রাহ্ম এখানে আসিতে পারিত, যদি খৃস্ট-বিভীষিকা না থাকিত। কোনপ্রকার ভয় না থাকে, কোনপ্রকার উত্তেজনা না থাকে, এই প্রকারে ব্রাহ্মধর্মের পথ পরিষ্কৃত করিতে হইবে। তাঁর বক্তৃতায়, তাঁর একাগ্রতায় সকলি সম্ভব পায়। ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে খৃস্টের ছায়া আসিতেছে, এই জন্য আমাদের হৃদয় দুঃখে প্লাবিত হইতেছে। আমরা চাই কেবল ঈশ্বরকে, তাঁর ত্রিসীমায় যেন কোন অবতার দণ্ডায়মান না থাকে। ব্রাহ্মধর্ম— স্বাধীনধর্ম; স্বাধীনতা রক্ষা না করিলে ব্রাহ্মধর্মের জীবন হইবে না। খৃস্ট যেখানে, সেখান হইতে স্বাধীনতা পলায়ন করে। খৃস্টের নামেতে বিগতবিবাদ ব্রাহ্মধর্ম হইতেও বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, সাম্প্রদায়িক ভাব সমুত্থিত হইয়াছে। দেখ পূর্বভাব মনে করিয়া দেখ, যখন একমাত্র ব্রহ্মই সকল ব্রাহ্মের মধ্যবিন্দু

হইয়াছিলেন, তার ইতস্ততঃ কোন পুত্তলিকার নামও ছিল না, তখন কেমন সকল ব্রাহ্মেরা একস্বরে একহৃদয়ে স্কন্ধে স্কন্ধে মিলিত হইয়া ব্রহ্মনাম ঘোষণা করিতেন; খৃস্টনাম আসিবামাত্র কি যে বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, কেহই জানে না যে, তাহা কি প্রকারে নির্বাণ হইবে। খৃস্টনাম সমুদয় ইউরোপকে রক্তপ্লাবনে প্লাবিত করিয়াছে; সেই খৃস্টনাম আবার এখানে প্রচলিত হইলে বঙ্গভূমির দুর্বল সন্তানগণের অস্থিচর্ম চূর্ণ করিয়া ফেলিবে। খৃস্টধর্মের মধ্যে পুরাতন ধর্ম পোপের ধর্ম, বহু রক্তপ্লাবনের পর প্রটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম তাহা হইতে মুক্ত হইল। কিন্তু যতটুকু তাহাদের খৃস্টের সঙ্গে যোগ, ততটুকু তাহাদের পরাধীনতা রহিয়াছে। ধর্ম বিষয়ে আজ পর্যন্ত ইউরোপে কোন দেশ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয় নাই। যেখানে খৃস্টের নাম গিয়াছে, সেইখানেই বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইয়াছে। আমরা ধর্মের নামে বিদ্বেষানল সহ্য করিতে পারি না। এই জন্য কেশবচন্দ্রকে অনুনয় করিয়া বলিতেছি যে, তিনি ব্রাহ্ম-ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে খৃস্টের নাম ঘোষণা না করেন। যে ব্রাহ্মধর্মের নিকটে তেত্রিশ কোটি দেবতা পরাভূত হইয়াছে, সে ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা কেবল এক ঈশ্বর।"

এই উপদেশের পর এক প্রতিবাদপত্র আসিল :

প্রতিবাদপত্র

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রধান আচার্য মহাশয় সমীপেষু।

"শ্রদ্ধাস্পদেষু,

"অদ্য প্রাতঃকালে আপনি ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে যে বক্তৃতা করিয়াছেন তন্মধ্যে খৃস্ট ও খৃস্টসম্প্রদায় সম্বন্ধে যে কয়েকটি কথা বলা হইয়াছিল তাহা উক্ত মন্দিরের মূল নিয়মবিরুদ্ধ, সুতরাং উহা প্রতিবাদ করা আমাদিগের পক্ষে নিতান্ত কর্তব্য। সে নিয়ম এই—

"এখানে যে উপাসনা হইবে তাহাতে কোন সৃষ্ট জীব বা পদার্থ যাহা সম্প্রদায়-বিশেষে পুজিত হইয়াছে বা হইবে তাহার প্রতি বিদ্রূপ বা অবমাননা করা হইবে না। কোন সম্প্রদায়কে নিন্দা উপহাস বা বিদ্বেষ করা হইবে না।

"আপনি যে জ্ঞাতসারে এই নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিবেন ইহা আমরা কখন

মনে করি নাই ; বিশেষতঃ উৎসবের দিনে এরূপ ব্যবহার করাতে আমাদের হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির } শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়
১০ই মাঘ ১৭৯২ শক } (প্রভৃতি ৬২ জনের স্বাক্ষর)"

ইহার উত্তরে দেবেন্দ্রনাথ লেখেন ·

"স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু গৌরগোবিন্দ রায়
প্রভৃতি সমীপেষু।

"স্নেহাস্পদেযু,—

"তোমাদের ১০ই মাঘ তারিখের পত্র কল্য পাইয়াছি। তোমাদের পত্রে উল্লিখিত মূল নিয়ম আমি অবগত ছিলাম না।

"এবং কোন সম্প্রদায়বিশেষের প্রতি অবমাননা কি উপহাস করা আমার অভিপ্রায় ছিল না। যাহাতে ব্রাহ্মধর্মের নির্মল ভাবের সহিত অন্য কোন পৌত্তলিক কি সাম্প্রদায়িক ধর্মের ভাব আসিয়া মিশ্রিত না হয় এবং তাহার উচ্চ আদর্শের মধ্যে অন্য কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মের পরিমিত আদর্শ আসিয়া না পড়ে, তাহাই আমার একান্ত বাসনা। আমার মনের সেই ভাব তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত এবং যাহাতে ব্রাহ্মধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে খৃস্টের নাম প্রচার হইয়া না পড়ে তাহাই তোমাদিগকে উপদেশ দেওয়া তোমাদিগের হিত মনে করিয়াছিলাম। আমার সেই উপদেশে যে তোমাদিগের ক্ষোভ জন্মিয়াছে তাহাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম।

১৫ই মাঘ } শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।
১৭৯২ শক } জোড়াসাঁকো।"

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, "এই প্রতিবাদ পত্র প্রেরণের দুই-চারি দিনের মধ্যে আমি মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'তোমরা প্রতিবাদ পাঠাইয়াছ, আমি কি করিব, আমি যাহা বলা উচিত মনে করি তাহাই ত বলিব, আমাকে আবার ডাকিলে হয়ত ঐরূপ কথাই বলিব।' তিনি যে বিরক্ত হইয়াছেন তাহার চিহ্নও দেখা গেল না।"

যাক, এই ঘটনার পর ব্রাহ্মসমাজের সম্মিলনের প্রস্তাব চাপা পড়িয়া গেল। ইউনিটেরিয়ান পাদ্রী ডাল্ সাহেব দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, (রাজনারায়ণ বসু তাঁহার এক প্রবন্ধে তাঁহার এই কথাগুলি উদ্ধার করিয়াছেন) কেশবের খৃস্টভক্তির জন্য ব্রাহ্মসমাজের বিচ্ছেদটা দূর হইবার উপক্রম হইয়াও দূর হইতে পারিল না। তিনি লিখিতেছেন : "That critical occasion was to have made the two churches one. But something parted them for ever. What was it ? Keshub's allegiance to Jesus. ...'Can we or can we not be one ?' was the voice upon the air. 'Not without we renounce Jesus and deny the founder of the Somaj' was the burden of the Adi Minister's reply. ...He ceased and the large congregation were about to disperse in silence which would have given consent. Then the spirit of Truth, which is the spirit of God, moved in the soul of our Keshub, with a power that he did not and could not resist.···None that heard that voice of God from the heart of Keshub could misconstrue its meaning or its results. He would be simply true to what God and honest enquiry should show him to be true in Jesus....The blow was struck. The deed was done....The Adist and the Progressives diverge from this day, Jesus said to the one, 'approach ;' to the other, 'depart' !"

ইহার পর আবার হিমালয় ! একেবারে বাক্রোটা শিখর !

আর-একটি বড়ো ঘটনার কথা পরপরিচ্ছেদে বলিয়া তাঁহার কর্মজীবনের পর্ব হইতে আমরা একেবারে বিদায় লইতে পারিব। তাঁহার কর্মজীবনের যদিও শেষ হইয়াছে দেখা গেল এবং যে ঘটনার কথা বলিতে যাইতেছি তাহাতে যদিও তাঁহার পরিশ্রম যথেষ্ট কিছুই ছিল না বলিলেই হয়, তবুও দূর হইতেও ইহার সঙ্গে যেটুকু যোগ তাঁহার ছিল, সেটুকুও নিতান্ত সামান্য নয়। ঘটনাটি—ব্রাহ্মবিবাহবিধির আন্দোলন। পরের পরিচ্ছেদে তাহার কথা বলা যাইবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ব্রাহ্মবিবাহবিধির আন্দোলন

ব্রাহ্মবিবাহবিধির ব্যাপার লইয়া যখন দেশে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত, তখন দেবেন্দ্রনাথ হিমাচলে বাক্রোটা শিখরে। কিন্তু সেখানে থাকিয়াও এ আন্দোলনের সঙ্গে তিনি পূর্ণমাত্রায় যুক্ত ছিলেন। কারণ ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে এটি সকলের চেয়ে গুরুতর ঘটনা। ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজের অন্তর্গত কি হিন্দু-সমাজের বহির্ভূত—এই আন্দোলনের দ্বারা তাহা চূড়ান্তরূপে স্থির করিতে হইয়াছিল! স্বাজাতিকতার পথ দিয়া আমরা বিশ্বভৌমিকতায় পৌছিব, না সে পথ ডিঙাইয়া একেবারেই সরাসরি পৌছিব, ব্রাহ্মসমাজের সামনে সেদিন এই বৃহৎ প্রশ্ন ছিল এবং এই প্রশ্নের জবাবের উপর ভাবী ব্রাহ্মসমাজের জীবন মরণ নির্ভর করিতেছিল।

ধর্মবিষয়ে মতভেদ সকল সভ্য সমাজে সকল কালেই দেখিতে পাওয়া যায় এবং সেই মতভেদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ও গড়িয়া উঠে। কিন্তু সম্প্রদায়ের উগ্রতা যেমনি থাক, তাহা জাতীয়তাকে অস্বীকার করিবার চেষ্টা করে এমন দৃষ্টান্ত বিরল। এক য়ুনাইটেড স্টেট্‌সের প্রতিষ্ঠাতা 'পিল্‌গ্রিম ফাদার্স' পিউরিটান দল ধর্মের জন্য দেশত্যাগী হইয়া আমেরিকায় গিয়া এক নূতন জাতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অথচ ইংলণ্ডের মধ্যে তো অসংখ্য ধর্মসম্প্রদায় আছে, কিন্তু তাহারা কেহই তো নিজেদিগকে অ-ইংরাজ বলে না। সমাজচৈতন্য জিনিসটা যাহাদের মধ্যে অস্ফুট বা অর্ধস্ফুট অবস্থায় থাকে, তাহারাই মতভেদের জন্য সমাজতন্ত্রকে ভাঙিয়া চুরিয়া বিপ্লব করিতে যায়। সে বিপ্লব যে সময় সময় প্রয়োজন হয় না তাহা নয়; কিন্তু তাহা কোনো সমাজেরই সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থার পরিচয় দেয় না।

আমরা দেখিয়াছি যে নব্য ব্রাহ্মরা হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন না। নিজেদের ধর্ম ও সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্যের অভিমান তাঁহাদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। সেইজন্য স্বাজাতিকতার একটি সর্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ তাঁহাদের চালে চলনে, আচারে ব্যবহারে, অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে কোথাও স্থান পাইল না। বিশ্বজাগতিকতার আদর্শকে তাঁহারা বরণ করিয়াছেন বলিয়া স্বাজাতিকতাকে তাঁহারা আমল দিতে পারেন নাই। কলিকাতা

সমাজের সঙ্গে নব্য ব্রাহ্মদলের বিচ্ছেদের একটা গোড়াকার কারণ এইখানে ছিল।

কিন্তু নব্য ব্রাহ্মদলের হিন্দুসমাজের সঙ্গে বিরোধ কতগুলি গুরুতর বিষয় লইয়া ঘটিয়াছিল। হিন্দুসমাজের গঠনের মূলে জাতিতন্ত্র—উপর হইতে নীচ পর্যন্ত কতগুলি জাতি স্তরে স্তরে সাজানো। উপরের চাপ ক্রমশ নীচের দিকে। যাহারা সকলের নীচে পড়িয়াছে সমস্ত সমাজের বহুকালের চাপে তাহাদের মনুষ্যত্ব একেবারে জীর্ণ পিষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই গঠনটিই ভাঙিবার জন্য নব্য দলের একান্ত চেষ্টা ছিল।

তার পরে হিন্দুসমাজতন্ত্রে "নরনারীর সমান অধিকার" নাই। স্ত্রী অত্যন্ত অধীন, পুরুষ তাহাকে বিষয়সম্পত্তির মতো মনে করিয়া তাহার সম্বন্ধে যেমন খুশি তেমন ব্যবহার করিতে পারে। পুরুষের বহুবিবাহ হিন্দু আইনে বৈধ, অথচ স্ত্রীর সামান্য স্খলনেই সে চিরকালের মতো পতিতা বলিয়া গণ্য হইবে। বিবাহের সময় অন্যান্য যৌতুকের মতো পিতা তাঁহার কন্যাকে বরের হাতে সম্প্রদান করিয়া থাকেন—বিবাহে স্ত্রীর সম্মতি বা অসম্মতির কোনো প্রশ্নই নাই। নব্য ব্রাহ্মরা স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী; এই জায়গায় হিন্দুসমাজের সঙ্গে তাঁহাদের বিষম বিরোধ।

কলিকাতা সমাজে থাকিতেই তাঁহারা জাতিতন্ত্র ভাঙিয়া অসবর্ণ বিবাহ দিতে লাগিলেন, স্ত্রীদের জন্য ব্রাহ্মিকা সমাজ তৈরি করিলেন, 'পর্দা' একটু একটু করিয়া মোচন করিতে লাগিলেন এবং বিবাহ অনুষ্ঠানে সম্প্রদান অংশটা তুলিয়া দিলেন। এইরূপে জাতিতন্ত্রমূলক সমাজের পরিবর্তে গণতন্ত্রমূলক সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহাদের এই-সব উদ্যোগ-অনুষ্ঠান চলিতে লাগিল। সমাজের কৌলিক ভিৎটাকে তাঁহারা নাড়া দিলেন।—হিন্দুসমাজে সেই কৌলিক ভিৎকে পাকা রাখিবার জন্যই তো পূর্বপুরুষের সঙ্গে সম্বন্ধ স্মরণ করিতে হয়—সেজন্য পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধতর্পণাদির যেমন ব্যবস্থা আছে, তেমনি বিবাহেও শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা আছে। হিন্দুপরিবারতন্ত্র সেই ধর্মানুগত কৌলিক অধিকারনিষ্ঠ পরিবারতন্ত্র—পাশ্চাত্ত্য সমাজতত্ত্ববিদেরা যাহার নাম দেন religious proprietary family। এই পরিবারতন্ত্রে বিবাহে কোনো পক্ষেরই ব্যক্তিগত সম্মতি-অসম্মতির কোনো প্রশ্নই নাই। এখানে পরিবাররক্ষা কুলরক্ষা ধর্মরক্ষাই প্রধান বিবেচনার বিষয় বলিয়া বিবাহ পিতামাতার ইচ্ছানুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে—পাত্রপাত্রীর ইচ্ছানুসারে হয় না। সুতরাং হিন্দুবিবাহমাত্রেই একটা বিশেষ ধর্মানুষ্ঠান (Sacrament)—তাহা চুক্তি বা contract-এর বিবাহ

নয়। নব্য ব্রাহ্মরা স্ত্রী-পুরুষের সম্মতি-অসম্মতির উপরেই বিবাহের একান্ত নির্ভর যদি বলিতেন, তবে তাঁহাদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বিবাহ আর স্যাক্রামেণ্ট থাকিতে পারিতই না। তাহা লোকবিধির অন্তর্গত হইয়া পড়িত। তাঁহাদের পরিবারতন্ত্র religious proprietary family না হইয়া সমাজতত্ত্ববিদেরা যাহাকে বলেন, পরিবারতন্ত্রের দ্বিতীয় ধাপ— romantic পরিবারতন্ত্র— তাহাই হইয়া দাঁড়াইত। স্ত্রী-পুরুষের রোমাণ্টিক প্রণয়ের দ্বারা বিবাহ স্থির হইত, বিবাহ-সম্বন্ধ কনট্রাক্ট্ বা চুক্তির সম্বন্ধ হইত।

এই দ্বিতীয় পরিবারতন্ত্রে সমাজবন্ধন শিথিল হইতে বাধ্য। কিন্তু নব্য ব্রাহ্মরা যে এই দ্বিতীয় পরিবারতন্ত্রকেই গ্রহণ করিয়াছেন এমন কথা বলা যায় না। কারণ তাঁহারা কৌলিক ভিত্তিকে সম্পূর্ণ ভাঙিতে পারেন নাই। হিন্দুসমাজের অন্তর্গত ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ এই তিন জাতির মধ্যেই প্রধানত তাঁহাদের বিবাহ-অনুষ্ঠানাদি প্রায় আবদ্ধ হইয়া আছে। অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম যে নাই তাহা বলিতেছি না। বিবাহের সময় পাত্র-পাত্রীর সম্মতি কেবলি তাহাদের স্বেচ্ছাধীন থাকে না, বাপ-মায়ের সম্মতির উপরেই তাহার সম্পূর্ণ নির্ভর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাকে। সুতরাং পশ্চিম মহাদেশের 'বোম্যাণ্টিক ফ্যামিলি' ব্রাহ্মসমাজে দেখা দিতে পারিল কই? ধর্ম এখানে পারিবারিক জীবনের প্রধান উপকরণ হইয়া আছে, বিবাহে ভাবী সন্তানসন্ততির শুভাশুভের উপর দৃষ্টি বিবাহের পাত্রপাত্রীর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আকর্ষণকে সংযত ও নিয়মিত করিতেছে, সুতরাং পরিবারের প্রতিষ্ঠা রক্ষা বা সম্ভ্রম রক্ষার ভাব যে একেবারে দূর হইয়া গিয়াছে সে কথা কোনোমতেই বলা যায় না। পশ্চিম মহাদেশে 'রোম্যাণ্টিক ফ্যামিলি' থাকিবার জন্য যে-সকল গুরুতর সামাজিক অনিষ্ট ঘটিতেছে, এ দেশের সমাজে তাহা ঘটিবার কোনো সম্ভাবনা নাই। কারণ রোম্যাণ্টিক পরিবারতন্ত্র স্ত্রী-পুরুষের যে স্বাধীনতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সে স্বাধীনতার কথা কল্পনা করাও ব্রাহ্ম-সমাজের পক্ষে শক্ত। বিবাহের পদ্ধতিতে কন্যা সম্প্রদানের জায়গায় কন্যার সম্মতি অংশ বসাইয়া দিলেই সেটা যথার্থ সম্মতি হয় না। ব্রাহ্মসমাজে স্ত্রী আজও স্বাধীন ব্যক্তি নয়, যেমন ইউরোপে। সুতরাং নব্য ব্রাহ্মরা না পশ্চিমের গণতন্ত্রমূলক সমাজের রোম্যাণ্টিক পরিবারতন্ত্র স্থাপন করিয়াছেন, না ভারতবর্ষের কুলতন্ত্রমূলক সমাজের ধর্মানুগত কৌলিক অধিকারনিষ্ঠ পরিবারতন্ত্রকে সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা দুয়েরি কতক কতক অংশ জুড়িয়া সামাজিক ব্যাপারেও এক অদ্ভুত সমন্বয় সাধন করিতে গিয়াছেন।

ব্রাহ্মদের পরিবারতন্ত্রকে পরিবারতন্ত্রের তৃতীয় ধাপ ethical family নাম দেওয়াও যাইতে পারে না। Religious proprietary পরিবারতন্ত্রের সঙ্গে romantic পরিবারতন্ত্রের যতখানি তফাত, 'রোম্যান্টিক' পরিবারতন্ত্রের সঙ্গে 'এথিকেল' পরিবারতন্ত্রের ততখানিই তফাত। রোম্যান্টিক পরিবারতন্ত্রে ইউরোপে যৌন নির্বাচনের খাতিরে কুলরক্ষা ধর্মরক্ষা এ-সব যেমন লোপ পাইয়াছে, ভাবী সন্তানের মঙ্গল-অমঙ্গলের দিকে তাকাইয়া যুবক-যুবতীর প্রণয়াকর্ষণের যে একটা সংযম নিতান্ত দরকার সেটাও তেমনি ভাবা হয় না— এমন-কি, সন্তান হওয়াটাই একটা অসুখের ব্যাপার বলিয়া ভাবা হয়।

'এথিকেল' পরিবারতন্ত্রে বিবাহের ব্যাপারে চারিটি জিনিসের অপেক্ষা আছে: ১. স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে একটি যথার্থ প্রেমের সম্বন্ধ— যে প্রেমে প্রবল হৃদয়াবেগের সঙ্গে শ্রদ্ধা মিলিত হইয়া আছে, ২. স্ত্রী-পুরুষের মাতা ও পিতা হইবার পক্ষে শারীরিক যোগ্যতা, ৩. তাহাদেব একটি ভদ্র স্বচ্ছল ও সুখী গৃহকে প্রতিষ্ঠিত করিবার ও রক্ষা করিবার শক্তি, ৪. সন্তানের মধ্যে নিজেদেব সদ্‌গুণ ও সংশিক্ষাকে সম্ভত করিবার উচ্চ কর্তব্যবোধ। অতএব এই কর্তব্য ও নীতি-বোধের সঙ্গে যদি হৃদয়াবেগের সংঘাত বাধে, তবে 'এথিকেল' পরিবার-তন্ত্রে হৃদয়াবেগকে বরং বিসর্জন দেওয়া হয়, কর্তব্যবোধকে বিসর্জন দেওয়া হয় না। ব্রাহ্ম পরিবারতন্ত্রে এ জিনিসটিও দেখা দিয়াছে।

সুতরাং সমাজ-অভিব্যক্তির ক্রমানুসারে যে তিন রকমের পরিবারতন্ত্র ইউরোপে পরে পরে দেখা দিয়াছে ও দিতেছে, সেই তিন পরিবারতন্ত্রের উপাদানগুলিকে জোড়াতাড়া দিয়া একটা নূতনগোচের পরিবারতন্ত্র দাঁড় করাইবার চেষ্টা ছিল ব্রাহ্মসমাজের চেষ্টা। জোড়া দিয়া জুড়িতে গিয়া ব্রাহ্ম পরিবারতন্ত্র তিনের কোনোটার মতোই হয় নাই। বরং হিন্দু পরিবারতন্ত্রেরই একটা উত্তর সংস্করণ বলিয়া তাহাকে ধরা যাইতে পারে।

সুতরাং নব্য ব্রাহ্মদের সামাজিক পদ্ধতি একেবারে যদি হিন্দুসমাজের পদ্ধতির উল্টা হইত, তবে হিন্দুসমাজ হইতে তাঁহাদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়ার সার্থকতা থাকিত। তাঁহারা হিন্দুসমাজের জাতিতন্ত্রকে আগাগোড়া ভাঙেন নাই; নীচ শ্রেণীর সঙ্গে উচ্চ শ্রেণীর বিবাহের আদান-প্রদান হইতে পারে এ কথা কাজে বিশেষ দেখান নাই। সুতরাং যেটুকু জাতির গণ্ডী ভাঙিয়াছেন সেটুকু হিন্দুসমাজের ভিতরে থাকিয়াই ভাঙা যাইত। তাঁহারা কৌলিক পদবী ত্যাগ করেন নাই; তবে কুলের মর্যাদার অভিমান ধর্মবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করিয়াছেন

এবং নিজের বর্ণের মধ্যেই যে বিবাহকে আবদ্ধ রাখিতে হইবে এ কথা অস্বীকার করিয়া অন্যান্য ভদ্র গুটি তিন-চার বর্ণের সঙ্গে প্রধানভাবে বিবাহের আদান-প্রদান করিয়াছেন। স্ত্রীস্বাধীনতা প্রচার করিলেও ইউরোপের Famininist movement-এর স্ত্রীস্বাধীনতার আদর্শ তাঁহাদের নয়; রোম্যান্টিক ফ্যামিলির আদর্শও তাঁহাদের নয়। বিবাহে কন্যার সম্মতি তাহার পিতামাতার সম্মতির উপরেই আজও প্রধানত নির্ভর করে। সম্পত্তির উত্তরাধিকার ইত্যাদি ব্যাপারে হিন্দু আইনের আশ্রয়েই ব্রাহ্মরা আছেন। সুতরাং স্ত্রীস্বাধীনতা বিষয়েও হিন্দু-সমাজের ভিতরে থাকিয়াই যে-সকল সংস্কার করা হইয়াছে তাহা করা যাইতে পারিত। একেবারে হিন্দুসমাজের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদের দরকার ছিল না। বিবাহকে কোনো ব্রাহ্মই পাশ্চাত্ত্য contract-এর চোখে আজও পর্যন্ত দেখেন না। তার প্রধান প্রমাণ, তিন আইনের বিবাহে যদিও বিবাহভঙ্গ বা divorce-এর ব্যবস্থা আছে, আজ পর্যন্ত কোনো ব্রাহ্ম সে ব্যবস্থার শরণাপন্ন হন নাই।

এখন দেখা যাক ব্রাহ্মবিবাহবিধির আন্দোলনের ইতিহাসটা। ব্রাহ্মসম্প্রদায় হিন্দুসমাজের ভিতরে থাকিয়া এ-সকল সংস্কার ধীরে ধীরে আনা যায় এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইলেন, না হিন্দুসমাজ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া এ-সকল সংস্কারকে আনিতে হইবে, এই সিদ্ধান্তকেই আশ্রয় করিলেন?

১৮৬৭ খৃস্টাব্দে ২০ অক্টোবর তারিখে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের এক অধিবেশনে স্থির হয় যে, "হিন্দুবিবাহসম্বন্ধে যে সকল রাজনিয়ম প্রচলিত আছে তাহা ব্রাহ্মবিবাহে বর্তিতে পারে কি না? যদি না পারে তবে ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার উৎকৃষ্ট উপায় অবধারণ করিবার ভার নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের উপর অর্পিত হয়।" কয়েকজন ব্যক্তির নামের তালিকার মাথায় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামও দেখিতে পাওয়া যায়।

কাউয়ি সাহেব তখন অ্যাডভোকেট জেনারেল ছিলেন। তাঁহাকে ব্রাহ্ম-বিবাহের বৈধতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তিনি উত্তর দেন যে, হিন্দু কিংবা মুসলমান বিবাহ-অনুষ্ঠানের বিশুদ্ধ বাঁধা পদ্ধতি অনুসারে ব্রাহ্ম বিবাহ সম্পন্ন হয় না বলিয়া কিংবা ইহা কোনো আইনের বিধান বা কোনো প্রতিষ্ঠিত ধর্মের আচারের অনুবর্তী নয় বলিয়া এ বিবাহ অবৈধ।

এ পর্যন্ত ১৮৬১ সাল হইতে কলিকাতা সমাজে "অনুষ্ঠান পদ্ধতি" অনুসারে যে-সকল বিবাহ হইয়া আসিতেছে, তাহা অপৌত্তলিক বিবাহ অথচ কলিকাতা সমাজ তাহাদিগকে হিন্দুবিবাহ বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছেন। সেই কারণে আইনের

চক্ষে সে বিবাহগুলি বৈধ কি অবৈধ সে প্রশ্ন লইয়া তাঁহারা সরকারের কাছে উপস্থিত হইবার কোনো প্রয়োজনই অনুভব করেন নাই। কাউয়ি সাহেবের এ মন্তব্যেও তাঁহারা বিচলিত হইলেন না। কারণ তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজকে যেমন উন্নত হিন্দুসমাজ, ব্রাহ্মধর্মকে যেমন উন্নত হিন্দুধর্ম বলিয়া ধরিয়া আসিতেছেন, ব্রাহ্মবিবাহকেও তেমনি সংস্কৃত ও বিশুদ্ধ হিন্দুবিবাহ বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছেন।

১৮৬৮ খৃস্টাব্দের ৫ জুলাই ভারতবর্ষীয় সমাজের আর-এক অধিবেশনে ব্রাহ্মবিবাহ কী, প্রচলিত হিন্দুশাস্ত্রমতে ব্রাহ্মবিবাহ সিদ্ধ কি না এবং যদি সিদ্ধ না হয় তবে ব্রাহ্মবিবাহকে বৈধ করিবার জন্য কী উপায় অবলম্বন করা দরকার এই বিষয়ে আলোচনা হয়। সেই সভায় কেশবচন্দ্র বলেন যে, ব্রাহ্মবিবাহকে হিন্দুবিবাহ মনে করা কোনোমতেই চলে না, কারণ প্রথমত নান্দীশ্রাদ্ধ বা কুশণ্ডিকা —এ দুইই ব্রাহ্মবিবাহে বাদ দেওয়া হইয়াছে এবং দ্বিতীয়ত ব্রাহ্মবিবাহে সঙ্কর বিবাহ আছে— হয়তো বা হিন্দু ভিন্ন অন্য দেশের অন্য জাতির সঙ্গেও ব্রাহ্মদের বিবাহ হইতে পারে। অতএব সেই সভায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা এই প্রস্তাব স্থির করেন যে, ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার জন্য গভর্মেণ্টের কাছে আবেদন করা হোক। গভর্মেণ্টের কাছে এ বিষয়ে আবেদন করা উচিত কি না, ইহা স্থির করিবার জন্য পূর্ব সভায় যে কমিটি নিযুক্ত হয় তাহাতে দেবেন্দ্রনাথের নাম ছিল। সমস্ত ব্রাহ্মমণ্ডলীর প্রতিনিধি এ কমিটিতে নাই বলিয়া দেবেন্দ্রনাথ এ কমিটির মধ্যে থাকিতে রাজি হন নাই।*

গভর্মেণ্টে ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার আবেদন কেশবচন্দ্র স্বয়ং সিমলায় গিয়া রাজপ্রতিনিধির সভায় উপস্থিত করেন। স্যর হেন্‌রি সাম্‌নার মেইন তখন ব্যবস্থাপক সভায় আইনবিভাগের মেম্বর। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া মেইন সাহেবের এই বিশ্বাস হইল যে, ব্রাহ্মদের ধর্মমতের কোনো স্থিরতা নাই। সেইজন্য ব্রাহ্ম কি?— ইহার আইনত কোনো সংজ্ঞা নির্দেশ করা শক্ত। আর যদি কোনো সংজ্ঞা না দেওয়াই যায়, তবে আইনের দিক হইতে ব্রাহ্মদের যেমন অবস্থা, ঠিক সেই রকম অবস্থার লোকেরা ব্রাহ্ম না হইয়াও আইনের আশ্রয়ের জন্য আবেদন করিতে পারে। সেইজন্য মেইন একটা সাধারণ ভাবের আইনের

* "Babu Devendra Nath declined to act on such committee, thinking the meeting as not properly representing the committee." —Rajnarain Bose, "The Civil Marriage Bill."

খসড়া খাড়া করেন। অবশ্য সেটা সিবিল বিবাহের আইনই হইবে, তাহাতে কোনো ধর্মসংক্রান্ত অনুষ্ঠানের ব্যাপার থাকিতে পারিবে না। ১৮৬৮ সালে এই আইনের পাণ্ডুলিপি তিনি ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করেন—**"A Bill to legalize marriages between persons not professing the Christian religion and objecting to marry according to the orthodox rites of any of the existing religions"**—যে-সকল ব্যক্তি খৃস্টান নন এবং কোনো প্রচলিত ধর্মের বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করিতে যাঁহাদের আপত্তি আছে, তাঁহাদের বিবাহকে বৈধ করিবার আইন। মেইন বলিলেন, সমস্ত ইউরোপীয় দেশেই প্রথমে সিবিল বা বিধিসংগত বিবাহ হইয়া পরে ধর্মসংগত বিবাহ হয়। অতএব এ আইন পাস হইলেও ব্রাহ্মরা যে-রকমের ইচ্ছা ধর্মানুষ্ঠান ইহার সঙ্গে জুড়িয়া দিতে পারিবেন।

তবে এক আপত্তি উঠিতে পারে এই যে, ভারতবর্ষে সকল সামাজিক প্রথা বা অনুষ্ঠানই যখন ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তখন এ রকমেব আইন এখানকার লোকের কাছে এক অভিনব কাণ্ড বলিয়া মনে হইবে এবং হয়তো বা ধর্মবিষয়ে গভর্মেণ্টের হস্তক্ষেপ বলিয়াও মনে হইতে পারে। ইহার উত্তরে মেইন বলেন যে, ধর্মমত ভিন্ন হইবার জন্য লোকে আইনের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইলে এবং আইন তাহাদিগকে তখন আশ্রয় দিতে গেলে, তাহাকে কখনোই ধর্মবিষয়ে হস্তক্ষেপ বলা যায় না। এই অবস্থায় ব্রিটিশ বিধিবিধানে ভারতবর্ষীয়দিগকে আইনের আশ্রয় দেওয়ার বিধি আছে। ১৮৫০ সালের লেক্স্‌লোসাই ২১ ধারার বিধিই তাহার প্রমাণ।* সে আইনটিকে মেইন ভাবতবর্ষে ধর্মমত সম্বন্ধে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার 'চার্টার' বলিয়াছেন। কিন্তু সে আইনের যাঁহারা প্রবর্তক ছিলেন তাঁহারা উত্তরাধিকারের সম্বন্ধে ব্যবস্থা দিলেন অথচ বিবাহসম্বন্ধে কোনো ব্যবস্থা

* Act XXI of 1850 এইরূপ :

"So much of any law or usage now in force within the territories subject to the Government of the East India Company, as inflicts on any person forfeiture of rights or property, or may be held in any way to impair or affect any right of inheritance, by reason of his or her renouncing, or having been excluded from the communion of any religion or being deprived of caste, shall cease to be enforced as law in the courts of the East India Company, and in the courts established by the Royal Charter within the said territories."

দিলেন না, এটা আশ্চর্যের বিষয়। হয়তো উত্তরাধিকারের প্রশ্নটাই তাঁহাদের সামনে ছিল, অন্য প্রশ্নটা ছিল না, সেইজন্য সেটি তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে।

মেইন তার পর তাঁহার বক্তৃতায় দেখাইলেন যে, কত বিচিত্র হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ এখনো বিধিবদ্ধ হইতে পারে নাই। শিখদের বিবাহ বিশুদ্ধ হিন্দু-পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হয় না। যদি কেহ বলেন যে হয়, তবে হিন্দুবিবাহপদ্ধতির বিশুদ্ধতার যে কিসের উপর নির্ভর ও কিসেব উপর নয়, তাহা তাঁহাকে দেখাইতে হইবে। শিখধর্মটাই একটা আধুনিক ধর্ম। শিখধর্ম হইতে যে-সকল শাখাধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও ধর্মমত ও ধর্মানুষ্ঠানের নানা বৈচিত্র্য আছে। সমস্ত ভারতবর্ষময় এই একই ক্রিয়া চলিতেছে দেখা যায়। সুতরাং সেই-সকল নব নব ধর্মসম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানাদিকে বিধিসংগত করিতে গেলে এই বিলের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে।

মেইনের এই বিলে বিবাহার্থীকে যে প্রতিজ্ঞা করিবার কথা ছিল তাহাতে তাহাকে বলিতে হইত যে, "আমি খৃস্টান নহি, এবং হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, পার্শি বা ইহুদী ধর্ম অনুসারে আমি বিবাহ করিতে আপত্তি করি।" সুতরাং এ বিল যদি পাস হইত, তবে অনেক হিন্দুসমাজের লোকও জাতিভঙ্গ করিয়া এই আইনের আশ্রয়ে অসবর্ণ বিবাহ করিয়াও হিন্দুসমাজে থাকিতে পারিত। বিলে তো এই দাঁড়ায়। সুতরাং এই বিল ব্যবস্থাপক সভায় ওঠামাত্র, হিন্দুসমাজে চারি দিক হইতে ইহার বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদ আসিতে আরম্ভ হইল।

সেই সময়ে, আদিব্রাহ্মসমাজও এই মর্মে একটা আবেদন গভর্মেণ্টের কাছে পাঠান যে, ব্রাহ্মদিগের বিবাহকে বিধিসংগত করিবার জন্য যখন এই বিলের অবতারণা, তখন এ বিল গভর্মেণ্ট পাস না করিলেই ভালো হয়। কারণ হিন্দুশাস্ত্র এবং এদেশীয় প্রথা— বিশেষত নানা হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে যে-সকল বিচিত্র বিবাহের প্রথা প্রচলিত আছে— সেই সমস্তই ব্রাহ্মবিবাহকে স্বীকার করিয়া লইবার পক্ষে অনুকূল।

সুতরাং মেইনের বিল পাস হইতে পারিল না। এক বিশেষ কমিটির হাতে বিলটার সম্বন্ধে বিবেচনার ভার ফেলিয়া দেওয়া হইল। দুই বছর কাটিয়া গেল। নূতন কমিটির মত হইল এই যে, সাধারণভাবে মেইনের বিল পাস হইতেই পারে না। তবে কেবলমাত্র ব্রাহ্মদের বিবাহকে বৈধ করিবার জন্য এক নূতন বিল খাড়া করা যাইতে পারে। তাহার নাম হইবে, 'ব্রাহ্ম ম্যারেজ অ্যাক্ট্।' এ বিলের বিধানগুলি মেইনের বিলের সমানই রহিল— সেই রেজিস্ট্রার আসিয়া

বিবাহকে বৈধ করিবেন, তিন জন সাক্ষী সাক্ষ্য দিবেন, পাত্র পাত্রী 'অবিবাহিত' এই কথা বলিতে হইবে (বিধবা বা বিপত্নীক হইলেও চলিবে) এবং পাত্রের বয়স ১৮ ও পাত্রীর বয়স ১৪ পূর্ণ হওয়া চাই। ৩১ মার্চ তারিখে এই বিল যেদিন পাস হইতে যাইতেছে, সেদিন হঠাৎ আদিব্রাহ্মসমাজের তরফ হইতে এক আবেদন গিয়া উপস্থিত হইল। ইহার পূর্বে আদিব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা এই বিল সম্বন্ধে বাষ্পও জানিতে পারেন নাই। এটা তাঁহাদের প্রতি অন্য পক্ষের যে অত্যন্ত অবিচার হইয়াছিল সে কথা বলিতেই হইবে। এ বিল পাস হইলে তাঁহাদের ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের সমস্ত আদর্শ ও প্রণালীপদ্ধতি চিরকালের মতো ব্যর্থ হইয়া যাইত। কারণ তাঁহাদের ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের আদর্শ হিন্দুসমাজের ভিতরে থাকিয়া ধীরে ধীরে সংস্কার-সাধনের চেষ্টা। হিন্দুসমাজের বাহিরে গিয়া স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করা তাঁহাদের আদর্শের বিরুদ্ধ। 'ব্রাহ্ম ম্যারেজ অ্যাক্ট্' পাস হইলে তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইত। সেইজন্য তাঁহারা তাড়াতাড়ি তাঁহাদের প্রতিনিধি সিমলায় পাঠাইলেন ও আবেদন পাঠাইলেন। সে আবেদনে ২০০০ ব্রাহ্ম সহি করেন। এ সম্বন্ধে ভারত-বর্ষীয় সমাজ বলেন যে, এ আবেদনে অনেক অব্রাহ্ম পৌত্তলিকের নামসহি লওয়া হইয়াছিল, অনেকে এ আবেদনটা যে কী ব্যাপার তাহা না জানিয়াই সহি দিয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের এই-সকল অভদ্র আক্রমণের উত্তরে রাজনারায়ণবাবু লিখিতেছেন যে, ধর্মসমাজের লোকের পক্ষে যতটুকু সংযমের সঙ্গে বাদপ্রতিবাদ চালানো উচিত, অন্য পক্ষের কাছে ততটুকু সংযম সকলেই প্রত্যাশা করে। অথচ অন্য পক্ষ আদিসমাজের সভ্যদের সম্বন্ধে এই-সকল জঘন্যতম অপবাদ দিতে কিছুমাত্র ইতস্তত: করেন নাই। পৌত্তলিক অনুষ্ঠান যাঁহারা করেন তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের সভ্য নন, এ কথা বলিলে কোন্ ব্রাহ্মসমাজের কয়জন সভ্য তখন অবশিষ্ট থাকিতেন? যাহাই হোক, আদিব্রাহ্মসমাজের আবেদনের মোট বক্তব্য কথাগুলি এই :

১. প্রস্তাবিত বিল সকল ব্রাহ্মদের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইবার কথা। অথচ অধিকাংশ ব্রাহ্ম এ বিলের আবশ্যকতা অনুভব করেন নাই এবং এরূপ বিলের জন্য কোনো প্রার্থনাও জানান নাই। কেশববাবু সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি নন।

তার পরে যে-সকল ব্রাহ্ম অপৌত্তলিক ভাবে বিবাহ-অনুষ্ঠান করিতেছেন, এ বিলের দ্বারা তাঁহাদের সেই অনুষ্ঠান যেন অবৈধ হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং এ

বিল যদি পাস হয়, তবে ব্রাহ্মদিগকে হিন্দুসমাজ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে, যদিচ তাঁহারা হিন্দুসমাজের অন্তর্গত। হিন্দুসমাজের ভিতরে থাকিয়া সংস্কার-সাধনের যে আদর্শ আদিব্রাহ্মসমাজের আদর্শ তাহা একেবারেই ব্যর্থ হইবে।

২. এই বিল এদেশীয় সামাজিক প্রথার উপরে হস্তক্ষেপ করিতেছে। সমাজে যে-সকল প্রথার পরিবর্তন ঘটে, তাহা সমাজের মাথালো লোকেরা ক্রমে ক্রমে স্বীকার করিয়া লয়। সুতরাং সে সম্বন্ধে আইনের হস্তক্ষেপের কোনো প্রয়োজন নাই। হিন্দুসমাজের ইতিহাস আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে যে, সময়ে সময়ে প্রচলিত ধর্মমতবিরোধী নানা সম্প্রদায় হিন্দুসমাজের মধ্যে জাগিয়াছে, তাহাদের আচার-অনুষ্ঠান সব সময়ে শাস্ত্রসংগত না হইলেও তাহার বৈধতা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন উঠে নাই। ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠানাদি সম্বন্ধেও সেই একই কথা।

রেজিস্ট্রারি বিবাহ, বিবাহ জিনিসটাকে এমন চুক্তির জিনিস করিয়া তোলে যে, ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদের পক্ষে সে ধরনের বিবাহের সঙ্গে বনিবনাও করা অত্যন্ত শক্ত। বিবাহের বয়স এ বিলে যাহা নির্ধারিত হইয়াছে, তাহাও এ দেশের প্রথার অনুযায়ী নয়। ১৪ বছরের নীচেই এ দেশের মেয়েদের বিবাহযোগ্য বয়স বলিয়া ধরা হয়। এক স্ত্রী থাকিতে অন্য স্ত্রীকে বিবাহ বা বহুবিবাহপ্রথা ক্রমশ উঠিয়া যাইতেছে, সুতরাং সে প্রথার নিবারণের জন্য এ বিলের কোনো সার্থকতা নাই।

৩. এ বিল নিষ্প্রয়োজন।

মেইন সাহেব ব্রাহ্ম কাহাকে বলে তাহার সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া মুশকিলে পড়িয়াছিলেন। অথচ ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস সুনির্দিষ্ট রহিয়াছে। যাহারা এক অদ্বিতীয় নিরাকার সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনা করে এবং তাঁহাকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য সাধন করে তাহারাই ব্রাহ্ম। এ সংজ্ঞা অনুসারে বম্বের প্রার্থনা-সমাজের সভ্যগণ এবং ইংলণ্ড ও আমেরিকার খ্রীস্টগণকেও ব্রাহ্ম বলা যায়। কিন্তু সামাজিক ব্যাপারে ব্রাহ্মগণ মনে করেন না যে, যে দেশীয় সমাজের তাঁহারা অন্তর্ভুক্ত সেই সেই সমাজের আচার ও অনুষ্ঠান তাঁহাদিগকে ছাড়িতে হইবে। অবশ্য যেখানে তাঁহাদের ধর্মবিশ্বাসে বাধে, সেখানে তাঁহারা আচার বা অনুষ্ঠানকে সংস্কার করিয়া লইতে বাধ্য। ব্রাহ্মগণ বিবাহ-অনুষ্ঠানে পৌত্তলিক অংশ বাদ দিয়া আর সমস্তই রক্ষা করিয়া আসিতেছেন এবং পৌত্তলিক অংশকে

তাঁহারা হিন্দু-বিবাহ-অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় অংশ বলিয়া বোধ করেন না। এই ধরনের অনুষ্ঠান এ পর্যন্ত ব্রাহ্মদের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং অ্যাড্‌ভোকেট জেনারেল কাউয়ির মত এই ব্রাহ্মবিবাহ সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে না।

৪. এ বিল আইন হইলে অনেক জটিলতার সৃষ্টি করিবে, অনেক নূতন আপদ উপস্থিত হইবে। হিন্দুসমাজের বাহিরে বিবাহ করিতে গেলেই উত্তরাধিকার সম্বন্ধে অনেক জটিল প্রশ্ন আসে। যেমন ধরা যাক, একজন হিন্দু ব্রাহ্ম হইয়া যদি একজন খৃস্টান বা মুসলমানের মেয়েকে বিবাহ করে, তবে তাহার সন্তান তাহার পিতামাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার কোন্ বিধি অনুসারে লাভ করিবে এ বিলে তাহার কোনো উল্লেখ নাই।

৫. ব্রাহ্মসমাজ এ বিলের জন্য প্রার্থী নন। কারণ আদি ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে যে-সকল বিবাহ হয়, সে-সকল বিবাহ পৌত্তলিকতা ছাড়া আর-সকল বিষয়েই হিন্দুপ্রথাকে অনুসরণ করিয়া থাকে। অতএব ব্রাহ্মবিবাহকে বিধিবদ্ধ করিবার দরকার নাই।

আদি ব্রাহ্মসমাজ উপরে অনুবাদিত যে আবেদনখানি পাঠাইয়াছিলেন তাহা ১৭৯৪ শকের জ্যৈষ্ঠের তত্ত্ববোধিনীতে "The Civil Marriage Bill" এই নামের এক ইংরাজী প্রবন্ধের মধ্যে উদ্‌ধৃত হইয়াছে। প্রবন্ধটি রাজনারায়ণবাবুর লেখা।

রাজনারায়ণবাবু আদি ব্রাহ্মসমাজের যে আবেদনটি উদ্ধার করিয়াছেন তাহাতে 'আচার্য কেশবচন্দ্র' গ্রন্থে উদ্‌ধৃত এ কথা কোথাও নাই যে, "বিশেষতঃ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইলে এই দোষ উপস্থিত হইবে যে, কাহারও পত্নী চিররোগ বা বন্ধ্যত্বাদি দোষযুক্ত হইলে অপর নারীর পাণিগ্রহণ ব্রাহ্মগণ করিতে পারিবেন না।" এ কথাও নাই যে, "নারীগণের বিবাহের বয়স চতুর্দশ বর্ষ নহে দ্বাদশ বর্ষ।" অথচ 'আচার্য কেশবচন্দ্র' গ্রন্থের প্রণেতা লিখিতেছেন যে, এই দুই কথা ঐ আবেদনে থাকার জন্যই নাকি কেশবচন্দ্র আবেদনটির সম্বন্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। প্রথম কথা আবেদনে থাকা একেবারেই হাস্যাস্পদ রকমে অসম্ভব। এত বড়ো বর্বরোচিত কথা রাজনারায়ণবাবুর কলম দিয়া বাহির হইতেই পারে না। দ্বিতীয় কথা যাহা আবেদনে আছে তাহা এই—"That the marriageable age of native girls in India is considered to be below fourteen years"—ভারতবর্ষে কন্যার বিবাহযোগ্য বয়স চৌদ্দ বছরের নীচে বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

অবশ্য ইহার কিছুকাল পূর্বে এ দেশের মেয়েদের বিবাহের উপযুক্ত বয়স কী তাহা স্থির করিবার জন্য কেশবচন্দ্র প্রসিদ্ধ ডাক্তারদের মত সংগ্রহ করেন। ১৪ হইতে ২১ পর্যন্ত বয়স বিবাহের ঠিক বয়স, বড়ো বড়ো ডাক্তারদের এই মত হয়। ডাক্তার চার্লস্ চৌদ্দ বছরকেই এ দেশের মেয়েদের পক্ষে বিবাহের উপযুক্ত বয়স মনে করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য দু-একজন ডাক্তার এ বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে একমত হইয়াছিলেন বলিয়া ঐ বয়সই সর্বনিম্ন বিবাহের বয়স, এই স্থির হয়। অতএব আদি ব্রাহ্মসমাজের আবেদনে মেয়েদের বিবাহের বয়স সম্বন্ধে যাহা লেখা হইয়াছিল তাহা না লিখিলেই ভালো হইত।

যাহাই হোক, আদি ব্রাহ্মসমাজের এই আবেদন যাওয়ার জন্য 'ব্রাহ্ম ম্যারেজ অ্যাক্ট্' পাস হইতে পারিল না— বিল সম্বন্ধে আলোচনা কিছুকালের মতো স্থগিত থাকিল। ইতিমধ্যে কাগজেপত্রে মসীর কলঙ্কলেপন চলিতে লাগিল। সেই সম্বন্ধেই রাজনারায়ণ বসু দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, ধর্মসমাজের লোকের কাছে বাদপ্রতিবাদের বেলাতেও মানুষ একটুখানি সংযমের প্রত্যাশা রাখে। কিন্তু নব্য ব্রাহ্মরা আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্বন্ধে জঘন্যতম অপবাদ দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া আদি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ সমর্থন করেন এবং মিরর তাঁহার সঙ্গে 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যান। মিররের সমস্ত প্রতিবাদের সার কথা এই যে, ব্রাহ্মগণ অভ্রান্ত শাস্ত্রে যখন বিশ্বাস করেন না তখন তাঁহাদের বিবাহের অনুষ্ঠান শাস্ত্রসম্মত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। হিন্দুসমাজের পণ্ডিতেরা এ বিবাহকে হিন্দুবিবাহ বলিয়া স্বীকার করেন না।

আদি ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদের বিবাহের অনুষ্ঠানের বৈধতা সম্বন্ধে কাশী, নবদ্বীপ, কলিকাতা ও ত্রিবেণীর প্রধান প্রধান পণ্ডিতদিগেব ব্যবস্থাপত্র আনান। সে ব্যবস্থাপত্রগুলি এইরূপ :

"ব্যবস্থাপত্র

"কাশীস্থ ও নবদ্বীপ, কলিকাতা এবং ত্রিবেণী প্রভৃতি সমাজস্থ প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের নিকট হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক আনীত ব্যবস্থাপত্র। সাধারণের বোধের জন্য বাঙলা অর্থ সহিত প্রকাশ করা হইল।

প্রশ্ন। (সংস্কৃতে দেওয়া হইয়াছে)

বাঙলা অর্থ

১. বহ্নি স্থাপন ও বিবাহবিহিত হোম না করিয়া বিহিত বাক্যোচ্চারণ পূর্বক

কন্যা দানের পর বিহিত মন্ত্র দ্বারা পাণিগ্রহণ ও সপ্তপদী গমনাদি করিলে সে বিবাহ সিদ্ধ হয় কি না।

২. উক্ত প্রকারে কন্যার দান ও গ্রহণ হইলে সেই স্বামী বর্তমানে সেই কন্যাকে অন্য পাত্রে পুনর্বার সম্প্রদান করিতে পারে কি না।

৩. উক্ত প্রকারে বিবাহিত পত্নী সেই স্বামীর নিকট হইতে গ্রাসাচ্ছাদন পাইবার অধিকারিণী হয় কি না।

৪. উক্ত প্রকারে বিবাহিত স্ত্রী পুরুষের পুত্রেরা পিতামাতার ধনাদিতে অধিকারী হইবে কি না।

অস্যোত্তরং।··· (সংস্কৃতে দেওয়া হইয়াছে)

বাঙ্গলা অর্থ: এই লিখনানুসারী এতাদৃশ বিবাহ সিদ্ধই হয়, যেহেতু দান স্বামিত্বের কারণ এবং ভার্যাত্ব সম্পাদক জ্ঞানপূর্বক গ্রহণই বিবাহ রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে, আর ইতর কর্মসকল অঙ্গরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে, সুতরাং সেই কন্যাকে পুনর্বার অন্য পাত্রে দান করিতে কেহ সমর্থ হয় না, এই উত্তর দ্বারা অন্তিম প্রশ্ন সকলও স্বীয় হস্তগত হইল, ইহা পণ্ডিতদিগের মত।

অত্র প্রমাণং। (সংস্কৃতে দেওয়া হইয়াছে ও তাহার বাংলা অনুবাদও ছাপা হয়)।

কাশীস্থ: ন্যায়পঞ্চাননোপনামক শ্রীঠাকুরদাস শর্মণাং, তর্কপঞ্চাননোপনামকানাং শ্রীজয়নারায়ণ শর্মণাং, তর্কভূষণোপাধিক শ্রীরাধামোহন শর্মণাং প্রভৃতি ২৮ জনের নাম স্বাক্ষর।

নবদ্বীপ প্রভৃতি সমাজস্থ: শ্রীরঘুমণি শর্মণাং, শ্রীহরমোহন শর্মণাং, শ্রীঠাকুরদাস দেব শর্মণাং, শ্রীমাধবচন্দ্র দেবশর্মণাং প্রভৃতি ২৫ জনের নাম স্বাক্ষর।

কলিকাতা হাতির বাগান হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাপত্র। (ইহার প্রশ্ন সকল প্রথমে দেওয়া হইয়াছে, তজ্জন্য পুনর্বার এখানে আর দেওয়া হইল না।)

শ্রীভবশঙ্কর শর্মণাং, শ্রীরমেশচন্দ্র শর্মণাং, শ্রীগোবর্ধন তর্করত্নস্য প্রভৃতি ৯ জনের নাম স্বাক্ষর।

কাশীস্থ হরিশ্চন্দ্র বাবুর বাটীর ১১ আশ্বিন দিবসীয় সভাস্থ পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে আধুনিক ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাপত্রের অবিকল প্রতিলিপি হইতে উদ্ধৃত। সাধারণের বোধের জন্য বাঙ্গলা অর্থ সহিত প্রকাশ করা হইল।

এই ব্যবস্থাপত্রে কোন প্রশ্ন লিখিত হয় নাই কেবল উত্তর মাত্র।

বাঙলা অর্থ

১. ব্রাহ্মনামক আধুনিক সমাজস্থদিগের বিবাহ কোনপ্রকারেই বেদসম্মত নহে।

২. নান্দীশ্রাদ্ধ না হওয়াতে অঙ্গমাত্র বৈগুণ্য হেতু বিবাহ ভার্যাত্ব সম্পন্ন করিলেও বিবাহে নান্দীশ্রাদ্ধের আবশ্যকতা জন্য বিহিত কর্মের অননুষ্ঠান প্রযুক্ত তাহা প্রত্যবায় বিশিষ্টই হইবে। সপ্তপদী ও কুশণ্ডিকা এই দুই বা ইহার মধ্যে এক না করিলে প্রধান কর্মের বৈগুণ্য হেতু বিবাহ সম্পন্নই হয় না।

৩. নান্দীশ্রাদ্ধ অবধি স্বীয় স্বীয় গৃহ্য সূত্রানুসারি পদ্ধতি প্রদর্শিত সকল কর্মই দ্বিজগণের বিবাহে আবশ্যক। শূদ্রকমলাকর প্রদর্শিত অমন্ত্রক সেই কর্ম শূদ্রদিগের।

৪. প্রতিলোম কন্যার বিবাহ চারি যুগেই নিষিদ্ধ, অনুলোম কন্যার বিবাহ কলিযুগে নিষিদ্ধ।

এই ব্যবস্থাপত্রে ইহার প্রমাণ কিছুই দেন নাই।

শ্রীবল্লভমতানুযায়িপঞ্চনদ্যুপনামক শ্রীগোবর্ধন শর্মণাং, ভট্টোপাহ্ব শ্রীসখারাম শর্মণঃ, ভট্টোপনামক শ্রীঅনন্তরাম শর্মণঃ প্রভৃতি ১৬ জনের নাম স্বাক্ষর।

ঈদৃগ্বিবাহঃ সম্পূর্ণো ন ভবতি ইতি।

ঈদৃশ বিবাহ অসম্পূর্ণ হয় মাত্র।

শ্রীঠাকুরদাস দেবশর্মসম্মতা ব্যবস্থা, শ্রীরাধামোহন শর্মণাং সম্মতিরত্রার্থে, শ্রীকালীপ্রসাদ শর্মণঃ, শ্রীতারাচরণ শর্মণঃ সম্মতিঃ, পণ্ডিত বেচনরাম শর্মণঃ সম্মতিঃ প্রভৃতি ২০ জনের নাম স্বাক্ষর।

এই ব্যবস্থাপত্র সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ যে-সকল অভিযোগ উপস্থিত করেন তাহাতে সাদা কথায় দাঁড়ায় এই যে, এই ব্যবস্থাপত্রখানি একটা প্রকাণ্ড ফাঁকি। প্রথম ব্যবস্থাপত্রে যাহাতে ঠাকুরদাস ন্যায়পঞ্চানন প্রভৃতি ২৮ জন পণ্ডিত এবং নবদ্বীপের ২৫ জন পণ্ডিতের নামসহি আছে, তাহাতে ব্রাহ্মবিবাহের কোনো উল্লেখ নাই— এই অভিযোগ। এই কারণে যিনি আদি সমাজের পক্ষে পণ্ডিতদের মত সংগ্রহের জন্য গিয়াছিলেন, সেই আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয়কে নব্য ব্রাহ্মদের কাগজ ধর্মতত্ত্বে খুব সুতীব্র শ্লেষ করা হয়। তার পরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কাশী ও নবদ্বীপের পণ্ডিতদিগের কাছে পত্র লিখিয়া ব্রাহ্মবিবাহ হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত কি না সেই প্রশ্ন করিয়া পাঠান। সেই চিঠিতে আদি সমাজ ও ভারতবর্ষীয় সমাজ দুই সমাজেরই অনুষ্ঠান-পদ্ধতি তাঁহারা পাঠাইয়া দেন এবং অসবর্ণ বিবাহ হিন্দুধর্মানুসারে বৈধ হইতে পারে কি

না জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহাদের প্রশ্নের জবাবে সকল জায়গার পণ্ডিতেরা একবাক্যে লেখেন যে, দুই পদ্ধতি অনুসারেই যে-সকল বিবাহ সম্পন্ন হয়, তাহারা অবৈধ এবং অসবর্ণ বিবাহ যে অবৈধ সে সম্বন্ধে তো কথাই নাই। কলিকাতার প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদিগের মধ্যে ভরত শিরোমণি, মহেশ ন্যায়রত্ন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরেরও ঐ এক মত দাঁড়ায়।

এই পাল্টা ব্যবস্থাপত্র আনার কোনো প্রয়োজন ভারতবর্ষীয় সমাজের ছিল না, কারণ ব্রাহ্ম বিবাহকে হিন্দুবিবাহ প্রমাণ করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় সমাজের কিছুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না। তাঁহারা সিবিল বিবাহেও রাজি ছিলেন, 'ব্রাহ্ম ম্যারেজ অ্যাক্‌টে' তো সানন্দে রাজি ছিলেন। সুতরাং কেবলমাত্র আদি সমাজের আবেদনের জন্য 'ব্রাহ্ম ম্যারেজ অ্যাক্‌ট্'টা ফাঁসিয়া গেল বলিয়া তাহাদেরও বিবাহ-অনুষ্ঠানটা অহিন্দু এটা প্রমাণ করার জন্য তাঁহারা কোমর বাঁধিয়া উঠিয়া পড়িয়া কেন লাগিলেন? আদি সমাজ যদি ব্যবস্থাপত্র পাইয়া থাকে, তাহাতে এতই কি চটিবার কারণ ছিল? এ দেশের পণ্ডিতগণের পাঁতির কি মূল্য তাহা কি তাঁহারা জানিতেন না? যে-সকল পণ্ডিত আদি সমাজের বিবাহকে সিদ্ধ বলিয়া নামসহি করিয়াছেন, একটু গোলযোগ ওঠা মাত্র তাঁরাই আবার কেহ কেহ সেই বিবাহকে অসিদ্ধ বলিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। এই পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে খুবই শ্রদ্ধেয় ও নিষ্ঠাবান থাকিলেও সাধারণত ইঁহাদের পাঁতি বা ব্যবস্থাপত্রের যে কি মূল্য তাহা একালে সকলেই জানেন। ব্যবস্থা আদায় করাও যেমন শক্ত নয়, ব্যবস্থা ঘুরাইয়া দেওয়াও তেমনি শক্ত নয়।

আদি সমাজ হিন্দুসমাজের সঙ্গে যোগ রাখিয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে চান, এ তো বেশ কথা। সেজন্য যদি তাঁহারা তাঁহাদের বিবাহ-অনুষ্ঠানকে বৈধ প্রমাণ করিবার জন্য পণ্ডিতদের পাঁতির জোগাড় করেন, তবে অন্য সমাজের লোকের এতটা খাপ্পা হইবার কি কারণ থাকিতে পারে— আমি তো বুঝিতে পারি না। বোধ হয় সে কালের ব্রাহ্মদের মনে পিউরিট্যানদের মতো একটা বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহাদের আদর্শই একমাত্র আদর্শ এবং তাঁহাদের প্রণালীই একমাত্র প্রণালী। যে ব্যক্তি অন্য আদর্শের বা প্রণালীর কথা কয় সে নিশ্চয়ই অসত্যের মধ্যে যাইতেছে, অতএব তাহার সেই অসত্যটাকে প্রাণপণে তাড়না করা একটা প্রকাণ্ড ধর্মনৈতিক কর্তব্য।

বেদান্তবাগীশ তাঁহার আনীত ব্যবস্থাপত্রকে ফাঁকি বলাতে প্রতিবাদ করেন। ভারতবর্ষীয় সমাজ প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন যে "ঐ ব্যবস্থাপত্রে" (শেষ

ব্যবস্থাপত্রখানিতে) "প্রথমতঃ ১৯ জন পণ্ডিত ব্রাহ্মবিবাহ অবৈধ ও অসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করেন। পরে দুইজন বাঙ্গালী পণ্ডিত ঈদৃশ বিবাহ পুর্ণো ন ভবতি' এই মতটি বাংলা অক্ষরে লিখিয়া তাহার নিম্নে স্বাক্ষর করিয়াছেন। পরে ১৬ জন পণ্ডিত বাংলায় কি লেখা হইল তাহা অবগত না হইয়া তাহার নিম্নে স্বাক্ষর করিয়াছেন। এখন বেদান্তবাগীশ ও কলিকাতা সমাজের সভ্যগণ চাতুর্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, যখন ঐ কয়েকজন পণ্ডিত ঈদৃশ বিবাহ সম্পূর্ণ নহে এই মতের নিম্নে স্বাক্ষর করিয়াছেন, তখন অবশ্যই তাঁহাদেরও এই মত, ইহা সাধারণকেও বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন, এমন কি তাহা আবার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত করা হইয়াছে।"

এই প্রবঞ্চনার অভিযোগের প্রমাণ এই উপস্থিত করা হয় যে, ভট্টোপনাম-কানন্তরাম শর্মা, বাবুদেব শাস্ত্রী, বাল শাস্ত্রী প্রভৃতি পণ্ডিত লেখেন যে পণ্ডিত তারাচরণ প্রভৃতি যাঁহাবা ব্রাহ্মবিবাহে সম্মতি দিয়াছিলেন তাঁহাবা অস্বীকার করিতেছেন। যে হরিশ্চন্দ্রবাবুব বাডিতে কাশীর পণ্ডিতদের সভা হয়, সেই হরিশ্চন্দ্র নিজে লিখিতেছেন যে, কাশীর কোনো প্রধান পণ্ডিত ব্রাহ্মবিবাহকে বৈধ বলেন নাই। তার পরে কাশী 'ধর্মসভা' হইতে এক চিঠি বাহির হয়, তাহাতে লেখা হয় যে কাশীর রাজা কোনো কোনো পণ্ডিত ব্রাহ্মবিবাহের ব্যবস্থাতে সম্মতি দিয়াছেন শুনিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। পণ্ডিত বস্তীরাম বলেন যে, তাঁহাকে বলা হয় শূদ্রবিবাহ বিষয়ে ব্যবস্থা চাই, তিনি শিষ্যকে তাই সম্মতি দিতে আজ্ঞা করেন। অন্যান্য পণ্ডিত বলেন, আমাদের ব্যবস্থা তাহাদেরই জন্য— যাহারা বেদকে অভ্রান্ত শাস্ত্র বলিয়া মানে। শেষকালে মহারাজের কাছে এই কথা গেল যে, যাঁহারা সম্মতি দিয়াছেন তাঁহারা ভুল করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা সম্মতি ফিরাইয়া লইতেছেন।

এ-সকল প্রমাণকে অকাট্য প্রমাণ মনে করিবার কোনো হেতু নাই। ন্যাশনাল পেপার এই-সকল প্রমাণের বিরুদ্ধে এই প্রমাণ দেন যে, কাশীতে ত্রিশ জন পণ্ডিতের মত পাওয়া গিয়াছে। তার পরে নবদ্বীপ, ত্রিবেণী, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের যে-সকল পণ্ডিতদের ব্যবস্থাপত্র আনা হইয়াছিল, তাঁহারা কেহ সম্মতি ফিরাইয়া লন নাই। কাশীর সকল পণ্ডিত প্রথমত ব্যবস্থা দেন নাই, তার পরে যাঁহারা দিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই বাঁকিয়া বসিয়াছিলেন এমন কোনো প্রমাণ নাই। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ যে-সকল পণ্ডিতের কাছে ব্যবস্থা চাহিয়া পাঠান তাঁহাদের সঙ্গে আদি ব্রাহ্মসমাজের বিবাহে যাঁহারা মত দিয়াছেন সেই-সকল

পণ্ডিতদের নামের সাদৃশ্য নাই। রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন যে, বিরুদ্ধ পক্ষ এই কথা রটনা করিয়া বেড়ান যে, যে-সকল পণ্ডিত আদি ব্রাহ্মসমাজের বিবাহে সম্মতি দিয়াছিলেন কাশীর রাজা তাঁহাদিগকে সামাজিক শাসন করেন। রাজার 'ধর্মসভা'র সম্পাদক সে কথা মিথ্যা বলিয়া প্রকাশ করেন। আনন্দচন্দ্র বেদান্ত-বাগীশ মহাশয় ব্রাহ্মবিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত ও বৈধ ইহা প্রমাণ করিয়া এক চটি বই প্রচার করিয়াছিলেন। মান্দ্রাজের পণ্ডিতেরা তাঁহাব মত সমর্থন করেন এবং বলেন যে, কতগুলি আচারই হিন্দুবিবাহেব প্রাণ নয়। বম্বের 'নেটিভ পাব্লিক ওপিনিয়ন' বলেন যে, তাঁহাদের অঞ্চলে বিবাহে কুশণ্ডিকা ব্যাপারই নাই।

আদি ব্রাহ্মসমাজের আনীত ব্যবস্থাপত্রকে ফাঁকি বলিয়া প্রমাণ করিবার দিকে এবং ব্রাহ্মবিবাহকে অহিন্দুবিবাহ বলিয়া প্রমাণ করিবার দিকে সমস্ত শক্তি সাধ্য ও মনোযোগ প্রয়োগ না করিয়া নব্য ব্রাহ্মরা অসবর্ণ বিবাহকেই হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য দেশের মধ্যে এই সময়ে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিতে পারিতেন। যে হিন্দুজাতির গঠনের মূলে আর্য ও অনার্যের স্পষ্ট সংমিশ্রণ রহিয়াছে এবং তার পরে বৌদ্ধযুগে অন্যান্য নানা জাতির সঙ্গে সংমিশ্রণের নানা চিহ্ন রহিয়াছে, সেই হিন্দুজাতির মধ্যে অসবর্ণ বিবাহকে শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ করা অত্যন্ত একটা অসম্ভব বা দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল না। বেদ হইতে শুরু করিয়া পুরাণ সংহিতা প্রভৃতি পর্যন্ত সমস্ত শাস্ত্রকে নাড়া দিয়া অসবর্ণ বিবাহটা যে বরাবর হিন্দুসমাজে চলিয়া আসিয়াছে তাহা প্রমাণ করা কিছুই কঠিন ছিল না। এই দিকে একটা প্রবল আন্দোলন জাগাইবার সুযোগ তখন ব্রাহ্মসমাজে ছিল অথচ ব্রাহ্মসমাজ সে সুযোগকে হেলায় বিসর্জন দিয়াছে। রামমোহন রায় সতীদাহ নিবারণের সময়ে শাস্ত্র ঘাঁটেন নাই? বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ বৈধ প্রমাণ করিবার জন্য শাস্ত্র হইতে বিধি আবিষ্কার করেন নাই? আর অসবর্ণ বিবাহকে সরাসরি অহিন্দু বিবাহ কবুল করিয়া শাস্ত্রান্বেষণ হইতে বিরত থাকাটাকেই ব্রাহ্মরা মস্ত একটা কর্তব্য বলিয়া মনে করিলেন, ইহার চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না।

৩০এ সেপ্টেম্বর কলিকাতা টাউন হলে এই বিবাহবিধি সম্বন্ধে আলোচনার জন্য যে সভা হয়, তাহাতে কেশবচন্দ্র বলেন যে, এ বিবাহবিধির উদ্দেশ্য জাতিভেদ উচ্ছেদ, সমস্ত ভারতবাসীর মধ্যে সঙ্কর বিবাহের চলন করিয়া এক ভারতীয় ভ্রাতৃমণ্ডলী স্থাপন করা। কিন্তু সব চেয়ে গুরুতর কথা সেই বক্তৃতার মধ্যে যাহা পাওয়া যায় তাহা এই যে, এই বিবাহবিধির জন্য হিন্দুসমাজ হইতে

যদি ব্রাহ্মদিগকে বিচ্ছিন্ন হইতে হয়, তাহাতে কোনো "ক্ষতি" নাই। তিনি বলিতেছেন—

"কাহার কাহার আপত্তি এই, ইহাতে হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে এবং সেই বিচ্ছেদে অবনতি অবশ্যম্ভাবী। অসত্য মিথ্যা পাপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সত্য ও পবিত্রতার অনুসরণ অবনতির হেতু! যদি হিন্দুসমাজ হইতে ব্রাহ্মগণকে বিচ্ছিন্ন হইতে হয়, তাহাতে তাঁহাদের ক্ষতি কি? অপর সমুদায় দেশ ও জাতি মধ্যে যে সকল সৎপুরুষ আছেন, তাঁহাদের সঙ্গে তো সত্যেতে, সামঞ্জস্যে, পবিত্রতাতে মিলন হইবে।"*

ব্রাহ্ম ম্যারেজ অ্যাক্ট্ বিলের বিরুদ্ধে আদি ব্রাহ্মসমাজ যে আবেদনখানি পাঠান, সে সম্বন্ধে 'আচার্য কেশবচন্দ্রে'র গ্রন্থকার লিখিতেছেন, "আইনের বিরোধীগণ মতে জাতি মানেন না বটে, কিন্তু ফলে জাতি রক্ষার জন্য এই বিবাহ-বিধির বিরোধী হইয়াছেন ইহাই কি গূঢ় কথা নয়?" বাস্তবিক ব্রাহ্মবিবাহবিধির এই আন্দোলন ব্যাপারে ব্রাহ্মসমাজের দুই শাখার মধ্যে যে তীব্র বাদপ্রতিবাদ চলিয়াছিল তাহাতে এই কথাই মনে হওয়া অসম্ভব নয় যে আদি ব্রাহ্মসমাজ অসবর্ণবিবাহকে একটুকুও আমল দিতে চান নাই। তাহা যদি হয় তবে নব্য ব্রাহ্মদের পক্ষে হিন্দুসমাজ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়া ছাড়া আর উপায় ছিল কি? কিন্তু আদি ব্রাহ্মসমাজের এই ভাব যদি সত্য হয়, তবে আর রাজনারায়ণ বসু কেমন করিয়া এই সমাজকে 'conservativo-progressive church' বলেন? দেবেন্দ্রনাথই বা অগ্রসর ও অনগ্রসর দুই দলকে মিলাইবার জন্য যে ব্যগ্র হইয়াছিলেন, তাহার অর্থ কোথায় থাকে? জাতিভেদপ্রথা সম্বন্ধে পুনঃপুনঃ তাঁহার চিঠিপত্রে তীব্র প্রতিবাদেরই বা সার্থকতা কি? সংরক্ষণ করিয়া ধীরে ধীরে সংস্কার করিতে হইবে, তাঁহার এ আদর্শেরই বা সত্যতা কোথায়? সংস্কার মানে কি শুধু পৌত্তলিকতা বর্জন, আর কিছুই নয়?

একথা মানিতেই হইবে যে, আদিব্রাহ্মসমাজ যে ব্যবস্থাপত্র আনাইয়াছিলেন তাহা কেবল অপৌত্তলিক সবর্ণবিবাহকে হিন্দুসমাজের চক্ষে বৈধ করিবার জন্য। অসবর্ণবিবাহের জন্য তাঁহারা ব্যবস্থাপত্র আনেন নাই, কারণ অসবর্ণবিবাহ আদি ব্রাহ্মসমাজে চলে নাই। রাজনারায়ণবাবু আশা করিয়াছিলেন যে কোনো সময়ে তাহা চলিবে, সে তো আমরা ইতিপূর্বেই অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি। তবু এ কথা

* আচার্য কেশবচন্দ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬৮

ঠিক নয় যে, ব্রাহ্ম ম্যারেজ অ্যাক্‌টের বিরুদ্ধে লড়িবার সময় তাঁহারা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাক এই ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় সমাজের বিবাহপ্রণালী যেমনি থাক, তাহাকেও হিন্দুসমাজের মধ্যে ক্রমশ চালাইতে হইবে এই দিকে তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল। ব্রাহ্মসমাজের কোনো-একটা শাখা আইনের দ্বারা হিন্দুসমাজের বাহিরে চলিয়া যায়, ইহা তাঁহাদের প্রাণগত অনিচ্ছা ছিল। কারণ ইহাকে তাঁহারা আত্মঘাতী পন্থা বলিয়াই মনে করিয়াছেন। তার সাক্ষী রাজনারায়ণবাবুর নিম্নে উদ্ধৃত কথাগুলি—

"যখন চৈতন্যমতাবলম্বী বৈষ্ণবদিগের কণ্ঠীবদল বিবাহ এবং অত্যন্ত আধুনিক শিখ সম্প্রদায় কোকাদিগের বিবাহ আদালতে বৈধ বলিয়া গণ্য হয়, তখন বিশেষ আইন না হইলেও ব্রাহ্ম বিবাহ আদালতে বৈধ বলিয়া গ্রাহ্য হইত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কেশববাবু আর কিছু দিন অপেক্ষা করিলে ব্রাহ্ম বিবাহ একটি সাম্প্রদায়িক প্রথা দাঁড়াইত, তাহা হইলে তাহা আদালতে বৈধ বলিয়া গ্রাহ্য হইত। কিন্তু কেশববাবুর সকল কার্যই তিন তাড়াতাড়ি। ব্রাহ্মবিবাহের আইনের আন্দোলনের সময় কেশব বাবু বলিয়াছিলেন যে, হিন্দুশাস্ত্রানুসারে অসবর্ণ বিবাহ কখনো বৈধ হইতে পারে না। তাঁহার স্থাপিত ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা যখন অসবর্ণ বিবাহ দিয়া থাকেন তখন আদি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে সে কথার উত্তর এইরূপ দেওয়া হইয়াছিল যে অসবর্ণ বিবাহ যদি শাস্ত্রানুমোদিত নহে তবে নিজ কেশব বাবুর উৎপত্তি কোথা হইতে হইল?"

ব্রাহ্ম ম্যারেজ অ্যাক্‌টের বিরুদ্ধে যখন আদি সমাজের আবেদন গেল, তার পরে দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণবাবুকে লিখিতেছেন "বিবাহ সম্বন্ধে একটা নিয়ম গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা সমাজ হইতে হইতেই হইবে। ব্রাহ্মদিগের বিবাহের জন্য সে নিয়ম না হইয়া যদি সাধারণের জন্য হয় তাহাতে ক্ষতি কি? কেবল কেশবদিগের জন্য বিবাহের আইন করার যে প্রস্তাব নবগোপাল করিয়াছেন তাহা আমার ভাল বোধ হয় না।" এ কি অনুদারতার কথা? ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সিবিল বিবাহে তাঁহার আপত্তি, ব্রাহ্ম বিবাহ বলিয়া একটা স্বতন্ত্র বিধি প্রস্তুত হইলে সে সম্বন্ধে তাঁহার আপত্তি, কিন্তু যদি হিন্দু বিধির মধ্যে সকল রকমের ব্রাহ্ম বিবাহ স্থান পায়, তবে সেইটাই তিনি সকলের চেয়ে কল্যাণকর বলিয়া মনে করিতেছেন। সেইজন্য স্পষ্টই তিনি লিখিতেছেন যে, কেবলমাত্র ভারতবর্ষীয় সমাজের ব্রাহ্মদের বিবাহের আইনের প্রস্তাব তাঁহার মনের সঙ্গে সায় পায় না। সুতরাং জাতি বাঁচাইবার জন্য আদি ব্রাহ্মসমাজ যে ব্রাহ্ম ম্যারেজ

অ্যাক্‌টের বিরোধী হইয়াছিলেন এ কথা একেবারেই ভিত্তিহীন। হিন্দুসমাজ হইতে ব্রাহ্মসমাজ যাহাতে বিচ্ছিন্ন না হয় এই দিকেই তাঁহাদের প্রাণগত একান্ত যত্ন। এবং বোধ হয় নব্য ব্রাহ্মদলের ঠিক উল্টাদিকেই প্রাণগত একান্ত যত্ন ছিল। হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়াটাই তাঁহারা পরম কল্যাণকর মনে করিয়াছিলেন।

রাজনারায়ণবাবু লিখিতেছেন, "শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় এবং নবগোপাল মিত্র আদি ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক শ্রীযুক্ত ষ্টিফেন সাহেবকে প্রস্তাবিত আইন বিষয়ে উপযুক্ত পরামর্শ দিবার জন্য সিমলায় প্রেরিত হন।...সিমলায় ষ্টিফেন সাহেবের সহিত সারদা বাবু ও নবগোপাল বাবুর সাক্ষাৎ হইবার সময় সাহেব বলিলেন, "তোমাদের প্রচার প্রণালী আমরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, প্রচার কার্যে তোমরা ইংরাজের কিছুমাত্র সহায়তা চাও না (you do not want the aid of Englishmen)। কেশব বাবু হিন্দুধর্মের সঙ্গে কোন রকম সম্বন্ধ রাখিতে চাহেন না। সিমলায় আসিবার কিছু পুর্বে কেশব বাবুকে আমি বলিলাম, "তোমরা যদি বল যে হিন্দু নই তাহা হইলে আমার পক্ষে আইন করিবার সুবিধা হয়; যেহেতু প্রচলিত ধর্মত্যাগকারী সকল লোকের ধর্মসম্পর্কশূন্য একটি সাধারণ সিবিল বিবাহবিধি বিধিবদ্ধ করিতে আমরা মানস করিতেছি।" কেশব বাবু উত্তর করিলেন, 'আমি হিন্দু নই বলিতে প্রস্তুত আছি', ইহাতে আমি আশ্চর্য হইলাম।" আশ্চর্য হইবার কথাই বটে। যেদিন কেশব বাবু বলিলেন, 'আমি হিন্দু নই' সেদিন কি শোচনীয় দিবস! সেদিন দুই ভাইএর ছাড়াছাড়ি হইল। এক ভাই পৈতৃক নিবাস স্বরূপ হিন্দুসমাজে রহিলেন, আর এক ভাই তথা হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। সিমলা হইতে যখন সাহেবেরা ফিরিলেন তখন কলিকাতায় ব্রাহ্ম বিবাহ বিষয়ে নূতন আইন বিধিবদ্ধ হয়। তাহা ১৮৭২ সালের প্রথমে বিধিবদ্ধ হয়।"

এই তিন আইনের বিবাহবিধি পাস করিবার সময় ভারতসচিবের ব্যবস্থাপক সভার আইনবিভাগের মেম্বর ষ্টিফেন সাহেব তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, 'আমি হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ পার্শি শিখ কিংবা জৈন কোন ধর্মাবলম্বী নই' বিবাহের সময় এই প্রতিজ্ঞাবিধি ঐ আইনের মধ্যে আছে বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন যে হয়তো উন্নতিশীল ব্রাহ্মরা আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে রাজি হইবেন না। কিন্তু গভর্মেণ্টের মতামত তাঁহাদের কাছে পৌছিবার পুর্বেই তাঁহারা আদি সমাজের আবেদনের জবাব দিয়া একটা পত্র পাঠান। তাহাতে এই আশ্চর্য উক্তিটি ছিল

—ব্রাহ্ম হিন্দুশব্দের অন্তর্ভুক্ত নয় ("The term Hindu does not include the Brahmo")। আদি ব্রাহ্মসমাজের এ বিলে আপত্তি নাই। হিন্দুসমাজের অধিকাংশ লোকেই এ বিবাহ হিন্দুসমাজের বহির্ভূত ব্যাপার জানিয়া এ সম্বন্ধে উদাসীন। ষ্টিফেন সাহেবের এ কথা বাস্তবিকই ঠিক, কারণ সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা বলিয়াছিলেন যে, এ বিবাহ যখন হিন্দুধর্ম বা হিন্দুসমাজকে কোথাও আঘাত করে না, তখন এ বিবাহের বিল পাস হওয়া সম্বন্ধে তাঁহাদের আপত্তির কী কারণ থাকিতে পারে ?

এই সময়ে রাজনারায়ণবাবু এই নূতন আইনেব বিরুদ্ধে "An Appeal to the Brahmo of India" নাম দিয়া এক উদ্দীপনা-পত্র ছাপাইয়া তাহা বিলি করেন। তাহাতে এমনতর নিরীশ্বর বিবাহপ্রণালীতে যে ব্রাহ্মরা রাজি হইতেছেন, ইহা লইয়া তিনি অত্যন্ত আক্ষেপ করিয়াছেন। তার পর ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে গভর্মেণ্টের হস্তক্ষেপ যে দরকার হইল এজন্যও তিনি বিশেষ ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সতীদাহ নিবারণ বা বিধবাবিবাহ প্রবর্তন ব্যাপারে গভর্মেণ্ট কোনো হস্তক্ষেপ করেন নাই। যাহা শাস্ত্রানুমোদিত তাহাকে বিধিসংগত করিয়াছেন মাত্র। যে অধিকার আমাদের নিজেদের হাতে ছিল তাহা গভর্মেণ্টের হাতে তুলিয়া দিবার জন্য ভবিষ্যতে কি হাতে আমাদিগকে গভর্মেণ্টের শরণাপন্ন হইতে হইবে।

কয়েক বছর হইল, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু এক বিবাহ-বিল ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিয়াছিলেন। অসবর্ণ বিবাহকে বৈধ হিন্দুবিবাহ বলিয়া স্বীকার করিবার কথা সেই বিলে ছিল। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু হিন্দুসমাজের লোক ; এবং এই বিলে হিন্দুসমাজের অনেকের পোষকতা তিনি পাইয়াছিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের তরফ হইতে দেবেন্দ্রনাথের পুত্রগণ এ বিলকে সমর্থন করিয়াছিলেন। সুতরাং রাজনারায়ণবাবুর কথা অনুসারে ১৮৭২ সালে যখন হিন্দুসমাজ এবং গভর্মেণ্ট দুই-ই অসবর্ণ বিবাহকে হিন্দুবিবাহের অন্তর্গত করিতে আপত্তি করে, তখন যদি আইনের জন্য তাড়াতাড়ি না করিয়া যেভাবে অপৌত্তলিক সবর্ণ বিবাহ চলিতেছিল, সেইভাবে অপৌত্তলিক অসবর্ণ বিবাহও চলিত, তবে আজ শ্রীযুক্ত বসুর বিলকে অগ্রাহ্য করা গভর্মেণ্টের পক্ষে অসম্ভব হইত। এতগুলি অসবর্ণ বিবাহকে অবৈধ বলিতে কোনো সভ্য গভর্মেণ্ট পারে না।

১৮৭২ সালের তিন আইনের স্বপক্ষে এক সময়ে ব্রাহ্মরা যতই লড়ুন, এখন অনেকেই অনুভব করিতেছেন যে, 'হিন্দু নই' এ আইনের প্রতিজ্ঞাবিধির এই

অংশটুকু বদলানো নিতান্ত দরকার। স্বদেশী আন্দোলনের পরে ব্রাহ্মসমাজের ভিতরেও জাতীয়তার ভাব খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। 'আমি হিন্দু নই'— এ কথা স্বীকার করা এ কালের অনেক যুবকদের পক্ষে মর্মান্তিক ক্লেশের ব্যাপার। অথচ এটা স্বীকার না করিলে তাহাদের বিবাহকে বৈধ করিবার কোনো উপায় নাই। স্বাজাত্যবোধ বরাবর এমন করিয়া আঘাত পাইতে পারে না। একটা প্রতিকার নিতান্ত দরকার। কিন্তু এ আইনের বদল কেমন করিয়া হয়? ব্রাহ্ম ও হিন্দুর মধ্যে যে ব্যবধান দাঁড়াইয়া গিয়াছে সেটাই বা কেমন করিয়া দূর হইবে? এ প্রশ্ন এখন যেমন গুরুতর, এমন গুরুতর দেবেন্দ্রনাথের সময়েও ছিল না। এখন এটার উপর ব্রাহ্মসমাজের জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে। হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে ক্ষতি কি, এ কথা কেশব যখন বলিয়াছিলেন তখন ব্রাহ্মসমাজ দেশের মধ্যে সব চেয়ে বড়ো শক্তি। তখন তাহার বল কত, দল কত। কিন্তু এখন এ কথা মুখে উচ্চারণ করিতেও বেদনা হয়, কারণ এখন দেশসত্তা কতখানি প্রত্যক্ষ! তাহার অতীতের কী গৌরবময় ছবি! তাহার বর্তমানের মধ্যে সেই অতীতকে জীবন্ত করিবার জন্য কী প্রয়াস— তাহার ভবিষ্যৎ কী বৃহৎ বিশ্বব্যাপক উদার সম্ভাবনারাশিতে পরিপূর্ণ! সেই যে অতীতবর্তমান-ভবিষ্যৎ সমস্তকে লইয়া হিন্দুসভ্যতার ধারা— ব্রাহ্ম তাহার বাহিরে? এ কথা কি ব্রাহ্মের পক্ষে স্বীকার করা সহজ? সুতরাং এখন এ আইনের হাত হইতে উদ্ধারের উপায় কী?

আমার মনে হয়, এক উপায় হইতে পারে, মেইনের বিলের অনুযায়ী করিয়া তিন আইনের বিবাহের ধারাটির যদি সংশোধন হয়। তিন আইনের বিবাহের দ্বারা যে সকল উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা ভুলিলে চলিবে না। ইহার দ্বারা ১. গোপন বা অবৈধ বিবাহ বন্ধ হইয়াছে, ২. বাল্যবিবাহ একেবারেই রদ হইয়াছে, ৩. ইহা পুরানো স্যাক্রামেন্টের বিবাহ—যাহাতে বিবাহার্থীদের সম্মতি-অসম্মতির কোনো প্রশ্ন নাই, সেই বিবাহপ্রথার স্থানে আধুনিক কালের বিজ্ঞান-সম্মত কন্‌ট্রাক্টের বিবাহ-প্রথাকে দাঁড় করাইয়াছে, যে বিবাহে বিবাহভঙ্গ বা divorce-এর বিধান আছে। ৪. ইহা জাতিভেদ ও বহুবিবাহ প্রথার মূলে আঘাত করিয়াছে। কেবল অহিন্দু স্বীকারোক্তিটুকুই ইহার মধ্যে বিশেষ আপত্তিকর। সুতরাং তখন হিন্দুসমাজ সিবিল বিবাহ সম্বন্ধে যত আপত্তি করিয়াছিল, এখন ততটা আপত্তি না-ও করিতে পারে। হিন্দুসমাজের মধ্যেও অনেক লোকে বিশুদ্ধ পৌত্তলিক রীতিতে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক হইতে

পারে। কারণ অনেক লোকের কোনো নির্দিষ্ট ধর্মবিশ্বাস না থাকিতে পারে। এখনই সে রকমের লোক যথেষ্ট দেখা দিতেছে। হিন্দুসমাজের ভিতরে বেশ নাড়াচাড়া চলিতেছে। তবে সমাজ ছাড়িয়া অনেক যুবক ব্রাহ্মদলে যোগ দিতে চায় না; সমাজ-বোধ তাহাদের মধ্যে অত্যন্ত জাজ্বল্যমান। সমাজের ভিতরে থাকিয়াই এই সমাজকে তাহাদের সংস্কার করিতে হইবে। সুতরাং এখন এ রকমের একটা বিলের খুবই প্রয়োজনীয়তা আছে। সেই প্রয়োজন দেখা দিলে তিন অ্যাক্ট্ ধারার অহিন্দু স্বীকারোক্তিটুকু ঘুচিয়া গেলেই ব্রাহ্মবিবাহ আর অহিন্দু-বিবাহ বলিয়া গণ্য হইবে না। ব্রাহ্ম বিবাহও হিন্দুসমাজের মধ্যে চলিবে।

বিবেকানন্দ-সম্প্রদায় দেশের কর্মশক্তিকে লোকসেবার ভিতর দিয়া উদ্‌বোধিত করিয়াছেন। কিন্তু সে সম্প্রদায় প্রধানত সন্ন্যাসীসম্প্রদায়, কারণ সন্ন্যাস তাঁহাদের আদর্শ। সেই রকমের এক সম্প্রদায় যখন গৃহস্থ হইয়া গার্হস্থ্যকে আদর্শ করিয়া সমাজ-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইবে, তখনই হিন্দুসমাজ হইবে ব্রাহ্মসমাজ, ব্রাহ্মসমাজ হইবে হিন্দুসমাজ। আমি মনে করি সেই সুমহৎ দিন বেশি দূরে নাই। তখনি দেবেন্দ্রনাথের সেই বাণী পুনরায় জাগ্রত হইবে যে, 'হিন্দুসমাজকেই ব্রাহ্মসমাজ করিতে হইবে।' অর্থাৎ হিন্দুসমাজকে তাহার আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

যাহাই হোক, তিন আইনের বিবাহ-বিল পাস হইয়া যাইবার পরে দেশে এক তুমুল আন্দোলন দেখা দিল। এই ১৮৭২ সালেই বোধ হয় সেপ্টেম্বর মাসে রাজনারায়ণবাবু জাতীয় সভায় "হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন—সেই বক্তৃতা লইয়া দেশময় একটা হৈ রৈ পড়িয়া যায়। সেই বক্তৃতাসভায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতি ছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এই বক্তৃতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ব্রাহ্মবিবাহ আইনের আন্দোলন উপস্থিত হওয়াতে, এবং কেশববাবুর দলস্থ ব্রাহ্মগণ তদুপলক্ষে তাঁহারা নিজে হিন্দুধর্ম-বিশ্বাসী নহেন বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে, আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহাদের বিবাদ উপস্থিত হয়। রাজনারায়ণবাবুর বক্তৃতা সেই বিবাদের প্রতিধ্বনি মাত্র। কিন্তু ঐ বক্তৃতা এত চিন্তাপূর্ণ, সুযুক্তিসংগত ও জাতীয়ভাবপূর্ণ হইয়াছিল যে, বক্তৃতা হইবামাত্র চারি দিকে ধন্য ধন্য রব পড়িয়া গেল। আমার স্বর্গীয় মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার 'সোমপ্রকাশে' লিখিলেন যে, হিন্দুধর্ম নির্বাণোন্মুখ হইতেছিল রাজনারায়ণবাবু তাহাকে রক্ষা করিলেন; সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভার সভাপতি কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর তাহার অশেষ প্রশংসা করিয়া রাজনারায়ণবাবুকে হিন্দুকুলশিরোমণি বলিয়া বরণ করিলেন; কেহ কেহ

তাঁহাকে কলির ব্যাস বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন, সুদূর মান্দ্রাজ হইতে ধন্য ধন্য রব আসিতে লাগিল; এবং ইংলণ্ডে টাইমস্ পত্রিকাতে ঐ বক্তৃতার সারাংশ ও তাহার অশেষ প্রশংসা বাহির হইল। রাজনারায়ণবাবু বঙ্গবাসীর চিত্তে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিলেন। কেশববাবুর পক্ষ হইয়া আমরা কয়েকজন তদুত্তরে বক্তৃতা করিলাম, কিন্তু সে কথা যেন কাহারও কর্ণে পৌছিল না; বরং কেশববাবুর দলস্থ ব্রাহ্মগণ অহিন্দু বলিয়া হিন্দুসমাজের অবজ্ঞার তলে পড়িলেন।"

হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা—এই কথাটার মধ্যেই এমন একটা সংকীর্ণ স্বাজাতিকতার ভাব আছে, যে ভাব বিশ্বজাগতিকতার আদর্শের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না। প্রত্যেক ধর্মেরই নিজের নিজের দিকের একটা শ্রেষ্ঠতা আছে, প্রত্যেক ধর্মেরই লক্ষ্য সার্বভৌমিকতার দিকে। ভিন্ন ভিন্ন মার্গে সেই লক্ষ্যের দিকে প্রত্যেক ধর্মই অগ্রসর হইতেছে। রামমোহন রায় এই ভাবেই হিন্দু খৃস্টান ও মুসলমান ধর্মের আলোচনা করিয়াছিলেন, অন্যান্য ধর্ম হইতে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতার কথা তিনি কোথাও বলেন নাই। বোধ হয় নব্য ব্রাহ্মরা কথায় বার্তায় উপদেশে বক্তৃতায় খৃস্টান ধর্মের শ্রেষ্ঠতা ঘোষণা করিতেছিলেন বলিয়াই তাহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা ঘোষণা করা দরকার হইয়াছিল। তাঁহারা স্বাজাতিক না হইয়াই বিশ্বজাগতিক হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন বলিয়াই তাহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ খুব কষিয়া পুরাদস্তুর স্বাজাতিক হইবার দিকে একটা আন্দোলন দেখা দিয়াছিল। এটা একেবারে প্রতিক্রিয়ার আন্দোলন। শুধু আদি ব্রাহ্মসমাজে নয়, সমস্ত দেশের মধ্যে এই প্রতিক্রিয়ার আন্দোলন জাগিয়া উঠিল। সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা হিন্দুধর্ম, হিন্দু আচারের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে মনোমোহন বসু প্রভৃতির দ্বারা বক্তৃতা দেওয়াইতে লাগিলেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিতেছেন, "চিন্তা করিয়া যতদূর অনুভব করিতে পারি এই সময় হইতেই দেশের লোকের মনের উপরে ব্রাহ্মসমাজের শক্তি অল্পে অল্পে হ্রাস পাইতে লাগিল। আমরা অনুভব করিতে লাগিলাম কেশবচন্দ্র সেন আর পূর্বের ন্যায় নব্য বঙ্গের অবিসম্বাদিত নেতা রহিলেন না; এবং যুবকদলের তাঁহার দিকে আর সে প্রবল আকর্ষণ থাকিল না। ওদিকে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেই তাঁহার বিরোধী দল দেখা দিল।...কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় যুবকদলের নেতৃত্ব এক প্রকার পরিত্যাগ করিয়া যোগ, ভক্তি, বৈরাগ্য প্রভৃতির সাধনার্থ কলিকাতার সন্নিকটে এক উদ্যান ক্রয় করিয়া কতিপয় অনুগত শিষ্যসহ

একান্তবাসী হইলেন, স্বপাকে আহার করিতে লাগিলেন; গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করিতে লাগিলেন; এবং বৈরাগ্য প্রচারে রত হইলেন। 'সমদর্শী' দল এই সকলের প্রতিবাদ করিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন যে, যুবকদলের উপর হইতে ব্রাহ্মসমাজের শক্তি চলিয়া গেল।"

দেশের স্রোত অন্য অন্য খাত কাটিয়া বহিয়া চলিল এবং ব্রাহ্মসমাজের নদী ক্রমশ মরা নদী হইয়া দাঁড়াইল। এই বিখ্যাত ১৮৭২ সালেই বঙ্কিমের প্রতিভার নবরবি 'বঙ্গদর্শনে'র ভিতর দিয়া দেশে এক নূতন প্রভাত উপস্থিত করিল। কিন্তু এই নূতন সাহিত্যের উপরে ব্রাহ্মধর্মের ও ব্রাহ্মসমাজের ভাব ও আদর্শের কিছুমাত্র প্রভাব থাকিল না। তার পরে এই নূতন সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতি ও জাতীয় উন্নতির দিকেও দেশের স্রোত ফিরিল। মনোমোহন ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু ইঁহারা "ভারত সভা" স্থাপন করিয়া রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করিয়া দিলেন। ক্রমশ কন্‌গ্রেস কন্‌ফারেন্সের আবির্ভাব হইল। তখন হইতেই ব্রাহ্মসমাজের যুগ গিয়া স্বাদেশিকতার যুগ এবং হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের যুগ দেখা দিল। ক্রমে শশধর তর্কচূড়ামণির হিন্দু-ধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, অল্‌কট ব্লাভাট্‌স্‌কির থিয়সফির আন্দোলন, অদৃশ্য মহাত্মা সূক্ষ্ম শরীর প্রভৃতি গূহ্য সাধনার ব্যাপার হিন্দুধর্মের সার বলিয়া প্রমাণের চেষ্টা, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের এক নূতন অদ্বৈতবাদ ও সন্ন্যাসের আন্দোলন—এই-সমস্ত পরে পরে উপস্থিত হইতে লাগিল। এ-সমস্তের ভিতরকার কথা এই যে, হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসভ্যতা পাশ্চাত্ত্য দেশের ধর্ম ও সভ্যতার চেয়ে কোনো অংশে খর্ব নয়, তাই কি অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর। শশধর তর্কচূড়ামণির হিন্দুদেবদেবী উপাসনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার ভিতরে ঐ কথাটি চাপা আছে।

"হিন্দুধর্ম সত্য,
মূলে আছে তার কেমিষ্ট্রি আর
শুধু পদার্থতত্ত্ব।"

থিয়সফির আন্দোলনের ভিতরে ঐ কথাটিই আসল কথা যে, হিন্দুর আধ্যাত্মিকতা পরলোক দর্শন, আত্মার সাক্ষাৎকার প্রভৃতি ব্যাপার বিজ্ঞানমূলক। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মিশনের মধ্যেও সেই কথা। অদ্বৈতবাদের দ্বারা সমস্ত ধর্মের সমন্বয় হয়, কোনো ধর্মকেই মিথ্যা বলিবার দরকার হয় না। সব পথই পথ। ভারতবর্ষ তাহার এই আধ্যাত্মিক শক্তির উপর দাঁড়াইলে পশ্চিমও একদিন তাহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে।

দেবেন্দ্রনাথ স্বাজাতিকতার আন্দোলনের জন্মদাতা, এ কথা বেশ জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে। ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার সকল বিষয়েই তিনি দেশীয় প্রথার অনুবর্তী। এইজন্যই দেশীয় সংগীত, শিল্প, সাহিত্য, অনুষ্ঠান, ধর্মাচরণ সমস্তকেই তিনি নবজীবন দান করিয়াছেন। কোনো সাহেবের সঙ্গে পারতপক্ষে তিনি দেখাসাক্ষাৎ করিতে চাহিতেন না। রাজনারায়ণবাবু লিখিয়াছেন "Miss Mary Carpenter যখন কলিকাতায় আসেন তখন দেবেন্দ্রবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে অভিলাষের কথা শুনিয়া তিনি তাঁহার জমিদারির নিকটস্থিত কুষ্টিয়া উপনগরে পলাইয়া যান। দেবেন্দ্রবাবু স্বভাবত ইংরাজের সঙ্গে আলাপ করিতে অনিচ্ছুক। যেহেতু ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় বিষয়ে তাঁহাদিগের সহিত তাঁহার মতের মিল হয় না। ইংরাজের মতানুমোদন করিয়া চলিলে ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়; কিন্তু দেবেন্দ্রবাবু ইংরাজদিগের নিকট প্রতিষ্ঠালাভ করিবার জন্য আদবে ব্যগ্র নহেন। কৃষ্ণনগর কালেজের বিখ্যাত প্রিন্সিপ্যাল লব (Lobb) সাহেব কোনো সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন "The proud old man does not condescend to accept the praise of Europeans." দেবেন্দ্রবাবু ইংরাজের তোষামোদ করিয়া চলিলে এতদিন তিনি মহারাজা K. C. S. I., হইতেন। তিনি কোন উপাধি চান না।"

"হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা"র প্রতিক্রিয়ার আন্দোলন দেবেন্দ্রনাথকে যে স্পর্শ করে নাই তাহা বলা যায় না। একটি ব্যাপারে তাহা পরিষ্কার প্রকাশ পাইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথের অনুষ্ঠান-পদ্ধতিতে উপনয়ন বলিয়া যে ক্রিয়া ছিল, তাহা কেবল কোনো উপদেষ্টার কাছে কোনো বালককে আনিয়া তাঁহার উপর তাহার ধর্মশিক্ষার ভার দেওয়া। কিন্তু এই সময়ে ১৮৭৩ সালের গোড়ায় তিনি প্রাচীন উপনয়ন-পদ্ধতিকে সংস্কৃত করিয়া আদি ব্রাহ্মসমাজে উপবীত দিবার নিয়ম প্রবর্তিত করিলেন। তিনি নিজে এক সময়ে উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা আমরা শুনিয়াছি। এখন তিনি নিজে ২৫ মাঘ ১৭৯৪ শকে তাঁহার দুই পুত্র সোমেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথকে উপনয়ন সংস্কার করিয়া উপবীত দিলেন।

কতকটা প্রতিক্রিয়ার মুখে, কতকটা আত্মরক্ষার্থে তিনি এই প্রথাটিকে গ্রহণ করিলেন। আত্মরক্ষা বলিতেছি এইজন্য যে বিবাহ-বিধির আন্দোলনে আদি ব্রাহ্মসমাজের অপৌত্তলিক ব্রাহ্মবিবাহকে ঠিক হিন্দুবিবাহ বলা যায় কি না সে সম্বন্ধে যখন গোলযোগ উঠিল, তখন হিন্দুসমাজের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য

হইবার জন্য যথাসম্ভব হিন্দু সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি সমস্তই গ্রহণ করিতে তিনি বাধ্য হইলেন। উপবীতের সংস্কার বাদ দিয়া বিবাহ-সংস্কারকে বিশুদ্ধ বলিয়া দাঁড় করানো যায় না। এইজন্য বিবাহেও সপ্তপদী গমন আগে তিনি সন্নিবেশ করেন নাই, পরে করিয়াছেন। যাহারা উন্নতিশীল তাহাদের সমাজ ও সামাজিক বিধি স্বতন্ত্র হইয়া গেল, যাহারা রক্ষণশীল তাহারা অনেকেই অপৌত্তলিক অনুষ্ঠান করিতে রাজি না হইয়া হিন্দুসমাজের সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ রাখিয়াই চলিতে লাগিল। শুধু গুটিকতক বন্ধুবান্ধব লইয়া সমাজ-সংস্কারে অগ্রসর হওয়া তখন দেবেন্দ্রনাথের সাধ্যের অতীত। সেইজন্য যতটা পারেন অনুষ্ঠানগুলিকে ধর্মের দিক দিয়া সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ রাখিয়া অন্যান্য আচারের দিক দিয়া হিন্দুসমাজের সঙ্গে সংগত রাখা ভিন্ন অন্য উপায় তিনি দেখিলেন না।

তৃতীয় খণ্ড

(১৮৭৩ - ১৯০৩)

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রব্রজ্যা শেষবয়সের সাধনা শান্তিনিকেতন-আশ্রম প্রতিষ্ঠা হিমালয়ে যাত্রা

রবীন্দ্রনাথের উপনয়নের পর দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া হিমালয়ে চলিয়া গেলেন। এই ১৮৭৩ সাল হইতে দশ-বারো বছর পর্যন্ত তাঁহার পরিব্রাজক জীবনের পালা।

এই শেষজীবনের ইতিহাস একেবারে অন্তরঙ্গ ইতিহাস বলিয়া তাহা উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখানো বড়ো কঠিন। এ একেবারে "অকূল শান্তি, বিপুল বিরতি"র জীবনের ইতিহাস; এ অন্তরঙ্গ জীবনে একের সঙ্গে একের, স্তব্ধের সঙ্গে স্তব্ধের নিত্যনব মিলন-লীলা। এখানে সামাজিক জীবনের কোনো বাষ্প মাত্র নাই।

তবু এই অন্তরঙ্গ সাধনার ইতিহাস প্রত্যেক সাধকের জীবনে বিশিষ্ট হইলেও ইহার যে একটা সাধারণ পরিচয় নাই এমন কথা বলা যায় না। তাহা না থাকিলে এ সাধনা বিশ্বমানবের সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হইতেই পারিত না। কেমন করিয়া, কী প্রণালীতে, কোন্ সোপান বাহিয়া মানুষ বাহিরের হাজার আকর্ষণ-পাশ কাটাইয়া অন্তরের অন্তরতম নিভৃততম লোকে প্রয়াণ করে এবং সেখানে আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মধুররসলীলা সম্ভোগ করিয়া ধন্য হয়— যুগে যুগে সাধকদের দ্বারা সেই প্রণালী সেই পন্থা সেই সোপানরাজি চিহ্নিত হইয়া গিয়াছে। তাহা যদি না হইত তবে তো এ ধরনের সাধনা নিছক পাগলামির আকার ধারণ করিত।

এ সাধনার পথ ধ্যানের পথ। ধ্যান মানে একটি নিবিড় অধ্যাত্ম নিবিষ্টতা, জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে একটি সব চৈতন্য-ডোবানো তন্ময়তা। জ্ঞানে যাহাকে জানি মাত্র, ধ্যানে তাহাকে প্রত্যক্ষ করি। ধ্যানের বিষয় মুখ্যত ব্রহ্ম হইলেও, যে-কোনো বস্তুকেই অবলম্বন করিয়া ধ্যানের ক্রিয়া চলিতে পারে। মন তো হাজার দিকে ছোটে, হাজার জিনিস তাহাকে টানে। সেই-সমস্ত টান সমস্ত ছোটাকে নিরোধ করিয়া একটি মাত্র বিষয়ের উপর যখন মনের দৃষ্টিকে সংহত করা যায়, সমস্ত চৈতন্যের আলো যখন একমুখীন হইয়া সেই বিষয়টারই উপর পড়ে, তখন তাহার সঙ্গে মনের একাত্ম সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া যায়। তখনি কবি ব্লেক যে বলিয়াছেন যে, To see a world in a grain of sand, একটি বালুকণার

মধ্যে এক জগৎকে দেখা যায়— সে কথা সত্য হয়। এই ধ্যানের প্রক্রিয়াই যখন পরমাত্মার উপলব্ধির জন্য কাজ করে, তখন বাহিরের বিষয়ের মধ্যে যেমন তন্ময় হইলে তবে সেই বিষয়ের সঙ্গে একাত্ম হওয়া যায়, তেমনি করিয়াই পরমাত্মার ভিতরে তন্ময় হইতে হয়। প্রথম ক্রিয়ার সঙ্গে দ্বিতীয় ক্রিয়ার তফাত এই যে, প্রথম ক্রিয়া ভিতর হইতে বাহিরে যাওয়া, দ্বিতীয় ক্রিয়া বাহির হইতে ভিতরে আসা। ভিতর হইতে বাহিরে যাওয়া তত শক্ত নয়, বাহির হইতে ভিতরে আসাটা যত শক্ত। যে মনের বৃত্তিগুলার স্বাভাবিক গতি বাহিরের দিকে বিষয়ের দিকে তাহাদের সেই গতিকে উল্টাইয়া অন্তর্মুখীন করার চেষ্টা। এ যেন গঙ্গার স্রোতকে সমুদ্রের দিক হইতে ফিরাইয়া গঙ্গোত্রীর দিকে চালাইবার চেষ্টার মতো। ভিতরের দরজার সামনে একটি তর্জনীর ইঙ্গিত নিশ্চল হইয়া আছে— বাহির হইতে যাহা-কিছু বিঘ্ন আসিতে চায় সে সকলকেই 'না' বলিয়া ফিরাইয়া দেয়।

১৮৭৫ সালে এক উপদেশে তিনি এই ধ্যানযোগ সম্বন্ধে নিজে লিখিতেছেন, "'আত্মনি তিষ্ঠান্নাত্মনোঽন্তরঃ'। তিনি আত্মাতে আছেন, আত্মার অন্তরে আছেন। যেমন দূরে যাইতে হইলে শরীরে কষ্ট লইতে হয়, আত্মার অন্তরে যাইতে হইলে সেইরূপ মনের কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। শারীরিক কঠোর তপস্যা অপেক্ষা মনকে সংযম করা গুরুতর কৃচ্ছ্রসাধন। আর যে-কোন উপায় অবলম্বন কর, মনঃসংযম ভিন্ন আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে দেখা যায় না। শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু সমাহিত হইয়া, শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে দেখিতে হয়।"

হঠাৎ এই ভুল ধারণা মনে উঠিতে পারে যে, তবে বুঝি এ সাধনা "ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসনে" বসিবার সাধনা। "যা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে" তাহাকে অস্বীকার করিবার সাধনা। তা নয়, তা একেবারেই নয়। এ সাধনায় বাহিরকে রোধ করিয়া ভিতরে যাওয়া নয়— বাহিরকে ভিতরের দিকে লইয়া যাওয়া। বিচিত্রকে এক করা। বিচিত্রের বিচিত্র রস, একের অখণ্ড রস। এ সাধনা সেই অখণ্ডরসের উপলব্ধির সাধনা, সমস্ত বিচিত্র রসের স্বাদ সেই অখণ্ড রসের মধ্যে মিলাইয়া যায়। যাহা বিক্ষিপ্ত ছিল তাহাই গ্রথিত হয়। কবি কভেন্ট্রি প্যাটমোর এই ধ্যানযোগের কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন— এ যেন প্রণয়ী-প্রণয়িনীর বাতি নিভাইয়া দিয়া বাহিরের দিক্‌কার পর্দা টানিয়া দেওয়ার মতো— এখানকার অন্ধকারটাই যে নিবিড় পরিচয়ের আলো!

উপনিষদের একটি বাক্যে এই ধ্যানের সোপানগুলি নির্দিষ্ট হইয়াছে। সে বাক্যটি পূর্বপৃষ্ঠায় উদ্‌ধৃত দেবেন্দ্রনাথের উপদেশে তিনি ব্যবহার করিয়াছেন। বাক্যটি এই—শান্তো দান্তো উপরতস্তিতিক্ষুসমাহিতোভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি। পাশ্চাত্ত্য মরমী (mystic) সাধনায় তিনটি মাত্র সোপানের কথা শোনা যায়—recollection, quiet, contemplation। অর্থাৎ প্রথম, মনঃসংযোগের দ্বারা বিষয় হইতে নিবৃত্তি; দ্বিতীয়, আত্মবিলোপের দ্বারা নির্বিকার অবস্থা প্রাপ্তি; তৃতীয়, ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেমের মিলন, হর্ষোচ্ছ্বাস ও রসস্ফূর্তি। উপনিষদের বাক্যে শান্ত দান্ত ও উপরত হওয়ার অবস্থা পাশ্চাত্ত্য মরমী সাধনার ঐ প্রথম অবস্থার সঙ্গে মেলে। তিতিক্ষু ও সমাহিত হওয়ার অবস্থা দ্বিতীয় অবস্থার সঙ্গে মেলে। তৃতীয় অবস্থার কথা উপনিষদে নাই, তাহা আমাদের দেশে ভক্তিমার্গের শাস্ত্রাদিতেই পাওয়া যায়। দেবেন্দ্রনাথ এই উপলব্ধির সন্ধান পাইয়াছিলেন—হাফেজে। সমাহিত হওয়ার পরেও যে একটা রসস্ফূর্তি হয়, প্রেমের একটি অন্তরঙ্গ লীলা চলিতে থাকে, সে কথা বেদান্তে নাই। এইজন্য শেষ বয়সে দেবেন্দ্রনাথের সাধনায় হাফেজ যত সহায় ছিল, এমন উপনিষদ্ নয়।

প্রথম দুই অবস্থার অভিজ্ঞতা তাঁহার প্রথম বয়সেই ঘটিয়াছিল, তাহা আমরা তাঁহার এই জীবনচরিতের প্রথম খণ্ডেই দেখিয়া আসিয়াছি। শান্ত দান্ত ও উপরত হওয়া এবং তিতিক্ষু ও সমাহিত হওয়ার জন্য যে ধ্যানের দরকার, বাহির হইতে ভিতরের দিকে যাইবার জন্য একটা প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের দরকার, সেটা তাঁহার পক্ষে সহজ হইয়া আসিয়াছিল। হিমালয় হইতে নামিবার সময় সেই ধ্যানশক্তিকে তিনি যথেষ্ট পরিমাণে অর্জন করিয়া আসিয়াছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, "আচার্য কেশবচন্দ্রের মুখে শুনিয়াছি তিনি একবার মহর্ষির সহিত নৌকাযোগে পদ্মা নদীতে যাইতেছিলেন। একদিন দেখিলেন, মহর্ষি প্রাতে প্রাতরাশের পর নৌকা হইতে বাহির হইয়া নৌকার ছাদে পৃষ্ঠ দিয়া দাঁড়াইয়া নদী দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে মগ্ন হইলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতীত হইতে লাগিল, দিবা দ্বিপ্রহরে এক ভৃত্যের পর অপর ভৃত্য আসিয়া মস্তকে ছাতা ধরিতে লাগিল, মহর্ষির সে জ্ঞান নাই; আহারাদি পড়িয়া রহিল; ভিতরে আসিলেন না; চক্ষু মেলিলেন না। অবশেষে অপরাহ্ণে চক্ষু খুলিলেন, তখন মনে হইল যে, নৌকার বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন।"...

"একবার স্থির হইল যে, কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে সায়ংকালের উপাসনা মহর্ষি করিবেন। আমরা অনেকে তৎপূর্বদিন কোন্নগরে গেলাম। সন্ধ্যাকালে মহর্ষি নৌকাযোগে স্বর্গীয় রাজনারায়ণবাবু মহাশয় ও নিজের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইলেন। উপাসনান্তে সকলের সহিত সমাসীন হইয়া প্রীতিভোজনে যোগ দিলেন। ভোজনান্তে নৌকাতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার সময় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার সঙ্গে না ফিরিয়া, আমার শয্যাতে আসিয়া শুইয়া পড়িলেন ; আমাকে বলিলেন, 'মহর্ষি যদি আমাকে ডাকেন আপনি গিয়া বলিবেন যে, আমি আর ফিরিয়া যাইব না, রাত্রে আপনাদের কাছেই থাকিব।' আমি বলিলাম 'সে কি ভাল দেখায়, তিনি আপনাকে ডাকিলেন, আর আপনি সঙ্গে যাবেন না।' বসু মহাশয় বলিলেন, 'কেন যাচ্চি না পরে আপনাকে বল্‌বো, আপনি বলুন না।' পরে তাহাই হইল, মহর্ষি যখন বসু মহাশয়কে ডাকিলেন তখন আমি গিয়া তাঁহাকে ছুটি করিয়া আনিলাম। শেষে শুনি মহর্ষি রবিবার সন্ধ্যার সময় কোন্নগরে উপাসনা করিবার উদ্দেশে শনিবার প্রাতে আহারান্তে নৌকাতে উঠিয়াছিলেন ; দুই ঘণ্টার পথ দুই দিনে আসিবেন! সকলে অনুমান করিতে পারেন সে কি ব্যাপার! কিয়দ্দুর আসিয়াই হুকুম হইল, নৌকা নঙ্গর করো তার পর মহর্ষি ধ্যানস্থ। সঙ্গীদ্বয় না কথা কহিতে পারেন, না নড়িতে চড়িতে পারেন। কয়েক ঘণ্টা পরে হুকুম হইল নঙ্গর তোলো ; আবার কথাবার্তা চলিল ; আবার কিয়দ্দুর আসিয়া হুকুম হইল নঙ্গর করো ; আবার ধ্যানস্থ হইলেন। শনিবার সমস্ত রাত্রি নদীপার্শ্বে নঙ্গর করিয়া কাটিয়া গেল। রবিবারও ঐ প্রকার গতিতে আসা হইল। ইহার পরে বসু মহাশয়ের মহর্ষির সহিত ঐ গতিতে কলিকাতায় ফিরিবার উৎসাহ মন্দীভূত হইয়া গেল। নৌকাযাত্রার এই বিবরণ শুনিয়া আমরা সকলে খুব হাসিলাম ; কিন্তু মহর্ষির ধ্যানপরায়ণতার বিষয় স্মরণ করিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলাম।"

তাঁহার ধ্যানপরায়ণতার বিষয়ে এ রকমের গল্প বিস্তর শুনিতে পাওয়া যায়। এ একেবারে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। এইজন্যই তিনি বেশিদিন বা বেশিক্ষণ মানুষের ভিড়ের মধ্যে থাকিতে পারিতেন না। নির্জন বাস তাঁহার পক্ষে একান্ত দরকার হইত। এইজন্যই কখনো তিনি নৌকায় করিয়া নদীতে নদীতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, কখনো বোলপুরের জনহীন প্রান্তরে তাঁবু ফেলিয়া মাসের পর মাস কাটাইয়া দিতেছেন, কখনো হিমালের দুর্গম শিখরে একাকী

বছরের পর বছর যাপন করিতেছেন। ভৃত্যেরা কেবল-মধ্যে মধ্যে আহারের জিনিস সামনে রাখিয়া যাইতেছে, আর সঙ্গ দিবার মতো জনপ্রাণী নাই।

কিন্তু ঐ যে তৃতীয় অবস্থার কথা বলা গেল— ঈশ্বরের সঙ্গে মধুর রসলীলার যোগ এবং সেই যোগের জন্য উদ্‌বেলিত হর্ষোচ্ছ্বাস ও রসস্ফূর্তি— সচরাচর ভক্তের জীবনেই তাহার পরিচয় আমরা পাই। বেদান্তের সাধনায় এ উপলব্ধি নাই, বৈষ্ণব সাধনায় বরং এই উপলব্ধির কথা পাওয়া যায়। অথচ দেবেন্দ্রনাথ তো গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনাকে গ্রহণ করিতে পারেন না। সেখানে ঈশ্বর যে সাকার বিগ্রহ। অনন্ত সান্ত। সেখানকার রস-সাধনায় স্ত্রী-পুরুষের যৌন সম্বন্ধের রূপকের ছড়াছড়ি। সেইজন্য তাঁহার ভক্তিসাধনায় বৈষ্ণব রসতত্ত্ব কোনো কাজে লাগিল না, সুফী রসতত্ত্ব তাঁহাকে আশ্রয় করিতে হইল। হাফেজ হইলেন তাঁহার আশ্রয়। সুফী রস-সাধনায় বলে যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক হইয়াও ভিন্ন— অনাদি কালে যখন তাঁহারা দুজনে ভিন্ন হন তখনই তাঁহারা পরস্পরের সঙ্গে এক নিগূঢ় প্রতিজ্ঞাপাশে বাঁধা পড়েন। বাহিরের এই জগৎ পরমাত্মার রূপের প্রতিরূপ, তাঁহার সৌন্দর্যের ছায়া। এই ছায়াতে এই মায়াতে না ভুলিয়া তাঁহাতেই সমস্ত প্রেম সমর্পণ করিলে তবেই জীবাত্মার সেই অনাদি প্রতিজ্ঞা পালন হয়। এই পৃথিবীর যত সংগীত যত সৌরভ সমস্তই সেই আদিম প্রতিজ্ঞার স্মৃতিটিকে জীবাত্মার মধ্যে জাগায় ও সেই পরম সুন্দরের দিকে তাহাকে আকৃষ্ট করে। সেই যে সৌন্দর্যের পরম আকর্ষণ, সেই যে রসোচ্ছ্বাস ও রসস্ফূর্তি, সেই যে প্রেমের অপূর্ব বিরহমিলনলীলা— এই তো কবি হাফেজের কাব্যের বিষয়। তাঁহার কবিতায় সেই প্রেমের নাম সুরা, প্রেমিকমণ্ডলী সেই সুরাপানে বিভোর, প্রেমিকসাধনের দীক্ষাগুরু যিনি তিনি সাকী।

হাফেজের কাব্যের একটা প্রধান বিশেষত্ব এই যে, পরমাত্মার জন্য জীবাত্মার কাতরতা— সেখানে স্ত্রী-পুরুষের প্রেমের সঙ্গে তুলনীয় হয় নাই। বরং দুই সখার প্রেমের সঙ্গে তুলনীয় হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনায় পঞ্চ রসের কথা আছে বটে, কিন্তু বাৎসল্য ও মধুর রসের প্রাধান্যই তো দেখিতে পাই। বাঙালী জাতির কোমল স্ত্রী-স্বভাববিশিষ্ট মন হইতে তাহার উৎপত্তি বলিয়া একদিকে নায়িকা অন্য দিকে মাতা এই দুই দিকের সাধনাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনায় পূর্ণ-মাত্রায় দেখা দিয়াছে। কিন্তু সখ্যরস হাফেজের কাব্যে যেমন ফুটিয়াছে এমন বাংলা বৈষ্ণব কাব্যে নয়। সুফীধর্ম সাধনাতেও কোনো পরমসুন্দর ব্যক্তির সঙ্গে গভীর আদর্শ (Platonic) প্রেমের যোগস্থাপন ধর্মসাধনারই অঙ্গ বলিয়া ধরা

হইয়া থাকে। দেবেন্দ্রনাথের জীবনে এই সখ্যরসই তো অন্যান্য রসের চেয়ে প্রবলতর—তাঁহার বন্ধুপ্রীতি আর-সকল প্রীতিকে ছাপাইয়া উঠিয়াছিল। মধুর রস, এমন-কি, বাৎসল্য রসও তাঁহার জীবনে বড়ো জায়গা পায় নাই। তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত প্রেম সখাদের সঙ্গে সখ্য সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই চরিতার্থ হইতে চাহিয়াছে। কেশবের সঙ্গে তাঁহার সেই গভীর আদর্শ প্রেমের যোগ ছিল। তাই তিনি আবেগের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধে এক চিঠিতে লিখিয়াছিলেন—"যদি আমার এই মনে, কাহারও প্রতিমা থাকে, তবে সে তাঁহারই প্রতিমা।" সেইজন্যই কেশবকে সামনে না দেখিতে পাইলে তাঁহার উপাসনা খুলিত না। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন যে, বৃদ্ধ বয়সে দেবেন্দ্রনাথ একবার সিন্দুরিয়াপটীর সাম্বৎসরিক উৎসবে উপাসনার কাজ করিয়া যখন তাঁহার কাঁধে হাত দিয়া গাড়িতে উঠিতে যাইতেছেন, তখন দেখা গেল ব্রাহ্মরা যে মধ্যে পথ দিয়া দুই ধারে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহার মধ্যে কেশবচন্দ্রও আছেন। শাস্ত্রী মহাশয় সে দিকে দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবামাত্র তিনি কেশবের কাছে গিয়া তাঁহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"কেশব, তুমি উপাসনাস্থলে উপস্থিত ছিলে? আমার সম্মুখে ব'স নাই কেন? তাহ'লে যে আমার উপাসনা আরও খুল্‌ত।" এক স্থফী কবিদের রচনায় এই অপূর্ব সখ্যের আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়—হাফেজ নিজে এই রকমের প্রেমিক। সখার প্রসন্নতা লাভ করিয়া যে সময়ে তিনি সুখী, তখন তাঁহার কাছে সমরকন্দ ও বোখারার সমস্ত সম্পৎ সখার একটি কৃষ্ণতিলের সমান মূল্যবান নয়; এমন দিনে পৃথিবীর সম্রাটকেও তিনি নিজের ক্রীতদাস বলিয়া মনে করিতে পারেন। এই আদর্শে সখ্যের রস হাফেজের কাব্যে ভরপুর বলিয়া, হাফেজ দেবেন্দ্রনাথকে এমন করিয়া মজাইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথের সখ্যলীলা সকল বয়সেই নানা বন্ধুকে আশ্রয় করিয়া পরিপূর্ণ হইয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। এ বয়সেও তিনি ঠিক তাঁর এখনকার অবস্থারই উপযুক্ত এক বন্ধু লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম শ্রীকণ্ঠ সিংহ। রায়পুরে তাঁহার বাড়ি। তাঁহার একটি চমৎকার প্রতিকৃতি রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'তে আছে। সেইখান হইতে তাঁহার সেই ছবিটা এখানে আবার তুলিয়া ধরিতে চাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সম্বন্ধে লিখিতেছেন—"বৃদ্ধ একেবারে সুপক্ক বোম্বাই আমটির মতো অম্লরসের আভাসমাত্রবর্জিত—তাঁহার স্বভাবের কোথাও এতটুকুও আঁশও ছিল না। মাথা-ভরা টাক, গোঁফদাড়ি-কামানো স্নিগ্ধমধুর মুখ, মুখবিবরের মধ্যে দন্তের কোনো বালাই ছিল না, বড়ো বড়ো দুই চক্ষু অবিরাম

হাস্যে সমুজ্জ্বল। তাঁহার স্বাভাবিক ভারী গলায় যখন কথা কহিতেন তখন তাঁহার সমস্ত হাত মুখ চোখ কথা কহিতে থাকিত। ইনি সেকালের ফারসি-পড়া রসিক মানুষ, ইংরেজির কোনো ধার ধারিতেন না। তাঁহার বামপার্শ্বের নিত্যসঙ্গিনী ছিল একটি গুড়গুড়ি, কোলে কোলে সর্বদাই ফিরিত একটি সেতার, এবং কণ্ঠে গানের আর বিশ্রাম ছিল না।...

"তিনি এক-একদিন আমাকে সঙ্গে করিয়া একজন য়ুরোপীয় মিশনরির বাড়িতে যাইতেন। সেখানে গিয়া তিনি গান গাহিয়া, সেতার বাজাইয়া, মিশনরির মেয়েদের আদর করিয়া, তাহাদের বুটপরা ছোটো দুইটি পায়ের অজস্র স্তুতিবাদ করিয়া সভা এমন জমাইয়া তুলিতেন যে, তাহা আর কাহারো দ্বারা কখনোই সাধ্য হইত না। আর-কেহ এমনতরো ব্যাপার করিলে নিশ্চয়ই তাহা উপদ্রব বলিয়া গণ্য হইত—কিন্তু শ্রীকণ্ঠবাবুর পক্ষে ইহা আতিশয্যই নহে—এইজন্য সকলেই তাঁহাকে লইয়া হাসিত, খুশি হইত।

"আবার তাঁহাকে কোনো অত্যাচারী দুর্বৃত্ত আঘাত করিতে পারিত না। অপমানের চেষ্টা তাঁহার উপরে অপমানরূপে আসিয়া পড়িত না। আমাদের বাড়িতে একসময়ে একজন বিখ্যাত গায়ক[১] কিছুদিন ছিলেন। তিনি মত্ত অবস্থায় শ্রীকণ্ঠবাবুকে যাহা মুখে আসিত তাহাই বলিতেন। শ্রীকণ্ঠবাবু প্রসন্নমুখে সমস্তই মানিয়া লইতেন, লেশমাত্র প্রতিবাদ করিতেন না। অবশেষে তাঁহার প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য সেই গায়কটিকে আমাদের বাড়ি হইতে বিদায় করাই স্থির হইল। ইহাতে শ্রীকণ্ঠবাবু ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলেন। বার বার করিয়া বলিলেন, "ও তো কিছুই করে নাই, মদে করিয়াছে।'

"কেহ দুঃখ পায়, ইহা তিনি সহিতে পারিতেন না—ইহার কাহিনীও তাঁহার পক্ষে অসহ্য ছিল। এইজন্য বালকদের কেহ যখন কৌতুক করিয়া তাঁহাকে পীড়ন করিতে চাহিত তখন বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস' বা 'শকুন্তলা' হইতে কোনো-একটা করুণ অংশ তাঁহাকে পড়িয়া শোনাইত, তিনি দুই হাত মেলিয়া নিষেধ করিয়া, অনুনয় করিয়া, কোনোমতে থামাইয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন।...

"ইনি আমার পিতার ভক্তবন্ধু ছিলেন। ইঁহারই দেওয়া হিন্দি গান হইতে ভাঙা একটি ব্রহ্মসংগীত আছে— 'অন্তরতম তিনি যে—ভুলো না রে তাঁয়।' এই

১. বিষ্ণু চক্রবর্তী

গানটি তিনি পিতৃদেবকে শোনাইতে শোনাইতে আবেগে চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেন। সেতারে ঘন ঘন ঝংকার দিয়া একবার বলিতেন,—"অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে"—আবার পালটাইয়া লইয়া তাঁহার মুখের সম্মুখে হাত নাড়িয়া বলিতেন, 'অন্তরতর অন্তরতম তুমি যে!' "

আমি ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে, শেষবয়সে পরিব্রাজক জীবনে দেবেন্দ্রনাথ অনেক সময়েই শান্তিনিকেতনে নির্জনে কাটাইতেন। শান্তিনিকেতন আবিষ্কারের ইতিহাসটি এই: রায়পুরের সিংহ-পরিবারের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ বন্ধুতা ছিল। একদিন সেখানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইবার সময় বোলপুর স্টেশন হইতে রায়পুরের পথে শান্তিনিকেতনের দিগন্তপ্রসারিত প্রান্তরে যুগল সপ্তপর্ণচ্ছায়ায় তিনি ক্ষণকালের মতো দাঁড়াইলেন। সমস্ত প্রান্তরের মধ্যে তখন ঐ দুটি মাত্র গাছ ছিল; চারি দিকে অবারিত তরঙ্গায়িত ধূসর মাঠ, তাহার কোনো জায়গায় সবুজ রঙের আভাস মাত্র নাই। শুধু দূর দিক্‌চক্রবালে একশ্রেণী ঋজু তালগাছ ধ্যানমগ্ন মহাদেবের তপোবনপ্রান্তে স্তব্ধ পাহারার মতো দাঁড়াইয়া আছে। যতদূর দৃষ্টি যায় কোনো বাধা নাই। কিছুই দেখিবার নাই। উপরে অনন্ত আকাশ, নীচে এই স্থলসমুদ্র। এই জায়গাটি হঠাৎ তাঁহার মনকে টানিল। এই ছাতিমের ছায়াটিকে তাঁহাব নির্জন সাধনার উপযুক্ত বলিয়া তাঁহার মনে হইল। তার পর হইতে ঐ ছাতিম গাছের তলায় মাঝে মাঝে তাঁহার তাঁবু পড়িতে লাগিল। শান্তিনিকেতনের সামনে ভুবনডাঙা গ্রাম, সে গ্রামে থাকিত এক ডাকাতের দল। বোলপুর হইতে নানা গ্রামে গ্রামে পথ গিয়াছে, পথের মধ্যে এই বিশাল প্রান্তর, চারি দিক জনশূন্য। ডাকাতির পক্ষে এমন উপযুক্ত জায়গা আর হইতে পারে না। কত লোককে যে তাহারা খুন করিয়া ঐ ছাতিম গাছের তলায় তাহাদিগের মৃতদেহ পুঁতিয়া রাখিয়াছিল, তাহার ঠিকানা নাই। দেবেন্দ্রনাথের কাছে সেই ডাকাতের দলের সর্দার ধরা দিল; ডাকাতি ব্যবসায় ছাড়িয়া তাঁহার সেবায় আপনাকে নিযুক্ত করিল। যে জায়গা ছিল বিষম ভয়ের জায়গা, তাহাই হইল পরম আশ্রয়ের জায়গা—আশ্রম।

এই শান্তিনিকেতনেই তাঁহার সঙ্গে আসিয়া মিলিলেন, শ্রীকণ্ঠ সিংহ। তাঁহাকে দেবেন্দ্রনাথ বলিতেন, শান্তিনিকেতনের বুল্‌বুল্‌। দেবেন্দ্রনাথ শান্তি-নিকেতনে গেলে তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইতেন ও তাঁহার সেতারের মধুর ঝংকারে ও গানে শান্তিনিকেতনের নির্জন ধ্যানসমুদ্রে রসের তরঙ্গ তুলিয়া দিতেন। একবার শান্তিনিকেতনে গিয়া শ্রীকণ্ঠবাবুকে সেখানে না পাইয়া ব্যাকুল

হইয়া দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে লিখিলেন, "আপনার বিরহে এ শান্তিনিকেতন নিস্তব্ধ রহিয়াছে। আর এখানে তেমন গোলাব ফুল ফুটে না। যদিও দুই একটা গোলাব ফুল ফুটে, তাহার আর মর্যাদা নাই। আমার আত্মা উদাস—তাহার প্রতি আর কে দেখে? এই সময়ে একবার আসিয়া আমাকে দেখা দিন—এই আমার প্রার্থনা।"

শ্রীকণ্ঠবাবুর কাছে তাঁর সব চিঠিগুলিই এমনি অনুরাগ-রঞ্জিত। ধর্মশালা পর্বতে গিয়া ১৮৭০ খৃস্টাব্দে সেখান হইতে তিনি তাঁহাকে লিখিতেছেন—

"সমালিঙ্গন পূর্বক নিবেদনমিদং—

"গত বৎসরের এই আশ্বিন মাসের এই প্রথম দিবসে আপনাদের পুষ্পকাননে অশোক বৃক্ষের ছায়াতে বসিয়া মনোহর প্রাতঃকালে আপনার উদার হস্ত হইতে যে কৃপা ও প্রেম আস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম আজি কয়েক দিবসাবধি হইল তাহা মনে আন্দোলিত হইয়া এই পর্বতের অরণ্য মধ্যে অন্তশ্চক্ষুতে আপনাকে দেখিয়া আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছিলাম, এমন সময়ে আপনার চির-পরিচিত বর্ণাবলীবিন্যস্ত পত্র আমার হস্তগত হইল। তাহা এমন সময়ে আমার হস্তগত হইবামাত্র আমি একেবারে আশ্চর্য ও চমকিত হইলাম এবং যারপরনাই আনন্দ অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইলাম। আত্মার সহিত আত্মার কি প্রেমযোগ—সে শরীর-ব্যবধান মানে না। আমি আপনাকে স্মরণ করিবামাত্র আপনার পত্র যেন আমার হস্তে উড়িয়া আসিয়া পড়িল। এই পত্রে, আপনি সপরিবারে কুশলে আছেন, এই সংবাদ লাভ করিয়া আমার মনের হর্ষ আরো দ্বিগুণিত হইল। এমনি শুভ সংবাদ যেন সর্বদা পাই।

"মধ্যে আপনি কৃপা করিয়া আমাদের বাটীতে যাইয়া দ্বিজেন্দ্র ও হেমেন্দ্রকে যে উৎসাহ ও আনন্দ প্রদান করিয়া আসিয়াছিলেন, ইহা শ্রবণে আমি পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। এই পর্বতের চূড়ার উপরে এই প্রাতঃকালে সূর্যের কিরণ অতি মধুর বোধ হইতেছে। মনে হইতেছে যে এই সময়ে আপনার মুখ হইতে এই গানটি শুনিতে পাইলে স্বর্গীয় আনন্দ অনুভব করিতাম। 'নয়ন খুলিয়া দেখ নয়নাভিরামে! হৃদয়-কমল বিকাশে যাঁর নামে। গগনে ভানু সহস্রকর বিস্তারি জগৎ-মন্দিরে বিরাজেন স্বপ্রকাশ—দেখ দেখ প্রেমাকরে দিবাকর জিনিয়া সুন্দর উজ্জ্বল অনুপমে॥ কোথায় গত বৎসরের এই আশ্বিন মাসের এই প্রথম দিবসে আপনার সহিত আপনাদের পুষ্পকাননে—আর কোথায় অদ্য এই প্রাতঃকালে এই বনে বসিয়া আপনাকে ভাবিতে ভাবিতে এই পত্র লিখিতেছি।

আবার আগামী বৎসরে এই সময়ে, যে কোথায় থাকি, তাহার কিছুই বলা যায় না। আপনি মধুর স্বরে আমাকে ডাকিতেছেন, 'তু আওরে।' কিছুই বলা যায় না—হয়ত 'আগল ফাগন মে তুমসে মেলৌঙ্গি!' আওর 'মনকি কমলদল খোলিয়া' শুনৌঙ্গি। সম্প্রতি এখান হইতে আমি সমুদয় হৃদয়ের সহিত আশীর্বাদ করিতেছি যে, মনের মত আপনার সাধুসঙ্গ লাভ হউক এবং আপনি পুণ্যপুঞ্জেতে পবিত্র হইয়া ভগবৎ প্রেমধন অধিকাধিক সর্বদা সঞ্চিত করিতে থাকুন। আপনার স্নেহময়ী দুহিতা ও প্রাণতুল্য জামাতা সপরিবারে চিরঞ্জীবী হইয়া সর্বদা সর্বত্র কুশলে থাকুন এবং আপনার হৃদয়কে আনন্দিত করুন। আর আর সমস্ত মঙ্গল। ইতি।

নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ ও
সতত কৃপাপ্রার্থিনঃ
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্মণঃ।"

শ্রীকণ্ঠ সিংহ মহাশয়ের সঙ্গলাভ করিলেই দেবেন্দ্রনাথের ভক্তিরসস্ফূর্তি হইত—তখন ধ্যানযোগের শান্তিময় অনুত্তরঙ্গ অবস্থা দূর হইয়া পুলক, নৃত্য প্রভৃতি রসভাবের উদ্‌বেল অবস্থা দেখা দিত।

এখানে বলা দরকার যে, 'শান্তি' কথাটার মধ্যে একটুখানি গলদ আছে, 'রসস্ফূর্তি' কথাটার মধ্যেও একটুখানি গলদ আছে। যে চাকাটা অত্যন্ত বেশি ঘুরিতেছে বলিয়া স্তব্ধ হইয়া আছে দেখায়, আর যে চাকাটা একেবারেই স্তব্ধ হইয়া আছে—এদুয়ের মধ্যে যে তফাত যথার্থ অধ্যাত্ম শান্তি ও বিরতির সঙ্গে আর কেবলমাত্র সংসারের কর্ম-কোলাহল হইতে বিরতির সেই তফাত। অথচ যথার্থ অধ্যাত্ম শান্তি এবং সংসারবিরতির চেহারা অনেকটা এই রকমের বলিয়া দুয়ের মধ্যে বিশেষ করা বিশেষ শক্ত। এ যেমন, তেমনি একবার সমস্ত বহির্বিষয় হইতে উপরত হইয়া তিতিক্ষু হইয়া ঈশ্বরের মধ্যে সমাহিত না হইলে, অর্থাৎ শান্ত না হইলে যথার্থ ভক্তিরসস্ফূর্তিও সম্ভব হইতে পারে না। সে রসস্ফূর্তিও তখন বাহিরের জিনিস হয়; সে 'দশা'প্রাপ্তির ভক্তি; সে আধ্যাত্মিক সম্মোহন মাত্র। সুতরাং যোগের দিক হইতে শান্তি যেমন জড়তা হইতে পারে; ভক্তির দিক হইতে ভক্তি তেমনি সম্মোহন মাত্র হইতে পারে। দুই দিকেই সমান বিপদ। এবং দুই দিকের বিপদ কাটানোর উপায় যথার্থ অধ্যাত্ম শান্তির ভিতর দিয়া গিয়া যথার্থ রসস্ফূর্তিতে পৌছানো। দেবেন্দ্রনাথের জীবনে তাহারই পরিচয় আমরা পাই।

আমি এ পরিচ্ছেদের গোড়াতেই বলিয়াছি যে, দেবেন্দ্রনাথের ধ্যানযোগের সাধনা মানে বাহিরকে রোধ করিয়া ভিতরে যাওয়া নয়, বাহিরকে ভিতরের দিকে লইয়া যাওয়া। সে সাধনা বাস্তবিক অখণ্ড রসের উপলব্ধির সাধনা। সুতরাং সেভাবে দেখিতে গেলে এ সাধনায় প্রথম ধাপে শান্তি ও বিরতি, দ্বিতীয় ধাপে রসোচ্ছ্বাস ও রসস্ফূর্তি। কবি প্যাট্‌মোরের ভাষায় বলিতে গেলে প্রথম ধাপে বাহিরের দিককার পর্দা টানিয়া দেওয়া ও বাতি নিভাইয়া দেওয়া, দ্বিতীয় ধাপে জীবাত্মা ও পরমাত্মার বর ও বধূর মতো নিবিড় মিলনের আনন্দ। এই প্রথম ধাপেই তিনি বহুকাল পর্যন্ত ছিলেন। শেষ জীবনে এই দ্বিতীয় ধাপে এই অন্তরঙ্গ লীলারসের সাধনায় তিনি উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এই দ্বিতীয় সাধনার অবস্থাতেই শ্রীকণ্ঠ সিংহের সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ের যোগ ও সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় হইয়াছিল।

কিন্তু আমি যে সকল কথা নিজে কল্পনা করিয়া লইতেছি না তাহার কী প্রমাণ আছে? প্রমাণ আছে বৈকি! আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে যাঁহারা দেবেন্দ্র-নাথের এই অন্তরঙ্গ জীবনের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তাঁহাদের প্রায় কেহই তাঁহার সম্বন্ধে কোনো কথাই রাখিয়া যান নাই। তাঁহার শিষ্যদল ছিল না, এটা যেমন একদিকে ভালোই হইয়াছিল, কারণ শিষ্যদের দ্বারা গুরু যতটা বিকৃত হন এমন আর-কাহারো দ্বারা নয়। আবার অন্য দিকে ইহার মন্দ ফল এই যে, তাঁহার রসভাব, তাঁহার অন্তরঙ্গ জীবনের নানা অভিজ্ঞতা, এ-সমস্ত ধরিয়া রাখিবার মতো কোনো আধারই ছিল না। স্বর্গ হইতে অজস্র অমৃত বর্ষিত হইল, কিন্তু কূপও নাই, বাপীও নাই, সরোবরও নাই—যাহারা সেই অমৃতকে ধারণ করিয়া মানুষের অধ্যাত্ম পিপাসাকে শান্ত করিবে। তিনি নিজে যেটুকু রাখিয়া গিয়াছেন, তাহারি উপরে আমাদের একান্ত নির্ভর। অথচ সে প্রথম বয়সের কথা, শেষ বয়সের নয়।

তবু এদিক সেদিক হইতে কুড়াইয়া বাড়াইয়া কিছুই যে পাওয়া যায় না, এমনও নয়। পরলোকগত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় দেবেন্দ্রনাথের একজন অনুরাগী শিষ্য ছিলেন—তাঁহার একটি অপ্রকাশিত ডায়ারি হইতে আমি দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু কিছু পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছি। যে সময়ের কথা লিখিতেছি সেই সময়ে অর্থাৎ ১৮৭২ সালে ২৭এ ফেব্রুয়ারি তারিখে তিনি একদিন দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথাবার্তার বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। তাহা হইতেই আমি তাঁহার শেষবয়সের সাধনা সম্বন্ধে যে-সকল কথা লিখিয়াছি, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। দেবেন্দ্রনাথ উমেশবাবুকে ধর্মরাজ্যের দুই ভাগের কথা বলিয়াছিলেন—

একটির নাম তিনি দিয়াছিলেন আমদরবার, অন্যটির নাম খাসদরবার। ডায়ারি হইতে তাঁহার মুখের কথার বিশুদ্ধ প্রতিবেদনটি তুলিয়া দিতেছি—

"সাধারণতঃ আমদরবারে নানা সম্প্রদায়, নানা উপাসনাপ্রণালী ও নানাপ্রকার ক্রিয়ানুষ্ঠানেই ধর্ম। তাহা ধর্মের জন্য চেষ্টা মাত্র। তাহা হইতে ঈশ্বরের কৃপায় খাসদরবারে যাওয়া যায়।... সেই আরামঘর বা শান্তিনিকেতনে আত্মার সঙ্গে তাঁহার যোগ; সেইখানে তাঁহাতে শুদ্ধ হইয়া তাঁহার সৌন্দর্য দেখা, শান্তি ভোগ করা—তাহা লোকের নিকট কিছুতেই বর্ণনা করা যায় না। বলিবার বাক্য নাই এবং তাহা শুনিবারও ক্ষমতা অতি অল্পলোকের। সে নিজে দেখে, সেই বুঝে। নীচের লোকে যখন সূর্যাস্ত দেখে, তখন উচ্চভূমির কোন ব্যক্তি সূর্যকে প্রকাশিত দেখিয়া যদি বর্ণনা করে, অন্যে তাহাকে পাগল বলিবে। একটি প্রাচীরের উপরে উঠিয়া যে ব্যক্তি পরপার দেখে, হাসিয়া পড়িয়া যায়, কেন যায় তাহার বৃত্তান্ত বলিতে আসিতে পারে না। জীবনের পরীক্ষা দ্বারা সত্যগুলি কেবল ইঙ্গিত করা যায়, কিন্তু গভীর ভাবসকল আত্মপরীক্ষা ভিন্ন বুঝা যায় না।...

"ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন কিছুই হয় না। যেমন ব্যাকরণ পড়িতে পড়িতে বুদ্ধি খুলিয়া যায়, সেইরূপ চেষ্টা ও সাধন করিতে করিতে বিশ্বাস-চক্ষু খুলিয়া যায়। প্রেম ও অনুরাগ হইলে আর মার নাই।"

ধর্মরাজ্যের এই "আমদরবার" হইতে "খাসদরবারে" যাইবার ইতিহাসই আমি এতক্ষণ ধরিয়া বলিতেছিলাম। এ পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্য নানা চেষ্টার পর্বে তিনি সম্পূর্ণত না হোক অংশত ঐ আমদরবারে ছিলেন; "শান্তিনিকেতনে" তেমন করিয়া আসেন নাই। যখন ঈশ্বর তাঁহার চেষ্টার সমস্ত জালগুলি নিজের হাতে খুলিয়া দিয়া কর্মশালা হইতে তাঁহাকে আপনার অন্তঃপুরের দিকে টানিয়া লইলেন, তখন হইতেই তিনি "শান্তিনিকেতনে।" তখন হইতে তাঁহার অন্তরঙ্গ জীবনের আরম্ভ এবং তখন হইতেই যেমন চেষ্টা বন্ধ, তেমনি প্রকাশও বন্ধ। তিনি নিজেই বলিতেছেন "বলিবার বাক্য নাই।" "যে নিজে দেখে সেই বুঝে।" এ কথা শুধু তিনি নন—সকল দেশের সকল সাধকই বলিয়াছেন। এমন-কি, উইলিয়ম জেম্‌সের মতো মানুষও তাঁহার *Varieties of Religious Experience* গ্রন্থে contemplative experience—এই ধ্যানযোগের অভিজ্ঞতার কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন যে তাহার একমাত্র লক্ষণ হইতেছে অনির্বচনীয়তা ("Ineffability")। বলা যায় না। কেমন করিয়া বলিবে? দেবেন্দ্রনাথ বলিতেছেন

"প্রাচীরের উপরে উঠিয়া যে ব্যক্তি পরপার দেখে, হাসিয়া পড়িয়া যায়, কেন যায়, তাহার বৃত্তান্ত বলিতে আসিতে পারে না।"

ধ্যানের শেষে এই আনন্দ যে কত বড়ো প্রচণ্ড প্রবল আনন্দ তাহাও যে-মানুষ অনুভব করে, সেই জানে। এই বৈষ্ণবী 'দশা'কে আমরা অনেক সময়ে না বুঝিয়া পরিহাস করি। কিন্তু এ যে বৈষ্ণবেরই বিশেষ জিনিস তাহা নয়। সুফী ভক্তদের মধ্যেও এই রসোচ্ছ্বাস ও নৃত্যাদি আছে। খৃষ্টীয় ভক্তদের মধ্যেও Ecstasy and Rapture উদ্‌বেল আনন্দ এবং দশার ভাবের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এই তো হাফেজের সুরা, যাহা পান করিয়া ভক্ত উন্মত্ত হন। একান্ত তন্ময়তা ভিন্ন, 'আমি'-বোধের একেবারে সম্পূর্ণ বিসর্জন ভিন্ন এবং 'তুমি'-বোধের পরিপূর্ণ উপলব্ধি ভিন্ন এই রসোচ্ছ্বাস কখনোই আসে না। এ রসোচ্ছ্বাসে শরীরকে পর্যন্ত এমন অসাড় করিয়া দেয় যে শারীর ক্রিয়া উন্টপান্টা হইয়া যায়। আমাদের দেশের অনেক সাধু ভক্তের কথা জানা আছে যাঁহাদের নিশ্বাস প্রশ্বাস এবং রক্তচলাচল পর্যন্ত কিছুক্ষণের মতো বন্ধ হইয়া গিয়াছে। খৃস্টান সাধ্বী সেণ্ট ক্যাথেরিনের জীবনে আছে যে, এইরূপ সমাধির অবস্থায় একটা জলন্ত প্রদীপশিখা তাঁহার হাতে একজন লোক পনেরো মিনিট কাল ধরিয়া রাখিয়াছিল; তিনি কিছুমাত্র অনুভব করিতে পারেন নাই। দেবেন্দ্রনাথের ধ্যানের যে বিবরণ একটু আগে দিয়া আসিয়াছি তাহাও এই রকমের। সকাল বেলা নৌকার ছাদে দাঁড়াইয়া চোখ বুজিয়াছেন, বিকাল পাঁচটায় চোখ মেলিলেন— সমস্ত দিন একভাবে নিঃস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন!

এ-সকল জিনিসের বিপদ কোথায় তাহা বলিয়াছি। এ যে কোথায় কেবলমাত্র সম্মোহন, আর কোথায় পরিপূর্ণ অধ্যাত্ম-উপলব্ধির পরিণাম, তাহার ভেদরেখা টানা শক্ত। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে নাকচ করিয়া একপাশে ঠেলিয়া রাখা যায় না। আধুনিক মনস্তত্ত্বে বলে যে, এই সমাধি বা দশা "monoideism"-এর অবস্থারই একটা প্রকার মাত্র। অর্থাৎ যখন চেতনা পরিধি হইতে কেন্দ্রের দিকে সমাহিত হয়, যখন একমাত্র ঈশ্বরই সমস্ত মনের বিষয়, আর-কোনো বিষয় নাই— তখনই এই অবস্থা মানুষের হওয়া সম্ভব। বহুর চৈতন্য এবং একের চৈতন্য সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয়। অথচ আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, একের চৈতন্য বহুকে বাদ দিয়া নয়; বহুর রস যখন এক রস হয় তখনই একের চৈতন্যের পূর্ণতা। সেই একবার কেন্দ্রে যখন সমস্ত চৈতন্য নিবিষ্ট হয়, তখন ধ্যান তখন সমাধি। আবার যখন সেই কেন্দ্র হইতে পরিধির দিকে ছুটিয়া যায়, তখন

রসস্ফূর্তি, তখন উদ্‌বেলিত আনন্দ, কম্প, পুলক, স্বেদ, অশ্রু, নৃত্য প্রভৃতির ভিতর দিয়া তাহার প্রকাশ।

দেবেন্দ্রনাথ আগে কখনোই ভাবাবেগে নৃত্য করা বা এ রকমে ভক্তির কোনো বাহ্য প্রকাশ দেখানো পছন্দই করিতেন না। এগুলিকে তিনি ভাবাতিশয্য বা প্রগল্‌ভতা বলিয়া মনে করিতেন। এইজন্য কীর্তন তিনি ভালোবাসিতেন না, বিশুদ্ধ তালমানলয়সংগত গান নহিলে তাঁহার মনে লাগিত না। অন্যের সঙ্গে বেশি মাখামাখি ভাবের কোনো লক্ষণ তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে দেখা যাইত না। তিনি সর্বদাই স্বতন্ত্র, সুদূর, সংবৃত, সংযত। কথাবার্তা, চলাফেরা, ওঠাবসা, সমস্তই দস্তুরে বাঁধা। এইজন্য তিনি পরিবারের লোকের কাছে এবং বাহিরের লোকের কাছেও সহজে অধিগম্য ছিলেন না। সেই মানুষ এখন মাঝে মাঝে প্রকাশ্যে ভাবাবেগে নৃত্য করিয়া ফেলিতেছেন, এমন কথা যদি শোনা যায়, তবে তাহা আশ্চর্যের বিষয় নয় কি ?

এই সময়েই অর্থাৎ ১৮৭২ সালের একটি ঘটনা সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের একজন ভক্ত শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ মহাশয় লিখিতেছেন, "মহর্ষির শ্রীচরণ দর্শন করিবার জন্য প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সম্ভবতঃ দেরাদুন যাওয়ার ৬।৭ বৎসর পর মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে ঐ আশা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত আমি কলিকাতায় আসি। এই মানসে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, ব্যারিষ্টার মহাত্মা আনন্দমোহন বসু এবং উকিল দুর্গামোহন দাস মহোদয়গণ সমভিব্যাহারে আদি ব্রাহ্মসমাজের উৎসবের উপাসনায় যোগ দিতে যাই। যাইয়া যাহা দেখিলাম ও শুনিলাম এ জীবনে তাহা ভুলিব না। তাঁহার বাড়ীর বৃহৎ প্রাঙ্গণ লোকে পরিপূর্ণ। তিনি ও আর একজন ভদ্রলোক* (পরে জানিলাম কোথাকার ভক্ত জমিদার) মুখোমুখী বসিয়া ভাবে গদগদ হইয়া গান করিতেছেন 'ব্রহ্মকৃপাহি-কেবলম্। পাশনাশ হেতুরেষ নতুবিচার বাগ্বলং। দর্শনস্য দর্শনেন ন মনোহি নির্মলং, বিবিধ শাস্ত্রজল্পনেন ফলতি তাত কিং ফলং।' আমাকে আনন্দমোহন বসু চিনাইয়া দিবার পূর্বে, দেবতার সৌম্যমূর্তি দেখিবামাত্রই বুঝিয়াছিলাম এই দুইজনের মধ্যে কে মহর্ষি। মনে মনে আমি তাঁহার শ্রীচরণে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইয়া এক দৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম এবং একলব্যের মতো আমার ধর্মগুরু বলিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে বরণ করিয়া লইলাম। এক ঘণ্টার

* শ্রীকণ্ঠ সিংহ মহাশয়।

কম হইবে না হাত ধরাধরি করিয়া উন্মত্তপ্রায় হইয়া ঐ এক গান 'ব্রহ্মকৃপাহি-কেবলম্' করিতে করিতে একবার উঠিতেছেন আবার বসিতেছেন। শুনিলাম আমাদের তথায় যাইবার অর্ধ ঘণ্টা পূর্বে ঐ গান আরম্ভ করিয়াছেন। ভাবোন্মত্ত হইয়া যতই গাহিতেছেন দ্রষ্টা ও শ্রোতার পিপাসা ততই বৃদ্ধি হইতেছে। যেদিকে চাই, দেখি সকলেই ভাবাবেশে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিয়াছে।"

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছে শুনিয়াছি যে একবার এক ব্রাহ্ম-সম্মিলনের সভায় তিনি ঈশ্বরের প্রেম বিষয়ে তাঁহার একটি রচনা পাঠ করিতে-ছিলেন। হঠাৎ দেখেন এক জায়গায় তাঁহার রচনা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া দেবেন্দ্রনাথ ও শ্রীকণ্ঠ সিংহ মহাশয় হাত ধরাধরি করিয়া "পুণ্যপুঞ্জেন যদি প্রেমধনং কোঽপি লভেৎ তস্য তুচ্ছং সকলং" এই গান গাহিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। সভা ভুলিয়া, সমস্ত ভুলিয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঐ একই গান গাহিয়া দুজনে নৃত্য করিলেন। সভার শেষে যখন তিনি বিদায় লইবার জন্য দেবেন্দ্রনাথকে প্রণাম করিতে গেলেন তিনি তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন— তুমি আমায় আজ কি কথা শোনালে! এমন কথা যে আমায় শোনায় আমি যে তার গোলাম!

প্রথম বয়সে তাঁহার দ্বারা এমন কাণ্ড ঘটিয়া ওঠা একবারেই অসম্ভব ছিল। অথচ শেষবয়সে ভগবৎপ্রসঙ্গ মাত্রে তিনি আত্মবিস্মৃত ও আত্মবিহ্বল হইয়া পড়িতেন। তাঁহার সমস্ত মাথার চুল খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিত, তাঁহার বলি-কুঞ্চিত ও জরাগ্রস্ত মুখ যৌবনের সমারোহে ভরিয়া অপূর্ব দীপ্তিতে মণ্ডিত হইয়া উঠিত, তিনি যেন আর আপনার আনন্দকে ধারণ করিতে পারেন না, এমনি মনে হইত।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র -চৌধুরী প্রণীত 'মহর্ষির কর্মজীবন' বইটিতে এই রকমের আর-একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। তিনি লিখিতেছেন, "একদা তিনি অমৃত-সহরে অবস্থিতিকালে বসন্তকালে ঐ সহরের একটি ফলফুলে সুশোভিত বাগানে গিয়া তাহার সৌন্দর্যদর্শনে মুগ্ধ হইয়া একান্তে ফলভরে অবনত কতকগুলি বৃক্ষের সম্মুখে হাফেজের গজল্ (কবিতা) গাহিয়া নৃত্য করিতেছিলেন। সেই একটি গজলের অর্থ এই 'হে ঈশ্বর বসন্তের সমাগমে ফলফুলে সুশোভিত এমন যে শোভনীয় বৃক্ষরাজি, ইহাদিগকে প্রলয়ে (ফনাতে) লইয়া যাইও না।' এই গজল্ ভক্তিভরে গাহিতেছিলেন ও নৃত্য করিতেছিলেন। এমন সময়ে দেখেন তাঁহার পিছনে একজন মুসলমান নিঃশব্দে নৃত্য করিতেছে। তাঁহাকে দেখিয়া

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কে?' উত্তরে তিনি বলিলেন, 'আমি একজন গরীব। আমি দিবান্ হাফেজের ঐ গজল্ জানি, আমি আপনাকে তাহা গাহিতে ও গাহিয়া নৃত্য করিতে দেখিয়া আমিও নৃত্য করিতেছিলাম।' মহর্ষি তাহা শুনিয়া বড়ই প্রীত হইলেন এবং তাহাকে বাসায় লইয়া যাইয়া তাঁহার বাক্সতে যে কয়টি খরচের টাকা ছিল, তাহা সমস্তই তাহাকে দিলেন।"

তাঁহার শেষবয়সের বন্ধু যেমন শ্রীকণ্ঠবাবু, তাঁহার শেষবয়সের আশ্রয় তেমনি শান্তিনিকেতন আশ্রম। এইখানে তিনি দিনে দিনে তাঁহার "প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি"র মধ্যে নিবিষ্ট হইলেন। তখন তিনি ক্রমশ অনুভব করিলেন যে, এ জায়গাটি তো তাঁহার অন্যান্য নির্জন সাধনার জায়গার মতো নয়। এ জায়গায় তাঁহার জীবনের সাধনা যে নিত্য হইয়া বিরাজ করিবে। এ যে আশ্রম হইয়া উঠিবে, এ যে আশ্রয় হইবে— এই কথাটি তাঁহার মনের কল্পনায় তখন হইতেই ক্রমশই সুস্পষ্ট আকার পাইতে লাগিল। তিনি অনুভব করিলেন যে, এইখানেই ভারতবর্ষের ভূতকালের একটি আবির্ভাব হইবে। ভূতকালের তপোবনের জলস্থল-আকাশ-তরুলতা-পশুপক্ষী সকলের সঙ্গে আত্মার নিবিড় আত্মীয়সম্বন্ধের সাধনাটি এইখানে আবার আবির্ভূত হইবে। শুধু ভূতকাল নয়, ভবিষ্যৎ কালেরও একটি পরম আবির্ভাব এখানে ঘটিবে। বিশ্বপ্রকৃতির মাঝখানে দাঁড়াইয়াই বিশ্বমানবের সাধনাকে সর্বতোভাবে স্বীকার করা যায়— মানুষকে বিশ্বপ্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একান্ত করিয়া দেখা সত্য দেখা নয়। সেই যে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে বিশ্বমানবের যোগ স্থাপনের সাধনা; মানুষের সমাজের ভাবের চিন্তার কাজের যত-কিছু ঘাতপ্রতিঘাত দ্বিধাদ্বন্দ্ব আছে সমস্তের চরম সমাধানের জন্য সাধনা; সেই ভবিষ্যৎ মানবের সাধনাও এখানে আবির্ভূত হইবে।

জগতের সমস্ত বড়ো সৃষ্টি এই আনন্দের সৃষ্টি, এই ধ্যানের সৃষ্টি। তাহা চেষ্টার সৃষ্টি নয়। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যেখানে তাঁহার ধ্যানের সৃষ্টি ছিল, সেখানে তিনি চিরকৃতার্থ, সেখানকার আনন্দের আর বিরাম নাই। সেখানকার সৃষ্টি কোনোদিনই ফুরাইবে না। কিন্তু যেখানে তাঁহার চেষ্টার সৃষ্টি ছিল, তাহা এক সময়ে আর-সমস্ত সৃষ্টিকে চাপা দিয়া প্রবল হইয়া উঠিলেও তাহার আলো মাটির প্রদীপমালার আলোর মতো। চেষ্টার তেল ক্রমাগতই তাহার মুখে জোগাইয়া জোগাইয়া তাহাকে জ্বালাইয়া রাখিতে হয়। তাহা স্বতঃই উজ্জ্বল নয়। কিন্তু এখানকার এই শান্তিনিকেতনের আকাশে দশ দিক উদ্‌ভাসিত আলোক-স্রোতের মাঝখানে

বসিয়া এই ভুবন-ভরা আনন্দের সঙ্গে আত্মার আনন্দের সহজ মিলনে যে স্ফূর্তি আপনিই হইয়া উঠিবে বলিয়া তিনি অনুভব করিলেন, তাহার মুখে কোনো তেল জোগানোর দরকার নাই। কারণ, বিশ্ব-প্রকৃতির সমস্ত আনন্দ তাহাকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিবার ভার লইবে।

বোলপুরের মরুভূমিতে তাই শান্তিনিকেতন আশ্রম রচনার জন্য তিনি ব্যস্ত হইলেন। মরুস্থলীর মধ্যে সুধার উৎস একবার ছুটিলে আর কি তাহা শ্যামল না হইয়া পারে? অন্য জায়গা হইতে মাটি আনাইয়া সেই মাটি শান্তিনিকেতনে ফেলিয়া সেখানে দেবেন্দ্রনাথ এক কানন রচনা করিলেন। গোলাপ, যুঁই, বেল, বকুল, মাধবী, মালতী, গন্ধরাজ প্রভৃতি ফুলের গাছ ও লতা; আম, জাম, পেয়ারা প্রভৃতি ফলের গাছ; শাল মহুল দেবদারু প্রভৃতি উন্নত বনস্পতির বীথিকা সেই কাননে রোপিত হইয়া দেখিতে দেখিতে বড়ো হইয়া উঠিতে লাগিল। মরুভূমির মধ্যে ফুটিল ফুল, নামিল ছায়া, ছুটিল সৌরভ। সেখানে পাখির দল আসিয়া উৎসব জমাইল। সেই দিগন্তপ্রসারিত কঙ্করময় ধূসর প্রান্তরের মাঝে ঐ একটুখানি শ্যামল কানন তাই কোনো কবির কাছে হরপার্বতীর মিলনের মতো সুন্দর বোধ হইয়াছিল। রিক্ততা যেন সেখানে পূর্ণতাকে বরণ করিয়া লইয়াছে। সেই দিগন্ত-বিস্তার রিক্ততার মধ্যে আগে তাঁহার একটি পাণ্ডুবর্ণ তাঁবু পড়িয়া মাঠের ধূসর পাণ্ডুরতার সঙ্গে রঙ মিলাইত। এখন সেখানে একটি বাড়ি তৈরি হইল। কেবল সেই তাঁবুর জায়গাটি— তাঁহার নিভৃত সাধনার জায়গাটির— মূক সাক্ষী দাঁড়াইয়া রহিল সেই দুইটি ছাতিম গাছ আর সে দিক্‌কার প্রান্তরে যতদূর দৃষ্টি যায় কোনো বাধা নাই কেবল— "দিবীব চক্ষুরাততং।"

১৮৭৩ সালে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথকে লইয়া হিমালয়ে যাইবার পথে এই বোলপুর শান্তিনিকেতনে তিনি কিছুকাল আসিয়া থাকিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন যে, তিনি এতকাল পর্যন্ত ছিলেন "ভৃত্যরাজকতন্ত্রে"র অধীনে— বাহিরে যাওয়া তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। এখন এই উন্মুক্ত প্রান্তরে আসিয়া তিনি যেখানে "স্থানে স্থানে বর্ষার জলধারায় বালিমাটি ক্ষয় করিয়া প্রান্তরতল হইতে নিম্নে লাল কাঁকর ও নানা প্রকার পাথরে খচিত ছোটো ছোটো শৈলমালা, গুহাগহ্বর, নদী, উপনদী রচনা করিয়া বালখিল্যদের দেশের ভূবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছে" সেই-সব "খোয়াই"গুলির মধ্যে একজন ছোটোখাটো "লিভিংস্টোনের" মতো নানা অভূতপূর্ব জিনিস আবিষ্কার করিয়া

বেড়াইতে লাগিলেন। খোয়াই হইতে নানা রকমের পাথর কুড়াইয়া পিতার কাছে উপস্থিত করিলে তিনি বলিতেন, "কী চমৎকার! এ-সমস্ত তুমি কোথায় পাইলে!" বালক রবীন্দ্রনাথ বলিতেন "এমন আরো কত আছে!...আমি রোজ আনিয়া দিতে পারি।" তিনি বলিতেন, "সে হইলে তো বেশ হয়। ঐ পাথর দিয়া আমার এই পাহাড়টা তুমি সাজাইয়া দাও।"

পাহাড়— একটা পুকুর খুঁড়িবার চেষ্টা হয় এবং পুকুরের গর্তের মাটি তুলিয়া একটা উঁচু ঢিবির মতো তৈরি করা হয়। সেখানে সকালবেলায় দেবেন্দ্রনাথ একটি চৌকি লইয়া উপাসনায় বসিতেন। স্তূপটা শান্তিনিকেতনের পূর্ব দিকে। সূর্যোদয়ের দিকে মুখ করিয়া বরাবর তাঁহার উপাসনা করার অভ্যাস ছিল। সেই স্তূপ বা পাহাড়টাই পাথর দিয়া সাজাইবার জন্য তিনি তাঁহার ছেলেকে উৎসাহ দিলেন।

বোলপুরে কিছুকাল থাকিয়া সাহেবগঞ্জ, দানাপুর, এলাহাবাদ, কানপুর প্রভৃতি জায়গায় মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিতে করিতে অবশেষে দেবেন্দ্রনাথ অমৃতসরে গিয়া পৌঁছিলেন।

পথের মধ্যে একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল—'জীবনস্মৃতি'তে তাহা রবিবাবু লিখিয়াছেন। "কোনো একটা বড়ো স্টেশনে গাড়ি থামিয়াছে। টিকিটপরীক্ষক আসিয়া আমাদের টিকিট দেখিল। একবার আমার মুখের দিকে চাহিল। কী একটা সন্দেহ করিল কিন্তু বলিতে সাহস করিল না। কিছুক্ষণ পরে আর-একজন আসিল— উভয়ে আমাদের গাড়ির দরজার কাছে উস্‌খুস্ করিয়া আবার চলিয়া গেল। তৃতীয় বারে বোধ হয় স্বয়ং স্টেশনমাস্টার আসিয়া উপস্থিত। আমার হাফটিকিট পরীক্ষা করিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই ছেলেটির বয়স কি বারো বছরের অধিক নহে?" পিতা কহিলেন,"না"। তখন আমার বয়স এগারো। বয়সের চেয়ে নিশ্চয়ই আমার বৃদ্ধি কিছু বেশি হইয়াছিল। স্টেশনমাস্টার কহিল, "ইহার জন্য পুরা ভাড়া দিতে হইবে।" আমার পিতার দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বাক্স হইতে তখনি নোট বাহির করিয়া দিলেন। ভাড়ার টাকা বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা যখন তাহারা ফিরাইয়া দিতে আসিল তিনি সে টাকা লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন, তাহা প্লাটফর্মের পাথরের মেজের উপর ছড়াইয়া পড়িয়া ঝন্‌ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। স্টেশনমাস্টার অত্যন্ত সংকুচিত হইয়া চলিয়া গেল —টাকা বাঁচাইবার জন্য পিতা যে মিথ্যা কথা বলিবেন এ সন্দেহের ক্ষুদ্রতা তাহার মাথা হেঁট করিয়া দিল।"

অমৃতসরে দেবেন্দ্রনাথ সকালবেলায় প্রায় প্রত্যহই গুরুদরবারে গিয়া বসিতেন। সেখানে সমস্ত সময়ই ভজনা চলিতেছে। তিনি যখন সুর করিয়া শিখদের সঙ্গে ভজনায় যোগ দিতেন, তখন তাহারা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিত। পূর্বে যখন তিনি অমৃতসরে ছিলেন তখনই তিনি গুরুমুখী ভাষা শিখিয়াছিলেন তাহা আমরা শুনিয়াছি।

যখন সন্ধ্যা হইত তখন তিনি বাগানের সামনে বারান্দায় আসিয়া বসিতেন। ব্রহ্মসংগীত শোনাইবার জন্য রবীন্দ্রনাথের ডাক পড়িত। "চাঁদ উঠিয়াছে, গাছের ছায়ার ভিতর দিয়া জ্যোৎস্নার আলো বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছে"—রবীন্দ্রনাথ গাহিতেছেন—

"তুমি বিনা কে প্রভু সঙ্কট নিবারে
কে সহায় ভব-অন্ধকারে"—

আর দেবেন্দ্রনাথ "নিস্তব্ধ হইয়া নতশিরে কোলের উপর দুই হাত জোড় করিয়া শুনিতেছেন।"

অথচ শুধু যে তিনি নিজের সাধন ভজন লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন, তাহা নয়। ছেলের পড়াশুনার উপরেও তাঁহার সম্পূর্ণ দৃষ্টি ছিল। রবীন্দ্রনাথকে পড়াইবেন বলিয়া তিনি Peter Parley's Tales পর্যায়ের অনেকগুলি বই লইয়া গিয়াছিলেন। সংস্কৃত ঋজুপাঠ দ্বিতীয়ভাগ উপক্রমণিকা পড়াইতেন এবং সংস্কৃত রচনায় ছেলেকে উৎসাহিত করিতেন। ইহা ছাড়া প্রক্টরের লেখা ইংরাজী জ্যোতিষের বই হইতে পড়িয়া মুখে মুখে বুঝাইয়া দিতেন— রবীন্দ্রনাথ তাহা বাংলায় লিখিতেন।

তিনি নিজের পড়ার জন্য অন্যান্য পুস্তকের মধ্যে বারো ভল্যুম গিবনের 'ডিক্লাইন অ্যাণ্ড ফল্ অব্ রোমান্ এম্পায়ার' লইয়া গিয়াছিলেন। সে বই এখনো জীর্ণ অবস্থায় শান্তিনিকেতনের লাইব্রেরিতে আছে। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, তিনি ভাবিতেন যে, তাঁহাকে তো দায়ে পড়িয়া শিখিতে হয় কারণ তিনি ছেলেমানুষ কিন্তু তাঁহার পিতা তো ইচ্ছা করিলেই না পড়িয়া পারেন, তাঁহার এ দুঃখ কেন? পড়ার এই অভ্যাস তাঁহার শেষবয়স পর্যন্ত ছিল। এ সম্বন্ধে তাঁহার যে কতদূর পর্যন্ত অধ্যবসায় ছিল তাহা একটি গল্প বলিলেই বুঝা যাইবে। এক সময়ে এই বুড়া বয়সে দেবেন্দ্রনাথ সাহেবগঞ্জে বজরায় বাস করিতেছিলেন। তাঁহার পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া দেখেন যে টেবিলের উপর দুই-চারিখানা বাঁধানো ফরাসীগ্রন্থ আর একখানি ফরাসী-

ইংরাজী অভিধান। গ্রন্থগুলি ভিক্টর কুজ্যাঁর প্রসিদ্ধ বই *Le vrai le beau le bien* অর্থাৎ সত্য, সুন্দর, মঙ্গল। ঐ বইটির ইংরাজী অনুবাদ পড়িয়া তাঁহার এত ভালো লাগিয়াছিল যে, ফরাসী মূলগ্রন্থ পড়িবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গিয়া দেখেন যে দেবেন্দ্রনাথ ইংরাজী তর্জমার সঙ্গে মিলাইয়া অভিধানের সাহায্যে মূল ফরাসী গ্রন্থ পড়িতেছেন। মধ্যে মধ্যে যে অংশ বুঝেন নাই, তাহার মানে জ্যোতিবাবুকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন। এই পুস্তকখানি তাঁহার প্রিয় ছিল বলিয়াই মূল ফরাসী হইতে এই বইটি জ্যোতিবাবু বাংলায় অনুবাদ করিয়াছেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন যে, 'নাইন্‌টিন্‌থ সেঞ্চুরি' পত্রে টেনিসনের কবিতা বাহির হইয়াছে— অত্যন্ত বুড়া বয়সে সেই কবিতা তিনি পড়িয়াছেন ও পড়িয়া শাস্ত্রীমহাশয়কে তাহা পড়িবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। আমিয়েলের বিখ্যাত জর্নাল যখন বাহির হয়, শাস্ত্রীমহাশয় সে বইয়ের খবর দেবেন্দ্রনাথকে দিতে আসিয়া দেখেন যে, দেবেন্দ্রনাথই তাঁহাকে সাক্ষাৎমাত্রে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, *Amiel's Journal* তিনি পড়িয়াছেন কি না। তার পরে দেখেন, সে বই তিনি শুধু পড়েন নাই, স্থানে স্থানে সে বইয়ের অংশ তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছে। একবার দার্জিলিং পাহাড়ে থাকিবার সময় কোনো নবাবিষ্কৃত বিজ্ঞানের তত্ত্বের বিষয়ে পড়িয়া তাহা ভালো করিয়া জানিবার জন্য ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসুকে তিনি ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহার কাছে বিষয়টি জানিয়া লইলেন। বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, সকল রকমের জ্ঞানগর্ভ বই পড়িবার জন্য তাঁহার যেমন আগ্রহ ছিল, তেমনি অধ্যবসায় ছিল। হেকেলের এভোলিউশনের উপর বই বাহির হইলে, দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বোলপুরে সে বই পাঠাইয়া দিলেন। তিনি পড়িয়া নিজের মন্তব্যসহ তাঁহাকে এক চিঠি লিখিয়াছিলেন। ইহার অনেক পরে যখন মসুরী পাহাড়ে তিনি ছিলেন, তখন হর্বার্ট স্পেন্সারের ***First Principles***-এর সমালোচক Professor Birks-এর গ্রন্থের কথা শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ মহাশয়ের কাছে শুনিয়া সেই বই তিনি চাহিয়া লইয়া তাহা পড়িয়াছিলেন। কোনো নূতন ভালো বইয়ের কথা শুনিলে সেটা না পড়িয়া তাঁহার শান্তি ছিল না।

যেমন জ্ঞানচর্চায় নিজের উৎসাহ ও অনুরাগ, তেমনি ছেলেদের লেখাপড়া ভালোরকম হয় এদিকে তাঁহার পুরাপুরি উৎসাহ ও আগ্রহ ছিল। ছেলেদের সাহিত্যচর্চায় তাঁহার উৎসাহ, সংকাজে উৎসাহ, সকল শুভসংকল্পে উৎসাহ।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কাছে শুনিয়াছি যে, তাঁহার 'তত্ত্ববিদ্যা' গ্রন্থ যখন বাহির হয়, তখন দেবেন্দ্রনাথ সে বইয়ের পাণ্ডুলিপি আগাগোড়া সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "আমার প্রণীত পুরুবিক্রম, সরোজিনী, অশ্রুমতী নাটক প্রকাশিত হইলে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। তিনি প্রত্যেকেরই সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিয়া আমাকে পত্র লেখেন, সেই পত্রগুলি সযত্নে রক্ষা করি নাই বলিয়া এখন দুঃখ হয়!" তাঁহার কন্যারাও যাহা লিখিতেন তাহা তিনি মনোযোগের সঙ্গে পড়িয়া তাঁহার মন্তব্য লিখিয়া জানাইতেন।

অথচ সকল সময়েই যে ছেলেদের মতের সঙ্গে তাঁহার মতের মিল হইত তাহা নয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ এই সময়ে শাঙ্কর অদ্বৈতবাদের দিকে তত্ত্বের দিক দিয়া খুব ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাহাতে বিচলিত হন নাই—যদিচ আমরা জানি যে অদ্বৈতবাদকে তিনি কোনো ক্রমেই সহ্য করিতে পারিতেন না। ১৮৭৪ সালে তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত "বেদান্তদর্শন" শিরে এক প্রবন্ধে দেখি লেখা হইয়াছে, "ত্রিগুণাতীত পরমাত্মার মধ্যে এবং আমাদের বিশুদ্ধ জ্ঞানের মধ্যে ব্যবধান নাই— ইহা দেখিয়াই বেদান্ত জীবাত্মা-পরমাত্মার মধ্যে অভেদভাব নিশ্চয় করিয়াছেন।" অমৃতসর হইতে বাক্রোটায় গিয়া সেখান হইতে এ সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বসুকে চিঠি লিখিতেছেন—

হিমালয়, বক্রোটাশেখর

১৪ আষাঢ় ১৭৯৫

"প্রীতিপূর্বক নমস্কার—

…ব্রাহ্মধর্মের বিরুদ্ধে 'সোঽহমস্মি' 'তত্ত্বমসি' এই সকল উপনিষদের বাক্য কি সিদ্ধান্ত নয়? তাহা হইলে আমরা বেদান্ত দর্শন কি প্রকারে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি? আমাদের মতে আত্মা কখনো পরাকাষ্ঠা নয়। কিন্তু এই আত্মার অন্তরাত্মা যে পরম পুরুষ তিনিই পরাকাষ্ঠা। অতএব আমরা এই উপনিষদ্‌বাক্য গ্রহণ করিয়াছি যে "হিরণ্ময়ে পরেকোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং।" আমার মতে 'অন্নময় কোষ' জড়বস্তু, 'প্রাণময় কোষ' বৃক্ষলতা, 'মনোময় কোষ' পশুপক্ষী, 'বিজ্ঞানময় কোষ' মনুষ্যের আত্মা, 'আনন্দময় কোষ' দেবাত্মা—সকলের প্রতিষ্ঠা ব্রহ্ম— 'ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।' অবিদ্যা-বিদ্যা, বন্ধন-মুক্তি প্রভৃতি যুগলগণ পরস্পর বিরোধী অথচ পরস্পর সাপেক্ষ— দ্বিজেন্দ্রের এই প্রহেলিকার পোষকতা বাজসনেয় সংহিতাতেও পাওয়া যায়।…রবীন্দ্রকে একটি জীবন্ত পত্রস্বরূপ করিয়া তোমাদের

নিকট পাঠাইয়াছি—তাহার প্রমুখাৎ এখানকার তাবৎ বৃত্তান্ত চুম্বকরূপে জানিতে পারিয়াছ, ইহার চতুর্দিক হইতেই সত্যং শিবং সুন্দরং ভাতি চ বিভাতি চ, ইহার বৃত্তান্ত আরো সংক্ষেপে এই বলিলাম।...

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্মণঃ।"

১৭৯৪ শকের চৈত্র মাসের শেষে তিনি অমৃতসর ছাড়িয়া ডালহৌসি পাহাড়ে যাত্রা করেন। সেই বাক্রোটা পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় তাঁহার বাসা স্থির হইয়াছিল। বৈশাখ মাসেও সেখানে এত শীত যে, পথের যে অংশে রোদ পড়িত না, সেখানে বরফ গলে নাই। বাসার নীচে বিস্তীর্ণ কেলুবন। এই বাক্রোটাশিখরে বাসসম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "রাত্রে বিছানায় শুইয়া কাচের জানালার ভিতর দিয়া নক্ষত্রালোকের অস্পষ্টতায় পর্বতচূড়ার পাণ্ডুরবর্ণ তুষারদীপ্তি দেখিতে পাইতাম। এক-একদিন, জানি না কত রাত্রে, দেখিতাম, পিতা গায়ে একখানি লাল শাল পরিয়া হাতে একটি মোমবাতির সেজ লইয়া নিঃশব্দসঞ্চরণে চলিয়াছেন। কাচের আবরণে ঘেরা বাহিরের বারান্দায় বসিয়া উপাসনা করিতে যাইতেছেন।

"তাহার পর আর-এক ঘুমের পরে হঠাৎ দেখিতাম, পিতা আমাকে ঠেলিয়া জাগাইয়া দিতেছেন। তখনো রাত্রির অন্ধকার সম্পূর্ণ দূর হয় নাই। উপক্রমণিকা হইতে 'নরঃ নরৌ নরাঃ' মুখস্থ করিবার জন্য আমার সেই সময় নির্দিষ্ট ছিল। শীতে কম্বলরাশির তপ্ত বেষ্টন হইতে বড়ো দুঃখের এই উদ্‌বোধন।

"সূর্যোদয়কালে যখন পিতৃদেব তাঁহার প্রভাতের উপাসনা-অন্তে এক বাটি দুধ খাওয়া শেষ করিতেন, তখন আমাকে পাশে লইয়া দাঁড়াইয়া উপনিষদের মন্ত্রপাঠ দ্বারা আর-একবার উপাসনা করিতেন।

"তাহার পরে আমাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন। তাঁহার সঙ্গে বেড়াইতে আমি পারিব কেন। অনেক বয়স্ক লোকেরও সে সাধ্য ছিল না। আমি পথিমধ্যেই কোনো-একটা জায়গায় ভঙ্গ দিয়া পায়ে-চলা পথ বাহিয়া উঠিয়া আমাদের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইতাম।

"পিতা ফিরিয়া আসিলে ঘণ্টাখানেক ইংরেজি পড়া চলিত।...

"মধ্যাহ্নে আহারের পর পিতা আমাকে আর-একবার পড়াইতে বসিতেন। কিন্তু সে আমার পক্ষে অসাধ্য হইত। প্রত্যুষের নষ্টঘুম তাহার অকালব্যাঘাতের শোধ লইত। আমি ঘুমে বার বার ঢুলিয়া পড়িতাম। আমার অবস্থা বুঝিয়া পিতা ছুটি দিবামাত্র ঘুম কোথায় ছুটিয়া যাইত।...

"বড়দাদা মেজদাদার কাছ হইতে কোনো চিঠি আসিলে তিনি আমাকে তাহা পড়িতে দিতেন। কী করিয়া তাঁহাকে চিঠি লিখিতে হইবে, এই উপায়ে তাহা আমার শিক্ষা হইয়াছিল। বাহিরের এই-সমস্ত কায়দাকানুন সম্বন্ধে শিক্ষা তিনি বিশেষ আবশ্যক বলিয়া জানিতেন।

"আমার বেশ মনে আছে, মেজদাদার কোনো চিঠিতে ছিল তিনি 'কর্ম-ক্ষেত্রে গলবদ্ধরজ্জু' হইয়া খাটিয়া মরিতেছেন—সেই স্থানের কয়েকটি বাক্য লইয়া পিতা আমাকে তাহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আমি যেরূপ অর্থ করিয়াছিলাম তাহা তাঁহার মনোনীত হয় নাই, তিনি অন্য অর্থ করিলেন। কিন্তু, আমার এমন ধৃষ্টতা ছিল যে সে-অর্থ আমি স্বীকার করিতে চাহিলাম না। তাহা লইয়া অনেকক্ষণ তাঁহার সঙ্গে তর্ক করিয়াছিলাম। আর-কেহ হইলে নিশ্চয় আমাকে ধমক দিয়া নিরস্ত করিয়া দিতেন, কিন্তু তিনি ধৈর্যের সঙ্গে আমার সমস্ত প্রতিবাদ সহ্য করিয়া আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

"তিনি আমার সঙ্গে অনেক কৌতুকের গল্প করিতেন। তাঁহার কাছ হইতে সেকালের বড়োমানুষির অনেক কথা শুনিতাম। ঢাকাই কাপড়ের পাড় তাহাদের গায়ে কর্কশ ঠেকিত বলিয়া তখনকার দিনের শৌখিন লোকেরা পাড় ছিঁড়িয়া ফেলিয়া কাপড় পরিত, এই-সব গল্প তাঁহার কাছে শুনিয়াছি।...

"এমন করিয়া কয়েক মাস কাটিলে পর, পিতৃদেব তাঁহার অনুচর কিশোরী চাটুর্জের সঙ্গে আমাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন।"

দেবেন্দ্রনাথের হিমালয়বাসের এই বৃত্তান্তটুকুতে তাঁহার ভিতরকার অধ্যাত্ম-জীবনের সাধনার কোনো পরিচয় না থাকিলেও, ইহা এইজন্য আশ্চর্য যে, যখন ঈশ্বরের সহবাসে থাকাটাই তাঁহার দিনরাত্রির কামনার বিষয়, তখনো ছেলের প্রতি কর্তব্য তিনি ভুলেন নাই। তাহাকে নিয়মিত পড়াইতেছেন, তাহাকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতেছেন, তাহার সঙ্গে নানা কৌতুকের গল্প করিতেছেন। আমাদের দেশের লোকের মনে ধারণা এই যে, ঈশ্বরে সমাহিত আত্মার আর কর্তব্যাকর্তব্য নাই, তাহার সকল কর্মের অবসান হইয়া গিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথের ঠিক উল্টা। তাঁহার আত্মা যতই ঈশ্বরে সমাহিত হইতেছে, ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভ তাঁহার পক্ষে যতই সহজ হইতেছে, ততই দেখি তাঁহার জ্ঞানচর্চা না কমিয়া বাড়িয়া যাইতেছে, কর্তব্যগুলি সুনিয়মিত হইয়া উঠিতেছে, নিয়মের শৃঙ্খলে তিনি আরো কঠিন করিয়া আপনাকে বাঁধিতেছেন।

কিন্তু ঈশ্বরের চরণকমলে যে আত্মা ভ্রমরের মতো একবার মজিয়া গিয়াছে, তাহার পক্ষে সেখান হইতে সংসারের প্রতিদিনকার তুচ্ছ সুখ-দুঃখ, হাসি-কৌতুক, চাপল্যের মধ্যে ফিরিয়া আসা বড়ো কঠিন। কঠিন বলিয়াই তো সেই ফিরিয়া আসার দৃশ্যের সৌন্দর্য ও মাধুর্য অমন গভীর!

১৭৯৫ শকের শীতকালে অর্থাৎ ১৮৭৪ সালে দেবেন্দ্রনাথ বাক্রোটা হইতে নামিয়া তাঁহার জমিদারি মাধবপুরে ইরাবতী নদীতীরে আসিয়া দু-এক মাস থাকেন। চৈত্র মাসে বসন্ত ঋতুতে আবার অমৃতসরে চলিয়া যান। সেখান হইতে চিঠি লিখিতেছেন—"এখানে এইক্ষণে বসন্তকাল। নেবু ফুলের গন্ধের সহিত আম্রমুকুলের গন্ধ মিশ্রিত হইয়া বিদেশে স্বদেশের ভাব আনিয়া দিতেছে। কিন্তু বসন্তের এ আমোদ আর থাকে না। ইহার পশ্চাতে খরতর খরা আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই বসন্তের অবসানের পূর্বেই আমি এখান হইতে প্রস্থান করিব এবং পর্বতে যাইয়া তথাকার বসন্তের সমাগমের প্রতীক্ষা করিব।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পত্নীবিয়োগ বাক্রোটায় বাস চীনভ্রমণ দার্জিলিং-যাত্রা মসূরী পাহাড়ে বাস

১৮৭৫ সালে (১৭৯৬ শক) ২৭এ ফাল্গুনে দেবেন্দ্রনাথের পত্নী শ্রীমতী সারদা দেবী পরলোকগমন করেন। হাতে ক্যানসার হওয়াতে তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া ভুগিতেছিলেন, মৃত্যুর পূর্বে ক্ষণে ক্ষণে চেতনা হারাইতেছিলেন। যে ব্রাহ্মমুহূর্তে তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহার পূর্বদিন সন্ধ্যার সময় দেবেন্দ্রনাথ হিমালয় হইতে বাড়ি ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ আসিয়াছেন শুনিয়া তিনি বলিলেন, "বসতে চৌকি দাও।" দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার সুমুখে আসিয়া বসিলেন। সারদা দেবী শুধু বলিলেন,"আমি তবে চললেম।" সকলেরি মনে হইল যে, স্বামীর কাছে এই বিদায় লইবার জন্যই এপর্যন্ত সেই সাধ্বী যেন আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন! মৃত্যুর পরে মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাইবার সময় দেবেন্দ্রনাথ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ফুল চন্দন অভ্র দিয়া নিজে শয্যা সাজাইয়া দিয়া বলিলেন, "ছয় বৎসরের সময় এনেছিলেম, আজ বিদায় দিলেম।"

এত বড়ো বৃহৎ সংসারের কর্ত্রী হইয়া এতকাল পর্যন্ত সমস্ত সংসারটিকে তিনি আগলাইয়া রাখিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তো চিরকালই বাহিরে বাহিরেই কাটাইয়াছেন; বাড়িতে আশ্রিত-প্রতিপালন, অতিথি-সৎকার প্রভৃতি সমস্ত রকমের পারিবারিক কর্তব্যের দায় সারদা দেবীর উপরেই ছিল। কেশববাবুর স্ত্রী যতদিন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ছিলেন, ততদিন তিনি অনুভব মাত্র করিতে পারেন নাই যে, তিনি দেবেন্দ্রনাথের আপন পুত্রবধূ নন। এ কেবল দেবেন্দ্রনাথের গুণে নয়, সারদা দেবীরও গুণে। তিনি যদি কেশববাবুর পত্নীকে আপনার করিয়া না লইতে পারিতেন, তবে দেবেন্দ্রনাথের হাজার যত্ন ও আদরেও দেবেন্দ্রনাথের গৃহে বাস তাঁহার পক্ষে সুখের হইত না। ১৮৬৬ সালে যখন রাজনারায়ণবাবু মাথার ব্যামোয় খুব কষ্ট পান, তখন দুই মাসের ছুটি লইয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়া দেবেন্দ্রনাথের বাড়িতে থাকেন। তিনি নিজে লিখিয়াছেন, "নিজ বাটীতে যেরূপ সেবা প্রাপ্ত হইতাম সেখানে সেরূপ সেবা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।" এ সেবার পিছনে কাহার হাত দুটি খাটিয়াছিল, তাহা অনুমান করা শক্ত নয়। দেবেন্দ্রনাথ তো সর্বদাই বন্ধুবান্ধবকে নিজের বাড়িতে

স্থান দিয়াছেন ; তাঁহারাও আপনার লোকের মতো সেখানে বাস করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ের এই দাক্ষিণ্যের সঙ্গে তাঁহার অন্তঃপুরের দাক্ষিণ্য যদি না মিলিত, তবে কি তাঁহার বন্ধুরা তাঁহার বাড়িটিকে নিজের বাড়ির মতো মনে করিতে পারিতেন? কেশববাবুর স্ত্রী যখন দেবেন্দ্রনাথের বাড়ি ছাড়িয়া অন্য জায়গায় গেলেন, তখন বধূকে বাড়ি হইতে বিদায় দিবার সময় যেমন বিবিধ অলংকারে সাজাইয়া দিতে হয়, তেমনি করিয়া তাঁহাকে নানা অলংকার দিয়া সাজানো হইয়াছিল। এ-সকল ব্যাপার তো শুধু বাড়ির কর্তার হুকুমে বা ইচ্ছায় হয় না— এ-সকল অন্তঃপুরের ব্যাপারের মধ্যে অন্তঃকরণটাই আসল জিনিস। সারদা দেবীর সেই জিনিসটি যথেষ্ট পরিমাণে ছিল।

মায়ের আদ্যশ্রাদ্ধে প্রার্থনার সময় সারদা দেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "আমাদের স্নান ভোজনের এতটুকু বিলম্ব হইলে তাহার প্রতিবিধানের জন্য তেমন আগ্রহ আর দেখিতে পাইব না। কোন বিষয়ে অনিয়ম করিলে তেমন মিষ্ট ভর্ৎসনা আর শুনিতে পাইব না। কোন প্রতিষ্ঠার কার্য করিলে তেমন উজ্জ্বল হাস্যমুখ আর দেখিতে পাইব না। পীড়ার সময় তেমন হস্তের স্পর্শ আর আমাদিগকে আরোগ্য প্রদান করিবে না।" এ 'আমরা' শুধু দেবেন্দ্রনাথের পরিবারের অনেকগুলি ছেলেমেয়ে পৌত্র পৌত্রী ও দৌহিত্র দৌহিত্রী নয়, এ 'আমরা'র মধ্যে আশ্রিত অভ্যাগত বন্ধুবান্ধব সকলেই অন্তর্ভুক্ত ছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রার্থনায় বলিয়াছিলেন যে, সারদা দেবীর "দয়া, হিতৈষণা ও ধর্মনিষ্ঠা সকলের মন আকর্ষণ করিত।" বাস্তবিক এই তিনটি গুণই তাঁহার চরিত্রের অলংকার ছিল। পৌত্তলিক পূজা প্রভৃতিতে যখন তাঁহার নিষ্ঠা ছিল, তখন সর্বদাই তিনি ব্রত অর্চনা, দান উৎসর্গ লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। ক্রমে তাঁহার স্বামীর প্রভাবে যখন অনেকটা পরিমাণে তাঁহার পূর্ব সংস্কার কাটিয়া গেল, তখনো তিনি নিষ্ঠার সহিত তাঁহার স্বামীর সঙ্গে প্রত্যহ ব্রহ্মোপাসনায় যোগ দিতেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের আমলে দুর্গোৎসব যেমন বাড়ির সামাজিক আনন্দোৎসব ছিল এবং সেই উৎসব যেমন মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত, দেবেন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল মাঘোৎসবকে তেমনি বাড়ির আনন্দোৎসব করিয়া তুলিবেন। তাঁহার বাড়িতে মাঘোৎসব কি রকম জমকাইয়া হইত, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছিলেন তাঁহারা জানেন। চাকরবাকরেরা কাপড় পাইত, পরিবারস্থ আত্মীয়স্বজনদিগকে কাপড় দেওয়া হইত, কাঙালী বিদায়ের বিশেষ আয়োজন হইত। পূর্বের পূজার সময়ে যেমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মেঠাই তৈরি হইত, এগারোই

মাঘেও সেই রকম মেঠাইয়ের ব্যবস্থা ছিল। সেই বড়ো বড়ো মেঠাইয়ের স্তূপ সকালবেলা হইতে বাহিরের ঘরে টেবিলের উপর সাজানো থাকিত; যাঁহার যখন ইচ্ছা খাইতেন, কোনো বাধা ছিল না। এই পারিবারিক উৎসবের আয়োজনে চাকরবাকর আত্মীয়স্বজন সকলকে খাওয়ানো ও কাপড় দেওয়া, সকলকে লইয়া আমোদ আহ্লাদ করা— এ-সব কাজ একলা কর্তার উপরে কখনোই নির্ভর করিত না, কর্ত্রীর উপরেও নির্ভর করিত।

পূর্বেই বলিয়াছি যে তিনি বহু সন্তানবতী ছিলেন বলিয়া সকল ছেলেমেয়েকে নিজের হাতে মানুষ করিতে পারিতেন না। তাঁহার জায়ের কাছে, গিরীন্দ্রনাথের স্ত্রীর কাছেই ছেলেমেয়েদের প্রধান আশ্রয় ছিল। রবিবাবু প্রভৃতি অন্তঃপুরের বাহিরে দাসদাসীর হাতেই মানুষ হইয়াছিলেন। হিমালয় হইতে ফিরিয়া আসার পর কিছুকালমাত্র তিনি মায়ের সঙ্গ পাইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসার পর ছাদের উপরে মাতার বায়ুসেবনসভায় আমিই প্রধানবক্তার পদ লাভ করিয়াছিলাম। মার কাছে যশস্বী হইবার প্রলোভন ত্যাগ করা কঠিন এবং যশ লাভ করাটাও অত্যন্ত দুরূহ নহে।"

সারদা দেবী বহুকাল ধরিয়া রোগে ভুগিতেছিলেন— অনেকদিন পর্যন্ত যে-ঘরে বালক রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার অন্য দুইজন সঙ্গী শুইতেন সেই ঘরেই ভিন্ন শয্যায় তিনিও শুইতেন। তার পর রোগের সময় তাঁহাকে কিছুদিন বোটে করিয়া গঙ্গায় বেড়াইতে লইয়া যাওয়া হয়। বাড়িতে ফিরিয়া তিনি অন্তঃপুরের তেতলার ঘরে থাকিতেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "যে-রাত্রিতে তাঁহার মৃত্যু হয় আমরা তখন ঘুমাইতেছিলাম, তখন কত রাত্রি জানি না, একজন পুরাতন দাসী আমাদের ঘরে ছুটিয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "ওরে তোদের কী সর্বনাশ হল রে!" তখনই বউঠাকুরানী তাড়াতাড়ি তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেলেন— পাছে গভীর রাত্রে আচমকা আমাদের মনে গুরুতর আঘাত লাগে এই আশঙ্কা তাঁহার ছিল। ...প্রভাতে উঠিয়া যখন মা'র মৃত্যুসংবাদ শুনিলাম তখনো সে-কথাটার অর্থ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দেখিলাম, তাঁহার সুসজ্জিত দেহ প্রাঙ্গণে খাটের উপরে শয়ান। কিন্তু, মৃত্যু যে ভয়ংকর, সে-দেহে তাহার কোনো প্রমাণ ছিল না; সেদিন প্রভাতের আলোকে মৃত্যুর যে-রূপ দেখিলাম তাহা সুখসুপ্তির মতোই প্রশান্ত ও মনোহর।... বেলা হইল, শ্মশান হইতে ফিরিয়া আসিলাম; গলির মোড়ে আসিয়া তেতালায়

পিতার ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম— তিনি তখনো তাঁহার ঘরের সম্মুখের বারান্দায় স্তব্ধ হইয়া উপাসনায় বসিয়া আছেন।"

এই মৃত্যুশোক নিশ্চয়ই দেবেন্দ্রনাথের মনে লাগিয়াছিল, কিন্তু তাঁহাকে একটুও বিচলিত করে নাই। এ ঘটনার পরে কোনো হাহুতাশ, কোনো বিলাপ পরিতাপ, কোনো চঞ্চলতা তাঁহার মধ্যে কেহ লক্ষ করে নাই। তিনি স্তব্ধ। মৃত্যুশোকের কালো মেঘকে বিদীর্ণ করিয়া তাঁহার অধ্যাত্ম-উপলব্ধির আনন্দময় জ্যোতিই বিকীর্ণ হইল।

আমি পূর্বপরিচ্ছেদে তাঁহার ধ্যানের কথায় বলিয়াছি যে, তাঁহার ধ্যান মানে বাহিরকে ভিতরের দিকে আনা, আমদরবার হইতে খাসদরবারে আসিয়া প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনের ভূমানন্দ লাভ করা। এক দিক দিয়া এই ধ্যানের ক্রিয়ায় মানুষটার মৃত্যু— বাহিরের দিকের মৃত্যু; অন্য দিকে আত্মার নব-জন্মলাভ— ভিতরের দিকের জন্ম। সুতরাং সংসারের সুখ দুঃখ মৃত্যু যে এই ক্রিয়ারই অন্তর্গত— সে যে পরিবর্তনেরই নানা রূপ মাত্র, এ কথা তিনি বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। সেই পরিবর্তন-পরম্পরার স্রোত হইতে মনকে তুলিয়া লইয়া অনন্তের মধ্যে স্থাপিত করার সাধনাই তাঁহার শেষবয়সের সাধনা। সেই সাধনার দ্বারাই যে-সংসার ক্রমাগত সরিতেছে ও সরাইতেছে, তাহার কবল হইতে মানুষের উদ্ধার। সংসারের এই-সমস্ত আবর্তন-পরিবর্তনের খরতর ঝঞ্ঝার মধ্যে একটি "স্থিরতার নীড়" আছে, যেখানে মানুষের অন্তরাত্মা ভূমার সঙ্গে নিবিড় প্রেমের মিলনে মিলিত।

ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে এ বছরের চৈত্রে (১৭৯৬ শক) বর্ষশেষের উপাসনায় দেবেন্দ্রনাথ এই কথারই আভাস দিয়াছিলেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পরে বলিয়া সেই-সকল কথার গভীরতা যে কতখানি তাহা বেশ বুঝিতে পারি। তিনি বলিতেছেন— "এই পৃথিবী যে আকাশ দিয়া একবার চলিয়া গেল, তাহা আর সে আকাশে চলিবে না। যে স্রোত নদী দিয়া চলিয়া গেল, তাহা আর ফিরিবে না। যে সুখদুঃখ ভোগ করিয়াছি তাহা আর আসিবে না। কালের স্রোত চলিয়া যাইতেছে। এই পরিবর্তনশীল চঞ্চল কালের মধ্যে থাকিবে কি? যতটুকু জ্ঞান ধর্ম প্রেমের সহিত আত্মাতে পরমাত্মাকে ধারণ করিয়াছি, যতটুকু তাঁহার সঙ্গে যোগসম্ভোগ করিতে পারিয়াছি তাহাই থাকিবে।"

তবে কি সুখদুঃখ ভোগের কোনো মানে নাই? সংসার হইতে সরিয়া পড়িয়া অধ্যাত্মযোগ লাভের চেষ্টাকেই কি দেবেন্দ্রনাথ আশ্রয় করিতে বলিতেছেন?

না, তাহা হইতেই পারে না। সেই একই উপদেশে তিনি বলিতেছেন— "পুত্রেরা যখন পিতাকে সংসারক্ষেত্রে আপনার আশ্রয়রূপে দেখিতে পায়, তখন নির্ভয়ে সকল কর্ম সম্পন্ন করে— সেই পরমপিতাকে নিয়ত সাক্ষাৎ পাইলে তবে সংসারের সমুদায় কর্ম সহজ হয়।…তবে সংসারে অকুতোভয়ে বিচরণ করিতে পারি। আশাভয়ে বিক্ষিপ্ত হই না, সুখেতে স্ফীত হই না, দুঃখেতে কাতর হই না। জানি যে সুখেতেও কল্যাণ, দুঃখেতেও কল্যাণ, কারণ সুখদুঃখ দুইই পরম পিতার হস্ত হইতে আমারদের নিকট আসিতেছে। চিরকাল বসন্ত থাকে না, চিরকাল শীতও থাকে না, ঋতুর পর্যায় চাই; তেমনি আত্মাকে দৃঢ়িষ্ঠ করিবার জন্য সুখদুঃখের আবশ্যক।"

ইহার পর আবার বাক্রোটা শিখর। ১৮৭৫ সাল ও ১৮৭৬ সালের আরম্ভ পর্যন্ত সেখানে কাটাইয়া তিনি কার্তিক কি অগ্রহায়ণ মাসে জলপথে ভ্রমণে বাহির হন। সে সময়েও তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। ৪ঠা পৌষ রামপুর বোয়ালিয়াতে উপস্থিত হইয়া সেখানকার ব্রাহ্মসমাজে তাহার পরদিন তিনি উপাসনার কাজ করেন। তিনি আসিয়াছেন শুনিয়া সেই ছোটো জায়গাটিতে তিনশতের বেশি ভদ্রলোকের সমাগম হয়— শহরের ভদ্রলোক আর বড়ো কেহ বাকি থাকে নাই। তাঁহার জলন্ত উপদেশ শুনিয়া ও তাঁহার মুখের অপূর্ব দিব্য-প্রভা দেখিয়া সকলে "চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থির ও নিস্তব্ধ"। উপদেশে তিনি বলিলেন, "ঈশ্বর সত্যের সত্য"— তার মানে নিখিল সত্যের মধ্যে তিনি সত্য, সকল সত্যের তিনি অন্তরতম আত্মা। সমস্ত সত্যকে গভীরভাবে না দেখিলে, নিবিড়ভাবে না গ্রহণ করিলে তাহাদের অন্তরাত্মাকে কেমন করিয়া দেখা যাইবে? "তিনি সূর্যের অন্তরাত্মা, কিন্তু সূর্যকে না দেখিলে, সূর্যের অন্তরাত্মাকে কি প্রকারে দেখিবে? তিনি চন্দ্রের অন্তরাত্মা, কিন্তু চন্দ্রকে না দেখিলে চন্দ্রের অন্তরাত্মাকে কি প্রকারে দেখিবে?…তিনি আত্মার অন্তরাত্মা, কিন্তু আত্মাকে না জানিলে আত্মার অন্তরাত্মা কি প্রকারে জানিবে?" উইলিয়ম জেম্‌স্‌ একজন Pluralistic mystic, এক অসংখ্য-বাদী মরমী সাধকের বিবরণ দিতে গিয়া লিখিয়াছেন যে, তিনি সকল স্বতন্ত্র বস্তুর একেবারে অন্তরাত্মাকে জানিতে পাইতেন— সেখানেই তিনি আত্মার নিশ্চয়তা (assurance of the soul) লাভ করিতেন। দেবেন্দ্রনাথের এই শেষবয়সের সকল উপদেশের মধ্যেই সেই ভাবেরই সাড়া পাওয়া যায়।

১৭৯৮ শকে, ১৮৭৬ সালে আবার তিনি বাক্রোটা শিখরে। কেবল শীতের সময় কিছুকালের মতো নামিয়া আসিয়া জলপথে তিনি ভ্রমণ করিতেছিলেন, বাড়িতে বড়ো থাকেন নাই। বাক্রোটায় গিয়া নিজের সাধনজীবনের কথা চিঠিপত্রে কখনো কখনো আভাসমাত্রে জানাইতেছেন, দেখিতে পাই। ৫ই বৈশাখ ১৭৯৮ শক রাজনারায়ণবাবুকে লিখিতেছেন, "এখানে বৈশাখ মাসের প্রথম দিবসেই বরফ পড়িয়া এমনি কঠোর শীত হইয়াছিল, তাহা একেবারে অসহ্য, তাহার তীব্রতা তোমরা অনুমানও করিতে পারিবে না। কিন্তু আশ্চর্য এই, কঠোর শীতেতে পরমাত্মার সমাধানে আত্মার বল হয়। যিনি "মহতো-মহীয়ান্" তাঁহার মহত্ত্বের নিদর্শন এখানে চতুর্দিক হইতেই প্রতীতি হইতেছে।"

অথচ আশ্চর্য এই যে, তিনি চিরকালই "Type of the wise, who soar but never roam" সেই জ্ঞানীর আদর্শ যাঁহারা ধ্যানের আকাশে ঊর্ধ্বে উড়িয়াও পথহারা হইয়া যান না। আকাশের সঙ্গে তাঁহাদের যতখানি সম্বন্ধ, মাটির সঙ্গে নীড়ের সঙ্গে ততখানিই সম্বন্ধ। এই কারণেই ধ্যানের মধ্যে নিবিষ্ট হইয়াও তিনি বিষয়কর্মের পরিচালনা করিতে পারিতেন। সেও তাঁর ধ্যানের অঙ্গীভূত ছিল, সে কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। তাঁহার সমস্ত কল্পনা এবং কাজ এইজন্যই পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাপারেও এমন যথাযথ ছিল যে, কোথাও এতটুকখানি ফাঁক বা শৈথিল্য সহ্য করিতে পারিতেন না। কোন্ ক্রিয়াকর্মে কোন্ জিনিসটা ঠিক কোথায় থাকিবে, কে কোন্‌দিকে বসিবে, কোন্ কোন্ অনুষ্ঠান কী পরম্পরায় সম্পন্ন হইবে, সমস্ত তিনি মনের চোখে ধ্যানের সাহায্যে ঠিক করিয়া লইয়া বলিয়া পাঠাইতেন। তাহার একটি চমৎকার নিদর্শন এই বছরেই বাক্রোটা শিখর হইতে একটি চিঠির মধ্যে দেখিতে পাই। দ্বিজেন্দ্রবাবুর কন্যার বিবাহ হইবে— সে সম্বন্ধে বেচারামবাবুকে নিম্নলিখিত চিঠি লিখিতেছেন—

বাক্রোটা শিখর

৮ বৈশাখ ১৭৯৮ শক

"প্রেমাস্পদেষু

নববর্ষের প্রেমালিঙ্গন পূর্বক নমস্কার—

দ্বিজেন্দ্রের কন্যা সরোজার শুভবিবাহ উপস্থিত। তুমি জ্ঞানচন্দ্র ও গড়গড়িকে লইয়া বেদীতে আসন গ্রহণ করিবে এবং আচার্যের কার্য সমাধা করিয়া এই শুভবিবাহ সুসম্পন্ন করিয়া দিবে। স্ত্রী-আচার হইয়া বরকন্যা দালানে

আইলে তবে ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ হইবে, তোমরা সেই সময়ে বেদীতে বসিবে, তাহার পূর্বে তাহাতে বসিবে না। দ্বিজেন্দ্রের সঙ্গে বরযাত্রদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া দরদালানে বসাইবে। পরে বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইলে বরযাত্রদিগকে দালানের বেদীর পশ্চিমভাগে সমাদর পূর্বক বসাইবে। এবং বরকে গদি হইতে উঠাইয়া আনিয়া কার্য আরম্ভ করিয়া দিবে। গদি খালি হইলে সেই গদি বরের জন্য বাটীর ভিতরে পাঠাইয়া দিবে এবং তাহার দুই পার্শ্বের বৈঠকীসেজ বেদীর দুই পার্শ্বে বসাইয়া দিবে। তাহা হইলে বেদীতে আলো কম হইবে না। এবং তুমি পুঁথি বেশ দেখিতে পাইবে। সময় আছে বলিয়া এই সকল তোমাকে বলিয়া দিলাম, নতুবা বাহুল্য মাত্র। তোমার বেহালার বাটীতে সকলে কেমন আছেন এবং তোমার নিজের শরীর বা কেমন আছে, জানাইয়া আপ্যায়িত করিবে।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ—

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্মণঃ।

পুঃ—যদি গড়গড়ি আসিতে না পারেন তাঁহার কোন ব্যাঘাত হয়, তবে তাঁহার স্থানে কোন্নগরের দয়ালচাঁদ ভট্টাচার্যকে বসাইয়া দিবে।"

৪ঠা বৈশাখ লিখিতেছেন, পরমাত্মাতে আত্মাকে সমাধানের কথা, পরে ৮ই বৈশাখ লিখিতেছেন এই পত্র— আধ্যাত্মিকের সঙ্গে বৈষয়িকের, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভাষায়, 'Heaven and home' আকাশের সঙ্গে ঘর বা নীড়ের এমন আশ্চর্য সম্মিলনের ছবি আর কোথায় আমরা দেখিয়াছি? তাহাই যদি হইল, তবে সমাজ-জীবন কেন তাঁহার রুদ্ধ হইল? তাহার উত্তর তো এই তৃতীয় খণ্ডের আরম্ভেই দিয়াছি। এ যে তাঁহার প্রব্রজ্যার জীবন। কর্মের জীবন তো নয়। এখানে পরিবারের সঙ্গে সংসারের সঙ্গে কতক কতক সম্বন্ধ আছে মাত্র— বনে গিয়াও যে সম্বন্ধটুকু থাকিতে পারে। এ সম্বন্ধও দূর হইতে যোগরক্ষা মাত্র, তাহার বেশি নয়। সমাজের সঙ্গেও এমনি সম্বন্ধই তাঁহার শেষ পর্যন্ত ছিল— কাজের দিক দিয়া সম্বন্ধ ছিল না।

১৮৭৬ সালের অগ্রহায়ণে তিনি বাক্রোটা ছাড়িয়া যখন নীচে নামিলেন, সেই বছরেই সিন্দুরিয়াপটীর উৎসবে তিনি আচার্যের কাজ করেন। তাহার কথা ইতিপূর্বে হইয়াছে। ব্রহ্মানন্দ কেশবের সঙ্গে সেইখানে তাঁর হঠাৎ দেখা। সেই উৎসবের উপদেশটিও অপূর্ব। এবার আর ধ্যানযোগের কথা নয়, প্রেম-যোগের কথা। শুধু প্রেম নয়, সৌন্দর্য-সম্ভোগের কথা। সৌন্দর্য যে ভগবানের

প্রেমেরই সৃষ্টি, সেই কথাটি এই উপদেশের ভিতর এবার ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিতেছেন—"তাঁহার সেই সৌন্দর্যের ছায়া প্রভাকর সুধাকর; সেই সৌন্দর্যের ছায়া প্রস্ফুটিত পুষ্পকানন; সেই সৌন্দর্যের ছায়া সরোবরের শতদল পদ্ম; সেই সৌন্দর্যের ছায়া এখানকার রূপযৌবনলাবণ্য। সেই সৌন্দর্যে যিনি প্রেম স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার প্রেম কখনই শুষ্ক হয় না।" "তাঁহার সেই প্রেমরূপ যে ভাগ্যবান ব্যক্তি দেখিয়াছেন, তিনি তাঁহার প্রেমে নিয়তই মগ্ন রহিয়াছেন।" এও যে কবি হাফেজের কথা। হাফেজ বলেন, ভগবান জগতের সমস্ত সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া আসিয়া ভক্তের মনকে কাড়িয়া লন। হাফেজ গাহিতেছেন—"আমার চিত্তহারী সখা আমারই জন্য নিত্যসরস ও নিত্যনবীন নানা শোভা, নানা বেশ, নানা বর্ণ ও নানা গন্ধ বিস্তার করিতেছেন।" "ওহে সুন্দর, সুন্দর চন্দ্রমার যে দীপ্তি তাহা তোমারি উজ্জ্বল মুখের দীপ্তি; জগতে যাহা কিছু সুন্দর, তোমার মুখশোভাই তাহার সৌন্দর্যের উৎস।"

১৮৭৭ সালে কতক সময় শান্তিনিকেতনে নির্জনে কাটাইয়া, হঠাৎ এই বছরের শেষে দেবেন্দ্রনাথ চীন ভ্রমণে বাহির হইয়া যান। তাঁহার সঙ্গে যান তাঁহার বড়ো জামাই, বাবু সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। এই চীন ভ্রমণের কোনো বৃত্তান্ত জানিবার উপায় নাই— এ সময়কার কোনো চিঠিপত্র নাই। ১৮৭৮ সালের গোড়ায় তিনি ফিরিয়া আসেন। চীন হইতে নানা রকমের অদ্ভুত জিনিস তিনি সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তাহার কতক কেশববাবুকে উপহার পাঠাইয়া দেন—এইটুকু মাত্র চীন ভ্রমণের খবর জানা যায়। আমার বিশ্বাস এই চীনে যাওয়া কেবলমাত্র সমুদ্রে বেড়াইবার জন্য যাওয়া। অনেক কাল পর্যন্ত পাহাড়ে থাকিবার জন্য সমুদ্র তাঁহাকে ডাকিতেছিল। লীলা ডাকিতেছিল ধ্যানকে; গতি ডাকিতেছিল ধৃতিকে। একবার সেই অনন্তের লীলাকে, অনন্তের অন্তহীন গতিকে দেখিবার জন্য তাঁহার মন ছট্‌ফট্ করিতেছিল। প্রান্তরের ধ্যানাসন ছাড়িয়া তিনি তাই একেবারে জাহাজে চড়িয়া ছুটিলেন চীনে। চীনের সভ্যতা বা ইতিহাস তাঁহার মনকে টানে নাই। এ যাত্রা শুধুই সমুদ্রযাত্রা। শুধু "Ocean's poem" সমুদ্রের মহাকাব্য শুনিবার জন্য যাত্রা।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী -প্রণীত 'মহর্ষির কর্মজীবন' বইটিতে আছে: "হংকং পঁহুছিয়া তথা হইতে ক্যাণ্টনে যাইয়া সেখানকার ধর্মমন্দির প্রভৃতি দর্শন ও মন্দিরস্থ ধর্মযাজকগণের সহিত ধর্মালাপ করিয়াছিলেন। তথাকার দৃশ্য-বর্ণনা এই—'এখানে পাপীদিগকে ভয়প্রদর্শন করিবার জন্য নরকযন্ত্রণা-ভোগের বিবিধ

মৃৎমূর্তি স্থাপিত রহিয়াছে। কোথাও ভয়ংকর ব্যাঘ্র মনুষ্যের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া রক্তপান করিতেছে, কোথাও-বা কেহ কৃমিকীট দ্বারা অর্ধ-ভক্ষিত দেহে ছটফট করিতেছে, কেহ অগ্নিতে দগ্ধ, কেহ-বা বিষে জর্জরিত। অন্য কতবিধ ভয়ংকর দৃশ্য রহিয়াছে তাহা দেখিলে মনে সহসা ভয়ের সঞ্চার হয়।" এই বর্ণনা হইতে কোনো মতেই মনে হয় না যে, তিনি চীনদেশের ধর্মসম্বন্ধে যথার্থভাবে খোঁজখবর লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন— কংফুচির ধর্ম বা "তাও" ধর্ম সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কিছুই জানিতেন না। চীনদেশের শিল্পও খুব আশ্চর্য; কিন্তু তাহার নিদর্শন নিঃসন্দেহ ক্যাণ্টনে তিনি পান নাই। চীনে নিতান্ত নিম্নস্তরের ধর্ম ও ধর্মমন্দির তিনি দেখিয়া থাকিবেন; সে-সকলের দ্বারা চীনের সভ্যতার কোনো বিচার হয় না। যেমন আমাদের দেশের কোনো সাধারণ মন্দির বা পূজারী ব্রাহ্মণকে দেখিয়া আমাদের দেশের সভ্যতার বিচার হইতে পারে না।

চীন হইতে ফিরিবার পর ১৮৭৮ সালের অধিকাংশ সময়ই তিনি শান্তিনিকেতন আশ্রমে নির্জনে বাস করেন। এই ১৮৭৮ সালেই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বিচ্ছিন্ন হয়। সেই নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগসভায় দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার সহানুভূতি জানাইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগীদিগকে এক চিঠি লিখিয়া পাঠান এবং তাঁহার সেই আশীর্বাদ-লিপি প্রথম পড়া হয়। ইহার পর হইতে আনন্দমোহন বসু, উমেশচন্দ্র দত্ত, শিবচন্দ্র দেব, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রধানগণ দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ ভক্ত ও অনুরক্ত হইয়া দাঁড়ান। শেষবয়সে ইঁহাদেরি সঙ্গে তাঁহার অন্তরঙ্গ যোগ হয়।

বোধ হয় ১৮৭৮ সালের শেষাশেষি সময়ে পরলোকগত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। দেবেন্দ্রনাথ তখন নদীপথে বজরায় করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে সাহেবগঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হন। সেই সময়ে প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের উপরে দেবেন্দ্রনাথের এমনি স্নেহ জন্মিল যে, তিনি তাঁহার সংসার প্রতিপালনের সমস্ত ভার নিজে লইয়া তাঁহাকে আপনার অনুচর করিয়া সঙ্গে লইলেন।

কিছুকাল শান্তিনিকেতনে থাকিয়া তার পরে ফরাসডাঙার গঙ্গাতীরে দেবেন্দ্রনাথ গেলেন। গ্রীষ্মকাল আসিলে সেখান হইতে তিনি দার্জিলিঙে যাইবার জন্য ইচ্ছা করিলেন। ১৮৭৯ সালেই তিনি দার্জিলিং পাহাড়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ৫ই আষাঢ় দার্জিলিং হইতে তিনি লিখিতেছেন— "আজ

যেমন এখানকার শোভা দেখিলাম এমন এখানে আসিয়া অবধি একদিনও দেখি নি। প্রাতঃকাল হইতে ক্রমে ক্রমে বাষ্পের আবরণ চলিয়া গিয়া প্রকৃতির অনাবৃত সৌন্দর্য দশদিকে বিকীর্ণ হইল। সূর্যের কিরণ পাইয়া পর্বত সকল বিচিত্রবর্ণ ধারণ করিল।” প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—“এখানে অবস্থানকালে প্রত্যহ প্রাতে উপাসনান্তে দুগ্ধ পান করিয়া লোহার ফলা লাগান একটা মোটা বেতের যষ্টি হস্তে করিয়া পর্বত ভ্রমণে বহির্গত হইতেন এবং পর্বতের শিখর কন্দর সমস্ত ভ্রমণ করিয়া বৃক্ষ, লতা, ফুল, পত্রের সহিত কত কি আলাপ করিয়া আনন্দ মনে গৃহে ফিরিতেন। গৃহে আসিয়া আমাকে পারস্য-গ্রন্থ দেওয়ান-হাফেজ পড়াইতেন। আহারান্তে কঠাদি উপনিষৎ পড়াইতেন।”

দার্জিলিঙে থাকিবার সময়ে এবং তাঁহার এই পরিব্রাজক জীবনে, মধ্যে মধ্যে যে বাহিরের জগতের নানা বিরোধ-আন্দোলনের ঝঞ্ঝাবাতের শব্দ তাঁহার কানে পৌঁছিত না তাহা নয়। ব্রাহ্মসমাজের ভিন্ন ভিন্ন শাখার মধ্যে তখন কতগুলি বড়ো বড়ো প্রশ্ন লইয়া কাগজপত্রে বাদপ্রতিবাদ চলিতেছিল— ১. ব্রাহ্মধর্ম সকল দেশের সকল শাস্ত্র হইতে সার সত্য সকল গ্রহণ করিয়া “সার্বভৌমিক” হইবে, না বেদবেদান্তে বদ্ধ থাকিয়া হিন্দুধর্মেরই একটা সংশোধিত সংস্করণ হইয়া থাকিবে; ২. ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠানে (constitution) সকলের সমান অধিকার থাকা বাঞ্ছনীয় কিনা এবং এই প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থা আদি-ব্রাহ্মসমাজে ছিল না বলিয়াই আদিব্রাহ্মসমাজ ক্রমশ পিছাইয়াছে কিনা; ৩. রেজেস্টারী বিবাহ নিরীশ্বর বিবাহ কিনা— ধর্মবিবাহ ও চুক্তির বিবাহ একসঙ্গে মিলিতে পারে কিনা; ৪. কেশববাবুর ও তাঁহার সমাজের খৃস্ট-ভক্তি ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে সংগত হইতে পারে কিনা। এ-সকল প্রশ্ন সম্বন্ধে দেবেন্দ্র-নাথের মনের ভাব কি তাহা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। তবে এ বয়সেও এ-সকল বাদপ্রতিবাদে যে তাঁহার ঔৎসুক্য ছিল তাঁহার এ-সময়কার চিঠিপত্র হইতে তাহা বেশ দেখা যায়। সুতরাং তাঁহার শেষবয়সে সামাজিক জীবন যে একেবারে ছিল না তাহা বলা যায় না। পরিব্রাজক জীবনে থাকিয়া গৃহ-পরিবারের সঙ্গে জনসমাজের সঙ্গে যতখানি যোগ রাখা সম্ভব, ততখানি যোগ তিনি শেষ পর্যন্ত রাখিয়াছিলেন। এ নয় যে তিনি নিজের ভজন-সাধনায় এমনি তন্ময় হইয়াছিলেন যে বাহিরের জগতে কী হইতেছে না হইতেছে সে সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন ছিলেন। ইংরাজীতে Quietism বলিলে যাহা বুঝায়, তাঁহার শান্তিনিকেতনের জীবনের শান্তিনিষ্ঠায় সেই ঔদাসীন্য কোনো কালেই ছিল না।

দার্জিলিঙে ১৮৭৯ সালটা প্রায় কাটাইয়া তিনি দার্জিলিং ছাড়িয়া মসূরী পাহাড়ের দিকে যাত্রা করিলেন। দার্জিলিং হইতে দামুকদিয়া ঘাট পর্যন্ত আসিয়া সেখানে বজরায় উঠিলেন ও বজরায় করিয়া কানপুরে গিয়া সেখানে কিছুদিন বিশ্রাম করিলেন। জলপথে ভ্রমণের সময় তাঁহার নিয়ম ছিল এই যে, তিনি প্রতিদিন প্রাতে উপাসনার পরে দুধ পান করিয়া নদীর তীরে তীরে হাঁটিয়া বেড়াইতেন এবং তার পরে বজরায় উঠিতেন। এমনি করিয়া ধীরে ধীরে যাইতে যাইতে ১৮৮১ খৃস্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ মসূরী পাহাড়ে যান। সেখানে তিনি কি ভাবে দিন কাটাইতেন তাহা প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের বিবরণ হইতে কতক জানা যায়। তিনি লিখিতেছেন যে, রাত্রে ঘুম হইতে উঠিয়া শয্যায় বসিয়া দেবেন্দ্রনাথ আরাধনা করিতেন। শাস্ত্রী মহাশয় ঘুমাইয়া আছেন, দেবেন্দ্রনাথের আবেগপূর্ণ হাফেজের বয়েদের আবৃত্তি তাঁহার ঘুম ভাঙাইয়া দিত। দেবেন্দ্রনাথ ঐ যে জাগিতেন, আর ঘুমাইতেন না। ভোর না হইতেই বাহিরে এমন জায়গায় গিয়া বসিতেন যেখান হইতে সূর্যোদয় দেখা যায়। হিমালয়ের সেই প্রচণ্ড শীতে শীতবস্ত্র মুড়ি দিয়া বসিয়া সেই প্রাতঃসূর্যের উদয় দেখিতেছেন। তার পর উপাসনা। উপাসনার পর দুধ পান করিয়া তিনি ভ্রমণে বাহির হইতেন। বেড়াইয়া আসিয়া কোনো গাছের তলায় ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন আছেন। দুপুরের সময় স্নান ও আহার করিয়া এক জায়গায় গিয়া বসিতেন এবং শোবার আগে পর্যন্ত একাসনে সেইখানে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন। হঠাৎ যখন ধ্যানের মধ্যে তাঁহার ভিতরকার অধ্যাত্ম আনন্দের স্ফূর্তি হইত, তখন গদ্গদ কণ্ঠে হাফেজের কবিতা বা উপনিষদ্ আবৃত্তির দ্বারা তাহা প্রকাশ করিতেন।

পঞ্জাবের দেবসমাজের সংস্থাপক শ্রীমৎ সত্যানন্দ অগ্নিহোত্রী কিছুকাল দেবেন্দ্রনাথের এই আশ্রমে থাকিয়া তাঁহার পত্রিকায় "স্বর্গীয় দৃশ্য" নামে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি যে স্বর্গীয় ছবির বর্ণনা করিয়াছিলেন, সে এই ধ্যানাসনে উপবিষ্ট দেবেন্দ্রনাথের ছবি।

দেবেন্দ্রনাথের মসূরী-দেহরাদুন জীবনের একটি সুন্দর বিবরণ আমি তাঁহার ভক্ত ও অনুরাগী শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ মহাশয়ের কাছে পাইয়াছি। কালী-মোহনবাবু দেহরাদুন-মসূরীতে সর্বে আফিসে কম্পিউটারের কাজ করিতেন। সেই কাজে তাঁহার বিশেষ উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়া তিনি লাট রিপনের কাছেও সম্মানিত হইয়াছিলেন। কালীমোহনবাবুর বড়ো ভাই গোপীমোহন-বাবুকে দেবেন্দ্রনাথ জানিতেন ও স্নেহ করিতেন। ১৮৭৫ সালে তিনি রাজনারায়ণ-

বাবুকে পত্র লিখিতেছেন "দেরাদুনে যাইবার জন্য গোপীমোহন ঘোষের দুই আহ্বান-পত্র আমি পাইয়াছি, আমার চলাবলার কিছুই ঠিকানা নাই।" মসুরীতে আসিতে কালীমোহনবাবুর সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় এবং প্রায় চার বছর কাল কালীমোহনবাবু তাঁহার সঙ্গ লাভ করেন। সুতরাং তাঁহার বিবরণ আমার ভাষায় না দিয়া তাঁহার নিজের কথায় পাঠকদিগের কাছে দিলে তাহা তাঁহাদের আরো ভালো লাগিবে। তাঁহার বিবরণটি তাই নীচে উদ্ধৃত করিতেছি:

"১৮৮১ খৃস্টাব্দে ফেব্রুয়ারী কি মার্চ মাসে এক সপ্তাহ দেরাদুনে বিশ্রাম করিয়া তিনি মশুরী পর্বতে উঠেন। আমার ছুটীর একমাস মাত্র বাকী, এই দিনগুলি যেন আর ফুরায় না। মশুরী পর্বতে গেলেই মহর্ষির দর্শন হইবে এই আনন্দে আর এইবার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব ছাড়িয়া যাইতে মনে তেমন কষ্ট হইল না। প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে সার্ভে আফিস সহ আমাকেও মশুরী যাইতে হইত। এইবার বিদায়ান্তে দেরাদুন পৌঁছিয়া দুই দিন পরই মশুরী গেলাম।

"পরদিন মহর্ষির শ্রীচরণ দর্শন লাভে, আমার বহুদিনের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে ভাবিয়া মহানন্দে রাত্র কাটাইলাম। আমি যে সেদিন যাইব পূর্বে জ্ঞাত থাকার দরুন গৃহ-প্রাঙ্গণে প্রবেশ মাত্র শ্রদ্ধেয় প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় সহাস্যে দৌড়িয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনিই কি কালীমোহন ঘোষ? আজ্ঞা হাঁ, বলিতেই প্রেমালিঙ্গনে ধরিয়া কহিলেন, আসুন, আপনি যে আজ আসিবেন আমরা জানি। মহর্ষি আপনার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। তিনি আমাকে ধরিয়া মহর্ষির নিকটে গিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে কহিলেন, কালীমোহন বাবু আসিয়াছেন। মহর্ষিদেব তখন একখানি আরাম-চৌকিতে বসিয়াছিলেন। শুনিয়াই, কে কালীমোহন বাবু আসিয়াছেন, বলিয়া দাঁড়াইলেন। আমি তাঁহার পদতলে পড়িয়া প্রণাম করিয়া পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া জীবন পবিত্র ও সার্থক করিলাম। তিনি আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া ৩।৪ মিনিট আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন। ঐ সময় কি এক অলৌকিক ভাবে আমার সমস্ত অঙ্গ শীতল ও জীবন পবিত্র হইতেছে অনুভব করিলাম।

"সম্মুখে একটা চেয়ারে আমাকে বসাইয়া তিনি বসিয়া শাস্ত্রী মহাশয়কে কহিলেন, কালীমোহন বাবু আসিয়াছেন, এখানকার ভাবাভাব সব জ্ঞাত আছেন, এখন আমাদের আর চিন্তা কিসের? আমাকে বলিলেন, তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্রে স্থানের মাহাত্ম্য এবং বিশেষ তোমাদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার এমনই আকর্ষণ

যে, এবার এখানে না আসিয়া পারিলাম না। আমি একাগ্রচিত্তে তাঁহার দেবমূর্ত্তি নিরীক্ষণ এবং অনন্যমনা হইয়া তাঁহার দেববাণী প্রায় একঘণ্টা শ্রবণান্তে সেদিনকার মত বিদায় লইয়া প্রণাম করিয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম। সেই স্বর্গীয় সুখ-ভোগ ছাড়িয়া কি আসিতে ইচ্ছা হয়? এই প্রথমবারে তাঁহার অবস্থানের জন্য যে বাড়ী ভাড়া হইয়াছিল, আমাদের সার্ভে আফিস হইতে তাহা বেশি দূরে নয়। আফিস ও মানমন্দির একটি অতি উচ্চ চূড়ার উপরে। আমরা সেইখানেই থাকিতাম।

"পাহাড়ের উৎরাই চড়াই ভাঙিতে যাহাদের অভ্যাস হইয়াছে, তাহারা জানে প্রথমে হাঁটিয়া চলায় কেমন ক্লেশ। গ্রীষ্মকালের দিন বড়, এখান হইতেও বড়। মহর্ষিদেব প্রথম বৎসর প্রাতে হাঁটিয়াই বেড়াইয়াছেন। আমি অপরাহ্ণ চারিটায় আফিস বন্ধ হইলে পর আধ ঘণ্টার মধ্যে আহার করিয়া প্রায় প্রত্যহ ৫টায় মহর্ষির কাছে উপস্থিত হইয়া তাঁহার আদেশমতে ইংরাজী দর্শন, বিশেষ Hegel-কৃত গ্রন্থ পাঠ করিতাম। তিনি তাহার ব্যাখ্যা করিতেন এবং উপনিষদ্ হইতে parallel passage উদ্ধৃত করিয়া আমাকে বুঝাইতেন। এক কি দুই পৃষ্ঠার বেশি পাঠ হইত না। কোন কোন দিন অর্ধপৃষ্ঠাও পড়া হইয়াছে, ইহাতেই একঘণ্টা অতিবাহিত হইত।

"এক দিবস ঐরূপ পাঠের সময় দেখি বিরক্তভাবে মহর্ষি নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া হুঁ হুঁ করিতেছেন; ইহার কারণ আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তখন শাস্ত্রী মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে কহিলেন, শাস্ত্রী, দেখ কোথা হইতে পাতা পোড়ার দুর্গন্ধ আসিতেছে। আমরা কিন্তু সে গন্ধ কিছুই পাইতেছি না। শাস্ত্রী মহাশয় তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া ঘরের বাহির হইয়া নীচের দিকে ছুটিলেন; কিছুদূর যাইয়া তিনিও গন্ধ পাইয়া আরও ১৫০।২০০ হাত নীচে যাইয়া দেখেন একপ্রকার গাছের পাতার আঁশে চকমকি দিয়া আগুন জ্বালাইয়া পাহাড়িরা পাতার পুরায় তামাক সাজিয়া খাইতেছে। সেই পাতা পুড়িয়া গন্ধ বাহির হইতেছে। তিনি পাহাড়িদিগকে ওখানে বসিয়া তামাক খাইতে নিষেধ করিয়া আসিলেন; পরে আর গন্ধ রহিল না। তখন মহর্ষি মহাশয় কহিলেন, কালীমোহন, আমার দুই ইন্দ্রিয়ের (চক্ষু ও কর্ণের) শক্তির হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে আর তিন ইন্দ্রিয়ের (নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্) শক্তি বৃদ্ধি হইতেছে। ইহার পরের বৎসর যখন তিনি 'The Priory' নামক ভবনে বাস করিতেছেন, শাস্ত্রী মহাশয় আমাকে একদিন বলিলেন, গতকল্য দুগ্ধ

(গৃহে খইল, ভুষী, বুট, গুড় খাওয়ান অতি যত্নে পালিত গরুর দুধ) খাইয়া মহর্ষি আমাকে বলিয়াছেন যে, শাস্ত্রী, আজিকার দুগ্ধে কেমন একটা স্বাদ ও গন্ধ পাইলাম। রাখালকে জিজ্ঞাসা কর গরু কোথায় চরাইয়া ঘাস খাওয়াইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় রাখালকে সঙ্গে করিয়া যে যে স্থানে গরু বাঁধিয়া ও ধরিয়া ঘাস খাওয়াইয়াছিল তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া সেখানকার দুই তিন রকমের গন্ধ-বিশিষ্ট ঘাস আনিয়া মহর্ষিকে দেখাইলেন। তিনি তৎসমুদয় ঘ্রাণ লইয়া তাহার মধ্য হইতে এক রকম ঘাস দেখাইয়া বলিলেন যে, এই ঘাস খাইয়াছে।

"দেরাদুনে মহর্ষির আশ্রম হইতে নালাপানী প্রায় দুই মাইল ব্যবধান। সেখানকার ঝরণার জল অতি বিখ্যাত স্বাস্থ্যকর। সেখান হইতে প্রত্যহ জল আনাইয়া আট কলসি জলে মহর্ষির স্নান হইত। দৈবাৎ একদিন এক কলসি জল কম হওয়ায় ভৃত্য অন্য জল তাহাতে মিশাইয়া স্নানের নিমিত্ত আট কলসি পূর্ণ করিয়া রাখে। সেই জল মাথায় ঢালা মাত্র একটু কাঁপিয়া শাস্ত্রী মহাশয়কে ডাকিয়া বলিলেন, দেখ শাস্ত্রী, বোধ হয় অদ্যকার স্নানের জলে কৃত্রিমতা আছে। সব জল নালাপানীর নয়। জলবাহককে জিজ্ঞাসা করা মাত্রই সে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে স্বীকার করিল যে জল কম হওয়াতে এক ঘড়া নহরের জল মিশান হইয়াছে। ভৃত্যদের বিশ্বাস মহর্ষি সিদ্ধ পুরুষ, মিথ্যা কহিলে নিস্তার নাই। মহর্ষি যে একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, তাঁহার তিন ইন্দ্রিয়— নাসিকা, জিহ্বা, এবং ত্বকের শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা ঠিকই।

"দেরাদুন হইতে নামিয়া আসার পূর্বে মশুরী পর্বতে অবস্থান কালে মহর্ষির ডান হাঁটুর ৩।৪ আঙ্গুল নীচে একটা ফোট হয়। তত্রস্থ সিভিল সার্জন ডাক্তার গ্রিগরি সাহেব অস্ত্র করেন। প্রত্যহ প্রায় দুইবার আসিয়া ঘা পরিষ্কার করিয়া মলম লাগাইয়া তাঁহার নিয়মিত ১৬৲ টাকার ভিজিট লইয়া চলিয়া যান। এই ভাবে প্রায় দুই মাস চিকিৎসাতেও ঘা শুকাইতেছে না, একটু উপশমের দিকেও আসিল না দেখিয়া সকলেরই চিন্তা হইল। একদিন বৈকালে আমি মহর্ষির নিকট উপস্থিত থাকার কালে ডাক্তার সাহেব আসিয়া ঘা পরিষ্কার করেন। চিম্‌টা দিয়া ঘায়ের পচা মাংসগুলি বাহির করিতেছে দেখিয়া আমার সর্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, মুখ ফিরাইলাম, ভয়ে আর সে দিকে চাহিতে পারিলাম না। তখন মহর্ষি মহাশয় আমার দিকে দৃষ্টি করিয়া একটু হাসিলেন। ডাক্তার সাহেব চলিয়া গেলে পর জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি অমন করিলে কেন? ভয় হইয়াছিল নাকি? আমি বলিলাম, আজ্ঞা হাঁ, ভয় ও আশ্চর্য দুইই। চিম্‌টা

দিয়া মাংসগুলি টানিয়া বাহির করিতেছে, কিন্তু আপনার মুখের ভাব একটুও ব্যতিক্রম হইতেছে না; আপনাতে সকলই সম্ভব। তিনি বলিলেন, তবে কি তুমি ভাবিয়াছিলে ছেলেদের মত আমি কাঁদিব? আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

"একদিন তিনি আমাকে মনোযোগের সহিত পড়াইতেছেন, তখন শাস্ত্রী মহাশয় একটা টেলিগ্রাম আনিয়া তাঁহার সম্মুখে মেজের উপর রাখিয়া গেলেন; টেলিগ্রাম খুলিয়া পড়িবেন ভাবিয়া আমি একটু থামিলাম। তিনি কহিলেন, থামিলে যে! পড়। অর্দ্ধঘণ্টায় পাঠ শেষ হইলে পর তিনি টেলিগ্রাম খুলিয়া পড়িলেন এবং শাস্ত্রী মহাশয়কে ডাকিয়া হাতে দিলেন। যেন কিছু নয়, এইরূপে পূর্ব্বের ন্যায় আমাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। ঐ টেলিগ্রামে তাঁহার অতি স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃত্যুসংবাদ ছিল।

"ঘা শুকাইতেছে না, দিন দিন দুর্ব্বল হইতেছেন, বরং বাঁ পায়ে আর একটা ঘা হইতেছে, কতদিন হইতে হাঁটিয়া বেড়াইতে পারেন না দেখিয়া আমি নিবেদিলাম এখানে আর বিলম্ব করা শ্রেয়ঃ নয়। এখানকার ডাক্তার সাহেব তো এত দীর্ঘকাল চিকিৎসা করিয়াও ঘায়ের কিছুই করিতে পারিতেছেন না, কেবল ভিজিট নিতেছেন। শুনিয়াছি অনেক দুষ্ট লোভী চিকিৎসক ইচ্ছা করিয়াই রোগ শীঘ্র আরোগ্য করিবার চেষ্টা করে না। ইনিও যে সে প্রকৃতির লোক নহেন কে বলিতে পারে? দেরাদুনের সিভিল সার্জ্জন মেক্‌লারেন সাহেব (যাঁহাকে প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় এবং ভবসিন্ধু বাবু জার্মান ভাবিয়াছেন; বাস্তবিক তিনি স্কটলণ্ডবাসী, সে যাহা হউক যে দেশবাসী হউন না কেন) অতি বিচক্ষণ দয়ালু ডাক্তার। তাঁহার চিকিৎসায় বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুর অতি কঠিন বহুপ্রকার রোগ হইতে মুক্তি পাইয়াছেন। তিনি বলেন, এমন সুচিকিৎসক কোথাও দেখেন নাই। তখনই শাস্ত্রী মহাশয়কে ডাকিয়া কহিলেন, শোন কালীমোহন কি বলিতেছেন। অদ্যই তুমি দেরাদুনে যাইয়া বাড়ী ঠিক করিয়া আসিয়া যাহাতে আগামী শনিবার দেরাদুনে নামিতে পারি তাহার বন্দোবস্তের চেষ্টা কর; কালীমোহনও শুক্রবার দেরাদুনে যাইবেন। (আমাদের আফিস সপ্তাহে পাঁচ দিন হইয়া শনি ও রবিবার দুইদিন বন্ধ থাকে, তাই সাধারণতঃ পক্ষান্ত শুক্রবার আফিসের পর দেরাদুনে নামিয়া পরিবার সহ দুইদিন থাকিয়া সোমবার প্রত্যূষে মন্সুরী যাইয়া আফিস করি)।

"মহর্ষিদেব শনিবার দেরাদুনে নামিলেন। রবিবার প্রাতে ডাক্তার মেক্‌লারেন সাহেব আসিয়া প্রথমে ডান পায়ের স্ফোট না দেখিয়া বাঁ পা পরীক্ষা করিয়া

বলিলেন, রক্ত সঞ্চালন ভাল হয় না তাই ঘা শুকাইতেছে না। পা ও শরীরের নানা স্থান টিপিয়া দেখাইলেন ; শীঘ্র সে স্থানে রক্ত আসিয়া পূর্ববৎ হইতেছে না। বলিলেন, কেবল ঘায়ের চিকিৎসা করিলে ঘা ত শুকাইতই না, মাসেক পর জীবনের আশাও ছাড়িতে হইত। যাহা হউক কোন চিন্তা নাই, অর্ধহাত পাশ, ৮।১০ হাত লম্বা ভাল ফ্লানেলের দ্বারা ব্যাণ্ডেজ বান্ধিতে হইবে। ঘরেই ফ্লানেল ছিল বাজারে যাইতে হইল না। ফ্লানেল লাগিয়া না থাকে এই জন্য ঐ ঘায়ের উপরে কি একটু মলম দিয়া, আঙ্গুল হইতে উরু পর্যন্ত দুই পায়েই ব্যাণ্ডেজ বান্ধিলেন। মহর্ষির জামাতা বাবু জানকীনাথ ঘোষাল মহাশয় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাকে এবং শাস্ত্রী মহাশয়কে বলিলেন কিরূপে ব্যাণ্ডেজ বান্ধিলাম দেখিলে তো, কালও আমি আসিয়া বান্ধিব, পরে তোমরাই বান্ধিতে পারিবে, আমার আর প্রত্যহ আসিবার দরকার হইবে না। আবশ্যক মত খবর দিলে আসিব। প্রাতে বিকালে দুইবার মাত্র ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা করিলেন এবং কি আহার ও কিরূপে বসিতে হইবে উপদেশ দিয়া উঠিলেন। তখন ১৬৲ ভিজিট দিয়া মহর্ষির আদেশ মতে আমরা কহিলাম, মহর্ষির ইচ্ছা ব্যারাম আরোগ্য করিয়া দিবার জন্য একটা ফুরণ করিয়া লইলে ভাল হয়। ডাক্তার সাহেব হাসিয়া উত্তর করিলেন—তা ত ভালই, প্রয়োজন বোধে সর্বদা আসিয়া দেখিতে লজ্জা হইবে না। আমাকে দুই শত টাকা দিবেন। মহর্ষি আনন্দিত হইয়া তখনই দুই শত টাকার চেক দিলেন। ১৫ দিনের মধ্যেই রীতিমত রক্ত সঞ্চালিত হইয়া, দেড় কি দুই মাসেই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেন। সন্তুষ্ট হইয়া তখন আরো দুই শত টাকা দিয়াছিলেন। তাঁহার ও আমাদের একটা মহা চিন্তা দূর হইল।

"এক মাসের পূর্বেই আফিস সহ আমিও দেরাদুনে নামিয়া আসিলাম। এইবার আমার সোনায় সোহাগা। মহর্ষির অবস্থানের জন্য যে বাড়ীভাড়া করা হইয়াছে, তাহার অতি সন্নিকটেই আমাদের বাড়ী। ভগবানের কৃপায় আমার সুবিধা ও সুযোগ উভয়ই হইল। এই ছয় মাস দিবা কি রাত্রি প্রতিদিন যখন ইচ্ছা যাইয়া মহাপুরুষের পাদপদ্ম দর্শন করিতে পারিব।

"আফিসের পর প্রায় প্রতিদিন মহর্ষির কাছে যাইয়া ৫টা হইতে ৭টা দুই ঘণ্টা তাঁহার উপদেশ শ্রবণ ও নানারূপ শিক্ষাপ্রদ কথোপকথনে স্বর্গ-সুখ ভোগ করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছি। এই সময়ে প্রতি রবিবার প্রাতে তিনি আমাদের বাড়ীতে আসিয়া সামাজিক উপাসনা করিতেন। তাঁহার আদেশ মতে আমরা

সকলে 'ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎকারণায় নমস্তে চিতে সর্ব লোকাশ্রয়ায়' স্তোত্র মুখস্থ করিয়াছিলাম। তিনি উপস্থিত হওয়া মাত্র দণ্ডায়মান হইয়া সকলে উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিতাম। তিনিও দাঁড়াইয়া 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে' শ্লোক পড়িয়া সংক্ষেপে তাহার ব্যাখ্যা ও উপদেশ এবং প্রার্থনা করিয়া তাঁহার নির্দিষ্ট চেয়ারে বসিলে পর আমরা সকলে ঢালা বিছানায় বসিতাম। তখন গোপাল বাবু তাঁহার স্বাভাবিক মিষ্টস্বরে একটি ব্রহ্মসঙ্গীত করিতেন।

"তাঁহার আশ্রমে যতবার আহার করিয়াছি, টেবিলের উপর খাদ্যসামগ্রী সজ্জিত থাকিত, স্বহস্তে তিনি পরিবেষণ করিয়া খাওয়াইতেন, ইহাতে তাঁহার বড় আনন্দ হইত। একজন চা-কর সাহেবের অনুরোধে তিনি চা বাগান দেখিতে যান, সঙ্গে আমি ও আমার বন্ধুবর বরিশালনিবাসী কালীকুমার চট্টোপাধ্যায় কম্পিটার। বাগান ও নানা প্রকার চা-প্রস্তুতপ্রণালী সকল দেখিয়া তাঁহার আশ্রমে ফিরিলাম। তিনি বলিলেন, তোমাদের পরিশ্রম হইয়াছে, কিছু ফল খাইয়া বাড়ী যাও। অমনি ভৃত্য অতি উৎকৃষ্ট ৮।১০টা আপেল আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া গেল। তিনি নিজ হাতে ছুরি দিয়া ফল কাটিয়া আমাদিগকে খাইতে দিতে লাগিলেন।

"এইবার মহর্ষিদেব আমার চতুর্থ পুত্রের বিমলভূষণ নাম রাখিয়া তাহার অন্নপ্রাশন করেন। কেমন করিয়া বিছানা করিতে হইবে, কোন্ দিকে তাঁহার বেদী থাকিবে, মুখে যে অন্ন দিবে তাহার বিশেষ ও পৃথক্ স্থান চাই এবং তাহা বেদীর কোন্ পার্শ্বে হইবে, কোন্‌দিকে গায়কেরা বসিবে, পিতা-মাতার বসিবারও বিশেষ স্থান এবং নিমন্ত্রিত লোকদের বসিবার স্থান বেদী হইতে কত দূরে হইবে ইত্যাদি তাঁহার আদেশানুযায়ী পছন্দ মত করা এক বিষম সমস্যা। আমাদের সাধ্যমত যথাসাধ্য ঠিক করিলাম। যথাসময়ে একখানা গরদের কাপড় পরিধানে তিনি আসিলেন। বিছানা তাঁহার উপদেশ ও আদেশমত হইয়াছে কিনা দেখিয়া কতক কতক পরিবর্তন করাইলেন। কার্যসমাপ্তে দেখি তাঁহার পরিধেয় ও বেদীর উপরের কাপড় রক্তে ভিজিয়া লাল হইয়াছে। তাঁহার অর্শরোগ ছিল। কার্যকালীন তাঁহার চেহারা দেখিয়া কেহই অনুমান করিতে পারে নাই যে তাঁহার বিন্দুমাত্র ক্লেশ হইতেছে। কি ধৈর্য! স্ফোট চিকিৎসায় আমার কিছু জ্ঞান ছিল, আর সকলেই অবাক্। প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় তখনই ঝাঁপানে তুলিয়া মহর্ষিকে আশ্রমে নিয়া গেলেন। তথায় পৌঁছিয়াই স্বহস্তে এক চিরকুট কাগজে যৌতুক লিখিয়া একটা মোহর পাঠাইয়া দিলেন।

"প্রতি বৎসর যতদিন দেরাতুনে ছিলেন অতি সমারোহে তিনি মাঘোৎসব করিতেন। সেদিন অতি উপাদেয় মণে মণে মতিচুরের লাড্ডু ঘরে প্রস্তুত করাইয়া বড় বড় হাঁড়ি ভরিয়া সকলের বাড়ী বাড়ী বিতরণ করিতেন। বাঙ্গালী ত কেহই বাকী থাকিত না। হিন্দুস্থানীয় তাঁহার ও আমাদের পরিচিত সকলের বাড়ীতেই পাঠান হইত।

"উৎসবের ৪।৫ দিন পূর্ব হইতে যে সব সঙ্গীত সংকীর্তন গীত হইবে, মহর্ষির সম্মুখে বসিয়া তাহার তালিম দেওয়া হইত, তাল মান স্বরের ব্যতিক্রম হওয়ার যো নাই; একটু এদিক্ ওদিক্ হইলে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিতেন এবং যে পর্যন্ত না তাল মান লয় সমস্ত ঠিক হইত, ছাড়িতেন না। কোন গানের অভ্যাস পাকা না হইলে সেই গানটি উৎসবের দিন গাইতে নিষেধ করিতেন। সৌন্দর্য ও সুশৃঙ্খলার প্রতি তাঁহার এমনি দৃষ্টি ছিল। কোন কাজই যেমন-তেমন নির্বাহ হওয়া তিনি ভালবাসিতেন না।

"একবার মাঘোৎসবের দিন, উপাসনা আরম্ভের দুই তিন ঘণ্টা পুর্বে ব্যারাম এত বৃদ্ধি হইল যে, তিনি শয্যা হইতে উত্থানশক্তিরহিত। গৃহ সুসজ্জিত; রাংতা জড়ান শতাধিক কন্বীতে মোমবাতি জ্বালান হইয়াছে। লোকে গৃহ পুর্ণ, উৎসব আরম্ভ হইবে। আমরা সকলেই নিরাশ, গত্যন্তর না দেখিয়া প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ই কার্য সমাধা করিবেন স্থির হইল। তখন বিষণ্ণ হইয়া কার্যারম্ভের অনুমতি লইতে মহর্ষির নিকট গেলে তিনি বলিলেন, ঠিক সময় হইয়াছে, তোমরা সকলে আমাকে ধরিয়া লইয়া চল। তাহাই হইল। তিন জনে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে আনিয়া বেদীতে বসান হইল। ভগবানের কৃপা ও কাণ্ড দেখিয়া সকলেই আশ্চর্যান্বিত। সেদিন দ্বিগুণ তেজের সহিত উপাসনা ও বক্তৃতা হইল, তাঁহার উপদেশ শ্রবণে সকলেই মোহিত হইয়া ধন্য ধন্য করিয়া বলিতে লাগিল, অনুপ্রাণিত না হইলে এইভাবে উপাসনা ও উপদেশ দেওয়া সাধারণ মানবের পক্ষে অসম্ভব।

"মহর্ষি কেবল ধার্মিক ও দার্শনিক ছিলেন না। জ্যোতির্বিদ্যাদি বিজ্ঞানে ভগবানের মহিমা ও তত্ত্বজ্ঞান বর্ণিত আছে বলিয়া তিনি একজন বিজ্ঞানপিপাসু ছিলেন। আমাদের সার্ভে আফিসের কার্যের কথা শুনিতে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন। গেলেই জিজ্ঞাসা করিতেন, আজ তোমার আফিসের খবর কি? যখন যে কার্যে ব্যাপৃত থাকিতাম, নিবেদন করিলে প্রশ্ন করিয়া জানিতে চাহিতেন। কেমন করিয়া Stars, Moon observations, Latitude, Longi-

tude, Pendulum হইতে Gravity Actinometer দ্বারা Solar Energy, the motive-power of the Sun, Electro-telegraphic Longitude operation, Tide ও Spirit Levelling ইত্যাদি কার্য হয়, সে সকল কথা শুনিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইতেন। যেমন বিলাতের শিল্পীরা কাপড় প্রভৃতি নির্মাণার্থ ভারতবর্ষ হইতে পাট নেয়, তেমনই জ্যোতিবিদ্ ও বৈজ্ঞানিকেরা তাঁহাদের গ্রন্থরচনার্থ data বা মালমস্‌লা ভারতবর্ষীয় Survey Office হইতে লইয়া থাকেন ইত্যাদি কথাবার্তায়, আলোচনা সমালোচনায় কোন কোন দিন অতিবাহিত হইত। একদিন আমি ইচ্ছা করিয়াই তাঁহার শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম যে আমাদের আফিসের হাজার, দেড় হাজার দুই হাজার unknown quantitiesএর এক একটা Equationএর অঙ্ক সমাপ্ত করিতে ৫।৭ pairs of Computerএর দুই তিন বৎসর লাগে এবং তাহাতে ২।৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। ইহাতে আমার এই জ্ঞান হইয়াছে যে, পর্যবেক্ষণের ভ্রম বাহির করিবার নিমিত্ত সামান্য একটা geodesical problem solutionএতেই এই, তবে ত মঙ্গলময়ের রাজ্যের যে ত্রুটি অমঙ্গল প্রতীয়মান হইয়া থাকে সেই অসংখ্য uuknown quantities এর equation solve করিতে অনন্তকাল লাগিবেই। এত সমীকরণ (equation) সম্পাদনের পর প্রমাণের (verification) কালে দেখা যায়, হয়ত হাজার অনিশ্চিত ভুলের মধ্যে ৯৯৯ ঠিক বাহির হইয়াছে, একটি হয় নাই, তখন এই একটিকে ঠিক করিতে গণনায় কোথায় ভুল রহিয়াছে বাহির করিতে আবার ১০।২০ হাজার টাকা ব্যয় হয়, এমন কতবার ঘটিয়াছে। + আর − দুইটি মাত্র চিহ্ন ঐরূপ দশমিক বিন্দু। একই অঙ্ক দুইজনে কসিলেও ভ্রম হইতে পারে। লোকে যে বলে মরিলে টের পাইবে, ইহাও প্রায় তদ্রূপই। শুদ্ধ হইতেছে কিনা ২।৩ বৎসর পর প্রমাণে ধরা পড়িবে। ইহা ভাবিতে ভাবিতে আমি উন্মত্তপ্রায় ; নিয়মিত আহারনিদ্রারহিত। ভগবানের কৃপায় ২০।২১ দিন এইভাবে চিন্তার পর একটা প্রণালী বাহির হইল যে, এইরূপে সমীকরণ সম্পাদন করিলে আর এইপ্রকার ভুল থাকিবে না। আমাদের officer-in-charge হার্সেল সাহেবকে এই প্রণালীর বিষয় জানাইলে তিনি কহিলেন, "কালীমোহন আমি জানিতাম তোমার গণিতে মাথা আছে, কিন্তু একান্ত বোকার মত কি বলিতেছ; গণিতে যাহা অসম্ভব।" আমি চুপ করিয়া রহিলাম। তখন তিনি কহিলেন, তোমার প্রমাণ স্পষ্ট করিয়া আমাকে লিখিয়া দেও বাড়ী নিয়া দেখিব। দেখিয়া এত সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে, পরের দিন আফিসে আসিয়াই আমাকে বলিলেন, ইহা

তুমি কোথায় পাইলে? উত্তরে কহিলাম, ভগবান কর্তৃক আমার মাথার ভিতরে নিহিত ছিল, সকলেরই আছে, অনুসন্ধানে পাইয়াছি। শুনিয়া মহর্ষি মহাশয়ের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। আর একদিন তাঁহার শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম— একজন ঈশ্বরবিশ্বাসী ধার্মিক জ্যোতির্বিদের সহিত অতি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গণিতজ্ঞ জ্যোতির্বিদ্ লে প্লাশের কথোপকথন পাঠে আমি আর একটি মহাশিক্ষা পাইয়াছি যে, খোদার উপর খোদকারী চলে না।

"লে প্লাশ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভক্ত জ্যোতির্বিদ্, আমরা যখন একটি বালুকণা সৃষ্টি করিতে পারি না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। কিন্তু তুমি যে তাঁহাকে, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, দয়াময়, বলিতেছ তাহার প্রমাণ কি? দেখ ধার্মিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, কবি প্রভৃতি তুমি আমি সকলেই প্রতিদিন পুর্ণচন্দ্র দেখিতে ভালবাসি। দয়াময় সর্বশক্তিমান হইয়া তিনি কেন সকলের আকাঙ্ক্ষা পুর্ণ করিলেন না। ইহাতে আমার ঐ সকল গুণের প্রতি সন্দেহ হইতেছে। কেপ্‌লারের ৩য় সিদ্ধান্তানুসারে আমিও ত বলিতে পারি, চন্দ্রকে কোথায় রাখিলে প্রত্যহ পুর্ণিমা হইত। ঈশ্বরের মঙ্গলময়ত্বে দৃঢ় বিশ্বাসী ভক্ত জ্যোতির্বিদ্, ২৩ দিন পর্যন্ত চন্দ্রের উপযোগিতা সম্বন্ধে অনেক চিন্তার পর উত্তর দিলেন— এইক্ষণে যে স্থানে আছে তাহার ৫॥ সাড়ে পাঁচগুণ দূরে থাকিলে প্রতিদিন পুর্ণিমা হইত যথার্থ, কিন্তু আমরা ইহার আলো পাইতাম পনের ভাগের এক ভাগ, একটা বড় তারার মত দেখাইত, তখন আর ইহার কি মহত্ত্ব থাকিত? কে বা দেখিতে উৎসুক হইত। উদ্ভিদ্ রাজ্যে ইহার কোন উপকারিতা থাকিত না; জোয়ার ভাঁটায় নাবিকের সাহায্যও কিছুই হইত না।

"এইরূপ কথোপকথনে তিনি এতই আগ্রহ প্রকাশ ও আনন্দানুভব করিতেন যে আমি তাহা বর্ণনা করিতে অক্ষম। সকল বিদ্যাই তাঁহার কাছে পরাবিদ্যা ছিল। একদিন একটা শ্লোক আমার হাতে দিয়া কহিলেন, তুমি দেখ আমার ঠিক মুখস্থ হইয়াছে কি না, বলিয়া তিনি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তাঁহার বয়স তখন ৬৫। একবার একদিন যথা সময়ে তাঁহার নিকট না গিয়া তাহার পরের দিন গেলাম মাত্র তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কাল কি তোমার কোন অসুখ হইয়াছিল? আজ্ঞা না— Rev. Crogson সাহেবের বক্তৃতা শুনিতে Churchএ গিয়াছিলাম। ইহা শুনিয়া তাঁহার চেহারা অন্যরূপ, মাথার চুল খাড়া হইয়া উঠিল। (মনের বিরুদ্ধ ভাব শ্রবণে সময়ে সময়ে তাঁহার এইরূপ হয় জ্ঞাত ছিলাম, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আশ্চর্য হইলাম।) "যেখানে নরপুজা হয় সেই

স্থানে গিয়াছিলে ?" দুই তিন বার এই কথা উচ্চারণ করিলেন। নরপূজার বিরুদ্ধে তাঁহার মনের ভাব কিরূপ বুঝিতে আর বাকী রহিল না।

"লর্ড রিপন আমাদের আপিসে গিয়া আমার সহিত কথা কহিয়াছেন ও আমার প্রশংসা হইয়াছে শুনিয়া মহর্ষির কত আনন্দ। তিনি বলিলেন, গণিতে তোমার নবাবিষ্কৃত সিদ্ধান্ত সকল তোমার নামে মুদ্রিত হয় নাই, তাহার প্রতিকারের জন্য কেন আন্দোলন করিতেছ না। আমি বিনীত ভাবে অবনত মস্তকে উত্তর দিলাম, এক ভগবানেরই সকল সত্য; সম্মানপ্রয়াসী হইলে শান্তির আশা ছাড়িতে হয় এবং ভবিষ্যতে সত্যানন্দ ছাড়িয়া মন সর্বদা সম্মানের জন্য লালায়িত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হইতে থাকে। (বলিয়া তখনই বুঝিতে পারিলাম মহর্ষির কাছে এইরূপ কথা কহা আমার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই)। শুনিয়া মহর্ষি কহিলেন, তুমি কালীমোহন মনে করিয়া আমি বলি নাই। আমাদের জাতির সম্মানের প্রতি কেন চাহিব না ?

"মহর্ষির প্রতি Surveyor General, General Walkerএর অচলা ভক্তি ছিল। তাঁহার সহিত কখন কেমনে সাক্ষাৎ হইতে পারে, একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করায় আমি গিয়া মহর্ষির অনুমতি চাহিলাম। তিনি কহিলেন তুমি তো জানই, অপরাহ্ন ১টা হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সাক্ষাৎ করিবার সময়। যে দিন General সাহেবের ইচ্ছা আসিতে পারেন। দিন ঠিক হইল, পূর্ববন্দোবস্তমতে সে দিন এক ঘণ্টা পূর্বে আমি যাইয়া মহর্ষির কাছে উপস্থিত রহিলাম। General সাহেব ঠিক সময়ে গিয়া সাক্ষাৎ করিলেন এবং পূর্ণ এক ঘণ্টা জ্ঞান ও ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া চলিয়া আসিলেন। পরের দিন General সাহেবের বাড়ী গিয়া মহর্ষি প্রতিসাক্ষাৎ করিলেন। General Walker মহর্ষিকে Reverend Father বাক্যে সম্বোধন করিতেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের প্রতিও তাঁহার এত শ্রদ্ধার ভাব ছিল যে একদিন আমাকে বলেন, 'Keshub Chandra Sen is a wonder of the nineteenth century ; তুমি কলিকাতায় গেলে আমাকে তাঁহার নিকটে লইয়া যাইবে।' তাহা ঘটিয়া উঠে নাই।

"একদা শনিবার নিয়মিত সময়ের (সাধারণতঃ অপরাহ্ন ৫টা) অনেক পূর্বে প্রায় ২ কি ২॥ টার সময়ে মহর্ষির কাছে গিয়া দেখি তিনি আরামচৌকিতে নিমীলিত নেত্রে ধ্যানে মগ্ন (তিনি দিনে ঘুমাইতেন না)। আমি অতি ধীরে ধীরে এক কোণে একটা চেয়ারে নিঃশব্দে বসিয়া মহা-যোগীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। তখন তাঁহার চেহারা হইতে যে কি এক অনির্বচনীয় স্বর্গীয়

জ্যোতি বাহির হইতেছে, তাহা দেখিয়া আমার মনে নানা ভাবের উদয় হইতে লাগিল। একবার ভাবিলাম, এই কি সমাধি বা অধ্যাত্ম যোগে যুক্ত হইলে যে অবস্থা হয় তাই! আমার ত উপলব্ধি করিবার অধিকার নাই। সে যাহাই হউক, এই অপূর্ব মূর্তি দর্শনে আমি স্তম্ভিত হইলাম। প্রায় ২০ মিনিট পরে যখন তাঁহার ধ্যান ভাঙিল আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, কালীমোহন যে, কতক্ষণ? আমি প্রণত হইয়া পদধূলি গ্রহণান্তে নিবেদিলাম, অধিক কাল নয়, অনুমান ২০ মিনিট হইবে।

"মশুরী অবস্থান কালে বৎসরাধিক কাল মহর্ষিদেব পীড়িত থাকেন; ক্ষুধার উদ্রেক একেবারেই হইত না; আহার দুইবারে দুই পেয়ালা অর্ধসের আন্দাজ দুধ মাত্র। ৺সীতানাথ ঘোষ মহাশয় নিজ উদ্ভাবিত এক প্রকার বৈদ্যুতিক প্রণালীতে চিকিৎসা করিতেন। তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে যন্ত্রাদির জন্য মহর্ষি মহাশয় আর্থিক সাহায্য করিয়াছিলেন। অর্থের অভাবে পড়িয়া এই সময় মহর্ষি সমীপে তিনি মশুরীতে আসেন। আশ্চর্য, কি একরূপ বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়া অবলম্বনে একদিন মহর্ষিকে রীতিমত আহার করাইয়া দিলেন। ঋণপরিশোধার্থ মহর্ষি তাঁহাকে ৭০০০৲ সাত হাজার টাকা দান করেন।

"একদা প্রসঙ্গক্রমে মহর্ষির শ্রীচরণে নিবেদন করি, নিজেকে ক্ষীণবুদ্ধি মনে করিয়া দার্শনিক Herbert Spencer's First Principle's অধ্যয়ন কালে, তাহার সমালোচক Thomas Rawson Birks M. A. Professor of Moral Philosophy, Cambrigc প্রণীত 'Modern Physical Fatalism and the Doctrine of Evolution, including an Examination of Mr. H. Spencer's First Principle's গ্রন্থ পাঠ করি, তাহাতে আমি বিশেষরূপে সাহায্য পাইয়াছিলাম। শুনিয়া কহিলেন, 'সেই বই তোমার কাছে আছে?' আজ্ঞা হাঁ, করাতে অতি আগ্রহের সহিত বলিলেন, 'আমাকে আনিয়া দিও। তোমাদেরে ছাড়িয়া কলিকাতা যাইবার দিন ঘনাইতেছে; তোমার সহিত এই সব জ্ঞানগর্ভ বিষয় আলোচনা করিবার এইক্ষণ আর সময় নাই। তজ্জন্য বড় দুঃখ হইতেছে। বই সঙ্গে নিব, পড়া শেষ হইলে তোমাকে পাঠাইয়া দিব।' পাঠক দেখুন, এত বৃদ্ধ বয়সে জ্ঞানার্জন-স্পৃহা কত।

"আমাদের সূর্য তাহার সৌর জগতের, আমাদের পৃথিবী এবং তদনুরূপ অপরাপর গ্রহ উপগ্রহাদি লইয়া কৃত্তিকা নক্ষত্র কি তন্নিকটবর্তী কোন বিন্দুকে অতি দ্রুতবেগে প্রদক্ষিণ করিতেছে। আবার সেই কৃত্তিকা নক্ষত্র কি তাহার

নিকটস্থ বিন্দু আমাদের এই সৌর জগৎ ও ইহার মত আরো কত সৌর জগৎ সঙ্গে লইয়া ঐরূপ দ্রুতবেগে পুষ্যা নক্ষত্র কি তাহার সমীপস্থ কোন বিন্দুর চতুর্দিকে ঘুরিতেছে। জ্যোতির্বিদ্‌দিগের জ্ঞানের দৌড় গতি সম্বন্ধে বর্তমানে এই পর্যন্ত। অনাদি কাল হইতে কোন্ অসীমের দিকে কত বেগে আমরা ছুটিতেছি সর্বজ্ঞ ভগবানই তাহা জানেন। এই সব কথা হওয়া মাত্র অমনি তদ্গত হইয়া মহর্ষি তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন—'অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর, এই সদা সবে জিজ্ঞাসে হে।' তখন তাঁহার চেহারা কেমন, না দেখিলে বর্ণনা দ্বারা প্রকাশ করা অসাধ্য।

"সুদীর্ঘ চারি বৎসর মহর্ষিসহবাসে থাকিয়া আমি কি জ্ঞান লাভ করিয়াছি যদি কেহ আমাকে এইরূপ প্রশ্ন করেন, তাহার একমাত্র উত্তর এই, তাঁহাকে দেখিয়া ও তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমি বুঝিয়াছি এই জীবনেই সাধন ভজন করিয়া মুক্ত হইয়া মানুষ দেবতা হইতে পারে।

"এই সময়ে মহর্ষির কলিকাতা প্রত্যাগমনের কথা চলিতেছে। তখন আমাদের মনের ভাব যে কিরূপ অন্তর্যামী জানেন, বর্ণনার বিষয় নয়। প্রায় চারি বৎসর মহাপুরুষের সহবাসে যে স্বর্গীয় আনন্দ ভোগ করিতেছিলাম, শীঘ্রই তাহাতে বঞ্চিত হইব ভাবিয়া প্রাণ কেমন করিতেছিল প্রকাশ করিতে পারি না। আর এই দেবমূর্তি দেখিব না, উপদেশামৃত পান করিব না। এই নিমিত্ত এই সময়ে ঘন ঘন তাঁহার কাছে যাইতাম এবং বেশীক্ষণ তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া উপদেশ শ্রবণ করিতাম এবং তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিতাম। নির্বোধ বালকেরা যেমন বৎসরের প্রথম অধিকাংশ খেলিয়া বেড়াইয়া আলস্যে দিন কাটাইয়া বর্ষশেষে পরীক্ষার কিছু পূর্বে পড়িতে থাকে আমার দশা ঠিক সেইরূপ।

"কাল কাহারও মুখাপেক্ষী নহে, বলিতে বলিতে যেন বিচ্ছেদের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি কলিকাতা রওয়ানা হইবেন। আমরা দেরাদুনবাসী বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী সকলেই কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার শেষ পদধূলি লইয়া তাঁহার কাছে বিদায় গ্রহণ করিলাম। তিনি সজলনয়নে আমাদের আশীর্বাদ করিয়া সাহারণপুর রেলগাড়ী ধরিবার জন্য ঘোড়ার ডাক গাড়ীতে চড়িলেন। সব ফুরাইল। আমরা ভগ্নহৃদয়ে বিষণ্ণবদনে, চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে গৃহে ফিরিলাম।

"ইহার পর আমার পেন্সন গ্রহণের দশ বৎসর মধ্যে মহর্ষির কলিকাতা]াটে অবস্থান কালীন দুইবার এবং ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে পেন্সন লইয়া দেশে

আসিয়া তাঁহার কলিকাতা জোড়াসাঁকো ভবনে তিনবার তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন লাভে জীবন সার্থক করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি।

"বিচ্ছেদের পরে পার্কষ্ট্রীটে প্রথম সাক্ষাতের ঘটনা এই জীবনে ভুলিতে পারিব না। প্রণত হওয়া মাত্র আলিঙ্গন করিয়াই বলিলেন, 'আমি জীবিত আছি, আমাকে দেখিতে আসিয়াছ, বসো, আমার কাছে কৌচের উপরে বসো। আমার প্রতি তোমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ভুলিব না। দেরাদুন ও মশুরী পর্বতে তোমাদের সঙ্গ পাইয়া বড় আনন্দে ছিলাম। ইচ্ছা হয় আবার সেখানে যাইয়া স্বর্গের শোভা-সৌন্দর্যে ভগবানের আবির্ভাব দেখিয়া জীবন অতিবাহিত করি।

" 'এইক্ষণ দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তি ক্রমে হ্রাস হইতেছে, বোধ হয় আর কিছুদিন পরে একেবারেই থাকিবে না। ভালই হইয়াছে। হৃদয়েশ্বর হৃদয়ে থাকিয়া সর্বদাই যেন বলিতেছেন— তুই আমারই ইচ্ছায় অন্ধ ও বধির হইতেছিস। সংসারের যাহা কিছু দেখা ও শুনা তোর শেষ হইয়াছে। দীর্ঘকাল এত দেখিয়া শুনিয়াও যদি তোর আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি না হইয়া থাকে তবে কখনও তোর বাসনা পূর্ণ হইবে না। এইক্ষণ কেবল আমাকে দেখ্ আর আমার বাণী শোন্।' পরে একটি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিলেন, তাহার মর্মও ঠিক এইরূপ।"

কালীমোহনবাবুর এই বিবরণ পড়িলে বেশ দেখা যায় যে, দেবেন্দ্রনাথের ধ্যানযোগের চরম অবস্থা যে সমাধি বা ভক্তিযোগের চরম অবস্থা যে রসস্ফূর্তি ও রসোচ্ছ্বাস, চৈতন্যের উদ্‌বেল ভাব— এই দুই অবস্থাই যুগপৎ তাঁহার ভিতরে দেখা দিলেও তাহার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের সহিত কর্মের সহিত সম্বন্ধ, সমস্ত জগৎ-সংসারের সহিত সম্বন্ধ তাঁহার বিলুপ্ত হয় নাই। তিনি যে কেবলি সমাহিত হইয়াই আছেন, বা কেবলি রসোদ্‌বেল অবস্থায় নাচিতেছেন গায়িতেছেন, তাহা নয়। সেইসঙ্গে-সঙ্গেই সেই একই সময়ে তাঁহার জ্ঞানালোচনা চলিতেছে, লোকজনের সঙ্গে লৌকিকতা আদর-অভ্যর্থনা মেলা-মেশা চলিতেছে, গৃহপরিবারের খুঁটিনাটি বিষয়ে পরামর্শ দান চলিতেছে, জমিদারি বা অর্থ সম্বন্ধীয় পরিচালনার ব্যাপারে যথাবিহিত কর্তব্য কী তাহা স্থির করিয়া দিতেছেন, ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যে-সকল আন্দোলন বাদপ্রতিবাদ চলিতেছে সে সম্বন্ধেও ভাবিতেছেন ও যাহা বলিবার বলিতেছেন। এ রকমের আশ্চর্য ব্যাপার কোনো প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় সাধকের জীবনে কখনোই দেখা যায় নাই। আধুনিক সাধকের যে আদর্শ হওয়া উচিত, সেই আদর্শেরই প্রতিকৃতি দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে দেখিতে পাই।

তাঁহার জ্ঞানালোচনা, লোকজনের সঙ্গে লৌকিকতা, জমিদারি-পরিচালন

ব্যাপারে পরামর্শদান প্রভৃতি ব্যাপারের দৃষ্টান্ত তো পাওয়া গিয়াছে।

ব্রাহ্মসমাজের ভিতরকার নানা আন্দোলন সম্বন্ধে যে তিনি উদাসীন ছিলেন না, তাহার একটা চমৎকার নিদর্শন এ সময়ে পাওয়া যায়। কেশবচন্দ্র নববিধান স্থাপনের পর যখন কখনো খৃষ্টীয় জলাভিষেক, কখনো বৈদিককালের হোম, কখনো কমিউনিয়ন সার্ভিস, কখনো পতাকাবরণ, কখনো পঞ্চপ্রদীপের আরতি প্রভৃতি নানা ধর্মের নানা বাহ্য অনুষ্ঠানগুলিকে নূতনভাবে সংস্কৃত করিয়া নব-বিধানের মধ্যে সমন্বিত করিতেছিলেন, তখন তিনি ভক্তিতে বিহ্বল। লড়ালড়ির পর্ব তখন চুকিয়া গিয়া শান্তিপর্বের সূচনা হইয়াছে। সেই সময়ে সিমলা হইতে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ৯ই আগস্ট ১৮৮১ সালে দেবেন্দ্রনাথকে একখানি চিঠি লেখেন। সেই চিঠিতে তিনি তাঁহার পুর্বকৃত দুর্বিনীত ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, এবং যাহাতে আবার কেশবচন্দ্রের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের পূর্বের মতো মিলন হয়, সেজন্য বিনীতভাবে প্রার্থনা করেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার চিঠির উত্তরে লিখিতেছেন— (চিঠিখানি পোকায় কাটায় তাহা সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই)—

মসূরী পর্বত

২৯শে শ্রাবণ ব্রাহ্ম সংবৎ ৫২

"প্রিয় প্রতাপ!

আমি প্রাতঃকালে উপাসনা করিয়া বসিয়া আছি— এমন সময়ে তোমার এক পত্র প্রাপ্ত হইলাম। তাহা যেন স্বর্গ হইতে চ্যুত হইয়া আমার হৃদয়ে মধু ঢালিয়া দিল। (১)……ঘটনা। আমার প্রতি তোমার অনুরাগ আজও…… বিরোধের মধ্যেও তাহা নির্বাসিত হয় নাই……আমার প্রতি যে কিছু অপরাধ করিয়াছ, সন্তপ্তচিত্তে তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছ, এ তো তোমার দেব-ভাব।……সেই পথে তোমাদের প্রথম……মিলন হয়। সেই তোমাদের জীবনের……নূতন উৎসাহে উৎসাহী, নূতন বলে বলী, নূতন তেজে তেজীয়ান্। তখন তোমাদের সহিত যে বিশুদ্ধ আনন্দ, অকৃত্রিম প্রেম অনুভব করিয়াছি, তাহা কি এ জীবনে ভুলিতে পারি?…

এই ক্ষণে ব্রহ্মানন্দের কথা কি বলিব!……সে মুখশ্রী আমার হৃদয়ে অদ্যাপি জাগ্রৎ রহিয়াছে। যদি আমার এই মনে কাহারও প্রতিমা থাকে, তবে সে তাঁহারই প্রতিমা। তাঁহার আপাদমস্তক— তাঁহার পদের উজ্জ্বল নখ অবধি মস্তকের কেশ পর্যন্ত— এখনি যেন— এই পত্র লিখিতে লিখিতে— জীবন্তরূপে

প্রতিভাত হইতেছে। যদি কাহারও নিমিত্তে আমার প্রেমাশ্রুর বিসর্জন হইয়া থাকে, তবে সে তাঁহারই জন্তে। এখন আর সে প্রেমাশ্রু নাই— আমার হৃদয়ের শোণিত এত অল্প রহিয়াছে, তাহা আর চক্ষুর অশ্রুরূপে পরিণত হইতে পারে না। আমার চক্ষু শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, নতুবা এই পত্র অশ্রুতে ভিজিয়া যাইত। এইক্ষণে আমার চক্ষু আরো নিস্তেজ হইয়াছে, কর্ণ আরো বধির হইয়াছে, মনের কথা বলিতে গিয়া আর শব্দ তেমন যোগায় না। শরীরের কলে মরিচে পড়িয়াছে, সে কল আর ভাল চলে না—তথাপি তোমার এই পত্র পাঠ করিয়া যেন আমি নবযৌবন লাভ করিলাম। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান যেন আমার নয়নের গোচর হইল। ব্রহ্মানন্দ এত উচ্চ পদবীতে উঠিয়াছেন যে আমরা তাঁহার নাগাল পাই না— তাঁহার মনের ভাব আর সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি না, ছায়াময় প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হয়। আমরা কেবল এক জন্মভূমির অনুরাগে ঋষিদিগের বাক্যেই জ্ঞানতৃপ্ত হইয়াছি— তিনি অসাধারণ উদার প্রেমে উদ্দীপ্ত হইয়া এই ভারতবর্ষের ব্রহ্মবাদিদিগের সঙ্গে পালেস্তাইন ও আরববাসী ব্রহ্মবাদিদিগের সমন্বয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইহা অতি কষ্ট-কল্প। ইহা লইয়া যে বাদানুবাদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার অন্ত নাই। ইহার কোলাহল ক্রমাগতই বৃদ্ধি হইতেছে। আমার এমন যে এই নির্জন পর্বতবাস, এখানেও সে কোলাহল আসিয়া পহুঁছিয়াছে। কখনো কখনো ব্রহ্মানন্দের এই অভিনব মতের বিরোধী হইয়াও আমার কথা কহিতে হয়— তাহার জন্য আমার মন কিন্তু বড়ই ব্যথিত হয়। তাঁহার পক্ষ ও তাঁহার মত যদি আমি সমর্থন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে······যে লাভ করিতাম, তাহা বলিতে পারি না। এই ক্ষণে তুমি আমার স্নেহ, প্রেম ও আশীর্বাদ গ্রহণ কর। সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে চিরকাল আমি তোমাদেরই। ইতি—

পুরাতন শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্মা
মসূরী

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে বাদশাহ ও ফকির হইতে আমি বাহিরে আছি, আমার বন্ধুর দ্বারের ধূলা যে সেই আমার বাদশাহ।”

প্রতাপবাবু-কর্তৃক এই চিঠির অংশ ধর্মতত্ত্বে ছাপানো হয়। দেবেন্দ্রনাথ কেশব-বাবুর নববিধানের নানা ধর্মের অনুষ্ঠানের সমন্বয় ব্যাপারকে সমর্থন করিয়াছেন ভাবিয়া রাজনারায়ণবাবু তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া চিঠি লেখেন। দেবেন্দ্রনাথ তাহার

উত্তরে লেখেন যে, তিনি কেশববাবুর ঐ সমন্বয়কে কখনোই সমর্থন করেন নাই, বরং সে জায়গায় তাঁহার সঙ্গে কেশববাবুর মিল হওয়া অসম্ভব বলিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। 'আচার্য কেশবচন্দ্রে'র গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "স্বর্গগত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের উৎপীড়নে এই পত্রের কথাগুলির কোন কোন স্থলে ভক্তিভাজন ধর্মপিতা যে অর্থান্তর ঘটাইয়াছেন" ইত্যাদি। 'ধর্মপিতা'র ধর্মজ্ঞান সম্বন্ধে গ্রন্থকারের শ্রদ্ধা যে কতখানি তাহা তাঁহার কথা হইতেই দিব্য বুঝা যায়। রাজনারায়ণবাবুকে লিখিত সেই চিঠিখানির শেষে দেবেন্দ্রনাথ লিখিতেছেন :

"আমার সহিত কেশব বাবুর যাহাতে পূর্ববৎ সম্মিলন হয়, প্রতাপ বাবু তাঁহার পত্রের শেষে এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। যখন তিনি কখনো গঙ্গার স্তব করিতেছেন, কখনো রাধাকৃষ্ণের প্রেমগান করিতে করিতে রাস্তায় মাতিয়া বেড়াইতেছেন, কখনো আবার হোম করিতেছেন, কখনো সশিষ্যে বাড়ীর পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া বলিতেছেন, জোর্ডান নদীতে জন-দি-বেপ্‌টিস্টের দ্বারা বেপ্‌টাইস্ট হইতেছি, মধ্যে মধ্যে মুসা, যীসা, সক্রেটিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সশরীরে পরলোকে তীর্থযাত্রা করিতেছেন— তখন এই সকল প্রহেলিকা ভেদ করিয়া তাঁহার সঙ্গে কি প্রকারেই বা মিল হইবে? এই জন্যই আমি মৃদুভাবে লিখিয়াছিলাম যে "ব্রহ্মানন্দ এত উচ্চ পদবীতে উঠিয়াছেন যে আমরা তাঁহার নাগাল পাই না, তাঁহার মনের ভাব আর সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি না, ছায়াময় প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হয়।"...এই জন্য আমি পরে লিখিয়াছিলাম যে "ইহা অতি কষ্টকল্প। ইহা লইয়া যে বাদানুবাদ উপস্থিত হইয়াছে তাহার অন্ত নাই— ইহার কোলাহল ক্রমাগতই বৃদ্ধি হইতেছে।" আমার পত্রের এই অংশ মিরর পত্রে উদ্ধৃত হয় নাই, এজন্য আমার সকল অভিপ্রায় তুমি বুঝিতে পার নাই। এ অংশটি গোপন করিয়া রাখা মিরর-সম্পাদকের উচিত কার্য হয় নাই।

"আমি কঠোর কর্তব্যের অনুরোধে তোমাকে এইটুকু লিখিলাম। পরের দোষগুণের এত বাহুল্য চর্চা আমার পোষায় না। আমার পক্ষে ইহা অতি অপ্রিয় কার্য। ঈশ্বর আমাকে উদ্ধার করুন। ইতি

হিমালয়, মসূরী পর্বত, নিয়তশুভাম্বধ্যায়ী
২৮ ভাদ্র ৫২। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দেবশর্মা।"

দেবেন্দ্রনাথ অনেক পরীক্ষা ও জ্ঞানালোচনার দ্বারা যে-সকল তত্ত্ব ও সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা ভিতর হইতে নূতন উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার দ্বারা

আপনি পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত তাহাকে তিনি দৃঢ় রকমে ধরিয়া থাকিতেন। জ্ঞানের ভিত্তিকে নষ্ট করিয়া দিয়া যে ভক্তি, সে ভক্তি তাঁহার কোনোকালেই ছিল না। তাহার প্রমাণ ক্রমে আরো পাইব। যাহা হউক, কেশববাবুর সঙ্গে তাঁহার ঐকান্তিক প্রীতির মধুর সম্বন্ধ শেষদিন পর্যন্ত অটুট ছিল। কেশববাবুর ও তাঁহার শেষ চিঠিগুলিই তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। নীচে দুখানি চিঠি উদ্ধার করা গেল :

হিমালয় দার্জিলিঙ
৭ই জুলাই ১৮৮২

"ভক্তিভাজন মহর্ষি,

হিমালয় হইতে হিমালয়ে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম পাঠাইতেছি, গ্রহণে কৃতার্থ করিবেন। আমি আপনার সেই পুরাতন ব্রহ্মানন্দ, সন্তান ও দাস। আপনি আমাকে অতি উচ্চ নাম দিয়াছিলেন। বহুমূল্য রত্ন "ব্রহ্মানন্দ" নাম। যদি ব্রহ্মেতে আনন্দ হয় তদপেক্ষা অধিক ধন মনুষ্যের ভাগ্যে আর কি হইতে পারে? ঐ নাম দিয়া আমাকে আপনি মহাধনে ধনী করিয়াছেন, বিপুল সম্পত্তিশালী করিয়াছেন। আপনার আশীর্বাদে ব্রহ্মের সহবাসে অনেক সুখ এ জীবনে সম্ভোগ করিলাম। আরো আশীর্বাদ করুন যেন আরো অধিক শান্তি ও আনন্দ তাঁহাতে লাভ করিতে পারি। ব্রহ্ম কি আনন্দময়; হরি কি সুধাময় পদার্থ! সে মুখ দেখিলে আর কি দুঃখ থাকে? প্রাণ যে আনন্দে প্লাবিত হয় এবং পৃথিবীতেই স্বর্গসুখ ভোগ করে। ভারতবাসী সকলকে আশীর্বাদ করুন যেন সকলেই ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে পারেন। আপনার মন তো ক্রমশঃ স্বর্গের দিকে উঠিতেছে, ভক্তমণ্ডলীকে সঙ্গে রাখিবেন, প্রেমের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিবেন, যেন সকলে আপনার সঙ্গে উঠিতে পারেন। এখান হইতে কল্যই প্রত্যাগমন করিবার ইচ্ছা।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।"

প্রত্যুত্তর।

"আমার হৃদয়ের ব্রহ্মানন্দ—

৩০ আষাঢ়ের প্রাতঃকালে এক পত্র আমার হস্তে পড়িল, তাহার শিরো-নামাতে চিরপরিচিত অক্ষর দেখিয়া তোমার পত্র অনুভব করিলাম, এবং তাড়া-

তাড়ি সেই বিমল পত্র খুলিয়া দেখি যে, সত্যসত্য তোমারই পত্র। তাহা পড়িতে পড়িতে তোমার সৌম্যমূর্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তোমার শরীর দূরে, কি করি, তাহাকেই মনের সহিত প্রেমালিঙ্গন দিলাম এবং আনন্দে প্লাবিত হইলাম।

আমার কথার সায় যেমন তোমার নিকট হইতে পাইয়া আসিতেছি এমন আর কাহারও কাছে পাই না। হাফেজ আফশোষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন 'কাহাকেও এমন পাই না যে আমার কথায় সায় দেয়।' তোমাকে সে পাগলা যদি পাইত, তবে তাহার প্রতি কথায় সায় পেয়ে সে মস্ত হয়ে উঠ্‌ত আর খুসি হয়ে বল্‌তে থাকিত—'কিমন্তি জানি না যে, আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল।' তোমাকে আমি কবে ব্রহ্মানন্দ নাম দিয়াছি এখনো তোমার নিকট হইতে তাহার সায় পাইতেছি। তোমার নিকটে কোন কথা বৃথা যায় না। কি শুভ-ক্ষণেই তোমার সহিত আমার যোগবন্ধন হইয়াছিল; নানাপ্রকার বিপর্যয় ঘটনাও তাহা ছিন্ন করিতে পারে নাই। ভক্তমণ্ডলীকে বন্ধন করিবার ভার ঈশ্বর তোমাকেই দিয়াছেন— সে ভার তুমি আনন্দের সহিত বহন করিতেছ, এই কাজেই তুমি উন্মত্ত, এ ছাড়া তোমার জীবন আর কিছুতেই স্বাদ পায় না। ঈশ্বর তোমার কিছুই অভাব রাখেন নাই, তুমি ফকিরের বেশে বড় বড় ধনীর কার্য করিতেছ। আমি এই হিমালয় হইতে অমৃতালয়ে যাইয়া তোমাদের সাক্ষাতের জন্য প্রত্যাশা করিব। 'তত্র পিতা অপিতা ভবতি, মাতা অমাতা'; সেখানে পিতা অপিতা হন, মাতা অমাতা। সেখানে প্রেম সমান— উঁচু নীচুর কোন খিরকিচ্ নাই। ইতি ২রা শ্রাবণ ৫৩ ব্রাঃ সং।

তোমার অনুরাগী
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্মা।
মসূরী পর্বত।"

জ্ঞানের ও তত্ত্বসিদ্ধান্তের যে প্রতিষ্ঠাভূমিতে অনেক পরীক্ষার পরে তিনি উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা তিনি যে কোনো কালেই ছাড়েন নাই তাহার আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত এই সময়ে রাজনারায়ণবাবুর সঙ্গে কয়েকটি চিঠিপত্রের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

রাজনারায়ণবাবু "থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি"র সঙ্গে যোগ দিয়াছেন শুনিয়া দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, "থিয়োসফিস্টের নিকট হইতে ব্রাহ্মধর্মের সম্বন্ধে লাভেরও প্রত্যাশা করিবে না এবং প্রিয়তম ঈশ্বরের পরিবর্তে সাংসারিক

লাভের জন্য ও স্বদেশের ঐহিক উন্নতির জন্যও থিয়সফিস্টদের সঙ্গে যোগ দিবে না। ইয়ার মফরোষ ব তুনিয়া।”

রাজনারায়ণবাবু এই চিঠি পাইয়া দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে লেখেন—

“পরম পুজনীয় মহাশয়েষু,

প্রীতিপূর্বক প্রণাম—

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় থিওসফিকেল সোসাইটির একজন সভ্য, কিন্তু কই এই জন্য সাধারণ সমাজের লোকেরা ত তাঁহাকে সংসারাসক্ত বলিতেছে না; বরং উল্টে তাঁহাকে প্রচারকপদে অভিষিক্ত করিতে যাইতেছে। আর আমার ঐ সোসাইটির সঙ্গে অতি অল্প মাত্র সংস্রব ছিল, এক হিসাবে কিছুই ছিল না বলিলে হয়, যেহেতু আমি তাহার সভ্য নহি, আর আপনি অনায়াসে আমাকে অত বড় কথাটা বলিলেন যে, প্রিয়তম ঈশ্বরকে সংসার জন্য আমি বিক্রয় করিয়াছি। আপনার শেষ পত্র না পাওয়া পর্যন্ত নিতান্ত দুঃখিতান্তঃকরণে কাল যাপন করিতেছি।

ইতি প্রণতঃ

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।”

দেবেন্দ্রনাথ ইহার উত্তরে লেখেন—

“প্রীতিপূর্বক নমস্কার—

নগেন্দ্রই হউন্, আর যিনিই হউন, তাঁহারদের প্রতি আমার এই অকাট্য কথা যে, হয় ঈশ্বরের সংসর্গ ছাড়, নয় নাস্তিকের সংসর্গ ছাড়— ইহার আর মধ্যপথ নাই। তবে আমার এই বাক্য অনুসারে চলা বা না চলা— তাঁহারদের ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধার উপরে নির্ভর। তুমি আর অধীর হইও না। আমাকে ক্ষমা কর। ইতি—”

‘ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস’ -রচয়িতা দেবেন্দ্রনাথ ঐ মত ও বিশ্বাসগুলি বা creedগুলিকে এমনি অটুট অচল অনড় মনে করিতেন যে, মানুষের জীবনে অভিজ্ঞতার স্রোত যে সেগুলির উপরেও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে পারে এবং তাহাদিগকে ডিঙাইয়া নব নব উপলব্ধির দেশের ভিতর দিয়া বহিয়া যাইতে পারে— এটা মনে করা তাঁহার পক্ষে শক্ত ছিল। “ব্রাহ্মধর্ম-বীজে” ঈশ্বরের যে ক’টি স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে, তাহা ছাড়া আরো কত বিচিত্র রূপে তিনি মানুষের কাছে দেখা দিতে পারেন— মানুষের উপলব্ধির সীমা নির্দেশ করে কে! ঈশ্বরকে

ঠিক anthropomorphic ভাবে না দেখিয়াও এক রকম হিসাবে মানুষ করিয়া দেখা যায়— এ কথা বলা যায় যে, "আপনি প্রভু সৃষ্টি-বাঁধন পরে' বাঁধা সবার কাছে।" সেইখানে স্বয়ং ঈশ্বরের পক্ষে চাওয়া আছে, এবং চাওয়ার জন্ম ব্যাকুলতা আছে, এবং সম্পূর্ণভাবে না পাওয়ার জন্ম বেদনাও আছে। এত বড়ো কথা মানুষ তাই বলিতে পারে—"The thirst that consumes my spirit is the thirst of Thy heart for mine"— যে তৃষ্ণা আমার আত্মাকে দগ্ধ করিতেছে সে যে আমার জন্ম তোমারি হৃদয়ের তৃষ্ণা! এ ক্ষেত্রে কি তাঁহাকে "অনন্ত", "নিরাকার", "অনধিগম্য" বলিয়া বর্ণনা করিলে চলে? এখানে যে তিনি রূপ, তিনি বেদন— তিনি "Suffering God"! তেমনি তাঁহাকে যখন বিশ্বমানবের ইতিহাস-বিধাতা করিয়া দেখা যায়, তখন আবার তাঁর ভিন্ন স্বরূপ! তখন তিনি God in the becoming— তিনি হইয়া উঠিতেছেন ভগবান্। যিনি নিত্য স্বভাববান্, তিনিই হন নিত্য বিগ্রহবান্। সেখানে মানুষের সঙ্গে তাঁহার সকল যৌথ কারবার— একপক্ষে মানুষ ও তাহার সকল দাবি, অন্য পক্ষে তিনি সেই ন্যায্য দাবিকে মিটাইবার জন্ম ব্যস্ত। সেখানে তিনি আর রাজা নন, সমস্ত মানুষকে রাজা করিয়া দিয়া তিনি তাহাদের মধ্যে অংশে অংশে আপনাকে বিলাইয়া সার্থক। সমস্ত মানুষের রাজত্বে তাঁর রাজত্ব। সেখানে তিনি আর রিক্ত হইয়া দূরে নন, সমস্ত মানুষের সকল চেষ্টাকে মিলাইয়া প্রতি মানুষকে তাঁর বিগ্রহ করিবার জন্ম মানুষের সকল চেষ্টার মধ্যে সচেষ্ট, মানুষের সকল কর্মের অংশীদার। সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতিবিজ্ঞান প্রভৃতির তত্ত্বদর্শীদের কাছে এই তো ঈশ্বরের নূতন স্বরূপ। তিনি এক হইয়াও বহু, বহু হইয়াও এক! Pluralismও শেষ কথা নয়; Monismও শেষ কথা নয়।

এমনি করিয়া কত রকমের ধর্মমত যে জাগিতে পারে তাহা কে বলিতে পারে! সকল জ্ঞানবিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পসাহিত্য— প্রত্যেকটিকেই অধ্যাত্মরসের রসানে ফেলিয়া প্রত্যেকটি হইতে এক-এক বিশিষ্ট শ্রেণীর ধর্মমত দাঁড় করানো যাইতে পারে। কোনোটা বা দর্শনমূলক ধর্ম, কোনোটা বা বিজ্ঞানমূলক ধর্ম, কোনোটা শিল্পমূলক, কোনোটা লোকহিতমূলক। ধর্ম যে এই-সমস্ত শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শনকে নিয়ন্ত্রিত করিবে তাহা নয়; ইহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ জায়গায় স্বরাট্। অথচ ইহাদের প্রত্যেকেরই ভিতর হইতে একটা ধর্ম ও ধর্মমত বেশ বাহির হইতে পারে। রামমোহন রায় এ কথা যেমন বুঝিয়াছিলেন এমন আর এ যুগে কেহই বোঝেন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান,

লোকবিধি, দর্শন— ইহারা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে নিজের নিজের পথে চলিবে— অথচ ধর্মের মধ্যে সেই সমস্ত পথের সম্মিলন। ধর্মের আদর্শ মুক্তির আদর্শ— এবং মুক্তি মানে বিশ্ব হইতে সরা নয়, বিশ্বের মধ্যে বাড়া। এইজন্য রাজা রামমোহন একই সময়ে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃস্টান— এ সমস্তই ছিলেন। তাঁহার মধ্যে নানা ব্যক্তিত্বের মিল অদ্ভুত ছিল।

অতএব ক্রীডের খোঁটা ধরিয়া থাকিলে, নব নব তত্ত্বের নব নব রসোপলব্ধি কেমন করিয়া ঘটিবে? পৃথিবীতে তত্ত্বও বসিয়া নাই, রসও বসিয়া নাই— তত্ত্ব যেমন অগ্রসর, তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে রসের বৈচিত্র্যও কি আর্টে, কি অধ্যাত্ম-রাজ্যে বাড়িয়াই চলিয়াছে। পুরানো মরমী সাধকদের রসোপলব্ধি এক রকমের ছিল; একালের মরমী সাধকদের রসোপলব্ধি কি ঠিক সেই রকমের হইতে পারে? একালের মানুষের চৈতন্য যে কত বড়ো প্রকাণ্ড ক্ষেত্রে বিস্তার পাইয়াছে। এই নূতন নূতন তত্ত্ব ও তাহার আনুষঙ্গিক নূতন নূতন রস 'ক্রীড' আঁকড়িয়া থাকিলে দেখা শক্ত হয়। প্রধানত এই কারণেই 'ক্রেডাল ধর্ম' এ যুগে আর টিঁকিতেছে না।

কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ সেই 'ক্রীডের' জন্মদাতা বলিয়া তিনি ক্রীডের বাঁধনে উপলব্ধির দিক হইতে নিজে বাঁধা না থাকিলেও জ্ঞানের দিক হইতে ক্রীডকে শেষ পর্যন্ত শক্ত করিয়া গাড়িয়া রাখিয়াছিলেন। হাফেজের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মের 'ক্রীড' সম্পূর্ণ কখনোই মেলে না। অথচ সে মিল যে তিনি জীবনে মিলাইয়াছিলেন, ইহা হইতেই প্রমাণ হয় যে, তিনি জ্ঞানের দিক হইতে যে তত্ত্বভূমিতেই দাঁড়ান, উপলব্ধির দিক হইতে সেখান হইতে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছেন।

রাজনারায়ণবাবু যখন "The Essential Religion" বা সারধর্ম লেখেন, তখন এক জায়গায় লিখিয়াছিলেন যে, বৌদ্ধধর্মের মতো নিরীশ্বরবাদী ধর্মের প্রতিও আমাদের মনের উদার ভাব পোষণ করা চাই, কারণ সে ধর্মে নীতির স্থান খুব উঁচুতে। সেই প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনীতে ছাপাইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করায়, প্রবন্ধের গায়ে দেবেন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

"এ নাস্তিকতা— ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়া ধর্ম থাকিতে পারে না। ইহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে ছাপাইলে পত্রিকার কলঙ্ক হইবে। এমন কথা এ পর্যন্ত তোমার কলমে আসে নাই এবং পত্রিকাতেও উঠে নাই। অতএব এইটা বাদ দিবে।

শ্রী দে, না, ঠাকুর।"

এখনকার কালে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে যতই আলোচনার প্রসার হইতেছে, ততই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, বৌদ্ধধর্মের মধ্যে ধর্মবিজ্ঞানের অংশ কত গভীর— মানুষের মনস্তত্ত্ব এবং নীতিতত্ত্বের একেবারে চূড়ান্ত জায়গায়— মূলে গিয়া এই ধর্ম পৌঁছিয়াছে। একালের পক্ষে সেই দিক দিয়া তাহার মূল্য কম নয়। তার পরে বিশ্বমৈত্রীর ভাবের দিক হইতে দেখিতে গেলে, বিশ্বচৈতন্য বিশ্ববোধ প্রভৃতি ব্যাপারের প্রত্যক্ষ সজীব অভিজ্ঞতা এই ধর্মের ভিতর দিয়া যেমন করিয়া হইয়াছে, এমন কোনো ধর্মে হয় নাই। অথচ কেবল ঈশ্বরের নাম নাই বা সে সম্বন্ধে বুদ্ধদেব নীরব ছিলেন বলিয়া এত বড়ো একটা ধর্মকে দেবেন্দ্রনাথ যে অগ্রাহ্য করিলেন, তাহার একমাত্র কারণ তিনি 'ক্রীডের' বিশুদ্ধতা রক্ষার দিক হইতে এ প্রশ্নের বিচার করিতেছিলেন।

ভক্ত শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের ধর্মজীবন সম্বন্ধে যাঁহাদের সাক্ষাৎ পরিচয় আছে, তাঁহারা জানেন যে তাঁহার শেষবয়সের মতামত যেমনি থাক, ভগবদ্ভক্তিতে তিনি কি আশ্চর্য রকম তদগত তন্ময় মানুষ ছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যতদিন পর্যন্ত তিনি প্রচারক ছিলেন, তাঁহার উপদেশ-উপাসনায় সকল উপাসকদের মনের মধ্যে একটা অধ্যাত্ম-বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হইত। তাঁহার প্রত্যেকটি কথা যেন ভিতরকার আত্মজ্যোতির স্ফুলিঙ্গের মতো বাহিরে ঠিকরিয়া পড়িত, তাহা সত্যের তেজে ও শক্তিতে ভরা। ১৮৭২ খৃস্টাব্দেই বোধ হয় প্রথম তাঁহার মতের পরিবর্তন ঘটিতে আরম্ভ করে। তিনি লিখিয়াছেন, "বাগ-আঁচড়া ব্রাহ্মসমাজের উদ্যানে এক দিন নির্জনে বসিয়া প্রার্থনা করিতেছি। হঠাৎ আমার মধ্যে যেন একটি জ্যোতিঃ প্রবেশ করিল এবং কে যেন বলিল, তুই আর আপনাকে বদ্ধ রাখিস না। গণ্ডীর মধ্যে থাকিলে ধর্ম হয় না।··· আমি পিঞ্জরমুক্ত পক্ষীর ন্যায় উড়িতে গিয়া পাখায় বল পাই না। তখন বুঝিলাম, ইহা গণ্ডীর পরিণাম।" তার পরে ক্রমে ক্রমে অধ্যাত্মজীবনে যতই তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই ব্রাহ্মসমাজের সাম্প্রদায়িক নীড়ের মধ্যে তিনি বাঁধা থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার স্পষ্ট বিশ্বাস হইল "ব্রাহ্মসমাজে যে প্রণালীতে উপাসনা সাধন-ভজন চলিতেছে, তাহার অধিকাংশই পরোক্ষ।" অর্থাৎ এখানে কতকগুলি বাঁধা মত, বাঁধা বিশ্বাস, বাঁধা উসাসনাপ্রণালী দাঁড়াইয়া গিয়াছে— মানুষের অধ্যাত্ম-উপলব্ধি যে বিচিত্র সাধনমার্গের ভিতর দিয়া গিয়া তবে পরিপূর্ণ হয়, সে-সকল সাধনমার্গের কোনো প্রত্যক্ষ পরিচয় এই বাঁধাবাঁধির মধ্যে পাওয়া কাহারো পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি তখন সাহস করিয়া নানা সাধনার ভিতর

দিয়া চলিলেন। অবশ্য শেষে তিনি গুরুবাদী হইলেন— তিনি মনে করিলেন যে, সাধুসঙ্গ ও সদ্‌গুরু লাভ ভিন্ন জীবের মুক্তির অন্য উপায় নাই। সমস্ত জগৎ, মানুষের সমস্ত জীবনের বিচিত্র ঘটনা— ইহার মধ্যে শ্রীভগবানেরই আশ্চর্য লীলা চলিতেছে এবং সেইজন্য মানুষের সমস্ত বাসনা-কামনার ভিতর দিয়া সেই শ্রীকৃষ্ণই মানুষকে আকর্ষণ করিতেছেন। কোথাও তিনি অর্থ-ভগবান, কোথাও তিনি স্ত্রী-ভগবান, কোথাও তিনি বিদ্যা-ভগবান, কোথাও তিনি যশ-ভগবান। বাস্তবিক এই-সব ভাবাই তাঁহার ছিল। মানুষের জীবনের সমস্ত পথেই সেই তাঁর দিকে একটা অভিসার চলিয়াছে, এমনি করিয়া তিনি ভগবানের রসলীলা দেখিতেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যে ব্রাউনিং কিম্বা হুইটম্যানের পাপপুণ্য, ধর্মাধর্ম সম্বন্ধে মনোভাব ও আদর্শ ঠিক এই একই রকমের। মানুষের কামনা-বাসনার ভিতর দিয়াই মানুষের মুক্তি। কিন্তু গোস্বামী মহাশয় মনে করিতেন, এ লীলা সদ্‌গুরুর কৃপা ভিন্ন মানুষ দেখিতে পায় না, সেইজন্য গুরুর প্রয়োজন। গুরুদত্ত নাম জপ করিতে করিতে যখন ব্যক্ত চৈতন্য ভিতরকার অব্যক্ত চৈতন্যের মধ্যে নিবিড় নিবিষ্ট হইয়া যায়, তখনই মানুষের এই দিব্য লীলা দেখিবার মতো দিব্য চক্ষু খুলিয়া যায়। তখন মানুষ দেখে সমস্ত মানুষই বিচিত্র অভিসারপথে সেই রসরূপী ভগবানের সন্ধানে চলিয়াছে। বিজয়কৃষ্ণ সেইজন্য কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে ধরা দিলেন না— সকল সম্প্রদায়ের মানুষকেই তিনি শিষ্য করিলেন। সুতরাং তাঁহার এ-সকল মতামত ও চেষ্টা তাঁহার উদ্দেশ্যকে সফল করে, কি ব্যর্থ করে তাহার বিচারের জন্য বেশি দূরে যাইবার দরকার নাই। তাঁহার সম্প্রদায়ের দ্বারা এ দেশে যথার্থ অসাম্প্রদায়িক ভক্তি-ভাব সঞ্চারিত হইতেছে কি না, না সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি ও কুসংস্কার বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা দেখিলেই চুকিয়া যায়।

গোস্বামী মহাশয়ের এই-সকল মতামত লইয়া যখন ব্রাহ্মসমাজে তুমুল আন্দোলন ওঠে, তখন দেবেন্দ্রনাথ নিজে হইতে তাঁহাকে একখানি চিঠি লেখেন। সে চিঠিখানি ১৮৮৮ সালের পৌষ মাসে লেখা হয়। সেই মাসের তত্ত্বকৌমুদী কাগজে গোস্বামী মহাশয়ের মতামতের বিরুদ্ধে যে প্রবন্ধ লেখা হয়, তাহা পড়িয়াই দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে সেই চিঠিখানি লেখেন। তাঁহার নূতন অনেক মতামতের মধ্যে কৌমুদী একটি মত এই লেখেন যে, গোস্বামী মহাশয় মনে করেন, "ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে আপনা আপনি পৌত্তলিকতা জাতিভেদ ইত্যাদি কুসংস্কার চলিয়া যাইবে" এবং "যে ব্যক্তি যে ধর্ম সরলভাবে বিশ্বাস করে সেই ধর্মসাধন করিতে করিতে সেই ব্যক্তি কালে সত্য লাভ করিবে।" দেবেন্দ্রনাথ

এই-সকল কথা পড়িয়া তাঁহাকে লেখেন— "বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাসকে এই সকল অযথাবাদ ও কুসংস্কারযুক্ত করিয়া প্রচার করিতে হইলে তাহার গতিরোধ করা হয়।... আত্মার সহিত পরমাত্মার যে যোগ তাহা স্বাভাবিক যোগ এবং ঋষিদিগের আত্মা অবধি আমারদিগের প্রত্যেকের আত্মার স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয়। এই আত্ম-প্রত্যয়ের স্থানে কি এখন, সাধুর পদে পড়িয়া না থাকিলে, সাধুর পদধূলি অঙ্গে না মাখিলে এবং অন্য কর্তৃক শক্তি সঞ্চারিত না হইলে মনুষ্যের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে না, এই প্রত্যয়কে হৃদয়ে স্থান দিতে হইবে? এই প্রত্যয়কে যদি হৃদয়ে স্থান দিতে হয়, তবে গায়ত্রী মন্ত্রের মূল্য থাকে না, 'হৃদা মনীষা মনসাভিক্‌লৃপ্তঃ' অর্থাৎ হৃদ্‌গত সংশয়রহিত বুদ্ধির যোগে মনন করিলে ব্রহ্ম প্রকাশিত হন, এই ঋষিবাক্য মিথ্যা হয় এবং আধ্যাত্মিক যোগের শিক্ষা ও ব্রাহ্মধর্মের মূল বিশ্বাস বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত হইয়া যায়।"

এই চিঠির উত্তরে গোস্বামী মহাশয়ের চিঠি পাইয়া তিনি পুনরায় তাঁহাকে লিখিলেন—"যদি জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি অপরা বিদ্যা শিক্ষার জন্য আচার্যের আবশ্যক হয়, তবে কি সর্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মবিদ্যার জন্য আচার্যের আবশ্যক হইবে না?... সদ্‌গুরুর নিকটে শিক্ষা লাভ করাই একমাত্র উপায়।

"পৌত্তলিককে নিরাকার ব্রহ্মোপাসক করাই ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য। পৌত্তলিককে তাহার ভ্রান্তি বুঝাইয়া দিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ কর, কিন্তু এ কথা বলিও না যে, 'যাঁহার যাহা বিশ্বাস, তিনি তাহাই সরলভাবে সাধন করুন, কালে সত্যলাভ করিবেন।' এ কথা বলিলে কালেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়, আচার্য কর্তৃক উপদেশের আবশ্যক থাকে না।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চুঁচুড়ায় ও বোম্বাই সমুদ্রতীরে বাস শেষজীবনের কথা অন্তিমকাল

মসূরী পাহাড় ছাড়িয়া দেবেন্দ্রনাথ রেলযোগে কাশী পর্যন্ত আসিলেন ও সেখান হইতে বজরায় গাজিপুরে উপস্থিত হইয়া গাজিপুরে কিছুদিন কাটাইলেন। গাজিপুর হইতে উত্তরের দিকে বরাবর বজরায় গিয়া আবার মসূরীতে যাইবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা হইল। ঘর্ঘরা নদী পাড়ি দিয়া বজরা গঙ্গায় আসিয়া পড়িল এবং বাঁকিপুরে পৌছিল। শাস্ত্রী মহাশয়কে তিনি লখনউ গিয়া তাঁহার জন্য একটা বাড়ি ভাড়া করিতে বলিলেন। পরদিন সকালবেলায় তাঁহার নামে এক ঝুড়ি চিঠি আসিয়া উপস্থিত— তাহার একটি চিঠিতে তাঁহার বড়ো জামাই শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুসংবাদ ছিল। তিনি সেই চিঠি পড়িয়া বলিলেন, "সারদা আমার আগেই চলিয়া গেলেন কেন জান? তিনি আমার জন্য পরলোকে বাড়ি ঠিক করিতে গিয়াছেন।" এ কথা বলিবার কারণ সারদাপ্রসাদ প্রায় সর্বদাই যেখানে যেখানে দেবেন্দ্রনাথ যাইতেন, সেখানে সেখানে আগেভাগে বাড়ি ঠিক করিয়া রাখিতেন। এই মৃত্যু-সংবাদ পাওয়ার জন্য মসূরী পাহাড়ে আর যাওয়া হইল না। তিনি বলিলেন, "বাড়ির সকলে শোকাচ্ছন্ন। তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার জন্য একবার বাড়ি যাইব।" বাঁকিপুর হইতে রেলে করিয়া প্রথমে তিনি শান্তিনিকেতনে এবং সেখান হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। বাড়িতে মাত্র তিন দিন থাকিয়া বজরায় করিয়া আবার গঙ্গায় বাহির হইয়া পড়িলেন।

১৮৮৪ সালে জানুয়ারি মাসে চুঁচুড়ায় গঙ্গাতীরে ওলন্দাজের আমলের তৈরি একটা দোতলা প্রকাণ্ড বাড়ি দেবেন্দ্রনাথের বাসের জন্য স্থির হয়। এই সময়ে আর-একটা নিদারুণ মৃত্যুশোক তাঁহার জীবনে উপস্থিত হইল। এই বছরের ২৫ পৌষে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে কেশবচন্দ্রকে দেখিবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ কমলকুটীরে গিয়াছিলেন। সেই তাঁহাদের শেষ দেখা! দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হইতে ব্রহ্মানন্দ ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং দেবেন্দ্রনাথ গভীর প্রেমের সঙ্গে তাঁহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া নিজের আসনের পাশে বসাইলেন। কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের হাত ধরিয়া

নিজের মাথায় রাখিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার রোগের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"আমি কেবল তোমাকে দেখিবার জন্যই কলিকাতায় আসিয়াছি। আমি সেই তোমাকে আচার্য ও প্রচারক করিয়া যে পরিব্রাজক হইয়াছিলাম, এখনও তাহাই আছি। তুমিই আচার্য ও প্রচারক। ব্রাহ্মধর্ম চারি প্রাচীরের মধ্যে বদ্ধ ছিল, এখন ইউরোপ আমেরিকা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে।"— এ কথাগুলির মধ্যে যে এতটুকখানি স্নেহের অতিশয়োক্তি নাই, তাহা আমার পাঠকেরা নিশ্চয়ই বুঝিবেন। কারণ সত্যই ব্রাহ্মসমাজের বিচ্ছেদের পর হইতেই দেবেন্দ্রনাথের পরিব্রাজক জীবনের আরম্ভ। কেশবচন্দ্রের প্রতি তাঁহার হৃদয়ের কী অসাধারণ প্রেম ছিল! তাঁহার মৃত্যুতে দেবেন্দ্রনাথের নিদারুণ আঘাত পাইবার কথা— কিন্তু এখন তিনি মুক্ত পুরুষ; সংসারের সুখদুঃখ তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। যদি সংসারের শোকতাপ একটুও তাঁহাকে ঘা দিতে পারিত, তবে এই চুঁচুড়ায় বাসের সময়ে পরে পরে তাঁহার যে কয়টি প্রিয়জনের মৃত্যু ঘটিয়াছিল, তাহার শোক তাঁহাকে একেবারে অভিভূত ও মুহ্যমান করিয়া ফেলিত। প্রথম তাঁহার "হৃদয়ের ব্রহ্মানন্দ" কেশবচন্দ্রের মৃত্যু, তার পর তাঁহার তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথের মৃত্যু, তার পর তাঁহার প্রিয়তম বন্ধু শ্রীকণ্ঠ সিংহের মৃত্যু; যে-কোনো মানুষ এই বয়সে এতগুলা শোক পাইলে পাগল হইয়া যাইত। কিন্তু এ-সকল মৃত্যু তাঁহাকে আঘাত মাত্র করিল না। কি আশ্চর্য!

চুঁচুড়ার বাড়িতে বাস করিবার সময়ে একদিন খবর আসিল হেমেন্দ্রনাথের কঠিন ব্যামো হইয়াছে। তাঁহার রোগের প্রতিদিনের খবর প্রিয়নাথ শাস্ত্রী দেবেন্দ্রনাথকে শুনাইতেন। একদিন রাত্রে খবর আসিল, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। শাস্ত্রীমহাশয় ভাবিতে লাগিলেন এই নিদারুণ খবর তাঁহাকে কেমন করিয়া দিবেন। সকালে উপাসনার পর তিনি বারান্দায় বেড়াইতে বেড়াইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজকের খবর কি?" শাস্ত্রী বলিলেন, "আজকের খবর ভালো নয়, সেজোবাবুর মৃত্যু হইয়াছে।" "মৃত্যু হইয়াছে" বলিয়া দেবেন্দ্রনাথ একটু দাঁড়াইলেন এবং আবার বেড়াইতে লাগিলেন। ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "তাঁহার সন্তানদিগের ও আমার মধ্যে তিনি একটা বাঁধ ছিলেন, এখন সে বাঁধ ভাঙিয়া গেল, জল আবার আমাতেই আসিয়া ঠেকিল, আমাকেই এখন তাঁহার সন্তানদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়কে পত্র লিখিয়া জানো যে মৃতশরীর কি ভাবে শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। হস্তপদাদি সমানভাবে রাখিয়া আপাদমস্তক বস্ত্রে আচ্ছাদন করত অভ্রমিশ্রিত বস্ত্র ও পুষ্পে

সজ্জিত করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে কি না? আর বিদ্যারত্নকে এখানে আসিতে লেখো, কি প্রকারে হেমেন্দ্রের শ্রাদ্ধ করিতে হইবে, তাহার ব্যবস্থা আমি তাঁহাকে বলিয়া দিব। মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করা উচিত।"

শ্রীকণ্ঠবাবু যখন অন্তিম রোগে আক্রান্ত, তখন তিনি উঠিতে পারেন না, চোখের পাতা আঙুল দিয়া তুলিয়া চোখ মেলিতে হয়। কিন্তু এমনি অবস্থায় কি আশ্চর্য মনের টানে রায়পুর হইতে সেই বৃদ্ধ তাঁহার "অন্তরতর অন্তরতম"কে শেষ দেখা দেখিবার জন্য মেয়ের শুশ্রূষাধীন হইয়া চুঁচুড়ায় আসিয়াছিলেন। কত দূর মনের টান থাকিলে অন্তিম শয্যা হইতে উঠিয়া মানুষ এতদূর পর্যন্ত আসিতে পারে—এ রহস্য কে বুঝিবে! অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয়; মৃত্যু যখন আসন্ন, তখনো 'কি মধুর তব করুণা প্রভো', এই গানটি গাহিয়া "সেই ভক্তকণ্ঠ চিরনীরব হয়।"

অবশ্য এ ঘটনা এই সময়ে ঘটে নাই।—ইহার অনেক পরে। রাজনারায়ণবাবুর ডায়ারি হইতে জানি যে, ১৮৮৪ সালে চুঁচুড়ার বাড়িতে যখন দেবেন্দ্রনাথ প্রথম আসিয়া বাস করেন, তখন শ্রীকণ্ঠ সিংহ মহাশয় প্রায়ই তাঁহার অতিথি। রাজনারায়ণবাবুর সমস্ত জীবনের ডায়ারি সবই প্রায় পোকায় কাটিয়াছে ও লোপ পাইয়াছে, শুধু এই চুঁচুড়ার সময়কার দুই-একখানি খাতা পোকার আক্রমণ হইতে কোনো গতিকে রক্ষা পাইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথের চুঁচুড়ার জীবনের কথা সেই ডায়ারি হইতে জায়গায় জায়গায় উদ্ধার করিয়া দিতেছি—

"১৮৮৪ সাল ১লা শ্রাবণ ১৫ই জুলাই মঙ্গলবার— অদ্য দ্বিজেন্দ্র বাবু ও শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে চুঁচুড়ায় আসা যায়।"

"২রা শ্রাবণ ১৬ই জুলাই বুধবার— অদ্য অপরাহ্নে প্রধান আচার্য মহাশয় কথোপকথনের সময়ে বলিলেন যে, ঈশ্বরে স্থিত হইয়া আমরা সৃষ্ট হইয়াছি, ঈশ্বরে স্থিত হইয়া আমরা জীবিত রহিয়াছি, মৃত্যুর পর ঈশ্বরেই স্থিত হইয়া আমরা অবস্থিতি করিব। আমরা তাঁহা হইতে কখনো পৃথক্ নাই। "In Him we live, move, and have our being."···তিনি ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে বলিলেন যে, ঈশ্বর যেমন অনন্তদেশব্যাপী এবং অনন্তকালস্থায়ী, তেমনি অনন্ত-রূপে গভীর। তিনি যেমন protensive ও extensive, তেমনি intensive। তিনি পরলোক সম্বন্ধে বলিতে বলিতে বলিলেন যে, ঈশ্বরই কেবল অশরীরী, শরীরী।"···

১৬ই শ্রাবণ ৩০ জুলাই বুধবার— অদ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রধান আচার্য

মহাশয়ের পরম বন্ধু অতিবৃদ্ধ ও জীর্ণ শ্রীকণ্ঠ সিংহ এবং নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রধান আচার্য মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শ্রীকণ্ঠবাবু ব্রহ্মসঙ্গীত গান করিয়া আমাদিগকে মোহিত করেন। এত বৃদ্ধ শরীরে এরূপ আনন্দের জোর ক্বচিৎ দেখা যায়।"...

"১৭ই শ্রাবণ ৩১ জুলাই, বৃহস্পতিবার— ...শ্রীকণ্ঠবাবু বৈকাল বেলা গান করেন, তাহাতে অতিশয় আনন্দের উদয় হয়। অপরাহ্ণে প্রধান আচার্য মহাশয় Kant দার্শনিকের মত আমাকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন।"

"১৯এ শ্রাবণ, ২ আগস্ট শনিবার— অদ্য প্রধান আচার্য মহাশয় 'নূতন ধর্ম-মত' শিরস্ক প্রস্তাব সংশোধন করেন।"

"২১এ শ্রাবণ ৪ আগস্ট সোমবার— অদ্য 'নূতন ধর্মমত' প্রস্তাব সংশোধন করিয়া তত্ত্ববোধিনীতে পাঠান যায়। ইহা বঙ্কিম বাবু ও অক্ষয়চন্দ্র সরকারের বিপক্ষে লিখিত।"

"২৯এ শ্রাবণ, ১২ আগস্ট মঙ্গলবার— অদ্য প্রাতে প্রধান আচার্য মহাশয় হাফেজের একটি বয়াত আবৃত্তি করিলেন, তাহার অর্থ এই যে, 'প্রেমের রাজা যখন খেলাত (সম্মানসূচক বস্ত্র) দেন তখন চুপ থাকিতে বলেন' অর্থাৎ ঈশ্বর যখন ব্রহ্মানন্দ দেন তখন সে ব্রহ্মানন্দ বাক্যে ব্যক্ত করা যায় না।"

"৩১এ শ্রাবণ ১৩ আগস্ট বুধবার— অদ্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, উমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ঐক্য স্থাপন জন্য প্রধান আচার্য মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদারও অদ্য প্রাতে ঐরূপ ঐক্য জন্য তাঁহাকে এক পত্র লেখেন।...গোস্বামী প্রভৃতির সঙ্গে কথোপকথনের সময় প্রধান আচার্য মহাশয় বলিলেন যে, ঈশ্বরকে সর্বদা স্মরণ হইবার প্রকৃষ্ট উপায় আপনাকে সর্বদা নিরাশ্রয় ভাবা ও তজ্জন্য ভয়ের ও ব্যাকুলতার উপস্থিতি। 'নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ।' ...সকলেই এই বাক্যের সম্যক্‌রূপে অনুমোদন করিলেন।"

"৩২এ শ্রাবণ ১৪ আগস্ট বৃহস্পতিবার— অদ্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ব্রাহ্ম-দিগের ঐক্যসাধন জন্য প্রধান আচার্য মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মিল হইবার কোন সম্ভাবনা দেখি না, যেহেতু তিনি 'নববিধান' শব্দ ছাড়িতে প্রস্তুত নহেন।...ঐক্য সাধনের নানা উপায় আলোচিত হইল।"

এই সময়েই আচার্য মোক্ষমূলরের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের পত্রব্যবহার হয়। আচার্য মোক্ষমূলরের বেদ, ষড়্‌দর্শন প্রভৃতি বই প্রকাশিত হওয়ায় পাশ্চাত্ত্য দেশের পণ্ডিতমহলে ভারতবর্ষের ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন সম্বন্ধে খুব একটা নাড়াচাড়া

পড়িয়া যায়। সে ঢেউ এ দেশেও আসিয়া লাগে। "মোক্ষমূলর বলেছে আর্য, সেই শুনে সব ছেড়েছি কার্য"— আমাদের দেশেও একদল 'আর্যশিশু' হঠাৎ শিখা উদ্যত করিয়া দেখা দেয়। মোক্ষমূলর দেবেন্দ্রনাথকে তাঁহার *Biographical Essays* পাঠাইয়া দেন ও চিঠি লেখেন। তাহার জবাবে দেবেন্দ্রনাথ লেখেন— "There are branches of knowledge and art in which the East is deficient, and which she must learn from foreign sources. But there are other things all her own, and even your enlightened countrymen may turn with pleasure and profit to a leaf or two out of the books of the East to learn something new...It is to be hoped that the dissemination of the knowledge of our ancient literature will help to cement the bonds of union between the two peoples who, brought up under a common roof, parted from each other and scattered over the distant quarters of the globe, again to be brought together under the mysterious decree of Almighty Providence."

অর্থাৎ জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিল্পের এমন অনেক শাখা আছে, যে-সকল বিষয়ে প্রাচ্য দেশ পিছাইয়া আছে এবং পশ্চিমের কাছে যে-সকল বিষয় তাহাকে শিখিতে হইবে। কিন্তু আবার তাহার নিজস্ব অনেক জিনিস আছে এবং সুসভ্য পশ্চিমবাসীরা প্রাচ্য দেশের প্রাচীন গ্রন্থের দু-এক পাতা উল্টাইয়া নূতন কিছু শিক্ষা করিতে পারেন। আশা করা যায় যে, সেই-সকল প্রাচীন গ্রন্থের যত প্রচার হইবে, ততই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জাতিদের মধ্যে বন্ধন আরো দৃঢ় হইবে এবং যাহারা এক সময়ে এক জায়গায় ছিল ও কালক্রমে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহারাই আবার বিধাতার নিগূঢ় বিধানে মিলিত হইবে।

ব্রাহ্মসমাজের বিচ্ছেদসম্বন্ধে সেই চিঠিতে তিনি লেখেন যে, বিচ্ছেদের দ্বারা আপাত অনিষ্ট ঘটিতে পারে, কিন্তু তবু নৈরাশ্যের কারণ নাই। বীজ বপন করা গিয়াছে, কালে ফসল ফলিবেই— ফলের আকাঙ্ক্ষা ছাড়িয়া নিজের নিজের ভাবে কাজ করিয়া গেলেই হইল— ফলদাতা ঈশ্বর স্বয়ং। "We must work and labour each in his own sphere and according to his own light, regardless of consequences. The crowning and fruition of our work rests with God alone.

দেবেন্দ্রনাথের ভক্ত ও অনুরাগী শিষ্য শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ মহাশয়কে তিনি এই সময়ে এক চিঠি লেখেন। তাহাতেও তাঁহার চুঁচুড়ার জীবনযাত্রার শান্তি ও আনন্দের গভীরতার চমৎকার পরিচয় পাওয়া যায়। চিঠিখানি নীচে তুলিয়া দিলাম—

চুঁচুড়া
৩রা বৈশাখ ৫৫

"প্রেমাস্পদেষু—

এখানে এখন গঙ্গা নদীর উপরে আছি—সকল স্থানেই তাঁহার আবির্ভাব ও মহিমা। এখানে উষার শোভা, সন্ধ্যার শোভা, গঙ্গার লহরী, বায়ুর হিল্লোল আমার জীর্ণ ও ভগ্ন শরীরের সেবা করিতেছে। ধন্য দেব পূর্ণব্রহ্ম! সেখানে হিমালয়ে এক প্রকার সুখদুঃখ ছিল, এখানে আর এক প্রকার সুখ দুঃখ। সুখদুঃখ এ সংসারে অহর্নিশি বিচরণ করিতেছে। যতদিন এ শরীর থাকিবে, ততদিন সুখদুঃখের ও প্রিয়াপ্রিয়ের অব্যাহতি নাই। যে ভাগ্যবান পুরুষ অধ্যাত্ম যোগ-দ্বারা পরমেশ্বরকে জানিয়া তাহাতে আপনার আত্মাতে সংস্থাপিত করিতে পারে, সেই সুখদুঃখেতে অক্ষত থাকিতে পারে। সুখেতেও আমারদের মঙ্গল হয় দুঃখেতেও আমারদের মঙ্গল হয়। সুখ এবং দুঃখ উভয়ই মঙ্গলের পথে চলিবার সোপান। আমার এখনো প্রতিদিন জোলাপ লইতে হইতেছে এবং দিন দিন শরীরের অপচয় হইতেছে। তোমার সেই বেদনা শরীর হইতে যাইতেছে না, এইক্ষণ ঘাড়ের বেদনাতে বড়ই কষ্ট পাইতেছ ইহাতে দুঃখিত হইলাম। মসুরীতে এবং দেহরাধূনে তোমার সঙ্গ পাইয়া যে সন্তোষ লাভ করিয়াছি তাহা আমার হৃদয়েতে মুদ্রিত আছে—আবার কি সে দিন ফিরিয়া আসিবে। আমার প্রতি তোমার যে অটল অনুরাগ তাহা আমার চিত্তকে অতিমাত্র আকর্ষণ করিয়াছে। তোমার সেই গভীর জ্ঞানগর্ভ বাক্য সকল আবার কবে শুনিতে পাইব তাহার প্রতীক্ষা করিতেছি। তোমার দাদা নিষ্কর্মা হইয়া অতি কষ্টে দিন কাটাইতেছেন, ঈশ্বর তাঁহাকে রক্ষা করুন। ইতি

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ—

পুনশ্চ :—এ বৎসর Duke and Duchess of Connaught কি মসুরীতে এই গ্রীষ্মকালে বাস করিতেছেন। তোমাদের General সাহেব এখন কোথায়।"

দানে দেবেন্দ্রনাথ যে কী আশ্চর্য রকম মুক্তহস্ত ছিলেন, তাহার অনেক পরিচয় তো আমরা পাইয়া আসিয়াছি। এখানেও তাঁহার অসাধারণ বদান্যতার একটি পরিচয় পাই।

কালীমোহনবাবু লিখিয়াছেন—

"দেরাদুনে আমার সর্বজ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহে ঋণ এবং পূর্ব ঋণ সহ প্রায় তিন হাজার টাকা ঋণী হই, তাহার উপরে সাংঘাতিক পীড়াক্রান্ত হওয়ায় বাধ্য হইয়া পনেরো মাসের ফার্লো বিদায় লইয়া ঢাকায় আসি। বৃহৎ পরিবার— অর্ধ বেতনে ব্যয়নির্বাহ হইবে কি প্রকারে, এই চিন্তা ইত্যাদি অবস্থা পত্রদ্বারা মহর্ষি মহাশয়কে জানাই।" তিনি তৎক্ষণাৎ তিন হাজার টাকার চেক পাঠাইয়া দেন।

কালীমোহনবাবু চেক ও চিঠি পাইয়া উত্তর দেন যে, তাঁহার ঋণ মারাত্মক নয়, ঈশ্বর-কৃপায় পরিশোধ হইবে। মহর্ষি তাঁহাকে ছেলের মতো স্নেহ করেন; তাঁহার প্রসাদ গ্রহণে তাঁহার কোনো লজ্জা কিংবা অপমান হইতে পারে না; তবে এখন এ অর্থ গ্রহণ করা অনাবশ্যক। তিনি ঐ টাকাটা ফেরত পাঠাইয়া দিবার জন্য অনুমতি ভিক্ষা করেন। তখন দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে লেখেন—

ওঁ

প্রেমাস্পদেষু—

তুমি আপনাকে দরিদ্র বল, কিন্তু তোমার মত ধনী কোথায়? কোন্ ধনীর এত ধন যে সে নিজের পরিশ্রমের ধন ভিন্ন আর ধন চায় না। তোমার মনের ভাব অতি উচ্চ, পৃথিবীতে ইহা দুর্লভ। তুমি লিখিয়াছ যে, "এখন ঋণ পরিশোধার্থ আমার টাকার দরকার নাই" এবং আমার আর্থিক দান গ্রহণ করিতে অক্ষম জানাইয়াছ। অতএব তোমার এই অভিপ্রায় মত লিখিতেছি যে, তুমি আমার প্রেরিত চেক্ আমার নামে ইণ্ডর্স করিয়া আমার নিকটে ফেরৎ পাঠাইবে। তুমি পেন্সন লইয়া কলিকাতা কিম্বা ঢাকায় থাকিবার সুবিধা দেখিবে। যে কোন কার্য তোমার হস্তে পড়িবে, তাহা অতি নিপুণতার সহিত তুমি নির্বাহ করিতে পারিবে, ইহাতে তোমার পরিবারের ভরণপোষণের ভাবনা কিসের। তোমার সচ্চরিত্র ও তোমার কর্মদক্ষতা, তোমার অমোঘ সম্পত্তি ও তোমার অটল সহায়। আমার শরীর ক্রমিক অবসন্ন হইতেছে। এই ভগ্ন শরীর আমার আত্মাকে আর ধারণ করিতে পারে না। এখন পৃথিবীর ধার অতি অল্পই ধারি। দুই প্রহরের সময় ডাল ভাত, মাছের ব্যঞ্জন ও মধ্যে মধ্যে ফল জল ভিন্ন কোন প্রকার পুষ্টিকর

আহার আর আমার সহ্য হয় না। আমার চলা বলা প্রায় বন্ধই হইয়াছে। ঈশ্বর তোমাকে সাংসারিক বিপদ্ বিঘ্ন হইতে কুশলে রক্ষা করুন এবং তোমার আত্মার বল দিন দিন বৃদ্ধি হউক এই আমার প্রার্থনা।

৬ই পৌষ ৫৭

নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দেবশর্মা।

১৮৮৫ সালে দেবেন্দ্রনাথ বোম্বাই যাত্রা করেন। তাঁহার মনের ইচ্ছা ছিল যে জীবনের বাকি কয়টা দিন বোম্বাইয়ের সমুদ্রতীরে কোনো নির্জন জায়গায় কাটাইয়া দিবেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, একেবারে নিভৃতে লোকের চোখের আড়ালে তিনি বাস করিবেন। কিন্তু সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। তিনি আসিতেছেন শুনিয়া ভোলানাথ সারাভাই প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য লোক আমেদাবাদ স্টেশনে আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং সেখানে যে-কয়দিন ছিলেন, প্রতিদিন বিস্তর লোক তাঁহার কাছে আসিতে লাগিলেন। প্রার্থনা-সমাজে এক-দিন তাঁহাকে উপাসনা করিতে হইল। ইহার পর বন্দোরায় সমুদ্রের উপরে তাঁহার জন্য এক বাড়ি ভাড়া করা হইল। সমুদ্রের জোয়ার আসিলে সে বাড়ির নীচের সিঁড়ি পর্যন্ত জলে ভরিয়া যাইত। আমেদাবাদ ছাড়িয়া সেইখানে তিনি বাস করিতে লাগিলেন। তিনি যে ঘরে থাকিতেন তাহার সামনেই "ফেনিল নীল অনন্ত সিন্ধু"। সেই সমুদ্রের দিকে চাহিয়া কখনো-বা তিনি ধ্যানে নিমগ্ন; কখনো-বা ভাবাবেশে কণ্ঠ ছাড়িয়া দিয়া তিনি গাহিতেন—"চমৎকার অপার জগৎ রচনা তোমার" বা "শান্তিসমুদ্র তুমি গভীর অতি অগাধ আনন্দরাশি"। বাহিরের সমুদ্রের মতো তাঁহার চিত্ত-সমুদ্রও কখনো-বা সমাহিত, কখনো-বা উচ্ছ্বসিত।

বোম্বাইয়ে বাস করিবার সময়ে একটা আশ্চর্যের বিষয় এই দেখা যায় যে, তিনি পৌত্তলিক, ব্রাহ্ম, আর্য, থিয়সফিস্ট সকল সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গেই মিশিয়াছেন ও তাঁহাদের কাছে শ্রদ্ধা ও সমাদর পাইয়াছেন। আর্যসমাজের লোকেরা একদিন তাঁহাকে লইয়া উৎসব করিলেন। থিয়সফিস্ট সম্প্রদায়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত তুকারাম তাত্যা দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল যে, সমুদ্রতীরেই তাঁহার জীবনের শেষ দিনগুলি কাটাইবেন। কিন্তু ছয়মাস যাইতে না যাইতে তাঁহার মাথা ঘোরার ব্যামো দেখা দিল। কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু, তাঁহার জামাতা জানকীবাবু, শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী প্রভৃতি তাঁহার শুশ্রূষার জন্য গেলেন। সেখানকার

ডাক্তারদের পরামর্শে তাঁহাকে সমুদ্রতীর ছাড়িয়া চুঁচুড়ায় চলিয়া আসিতে হইল। ১৮৮৬ সালের আষাঢ় মাসে তিনি বোম্বাই ছাড়িলেন।

চুঁচুড়ায় ফিরিয়া আসিয়া তিনি সুস্থ হইলেন বটে, কিন্তু শরীরের দুর্বলতা বাড়িয়াই চলিল।

এই সময়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ সকলে মিলিয়া মাঘোৎসবের পরে তাঁহাকে দেখিতে আসিবেন, তাঁহার উপদেশ ও আশীর্বাদ গ্রহণ করিবেন, এবং এক অভিনন্দনের দ্বারা তাঁহার প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিবেন, এই এক প্রস্তাব উপস্থিত হয়। দেবেন্দ্রনাথের শরীর যদিও তখন খুবই দুর্বল, তবু তিনি পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও শিবচন্দ্র দেব মহাশয়দের একান্ত অনুরোধে এই প্রস্তাবে রাজি হইলেন। ১৭ই মাঘে নানা রঙের নিশান ও ফুলপাতা দিয়া সাজানো একখানি স্টীমারে প্রায় পাঁচশত ব্রাহ্ম ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা দেবেন্দ্রনাথের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্থলপথে আরো অনেক ব্রাহ্ম আসিলেন— সবসুদ্ধ প্রায় হাজার লোক তাঁহার অতিথি। দেবেন্দ্রনাথের স্নানাহারের সময় অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট থাকিত; তাঁহাকে নিয়মিত সময়ে স্নানাহার করাইবার জন্য বিশেষ বিশেষ ভৃত্য নিযুক্ত থাকিত। কিন্তু সেদিন তাঁহার বাড়িতে এত অতিথি; তিনি বেলা ২টা পর্যন্ত সেই ভগ্ন শরীরে আতিথ্যের বন্দোবস্ত করিতে ব্যস্ত। কোথায় কী হইতেছে, কে কোথায় কোন্ কাজে নিযুক্ত আছেন— সমস্ত খবর তাঁহার জানা চাই। ব্রহ্মসংকীর্তন ও ব্রহ্মোপাসনা হইয়া গেলে আহার হইল এবং তার পরে ২টার সময় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেব ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে সভাতে উপস্থিত করিলেন। শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা সরকার তাঁহার গলায় ফুলের মালা দিলেন; পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় অভিনন্দন পাঠ করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ সেই অভিনন্দনের উত্তরে যাহা লিখিয়াছেন, তাঁহার আদেশে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী তাহা পড়িলেন। তাহাতে তিনি বিশেষভাবে এই কথাই বারবার বলিলেন, "ব্রাহ্মধর্মের ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্য যাহা কিছু বলিয়াছি, যাহা কিছু করিয়াছি তাহা কেবল তাঁহারই কৃপাতে— তাঁহারই সাহায্যে।··· তাঁহার কৃপাতে মাটি যে, সে সোনা হয়, পঙ্গু গিরিকে লঙ্ঘন করে।" তার পরে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার "উপহার" বা ব্রাহ্মদিগের প্রতি তাঁহার শেষ উপদেশ দিলেন। সে "উপহার" ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান ও অনুশাসনেরই সংক্ষিপ্ত সারের মতো। তখন তাঁহার পক্ষে কিছু নূতন বলা অসম্ভব। শরীর তাঁহার তখন এমনি অপটু।

অভিনন্দনের ব্যাপার চুকিয়া গেল বটে, কিন্তু এই ঘটনার জন্য মানসিক উত্তেজনায় তাঁহার জ্বর হইয়া পড়িল। ডাক্তারেরা আসিয়া বলিলেন, সাতদিনের মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইবে। ১০৪।৫ ডিগ্রি জ্বর, উত্থানশক্তিরহিত। তার সঙ্গে পেটের অসুখ। তাঁহার বাড়ির লোকেরা সকলেই অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। তিনি তাঁহার পরিবারস্থ একজনকে ১৫০০০ টাকা দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলেন— শরীরের অবস্থা বুঝিয়া তিনি রাত্রেই চেক সই আনাইয়া তাহাতে সেই টাকা তাঁহার নামে সই করিয়া রাখিয়াছিলেন। এমনি তাঁহার আশ্চর্য সত্যনিষ্ঠা! তাঁহার অসুস্থতার খবর পাইয়া রাজনারায়ণবাবু দেওঘর হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ডায়ারি হইতে আবার এ সময়ের বিবরণ উদ্ধার করি—

"১৫ই ফাল্গুন ২৫ ফেব্রুয়ারি শনিবার— অদ্য রেলগাড়িতে চুঁচুড়ায় আসি, আসিয়া দেখি প্রধান আচার্য মহাশয়ের অবস্থা অতি সঙ্কটাপন্ন। সকলেই ব্যাকুল। সকলেই মনে করিলেন যে, অদ্যই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিবেন।"

"১৬ই ফাল্গুন, ২৬ ফেব্রুয়ারি রবিবার— অদ্য প্রধান আচার্য মহাশয়কে একটু সুস্থ দেখিয়া আমরা কিঞ্চিৎ স্থির হইলাম, কিন্তু এখনও কিছু বলা যায় না।..."

"১৮ই ফাল্গুন, ১ মার্চ মঙ্গলবার— ...অদ্য প্রধান আচার্য মহাশয় আমাকে উপরে ডাকাইয়া লইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার অত্যন্ত শীর্ণ শরীর দেখিয়া আমি আঁতকিয়া উঠিলাম। এমনি কৃশ হইয়া গিয়াছেন। তিনি বলিলেন যে, তিনি এক্ষণে "দৃষ্টিহীন, নাড়িক্ষীণ"। দিবারাত্রির গতি অনুভব করিতে পারেন না। "ন দিবা, ন রাত্রি শিব এব কেবলং"কে দেখিতেছেন। এই কথা যখন বলিলেন তাঁহার অশ্রুপাত হইল! বিদায় হইবার সময় তাঁহার পদধূলি লইলাম। এরূপ পূর্বে কখন করি নাই। মন কি পর্যন্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিল তাহা বর্ণনা করিতে পারি না। যখন মনে করিলাম যে হয়ত তাঁহার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না, তখন আকুল হইয়া পড়িলাম। নীচে আসিয়া অনেকক্ষণ লোকের সহিত কথা কহিতে পারিলাম না। হায়! হায়! চিরকালের "Guide, Philosopher and Friend" আমাকে ছাড়িয়া যাইতেছেন। ইহা অপেক্ষা পৃথিবীতে কষ্টকর বিষয় কি হইতে পারে?"

কয়েকদিন পরে জ্বরের মাত্রা একটু কমিতে একদিন তিনি দোয়াত, কলম, কাগজ চাহিলেন। কাগজে লিখিলেন—

"আমার শরীর এখন mechanical force দ্বারা অপর কর্তৃক চালিত হইতেছে।

"Chemical laboratory আমার শরীর হইয়াছে, তাহার… * আমার শরীরে প্রাণ সঞ্চরণ করিতেছে। এ প্রপঞ্চোপশম শান্ত মঙ্গলস্বরূপ পরমাত্মার ক্রোড়ে আমার আত্মা নিহিত হইয়া রহিয়াছে।

"এই কয় ছত্র আমার আত্মা এই শরীরযন্ত্রযোগে বাহিরে প্রকাশ করিল।

"এখন এই মর্মবেধকর যন্ত্রণা নাই— সকলই শান্ত !

চুঁচুড়া
১৪ ফাল্গুন ৫৭"

ইহার পরে আবার জ্বরের মাত্রা এত বাড়িয়াছিল যে, তাঁহাকে একটু দুধ পর্যন্ত খাওয়ানো যাইত না। সাহেব ডাক্তার এক রাত্রি তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন রাত্রি কাটে কি না সন্দেহ। সে রাত্রি এবং তাহার পরের রাত্রিও কাটিল। সকালবেলায় তিনি বিছানাতে বালিশ ঠেস দিয়া বসিয়াছেন। বলিতেছেন— "এ কি শুনিলাম ! ঈশ্বরের আদেশ ! ঈশ্বর বলিলেন, হে প্রিয় পুত্র, তুমি এ যাত্রা রক্ষা পাইলে। তুমি এখনো সম্পূর্ণরূপে তোমার গম্যস্থানের উপযুক্ত হও নাই, যখন তুমি সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত হইবে, তখন তোমাকে তোমার গম্যস্থানে লইয়া যাইব।"

শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী লিখিয়াছেন, "চুঁচুড়ার বাড়িতে পিতার যখন কঠিন পীড়া হয়, তখন আমি আর আমার ন বোন স্বর্ণ তাঁহার সেবার জন্য গিয়াছিলাম। কিন্তু পাছে আমাদের কোনো অসুবিধা হয় সেজন্য তিনি অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন। সেই অবস্থাতেই আমাদের শোবার খাবার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া তবে তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। তাঁহার কাছে থাকিয়া কেহ কোনো বিষয়ে অসুবিধা ভোগ করিবে ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না— এমন-কি ভৃত্যদেরও কোনো অসুবিধা তাঁহার ভালো লাগিত না।"

ক্রমে তিনি সুস্থ হইয়া উঠিলেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর নিজের ষ্টীমার তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলেন এবং তাঁহার চৌরঙ্গীর বাড়িতে দেবেন্দ্রনাথের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এক মাস সেখানে থাকিয়া তিনি এতটুকু বল পাইলেন যে দুইজন মানুষের কাঁধে ভর করিয়া একটু চলিতে ফিরিতে

* একটি কথা এখানে বুঝা গেল না।

পারেন। তখন তিনি বলিলেন, "এই কলিকাতার বদ্ধ বাতাস ও আকাশের মধ্যে আর আমি থাকিতে পারি না। আমি দার্জিলিং যাইব।" একবার সংকল্প স্থির হইলে তাঁহাকে টলানো কাহারো সাধ্য ছিল না। তিনি দার্জিলিঙে গেলেন। তাঁহার কোনো কোনো কন্যা ও জামাতা তাঁহার সেবার জন্য দার্জিলিঙে যাইতে চাহিলেন। তিনি নিষেধ করিয়া চিঠি লিখিলেন— "এখন আমার সম্যক্‌রূপে যতির ধর্ম পালন করা নিতান্ত প্রয়োজন, অতএব পরিজনের সঙ্গ হইতে বিবর্জিত হইয়া একান্ত নির্জনে তাঁহার সহিত যোগযুক্ত হইয়া থাকিতে হইবে। ২৬এ বৈশাখ— ৫৮ ব্রাঃ সম্বৎ— দার্জিলিং।"

শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা সরকার দেবেন্দ্রনাথের একজন স্নেহের পাত্রী ছিলেন। তিনি এ সময়ে দার্জিলিঙে ছিলেন; এবং এ সময়ের স্মৃতি ১৩১৬ সালের অগ্রহায়ণের 'প্রবাসী'[১] পত্রে একবার লিখিয়াছিলেন। তাঁহার সেই রচনা হইতে কতক কতক অংশ উদ্ধার করিয়া দেওয়া গেল:

"মধ্যাহ্ন সময়ে যখন সমগ্র প্রকৃতি কিয়ৎক্ষণের জন্য নীরব হইত, সেই সময়ে আমি অনেক দিন তাঁহার নিকট যাইতাম। ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত, রাজা রামমোহন রায়ের কথা, মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ ও সাধনা, তৎপরে প্রচার ইত্যাদি নানা কথা তাঁহার নিকটে শুনিতাম। তাঁহার নিকট অবস্থান সময় আমার কি আনন্দ ও তৃপ্তিতে কাটিত তাহা সমুচিতরূপে ব্যক্ত করিতে পারি না। যখন তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতাম, তখন মনে হইত, ব্রহ্মলোক হইতে ধরায় অবতরণ করিতেছি।...

"কতদিন তিনি কথা কহিতে কহিতে গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া গিয়াছেন এবং আমি বিস্ময়স্তিমিত অন্তরে তাঁহার বদনমণ্ডলের প্রতি অনিমেষ দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিয়াছি।... কখনও কখনও তিনি কথা কহিতে কহিতে উৎসাহে অগ্নিপ্রায় হইয়া আসন ত্যাগ করিয়া উঠিতেন এবং আমার স্কন্ধে হস্ত দিয়া প্রকাণ্ড বারাণ্ডায় পাদচারণায় প্রবৃত্ত হইতেন।

"দার্জিলিং থাকিতে তিনি ১৮৮৭ খৃস্টাব্দের ৩রা জুন আমাদের গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন। সেদিন তিনি আমাদের যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন নিম্নে তাহা প্রকটিত হইতেছে—

" 'আজ আমি তোমাদিগকে কতকগুলি কথা বলিব। আমার দীর্ঘজীবনে যে সকল সত্য উপার্জন করিয়াছি তাহারই কয়েকটি তোমাদিগকে বলিব।...

[১] "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মৃতি", পৃ ৫৭৪।

আমার জীবনগ্রন্থলিখিত কয়েকটি প্রত্যক্ষ কথা।...আমার শরীর এখন জরাভরে অবনত, আমার চক্ষু নিষ্প্রভ, কর্ণ দুর্বল, বাক্‌শক্তি ক্ষীণ ও হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকল ;... আত্মা আর এই জরাজীর্ণ ও ব্যাধিক্লিষ্ট দেহভার বহন করিতে পারে না, তাই সময় সময় মনে হয় কেন এই জরা ও রোগগ্রস্ত মাংসপিণ্ডের ভার বহন করিতে আজিও পৃথিবীতে জীবিত রহিলাম ?... গভীর রূপে চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলে দেখি পৃথিবীতে আমার আত্মার শিক্ষা এখনও সমাপ্ত হয় নাই তাহা সম্পূর্ণ করিবার উদ্দেশেই ঈশ্বর এখনও আমায় পৃথিবীতে রাখিয়াছেন এবং বার বার মৃত্যুমুখে ফেলিয়া আসন্নকালের কথা স্মরণ করাইয়া তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে আমায় অবসর দিতেছেন।... ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য আমার আরও শরীরসংযম আবশ্যক, সেইজন্য তিনি ইন্দ্রিয়ের শক্তি সকল হ্রাস করিয়া আমাকে পরলোকে তাঁহার সহবাসের যোগ্য করিয়া লইতেছেন।...

" 'এইরূপে বাহ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বার সকল যেমন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে, সেইরূপ আত্মার ইন্দ্রিয়ের দ্বার সকল ক্রমশঃ উন্মুক্ত হইতেছে। জীবনসন্ধ্যায় বাহিরের জগৎ ক্রমশঃ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে, বাহিরের ধ্বনি নীরব, কিন্তু আত্মার গৃহ দিন দিন উজ্জ্বলতর আলোকে জ্যোতির্ময় হইতেছে ও তাঁহার মধুর গম্ভীর ধ্বনিতে তাহা প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এইরূপে একদিকে শান্ত সন্ধ্যার নিস্তব্ধ গাঢ় অন্ধকার আমাকে বেষ্টন করিতেছে, অপরদিকে বিমল উষার মধুর শুভ্র জ্যোতিঃ ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইতেছে।'...

"আর এক দিনের কথা স্মরণে আসিতেছে। সেদিন প্রভাতে আমি তাঁহার গৃহে গিয়াছিলাম। আমি সাধারণতঃ মধ্যাহ্ন সময়েই তাঁহার নিকটে যাইতাম, অন্য সময়ে নহে। সেদিন কেন প্রভাতে গিয়াছিলাম তাহা স্মরণ হইতেছে না। গিয়া দেখি সার্সীবেষ্টিত প্রকাণ্ড বারান্দায় তিনি উপাসনায় আসীন, গৃহ ধূপ ও ধূনার মধুর সৌরভে আমোদিত। মহর্ষি বাষ্পরুদ্ধ স্বরে জরাস্খলিত কণ্ঠে গাহিতেছেন—

প্রথম নাম ওঙ্কার ভুবনরাজ দেবদেব
জ্ঞানযোগে ভাব হে তিনি তোমার সঙ্গে।

গৃহে প্রবেশ করিতে আমার আর সাহস হইল না। পাছে তাঁহার ভজনের বিঘ্ন উপস্থিত হয়। প্রবেশদ্বারের সোপানের উপর আমি ভক্তিনম্র হৃদয়ে সসম্ভ্রমে বসিয়া রহিলাম। কতক্ষণ এরূপভাবে বসিয়া ছিলাম মনে পড়ে না, কিন্তু আমার সেই সময়ে সেই গৃহকে ভগবৎ-আবির্ভাবে কিরূপ পরিপূর্ণ বলিয়া বোধ

হইয়াছিল তাহা সমুচিতরূপে প্রকাশ করিতে পারিতেছি না।... বহুক্ষণ পরে যখন উঠিলাম, তখনও তিনি ব্রহ্মপূজায় নিমগ্ন, আমি সকলের অলক্ষ্যে ধীরপদে তাঁহার ভবন হইতে বহির্গত হইলাম।..."

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছে গল্প শুনিয়াছি যে, তিনি একদিন দার্জিলিঙে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছেন; প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে বারান্দায় ধ্যানে আসীন দেবেন্দ্রনাথের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন,—"ঐখানে ছয় ঘণ্টা বসিয়া আছেন এবং কখনো কখনো গিরিশৃঙ্গকে মেঘ-মালা দ্বারা আচ্ছাদিত দেখিয়া বলিয়া উঠিতেছেন 'ঘোমটা দিয়াছ কেন, মুখ খোল একবার দেখি!'"

কিন্তু দার্জিলিঙের জলহাওয়া তাঁহার দুর্বল শরীরে সহ্য হইল না— তাঁহার কাশি হইল ও অন্ত্রের ব্যথা বাড়িল। তিন মাস পরে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহার জন্য পার্ক স্ট্রীটে একটি বাড়ি ভাড়া হইল। তিনি নিজের বাড়িতে কেন থাকিতে চাহিলেন না, তাহার কারণ পূর্বেই বলিয়াছি। তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে যতির ধর্ম এখন হইতে তাঁহাকে পালন করিতে হইবে। তাঁহাকে একলা থাকিয়া পরলোকের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

এই পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে বহুকাল তিনি যাপন করেন— প্রায় দশ বছর। তার পরে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আবার ফিরিয়া আসেন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত সেখানেই থাকেন।

পার্ক স্ট্রীটে থাকিতে ১৮৮৭ সালে তিনি শান্তিনিকেতন আশ্রম সর্বসাধারণের জন্য ট্রস্টডীড করিয়া উৎসর্গ করিয়া দেন। ট্রস্টডীডে আছে যে প্রতিবছর ৭ই পৌষে তাঁহার পুণ্য দীক্ষাদিনে শান্তিনিকেতনে উৎসব হইবে এবং উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে একটা মেলা বসিবে। এই মেলা জিনিসটা এ দেশের একটা বিশেষ জিনিস। কোনো পুণ্যদিন বা কোনো পুণ্যশ্লোক-মানুষের স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করিয়া রাখিবার এমন ব্যবস্থা আর-কোনো দেশে উদ্‌ভাবিত হয় নাই। স্মৃতিসভা, বক্তৃতা, মার্বেল-প্রস্তরমূর্তি, বা স্তম্ভের চেয়ে ঢের বেশি বড়ো জিনিস এই মেলা; কারণ এ যে সকল মানুষের জীবনের ভিতরে স্মৃতিকে তাজা করিয়া রাখিবার উপায়!

শান্তিনিকেতন আশ্রমের নিয়মগুলি দেখিলেও তাঁহার অসাম্প্রদায়িক ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও নিয়ম আছে যে, আশ্রমে "নিরাকার এক ব্রহ্মের উপাসনা ব্যতীত কোন সম্প্রদায়বিশেষের অভীষ্ট দেবতা বা পশু, পক্ষী, মনুষ্যের

বা মূর্তির বা চিত্রের বা কোন চিহ্নের পূজা বা হোম যজ্ঞাদি" হইবে না, তবু সেই সঙ্গে সঙ্গে বলা হইয়াছে যে, "কোন ধর্ম বা মনুষ্যের উপাস্য দেবতার কোন প্রকার নিন্দা বা অবমাননা এই স্থানে হইবে না" এবং "এরূপ উপদেশাদি হইবে ...যদ্দ্বারা...সার্বজনীন ভ্রাতৃভাব বর্ধিত হয়।" বিধিনিষেধের মধ্যে আর-একটি নিষেধ এই যে, এ আশ্রমে আমিষ ভোজন ও মদ্যপান হইতে পারিবে না।

যাঁহারা এইরূপ অসাম্প্রদায়িক ভাবে ঈশ্বরের সাধনা করিতে চান, এ আশ্রম তাঁহাদেরি জন্য উৎসর্গ করা হইলেও ট্রস্টডীডে আছে যে, এই আশ্রমে একটি ভালো গ্রন্থাগার ও ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। ১৯০১ সালে দেবেন্দ্রনাথের এই ইচ্ছাটি পূর্ণ হয়। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাছে শান্তিনিকেতন আশ্রমে একটি ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয় খোলার প্রস্তাব করেন এবং দেবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তাহা অনুমোদন করেন। ১৯০১ হইতে ১৯১৬— এই পনেরো বছরে সমস্ত প্রান্তর বিদ্যালয়ের কুটিরে কুটিরে ছাইয়া গিয়াছে এবং ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের নানা জায়গা হইতে প্রায় দুই শত বিদ্যার্থী এই বিদ্যালয়ে আজ পড়িতেছে। নানা পণ্ডিত, গুণী ও রসিক ব্যক্তির সমাগমে আশ্রম দেশবিদেশে বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর দেবেন্দ্রনাথ একদিন গল্পচ্ছলে বলিয়াছিলেন— আমি মনশ্চক্ষে দেখিতেছি সমস্ত মাঠ ছেলেতে ছেলেতে ভরিয়া গিয়াছে!

অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শান্তিনিকেতনের ট্রস্টডীডে বিদ্যালয়ের কথা থাকিলেও, ঐ ট্রস্টডীড যখন তৈরি হয়, তখন এ বিদ্যালয়ের কোনো সম্ভাবনা পর্যন্ত ছিল না। সুতরাং শান্তিনিকেতন আশ্রমের জন্য অত আয়োজন সকলেরি কাছে বৃথা মনে হইয়াছিল। এখানে একটি কাচের মন্দির অনেক খরচ করিয়া তিনি তৈরি করান। মন্দিরটির মেজে শ্বেতপাথরে তৈরি; আর চারি দিকে নানা রঙিন কাচের প্রাচীর এবং অনেকগুলি দরজা। দরজাগুলি মেলিয়া দিলেই চারি দিক একেবারে উন্মুক্ত হইয়া পড়ে। যাহাতে শান্তিনিকেতনের বিশাল প্রান্তরের অনন্তত্বের ভাবটি চাপা না পড়ে, সেইজন্য মন্দিরটির এমনি গড়ন হইয়াছে। তার পর বাগানের চারি দিকে ছোটো ছোটো স্তম্ভ তৈরি করিয়া তাহাতে তিনি ব্রহ্মমন্ত্র লিখাইয়া দেন এবং ছাতিম তলায় তাঁহার ধ্যানের জায়গায় শ্বেতপাথরের বেদী রচিত হয়। মন্দিরে নিত্য দুবেলা উপাসনার জন্য একজন নির্দিষ্ট পুরোহিত নিযুক্ত হন। কেবল মন্দিরটি তিনি দেখিয়া যান নাই— তাঁহার নির্দেশ অনুসারে তাহা তৈরি হইয়াছিল।

কিন্তু কেন? এ-সব কাহাদের জন্য? বাঁধা মাইনে-করা পুরোহিত দিয়া কি ধর্মোপাসনা হয়? হয় না যে, তাহা তিনি জানিতেন। দেবেন্দ্রনাথ পার্ক স্ট্রীটে থাকিতে শ্রীযুক্ত রবিবাবু আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হন, তখন তিনি এই প্রশ্নই একদিন তাঁহার কাছে তুলিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, বেশ তো, তুমি ভালো লোক আনিয়া উপাসনা করাও। কিন্তু সে লোক মেলে কোথায়? দেবেন্দ্রনাথ মনে করিতেন, যত দিন পর্যন্ত ঠিক লোকটি না মেলে, তত দিন একটা সুর ধরিয়া রাখা চাই— একটা আয়োজন প্রস্তুত থাকা চাই। শান্তি-নিকেতনে জনপ্রাণী নাই, তবু ব্রহ্মোপাসনার সুরটুকু সেখানে নিত্য বাজা চাই— সেইজন্যই এত ব্যবস্থা।

অবশ্য সময়ে সময়ে ব্রাহ্মসমাজের কোনো কোনো প্রচারক আসিয়া আশ্রমে বাস করিয়াছেন। তখনকার আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের চেষ্টায় ও যত্নে আশ্রমের বাহিরের সৌষ্ঠব সম্পূর্ণ হইয়াছিল— ব্রাহ্মসমাজের সাধকেরা আসিয়া এখানে তাঁহারি আতিথ্যে পরমানন্দে দিন কাটাইয়াছেন। সেইজন্য সাধারণের মনে বিশ্বাস এই যে, শ্রীযুক্ত রবিবাবুর বিদ্যালয় হওয়ার জন্য দেবেন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন আশ্রম স্থাপনের উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়াছে। যেখানে ছিল নির্জনতা ও শান্তি, সেখানে বসিয়াছে তিনশো লোকের হাট। যাঁহারা এ কথা ভাবেন, তাঁহাদের জানা উচিত যে, বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাও দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং। তিনি সংসারবিমুখ সাধকদের জন্য এই শান্তিনিকেতনের নিভৃত নীড় রচনা করেন নাই। তিনি মনে মনে এই জনতার হাটই কামনা করিয়াছিলেন: এখানে সকল বিচিত্র সাধনার স্থান হইবে এবং সকল সাধনার উপরে থাকিবে ব্রহ্মের সাধনা, ভূমার সাধনা। এখানে জ্ঞানী আসিবেন, বৈজ্ঞানিক আসিবেন, শিল্পী আসিবেন, কর্মী আসিবেন— ক্রমে ক্রমে হয়তো এ একটা বিশ্ববিদ্যালয় হইয়া উঠিবে। কিন্তু সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচিত্র সাধনা এই আশ্রমে ভূমার সাধনার অঙ্গীভূত হইবে। সুতরাং বিদ্যালয় এখানে একটা বিশ্বতীর্থের মতনই হইয়া উঠিবে। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচিত্র তপস্যার মাঝখানে ছোটো ছোটো ছেলেরা মানুষ হইবে। এই আদর্শটি শুধু শিক্ষার পূর্ণ আদর্শ নয়, ধর্মেরও পূর্ণ আদর্শ।

শান্তিনিকেতন আশ্রমে যে এই একটি বৃহৎ ভাবী উদ্যোগের বীজ বপন করা হইয়াছে, তাহা তিনি নিজের ভিতর হইতে বুঝিতেন। সেইজন্য এ জায়গার উপর তাঁহার আশ্চর্য রকমের ভরসা ছিল। শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে কেহ কোনো

নৈরাশ্য বা উদ্‌বেগ প্রকাশ করিলে তিনি বলিতেন— তোমরা কিছু ভেব না, ওখানকার জন্য কোনো ভয় নাই— আমি ওখানে শান্তং শিবং অদ্বৈতংকে প্রতিষ্ঠা করে এসেছি।

ব্রাহ্মসমাজের কাজে যখন তিনি ব্যর্থ হইলেন, তখন কে জানিত যে এই মরুময় প্রান্তরের মাঝখানে তিনি যে ধ্যানের আসনটি পাতিয়াছিলেন, সেইখানে একদিন বিশ্বের প্রাণধারা নানা দিগ্‌দিগন্তর হইতে ছুটিয়া আসিয়া সেই মরুকে এক মহাতীর্থ করিয়া তুলিবে— তাঁহার জীবনের কাজ, তাঁহার অধ্যাত্ম-সাধনা, তাঁহার সামাজিক সাধনা, সমস্তই যে সেখানে নূতন যুগের প্রাণের মধ্যে প্রাণ পাইয়া ক্রমশ আরো উন্নত আরো বিকশিত হইয়া চলিতেই থাকিবে— এ কথা কে স্বপ্নেও মনে করিয়াছিল? যে পূর্ব-পশ্চিমকে তিনি তাঁহার অধ্যাত্ম-সাধনায়, তাঁহার তত্ত্বচিন্তায় মিলাইয়াছিলেন অথচ মিলাইতে গিয়া স্বাজাতিকতাকে এক চুলপরিমাণও খাটো করেন নাই— সেই পূর্ব-পশ্চিমের মিলন যে এখানে আবার বড়ো করিয়া সত্য করিয়া দেখা দিবে, এ কথা কে জানিত! স্বাজাতিকতা ও বিশ্বজাগতিকতা এ দুই যে বর-বধূর মতো এই আশ্রমে মিলিবে এবং এখানেই যে সেই মিলনের নহবত গানে গানে বাজিতে থাকিবে, সে কথাই বা কাহার কল্পনায় জাগিয়াছিল। এই-সব দেখিলে এই কথাই সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, কোনো বড়ো ভাব কোনো দিন মরে না, কোনো বড়ো সাধনার কোনো দিন বিনাশ নাই। বীজ যেমন পচিয়া মরিয়া তবে অঙ্কুরে উদ্‌গত হইয়া ওঠে, বড়ো ভাব ও বড়ো সাধনাকে তেমনি একবার মরিতে হয়, তার পরে কালের কালো অন্ধকারকে ভেদ করিয়া তাহার অফুরন্ত প্রাণ আবার মাথা জাগাইয়া উঠে।

পার্ক স্ট্রীটে তিনি যতকাল পর্যন্ত ছিলেন ততকাল নানা সম্প্রদায়ের লোক তাঁহার কাছে আসিয়াছে, গিয়াছে— সকলকেই তিনি যথাযোগ্য আদর, অভ্যর্থনা ও আশীর্বাদ করিয়াছেন। সকল শুভ কাজে তাঁহার দান এ সময়ে অবারিত ছিল। কন্‌গ্রেসের জন্য শ্রীযুক্ত ডব্লিউ. সি. বাঁড়ুয্যে, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার কাছে কতবার গিয়াছেন, তিনি কন্‌গ্রেসের খরচের জন্য অকাতরে দান করিয়াছেন। রাজা, মহারাজার দল তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন— ধনী দরিদ্র সকলের কাছেই তখন তিনি "মহর্ষি", তিনি ভক্তির পাত্র। দেশের লোকের কাছে তখন তিনি মহা সাধক বলিয়া পুজার্হ হইয়াছেন। কেহ অর্থী, কেহ প্রার্থী— নানা লোক নানা ভাবে তাঁহার কাছে আসিয়াছে— কাহাকেও তিনি ফিরান নাই।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের জন্য জমি কেনা হইলে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় দেবেন্দ্রনাথকে কিছু অর্থসাহায্যের জন্য অনুরোধ জানান। তার পর একদিন তিনি তাঁহার কাছে গিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন— নথি পেয়েছি। নথি মানে টাকার জন্য তাঁহাদের আবেদন-পত্র। শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন, রায় কবে বের হবে? তিনি বলিলেন, হবে এখন। শাস্ত্রী মহাশয় শুনিয়াছিলেন যে দেবেন্দ্রনাথ খোঁজ লইতেছিলেন, কে কে ট্রস্টী হইয়াছেন, ট্রস্টী না হইলে তিনি অর্থ সাহায্য করিবেন না। সেদিন রাজ-নারায়ণবাবু সেখানে ছিলেন— নানা সৎপ্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। হঠাৎ এক সময় দেবেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের হাতখানি ধরিয়া বলিলেন— চলো, বাড়ির ভিতরে কিছু খেয়ে আসবে চলো। এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে ভিতরে লইয়া গেলেন। তিনি নিজের হাতে খাওয়াইতে ভালোবাসিতেন এবং তিনি নিজে যথেষ্ট আহার করিতে পারিতেন বলিয়া লোকে অল্প খাইলে সন্তুষ্ট হইতেন না। শাস্ত্রী মহাশয়কে তিনি নানা রকমের খাবারের জিনিস নিজের হাতে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় যখন দেখেন যে আর তিনি খাইতে পারেন না— তখন তিনি তাঁহাকে শোনাইবার জন্য উঁচু গলায় বলিলেন —আর যে পারি না! দেবেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন— তা হবে না! তোমরা না স্ত্রী-স্বাধীনতার দল? বাড়ির মেয়েরা এই-সব খাবার তৈরি করেছে, এ তোমাকে খেতেই হবে। খাওয়া শেষ হইলে তিনি ফিরিয়া আসিয়া হাতবাক্স আনিতে বলিলেন, চেকে সহি করিবার সময় মুখ তুলিয়া বলিলেন— রায় দেওয়া হচ্ছে। শাস্ত্রী মহাশয়কে চেক্‌খানি দিয়া ইংরাজীতে বলিলেন, "This is my unconditional gift।" তিনি তো অবাক্! তিনি ও তাঁহার বন্ধুরা ভাবিয়া-ছিলেন যে, খুব বেশি হইলে হাজার-দুই টাকা পাওয়া যাইবে। দেবেন্দ্রনাথ সাত হাজার টাকা দান করিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন যে, আনন্দে তখনি বন্ধু-বান্ধবদের এই খবর দিবার জন্য বিদায় লইয়া তিনি চেক্‌খানি ফেলিয়াই বাহির হইয়া পড়িলেন। কিছুদূর গিয়া চেকের কথা মনে পড়িতে আবার ফিরিয়া আসিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার অবস্থা দেখিয়া স্নেহের সঙ্গে হাসিতে লাগিলেন।

পার্ক স্ট্রীটে তাঁহার জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই লিখিবার নাই। তাঁহার কন্যা লিখিয়াছেন, "যখন পার্ক স্ট্রীটে তাঁহার কাছে ছিলাম, দেখিতাম সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি একই চৌকিতে সমানভাবে বসিয়া ঈশ্বরচিন্তায় দিন কাটাইয়াছেন— স্নানাহার ছাড়া আর সমস্ত ক্ষণই তাঁহার মন ঈশ্বরে নিবিষ্ট

থাকিত। কোনো দিন যখন কোনো প্রয়োজনীয় কথা বলিতে যাইতাম তিনি বলিতেন, আমি কোথায় ছিলাম, আমাকে কোথায় আনিলে— তখন মনে অনুতাপ হইত।"

এই সময়ে তাঁহার নিয়ম ছিল, মাসের প্রথম তিন দিন তিনি হিসাব-পত্র শুনিতেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তি এমন অসাধারণ ছিল যে শ্রীযুক্ত রবিবাবুর কাছে গল্প শুনিয়াছি যে, হিসাবে কোথাও কোনো দুর্বলতা থাকিলে সেটা তাঁহার কাছে ধরা পড়িতে কিছুমাত্র দেরি হইত না। তিনি মনে মনে সমস্ত হিসাবগুলি যোগ করিয়া যাইতেন— পূর্ব পূর্ব মাসে কী বাবদ কী খরচ হইয়াছে তাহাও তাঁহার স্মরণে আছে। এত বয়স পর্যন্ত স্মৃতিশক্তি ও ধারণাশক্তির এমন প্রখরতার দৃষ্টান্ত কোথাও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।

অষ্টপ্রহর সমাহিত হইয়া থাকিলেও, এত বড়ো বৃহৎ পরিবারের প্রত্যেকের কল্যাণ কামনা করিয়া প্রত্যেকের যাহা প্রয়োজন তাহা তিনি বিধান করিতেন, ইহাই আশ্চর্য। শ্রীযুক্ত রবিবাবুর পুত্র রথীন্দ্রনাথ সংস্কৃত ভাষা শিখিতেছেন, সেজন্য পণ্ডিত নিযুক্ত আছেন। তাঁহার সংস্কৃত পড়া বেশ বিশুদ্ধ হইল কি না তাহা এক সময় দেখিতে হইবে, এত চিন্তার মধ্যেও সে কথাটি তিনি ভোলেন নাই। একদিন শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া দেখেন রথীন্দ্রনাথ ও তাঁহার পণ্ডিত সেখানে উপস্থিত। শাস্ত্রী মহাশয় পরীক্ষা লইলেন। তিনি যখন বলিলেন, বেশ পড়া হইয়াছে, তখন সেই পণ্ডিত মহাশয় পুরস্কার পাইলেন। কথাচ্ছলে একদিন ভালো একটি কীর্তনীয়া কোথায় পাওয়া যায় শাস্ত্রীমহাশয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, বছরখানেক পরে তিনি তাঁহাকে তাহার সন্ধান দিলেন। এত দিন পর্যন্ত সে কথা ভোলেন নাই। এক দিকে ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন হইয়া আছেন, অন্য দিকে সকল ছোটো-বড়ো কর্তব্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করিতেছেন— এ দুয়ের সামঞ্জস্য কোনো ভক্তের জীবনে পাওয়া যায় না। সংসারে থাকিয়া ধর্মলাভের ইহাই আদর্শ দৃষ্টান্ত।

শুধু যে সাংসারিক কর্তব্য পালনে তিনি শেষ পর্যন্ত উদাসীন ছিলেন না তাহা নয়। জ্ঞানের আলোচনাতেও শেষ পর্যন্তই তাঁহার অনুরাগ ও উৎসাহ। ১৮৯৩ সালে পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে থাকিবার সময় বাড়ির ছেলেমেয়েদের কাছে গল্প বলার ছলে "জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি" সম্বন্ধে তিনি ধারাবাহিকভাবে যে উপদেশগুলি দিয়াছিলেন, তাহা পড়িলে তাঁহার মনের প্রসার দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া যাইতে হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy), ভূতত্ত্ব (Geology), জীবতত্ত্ব (Biology), নৃতত্ত্ব

(Anthropology), ইতিহাস (History), এ সমস্ত বিজ্ঞানগুলির মধ্যে তাঁহার কী অসাধারণ প্রবেশ ছিল। সমস্ত বিজ্ঞানের ভিতর দিয়া বিধাতার সৃষ্টির অভিপ্রায়টি যে কেমন করিয়া ক্রমশ পরিণাম লাভ করিতেছে, 'জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি' মানুষের মধ্যে যে কেমন বিচিত্রভাবে ঘটিতেছে, ঐ গ্রন্থে তাহাই তিনি বিশেষভাবে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং ঐ গ্রন্থ এক হিসাবে মানুষের অভিব্যক্তি (The Evolution of Man) এবং ধর্মের অভিব্যক্তির (The Evolution of Religion) একটি মোটামুটি রকমের চমৎকার ইতিহাস। অথচ গ্রন্থের ভিতরকার উদ্দেশ্য ঈশ্বরের মঙ্গল বিধান কেমন করিয়া জগতের মধ্যে এবং মানুষের মধ্যে কাজ করিতেছে, সেই দিক হইতে সমস্ত ইতিহাসকে দেখা। প্রথম উপদেশ, "সৃষ্টি"— তাহাতে অনন্ত আকাশে "অগণ্য গ্রহনক্ষত্রে"র কথা বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় উপদেশ "পৃথিবী"— পৃথিবী কেমন করিয়া একটি "সুপ্রকাণ্ড অগ্নিগোলক" হইতে তাহার বর্তমান অবস্থায় আসিল, তাহার ইতিহাস— ভূতত্ত্বের কথা। ভূতত্ত্ব আলোচনায় তাঁহার অনুরাগের একটা গল্প এখানে বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। একবার আনন্দমোহন বসু মহাশয় ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় শান্তিনিকেতনে গিয়াছেন, তাঁহারা বৈঠকখানা ঘরে দেখেন, টেবিলের উপর ভূতত্ত্বসম্বন্ধীয় একটা প্রসিদ্ধ বই রহিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হইতে আনন্দমোহনবাবু বলিলেন— সংবাদপত্রে এই বইয়ের সমালোচনা দেখিয়াছি ও প্রশংসা শুনিয়াছি, আপনি কি এখানি পড়িতেছেন? তিনি বলিলেন হাঁ, বইখানি খুব ভালো বটে। আনন্দমোহনবাবু বলিলেন— আপনি এই নির্জনে বসিয়া ভূতত্ত্ববিদ্যার বিষয় বই পড়িতেছেন! দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন— সেকি আনন্দমোহন! আমি পাহাড়ে পর্বতে থাকিয়া বহু বৎসর ভূতত্ত্ববিদ্যার অনুশীলন করিয়াছি; এমন-কি, এ বিষয়ে আমাকে একটা authority (গুরু) বলিলে হয়, তুমি কি তাহা জান না? এই বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন এবং বলিলেন— "আমার জাহাজ খানা ছাড়বার সময় হচ্ছে কিনা? এখন যত cargo (মাল) বোঝাই লওয়া যায়।"

তৃতীয় উপদেশ—"অন্নময় কোষ"— অর্থাৎ জড়জগতের কথা। এই নাম বাছাই করাতেও বিশেষ একটি নৈপুণ্য আছে। তিনি জড়জগৎ, উদ্ভিদ্‌জগৎ, জন্তুজগৎ, মনোজগৎ প্রভৃতি এই কোষের সংজ্ঞায় বুঝাইয়াছেন। কারণ ইহাদের ভিতরে যে একটি ক্রমোন্নতির সূত্র আছে সেটি বুঝাইবার জন্যই এই সংজ্ঞা অতি উপযোগী হইয়াছে। যেমন একটি কোষ খুলিলেই আর-একটি কোষের পরিচয়

পাওয়া যায়, তেমনি জড় হইতে প্রাণ, প্রাণ হইতে মন, ক্রমশ উন্নত হইয়া দেখা দিয়াছে— ইহাই তিনি দেখাইতে চান।

চতুর্থ উপদেশ—"প্রাণময় কোষ"— প্রাণজগতের কথা অর্থাৎ উদ্ভিদ্ জগতের কথা। পঞ্চম উপদেশ—"মনোময় কোষ"— পশুরাজ্যের কথা। এখানে জীবতত্ত্বের কথা দস্তুরমত আসিয়াছে। কেমন করিয়া উদ্ভিদ্‌রাজ্যে ও পশুরাজ্যে ক্রমোন্নতির ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় তাহা তিনি অনুসরণ করিয়াছেন। ষষ্ঠ উপদেশ —"বিজ্ঞানময় কোষ"— এখানে মানুষের কথা এবং মানুষের মনস্তত্ত্বের কথা আসিয়াছে। সপ্তম উপদেশ—"আর্যজাতি"— এই উপদেশে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতিগঠনের কারণ তিনি আলোচনা করিয়াছেন এবং আর্যরা কেমন করিয়া উন্নত হইল তাহা বলিয়াছেন। তার পর "আর্যদিগের উন্নতি" বলিতে গিয়া গ্রীক-রোমক-সভ্যতা ও হিন্দু-সভ্যতার ধারার একটা ইতিহাস সংক্ষেপে বলিয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। আর্যরা কি এ দেশে কি ইউরোপে কেমন করিয়া ভাষার উন্নতি, নানা জ্ঞানবিজ্ঞানের সৃষ্টি, সৌন্দর্যবোধের বিকাশ, ব্যাবসা-বাণিজ্যের উন্নতি প্রভৃতি নানা উন্নতি করিলেন তাহা দেখাইয়াছেন। ইউরোপে রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে কেমন করিয়া খণ্ড খণ্ড নাগরিক স্টেট হইতে এক বৃহৎ রোমক সাম্রাজ্য হইল এবং সেই বৃহৎ রোমক সাম্রাজ্যের অবসানে আবার কতগুলি নেশন বা ভিন্ন ভিন্ন জাতি গড়িয়া উঠিল তাহাও দেখাইয়াছেন। এবং সেইসঙ্গে এই ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছেন, "ইহাদিগের মধ্যে পরস্পরের জাতীয় আক্রোশ রহিয়াছে··· এই সূত্রে যুদ্ধবিগ্রহ হইতে পারে এবং বিরোধী পক্ষদ্বয়ের মধ্যে যাহারা প্রজাদিগের মঙ্গল কামনা না করিয়া স্বার্থপর হইয়া, অধর্মকে আশ্রয় করিয়া অন্যের অধিকারে লোভবশত অন্যায় পূর্বক যুদ্ধ করিতে যাইবে তাহাদিগেরই অধোগতি হইবে।" সে ভবিষ্যদ্‌বাণী আজ ইউরোপীয় যুদ্ধে ফলিয়াছে বলা যাইতে পারে!

দশম, একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ উপদেশে ভারতবর্ষের ধর্মের অভিব্যক্তির ধারাটি তিনি অনুসরণ করিয়াছেন। এই কয়টি উপদেশের মধ্যে তিনি সংক্ষেপের মধ্যে যেমন সম্পূর্ণ করিয়া আমাদের ধর্মের অভিব্যক্তির ইতিহাসখানি ধরিয়াছেন, কোনো ইউরোপীয় পণ্ডিতের বইয়ে তেমন সম্পূর্ণ একটা বিবরণ পাইবার জো নাই। ভারতবর্ষীয় আর্যরা কৃষক জাতি ছিলেন বলিয়া ইন্দ্র, সূর্য, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি প্রাকৃত দেবতাগুলি তাঁহাদের উপাস্য হইলেন এবং তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিবার জন্য যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানাদি তাঁহাদের মধ্যে চলিতে লাগিল এইটে তিনি

প্রথম দেখাইলেন। ক্রমে সেই কৃষিপ্রধান সভ্যতা হইতে যখন গৃহ, পরিবার প্রভৃতি গড়িল, তখন অগ্নি গৃহদেবতা হইলেন। যাগযজ্ঞাদি করিতে গিয়া প্রথমে তাঁহাদের মধ্যে সৌন্দর্যবোধের উদ্রেক হইয়াছিল এবং প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা ভাবও বিকশিত হইয়াছিল। তাঁহাদের স্তবস্তুতির দ্বারা সেই ভাবগুলির চরিতার্থতা হইতেছিল। ক্রমে 'Moral types', নৈতিক আদর্শ দেখা দিতে লাগিল। পাপবোধ জাগ্রত হইল; পাপ মোচনের দেবতাও আসিলেন, যেমন বরুণ। এমনি করিয়া ঈশ্বর-স্পৃহা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সকল দেবতার মধ্যে এক দেবতা আছেন— সেই একই শক্তির নানা প্রকাশ— আর্যদের মনে এই ভাবের উদয় হইতে লাগিল। তখনই ব্রহ্মবিদ্যার আরম্ভ— উপনিষদের যুগের আরম্ভ। তখন কেহ কেহ গৃহ সমাজ ছাড়িয়া অরণ্যে গিয়া জ্ঞান ও ধর্মের আলোচনা করিতে লাগিলেন। নানা তত্ত্ব ও সাধনপ্রণালী তখন দেখা দিতে লাগিল। এই পর্যন্তই ভারতবর্ষের ধর্মের অভিব্যক্তির ইতিহাসকে তিনি আলোচনা করিয়াছেন। এর পরে আর বেশিদূর অগ্রসর হন নাই।

১৮৯৩ সালে যখন তাঁহার শরীর জীর্ণপ্রায়, চোখ-কানের কাজ আর চলে না, তখন গল্পচ্ছলে এত বড়ো একটা জিনিস এমন সহজ ভাষায় ও সহজ ভাবে বলা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় নয় কি? কত বড়ো মনের প্রসার থাকিলে তবে একজন মানুষ অনন্ত আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের কথা হইতে আরম্ভ করিয়া ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস ও ধর্মের ইতিহাস— এই সমস্ত ধারাটির ভিতর দিয়া ঈশ্বরের বিধান কেমন করিয়া মানুষের জগতে কাজ করিতেছে এবং মানুষ কেমন করিয়া উন্নতি হইতে উন্নতির সিঁড়িতে উঠিতেছে তাহা এমন অনায়াসে ও অবলীলাক্রমে কথকতার মতো করিয়া বলিয়া যাইতে পারে! এত বড়ো একটা গ্রন্থ আমাদের বাংলা সাহিত্যে আর নাই ইহা স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে।

১৮৯৫ সালে তাঁহার শেষ শিক্ষা বলিয়া 'পরলোক ও মুক্তি' নামে যে একটি চটি বই বাহির হয়, তাহা এত বেশি পরিমাণে কল্পনার দ্বারা ভারাক্রান্ত যে তাহার সবটাই দেবেন্দ্রনাথের জিনিস বলিয়া মানিয়া লইতে মনে দ্বিধা বোধ হয়। 'ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাসে' দেবেন্দ্রনাথ "স্বর্গ ও নরক" প্রবন্ধে স্বর্গ ও নরক সম্বন্ধে মানুষের বিশ্বাসকে জল্পনাকল্পনা মাত্র বলিয়া বিদায় দিয়াছেন। বলিয়াছেন— "আত্মগ্লানিই পাপীর নরক ভোগ" এবং "ধার্মিকের স্বর্গ ভোগের আভাস আমরা এখানে পাইয়াছি—"অন্তরেই তাহার আভাস পাইতেছি।" এখন

যে তিনি "স্বর্গলোক" ও "দেবশরীর" সম্বন্ধে সেই-সকল জল্পনাকল্পনাকেই প্রত্যয় করিবেন, এমন তো বোধ হয় না। তবে এটা ঠিক যে তিনি আত্মার অনন্ত উন্নতিতে বিশ্বাস করেন বলিয়া এটা মনে করেন যে লোকলোকান্তরের ভিতর দিয়া উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থায় মানুষের আত্মা যাত্রা করিবে। "স্বর্গাৎ স্বর্গং সুখাৎ সুখং।"

ইহার পর আর তাঁহার কোনো উপদেশ বা বাক্য ছাপা হয় নাই। কারণ ইহার পর যদিও তিনি দশ বছর বাঁচিয়া ছিলেন, কিন্তু তাঁহার শরীর তখন এমন জীর্ণ যে তখন তাঁহার পক্ষে বেশি কথা বলা অসম্ভব ছিল। মধ্যে মধ্যে যাঁহারা আসিতেন, তাঁহাদের কাছে হয় উপনিষদের কোনো বাক্য, নয় হাফেজের কোনো বয়েদ্ আবৃত্তি করিয়া দু-চার কথা বলিতেন মাত্র। যখন ভাবে গদ্‌গদ হইয়া হাফেজ আবৃত্তি করিতেন, তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িত, শরীরে রোমাঞ্চ হইত, মাথার চুল খাড়া দাঁড়াইয়া উঠিত। প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে সর্বদাই তাঁহার সঙ্গে থাকিতে হইত। দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতিশক্তি শেষ পর্যন্ত বেশ প্রখর থাকিলেও শেষজীবনে মাঝে মাঝে ভুলিয়া যাইতেন। হয়তো হঠাৎ কোনো সময়ে একটা উপনিষৎ বাক্য বা হাফেজের একটা শ্লোক তাঁহার অত্যন্ত দরকার হইয়াছে— তখন যেমনি সময় হোক-না কেন শাস্ত্রীর ডাক পড়িত। শাস্ত্রী মহাশয় আসিতেই বলিতেন, অমুক পাতা খোলো। কিম্বা বাক্যের গোড়ার অংশটুকু বলিয়া বলিতেন— সবটা শোনাও। তিনি শোনাইতেছেন আর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করিতে করিতে তাঁহার আবার ভাবাবেশ হইত। ধ্যানে তিনি নিস্তব্ধ হইয়া যাইতেন। শেষজীবনের দিনরাত্রিগুলি এমনিভাবেই কাটিয়াছিল। এ সম্বন্ধে নূতন খবর দিবার বা জানিবার কী বা আছে!

পরলোকগত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ডায়ারিতে শেষবয়সে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের কথা কিছু কিছু পাওয়া যায়। তাহারই দু-একটা টুকরা এখানে উদ্ধার করি—

"মার্চ ১৮৯৮— মহর্ষি বলিলেন, এখন পুঁটুলি বাঁধা ঠিক হইয়া আছে, ডাক হইলেই চলিয়া যাইব। আগামী জ্যৈষ্ঠের পর জ্যৈষ্ঠ বোধ হয় আমাকে দেখিতে পাইবে না।

"১৪ই ডিসেম্বর ১৮৯৮— নবদম্পতী শরদিন্দু বিশ্বাস ও চারুশীলাকে লইয়া মহর্ষির সহিত তাঁহার জোড়াসাঁকো ভবনে সাক্ষাৎ হয়। তিনি বর ও কন্যাকে দুইখানি ব্রাহ্মধর্ম পুস্তক উপহার দিয়া আশীর্বাদ করেন।... এবার বলিলেন,

ব্রাহ্মধর্ম বেদবাক্য ও বেদের পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ তিনটি এক হইয়া চমৎকার হইয়াছে। খুব আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আমরা সব এক পরিবার হইয়াছি।...

"সেপ্টেম্বর ১৯০০— বাবু বিপিনচন্দ্র পালের সহিত একত্র হইয়া মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি জাতিভেদের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, বেদের সময়ে জাতিভেদ ছিল না, স্ত্রী শূদ্র সকলে বেদ রচনা করিয়াছেন। পৌরাণিক সময়ে এই ভেদের সৃষ্টি হয়। ইহা আবার ভাঙিয়া যাইতেছে। জাতিভেদ যাওয়াই শ্রেয়স্কর।

"সেপ্টেম্বর ১৯০১, ১৫ই আশ্বিন মঙ্গলবার— উষা ও বাণীকে লইয়া তাহাদের দীক্ষার জন্য মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ করা যায়। বর্ষায় তাঁহার শ্রবণ-শক্তি গিয়াছে। প্রিয়নাথ শাস্ত্রী অতি কষ্টে শিঙ্গা দ্বারা কথা বলিলেন। তিনি তখনি একটু সংক্ষিপ্ত উপদেশ দিয়া বলিলেন, এই তোমাদের দীক্ষা হইল। পরে আমার উপর তাহা সম্পূর্ণ করিবার ভার দেন।...

"৮-১১-০১— "পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষিদেবের সহিত সাক্ষাৎ— সঙ্গে পুরাতন বন্ধু বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্ত, মহর্ষির গৃহে পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ও হিতেন্দ্রবাবু। প্রথমতঃ কুশল জিজ্ঞাসা ও মস্তকে হস্তার্পণ পূর্বক আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন— ব্রহ্ম-কৃপা এখন বিশেষ অনুভব করিতেছি— ব্রহ্ম আমাকে বাহিরের রাজ্য হইতে টানিয়া লইয়া তাঁহার নিকটে রাখিয়াছেন। কিছুক্ষণ চিন্তার পর উষা ও প্রতিভার দীক্ষানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে কি না এবং প্রতিভার বিবাহ স্থির হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। আবার কিছুক্ষণ চিন্তার পর শাস্ত্রীকে ব্রাহ্মধর্মের এই শ্লোকের ব্যাখ্যা পড়িতে বলিলেন—শান্তো দান্তো উপরত ইত্যাদি।

"শাস্ত্রী মহর্ষির কানে নল দিয়া তাহা পড়িলে আর-একটু ব্যাখ্যা করিয়া আত্মাতে পরমাত্মাতে দেখিতে হইবে এই আমাদের সাধন বলিলেন। পরে শাস্ত্রী সেই অধ্যায়ের সমুদায় শ্লোক তাঁহাকে শ্রবণ করাইলে শেষ শ্লোকটি— 'যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে' সুন্দররূপে আবৃত্তি করিয়া বলিলেন— আমি আজি কালি এইটি লইয়া ভাবিতেছি। পরমাত্মা বিশ্বব্যাপী, অথচ আমার আত্মার অন্তরে— ইহা সংক্ষেপে বুঝাইলেন।

"শান্তিনিকেতনে ব্রাহ্ম-ইস্কুল হইতেছে এবং তথায় ছোটোলাট যাইবেন বলিলেন। পৌত্তলিকতাবর্জিত এক পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়াছেন বলিলেন।

"প্রতাপবাবু খৃষ্টকে ঈশ্বর বলেন না, ক্ষেত্রবাবু এই কথা বলিলে হাফেজের

এক বয়েদ্ আওড়াইয়া বলিলেন, 'মেসায়া যাহা করিয়াছেন, ঈশ্বরপ্রসাদ লাভ করিলে প্রত্যেক মনুষ্য তাহা করিতে পারেন। আর ঈশ্বরকে ধরিয়া থাকিলে গৃহে থাকিয়াও বনবাসী ও পরলোকবাসী হওয়া যায়।'

"কন্‌গ্রেসের সময় Theistic Conference হইবে শুনিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

"২৭-৬-১৯০২— প্রথমেই বলিলেন, তোমাদিগকে অনেক দিন হইতেই বলিয়া আসিতেছি আমার চক্ষুকর্ণ বহিরিন্দ্রিয়-দ্বার সকল রুদ্ধ হইতেছে— এখন আরও অধিক।... রাজা রামমোহন রায় মৃত্যুর গান করিয়া অমৃতের পথ দেখাইয়াছেন বলিয়া, "মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর" গানটি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। পরে শিবনাথকে মুমুক্ষু দেখিয়া সুখী হইয়াছেন বলিলেন এবং তাঁহাকে মুক্তির বিষয়ে একটি কথা লিখাইয়া দিয়াছেন বলিলেন।... আমার এক পুত্র সন্তোষকে স্মরণ করিয়া বলিলেন, তাহাকে যেন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রবাবুর আশ্রমে লওয়া হয়।... আনন্দমোহন বসুরও তত্ত্ব লইলেন। প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়, হিতেন্দ্রবাবু এবং বাহিরের কোনো কোনো লোক উপস্থিত ছিলেন। আমরা তাঁহার অবস্থা জানি, বাহিরের লোকেরা কথাবার্তা কহিতে না পারিয়া ক্ষুব্ধ না হন, এজন্য বারবার বিনতি করিতে লাগিলেন। কাহারও কোন কথা আছে কি না জিজ্ঞাসা করাতে শাস্ত্রীমহাশয় বলিলেন, "না, কথা কিছুই নাই। আপনার দর্শন ও আশীর্বাদ লাভই সকলের উদ্দেশ্য।" হিতেন্দ্রবাবু বলিলেন, উমেশবাবু মুক্তি সম্বন্ধে কথাটি জানিতে চান, তা আমি লিখাইয়া দিব। তাঁহার মুখের ও চেহারার প্রতি অনেক-ক্ষণ চাহিয়া রহিলাম, মধ্যে মধ্যে ধ্যানস্থ হইয়া উজ্জ্বল হইতেছেন বোধ হইতে লাগিল। অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়াছেন, একদিন কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্চ্ছার মত হইয়াছিল। বেশিদিন আর পৃথিবীতে থাকেন বোধ হয় না।

"২৩-৪-১৯০২— শ্রীমন্মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ। সঙ্গে শরৎবাবু ও প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়।

"মহর্ষি প্রথমেই বলিলেন, আমার চক্ষু ও কর্ণ দুই দ্বারই গিয়াছে, বাহিরে সব অন্ধকার। কিন্তু ভিতরের জ্যোতিতে আনন্দে আছি, এই জ্যোতি লইয়া যাইব। এই জ্যোতির কিছু ব্যাখ্যা করিলেন। এই প্রত্যক্ষ আধ্যাত্মিক জীবন কি শিক্ষাপ্রদ! সকলকেই অন্তরের জ্যোতিতে আনন্দ লাভ করিতে উপদেশ দিলেন। আন্দাজ করিয়া আমার নাম উমেশ দত্ত আসিয়াছেন বলিলেন। শরৎবাবুকে আর অনুমানে ধরিতে পারিলেন না। বোধ হইল, আমাদের সহিত

দেখায় খুব আনন্দ হয়— আরও অনেক কথা বলিতে উৎসাহের সহিত প্রবৃত্ত। তাঁহার স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কায় আমরা নিবৃত্ত করিয়া বিদায় লইলাম।

"৫-১০-১৯০৪— বুধবার শ্রীমন্মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ।... মহর্ষি অতি রুগ্‌ণ— কৌচে হেলান দিয়া শয়ানভাবে আছেন। আমরা প্রণাম করায় কে আসিয়াছেন জিজ্ঞাসিলেন— হিতেন্দ্রবাবু আমার নাম করাতে বলিলেন— উমেশবাবু এসেছ, তোমাদেরই কথা মনে করিতেছিলাম। অনেক দিন আস নাই, আসিয়া ভালই করিয়াছ। আমি আর কি বলিব, তোমাদের সব মঙ্গল হউক।... তাঁহার শরীরের অবস্থা দেখিয়া অল্পক্ষণে বিদায় লইলাম। মনে হইতে লাগিল আর দেখা হয় কি না? পবিত্রসুন্দর মুখমণ্ডলটি ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম।

"নভেম্বর ১৯০৪— শ্রীমন্মহর্ষিকে দেখিলাম নিদ্রিতভাবে চক্ষু নিমীলিত করিয়া শয়ান। শুনিলাম, প্রায় চক্ষু মেলেন না। ডাকিয়া চাহাইয়া খাওয়াইতে হয়।

"১৭-১-১৯০৫— তাঁহার অন্তিমকাল শুনিয়া দেখিতে গেলাম। দ্বিজেন্দ্রবাবু, সত্যেন্দ্রবাবু প্রভৃতি শয্যার কাছে দণ্ডায়মান। তিনি হাঁ করিয়া নিশ্বাস ফেলিতেছেন, যেন শ্বাস। একবার মুখ বুজাইয়া হাতটা নাড়িয়া বালিশে ফেলিলেন। মুমূর্ষু অবস্থা। রাত্রি যায় কি না সকলের ভাবনা।"

পরলোকগমনের কিছু পূর্বে তাঁহার বুকে একটা ফোড়া দেখা দেয়— ডাক্তার সান্দার্স অস্ত্রচিকিৎসা করেন। সেই অষ্ট-আশি বছরের বৃদ্ধ অস্ত্র করার সময়ে কোনো রকমের অস্থিরতা প্রকাশ করিলেন না— শান্ত হইয়া রহিলেন। অস্ত্র করিয়াই ডাক্তার বলিলেন যে আর বেশি দিন তিনি বাঁচিবেন না। ডাক্তার যখন রোজ আসিয়া ক্ষতস্থানে গজ পুরিতেন ও ক্ষতস্থান পরিষ্কার করিতেন, তখনো তাঁহার মুখ যন্ত্রণায় একদিনের জন্যও বিবর্ণ বা বিকৃত হয় নাই। কী আশ্চর্য! তিনি নিজেও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, পৃথিবী হইতে তাঁহার বিদায়ের সময় উপস্থিত। একবার শুধু শান্তিনিকেতনে গিয়া তাঁহার মৃত্যু হয় এই কামনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা তখন আর কোনো মতেই সম্ভব ছিল না! একদিন তিনি তাঁহার পৌত্র শ্রীযুক্ত দ্বিপেন্দ্রবাবুকে বলিলেন : এখন আমার অবস্থা কি রকমের জান! একটা জাহাজ যখন তীর ছাড়িয়া চলিয়া যায় তখন তীরের দিকটা যেমন তাহার কাছে ঝাপ্‌সা হইয়া আসে কিন্তু অন্য দিকে গন্তব্যস্থানের ছবিটা ক্রমশই স্পষ্ট হইতে থাকে, আমারও এখন ঠিক তেমনি হইয়াছে। পিছনে সংসারের দিকটা ক্রমশ ঝাপ্‌সা হইয়া আসিতেছে। সামনে পরলোকের ছবিটা পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছি।

মৃত্যুর পূর্বে উইল করিয়া তিনি বিষয় সম্বন্ধে সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করিয়া গিয়াছিলেন। পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে থাকিতে উইলের প্রথম খসড়া হয়, তার পর অনেকবার তাহার বদল হয়। এমন চমৎকার উইল খুব অল্প লোকেরই দেখা গিয়াছে। সকল পক্ষেরই ইহাতে সন্তোষ হইয়াছিল—কাহারো প্রতি কোনো অন্যায় বা অবিচার হয় নাই। সেইজন্য তাঁহার দেহত্যাগের পরে তাঁহার পুত্র-পৌত্রদিগের মধ্যে বিষয় লইয়া এতটুকু কোনো গোলযোগ ঘটিতে পারে নাই।

বোধ হয় তাঁহার মনে মনে একটা আশঙ্কা ছিল যে, তাঁহার পরলোকগমনের পর তাঁহার ভস্ম লইয়া শান্তিনিকেতনে একটা সমাধিমন্দির তৈরি হইবে এবং তাঁহার ভক্তগণ সেখানে তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে তীর্থযাত্রা করিতে থাকিবেন এবং তাঁহাকে ভক্তিঅর্ঘ্য নিবেদন করিবেন। এ দেশের মানুষের দ্বারা যে এরকমের কাণ্ড ঘটিয়া ওঠা কিছুমাত্র বিচিত্র নয় সেটা তাঁহার বেশ জানা ছিল। সেইজন্য পাছে যেখানে তিনি তাঁহার "প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি"কে লাভ করিয়াছেন, সেখানে তাঁহার পূজার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও পূজা পাইতে থাকেন এবং ব্রহ্মের আশ্রম তাঁহার একটা মঠে পরিণত হয়, এই ভয়ে তিনি একদিন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথকে ডাকাইয়া এবিষয়ে তাঁহার মনের দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিলেন। তিনি তাঁহাকে পরিষ্কার করিয়া নিষেধ করিয়া দিলেন যে, তাঁহার ভস্ম লইয়া শান্তিনিকেতনে যেন কোনো সমাধিমন্দির তৈরি না হয়। সেখানে তাঁহার কোনো চিহ্ন থাকিবে না। ব্রহ্মের পূজাকে বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য শেষ পর্যন্ত তাঁহার কী একান্ত আকিঞ্চন!

এইবার সেই শেষদিনের কথায় আসিতে হইতেছে—যেদিন ইহলোক হইতে এই মহাপুরুষের বিদায়ের দিন। কিন্তু এ দিন তাঁহার পরিবারের লোকের কাছে নিদারুণ শোকের দিন হইলেও, তাঁহার কাছে পরম আনন্দের দিন! নদী যখন সাগরের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন যেমন তাহার দীর্ঘ পথযাত্রা সার্থক, তেমনি এই সুদীর্ঘ জীবন যেদিন দেহের বন্ধন ছাড়াইয়া সংসার ছাড়াইয়া সকল কৃতকর্ম পিছনে ফেলিয়া আনন্দধামে পরমাত্মার সঙ্গে মিলিল, সেদিন তাহার কী সুগভীর শান্তি, কী পরমাশ্চর্য আনন্দময় বিরাম!

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব হইতে তিনি কেবলই বলিতেন, "আমি বাড়ি যাব, আমি বাড়ি যাব।" আশ্চর্য যে, শেষ পর্যন্ত তাঁহার চৈতন্যের বিলোপ হয় নাই।

প্রতিদিন প্রত্যূষে পূর্বদিকে মুখ করিয়া তাঁহার ব্রহ্মোপাসনা করার রীতি ছিল। মৃত্যুর পূর্বদিনেও যখন তাঁহার চোখ দেখিতে পায় না, কান শুনিতে পায় না, সমস্ত শরীর বিকল, ইন্দ্রিয়বোধ বিলুপ্ত— তখনো প্রত্যূষে উঠিয়াই তিনি চীৎকার করিতেছেন, "আমাকে পুবমুখো করিয়ে দাও, আমাকে পুবমুখো করিয়ে দাও, আমার উপাসনার সময় হ'ল!"

তিনি যখন ধ্যানস্থ হইতেন বা কোনো বিষয়ে চিন্তা করিতেন তখন নাকের ডগার উপরে একটি আঙুল রাখা তাঁহার এক অভ্যাস ছিল। দেহত্যাগের তিন দিন পূর্ব হইতে তিনি প্রায় সমস্ত সময় সেই অবস্থায় কৌচে হেলান দিয়া রহিলেন। কাহারো সঙ্গে বিশেষ কোনো কথাবার্তা বলিলেন না। তিনি যে অনেক দিন হইতেই পরলোকের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন তাহা বেশ বোঝা যায়। ৭ই পৌষের উৎসবের পর যখন তাঁহার পৌত্র শ্রীযুক্ত দ্বিপেন্দ্রবাবু তাঁহার সহিত দেখা করিলেন, তিনি বলিলেন, তুমি এসেচ ভালই হয়েচে: আমি ভাবছিলাম তোমার সঙ্গে আর দেখা হ'ল না!

মঙ্গলবার হইতে চারি দিকে খবর গেল যে, তাঁহার দেহত্যাগের আর দেরি নাই। কিন্তু তাঁহার অবস্থা দেখিয়া কিছুই বুঝিবার জো নাই। তিনি স্থির হইয়া কৌচে হেলান দিয়া আছেন; সেদিনও নিয়মিত উপাসনা করিলেন, নিয়মিত পথ্য করিলেন। তার পরদিনও গেল। বৃহস্পতিবার প্রত্যূষেও তিনি নিয়মিত উপাসনা করিলেন। সেদিন দুপুর ১টা ৫৫ মিনিটের সময় তিনি কৌচে উপবিষ্ট অবস্থায় শান্তভাবে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গেলেন— ৬ই মাঘ ১৮২৬ শক— ইংরাজী ১৯এ জানুয়ারি ১৯০৫ সাল।

বিদ্যুৎবেগে সমস্ত কলিকাতা শহরের মধ্যে খবর প্রচারিত হইল যে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর নাই। দলে দলে নরনারী তাঁহার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মোপাসনার পর তাঁহার দেহ তেতলা হইতে নীচে নামানো হইল। সাদা রঙের খাটের উপর সাদা কাষায় বস্ত্রে তাঁহার মৃতদেহ ঢাকা হইল— সাদা ফুল দিয়া ও মালা দিয়া খাট সাজানো হইল। সব শুভ্র। তাঁহার কৃতী পুত্ররা তাঁহার মৃতদেহকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বিকাল ৪-২০ মিনিটের সময় মৃতদেহ গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার জন্য সকলে রওনা হইলেন। শ্মশানপথে সকল সম্প্রদায়ের লোকই আসিলেন— হিন্দু, ব্রাহ্ম, মুসলমান, খৃস্টান, ইংরাজ— প্রায় সাত শত লোক সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। পথে কড়ি, পয়সা, লাজাঞ্জলি ছড়ানো হইল। "ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্" এই রব উচ্চারিত

হইতে লাগিল। কলিকাতার সকল সম্প্রদায়ের গণ্যমান্য ধনী দরিদ্র সকল লোক তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিলেন। কলিকাতা শহরে কোনো মানুষের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় এমন বিপুল জনসমাগম শীঘ্র কেহ দেখে নাই।

ভারতবর্ষের সমস্ত সংবাদপত্রে এবং বিলাতেরও প্রসিদ্ধ কাগজে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরলোকগমন সম্বন্ধে ও ইহলোকে তাঁহার জীবনের বিচিত্র কীর্তি সম্বন্ধে নানা রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। এবং ৩রা মার্চ শুক্রবার টাউনহলে তাঁহার স্মরণার্থ এক বিরাট সভার আয়োজন হইয়াছিল। তাঁহার পুত্রগণ দশদিন অশৌচ গ্রহণ করিয়া তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ করেন। সেই শ্রাদ্ধবাসরে [মাঘ ১৩১১ বঙ্গাব্দ] তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র কবিকুলগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাঁহার সমস্ত জীবনের স্মৃতির উদ্দেশে তার চেয়ে সত্যতর অর্ঘ্য আর কিছুই হইতে পারে না। সেই কথাগুলি এখানে তুলিয়া দিয়া তাঁহার জীবনকাহিনী এইখানেই সমাপ্ত করি :

"এই পরিবারের মধ্য দিয়া যিনি অচেতন সমাজকে ধর্মজিজ্ঞাসায় সজীব করিয়া দিয়াছেন, যিনি নূতন ইংরেজি শিক্ষার ঔদ্ধত্যের দিনে শিশু বঙ্গভাষাকে বহুযত্নে কৈশোরে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন, যিনি দেশকে তাহার প্রাচীন ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার উদ্‌ঘাটিত করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছেন, যিনি তাঁহার তপঃপরায়ণ একলক্ষ্য জীবনের দ্বারা আধুনিক বিষয়লুব্ধসমাজে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ পুনঃস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন, তিনি এই পরিবারকে সমস্ত মনুষ্য-পরিবারের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়া, ইহার সর্বোচ্চ লাভকে সমস্ত মনুষ্যের লাভ করিয়া দিয়া···আমাদিগকে যে গৌরব দান করিয়াছেন,···অদ্য আমরা তাহাই স্মরণ করিব··· ।"

পরিবারের দিক হইতে তাঁহার পুত্র যেমন বলিলেন, সমস্ত দেশের দিক হইতে তেমনি এই কথাই আমাদের একদিন বলিবার অপেক্ষা আছে। তিনি আমাদের এই সমাজকে, এই দেশকে তাঁহার জ্ঞান ও ভক্তির সাধনার দ্বারা ও মহৎ জীবনের দ্বারা বিশ্বসমাজ ও বিশ্বমানবের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। এই কথাটি আমার পাঠক-পাঠিকাবর্গ যদি সকৃতজ্ঞভাবে তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদন করেন, তবেই এই চরিত-রচনা সার্থক হইবে।

পরিশিষ্ট

প্রথম পরিচ্ছেদ

দেবেন্দ্রনাথের ধর্মতত্ত্বের ক্রমপরিণতি

যে কারণেই হোক, সাধারণের মধ্যে একটা ধারণা দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে, দেবেন্দ্রনাথ একজন অধ্যাত্মযোগযুক্ত সাধু-পুরুষ, তিনি হিমালয়ের চূড়ায় হিমালয়েরই মতো ধ্যানগম্ভীর হইয়া নির্জন সাধনায় চিরজীবন কাটাইয়া গিয়াছেন।

দেবেন্দ্রনাথকে এইরকম একান্ত অন্তর্মুখীন নির্জন-বিলাসী সাধক করিয়া দেখা ঠিক দেখা নয়। প্রাচীনকালে আমাদের হিন্দু-সভ্যতার বাণিজ্যের নৌকা সপ্তদ্বীপ ঘুরিয়া আসিত শোনা যায়; কিন্তু একালে সমস্ত বিশ্বের বড়ো বড়ো বন্দর হইতে তাহার আমন্ত্রণ আসিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ সেই একালের এক বড়ো মহাজন হইয়া যদি বিশ্বের সঙ্গে সকল কারবার বন্ধ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার ভাণ্ডারে সাধুতার অর্থ যেমনি সঞ্চিত থাক, তাহা সকল ব্যবহার হইতে বঞ্চিত হইয়া ব্যর্থ হইবে।

দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বের সঙ্গে বেশ বড়ো রকমেই কারবার করিয়াছেন। পূর্ব ও 'পশ্চিমের দুই সভ্যতার ভিতর দিয়া বিশ্বমানবের সাধনার যে দুই ধারা বহিয়া চলিয়াছে, তাহার সন্ধি-স্থানটি তিনি নিজের জীবনের অধ্যাত্ম-অভিজ্ঞতার দ্বারা আবিষ্কার করিয়াছেন।' পূর্ব সমুদ্র এবং পশ্চিম সমুদ্রের মাঝখানে মরুবালুর ব্যবধান যেমন সুয়েজ খালের উদ্‌ভাবয়িতা দূর করিয়া দিয়াছেন এবং যাতায়াতের পথকে সহজ করিয়াছেন, তেমনি 'এ যুগে বাংলাদেশে রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র ও বিবেকানন্দ ভিন্ন (অবশ্য জীবিত মহাত্মাগণ বাদে) বোধ হয় আর-কারো নাম করা যায় না, পূর্ব ও পশ্চিমের সাধনা-সমুদ্রের পরস্পরের ব্যবধান যাঁহাদের দ্বারা দূর হইয়াছে। সুতরাং দেবেন্দ্রনাথ শুধু কারবার করিয়াছেন বলিলে তাঁহাকে ছোটো করা হয়, তিনি এ যুগের সন্ধি-স্থানটি বাহির করিয়াছেন এবং আমাদের জন্য সেখানে এক নূতন প্রতিষ্ঠা-ভূমি তৈরি করিয়াছেন।'

'কিন্তু এ কাজ তিনি আপনার ভিতরকার আধ্যাত্মিক জীবনের তাড়নায় করিয়াছেন, অপর কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নয়। সেইজন্যই তিনি যে এ কাজ করিয়াছেন, তাহার কোনো বাহিরের প্রমাণ এতই বেশি যে, তাঁহাকে যুগসমস্যা-মীমাংসক বলিতে কাহারো আপত্তি হয় না। তাঁহার কাছে সমস্যাগুলি

সমস্ত মানুষের সমস্যারূপে উপস্থিত হইয়াছে এবং বিশ্বমানবের তরফ হইতে সেই সমস্যা মিটাইবার আয়োজনও তাঁহাকে করিতে হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথের কাছে সকল সমস্যাই একেবারে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের জিনিস— তাঁহার কাছে এগুলির কোনো সামাজিক বা ঐতিহাসিক বা দার্শনিক ঔৎসুক্য নাই। সে-সকল দিক হইতে ইহাদের বিচারের কোনো চেষ্টাও তাঁহার মধ্যে দেখা যায় নাই। তাঁহার অধ্যাত্মজীবনের পথে যেমন যেমন সমস্যা দেখা দিয়াছে, তেমন তেমন তিনি তাহার সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন— তাঁহার জীবনের পথে পথে সেই চেষ্টার নানা চিহ্ন ছড়াইয়া আছে। তিনি ভারতবর্ষের এবং ইউরোপের তত্ত্বশাস্ত্র রীতিমত পড়িয়াছিলেন কিন্তু পড়ুয়া ছাত্রের মতো জ্ঞানের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য পড়েন নাই। অধ্যাত্মজীবনের ক্ষুধার তাড়নায় পড়িয়াছিলেন। তাই তাঁর জীবনের পথে চলিতে চলিতে বিশ্বতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্বের এক-একটা পান্থশালা আমাদের চোখে পড়ে— সে পান্থশালা তিনি নিজেই তৈরি করিয়াছেন। তার মালমসলা কত বিচিত্র জায়গা হইতে তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন— তাঁহার কালের জ্ঞানভাণ্ডারের কোনো উপকরণকেই তিনি অব্যবহৃত রাখেন নাই। আবার সেই পান্থশালা ফেলিয়া তিনি নূতন সন্ধানে চলিয়াছেন এবং সেই একই তত্ত্ব বড়ো কষিয়া ও সমগ্র করিয়া পুনরায় গড়িয়াছেন। এই যে তাঁহার জীবনের ভিতর হইতে একটি সৃষ্টিক্রিয়া দেখিতে পাই, ইহা জীবনের জিনিস বলিয়াই অত্যন্ত আশ্চর্য। এই সৃষ্টির প্রত্যেক অবস্থায় এ যুগের বিচিত্র উপকরণগুলিকে একটি জীবনের ছাঁচের মধ্যে ঢালাই করিয়া লওয়া হইয়াছে। সেই ছাঁচটির মধ্যে কোনো উপকরণ আর নির্জীব উপকরণ হইয়া নাই, তাহা সজীব উপাদানের মতো হইয়াছে। জীবনতত্ত্বের সেই ছাঁচ দেবেন্দ্রনাথ আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন বলিয়া, তিনি বর্তমান যুগসমন্বয়ের একজন প্রধান প্রতিষ্ঠাতা, এ গৌরব তাঁহাকে দেওয়া যাইতে পারে। তিনি যদি শুধু বেদান্ত দর্শন বা পশ্চিমের দর্শন হইতে নানা জিনিস সংগ্রহ করিয়া জোড়া-তাড়া দিয়া একটা তত্ত্ব খাড়া করিবার চেষ্টা করিতেন, তবে তাঁহার কোনো বিশেষত্বই থাকিত না— তাঁহাকে বড়ো জোর একজন সংগ্রহকার বলা যাইত। কিন্তু তিনি অধ্যাত্মজীবনের ভিতর হইতে এ দেশের তত্ত্ব ও পশ্চিমের তত্ত্ব, এ দেশের সাধনা ও পশ্চিমের সাধনাকে সকল দিক হইতে আত্মস্থ ও আত্মসাৎ করিয়া এক নূতন রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। সে রূপ তাঁর জীবনের রূপ, অথচ তাহার মধ্যে সমস্ত যুগের রূপটি ফুটিয়াছে। এই যুগরূপটিকে, ব্যক্তিরূপে

বিশেষরূপে ফুটাইয়া তোলাতেই তো দেবেন্দ্রনাথের বিশেষত্ব। এই ক্ষেত্রে তাঁহার তুলনা নাই।

আমরা তাঁহার গ্রন্থগুলি কালক্রমানুসারে সাজাইয়া পরে পরে আলোচনা করিলে সমস্ত যুগসমস্যা তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা হইয়া তাঁহার ভিতর হইতে যে কেমন সমাধান লাভ করিয়াছে, তাহা দেখিতে পাইব। তাঁহাকে একজন ধর্মতত্ত্ববিৎ (Theologian) রূপে তো দেখিবই, কারণ তিনি অধ্যাত্ম-অভিজ্ঞতার দিক হইতে তত্ত্বের নিরূপণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি 'ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস' (Dogmas and beliefs) একটি একটি করিয়া স্থির ভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবারও চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার এই দিকটা মস্ত দিক—এ জায়গায় তাঁহাকে প্রচলিত সকল ধর্মমতের সঙ্গে লড়াই করিয়া তাঁহার ধর্মমতকে দাঁড় করাইতে হইয়াছে। কিন্তু কেবল এই দিক হইতে দেখিলেই চলিবে না—সকল তত্ত্ব তাঁহার জীবনের তত্ত্ব হইয়া যে কেমন ব্যক্তিরূপ বা বিশিষ্টরূপ লাভ করিয়াছে, সেইটে দেখাই আসল দেখা। কারণ সেটা একটা সৃষ্টিকে দেখা, সংগ্রহকে দেখা নয়। কবির কাব্য যেমন সৃষ্টি, দার্শনিকের তত্ত্ব যেমন সৃষ্টি, এই জীবনদর্শনের জীবন্ত সত্য উপলব্ধিগুলি তেমন সৃষ্টি। কাব্যের সকল অনুভাবের সুরগুলি যেমন একটি অখণ্ডভাবের রাগিণীর মধ্যে সম্মিলিত, দর্শনের সকল খণ্ডতত্ত্বের বিচারের ধাপগুলি যেমন একটি সমগ্র তত্ত্বের প্রণালীর মধ্যে সুবিন্যস্ত, এই জীবনদর্শনের সত্যোপলব্ধিগুলিও তেমনি একটি বড়ো পরিণামের সূত্রে গাঁথা। কালক্রম-অনুসারে সাজাইলেই সেই পরিণামের চেহারাটা একেবারে জাজ্বল্যমান হইয়া দেখা দিবে।

এই পরিণামকে অনুসরণ করিবার সময় তাঁহার অসাধারণ মনীষা দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। এ তো শুধু ধ্যানপরায়ণতা নয়, শুধু ভক্তির রসোচ্ছ্বাস নয়, এ যে একটা সজীব মন, যে গরুড়ের মতো আপনার ক্ষুধায় এ দেশের এবং বিদেশের সমস্ত দর্শনশাস্ত্র, বিজ্ঞানশাস্ত্র আত্মসাৎ করিতে বসিয়া গিয়াছে, যে নিজেই প্রশ্ন তুলিতেছে এবং নিজেই তাহার বিচার করিতেছে, যে সন্দেহের কুয়াশার জাল বিদীর্ণ করিয়া জ্ঞানের রশ্মি-প্রদীপ্ত আকাশকে দিকে দিকে অন্তহীন প্রসারে প্রসারিত বলিয়া অনুভব করিতেছে। তাহার সব বিচারই যে চূড়ান্ত বিচার, সব তত্ত্বই যে শেষ কথা তা নয়—কিন্তু তাহার মানস বিহার-লোকটি সংকীর্ণ নয় এবং মনের বৈদ্যুত তেজে তাহা আগাগোড়া ঠাসা ভরা। এ মনের কাছে যেমন আত্মতত্ত্ব, জগৎতত্ত্ব, তেমনি নীতিতত্ত্ব, সৌন্দর্যতত্ত্ব,

পরমাত্মতত্ত্ব, সকল তত্ত্বই অত্যন্ত বেশি জাগ্রত— কেবল পুঁথির জিনিস নয়। সেইজন্য এ মনের বিকাশের ইতিহাস খুব বড়ো ইতিহাস— তাহার ক্রমগুলি বিচিত্র, আয়োজন বিচিত্র, পরিণতি বিচিত্র। সেই ইতিহাসের ধারাটি এখন অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

আত্ম-জীবনী

(১৮৩৫ – ১৮৪৮)

পাশ্চাত্ত্য দর্শন পাঠ উপনিষদের সন্ধানলাভ বেদান্তদর্শনের পরিচয় ব্রাহ্মধর্মের পত্তনভূমি

আঠারো বছর বয়সে দেবেন্দ্রনাথের দিদিমার মৃত্যুকালে শ্মশানে বসিয়া তিনি যে এক "উদাস আনন্দ" অনুভব করিয়াছিলেন, সেই তাঁহার অধ্যাত্মজীবনের উদ্‌বোধন। তাহার পূর্বে তিনি তত্ত্বজ্ঞানের কিছুমাত্র আলোচনা করেন নাই। শ্মশানের সে আনন্দ ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুতের মতো একবার চমকিয়া তার পর মিলাইল এবং ভয়ংকর এক বিষাদ তাঁহার মনকে আচ্ছন্ন করিল। সেই অবস্থায় তত্ত্বান্বেষণের জন্য তিনি সংস্কৃত মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ এবং ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্র পড়িতে লাগিলেন। বোধ হয় লক্‌, হিউম্‌ এবং ফরাসী জড়বাদী লা মেট্রির দর্শন তিনি পড়িয়া থাকিবেন। কারণ, তখন হিন্দুকালেজের ছাত্রদের মধ্যে এই-সকল গ্রন্থের বেশ চল ছিল। ইউরোপীয় দর্শন হইতে তিনি দুটি জিনিস পাইলেন : ১. "প্রকৃতির অধীনতাই··· মনুষ্যের সর্বস্ব।··· এই পিশাচী প্রকৃতির হস্তে কাহারও নিস্তার নাই।" ২. "যেমন ফটোগ্রাফের কাচপাত্রে সূর্যকিরণের দ্বারা বস্তু প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা মনের মধ্যে বাহ্য বস্তুর একটা অবভাস হয়, তাহাই জ্ঞান।" এই দুই তত্ত্বই তাঁহাকে কোনো আশ্বাস দিতে পারিল না। তাহার কারণ তিনি বলিতেছেন যে, "একজন নাস্তিকের নিকট এইটুকুই যথেষ্ট ; সে প্রকৃতি ছাড়া আর কিছু চায় না।" যাহা ইন্দ্রিয়ের কাছে প্রত্যক্ষ নাই, তাহা বাহ্যজগতে কোথাও নাই— অতএব ক্ষণিক ইন্দ্রিয়জ্ঞান ভিন্ন অপর কোনো জ্ঞান হইতে পারে না, একদিকে এই সংশয়বাদ ও অন্য দিকে প্রকৃতিই সর্বস্ব এই জড়বাদ তাঁহাকে তৃপ্ত করা দূরে থাকুক, তাঁহার মনের ব্যাকুলতাকে দিন দিন বাড়াইয়া তুলিল। তখন ভাবিতে ভাবিতে ইউরোপীয় দর্শনের এই দুই তত্ত্বের বিরুদ্ধে তাঁহার মনে আর দুইটি সিদ্ধান্ত উপস্থিত হইল : ১. "বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শের যোগে বিষয়-জ্ঞান জন্মে। কিন্তু এই জ্ঞানের সহিত, আমি যে জ্ঞাতা, তাহাও তো জানিতে পারি। দর্শন স্পর্শন আঘ্রাণ ও মননের সহিত, আমি যে দ্রষ্টা স্প্রষ্টা ঘ্রাতা ও মন্তা, এ জ্ঞানও তো পাই।" ২. "জ্ঞানের প্রভাব বিশ্বসংসারে সর্বত্র দেখিতে পাই। আমাদের জন্য চন্দ্রসূর্য নিয়মিতরূপে

উদয়াস্ত হইতেছে, আমাদের জন্য বায়ু বৃষ্টি উপযুক্তরূপে সঞ্চালিত হইতেছে, ইহারা সকলে মিলিয়া আমাদের জীবনপোষণের একটি লক্ষ্য সিদ্ধ করিতেছে। এইটি কাহার লক্ষ্য? জড়ের তো লক্ষ্য হইতে পারে না, চেতনেরই লক্ষ্য। অতএব একটি চেতনাবান্ পুরুষের শাসনে এই বিশ্বসংসার চলিতেছে।...তিনিই সেই প্রয়োজন-বিজ্ঞানবান্ ঈশ্বর, যাঁহার শাসনে জগৎসংসার চলিতেছে।"

প্রথম সিদ্ধান্তে, ইন্দ্রিয় দ্বারা মনের মধ্যে বাহ্য বস্তুর যে অবভাস হয় তাহাই জ্ঞান— এ তত্ত্ব কাটিয়া গেল, কারণ বিষয়জ্ঞানের সঙ্গে বিষয়ীর জ্ঞানও পাওয়া যায় দেখা গেল।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে, প্রকৃতির শাসনই যে সর্বস্ব, সে তত্ত্ব আর টিঁকিল না, কারণ প্রকৃতির মধ্যে যে প্রয়োজন-বিজ্ঞান দেখা যায়, জীবনপোষণের যে লক্ষ্য দেখা যায়, তাহা কখনোই জড়ের লক্ষ্য হইতে পারে না।

এই দুই সিদ্ধান্ত দেবেন্দ্রনাথ নিজের বুদ্ধির আলোচনায় স্থির করিলেও ইহা একেবারেই উপনিষদের জিনিস। কারণ ঔপনিষদ দর্শনে আত্মা দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, ঘ্রাতা ও মন্তা— তাহার নিজের রূপ রস গন্ধ স্পর্শ কিছু নাই। আবার উপনিষদে আছে যে, ঈশ্বর যাথাতথ্যতোর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ— শাশ্বত কাল হইতে যথাতথরূপে সকল প্রয়োজনের বিধান করিয়াছেন— তাঁহার শাসনেই সমস্ত জগৎ বিধৃত হইয়া আছে। তিনি প্রথমে ঈশোপনিষদ্ পান, তার পরে কেন, কঠ, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য প্রভৃতি পরবর্তী কালের উপনিষদ্‌গুলিই পড়েন— বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদের সঙ্গে তখনো তাঁহার পরিচয় হয় নাই। ঐ দুই উপনিষদ্ অনেক পরে তিনি দেখিতে পান। সুতরাং এই-সকল উপনিষদ্ পড়িয়া তার পর যখন শঙ্করাচার্যের শারীরক ভাষ্য পড়িতে গেলেন, তখন তাহা তাঁহার একেবারেই ভালো লাগিল না। তিনি লিখিয়াছেন: "শঙ্করাচার্য জীব আর ব্রহ্মকে এক করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।...যদি উপাস্য উপাসক এক হইয়া যায়, তবে কে কাহাকে উপাসনা করিবে?"— এইটি হইল তাঁহার কাছে এক মস্ত সমস্যার বিষয়। সুতরাং শাঙ্কর বেদান্তের মতে তিনি মত দিতে পারিলেন না এবং শঙ্করাচার্য উপনিষদের যে ভাষ্য করিয়াছেন তাহাও সম্পূর্ণরূপে লইতে পারিলেন না।

ইহার পাঁচ বছর পরে, বেদ ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্র কি না— এই প্রশ্ন লইয়া ব্রাহ্মসমাজে এক মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি বেদকে আপ্তশাস্ত্র বলিয়া মানিতে রাজি ছিলেন না। তিনি বলিলেন— "অখিল সংসারই

আমাদের ধর্মশাস্ত্র এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানই আমাদের আচার্য।" অক্ষয়কুমারের মত কতকটা ইউরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর ডীস্ট্‌দের মতন ছিল। তাঁর ধর্মের প্রাণ যুক্তি। দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম যে কোনো কালেই এইরূপ 'ডীজ্‌ম্' ছিল না, তাহার প্রমাণ তিনি লিখিতেছেন, "ঈশ্বরের সঙ্গে উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ, এইটি ব্রাহ্মধর্মের প্রাণ।" সুতরাং হৃদয়ের সহিত নিঃসংশয় বুদ্ধির যোগে মনের আলোচনা দ্বারা ঈশ্বর যে অভিপ্রকাশিত হন— ঈশ্বরের অনুভূতি যে পরোক্ষ অনুভূতি মাত্র নয়, শ্রুতকথা মাত্র নয়, কিন্তু অপরোক্ষানুভূতি— এ সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের মনে কখনোই সংশয় নাই। উপনিষদ্-বাক্যকে তিনি ঋষিদের সেই অপরোক্ষানুভূতির বাক্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বেদ উপনিষদ্ প্রভৃতি ভালো করিয়া আলোচনা করার পুর্বে তাঁহার ধারণা ছিল যে, বেদ-উপনিষদের সমস্তই বুঝি এইরূপ অপরোক্ষানুভূতির বাক্য, সুতরাং আপ্তবাক্য। বেদে অপরাবিদ্যার বিষয় কেবল দেবতাদের যাগযজ্ঞের কথা আছে এবং পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যার কথা যাহা আছে তাহা উপনিষদ্-বেদান্তে স্থান পাইয়াছে— কাশীতে গিয়া এই কথা দেবেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথমে জানিতে পারিলেন। সুতরাং উপনিষদ্‌ই যে বেদের সারভাগ এ বিষয়ে তাঁহার আর সংশয় রহিল না। বেদে ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি স্থাপন করিতে না পারিয়া, শঙ্করাচার্য যে ১১খানি উপনিষদের ভাষ্য করিয়াছিলেন, সেই উপনিষদে ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি স্থাপন করা যাইবে, দেবেন্দ্রনাথ এইরূপ স্থির করিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, মোট ১১খানি উপনিষদ্ আছে— কিন্তু খোঁজ করিয়া দেখেন, ১৪৭ খানি উপনিষদ্ আছে। বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায়গণ উপনিষদ্ নাম দিয়া নিজেদের উপাসনা প্রচার করিয়াছেন। সে-সকল উপনিষদ্ ছাড়িয়া দিয়া শুধু ১১খানি প্রামাণ্য উপনিষদ্ ধরিলেও, সেই উপনিষদেও ব্রাহ্মধর্মের পত্তনভূমি হয় না— কারণ উপনিষদে সোঽহমস্মি, তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্য পাইয়া দেবেন্দ্রনাথ নিরাশ হইয়া পড়িলেন। তা ছাড়া উপনিষদেরও সবটাই কিছু ব্রহ্মতত্ত্বের কথা নয়। সুতরাং তিনি অবশেষে স্থির করিলেন যে, ব্রাহ্মধর্মের পত্তনভূমি "আত্ম-প্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়।" এ কথাটি কিছু তাঁর সৃষ্ট কথা নয়, বেদান্তেরই এই কথা— কয়েক পঙ্‌ক্তি নীচে তিনি নিজেই তাহা উদ্ধার করিয়াছেন। "জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।" শুদ্ধসত্ত্ব-ব্যক্তি ধ্যানযুক্ত হইয়া নির্মল জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে দেখেন। এই একটি বাক্য ছাড়া— আরো-একটি বাক্য তিনি উদ্ধার করিয়াছেন: হৃদা মনীষা মনসাভিক্‌প্তঃ— "হৃদয়ের সহিত নিঃসংশয় বুদ্ধির যোগে মনের আলোচনা দ্বারা,

ঈশ্বর অভিপ্রকাশিত হয়েন।" সুতরাং ধর্মের পত্তনভূমি শুধু আত্মপ্রত্যয় নয়—তিনটি জিনিস একযোগে। আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞান বা নিঃসংশয় বা নির্মল জ্ঞান, বিশুদ্ধসত্ত্ব বা বিশুদ্ধহৃদয়, এবং মনের আলোচনা বা ধ্যান-ধারণা।

স্বরচিত জীবনচরিতে যেখানে তিনি এই "আত্মপ্রত্যয়" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, সেখানে তাহা 'সহজ জ্ঞান' বা পাশ্চাত্ত্য Intuition অর্থে ব্যবহার করেন নাই। এ সম্বন্ধে বেদান্তদর্শনেও এর অনুরূপ আলোচনা আছে। শাঙ্কর-মতাবলম্বীদিগের মধ্যে বিবরণকার-সম্প্রদায় বলেন যে, ব্রহ্মজ্ঞান শব্দ জ্ঞানের দ্বারা হয়— বেদের মহাবাক্য সাক্ষাৎভাবে ব্রহ্মজ্ঞান করায়। অন্য পক্ষে বাচস্পতি মিশ্রের দল বলেন যে, মহাবাক্য শ্রবণের দ্বারা যে তত্ত্ব আসে, সেই তত্ত্ব মনন ও নিদিধ্যাসনের ফলে জ্ঞান প্রসন্ন হয়, মন সংস্কৃত হয়। তাহাতে যে "ধ্যানজ প্রমা" জন্মায়, তাহাতেই ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। আত্মপ্রত্যয়ের ঠিক অনুরূপ বাক্য "ধ্যানজ প্রমা"। মহাবাক্যের তাৎপর্য বুঝিলে তাহাতেই জ্ঞান জন্মায়। দেবেন্দ্রনাথ বলিতেছেন— "পূর্ব্বকার যে-ঋষি জ্ঞান-প্রসাদে ধ্যান-যোগে আপনার বিশুদ্ধ হৃদয়ে পূর্ণব্রহ্মকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারই পরীক্ষিত কথা এই যে : জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্তত স্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ। আমারও হৃদয়ের পরীক্ষার সঙ্গে এই কথার মিল হইল, অতএব আমি এই কথা গ্রহণ করিলাম।" এ বেশ পরিষ্কার কথা। কিন্তু ইহার পরে আমরা দেখিব যে তিনি আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে সহজ জ্ঞান কথাটা আনিয়া ফেলিয়াছেন এবং তাহাতে এ বিষয়টি যেমন জটিল হইয়া পড়িয়াছে, তেমনি আত্মপ্রত্যয়েরও অর্থের কিছু বদল হইয়াছে। সেটা যথাস্থানে আমরা আলোচনা করিব।

এখানে আমরা দেখিলাম যে, শঙ্করাচার্যের শারীরক মীমাংসা বেদান্তদর্শনে জীবব্রহ্মের অভেদ প্রতিপন্ন করা হইয়াছে বলিয়া দেবেন্দ্রনাথ শঙ্করের মত গ্রহণ করিতে পারিলেন না এবং ঐ অভেদ প্রতিপাদক বাক্যগুলি কোনো কোনো উপনিষদে দেখিয়া উপনিষদ্‌কেও ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি করিতে পারিলেন না। তিনি ধর্মের ভিত্তি স্থির করিলেন—"আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়।" জ্ঞান নিঃসংশয় হওয়া চাই, হৃদয় বিশুদ্ধ হওয়া চাই, তার পর ধ্যান-যোগে ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া যে উপলব্ধি হইবে সেই উপলব্ধির সঙ্গে শাস্ত্রের যে-সকল উপলব্ধির বাক্যের সুর মিলিবে, সেই সেই বাক্যই গ্রাহ্য, অন্যান্য বাক্য অগ্রাহ্য। এইরূপে হৃদয়ের পরীক্ষার সঙ্গে উপনিষদের যে-সকল বাক্যের মিল হইল, সেই বাক্যগুলি ১৮৪৮ খৃস্টাব্দে তাঁহার 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থে আবদ্ধ হইল।

আত্মতত্ত্ববিদ্যা

(১৮৫০—১৮৫১)

এ পর্যন্ত আমরা যাহা দেখিয়া আসিলাম, তাহাতে শঙ্করাচার্যের দার্শনিক মত গ্রহণ করিতে দেবেন্দ্রনাথ কোথায় বাধা অনুভব করিলেন তাহাই কেবল বলা হইয়াছে। কিন্তু শাঙ্কর দর্শন ছাড়িয়া তিনি নিজে স্বাধীনভাবে কোনো দার্শনিক মতামতে গিয়া উপনীত হইয়াছিলেন কিনা, সে সম্বন্ধে তাঁহার আত্মচরিতে কোনো কথারই উল্লেখ নাই। কেবল শাস্ত্রকে তিনি কিভাবে গ্রহণ করিলেন, তাহাই সেখানে বিস্তারিত ভাবে বলা হইয়াছে।

১৮৫০-১৮৫১ সালের মধ্যে রচিত 'আত্মতত্ত্ববিদ্যা' নামক একটি ছোটো চটি বইয়ের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথের এই সময়ের দার্শনিক মত যে কী ছিল তাহা জানিতে পারা যায়। বইটিতে পাঁচটি অধ্যায় আছে, যথা : ১. জীবাত্মা ও জড় ২. জীবাত্মা ও পরমাত্মা ৩. ঈশ্বর জগতের আদি ও সৃষ্টিকর্তা ৪. ঈশ্বর সত্যসংকল্প, নির্বিকার, অভ্রান্ত ও আনন্দস্বরূপ এবং ৫. জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ভিন্নতা। এই পাঁচ অধ্যায়ের দার্শনিক সিদ্ধান্ত-পঞ্চক যে কী কী, তাহা খোলসা করিয়া বলিলে শাঙ্কর দর্শন হইতে দেবেন্দ্রনাথের প্রস্থান যে কোন্ কোন্ দিক দিয়া হইল তাহা বুঝা যাইবে—

১. প্রথম প্রস্থান—"জীবাত্মা ও জড়" প্রবন্ধে, জীবাত্মা ও জড়ের বা বিষয়ী-বিষয়ের দ্বৈত সম্বন্ধ। বাহ্যবস্তু রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দবিশিষ্ট, কিন্তু জীবাত্মা, যিনি দ্রষ্টা, আস্বাদয়িতা, ঘ্রাতা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা, তাঁহার রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, স্পর্শ নাই, শব্দ নাই। "চতুর্দিকে বাহ্যবস্তু দ্বারা বেষ্টিত থাকিয়া সর্বদাই বাহ্য-বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিয়া, লোক সকল কি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমি কিছুই হইলাম না, কেবল সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র প্রভৃতি বাহ্যবস্তু সকলই বস্তু হইল। এ বিবেচনা নাই যে, আমি যদি না থাকিতাম, তবে কোথায় বা গ্রহ-নক্ষত্র, কোথায় বা এই জগৎ থাকিত।" আমি যদি না থাকিতাম, কোথায় বা এই জগৎ থাকিত —এ কথাটা ভাববাদের (Idealism) দিক হইতে বলা যাইতে পারিত। কিন্তু এখানে সেদিক হইতে মোটেই বলা হয় নাই। বিষয়ী ও বিষয়ের যে দ্বৈতের কথা এখানে বলা হইয়াছে, তাহা ঔপনিষদ দর্শনের কথা। উপনিষদে ঠিক এই ভাবেই রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শবিশিষ্ট বিষয় হইতে দ্রষ্টা স্প্রষ্টা সাক্ষী যে বিষয়ী তাহাকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখা হইয়াছে। আত্মাকে দেখা যায় না, শোনা যায় না, ঘ্রাণ করা যায় না, স্পর্শ করা যায় না— ঠিক এই-সকল বাক্যই উপনিষদে আছে। ঔপনিষদ

দর্শনের ন্যায় দেকার্ত দর্শন ও র‍্যাশনাল সাইকলজিতেও জ্ঞাতাজ্ঞেয়ের এই মূলভেদ স্বীকার করা হয়। কার্তিজিয়ান্ অর্থাৎ দেকার্তের দর্শনের সিদ্ধান্ত এই প্রস্থান-ব্যাপারে দেবেন্দ্রনাথ যে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাওয়া যায়।

২. দ্বিতীয় প্রস্থান— জীবাত্মা অংশবিশিষ্ট নয়; জড় বস্তুর অংশ আছে— "অতি সূক্ষ্ম পরমাণু হইলেও তাহার অবশ্য অংশ থাকিবেক।" "জড় এবং জীবাত্মা এত ভিন্ন, যেমন অন্ধকার আর আলোক।··· জড়েতে যে সকল গুণ আছে, তাহা জীবাত্মাতে নাই; জীবাত্মাতে সে সকল গুণ আছে, তাহা জড়েতে নাই। জড়ের প্রধান গুণ যে বিস্তৃতি, তাহা জীবাত্মাতে নাই; জীবাত্মার প্রধান গুণ যে জ্ঞান, তাহা জড়েতে নাই।" এ একেবারে দেকার্তের কথা। **Extension is the attribute and being of matter, thought is the being of spirit**— জড়বস্তুর প্রধান গুণ এবং সত্তা— বিস্তৃতি, জীবাত্মার সত্তা— চিৎশক্তি। জীবাত্মার অংশ নাই, বিস্তৃতি নাই; জড়বস্তুর চিৎশক্তি নাই। এখানে দেকার্তের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের ভাষার সাদৃশ্য পর্যন্ত দেখা যাইতেছে।

তার পর জীবাত্মা এক এবং অংশবিহীন হইলেও "জীবাত্মার সংখ্যা অগণনীয়।" "যেমন পরমাণুর গণনা হয় না, তদ্রূপ জীবাত্মারও গণনা হয় না।" কিন্তু পরমাত্মা এক এবং অদ্বিতীয়। এইখানে, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সম্বন্ধের কথা বলিতে গিয়া দেবেন্দ্রনাথ এক ভয়ংকর কথা বলিয়া বসিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "জড় হইতে জীবাত্মা যত ভিন্ন, তাহা অপেক্ষা অনন্তগুণে জীবাত্মা হইতে পরমাত্মা ভিন্ন।" জীবাত্মা হইতে পরমাত্মা অনন্তগুণে ভিন্ন, এমন কথা বেদান্তদর্শনের কোনো দলই বলে নাই— সমস্ত সৃষ্টি হইতে পরমাত্মাকে এতটা দূরে ঠেলিয়া রাখা এক মুসলমান ধর্মতত্ত্বেই সম্ভব। ভারতীয় ধর্মতত্ত্বে এতটা দূরত্বের কল্পনা আসে না। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, শঙ্করের জীবাত্মা পরমাত্মার ঐক্যের মতকে খণ্ডন করিতে গিয়াই দেবেন্দ্রনাথকে জীবাত্মা-পরমাত্মার এমনতর ভয়ংকর বিচ্ছেদের মতের উপর দাঁড়াইতে হইয়াছিল। প্রাচ্য বেদান্তের ভূমি ছাড়িয়া একেবারে পাশ্চাত্য দর্শনের ভূমিতে আসিয়া আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। শঙ্করের মতের এতটা উল্টো না যাওয়া ভিন্ন দেবেন্দ্রনাথের আর কোনো উপায় ছিল না। এই প্রস্থানের সাহসেই তাঁহার অসাধারণ মনঃশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ এমন দ্বৈতমত তাঁহার অধ্যাত্মজীবনের গভীরতার সঙ্গে কোনোমতেই খাপ খাইতে পারে না। যাহার কিছুমাত্র অধ্যাত্ম

উপলব্ধি আছে, সে কি জীবাত্মা হইতে পরমাত্মা অনন্তগুণে ভিন্ন এ কথা বলিতে পারে ? কিন্তু দার্শনিক দিক হইতে এই মতে আসিয়া না পড়িলে শঙ্করের প্রভাব তাঁহার পক্ষে কোনো ক্রমেই কাটাইয়া ওঠা সম্ভব হইত না।

শুধু তাঁর পক্ষে কেন, দেশের পক্ষেও এ প্রভাব কাটানো সম্ভব ছিল না। ঐ যে কৈবল্য বা নির্বাণ মুক্তি, উহাতে ব্যক্তিত্বের, ইচ্ছার স্বাধীনতার কোনো স্ফূর্তি হইতেই পারে না। সেইজন্য একবার ঐ সর্বগ্রাসী অসীমের কবল হইতে সসীম জীবকে টানিয়া বাহির করার অত্যন্তই প্রয়োজন ছিল। নহিলে নৈতিক জীবন (Ethical life) বা স্বাধীন ইচ্ছার জীবন, কিছুই দাঁড়াইতে পারিত না—এই একটা দিক একেবারেই কাণা হইয়া থাকিত। স্বাধীনভাবে যখন জীব ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হয় তখনই দ্বৈত ঘুচিয়া গিয়া অদ্বৈত দাঁড়ায়—সে অদ্বৈত সমস্ত নিছিয়া-মুছিয়া নিঃশেষ করা অদ্বৈত নয়। যেমন ব্যক্তিগত জীবনে, তেমনি জাতিগত জীবনে এই এক চক্র ক্রমাগত ঘুরিয়া চলিয়াছে, একবার দ্বৈত হইতে অদ্বৈতে যাওয়া, আবার অদ্বৈত হইতে দ্বৈতে ফিরিয়া আসা। "এই, এক দুই, দুই এক, চিরকাল ঘুরিতেছে। কেও জানছে না, কখন এক, কখন দুই। কেও বলছে এক, কেও বলছে দুই। কর্ম যেখানে সেখানেই দুই, জ্ঞান যেখানে সেখানেই এক।"—'বসন্তপ্রয়াণ', পৃ ৯৯।

ঈশ্বর সর্বদর্শী, সর্বশক্তিমান, অদ্বিতীয়—এভাবের বাক্য দেকার্তের দর্শনে থাকিলেও সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং জীবাত্মার গতি সম্বন্ধে এই অধ্যায়েই যে-সকল কথা বলা হইয়াছে, তাহা দেবেন্দ্রনাথের নিজস্ব। অথবা তাহাতে প্রাচ্য প্রভাব, উপনিষদের প্রভাব পরিষ্কার লক্ষ করা যায়। ঈশ্বরের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন, "পূর্ণানন্দ পরব্রহ্ম! তিনি আপনার আনন্দ আপনি নিত্য উপভোগ করিতেছেন, আপনার আনন্দে আপনি নিত্য পূর্ণ রহিয়াছেন। সেই প্রেমাস্পদ পরমপুরুষ সংকল্প করিলেন যে আমি আমার প্রীতিপাত্র জীবাত্মা সকল সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে আনন্দ বিতরণ করিব।" উপনিষদেও আছে যে, "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।" জীবের মোক্ষের কথাও এইরূপ বলা হইতেছে; "যে অবস্থাতে জীবাত্মা সেই প্রেমাস্পদ ব্রহ্মকে লাভ করিয়া সম্পূর্ণ আনন্দ উপভোগ করিবে, এই অবস্থা জীবাত্মার শেষ গতি, এই অবস্থা জীবাত্মার পরমগতি; ইহা ইহার পরম লোক; ইহা ইহার পরম আনন্দ; যে আনন্দ দ্বারা আমাদিগকে সুখী করিবার জন্য সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিক্রিয়ার মুখ্য তাৎপর্য হইয়াছে।" এখানেও

উপনিষদ্‌-বাক্যেরই অনুবাদ পাওয়া যাইতেছে। দেবেন্দ্রনাথের এই এক আশ্চর্য বিশেষত্ব আমরা আগাগোড়া তাঁহার মানসিক বিকাশের ইতিহাসে লক্ষ করিয়া যাইব যে, তিনি বেদান্তের ভূমির উপরে স্থির ও দৃঢ়ভাবে বরাবর দাঁড়াইয়া তার পর তাঁহার কালের চারিপাশের তত্ত্ব ও সাধনের সঙ্গে যোগ রাখিয়াছেন। তিনি নিজের ভূমির ভিতরে তাহাদিগের প্রচুর সার ফেলিয়া অধ্যাত্মজীবনের নূতন ফসল ফলাইয়াছেন—সেই ফসলের ফলনে কোথায় পশ্চিমের দর্শন, কোথায় বেদান্ত, কি পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা শক্ত হইলেও দেখিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। দেকার্ত দর্শনের বিষয়ী-বিষয়ের ভেদের তত্ত্ব লইয়াছেন বলিয়া তিনি যে আগাগোড়াই ঐ দর্শনের সকল তত্ত্বই লইবেন, এ কখনোই হইতে পারে না। তিনি সকল তত্ত্বকে আপনার অভিজ্ঞতার ছাঁচে ঢালাই করিয়া চিন্তার নূতন ছাঁচ, নূতন categories আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন।

৩. তৃতীয় প্রস্থান—ঈশ্বরের সঙ্গে সৃষ্টির সম্বন্ধ—ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা অণু কখনো আদি বা নিত্য বস্তু হইতে পারে না। "যদি এক অণুর সহিত দ্বিতীয় অণুর কোন সম্বন্ধ না থাকিত—যদি তাহারদিগের পরস্পর সংযোগ দ্বারা কোন প্রয়োজন উদ্ধার না হইত, তবে অণু সকল যে অনাদিকাল পর্যন্ত আছে, ইহা স্বীকার করাও যাইতে পারিত। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে, পরস্পর সকল অণুর সহিত সকল অণুর সংযোগ রহিয়াছে—যখন তাহারদিগের পরস্পর সংযোগের দ্বারা সকল প্রয়োজন উদ্ধার হইতেছে, তখন সেই প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশে কোন বিজ্ঞানবান পুরুষ দ্বারা যে এই সকল বস্তু হইয়াছে, ইহাই প্রমাণ হইতেছে।" সৃষ্টির সম্বন্ধে এই যুক্তিকে বলে Design argument, argument from organic ends and order—জীবনের বিচিত্র প্রয়োজন সাধন এবং বস্তুপুঞ্জের মধ্যে শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থা দেখিয়া কোনো প্রয়োজন-বিজ্ঞানবান (Intelligent Designer) ঈশ্বরের দ্বারা এই-সমস্ত সৃষ্ট হইয়াছে, এই ধারণায় উপনীত হওয়া। ঈশ্বরের সংকল্প (Design) হইতেই বিশ্বের সৃষ্টি।

৪. সৃষ্টিতত্ত্ব হইতে বেদান্তদর্শনের পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদের বিচার।

দেবেন্দ্রনাথ পরমাত্মাকে জগতের উপাদানকারণ বলিতে রাজি নহেন। দেবেন্দ্রনাথের মতে পরমাত্মা "এই জগতের একমাত্র নিমিত্ত কারণ, ইহার উপাদান-কারণ তিনি স্বয়ং কদাপি নহেন।" পরমাত্মাকে পরিণামী উপাদান স্বীকার করা তো তাঁহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব—"পরমাত্মা যিনি বিকার-

বিহীন, তাঁহার পরিণাম কি প্রকারে হইতে পারে ?" এ কেমন করিয়া হয় যে "তিনি স্বয়ং প্রতিশরীরে পৃথক পৃথক জীবাত্মা হইয়া সাংসারিক বিবিধ ক্লেশ-ভোগ করিতেছেন— কখন মোহবিশিষ্ট হইতেছেন, কখন পাপাচরণ করিতেছেন, কখন সাধু হইতেছেন, কখন অসাধু হইতেছেন।"

দেবেন্দ্রনাথ বলেন, পরিণাম উপাদানের এই দোষ খণ্ডন করিবার জন্য অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতেরা "উপাদানকারণকে দুই প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন, পরিণাম উপাদান আর বিবর্ত উপাদান।

'স তত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত ইত্যুদাহৃতঃ॥'

"স্বরূপের অন্যথা হইয়া যে কারণ হইতে কার্যের উৎপত্তি হয় তাহা বিকারী বা পরিণামী বলিয়া উক্ত হইয়াছে, যেমন মৃত্তিকাপিণ্ডের পরিণামে ঘট হয়, দুগ্ধের পরিণামে দধি হয়। আর এই প্রকার স্বরূপের অন্যথা না হইয়া যে কারণেতে কার্য উৎপন্ন হয় তাহা বিবর্ত উপাদান বলিয়া উক্ত হইয়াছে।"

পরমাত্মাকে বিবর্ত উপাদানকারণ বলিয়া স্বীকার করিতে যুক্তির দিক হইতে দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ আপত্তি না থাকিলেও, তিনি বলেন, "তাহাকে বিবর্ত উপাদানকারণ বলা কেবল অনর্থক বাগাড়ম্বর মাত্র।" কারণ পরমাত্মা যখন জগৎ হইতে সর্বদা স্বতন্ত্র ও নির্লিপ্ত আছেন, তখন বিবর্ত উপাদান প্রভৃতি শব্দেতে সকলকে আচ্ছন্ন করিবার দরকার কি ?

যে-সকল বেদান্তমতে পরিণামবাদ মানে, তাহাদের বিরুদ্ধে তিনি শাঙ্কর বেদান্তের যুক্তিগুলি গ্রহণ করিয়াছেন এবং শঙ্করের বিবর্তবাদ আসিলে মায়া-বাদও সঙ্গে সঙ্গে আসিবে বলিয়া, তাহা খণ্ডন করিবার জন্য রামানুজের যুক্তির আশ্রয় লইয়াছেন। এইরূপে দুই দিক হইতেই তিনি মুক্ত হইয়াছেন।

শঙ্কর বলেন, একমাত্র বস্তু পরমাত্মা, তিনি ভিন্ন সৃষ্ট কি নিত্য আর দ্বিতীয় বস্তু নাই। যেমন রজ্জুতে সর্পের ভ্রম হয়, সেইরূপ এক বস্তুতে এই-সকল অবস্তুর ভ্রম হইতেছে। এখানে প্রশ্ন এই যে, কেমন করিয়া এই ভ্রম হইতেছে; পরমাত্মা ভিন্ন যখন বস্তু নাই, তখন তাঁহারি কি এই জগৎ রূপে ভ্রম হইতেছে? "অদ্বৈতবাদীরা তাঁহারদিগের যুক্তির এই দোষ পরিহার করিবার অভিপ্রায়ে এক জড় উপাধিশব্দ কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, তপ্ত লৌহ যেমন অন্য বস্তুকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ ব্রহ্মচৈতন্যবিশিষ্ট যে জড় উপাধি, সেই এই মিথ্যা জগৎকে সত্য বলিয়া জ্ঞান করে এবং সেই এই নানাবিধ সাংসারিক সুখ দুঃখ

ভোগ করে।...তাঁহারা জড় উপাধিকে লৌহপিণ্ডের সহিত আর ব্রহ্মচৈতন্যকে অগ্নির সহিত দৃষ্টান্ত দেন।"

শঙ্করের বক্তব্য এইরূপে বলিয়া লইয়া দেবেন্দ্রনাথ তাহাকে খণ্ডন করিবার জন্য, তার পরে বলিতেছেন—"যখন বাস্তবিক লৌহপিণ্ড কোন প্রকারেই কিছু দগ্ধ করিতে পারে না, কিন্তু সেই লৌহপিণ্ডেতে যে অগ্নি আছে, সেই কেবল অন্য বস্তুকে দগ্ধ করিতে পারে, তদ্রূপ কল্পিত উপাধি যে জড় বস্তু, তাহার কোন বিষয়ের জ্ঞান হইতে পারে না, কিন্তু তাহাতে যদি চৈতন্য উপহিত থাকে তবে তাঁহারই সত্য কি মিথ্যা জ্ঞান হইতে পারে এবং সুখ দুঃখের ভোক্তা তিনিই হইতে পারেন।...চৈতন্য কোন উপাধিতে উপহিত থাকুক বা পৃথকই থাকুক, যাহা কিছু জ্ঞাত ও অনুভূত হইবেক, তাহা চৈতন্য দ্বারাই হইবেক।" সুতরাং অদ্বৈতবাদীদের যুক্তি অবলম্বন করিলে "নির্বিকার নিরবদ্যকে বিকৃত মানিতে হয়, সর্বজ্ঞ সর্ববিৎকে ভ্রান্ত বলিতে হয়, পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ, অমৃতস্বরূপকে সাংসারিক সুখ দুঃখের ভোক্তা করিতে হয়।"

অদ্বৈতবাদের এই বিচারে দেবেন্দ্রনাথ বৈষ্ণব আচার্যদের যুক্তিপ্রণালী গ্রহণ করিয়াছেন তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। শঙ্করের বা শঙ্করশিষ্যদের মতামত তিনি যে ভালোরূপে বিচার না করিয়াই অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, এ আলোচনাটি পড়িলে তাহা আর মনে হয় না। বেদান্তদর্শন যে তিনি রীতিমত আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ ইহাতে পাওয়া যায়। জীবব্রহ্মের ঐক্যের মত তিনি কোনোমতেই গ্রহণ করিতে পারেন না বলিয়া ঈশ্বরের উপাদানকারণত্বও অস্বীকার করিয়াছেন এবং শঙ্কর জগৎ যে সৃষ্ট হইয়াছে ইহা মানেন না বলিয়া, তাঁহার উপাধিবাদ ও মায়াবাদকে যুক্তির দিক হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

৫. পঞ্চম প্রস্থান— পরমাত্মা নিত্য, পরিপূর্ণ, অবিকৃত, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব আর জীবাত্মা সৃষ্ট, অপূর্ণ, বিকার্য, কখনো অজ্ঞ, কখনো বিজ্ঞ, কখনো শুদ্ধ, কখনো অশুদ্ধ, কখনো বদ্ধ, কখনো মুক্ত। জীবাত্মাতে পরমাত্মাতে এমন একান্ত ভিন্নতা।

তথাপি অদ্বৈতবাদীরা বলেন যে, পরমাত্মাতে জীবাত্মাতে ভেদ নাই। পৃথিবী যেমন অসংখ্য পরমাণুর সমষ্টি, তেমনি জীবাত্মাসকলের সমষ্টিকে পরমাত্মা বলা যায় না। কেন যায় না? জীবাত্মাকে পরমাত্মার অংশ বলিলে ক্ষতি কি? এই প্রশ্নের উত্তরে দেবেন্দ্রনাথ বলিতেছেন, "যদি পরমাত্মাকে কেবল জীবাত্মা সকলের সমষ্টি করিয়া বলা যায়, তবে জীবাত্মা সকল ভিন্ন আর পরমাত্মা নাই

এই বলা হয়। যেমন পার্থিব পরমাণুপুঞ্জকে পৃথিবী বলা যায় তেমনি যদি জীবাত্মাপুঞ্জকেই পরমাত্মারূপে কেবল স্বীকার করা যায়, তবে পার্থিব পরমাণু ভিন্ন যেমন পৃথিবীর পৃথক সত্তা নাই তদ্রূপ জীবাত্মা সকল ভিন্ন যে আর পরমাত্মার পৃথক সত্তা নাই, এই বলা হয়।”

এই কথা বলিয়াই তার পরে এক ও বহুর চিরন্তন দ্বন্দ্বের প্রশ্ন সম্বন্ধে তিনি এক আশ্চর্য সিদ্ধান্ত খাড়া করিয়াছেন—“অনেক বস্তু কখন এক হইতে পারে না এবং এক বস্তুও কখন অনেক হইতে পারে না।” দার্শনিক হিসাবে এই সিদ্ধান্তের মূল্য যে কতখানি তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অনেক বস্তু যে এক হইতে পারে না— আমরা যে এক করিয়া মনেতে কল্পনা করি, তাহা যে কল্পনাই, সত্য নয়— এই তো আধুনিক Pluralismএর মত—অসংখ্যবাদের মত। এই মতের দ্বারা Idealism বা ভাববাদকে একদল দার্শনিক একেবারে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। কি আশ্চর্য যে ১৮৫১ সালে ৬০।৬৫ বৎসর পূর্বে যে সমস্যা লইয়া আজ তত্ত্বজ্ঞানীরা ব্যতিব্যস্ত, সেই সমস্যা দেবেন্দ্রনাথের কাছেও এমন পরিষ্কাররূপে উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি লিখিতেছেন, “অসংখ্য পরমাণুর সমষ্টি এই পৃথিবীকে একমাত্র বস্তুরূপে ভাবিয়া এবং তাহা হইতে নানাবিধ বৃক্ষাদি সকল উৎপন্ন হইতে দেখিয়া মনে করি যে এক যে বস্তু সেই নানা হইতেছে; কিন্তু বাস্তবিক পৃথিবী এক বস্তু নহে; সে অনেক পরমাণুর সমষ্টি এবং সেই পরমাণু সকল নানা সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নানা আকারে অবস্থিতি করিতেছে। যদি পৃথিবী অংশবিহীন অখণ্ডনীয় এক বস্তু হইত, তবে তাহা আর কখন দুই হইতে পারিত না এবং সুতরাং অন্য সকল বস্তুরূপেও পরিণত হইতে পারিত না। শাঙ্কর অদ্বৈতবাদকে খণ্ডন করিতে গিয়াই এই Pluralistic universeএর সিদ্ধান্তে দেবেন্দ্রনাথ যেমন উপনীত হইলেন, ঠিক তেমনি নিও-হেগেলিয়ান Absolutismকে খণ্ডন করিতে গিয়া সেই একই কারণে একালে, Pluralism বা অসংখ্যবাদের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। আমাদের দেশেও বৌদ্ধগণ এক সময়ে বেদান্তের অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে গিয়া এই বহুবাদ বা Pluralismএর মতে উপনীত হইয়াছিল।

“অনেক বস্তু কখন এক হইতে পারে না এবং এক বস্তুও কখন অনেক হইতে পারে না”— এ কথা বলার দ্বারা অদ্বৈতবাদের একই যে বহুরূপে পরিণত হইয়াছে— এই মত; অথবা একই সত্য, বহু মায়া এই মত— উভয় মতেরই গোড়া ঘেঁষিয়া কোপ মারা হইয়াছে। “পরমাত্মা স্বরূপতঃ একমাত্র অংশবিহীন”

—সে যে এক, তাহার আর অংশ নাই, খণ্ড নাই, পরিণাম বা বিবর্ত নাই। বহুর জগৎ তাঁহার সংকল্পের সৃষ্টি—জগৎ এক নয়, বহু। আধুনিক Pluralism বা অসংখ্যবাদে এই এককে মানিতে চায় না, কারণ একতে অনেকের অন্তর্নিহিত এক বলি। সাধারণত ভাবনা করা হয় এবং সেই ভাবনাটাকে এই মতে কল্পনা বলিয়াই মনে করা হয়। দেবেন্দ্রনাথ এই আত্মতত্ত্ববিদ্যায় শাঙ্কর-মতকে খণ্ডন করিতে গিয়া যেমন জড় ও জীবাত্মার দ্বৈতরেখা টানিলেন, তেমনি জড় ও জীবাত্মাকে বহু বলিয়া পরমাত্মাকে জড় ও জীবাত্মা উভয় হইতেই একান্ত বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলেন।

এই দ্বৈত মত যে ক্রমে ক্রমে তিনি কেমন করিয়া কাটাইয়া উঠিলেন, তাহাই আমরা পরবর্তী গ্রন্থগুলি আলোচনা করিবার সময় দেখিতে পাইব। শাঙ্কর অদ্বৈতবাদকে নিরস্ত করিবার জন্যই এই ঘোর দ্বৈত মতে যাওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথের এই মত সত্য কি ভ্রান্ত, তাহা আলোচনা করার চেয়ে তিনি যে স্বাধীনভাবে একটা দার্শনিক ভিত্তির উপরে জগৎ আত্মা ও ঈশ্বর এই তিন মূল তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিবার এমনতর আশ্চর্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহার আলোচনাই অনেক বেশি ঔৎসুক্যজনক। এ মত তিনি নিজেই অধ্যাত্মজীবনের ও জ্ঞানালোচনার অভিজ্ঞতায় ক্রমশ অগ্রসর হইতে হইতে পরিবর্তন করিয়াছিলেন। সুতরাং সেই পরিবর্তনের আলোচনায় যখন আসিব, তখনই এ-সকল মতের মীমাংসার কথা আপনি উঠিবে। তখন আমরা ইহাই দেখিব যে, জীবনের চেয়ে বড়ো মীমাংসাকার আর কেউ নাই। জীবনই বাস্তবিকই তত্ত্বকে ভাঙে এবং গড়ে। সে তাহার সমস্ত জ্ঞানের উপকরণকে সাজাইয়া তাহাদিগকে অভিজ্ঞতার আগুনে আপনার উপকরণ করিয়া লয় এবং তত্ত্বের নব নব ছাঁচ প্রস্তুত করিয়া তত্ত্বকে জীবনের বস্তু, অভিজ্ঞতার বস্তু করিয়া উত্তরকালের মানুষের ব্যবহারের জন্য রাখিয়া যায়। দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে সেই ক্রিয়াই বারম্বার লক্ষ করা যায়, ইহা আমরা দেখিয়াছি। শাঙ্কর বেদান্তদর্শনের মতকে এই আত্মতত্ত্ববিদ্যায় তিনি খণ্ডন করিতে গিয়া একদিকে পাশ্চাত্ত্য কার্তিজীয় দর্শনের বিষয়-বিষয়ীর দ্বৈত মতকে গ্রহণ করিলেন, অন্য দিকে বেদান্তের পরমাত্মার শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব অদ্বিতীয় ও নির্গুণ স্বরূপের মতকেও গ্রহণ করিলেন। কেবল পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মা ও জড়ের একান্ত ভিন্নতা আছে, এই মতই বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত করিবার জন্য শাঙ্কর মতকে তিনি স্বীকার করিলেন না।

ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস

(১৮৫৯ - ১৮৬০)

"ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস"—এই নাম হইতেই বুঝা যায় যে, এই বইটিতে দেবেন্দ্রনাথকে প্রধানত ধর্মতত্ত্ববিৎ (Theologian) রূপেই আমরা দেখিতে পাইব।

ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাতা রামমোহন রায়কেও ব্রাহ্মধর্মের মূল সত্যগুলিকে বেদান্তশাস্ত্রের ভিত্তিতে পত্তন করিয়া, তার পর নিজের অধ্যাত্মজীবনের আলোকে প্রত্যক্ষ ও উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে হইয়াছিল। বিশ্বমানবের সকল ধর্মতত্ত্বের মূল সত্যগুলি রামমোহন রায় দেখিতে পাইয়াছিলেন বলিয়া বেদান্ত-ধর্মের মূল সত্যকেও সেই বিশ্বজনীন উদার ক্ষেত্রে তিনি সহজেই তুলিয়া ধরিতে পারিয়াছিলেন। রামমোহন রায় এইরূপে শাস্ত্র মীমাংসা করিয়া তাহার মূল সত্যগুলি আমাদিগকে দিয়া গেলেন; কিন্তু তিনি ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস (Dogmas and beliefs) বেশ প্রণালীবদ্ধ করিয়া বিশদ করিয়া স্পষ্ট করিয়া পাকা করিয়া ও সর্বাঙ্গীণ করিয়া আমাদিগকে দিয়া যাইতে পারেন নাই। দেবেন্দ্রনাথই তাঁহার সেই অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করিয়াছেন। এই বইটিই তাহার নিদর্শন।

এ যুগে ধর্মতত্ত্বের মীমাংসা শুধু এদেশের তত্ত্বের সাহায্যে হয় না; পশ্চিমের ধর্মতত্ত্বকে ঠেলিয়া রাখিবার কোনোই উপায় নাই। কারণ যে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রণালী পশ্চিমে উদ্‌ভাবিত হইয়াছে, তাহার সাহায্যে বেদান্তমতকেও ব্যাখ্যা করিতে গেলে তবেই তাহার মত ও বিশ্বাসগুলিকে প্রণালীবদ্ধ করিয়া দাঁড় করানো যাইতে পারে। পশ্চিমের প্রণালীটুকু লইব আর সেই প্রণালীতে যে-সকল ধর্মমত ও বিশ্বাস, যে-সকল মূলতত্ত্ব সেখানে আলোচিত হইয়াছে, তাহাদের কোনোই ধার ধারিব না—ইহা বলা চলে না। শুধু আপনাতেই আপনি পর্যাপ্ত থাকিবার অন্ধ রুদ্ধতা এ যুগে ভাঙিয়া গিয়াছে। এখন সমস্তই গ্রহণ করিতে হইবে, আত্মসাৎ করিয়া আপনার করিতে হইবে, এবং এইরূপে আপনার জিনিসকে বিশ্বের জিনিস করিতে হইবে। ধর্মতত্ত্ব-মীমাংসকরূপে দেবেন্দ্রনাথ যে তাহাই করিয়াছেন তাহা আমরা এই অধ্যায়ে দেখিবার চেষ্টা করিব। তিনি উপনিষদ্-বেদান্তের মূল সত্যগুলিকে মত ও বিশ্বাসের আকার দান করিতে গিয়া পশ্চিমের ন্যাচারল থিয়লজি; বাটলার, পেলি, চামার্স, প্রভৃতির রচনা; রীড্‌ হ্যামিল্‌টন, ডিউগ্যাল্ড স্টুয়ার্ট প্রভৃতি স্কচ্‌ দর্শনকারদের লেখা; বেন্থাম, মিল প্রভৃতির ইউটিলিটেরিয়ান-বাদ; কাণ্টের নীতিশাস্ত্র—

এ-সমস্ত বিচিত্র মালমসলা, হাপর, হাতুড়ি আনিয়া ফেলিয়াছেন। ইহাদের দ্বারা তাঁহার ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস গড়িয়া-পিটিয়া চোস্ত হইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিমের এই-সকল তত্ত্বকে তিনি গোটাভাবে কোথাও গ্রহণ করেন নাই। অর্থাৎ তিনি যে উপনিষদ্-বেদান্তের সঙ্গে আর স্কচ দর্শন বা ন্যাচারল থিয়লজি বা কাণ্ট বা আর-কিছুর সমন্বয় করিয়াছেন, এ ভুল ধারণা যেন কাহারো না হয়। এ-সমস্তই তিনি উপকরণের মতো, ছাঁচের মতো, কোথাও-না-কোথাও ব্যবহার করিয়াছেন— ইহাদের সাহায্যে বেদান্ত-উপনিষদের মতগুলিকে গড়িয়া-পিটিয়া ঘষিয়া-মাজিয়া একালের ব্যবহারের উপযোগী করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এইখানেই তাঁহার মস্ত কৃতিত্ব।

'ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাসে' সবসুদ্ধ দশটি উপদেশ আছে। এইবার একে একে তাহাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক্ :

ক. প্রথম উপদেশ— ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও লক্ষণ।

ঈশ্বরের অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে দুইটি লক্ষণ স্পষ্ট রহিয়াছে— তিনি জ্ঞানস্বরূপ এবং মঙ্গলস্বরূপ। এই লক্ষণ বাদ দিয়া তাঁহার অস্তিত্বের ধারণা হয় না। তাঁহার এই ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণে দেবেন্দ্রনাথ 'অনন্ত' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। কারণ ঈশ্বর কতক জানেন, কতক জানেন না, তাঁহার কতক সাধুভাব এবং কতক অসাধুভাব —এ কথা হয় না। "তাঁহার যে কোন বিষয় মনে করি, সকলই অনন্ত। তিনি জ্ঞানেতে অনন্ত— তিনি শক্তিতে অনন্ত— তিনি মঙ্গলভাবে অনন্ত— তিনি দেশেতে অনন্ত— তিনি কালেতে অনন্ত।"

এই যে অনন্তের ধারণা, এ সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ একজায়গায় এমন একটু খাঁটি চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, যাহাতে ঈশ্বরের এই লক্ষণ বর্ণনা কেবল একটা কথার কথা হইয়া উঠে নাই। আমরা যা কিছু ভাবি, তা দ্বন্দ্বের সীমায় (limit of opposites) ভাবি। "আলোকের সীমা কি ? না, অন্ধকার। জ্ঞানের সীমা কি ? না, অজ্ঞান। সদ্ভাবের সীমা কি ? না, অসদ্ভাব। মঙ্গলের সীমা কি ? না অমঙ্গল।" কিন্তু ঈশ্বরের কোনো ভাবের সীমা নাই। "তাঁহার জ্ঞানের সীমা নাই বলিয়া তিনি সর্বজ্ঞ ; তাঁহার মঙ্গলভাবের সীমা নাই বলিয়া তিনি পূর্ণ মঙ্গল।"

ইহার পর ঈশ্বরের লক্ষণগুলি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে (order) তিনি সাজাইয়াছেন। মূল লক্ষণ তিনটি ধরিয়াছেন— সত্যং শিবং সুন্দরং। সত্যের মধ্যে তাঁহার জ্ঞান ও শক্তি অন্তর্গত। তাহার লক্ষণ হইল— তিনি সর্বজ্ঞ,

নিরবয়ব, সর্বশক্তিমান, অদ্বিতীয়, নিত্য ও সর্বব্যাপী। মঙ্গলের লক্ষণ হইল, তিনি পূর্ণ মঙ্গল, নিয়ন্তা ও নির্বিকার। সুন্দরের লক্ষণ হইল, তিনি আনন্দরূপ, প্রেমস্বরূপ।

খ. দ্বিতীয় উপদেশ— ঈশ্বর সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্তা।

ঈশ্বর সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্তা কেবলমাত্র তাঁর ইচ্ছায়। তিনি কোনো উপকরণের দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন নাই, ইচ্ছার দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন ও তাঁহার ইচ্ছাতে জগৎ স্থিতি করিতেছে। ইচ্ছার বিরাম হইলে জগৎ লয় পাইবে।

এখানে তিনি বলিতেছেন যে, এই বিশ্বকে ঈশ্বর "অসৎ অবস্থা হইতে সদ্ভাবে আনিয়াছেন।" অসৎ অবস্থা মানে অব্যক্ত অবস্থা। "ঈশ্বরের শক্তি ব্যক্ত হওয়ার নাম সৃষ্টি— ঈশ্বরের শক্তি ঈশ্বরেতেই প্রত্যাবৃত্ত হওয়ার নাম প্রলয়।" এখানে 'আত্মতত্ত্ববিদ্যা'র মতের চেয়ে সৃষ্টিতত্ত্বের মত অনেকটা অগ্রসর হইল, তাহা দেখাই যাইতেছে। অসৎ অবস্থা— নেতিত্বের কথা— পূর্বে তিনি একেবারেই স্বীকার করেন নাই।— না থেকে যে হাঁ হয়— ব্যক্তাব্যক্ত-রহস্যকে তিনি বিশেষ স্থান দেন নাই। এটুকু অগ্রসর এখানে লক্ষ্য করিয়া যাওয়া দরকার।

আর একটি বিষয় এই উপদেশে বিশেষ ভাবে দেখিবার আছে। সৃষ্টি-স্থিতিকে দেবেন্দ্রনাথ ক্রমিক উন্নতির দিক্ হইতে দেখিতেছেন। তিনি লিখিতেছেন, "এই জগৎসংসারের সমুদায় ব্যাপারই উন্নতির ব্যাপার। পৃথিবী প্রথমে যেরূপ তেজস্বিনী ছিল, এখন আরও সতেজ হইয়াছে। পৃথিবীর মুখশ্রী দিন দিন আরও প্রফুল্ল হইতেছে। ভূতত্ত্ববেত্তারা পৃথিবীর আদিম অবস্থা যে প্রকার নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা হইতে পৃথিবী এক্ষণে কত উন্নতাবস্থায় উপনীত হইয়াছে। আবার যদি কেবল এক মনুষ্যজাতির অবস্থা পর্যালোচনা করা যায়, তাহা হইলেও ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। মনুষ্যজাতির অবস্থা সাবিশেষ উন্নতিশীলা। তাহাদের মধ্যে জ্ঞানের উন্নতি হইতেছে, ধর্মের উন্নতি হইতেছে এবং সামাজিক অবস্থারও উত্তরোত্তর উন্নতি হইয়া আসিতেছে। মনুষ্যজাতির মধ্যে যেমন পৃথিবীতে উন্নতির আলোক প্রকাশ পাইতেছে, সেই প্রকার প্রতি মনুষ্য অনন্ত কালের মধ্যে যে কত উন্নত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?"

বিশ্বের, সমস্ত মনুষ্যজাতির, এবং মানবাত্মার এই যে ক্রমিক উন্নতির ধারণা, এটা দেবেন্দ্রনাথের জীবনে ও সাধনায় সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস।

বেদান্তের মোক্ষের আদর্শের মধ্যে এ জিনিস নাই; সে কৈবল্যের আদর্শ স্থিতির আদর্শ (Static conception); উন্নতি ও গতির আদর্শ (Dynamic conception) নয়। উন্নতি ও গতির প্রতি দেবেন্দ্রনাথের এমন প্রবল ঝোঁক যেমন উপরে উদ্ধৃত পদটিতে পাওয়া গেল, তেমনি পুনঃপুনঃ এই বইয়ে এবং অন্যান্য বইয়ে নানা স্থানেই পাওয়া যাইবে। হিন্দুর পক্ষে এই উন্নতির ক্রম-পর্যায়ের কথা তোলাটাই আশ্চর্য— যে হিন্দুর নৈরাশ্যবাদ (pessimism) কল্পযুগ-মন্বন্তরে কেবলি ক্রমিক অবনতির ভাবই প্রকাশ করিয়া থাকে। ধর্ম চতুষ্পাদ হইতে ত্রিপাদ, ত্রিপাদ হইতে দ্বিপাদে ক্রমশই অবনত হইতেছে— সত্যযুগ হইতে কলিযুগে ক্রমশই মানুষের পতন হইতেছে। সমস্ত দেশের এই নৈরাশ্যের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ওঠার একটা একান্ত প্রয়োজন ছিল। হিন্দু মুক্তিকে স্থিতির দিক হইতেই জানে—"ব্রাহ্মীস্থিতি" প্রভৃতি মুক্তির ভাবদ্যোতক বাক্য দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। মুক্তি যে ক্রমিক উন্নতির পর্যায়ে পর্যায়ে ধাপে ধাপে সত্য ও সত্যতরের উপলব্ধিতে ("Grades of Reality") পূর্ণ ও পূর্ণতর হইয়া চলিয়াছে, এই-সকল কথা দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা আরো স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইব। এত বড়ো উন্নতির আদর্শ যাঁর, তাঁকে কি না আমাদের দেশের লোকে 'উন্নতিশীলতা'র বিরুদ্ধ বলিয়া মনে করে। রামমোহন রায়ের মধ্যে সমস্ত মানবজাতির উন্নতির এই মহান্ আদর্শ ঠিক এমনি ভাবেই ছিল। তবে ধর্মতত্ত্বের দিক্ দিয়া তাহাকে এমন স্ফুট ও সর্বাঙ্গীণ ভাবে রামমোহন রায় ধরেন নাই। যেমন সমষ্টিভাবে সমস্ত মনুষ্যজাতির উন্নতি, তেমনি ব্যষ্টিভাবে প্রতি মানবের উন্নতির কথা এমন করিয়া আর কেহ বলেন নাই। সৃষ্টিস্থিতিকে এই গতি ও উন্নতির দিক্ হইতে দেখাটা দেবেন্দ্রনাথের নূতন দেখা।

গ. তৃতীয় উপদেশ— পরমেশ্বর আনন্দস্বরূপ।

প্রথমে ঈশ্বরের লক্ষণ অনন্তের সংজ্ঞায় বলা হইল, তার পর সৃষ্টিস্থিতি যে অনন্ত উন্নতির ক্রমপর্যায়— যিনি অনন্ত, তিনি যে মানুষের অনন্ত উন্নতির বিধান করিয়াছেন, তাহা বলা হইল। এবার তাঁহার আনন্দস্বরূপের আলোচনায় মানুষের আত্মার সঙ্গে তাঁহার কোন্ দিক্ দিয়া যে সান্নিধ্য ও সন্নিকর্ষ হইতে পারে, তাহারই কথা বলা হইতেছে। দেবেন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—"প্রিয় রস আস্বাদনে বা প্রিয় স্বর শ্রবণে মনেতে যেমন এক প্রকার সুখের সঞ্চার হয়, সেইরূপ ঈশ্বরের বিশুদ্ধ ভাব অনুভূত হইলে, আত্মাতে এক পবিত্র আনন্দরসের সঞ্চার হইয়া থাকে।"

এই আনন্দের ভিতর দিয়া তাঁহার উপলব্ধির কথা বলিতে গিয়া দেবেন্দ্রনাথ এক মস্ত কথা বলিয়াছেন যে, "ঈশ্বর সকলেরি সাধারণ সমৃদ্ধি এবং তিনি প্রত্যেকেরই নিজস্ব ধন।" সাধারণ সমৃদ্ধি বলাটা কিছু বড়ো কথা বলা নয়— কিন্তু ঈশ্বর যে প্রত্যেকের নিজস্ব ধন, তাঁর অসীম আনন্দ যে প্রত্যেকটি মানুষের উপরে সম্পূর্ণভাবে একান্তভাবে বিরাজ করিতেছে— এ একটা আশ্চর্য ও নূতন কথা। এই ব্যক্তির ঐকান্তিকত্বের কথা (uniqueness of the individual), ব্যক্তির অসীম মূল্যের কথা (infinite worth of the individual), এখনকার কালের সব চেয়ে বড়ো কথা। রয়েস তাঁর *The World and the Individual* গ্রন্থে এই দিক্ হইতেই প্রতি ব্যক্তির অমরত্বের আইডিয়া প্রচার করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানে এই কথাটির ও উন্নতির কথাটির আরো গভীরতর প্রকাশ আমরা দেখিতে পাইব।

এই উপদেশে আনন্দের সংজ্ঞায় (termএ) আত্মার উন্নতিকে তিনি ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, দেখিতেছি। 'আত্মতত্ত্ববিদ্যা'য় জীবাত্মাকে তিনি জড়ের মতো অসংখ্য পুঞ্জ বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন; ঈশ্বর যে প্রত্যেক জীবাত্মার নিজস্ব ধন— এ কথা বলেন নাই। এখানে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ব্যবধান ক্রমশই দূর হইতেছে, তাহা তো দেখাই যাইতেছে।

আনন্দের উপলব্ধির কথা বলিতে গেলেই, পাপের প্রশ্ন স্বভাবতই আসে। ধর্মতত্ত্বে এ একটা বিষম জটিল প্রশ্ন— বিশেষত খৃস্টান ধর্মতত্ত্বে। নিজের চেষ্টায় ও সাধনায় আমরা পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারি, না ঈশ্বরের করুণা ও প্রসাদের দ্বারা পারি? ইচ্ছার স্বাধীনতা (free will) বা নিয়তির অধীনতা (Destiny)— এ ক্ষেত্রে কোন্‌টার শক্তি বেশি? দেবেন্দ্রনাথ ইচ্ছার স্বাধীনতাকে এক চুলও খর্ব করিতে রাজি নহেন— খৃস্টানী ক্যালভিন্ প্রভৃতির নিয়তিবাদ তিনি কোনো-মতেই গ্রাহ্য করিতে পারেন না। তিনি রামানুজাচার্যের পন্থাতেই এ প্রশ্নের কতকটা সমাধান করিয়াছেন। রামানুজ বলেন, 'বৈমুখ্যে'র দরুন পাপ হয়, ঈশ্বরের 'আভিমুখ্য' করিলে তখন তাঁর প্রসাদ বা আনন্দ আপনি আসিয়া অবতীর্ণ হয়। স্বাধীনভাবে স্বাধীন চেষ্টায় সেই আভিমুখ্য করা চাই, তার পরে ভগবৎ-প্রসাদ বা আনন্দ লাভ হইবে। সুতরাং গোড়ায় আত্মচেষ্টা চাইই চাই— নহিলে পবিত্র আনন্দের আস্বাদ পাইবার উপায় নাই। কিন্তু এখানে প্রশ্ন এই যে, আনন্দ যে আসিল, তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ— আত্মপ্রসাদ। "আত্মপ্রসাদই মনের সুস্থতা, আত্মগ্লানিই মনের বিকৃতাবস্থা।" আবার এই যে আভিমুখ্যজনিত

আনন্দ, এ যে মুহূর্তকালের আনন্দ, বা ইহার একই রকমের ভাব—তাহাও নহে। দেবেন্দ্রনাথ বলিতেছেন, "সেই আনন্দের ক্রমিকই উৎকর্ষ সাধন হইতে থাকে। স্বর্গ হইতে স্বর্গলাভ; সুখ হইতে কল্যাণকর সুখের আস্বাদ গ্রহণ হইতে থাকে।...ঈশ্বরের সহিত আত্মার ক্রমিক নিকট সম্বন্ধ হইতে থাকে।" এখানেও আবার সেই উন্নতির কথা; অবশ্য আনন্দের দিক্ হইতে বলা হইল।

সুতরাং তাঁহার মতে পাপ হইতে মুক্তি—প্রথমে মানুষের যত্নাধীন, পরে ঈশ্বরের প্রসাদ আসিয়া মানুষকে যখন আনন্দিত করে, তখন পাপ ক্রমশ সরিয়া যাইতে থাকে। আনন্দ যেন স্বাস্থ্য, আর পাপ যেন রোগ—স্বাস্থ্য যতই লাভ হয়, রোগ ততই দূর হয়। সুতরাং সাধারণ খৃস্টানী মতে পাপের অবস্থা হইতে মানুষ আত্মচেষ্টায় কোনো কালে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন না, এ কথা দেবেন্দ্রনাথ মানেন নাই। পাপবোধকে সর্বদাই উগ্র করিয়া অস্বাস্থ্যকে পাকা করিয়া রাখার চেষ্টাকে তিনি অবলম্বন করিতে বলেন নাই। পাপের অনুশোচনা বা গ্লানি ঈশ্বরের অভিমুখে মানুষকে লইয়া যায়; পাপ হইতে তখন মুক্ত হইবার জন্য মানুষ চেষ্টা করে; চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের প্রসাদ তাহার মনের গ্লানি দূর করিয়া তাহাকে আনন্দিত করে; আনন্দ যতই বাড়ে পাপ তত কমে এবং ক্রমে আত্মপ্রসাদ জাগিয়া ঈশ্বরের সহবাসের আনন্দে মানুষের আত্মাকে পরিপূর্ণ করিয়া দেয়। পাপ ও পাপ হইতে মুক্তি সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ এই কয়েকটি অবস্থার নির্দেশ করিয়াছেন।

যদিচ বলা গেল যে এই আনন্দের দিক্ হইতে মুক্তির ভাবের সঙ্গে সাধারণত বেদান্তের ভাবের খুবই সাদৃশ্য আছে—তথাপি একটি কথা এখানে বলা দরকার যে, সাধারণত বেদান্তবাদে আনন্দ impersonal। আনন্দ যেন একটা অবস্থা, যে অবস্থা প্রাপ্ত হইলে মানুষের সর্ববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হয়। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে ঈশ্বরের আনন্দ এমন একটা নিষ্ক্রিয় অবস্থা মাত্র নয়—সে ক্রিয়াবান্। এই আনন্দের সম্বন্ধে জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের সন্নিকর্ষ ঘটিতেছে—জীব স্বাধীনভাবে ক্রমে ক্রমে আনন্দের "স্বর্গ হইতে স্বর্গে" উত্তীর্ণ হইতেছে। এই যে প্রত্যক্ষ সহবাসের কথা এবং সহবাসের ভিতর দিয়া "আনন্দের ক্রমিক উৎকর্ষ—এ কথা বেদান্তবাদে নাই। ইউনিটেরিয়ান্ একেশ্বরবাদীদের মধ্যে চ্যানিংএর মধ্যে এই সত্য প্রতিভাত হইয়াছে। সেখানকার খৃস্টানী স্বর্গের স্থিতির ধারণাকে চ্যানিং প্রভৃতিকে ভাঙিতে হইয়াছে। পূর্বে ও পশ্চিমে এই যে একই ক্রিয়া চলিতেছে, ইহাই এ যুগের সবচেয়ে বড়ো লক্ষণ।

ঘ. চতুর্থ উপদেশ— ঈশ্বর সত্যস্বরূপ।

"ঈশ্বরেতেই সত্য শব্দ সম্পূর্ণ সংলগ্ন হয়।" সত্যবস্তু-জ্ঞানবস্তু প্রাণবিশিষ্ট— পূর্ণজ্ঞানস্বরূপের জ্ঞানই প্রাণ। প্রাণ মানে অবশ্য যে প্রাণের হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, যাহা অমৃত। জড়বস্তু ও জীবাত্মা আত্মস্তবৎ বলিয়া তেমন সত্য নহে, ঈশ্বরই একমাত্র সত্য। সত্যের সঙ্গে "না"র যোগ থাকিলে চলিবে না— এতকাল আছে, এতকাল নাই, এতটুকু দেশে আছে, এতটুকু দেশে নাই— কতক জ্ঞান, কতক অজ্ঞান— সত্যের স্বরূপ এ রকম নয়। সুতরাং "এই সমুদায় জগৎসংসারকে আপেক্ষিক সত্য বলা যাইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরই কূটস্থ সত্য।" এখানে "কূটস্থ সত্য" কথাটা বেদান্তদর্শন হইতে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু বেদান্তের ব্যাবহারিক সত্যের জায়গায় আপেক্ষিক সত্য বা Relative Truth কথাটা ব্যবহার করিলেন। আর-এক জায়গায় তিনি লিখিতেছেন,"পারমার্থিক সত্য পদার্থ কেবল তিনিই"। ব্যাবহারিক সত্য বলিলে তো জগৎকে মিথ্যা বা মায়া বলা হয়— ব্রাড্‌লি যাহাকে grades of reality, degrees of reality বলিয়াছেন, তাহা তো মানা হয় না। তাই পারমার্থিক সত্য পদার্থ কেবল তিনিই এ কথা বলিয়াই দেবেন্দ্রনাথ অমনি বলিতেছেন, "এই বলিয়াই যে জগৎসংসার ভ্রান্তিমূলক মিথ্যা, তাহা নহে। এ সমুদায় মায়াও নহে, স্বপ্নও নহে। যেহেতু ইহার মূল যিনি, তিনি সত্য।" শঙ্কর কিম্বা রামানুজ -মতে বাস্তবিক সত্যের ক্রমপর্যায় ("Degrees of Reality")— এ তত্ত্বের কোথাও পরিষ্কার স্বীকারোক্তি নাই। চিদাভাসের ক্রমপর্যায় (degrees) আছে, ইহা স্বীকার করা হইয়াছে। সম্ভবত ভিক্টর কুঁজ্যার দর্শনে এই ভাবটি পাইয়া তিনি তাঁহাকে তাঁহার তত্ত্বের সঙ্গে মিলাইয়া লইয়াছেন। ইহার পরে 'জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি' পুস্তকে আমরা দেখি যে, এই ক্রম-পর্যায়ের ধারাটিকে তিনি অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ প্রভৃতি পঞ্চকোষের ক্রমানুসারে মিলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ক্রমশই পূর্ণ হইতে পূর্ণতর হইয়া চলিয়াছে সত্যের ক্রমগুলি।

এখন প্রশ্ন উঠিবে যে, জগৎসংসার যে সত্যমূলক— তাহার প্রমাণ কি? এখানে হ্যামিল্টন যে প্রমাণ দিয়াছিলেন সেই একই প্রমাণ দেবেন্দ্রনাথও দিতেছেন। তিনি লিখিতেছেন, "আমারদিগের বুদ্ধিতে জগতের অস্তিত্ব জীবাত্মার অস্তিত্ব এবং পরমাত্মার অস্তিত্ব প্রকাশ পাইতেছে, ইহার মধ্যে যদি কোন এক অস্তিত্বকে স্বপ্নের প্রতীয়মান বস্তুবৎ মিথ্যা বলা হয়, তবে অন্য সকল অস্তিত্বকেই তাহার ন্যায় মিথ্যা বলিতে হয়।" অর্থাৎ "same testimony of consciousness"ই এর প্রমাণ— জগৎ, জীব ও ঈশ্বর তিনের অস্তিত্বই বুদ্ধিতে

প্রকাশ পায়—একের অস্তিত্ব বাদ দিলে আর দুয়ের অস্তিত্বও বাদ পড়িয়া যায়। মার্টিনোও এই প্রমাণ দিয়াছেন।

ঙ. ঈশ্বরানুরাগ ও বিষয়বিরাগ—

এইবার আমরা দেবেন্দ্রনাথের ধর্মনীতি (Ethics) সম্বন্ধে মতামতের আলোচনায় উপস্থিত হইয়াছি।

দেবেন্দ্রনাথের মতে বিষয়সুখ, বাহিরের সৌন্দর্য, প্রবৃত্তি এ-সমস্ত একেবারেই যে বর্জনীয় তা নয়—তবে "বিষয়সুখভোগের জন্য যে ধর্ম তাহা অতি নিকৃষ্ট, ঈশ্বরের জন্য যে ধর্ম তাহাই উৎকৃষ্ট ধর্ম।" বিষয়সুখের জন্য ধর্মকে তাই তিনি "কনিষ্ঠ উপায়" বলিয়াছেন। ধর্মপথ মধ্যপথ—"একদিকে সংসার, একদিকে ঈশ্বর, মধ্যে ধর্ম। এদিকের মঙ্গলের জন্যও ধর্ম আবশ্যক; ঈশ্বরের দিকে যাইবার জন্যও ধর্ম সহায়।" অতএব ধর্ম, ঈশ্বরানুরাগ ও সংসারের সম্বন্ধ এইরূপে দেখানো যাইতে পারে—

ঈশ্বরানুরাগ (ভক্তি, Love)

ধর্ম (Ethics)

সংসার (Social happiness)

রাজা রামমোহন রায়ও তাঁহার লোকশ্রেয়ের আদর্শকে অদ্বৈত-জ্ঞান ও সংসারের সেতুর মতো করিয়াই দেখিয়াছিলেন। এই পূর্ণ আদর্শটির প্রয়োজন একালে বিশেষভাবেই ছিল। বিষয়সুখ ধর্মের পুরস্কার হইতেই পারে না; কারণ যখন ধর্মের সঙ্গে সুখের বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন সেই সুখ বিসর্জন করা কত কষ্টকর। ধর্মের জন্য যখন সুখ ছাড়িতে হয়, তখন কী কঠোরতা, কী শুষ্কতা আসে—সমস্তই তখন শূন্যময় হইয়া যায়। সুতরাং সংসারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ধর্ম উপার্জন করিলে, ধর্ম উপরের শ্রেণীতে থাকে, আর ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ধর্ম উপার্জন করিলে, ধর্ম আশ্রয়ভূমিস্বরূপ হয়। "ধর্মের প্রথম পুরস্কার ঈশ্বরে অনুরাগ সঞ্চার হওয়া, তাহার শেষ পুরস্কার ঈশ্বরকে লাভ করা।"

এখানে বিষয়সুখের সঙ্গে ধর্মের বিরোধের অবস্থার কথাটা দেবেন্দ্রনাথ বেশ করিয়া বলিলেন, কিন্তু কেমন করিয়া সেই বিরোধের ভঞ্জন হয় এবং আনন্দলাভ হয়, তাহার কথা বিশেষ বলিলেন না। ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানে আমরা এই প্রশ্নের উত্তর পাইব। এখানে শুধু বিরোধের ফলে যে একটা শূন্যতা ও বিরসতার অবস্থা আসে, কার্লাইল যাহাকে Everlasting No বলিয়াছেন, তাহারি ইঙ্গিতমাত্র করা হইয়াছে।

চ. ষষ্ঠ উপদেশ— বিষয়সুখ ও ব্রহ্মানন্দ।

বিষয়সুখের যে বিশ্লেষণ এই উপদেশে দেবেন্দ্রনাথ করিয়াছেন, তাহা বেদান্তেরই অনুযায়ী। বিষয়সুখ ১. ক্ষণভঙ্গুর ২. অল্প ৩. কখনো ধর্মের অনুকূল, কখনো প্রতিকূল সুতরাং অনিশ্চিত ৪. তাহাতে একটা অতৃপ্তি লাগিয়াই থাকে। এই "অতৃপ্তিই ভূমার প্রতি আমাদের আত্মার প্রধান আকর্ষণ।"

এই ভূমার বোধটি যে কি রকম তাহা নীচের এই কয়েকটি ছত্রে বড়ো সুন্দর ফুটিয়াছে: "আমরা নির্জনেও একাকী নহি, বিপদেও সময়েও নিরাশ্রিত নহি; কিন্তু ঈশ্বর আমারদের সহিত সর্বদাই আছেন এবং তিনি তাঁহার শীতল আশ্রয়ের ছায়া সর্বদাই বিস্তার করিতেছেন। এই বিস্তীর্ণ জগৎ শ্মশানতুল্য নহে কিন্তু ইহা উৎসবপূর্ণ দেবমন্দির।"

বিষয়লাভের তৃপ্তিসুখেও যে কেমনতর অতৃপ্তি থাকে, তাহার বিশ্লেষণটিও নূতন ও চমৎকার। শোপেনহাওয়ারের pessimism বা নৈরাশ্যের ভাব এই বিশ্লেষণে ব্যক্ত হয় নাই— বিষয়সুখের সবটাই যে সুখের অভাব বা দুঃখ শোপেন-হাওয়ারের মতো তাহা বলা হয় নাই। বিষয়লাভের অতৃপ্তির চারিটি অবস্থা তিনি দেখাইয়াছেন: "প্রথমতঃ, বিষয় পাইবার জন্য কেমন ব্যগ্রতা ও কি কষ্ট! দ্বিতীয়ত, না পাইলে কেমন অসুখ! তৃতীয়ত, বিষয় পাইলেও তাহাতে অতৃপ্তি! চতুর্থতঃ, পাইবার পর তাহা নষ্ট হইলে কেমন যন্ত্রণা!"

বিষয়সুখের এই বিশ্লেষণ করিয়া উপসংহারে তিনি 'ইউটিলিটির' সুখসাধন-নীতিকে তীব্র আক্রমণ করিয়া লিখিতেছেন: "সুখই যাহাদের ধর্ম এবং দুঃখই পাপ, নিঃস্বার্থ ভাব যে কি, তাহা তাহারা কি প্রকারে বুঝিবে? ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তি যে ধর্মের জন্য অনায়াসে প্রাণ দান করিতে উদ্যত, তাঁহারদিগের নিকটে সে কেবল ভ্রান্তি মাত্র। ঈশ্বরপ্রীতি যে মনুষ্যকে দেবত্ব-পদে স্থাপিত করে, সে কল্পনা মাত্র। সেই পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণ অশেষ শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া এই স্থির করেন, যে মনুষ্যের সকল কর্মের সমুদায় ধর্মের লক্ষ্য কেবল স্বার্থপরতা। তাহারা মনুষ্যের মহদ্ভাব সকলকে পশুভাবের তুল্য করিতে চাহে এবং তাহারা জ্ঞান-ধর্ম-বুদ্ধি-সম্পন্ন আত্মাকে জড় করিতে চাহে। তাহারা মনুষ্যের আশা, ভরসা, জ্ঞানধর্ম, সকলই এই সংকীর্ণ স্থান ও সংকীর্ণ কালেই বদ্ধ করিতে চাহে এবং মৃত্যুর সঙ্গেই তাহার আত্মার ধ্বংস ও বিনাশ ঘোষণা করে। সাবধান, যেন তাহারদের উপদেশ-গরল কেহ প্রমাদগ্রস্ত হইয়া ভক্ষণ না করেন।"

এ জায়গায় হব্‌স্‌ হইতে বেন্থাম ও জেম্‌স্‌ মিল পর্যন্ত সকল সুখসাধন ও

স্বার্থপরতার নীতিবাদীদিগের মতকে দেবেন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করিয়াছেন। কেননা, তাঁহারাই বলেন, সুখই ধর্ম এবং অসুখই অধর্ম— আত্মপ্রীতিই (self-love) সকল নীতির মূল। মার্টিনোও ঠিক দেবেন্দ্রনাথেরই মতো ইহাদের সমালোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, এ মত গ্রহণ করিলে ধর্মের জন্য প্রাণদান (martyrdom) অসম্ভব হয়। কার্লাইল এই দর্শনকে pig philosophy বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়া গিয়াছেন।

ছ. সপ্তম উপদেশ— পরলোক।

প্রথমে পরমাত্ম তত্ত্ব হইল— পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার কী সম্বন্ধ তাহা আলোচনা করা হইল। তার পর পরমাত্মার সঙ্গে জগতের সম্বন্ধ কী, তাহাও বলা হইল। ঈশ্বর পারমার্থিক সত্য, জগৎ আপেক্ষিক সত্য— বলা হইল। তার পর ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে Ethics-এর ক্ষেত্রে, কেমন করিয়া বিষয়-সুখ হইতে আত্মা মুক্ত হইয়া উঠিবে— সংসারের সঙ্গে ধর্মের, ধর্মের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্বন্ধ কী— তাহা আলোচনা করা গেল। এইবার পরলোকের তত্ত্বটা কি এবং সে সম্বন্ধে সত্য ধারণা কি হইতে পারে, তাহার আলোচনা দেবেন্দ্রনাথ উপস্থিত করিয়াছেন।

এই পরলোকতত্ত্ব দেবেন্দ্রনাথ বাট্‌লার, দেকার্ত এবং ডিউগ্যাল্ড স্টুয়ার্ট প্রভৃতি স্কচ দর্শনকারদিগের যুক্তিপন্থা অনুসরণ করিয়াই আলোচনা করিয়াছেন— এদেশের শাস্ত্রের যুক্তিপন্থা এ বিষয়ে গ্রহণ করেন নাই। যাহা হৌক, পরলোক সম্বন্ধে তাঁহার যুক্তিগুলি একে একে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাক—

১. আমি যে আছি, ইহাতে আর কাহারো সংশয় হয় না। "বরং দৈর্ঘ্য-প্রস্থবিশিষ্ট বস্তুর প্রতি সংশয় জন্মিতে পারে, কিন্তু আমাকে আমি কখনোই সংশয় করিতে পারি না। সংশয় করে কে? না আমি, অতএব আমি আমি, নতুবা আমার সংশয়ও মিথ্যা।" এ একেবারে দেকার্তের কথা— *cogito ergo sum*— I think, therefore, I am। আমি ভাবনা করি, অতএব আমি আছি। পরলোকের অস্তিত্বের গোড়াকার কথা এই নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ।

২. আমি আমার শরীর হইতে ভিন্ন— অঙ্গপ্রত্যঙ্গ (organs), মস্তিষ্ক, হৃদয়— আমি নই। "অন্নপানে শরীরের পুষ্টি হইতেছে, রোগদ্বারা শরীর ক্ষয় হইতেছে এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহার প্রত্যেক পরমাণু একেবারে পরিবর্ত হইয়া যাইতেছে; কিন্তু আমি যে একই সে একই রহিয়াছে। বাট্‌লার আত্মার অমরত্বের প্রমাণ দিতে গিয়া ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ এই ক্ষেত্রে র‍্যাশন্যাল সাইকলজি ও ন্যাচারল থিয়লজির পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন। বিষয়

আর বিষয়ীর মধ্যে কোনো সাদৃশ্য নাই। অতএব শরীর আত্মা পৃথক বলিয়া শরীরের মৃত্যুর পর আত্মার বিনাশ কেমন করিয়া হয়?

৩. জীবাত্মা যে একই— দুই নয়, তিন নয়— ইহা আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ (Testimony of consciousness)। "আমাদের বিচিত্র ভাব, বিচিত্র মনোবৃত্তি; এই একই বস্তুতে অনুভব করি। আমি একই, এই জ্ঞানটি না থাকিলে আমরা কোন বিষয়কেই বিষয় বলিয়া অবধারণ করিতে পারিতাম না; সকলই আমাদের নিকটে অসম্বদ্ধ বিচ্ছিন্ন হইত এবং আমাদের নিকটে তাহাদের থাকা আর না থাকা সমান হইত।"

এটা স্পষ্টই বেদান্তের কথা। "সংবিদেব ভগবতী নঃ স্মরণং বস্তূপগ্রহে" (শঙ্কর মিশ্র)— অর্থাৎ বস্তু উপগ্রহ (accept) করিব কি না ইহার সংবিৎই একমাত্র আশ্রয়। আত্মাতে অসম্বদ্ধ বিচ্ছিন্ন বিষয় সংবিৎ বা আত্মচৈতন্যে অধিষ্ঠিত বা অনুস্যূত।

হয়তো কাণ্টের synthetic unity of apperception-এর কথা অর্থাৎ সংবিতের যোগাত্মক ঐক্যের কথাটাও তাঁহার মাথায় ছিল। অর্থাৎ সকল বিচ্ছিন্ন বিষয়ের অবধারণের মধ্যে যে একটা ঐক্যসূত্র আছে, তাহা যে সংবিতের ঐক্যসূত্র— হয়তো কাণ্টের দর্শনশাস্ত্রের এই কথাটি এ জায়গায় বলিবার সময়ে তাঁহার মনে ছিল। তবে বেদান্তে এ কথা আছে, তাহা তো একটু উপরেই বলা গেল। সুতরাং কাণ্ট হইতে তাঁহার এ কথাটা লইবার বিশেষ প্রয়োজন না থাকিতেও পারে।

কাণ্টের এই তত্ত্ব লইলেও, কাণ্ট র‍্যাশন্যাল সাইকলজিকে এ বিষয়ে যে সমালোচনা করিয়াছেন, সে সমালোচনা দেবেন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন নাই। এই যে আমি এক বস্তু, অতএব আমার ভঙ্গ নাই; আমি শরীর নই অতএব আমার মৃত্যু নাই— কাণ্ট এ সব বাক্যই *petitio principii* ভ্রমে দুষ্ট বলিয়াছেন। যে প্রশ্নের বিচার চাই, সেই প্রশ্নের কাছেই যদি উত্তর ভিক্ষা করা হয়, সেই প্রশ্নের দ্বারাই যদি প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা হয়— তবে সেই ভ্রমের নাম *petitio principii*। আমার ভঙ্গ নাই, আমি শরীর নই— ইত্যাদি কথাগুলি "আমি চিন্তা করি" এই একটি সহজ কথা হইতেই উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। কিন্তু "আমি চিন্তা করি"— তো একটা মনের ক্রিয়া মাত্র— সেটা তো বস্তু নয়।

যাহা চিন্তার ক্রিয়া তাহাকে বস্তুরূপে দেখিতে যাওয়াটাই ভুল। আমি আমার চিন্তাকে আমার শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারি, কিন্তু তার মানে

যে আমার চিন্তা বিচ্ছিন্ন হইয়া চলিতেই থাকিবে, তাহার কোনো মানে নাই। যাহাই হোক দেবেন্দ্রনাথ কাণ্টের র‍্যাশন্তাল সাইকলজির এই সমালোচনাকে গ্রহণ করেন নাই। তিনি র‍্যাশন্তাল সাইকলজির দিক দিয়াই পরলোকতত্ত্বের বিচার করিয়াছেন।

৪. "যখন আমরা আমাদের কর্তৃত্ব বুঝিতে পারি তখন পরকালের বিশ্বাস উজ্জ্বল হয়।" এটা নৈতিক যুক্তি (moral argument)। এই কথাটি খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিতেছেন, "শত শত যুক্তি একত্র হইলেও আমার-দিগকে এই কর্তৃত্ব জ্ঞান হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে না।···বিষয়াকর্ষণের প্রতিকূলে আমাদের ইচ্ছাকে যে পরিমাণে নিয়োগ করি, সেই পরিমাণে বুঝিতে পারি যে, আমি বিষয় হইতে স্বতন্ত্র।···একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র কার্য আপনার কর্তৃত্ব ও স্বাধীনতাকে যেমন ব্যক্ত করে, শত শত যুক্তিতে তেমন করিতে পারে না।" অতএব আপনার কর্তৃত্ব ও স্বাধীনতা কাণ্ট যাহাকে autonomy of the will বলিয়াছেন— তাহার প্রমাণ অভিজ্ঞতা— একটি স্বাধীন কার্য করিলেই তাহার প্রমাণ হাতে হাতে মিলে। এই স্বাধীনতার প্রমাণটি বাস্তবিকই বড়ো আশ্চর্য। এই সুরটি আগাগোড়া দেবেন্দ্রনাথের সকল লেখার ভিতর কোথাও-না কোথাও ধরা দিয়াছে। তিনি তাই লিখিতেছেন, "আমার জীবদ্দশাতেই ধর্মের অনুরোধে বিষয়ের প্রতিকূলে গিয়া মুক্তাবস্থা কতক উপলব্ধি করিতে পারিতেছি।"

৫. শেষ প্রমাণ— আধ্যাত্মিক প্রমাণ— এটিও পূর্বের প্রমাণের ন্যায় দেবেন্দ্রনাথের নিজস্ব। তিনি বলিতেছেন, "ঈশ্বরের সহিত আমাদের চিরন্তন সম্বন্ধ— সে সম্বন্ধ একবার নিবদ্ধ হইলে আর কোন কালেই তাহা নিরাকৃত হইবার নহে। আমরা ঈশ্বরের আশ্রয়ে চিরকালই অবস্থিতি করিব, এই দৃঢ় বিশ্বাস অপেক্ষা পরকালের দৃঢ়তর প্রমাণ আর কিছুই নাই।"

জ. অষ্টম উপদেশ— স্বর্গ ও নরক। ধর্মতত্ত্ব-মীমাংসক (Theologian) হিসাবে স্বর্গ-নরক, দণ্ড-পুরস্কার সম্বন্ধে তিনি কী মনে করিতেন তাহা জানা দরকার। কারণ এ সম্বন্ধে খৃস্টান থিয়লজিতে অনেক কথা বলে এবং সকল ধর্মেই দণ্ড-পুরস্কারের বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া স্বর্গ-নরকের ভাব কিছু-না কিছু আসিয়া পড়িয়াছে।

দেবেন্দ্রনাথ বলেন যে, এ সম্বন্ধে বেশি ফলাও করিয়া বর্ণনা করিতে গেলেই সত্যের পরিবর্তে কল্পনা আসিয়া পড়ে। সোজা কথা ধর্মেই সুখ এবং

পাপেই দুঃখ। কিন্তু তাহা বলিয়া যখন মানুষ স্বর্গ-নরকের কাল্পনিক ছবি আঁকিতে থাকে—তখন স্বর্গকে সহস্র ইন্দ্রিয়-সুখের আগার ও নরককে ভয়ানক যন্ত্রণার স্থান করিয়া বর্ণনা করে। কিন্তু বিষয়-সুখে কি কখনো আত্মা তৃপ্ত হয়? এ-সকল চিত্র কেবল লোভ দেখাইয়া বা ভয় দেখাইয়া মানুষকে ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত করিবার জন্য মানুষ আঁকে। ভয় এবং লোভ দেখাইয়া মানুষকে ধর্মে আনিতে চাওয়ার মতো অন্যায় আর-কিছুই হইতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে তিনি খৃস্টান থিয়লজিকে রীতিমত সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার কথা নিম্নে উদ্ধার করিয়া দিই: "তিনি (ঈশ্বর) আমারদিগের জন্য একদিকে স্বর্গ আর একদিকে নরক সৃষ্টি করিয়া আমারদিগকে তাহার মধ্যস্থল এই পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিয়া রাখেন নাই যে মৃত্যুর পরে হয় অনন্ত স্বর্গভোগ বা অনন্ত নরকভোগ হইবে। আত্মার উৎকর্ষ সাধনই তাঁহার উদ্দেশ্য।...পাপীকে অনন্ত নরক, জলন্ত অনল, দুঃসহ যাতনার ভয় দেখাও, তাহাতে তাহার কি হইবে? তাহার পাপের আসক্তি কি ক্ষীণ হইবে?...মন্দকে ভাল বলিয়া গ্রহণ করাতেই পাপ, তাহার সহিত ভয় মিশ্রিত হইলেই কি তাহার মলিনত্ব দূর হইল?

"... পাপীর অনন্ত শাস্তি নহে। পরিমিত জীব অনন্ত পাপে পাপী কখনই হইতে পারে না।

"... ব্রাহ্মধর্মের স্বর্গ কেবল সুখের স্বর্গ নহে। ব্রাহ্মধর্ম সুখের জন্য, ভোগের জন্য, এখানেই হৌক বা পরত্রই হৌক, ধর্ম সাধন করিবার শিক্ষা দেন না; কিন্তু সর্বথা ইহামুত্রার্থফলভোগ বিরাগেরই উপদেশ দেন। ব্রাহ্মধর্ম এ প্রকার কোন ঔষধ দেন না যে, তাহা সেবন করিয়া পাপী একেবারেই সুস্থ হইবে; কিন্তু তিনি এই উপদেশ দেন যে, অনিবার্য যত্ন সহকারে আমাদের কুপ্রবৃত্তি সকলকে দমন করিতে হইবে এবং আমাদের ইচ্ছাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত মিলিত করিতে হইবে।...কোন কালেই আমাদের আত্মার উন্নতির বিরাম হইবে না। আমরা অনন্ত উন্নতিলাভের অধিকারী, অনন্তস্বরূপকে আমরা কোন কালেই জানিয়া এবং তাঁহার আনন্দ ভোগ করিয়া শেষ করিতে পারিব না, সেই অনন্ত প্রস্রবণ হইতে আমরা সকল কালেই পূর্ণ হইতে থাকিব।" ইউনিটেরিয়ান একেশ্বরবাদীদেরও খৃস্টানধর্ম সম্বন্ধে এই কথা। চ্যানিং, থিয়োডোর পার্কার প্রভৃতি খৃস্টানী স্বর্গের আদর্শকে, একেবারে চরম মুক্তির আদর্শকে, নিন্দা করিয়াছেন। এ কথা আমরা অন্যত্র বলিয়া আসিয়াছি।

খৃস্টানধর্মের **Heaven and Hell** এবং **Redemption**—এ-সকল ভাবের

বিরুদ্ধে তাঁহার কি বক্তব্য তাহা জানা গেল। দণ্ড পুরস্কার সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, পাপীর দণ্ড অবশ্যই হইবে ; তবে দণ্ডের জন্যই ঈশ্বরের দণ্ড দিবার তাৎপর্য নহে, কিন্তু পাপীর পরিত্রাণের জন্য। সেইজন্য অনন্ত নরকের ব্যবস্থা হইতেই পারে না। যেমন তিনি পাপের দণ্ড দেন, তেমনি ধর্মের পুরস্কার দেন। কিন্তু পুরস্কারের জন্য ধর্ম নহে—আত্মপ্রসাদই পুরস্কার ; ঈশ্বরের নিকটবর্তী হওয়াই সকলের চেয়ে বড়ো পুরস্কার। স্বর্গ ও নরক এইখানেই ভোগ হয়—কারণ ধর্মের আত্মপ্রসাদ এইখানেই আমরা পাই এবং পাপের আত্মগ্লানি এইখানেই সহ্য করি। পাপ হইতে আত্মগ্লানি, আত্মগ্লানি হইতে বিষয়-ব্যাবৃত্তি, বিষয়-ব্যাবৃত্তি হইতে ইশ্বরের আভিমুখ্য, ঈশ্বরের আভিমুখ্য হইতে ব্রহ্মানুরাগ—এইরূপে ধাপে ধাপে পাপীকে দণ্ড দিয়া তাহার পাপ ঈশ্বর শোধন করিয়া লন। এইজন্য "তাঁহার সকল শাস্তি ঔষধস্বরূপ।"

এই 'স্বর্গ ও নরকে'র উপদেশে কাণ্টের Ethicsএর কথা এক জায়গায় খুবই স্পষ্ট রকমেই প্রকাশ পাইয়াছে—সেই জায়গাটিই ইহার মধ্যে বিশেষ মূল্যবান্। কিন্তু তার আগে কাণ্টের নীতিশাস্ত্রের মোট কথাটা কী, তাহা জানা দরকার। কাণ্ট তাঁহার "Critique of Practical Reason"এ ব্যাবহারিক জ্ঞানের সামান্য অবশ্যম্ভাবী বিষয়স্বরূপ নৈতিক নিয়মকে (Moral law as the universal and necessary object of the Practical Reason), Categorical Imperative বা অবশ্যপালনীয় আদেশ বলিয়াছেন। অর্থাৎ অন্যান্য নিয়ম (practical laws) যেমন সুখের উদ্দেশ্য বা অপর নানা উদ্দেশ্য সাধনের সহায়, নৈতিক নিয়ম তাহা নহে—কেবলমাত্র ইহারি জন্য ইহাকে মান্য করিতে হয়। সেইজন্য যে-সকল "material motives," সুখসাধনের যে-সকল উদ্দেশ্য আমাদের ইচ্ছার স্বাধীনতাকে (Autonomy of the Will) হরণ করিয়া তাহাকে নিজেদের অধীন করিতে চায়, সেই-সকল উদ্দেশ্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা তাহাদের জয় করিয়া—একমাত্র নৈতিক উদ্দেশ্য (moral motive) যে নৈতিক নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধা (respect for the Moral Law)—তাহাকে ধরিতে হইবে। সুখকে কোথাও আমল দিলে চলিবে না, সুখের সকল উদ্দেশ্যগুলিকে ঝাঁটাইয়া ধর্মের বিশুদ্ধ কঠোর ভূমিতে উত্তীর্ণ হইতে হইবে—ইহাই কাণ্টের নীতিশাস্ত্রের সার কথা। এই নীতিপন্থাকে তাই Rigorism বলে অথবা নিষ্কাম কর্তব্যসাধনের পন্থা বলে—কারণ এ পন্থায় সুখকে একেবারেই বাদ দেওয়া হইয়াছে।

দেবেন্দ্রনাথ কাণ্ট ও ফিক্তের নীতিশাস্ত্রের কাছে খুবই ঋণী। কাণ্টকে ইউটিলিটেরিয়ান সুখসাধননীতির (Hedonism) প্রতিবাদ করিয়া এই কর্তব্যের জন্য কর্তব্যসাধন নীতিকে (Rigorism) প্রতিষ্ঠিত করিতে হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথের কালে মিল্, বেন্থাম্ প্রভৃতির, প্রভূততম লোকের অধিকতম সুখসাধনের নীতিতত্ত্বের প্রভাব অতিমাত্রায় দেখা দিয়াছিল। সেইজন্য তাঁর পক্ষে কাণ্ট ও ফিক্তের নীতিশাস্ত্র অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছিল।

ফিক্তেও কাণ্টের মতো সম্পূর্ণ স্বাধীনতাবাদী (Absolute autonomy) ছিলেন। আত্মা ক্রমশ, ক্রমশ, অনাত্ম হইতে স্বতন্ত্র হইয়া প্রকৃতির দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবে এবং আপনার বিশুদ্ধ জ্ঞানে আপনাকে স্বাধীন বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিবে, ফিক্তের নীতিতত্ত্বেরও ইহাই আদর্শ। জগতের এই যে একটি বিশুদ্ধ জ্ঞানতন্ত্র নৈতিক ব্যবস্থা (moral order), ফিক্তের কাছে তাহাই ঈশ্বরের স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। এই moral orderএ বিশ্বাসই একমাত্র পূর্ণ বিশ্বাস; আত্মার স্বতন্ত্র ও স্বাধীন লোকে এই ব্যবস্থাকে কাজ করিতে দিলেই ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ যথার্থ সম্বন্ধ হয়। কিন্তু ফিক্তের এই নীতিতন্ত্রের নিয়ামক যে reason তাহা Person বা পুরুষ নহে— সুতরাং তাহার সঙ্গে যোগ আনন্দের যোগ হয় না। এ ক্ষেত্রে আনন্দের দান-প্রতিদানের সম্বন্ধ নাই। মার্টিনো নৈতিক জ্ঞানের (moral reason) এই impersonal অবস্থা হইতে প্রত্যক্ষ পূর্ণ মঙ্গল person-এর বোধে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথও সেই জায়গায় উঠিয়াছিলেন— কাণ্ট, বা ফিক্তের মতন নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা এক মনে করেন নাই, ইহা আমরা তাঁহার ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানে দেখিতে পাইব। তবে কাণ্ট ও ফিক্তের নীতিতত্ত্বের প্রভাব তাঁহার উপরে যে বিশেষভাবে পড়িয়াছিল, তাহার নিদর্শন এই গ্রন্থেই জায়গায় জায়গায় দেখিতে পাইব। এই উপদেশে এই রকমের যে স্থানটির উল্লেখ করিয়াছিলাম তাহা নীচে উদ্‌ধৃত করিয়া দিতেছি। দেবেন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

"ধর্মকে ধর্মের জন্যই আলিঙ্গন করিতে হইবে। আমরা যদি ভাবী সুখের প্রত্যাশায় বর্তমান সুখ পরিত্যাগ করি, তবে তাহা ধর্ম সাধন হইল না স্বার্থ সাধন মাত্র।... আমাদের প্রবৃত্তির সঙ্গে অনেক স্থলে ধর্মের ঐক্য দেখা যায়। শরীররক্ষা আমাদের ধর্ম; কিন্তু আমরা প্রবৃত্তি বশতঃও শরীর-সেবায় প্রবৃত্ত হইতেছি। অশন বসন সুখ স্বচ্ছন্দতা পাইবার নিমিত্তে লোকে যে এত কষ্ট সহ্য করিতেছে, ধর্মতঃ বিবেচনা করিতে গেলে তাহাদের কিছুমাত্র গৌরব নাই।"

(কাণ্টের ভাষায় তখন তো তাহারা instincts বা material motivesএর দ্বারা চালিত হইয়া শরীর রক্ষা করিতেছে) "কিন্তু যদি আমাদের এমন এক সময় উপস্থিত হয়, যখন আমরা বিপদে একান্ত আক্রান্ত হই— শোকেতে ব্যাকুলমতি হই— আপনার প্রতি আর কিছুমাত্র আদর থাকে না, মৃত্যু আমাদের প্রার্থনীয় হইয়া পড়ে ; এমন অবস্থায় যদি আমরা আমাদের সমুদায় বল একত্র করিয়া কেবল ধর্মের জন্য কর্তব্যের জন্য আত্মরক্ষা করি ; সেই স্থলেই আমাদের ধর্মবল প্রকাশ পায়।" এই উদাহরণটি কী চমৎকার এবং কী নিপুণভাবে বলা হইয়াছে ! শরীররক্ষায় যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, তাহার দ্বারা চালিত হইয়া শরীর রক্ষা ধর্মই নয়— তাহাতে ধর্মের সাহায্য নাই। যখন কোনো কারণবশত শরীররক্ষার সেই প্রবৃত্তি চলিয়া গিয়াছে, তখন যদি সংগ্রাম করিয়া ধর্মবোধে শরীর রক্ষা করা হয় তবেই তাহাতে গৌরব আছে। কারণ তাহাতে স্বাধীনতার স্ফূর্তি আছে।

তার পরে তিনি বলিতেছেন, "এই প্রকার আমরা ধর্ম হইতে হিতৈষণার আদেশ পাইতেছি এবং স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতেও অন্যের প্রতি প্রেম, দয়া, করুণা বিস্তার করিতেছি। কিন্তু মাতা যে তাঁহার পুত্রকে স্নেহ করেন, স্বামী যে তাঁহার স্ত্রীকে প্রীতি করেন, দরিদ্রের দুঃখ দেখিয়া যে কোন ব্যক্তি দয়া অনুভব করেন, তাহাতে তাঁহারদিগের ধর্ম-গৌরব কি ?" —এ একেবারে কাণ্টের Rigorismএর কথা। কবি শিলার কাণ্টের এই কঠোর নীতিবাদকে ঠাট্টা করিয়া লিখিয়াছেন—

"Willing, serve I my friends all, but do it alas with affection ;

"And so gnaws me my heart that I'am not virtuous yet,

Answer—

"Help, except this answer, there is none ; you must strive with might to contemn them,

"And with horror perform then what the law may enjoin."

আমি বন্ধুদের সেবা করি, কিন্তু সেটা স্নেহের সঙ্গে করি— সেইজন্য আমার মন পীড়া পায়, কারণ আমি এখনো পর্যন্ত ধার্মিক হই নাই।

—উত্তর—

এ ছাড়া আর উপায় দেখিতেছি না— তুমি প্রাণপণে তাহাদের ঘৃণা করিতে চেষ্টা করো— তার পরে প্রীতির সঙ্গে নীতির নিয়মের নির্দেশ অনুসারে যে মঙ্গল করিবার আছে তাহা করো।

দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, নির্বিরোধ হইতে বিরোধের অবস্থায় আসিলে তবেই ধর্ম হয়।— নির্বিরোধ অবস্থা প্রবৃত্তির (Instincts) অধীনতার অবস্থা; আর বিরোধের অবস্থা, যে অবস্থায় প্রবৃত্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়লাভ করা যায়। এ কথাটার মধ্যে শুধু যে কাণ্টের প্রভাব আছে তাহা নহে, মার্টিনোরও প্রভাবও থাকার কথা। অনুমান ১৮৪৭।৪৮ খৃস্টাব্দে মার্টিনোর রচনাবলী প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে— সুতরাং তাঁহার লেখার সহিত দেবেন্দ্রনাথের পরিচয় থাকার সম্ভাবনা। এই যে দুই অবস্থার মধ্যে একটি বৈষম্য আছে এবং বিরোধের অবস্থা না হইলে ধর্ম হয় না— এ কথাটা মার্টিনোর বলিয়াই বোধ হয়।

কাণ্টের কঠোর নীতিবাদকে গ্রহণ করিলেও, ইন্দ্রিয়সুখকে একেবারে বাদ দিবার কথা দেবেন্দ্রনাথ বলেন নাই। এই জায়গায় তাঁহার বিশেষত্ব আবার ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার সৌন্দর্যপ্রবণ প্রকৃতি ধরা পড়িয়াছে। এই "স্বর্গ ও নরক" উপদেশের মধ্যে ইন্দ্রিয়সুখভোগের সমর্থন করিয়া এক স্থানে যে কতগুলি কথা বলা হইয়াছে, তাহা অপূর্ব। অপূর্ব এইজন্য যে, কাণ্টের কঠোর নীতির পাশাপাশি এই কথাগুলি পড়িলে একেবারে চমকিয়া উঠিতে হয়। কারণ, বিষয়সুখের সঙ্গে ধর্মের বিরোধের কথাই বারবার বলা হইতেছে— আর স্বাভাবিক প্রবৃত্তির স্নেহ-প্রেম-দয়া-করুণার চেষ্টায় কোনো ধর্মগৌরব নাই, এ কথাও বলা হইতেছে। তার মধ্যে হঠাৎ নিম্নলিখিত কথাগুলি একেবারে দারুণ গুমটের মধ্যে দমকা হাওয়ার মতো আসিয়া পড়িয়াছে—

"নির্দোষ ইন্দ্রিয়সুখ অবশ্য সেব্য, তাহার সন্দেহ নাই। শোভা সংগীত সৌগন্ধে পরিবৃত মনোহর উদ্যান বা উন্নত প্রাসাদে বাস করা— যে সকল স্থানে কর্ণ কোন অশ্রাব্য স্বর শুনিতে পায় না, চক্ষু কোন কুৎসিত রূপ দেখিতে পায় না, এমন সকল স্থানে কালক্ষেপ করা— নানাবিধ ভোগ্য সামগ্রীতে আমাদের পশুপ্রকৃতিকে চরিতার্থ করা; এ সকল সামান্য সুখ নহে। পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিরা যাহা বলুন না কেন, এ সকল সুখ কখনই হেয় নহে।"

এ-সকল কথা রসেটি বলিতে পারিতেন। কারণ চতুর্দিক্‌কে শোভন ও সুন্দর করিয়া রাখার বিশেষ প্রয়োজন যে আছে ইহা তিনি বলিয়া গিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথের জীবনেও এ-সকল কথা খুবই সত্য; কারণ তাঁহার ইন্দ্রিয়বোধ অত্যন্ত বেশিমাত্রায় সূক্ষ্ম ছিল এবং লেশমাত্র অসুন্দর জিনিস তাঁহাকে পীড়া দিত। এই সুখের ভিতর দিয়া যে একটা সৌন্দর্যের ও রসের উপলব্ধি

হয় এবং চিত্তের মলিনতা ও পাপ প্রভৃতি একেবারে ধুইয়া মুছিয়া যায়, সে উপলব্ধির কথা আমরা ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানে ইহার পরে যথেষ্ট পাইব। সুতরাং Rigorism বা কাঠিন্যের নীতিতে তিনি কখনোই ঠেকিয়া যান নাই। তাঁহার সৌন্দর্যসাধনায় সকল কঠোরতা ও সংগ্রামকে তিনি বিলীন করিয়া দিয়াছিলেন। সৌন্দর্য হইতে ঈশ্বরানুরাগ, ঈশ্বরানুরাগ হইতে নিকট সান্নিধ্য, নিকট সান্নিধ্য হইতে তাঁহার আদেশ শ্রবণ—দেবেন্দ্রনাথকে এই ক্রমপর্যায় —নীতিমার্গের শুষ্ক Categorical Imperative হইতে অধ্যাত্মমার্গের নিবিড় সহবাসজনিত আদেশ শ্রবণ ও আদেশ পালনের দিকে লইয়া গিয়াছিল।

ঝ. নবম উপদেশ—মুক্তি।

এইবার শেষ কথায় আমরা আসিয়া পড়িয়াছি—মুক্তি কি ?

দেবেন্দ্রনাথ মুক্তিকে মধ্যবিন্দু বলিয়াছেন। মুক্তি আমাদের লক্ষ্য হইলে, সমুদায় সংসারের কার্যই আমাদের পরিধি হয়, আর আমরা মধ্যের বিন্দুতে অবস্থিতি করি। এই উক্তিটির মধ্যে বেশ একটি নূতনত্ব আছে। মুক্তি মানে হৃদয়গ্রন্থি হইতে মুক্তি—মোহ অজ্ঞান স্বার্থপরতা যা-কিছু সংসারের পাশে, মৃত্যুর পাশে বদ্ধ করিয়া রাখে তাহা হইতে মুক্তি। কিন্তু এই মুক্তি ঘটিলে সংসার ঘুচিয়া যায় না—"সমুদায় নিঃস্বার্থ ধর্ম্মকার্য নিশ্বাসের ন্যায় সহজ হইয়া আইসে।"

ঞ. দশম উপদেশ—মুক্তি।—উপরে যেটুকু বলা হইল তাহাতে মুক্তির অভাবাত্মক (negative) দিকের কথাই বলা হইয়াছে। কিন্তু "মুক্তির অবস্থা কেবল অভাবের অবস্থা নহে ; পাপের অভাবই যে মুক্তি, তাহা নহে।" তাহা হইলে তো পশুদিগের অবস্থা এবং শিশুদের নিষ্পাপাবস্থা মুক্তির অবস্থা হইত। সংগ্রামের ভিতর দিয়া মুক্তিই মুক্তি ; যে মনে জ্ঞান প্রীতি এবং স্বাধীন কর্তৃত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, সেই মুক্ত।··· এই মুক্তি লাভ করা আমাদের অনন্তকাল সাধ্য। এ জীবনে এই পৃথিবীতে ইহার এক পাঠ সাঙ্গ হইয়া গেল ; পরজীবনে অন্য অন্য পাঠ অভ্যাস করিতে হইবে। "আমাদের ক্রমিক উন্নতি হইবে।" এই জীবনেই মুক্তির প্রথম সোপান মাড়ানো গেল বটে, কিন্তু অনন্ত জীবনের ভিতর দিয়া আমরা সোপানের পর সোপান অতিক্রম করিতে থাকিব। মুক্তির ভিতরে এই যে ক্রমিক উন্নতির ভাব—(gradations) আছে—ইহা নিউম্যান এবং চ্যানিংএর লেখায় পাওয়া যায়। কাণ্টের মধ্যে তো পাওয়া যায় বটেই।

অনন্ত উন্নতি বলিতে পাছে একটা অবচ্ছিন্ন (abstract) জিনিস বুঝায়—সেজন্য লোক হইতে লোকে উন্নতির চিত্র প্রত্যক্ষ (concrete) ভাবে তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন। হিন্দু মন কোনো অবচ্ছিন্ন ভাবকে সেই ভাবেই থাকিতে দেয় না ; তাহাকে রূপে (symbolএ) প্রকাশ করে।

দেবেন্দ্রনাথ এই পৃথিবীলোক হইতে যে উৎকৃষ্ট লোকে আমরা যাইব তাহাকে হিন্দু কল্পনা অনুসারে দেবলোক বলিয়াছেন। "যেখানে আমরা ঈশ্বরের অধিকতর নিকটবর্তী হইতে পারিব, যেখানে আমাদের জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা ঈশ্বরের জ্ঞান, প্রীতি ও ইচ্ছার সহিত অধিক মিলিত হইবে—সেই স্বর্গলোক, সেই পুণ্যধাম। দেবতারা দেব নাম কেন ধারণ করিয়াছেন ; কেননা ঈশ্বরের উপাসনাতেই তাঁহারা নিরন্তর নিমগ্ন আছেন। 'মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে।' "

কিন্তু উন্নতির জন্য তাঁহার মনের এতই প্রবল আবেগ যে, দেবলোকের কথা বলিয়াই তিনি বলিতেছেন, "সেখানে (সেই দেবলোকেই) যে আমাদের শিক্ষার শেষ হইল তাহা নহে। যদিও সে এমন আনন্দের লোক, যাহার জন্য শত শত জীবন বলিদান দেওয়া যায়। কিন্তু সেখানেও শেষ নয়—আরো আরো আরো—eternal quest of perfection—পূর্ণতার অনন্ত সন্ধানে আমরা যাইব। উন্নতির জন্য এমন অত্যুগ্র, ব্যাকুল ও দুরন্ত ইচ্ছা, একালে এদেশের আর কোনো লেখকের মধ্যে বোধ হয় এমন করিয়া ফোটে নাই ; অথচ দৈবের কি শাস্তি যে ইঁহাকেই উন্নতিশীলতার বিরুদ্ধচারী একান্ত রক্ষণশীল বলিয়া সর্বত্র প্রচার করা হয়।

মুক্তি সম্বন্ধে ধর্মতত্ত্বমীমাংসক (theologian) হিসাবে তিনি বৈদান্তিক মুক্তির আদর্শ ও খৃস্টান মুক্তির আদর্শ দুইই খণ্ডন করিয়া ব্রাহ্মধর্মের মুক্তির আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়াছেন। বেদান্তের মুক্তির আদর্শ এই যে, জীবত্ব গিয়া ঈশ্বর হইয়া গেলে জীবের মুক্তি হইবে।

এই মুক্তি ব্রাহ্মধর্মের মুক্তি নহে ; কারণ ব্রাহ্মধর্মের মুক্তি ঈশ্বরের অধীন হইয়া থাকা ; সুতরাং ব্রাহ্মধর্মের মুক্তি আত্মার অনন্তকালের উন্নতি। এই প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ শঙ্করাচার্যের কথা বিশেষ শ্রদ্ধার সহিতই উল্লেখ করিয়াছেন—এবং অদ্বৈতবাদের মধ্যে যেটুকু সত্য আছে তাহাও ধরিয়াছেন, দেখিতে পাই। সুতরাং 'আত্মতত্ত্ববিদ্যা'য় শঙ্করের প্রতি তাঁহার যে ভাব, এখানে তাহার কিছু বৈলক্ষণ্য দেখা যাইতেছে। তিনি লিখিতেছেন—"বৈদান্তিক মতের প্রধান পোষক যে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য, তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে আমরা সংসার হইতে

উপরত হইয়া ও কর্মের ফলাফলে নিরাকাঙ্ক্ষী হইয়া পরব্রহ্মের উপাসনা করিলে তাঁহার সহিত এক হইয়া যাই; তাঁহাতে আর আমাতে কোন প্রভেদ থাকে না। হীনমতি কুলোকের হস্তে এই মত পড়িয়া তাহার ফল এই হইয়াছে যে তাহাদের মধ্যে পাপপ্রবাহ বৃদ্ধি পাইয়াছে; তাহারা বলে আমি যাহা করিতেছি, ঈশ্বরই করিতেছেন।" ইত্যাদি।

তার পর খৃস্টানধর্মের মুক্তির আদর্শকে তিনি সমালোচনা করিয়াছেন। অন্যের হস্তে মুক্তির ভার সমর্পণ করিয়া আমরা মুক্ত হইব— ইহা হইতে পারে না। "ব্রাহ্মদের বিশ্বাস ইহা নয় যে পুরাকালের কোন নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণে আমরা একেবারে পতিত হইয়াছি; আমারদিগকে ঈশ্বরেরও ত্রাণ করিবার সাধ্য নাই; আমাদের অনুতাপও কোন কার্যের নহে; একজন মানবদেবতার সহায়তা চাই।" খৃস্টের দ্বারা redemptionএর আদর্শ এবং স্বর্গে গিয়া মুক্তি-লাভের ভাব (supermundane conception of salvation)— এ-দুইই তিনি ভ্রান্ত বলিয়াছেন।

'আত্মতত্ত্ববিদ্যা'র সহিত 'ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাসের' মতপার্থক্য কোথায় কোথায় আছে?

কোনো বড়ো তত্ত্বদর্শী মনীষী বিশেষ বিচার করিয়া একবার যে তত্ত্বের ভূমিতে দাঁড়ান, ফস্ করিয়া সে ভূমি ছাড়িয়া দিয়া একেবারে বিপরীত কোনো সিদ্ধান্তে গিয়া তিনি উপস্থিত হইতে পারেন না। এক সিদ্ধান্ত ছাড়িয়া দিয়া অন্য সিদ্ধান্তে যাইবার প্রয়োজন হইলে যে প্রণালী, যে প্রকরণ-পদ্ধতি, যে প্রস্থান পূর্বে অবলম্বন করিয়াছিলেন, পরেও তাহাই অবলম্বন করিয়া নিজের গোড়াকার তত্ত্বসিদ্ধান্তের অসম্পূর্ণতা ও খণ্ডতা দোষগুলি সংশোধন করিয়া লন। খেয়ালের ঝোঁকে বা অনুভূতির তাড়নায় কখনো এক কথা, কখনো অন্য কথা বলাটা দার্শনিকেরও ধর্ম নয়, ধর্মতত্ত্ববিদেরও ধর্ম নয়। তাঁহার দর্শন বা দেখা মানেই সম্যক্ দৃষ্টি— খণ্ডগুলাকে সমগ্রের মধ্যে বেশ সুবিহিত করিয়া দেখা। অসামঞ্জস্যগুলাকে শৃঙ্খলার মধ্যে সুগোছালো করিয়া দেখা। সেই সবটা দেখা এবং এমন শৃঙ্খলিত করিয়া দেখা— ঘড়ি ঘড়ি বদলাইতে পারেই না। দেখার অসম্পূর্ণতা থাকিতে পারে অবশ্য; হয়তো একদিক দেখা হইয়াছে অন্য দিক দেখা হয় নাই— হয়তো ভালোরূপ পরীক্ষা না করিয়া একটা অন্বীক্ষা (inference) করা হইয়াছে— সেগুলি দর্শনশাস্ত্র গড়িবার সময় সকল দার্শনিককেই পূরণ করিয়া করিয়া লইতে হয়।

আত্মতত্ত্ববিদ্যার ও ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাসের মূল সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে এই রকমই প্রভেদ রহিয়াছে। একেবারে আকাশ-পাতাল প্রভেদ হয় নাই। আত্ম-তত্ত্ববিদ্যাতে শঙ্করের প্রতিবাদস্বরূপ বলা হইয়াছিল যে জড় হইতে জীবাত্মা যত ভিন্ন তাহা অপেক্ষা অনন্তগুণে জীবাত্মা হইতে পরমাত্মা ভিন্ন। সেইজন্য পরমাত্মাকে একেবারে জগৎ ও জীব হইতে দূরে সরাইয়া নিজ শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপে চির অবস্থিত করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং জগৎ ও জীবাত্মাকে অসংখ্য (plural) বলা হইয়াছিল। এ দুয়ের মধ্যে ব্যবধান একেবারে অসীম ও অলঙ্ঘনীয় বলিয়া ভাবা হইয়াছিল। ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাসে সে ব্যবধান অনেকটা দূর হইয়াছে— ঈশ্বরকে পারমার্থিক সত্য এবং জগৎকে আপেক্ষিক সত্য বলার দরুন। জীবাত্মাকে জড়ের মতো অসংখ্য পুঞ্জ করিয়া যেমন আত্মতত্ত্ব-বিদ্যায় দেখানো হইয়াছিল, জীবাত্মার অনন্ত উন্নতি এবং স্বাধীন কর্তৃত্ব— এই দুটি নূতন তত্ত্ব এই গ্রন্থে উপস্থিত হওয়ায় সেই পুঞ্জের ভাবটা এখানে একেবারেই কাটিয়া গিয়াছে। "ঈশ্বর প্রত্যেকেরই নিজস্ব ধন"— এই কথা বলার জন্য প্রত্যেক জীবাত্মাকে অসীম মূল্য অর্পণ করা হইয়াছে, তাহাকে একান্ত ও সম্পূর্ণ করিয়া দেখা হইয়াছে। আত্মতত্ত্ববিদ্যা হইতে এ ক্ষেত্রেও অনেকটা অগ্রসর দেখিতেছি। তার পরে, জীবাত্মার স্বাধীন কর্তৃত্বের কথা বলার জন্য, জীবাত্মা পরমাত্মার যে ভয়ংকর ব্যবধান ঐ প্রথম পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছিল, তাহাও অনেকটা ঘুচিয়াছে।

অর্থাৎ সংক্ষেপে যে ঘোর দ্বৈতমত আত্মতত্ত্ববিদ্যায় প্রতিপন্ন হইয়াছে তাহা ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাসে পুরাপুরি না খণ্ডিত হইলেও, তাহার বিচ্ছেদগুলি যে ক্রমশ মিলিত হইবার দিকে চলিয়াছে, ইহা বেশ লক্ষ্য করা যায়।

ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান

(১৮৬০ – ১৮৬১)

এ পর্যন্ত আমরা দেবেন্দ্রনাথকে শঙ্করের প্রতিবাদী এক নূতন তত্ত্ববিৎ এবং ধর্মমত ও বিশ্বাসের এক নূতন ব্যাখ্যাতা ও মীমাংসক রূপেই প্রধানত দেখিয়া আসিয়াছি। 'ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাসে' আমরা দেখিলাম কেমন করিয়া উপনিষদ্-বেদান্তের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া তিনি পশ্চিমের ন্যাচারল থিয়লজি, র‍্যাশন্যাল সাইকলজি, স্কচ দর্শন, ইউটিলিটি দর্শন, এবং দেকার্ত হইতে কাণ্ট পর্যন্ত সমস্ত দর্শনশাস্ত্রগুলিকে প্রথমে বিচার করিয়া, ও পরে আত্মসাৎ করিয়া তাহাদের সাহায্যে নিজের ঔপনিষদ ধর্মমতের ও বিশ্বাসের ভিত্তিকেই প্রশস্ততর

ও দৃঢ়তর করিয়াছেন। এত বড়ো দুই বিপরীত সাধনার ধারাকে এমন করিয়া জীবনের ভিতরের দিক হইতে মিলাইয়া ভাবী যুগের কাছে এক নূতন ও জীবন্ত ধর্মরূপে দান করিয়া যাওয়ার মতো আশ্চর্য ব্যাপার, এ দেশে আর কাহারো দ্বারা বর্তমান কালে ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ।

কিন্তু ইহার চেয়েও আশ্চর্যতর ব্যাপার তাঁহার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। শুধু ধর্মতত্ত্ব ও নীতিতত্ত্বের বিচার ও মীমাংসা নয়, একেবারে সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি; শুধু সম্যক্ দর্শন নয়, একেবারে সর্বেন্দ্রিয় হৃদয় মন ও আত্মা সমস্ত দিয়া দর্শন; শুধু এক-একটি সমস্যার নিপুণ বিশ্লেষণ নয়, একেবারে অখণ্ডবোধের দ্বারা সকল সমস্যার চূড়ান্ত সমাধানের স্পষ্ট নিদর্শন—তাঁহার পরবর্তী গ্রন্থ 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানে' দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা আর ব্যাখ্যান নয়; ইহা ঈক্ষণ—পরিপূর্ণ সত্যের ঈক্ষণ; ইহার প্রাণ আর তত্ত্ব মাত্র নয়, ইহার প্রাণ ঈশ্বরের সহিত সহবাসযুক্ত আনন্দিত একটি সত্ত্ব।

'ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাসে' দেবেন্দ্রনাথ Deism-এর অবস্থা বহু দূর ছাড়াইয়া গিয়াছেন; ব্যাখ্যানে একেবারে Absolute Theism (Theism raised to the Absolute)-এর অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। সৃষ্টি যে এক কালে হয় নাই, তাহা যে ক্রমশই পূর্ণ হইতে পূর্ণতরের দিকে চলিয়াছে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছাই যে সৃষ্টির মূলে এবং আমাদের ইচ্ছার সঙ্গে তাঁর ইচ্ছার যে স্বাধীন যোগের সম্বন্ধ —এই-সকল তত্ত্ব ডীজ্‌মের তত্ত্ব কোনো কালেই নয়, থীজ্‌মের তত্ত্ব।

'আত্মতত্ত্ববিদ্যা'য় জীবাত্মাকে পরমাত্মা হইতে অনন্তগুণে ভিন্ন বলা হইয়াছিল; 'ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাসে' জীবাত্মার স্বাধীন কর্তৃত্ব ও অনন্ত উন্নতির কথা বলায় জীবাত্মা-পরমাত্মার সে ব্যবধান দূর হইয়াছিল। 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানে' বলা হইল যে আত্মাতে তাঁহার রূপ, জগতে প্রতিরূপ। "আত্মাতে তাঁহার সাক্ষাৎ রূপ বিরাজ করিতেছে।" "আত্মা তাঁহার শরীর।" "জীবাত্মা পরমাত্মা এত নিকট যে তাঁহাদের মধ্যে আকাশেরও ব্যবধান নাই।" সুতরাং ব্যাখ্যানে দেখিতে পাই, আত্মা-পরমাত্মার আত্যন্তিক ভেদ দূর হইয়া গিয়াছে। এবং আত্মাতে ঈশ্বরের রূপ ও জগতে প্রতিরূপ বলায় জগতের সঙ্গেও ঈশ্বরের যে একান্ত বিচ্ছেদ পূর্বে কল্পনা করা হইয়াছিল, সে বিচ্ছেদও আর থাকে না। দেবেন্দ্রনাথের সাবেক দ্বৈত মত গিয়া ব্যাখ্যানে পুরা শাঙ্কর অদ্বৈত মত না দাঁড়াইলেও অদ্বৈত-ঘেঁষা মত দাঁড়াইয়াছে বলা যায়। পুরা অদ্বৈত মত হইলে মুক্তি একেবারে কৈবল্য মুক্তি হইয়া বসে, তাহাতে ব্যক্তির স্বাধীন কর্তৃত্বের ও ক্রমিক উন্নতির

স্থান থাকে না। তখন সেই মুক্তির আদর্শই হইয়া পড়ে দারুণ বন্ধনের কারণ। আমাদের দেশে অদ্বৈত মতের সর্বত্র প্রচারে এই অনিষ্টটি ঘটিয়াছিল— ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ বহু যুগ ধরিয়া একেবারে চাপা পড়িয়া গিয়াছিল।

আত্মাতে ঈশ্বরের রূপ এবং জগতে প্রতিরূপ— দেবেন্দ্রনাথ কুজ্যাঁর দর্শন হইতে এই তত্ত্বের আভাস পাইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। অনন্তের সত্যশিব-সুন্দর রূপ জগতের নানা পদার্থে, মানুষের নানা ভাবে ও কর্মে প্রতিরূপে প্রতি-রূপে প্রকাশ পাইতেছে, ইহাই কুজ্যাঁর দর্শনের কথা। তবে কুজ্যাঁ সেই অসীম চৈতন্যকে impersonal ভাবে দেখিয়াছেন, সাক্ষাৎ পুরুষরূপে দেখেন নাই। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে এই জায়গায় তাঁহার পার্থক্য। ইনি বলিতেছেন, তিনি 'আত্মার অন্তরাত্মা'। অন্তরের মধ্যে অন্তরাত্মা রূপে তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার সান্নিধ্য উপলব্ধি— এই যে অব্যবহিত ও পরিপূর্ণ অধ্যাত্মযোগের উপলব্ধি (communion)— ইহা এ যুগে আর কাহারো মধ্যে এমনতর ভাবে দেখা গিয়াছে কি না সন্দেহ। তিনি ব্যাখ্যানে পুনঃপুনঃ বলিতেছেন যে "বাহিরে যে তাঁহার প্রকাশ দেখা, সেও তাঁহাকে দূরে দেখা। যখন তাঁহাকে হৃদয়ে দেখি তখনই নিকটে দেখি।" এইজন্যই বাহিরে তাঁহার প্রতিরূপ বলিয়াছেন ; কারণ বাহিরে তাঁহাকে নিকট করিয়া দেখা যায় না। তিনি লিখিতেছেন, "সৃষ্টির সৌন্দর্যে, মানুষের মুখশ্রীতে, ধার্মিকের কল্যাণতর অনুষ্ঠানে, তাঁহার ভাবের প্রতিরূপ মাত্র দেখা যায়।... তাঁহার প্রতিরূপ সকল স্থানে। মাতার স্নেহ, ভ্রাতার সৌহার্দ্য, পতিব্রতা সতীর পবিত্র প্রেম, এ সকলই তাঁর প্রতিরূপ।"

জীবাত্মাতে তাঁহার রূপ বলা হইল এবং আত্মাতেই তাঁহাকে দেখা যথার্থ সত্য দেখা বলা হইল। ইহাতে আত্মা-পরমাত্মার ব্যবধান গিয়া আশ্রয়-আশ্রিত সম্বন্ধ দাঁড়াইল। সসীমই অসীমের প্রকাশ— সসীম জ্ঞান, প্রীতি ও ইচ্ছার ভিতর দিয়াই অসীম জ্ঞান, অসীম প্রীতি ও অসীম ইচ্ছা প্রকাশ পাইতেছেন— সসীম ও অসীমের মধ্যে এইরূপ একটি নিকট সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। তিনি লিখিতেছেন, "আপনার জ্ঞানের প্রতি দৃষ্টি কর, তাহা চতুর্দিকেই পরিমিত ও সীমাবদ্ধ ; কিন্তু তাহাই অসীম জ্ঞানকে প্রকাশ করিতে থাকে। আপনার ইচ্ছার ভাব দেখ, তাহা স্বাধীন অথচ ক্ষুদ্র ; তাহা সেই মহতী ইচ্ছারই অধীন দেখিতে পাইবে এবং সেই অপরিমিত শক্তির আশ্রয়েই আপনার স্বাধীনতার প্রকাশ দেখিতে পাইবে।" 'আত্মতত্ত্ববিদ্যা'য় অসীম পরমাত্মার সঙ্গে সসীম জীবাত্মার কোনো সম্বন্ধই নাই— উভয়ের স্বরূপ একেবারে ভিন্ন। এখানে বলা হইল আমারি জ্ঞান

সেই অসীম জ্ঞান প্রকাশ করে, আমারি ইচ্ছা সেই মহতী ইচ্ছার অধীন হইয়াই আপনার স্বাধীনতাকে প্রকাশ করিতেছে।

আশ্রয়-আশ্রিত সম্বন্ধের কথা বলিতে গিয়া তিনি বলিতেছেন, যেমন সমুদয় বস্তু আকাশ অবলম্বন করিয়া আছে এবং আকাশের সহিত সমুদয় পরমেশ্বরের আশ্রয়ে রহিয়াছে, জীবাত্মা সেইরূপ পরমাত্মাকেই অবলম্বন করিয়া আছে। এই ভাবের সঙ্গে ম্যালেব্রাঁসের (Malebranche) ভাবের খুবই সাদৃশ্য দেখা যায়। তিনি বলেন, As space is the place of bodies so God is the place of spirits— যেমন আকাশে সমস্ত বস্তু বিরাজ করিতেছে— তেমনি ঈশ্বরে সকল আত্মা অবস্থিত। ঈশ্বরে আত্মা অবস্থিত, এই কথা হইতেই আশ্রয় ও আশ্রিতের কথা আসিয়া পড়িয়াছে। তিনি লিখিতেছেন— "জীবাত্মা পরমাত্মা এত নিকট যে, তাঁহাদের মধ্যে আকাশেরও ব্যবধান নাই।··· আমরা আশ্রিত হইয়া কি আশ্রয়কে জানিব না ?··· আত্মা পরমাত্মা উভয়েই একত্র রহিয়াছেন এবং উভয়েই পরস্পরের সখা। এ দুইজন সর্বদা একত্রে থাকেন। একজন আশ্রয়, একজন আশ্রিত।" এ জায়গায়ও তাঁহার এই ভাবের সঙ্গে শ্লায়ারমেকারের ভাবের সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে। শ্লায়ারমেকার তাঁহার ধর্মতত্ত্বে অধ্যাত্ম ধর্মকে (Religion) অনুভূতিময় চৈতন্য (affective consciousness) বলিয়াছেন— কিন্তু সে অনুভূতি কিসের অনুভূতি ? তিনি বলিয়াছেন, ঈশ্বর যে আমাদের সম্পূর্ণ আশ্রয়— এই অনুভূতি (a feeling of absolute dependence on God)। বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদী রামানুজ প্রভৃতির মধ্যেও এই সেব্য-সেবক সম্বন্ধই ধর্মের প্রাণ।

আশ্রয়-আশ্রিত সম্বন্ধ বলা হইল বলিয়া জীবাত্মা-পরমাত্মার এতটুকু দূরত্ব কল্পনা করা হইল না। বরং এত নৈকট্য হইল যে, তাঁহাতে ও জীবে সহবাস কী করিয়া হইতে পারে, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিতেছেন— "সহবাস কি ? না, একত্রে থাকা। দূরের বস্তুর সঙ্গেই সহবাস হয় না ; কিন্তু অন্তরতমের সঙ্গে কেন না একত্রে থাকা যাইবে ? এমন যে নিকটের বস্তু, তাঁহার সঙ্গে সহবাস কেন না হইবে ?··· তিনি আমারদের এত নিকটে আছেন যে, আত্মা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া জানিতেছে ; তাঁহার সঙ্গে সংস্পৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে। যখন তিনি আমারদের এত নিকটে আছেন, তখন তাঁহার সহিত সহবাস কেন না হইবে ? সহবাস আর কাহাকে বলে ?···আমি যখন যাহা তাঁহাকে বলিতেছি, তাহা তিনি শুনিতেছেন ; তিনি যাহা আদেশ করিতেছেন, আমি শুনিতেছি ; এ অপেক্ষা সহবাস আর কি হইবে ?···তিনি নিজে যেমন অচক্ষু অকর্ণ, অথচ সকল

দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন; আমরা এ চক্ষু না দিয়াও তাঁহাকে দেখিতেছি, ও এ কর্ণ না দিয়াও তাঁহার অমৃত বাক্য শ্রবণ করিতেছি।" ঈশ্বরকে দেখা (seeing God) ঈশ্বরকে শোনা (hearing God)— এতটা প্রত্যক্ষ ঈশ্বরের উপলব্ধি দেবেন্দ্রনাথে যেমন দেখা গিয়াছে, এ যুগে তাঁহার পূর্বে আর কাহারো মধ্যে তাহা দেখা যায় নাই।

আমরা 'ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাসে' কেবল এক স্থানে পাইয়াছিলাম যে, "ঈশ্বর প্রত্যেকের নিজস্ব ধন"। ইহাতে প্রত্যেক জীবকে যে একটি ঐকান্তিকত্ব (uniqueness of the individual) ও একটি অসীম মূল্য (infinite worth of the individual) দেওয়া হইল, তাহাতেই জীবাত্মা-পরমাত্মার সাযুজ্য সারূপ্য সম্বন্ধ হইল। জীবাত্মা আর পরমাত্মা হইতে পৃথক্ রহিল না— উভয়ের যোগ একটি নিবিড় প্রীতির যোগ হইল (personal relation of love)। এই প্রীতির সাযুজ্য সম্বন্ধটি যে কত গভীরভাবে তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার লেখা হইতে একটি স্থান উদ্ধৃত করিয়া দিলেই পরিষ্কার হইবে—"একের প্রীতিতে প্রীতি-ভাব সম্পূর্ণ হয় না; প্রীতি উভয়েরই চাই। ঈশ্বর আমারদিগকে যে প্রীতি করিতেছেন, সেই প্রীতি আবার আমারদের প্রীতিকে আকর্ষণ করিতেছে।··· উদাসীনের মত দেখিলে তাঁহার বিশুদ্ধ উজ্জ্বল প্রেম অনুভব করা যায় না; বিশুদ্ধ জ্ঞান-নেত্রে, প্রীতিরঞ্জিত নয়নেই, তাঁহার প্রেম-দৃষ্টি প্রকাশ পায়।"

তার পরে শুধু এই কথা বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না— মা যেমন প্রত্যেক সন্তানকে পৃথক্ করিয়া ভালোবাসেন, প্রেমিক যেমন নিজের প্রেমাস্পদকে একান্ত করিয়া ভালোবাসে— জীবের সঙ্গে তাঁহার ঠিক সেই ভালোবাসার সম্বন্ধ। তাহা মায়ের সঙ্গে ছেলের সম্বন্ধ; প্রেমিকের সঙ্গে প্রেমাস্পদের সম্বন্ধ। তিনি লিখিতেছেন— "মাতৃস্নেহের ন্যায় সেই স্নিগ্ধ দৃষ্টি সকল জগৎকে সিক্ত রাখিয়াছে;··· তিনি প্রতি জনকেই পৃথক্ পৃথক্ দেখিতেছেন। তিনি একাকী প্রতি আত্মার প্রেম-ক্ষুধা শান্তি করিতেছেন। পৃথিবীর মধ্যে যদি আর কেহই না থাকিত; আমি একাকী তাঁহার রাজ্যের অধিকারী হইতাম; তাহা হইলে তিনি আমাকে যে প্রকারে দেখিতেন, এখনও অগণ্য জীবের মধ্যেও আমাকে সেই প্রকারে দেখিতেছেন।" ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের ইহার চেয়ে ব্যক্তিগত সম্বন্ধের কথা আর কি হইতে পারে?

'ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাসে' যেমন দেখিয়া আসিয়াছি, এখানেও তেমনি

আত্মার সেই ক্রমিক উন্নতির কথা, মুক্তির অনন্ত গতিশীলতার কথা (Dynamic conception) এবং ঈশ্বরেরও প্রাণ-রূপের কথা (life-force) কেবলি পাওয়া যাইতেছে। "অনন্ত কালই আনন্দের উপর আনন্দ, প্রেমের উপর প্রেম, লাভ করিতে থাকিব।" "যিনি আত্মাতে প্রকাশ পাইতেছেন, আমরা তাঁহাকে আত্মার প্রাণরূপে দেখিতেছি।"··· তিনি সকল জগতের প্রাণ ; তিনি প্রাণের প্রাণ।" তাঁহাকে সর্বত্র এই প্রাণরূপে দেখা মানেই সমস্তকে চিরনবীন করিয়া দেখা ; মৃত্যুর পাশ হইতে আত্মাকে এবং জগৎকে মুক্ত করিয়া দেখা। এই প্রাণরূপে তাঁহাকে ধ্যান করিতে গিয়া তিনি বলিতেছেন—"যেমন আমার উপরে তাঁহার চক্ষু, সেইরূপ সর্বত্রই তাঁহার চক্ষু, সর্বত্রই তাঁহার হস্ত— বৃক্ষের পত্রে, পক্ষীর পতত্রে ; সমুদ্রের গাম্ভীর্যে, পর্বতের উচ্চতায়। সকল শক্তির অভ্যন্তরে তাঁহার শক্তিরই প্রভাব ; সেই প্রাণের অধিষ্ঠানে জগৎ জীবিত রহিয়াছে।··· হা! আমি এইক্ষণে কি দেখিতেছি! কোথায় রহিয়াছি! এক্ষণে আমি ভূলোকেও নাই, দ্যুলোকেও নাই ; সেই পরম লোকে রহিয়াছি, ঈশ্বরের মহিমার মধ্যেই স্থিতি করিতেছি।"

'ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাসে' আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে, বেন্থাম প্রভৃতির সুখসাধন নীতির (Hedonism) প্রতিবাদ করিতে গিয়া দেবেন্দ্রনাথ কাণ্টের নিষ্কাম কর্তব্যসাধন নীতির (Rigorism) সমর্থন করিয়াছেন। কেবল সুখলাভের উদ্দেশ্যে প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া যে স্নেহ-প্রীতি ও দয়ার চর্চা হয়, তাহাতে ইচ্ছার স্বাধীন কর্তৃত্ব (Autonomy of the will) থাকে না— সেই-সকল সুখৈষণাকে সংগ্রামের দ্বারা জয় করিয়া কর্তব্যের জন্য কর্তব্য, ধর্মের জন্য ধর্মকে স্বীকার ও পালন করিতে পারিলে তবেই আত্মার স্বাধীনতা রক্ষা পায় ও চরিতার্থতা লাভ করে। কাণ্ট ও ফিক্তের এই নীতিতত্ত্বের মধ্যে সুখ একেবারে বাদ পড়িয়াছিল বলিয়া, দেবেন্দ্রনাথ এক জায়গায় "নির্দোষ ইন্দ্রিয়সুখ অবশ্যসেব্য" এ কথা বলিয়াছিলেন, তাহাও আমরা দেখিয়াছি। তথাপি "সংগ্রামস্থলেই ধর্মের প্রকাশ পায়"— এই কথারই উপর তখন সম্পূর্ণ ঝোঁক দিয়াছিলেন। তাঁহার পঞ্চবিংশ ব্যাখ্যানে এই নৈতিক জীবনের সংগ্রামের একটি ছবি তাঁহার নিজের জীবনের ভিতর হইতে তিনি আঁকিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে সংগ্রামের দিক্‌টার উপরেই সব ঝোঁকটা পড়ে নাই। তিনি লিখিতেছেন, "আমারদের হৃদয়ে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ উভয়েরই ঘোরতর সংগ্রাম।" প্রেয়ঃ আসিয়া নানা রকমের ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়-সুখের প্রলোভন দেখায় ; কিন্তু সে প্রলোভনে পড়িয়া গেলে কিছু কালের মধ্যে

যখন ইন্দ্রিয় জীর্ণ হইয়া যাইবে, তখন আর সুখ সুখ থাকিবে না— তাহা পরম দুঃখের কারণ হইবে। তাই প্রেয়ের প্রলোভন-বাক্য শুনিয়া এক সাধু যুবা তাহাকে বলিলেন, "যদি তোমার নিকটে এমন কোন সুন্দর অমূল্য বস্তু থাকে যে, যাহাতে প্রীতি স্থাপন করিলে আর-সকলকে প্রীতি করা যায় এবং আমার হৃদয়ে সমুদয় প্রীতির পর্যাপ্তি হয়, কস্মিন্‌কালেও তাহার ক্ষয় হয় না; যদি এমন কোন অমূল্য ধন তোমার নিকটে থাকে, তবে তাহা আমার হস্তে দিয়া আমার ব্যাকুলতাকে শান্তি কর।" প্রেয়ঃ ইহাতে চুপ করিয়া গেল এবং তাঁহাকে ছাড়িয়া গেল। তখন সেই সাধু যুবা "পার্থিব ও স্বর্গীয় সকল প্রকার সুখের অভাবে বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন"— এ তো তাঁর আত্মজীবনীরই ঘটনা। বিলাসের আমোদে ডুবিয়া থাকিবার পর একদিন হঠাৎ যখন তাঁর আত্মচৈতন্য হইল, তখন এমন বিষাদ তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল যে, তখন বিষয়সুখ তো গেলই অন্য আনন্দও না থাকায় পৃথিবীটা তাঁহার কাছে একেবারে শূন্য ঠেকিতে লাগিল। তখন শ্রেয়ঃ আসিয়া তাঁহাকে বলিল, "যেখানে প্রীতি স্থাপন করিলে সমুদয় প্রীতির পর্যাপ্তি হয়— যার কখনই আর ক্ষয় হয় না, যাঁর সঙ্গে যোগ নিবদ্ধ করিলে সে যোগের আর অন্ত হয় না, তাঁহারই প্রেমে মগ্ন হইয়া আপনাকে শীতল কর।... ধর্ম সুখেতেও বর্দ্ধিত হয় এবং দুঃখেতেও বর্দ্ধিত হয়; সম্পদেও ধর্মের উন্নতি হয়, বিপদেও ধর্মের উন্নতি হয়।... সুখেতেও ধর্মের উন্নতি হয় বটে; কিন্তু ধর্মের পুরস্কার কদাপি সুখ নহে।... ধর্মের পুরস্কার নিজেই ধর্ম, ধর্মের পুরস্কার আত্মপ্রসাদ, ধর্মের পুরস্কার স্বয়ং ঈশ্বর।"

তবেই দেখিতেছি যে, কাণ্টের মতো স্বাধীন কর্তৃত্ব এবং এই নীতিমূলক জ্ঞান (moral reason) কখনোই দেবেন্দ্রনাথের কাছে শেষ কথা হইতে পারে নাই। তাঁহার কাছে এটা পথ কিন্তু গম্যস্থান ঈশ্বর নিজে। অথচ কাণ্ট ও ফিক্টের কাছে এই নৈতিকতাই আধ্যাত্মিকতা হইয়াছিল তাহা আমরা দেখিয়াছি— ফিক্টে moral orderকেই ঈশ্বরের স্থান দিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ দুটি দিক্ হইতে এই কঠোর নীতিমার্গ ছাড়াইয়া উঠিতে পারিয়াছিলেন। এক সৌন্দর্য উপলব্ধির দিক্ হইতে— যাহার একটুখানি আভাস— 'ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাসে'র মধ্যেই দেখা দিয়াছে; আর-এক ঈশ্বরের সঙ্গে নিবিড় প্রেমের সম্বন্ধের দিক্ হইতে।

অবশ্য, সৌন্দর্য ও প্রেমকে তিনি পৃথক করিয়া দেখেন নাই— ঈশ্বরের প্রেমই যে সৌন্দর্যরূপে আনন্দ দান করিতেছে, এই কথাই তিনি বলিয়াছেন।

তাঁহার সেই প্রেম উপলব্ধি করিলেই আমাদের অন্তর বাহির সুন্দর হইয়া যায় এবং পাপের দাহ ও মলিনতা দূর হইয়া যায়। তিনি লিখিতেছেন, "আমরা কি বিমূঢ়, তিনি আমারদিগকে সর্বদাই আপন ক্রোড়ে আহ্বান করিতেছেন; আমরা সেই মাতৃস্নেহের আহ্বান শ্রবণ করি না। তিনি নিয়তই প্রেম দান করিতেছেন; আমারদের ইচ্ছা নাই, স্পৃহা নাই, প্রীতি নাই, এই জন্যই তাঁহার প্রেম উপলব্ধি করিতে পারি না। আমরা যখনই তাঁহাতে আত্মাকে সমর্পণ করি, তখনই তিনি তাহা পূর্ণ করেন। তিনি পুষ্পকে সৌন্দর্যে পূর্ণ করিতেছেন, সূর্যকে আলোকে পূর্ণ করিতেছেন, তিনি আপনাকে দিয়া আত্মাকে পূর্ণ করেন। সেই অনন্ত প্রস্রবণ কখনই শুষ্ক হয় না।"

আর-এক স্থানে লিখিতেছেন—"সূর্যোদয়ে যেমন রজনীর অন্ধকার আর প্রাতঃকালের কুজ্ঝটিকা দূর হয়; প্রীতির আগমনে সকল প্রকার ভয় ও ব্যাকুলতার শান্তি হয়।···যখন আমারদের আত্মা তাঁহার সহিত সম্মিলিত হয়; তখনি সকলি সুধাময়; তখন জগৎ-সংসার আর এক বেশ ধারণ করে; তখন কিছুই আর অপবিত্র নহে।"

অতএব সৌন্দর্য উপলব্ধি (Realisation of beauty) এবং ঈশ্বরের সহিত প্রেমের আদান-প্রদানের সম্বন্ধ, এই দুই কারণ একত্রিত হইয়া দেবেন্দ্রনাথকে ঐ কঠোর, সকল সুখকামনাপরিশূন্য, সংগ্রামশীল নীতিমার্গ হইতে (Rigorism) এমন একটি উচ্চতর মার্গে লইয়া গেল, যেখানে আত্মার স্বাধীন কর্তৃত্ব মানে ঈশ্বরের সম্পূর্ণ অধীনতা। অর্থাৎ যেখানে ঈশ্বরের অধীনতাতেই আত্মার স্বাধীনতার সম্পূর্ণতা। তিনি বলিতেছেন, "আত্মার স্বাধীনতা দেখ। ইহা কোন প্রকারেই কাহারও অধীন হইতে চাহে না। স্বাধীনতাতে আত্মার যে প্রকার সুখ, তাহা সকলেই অনুভব করিতেছেন। এখানে নানা ঘটনা, নানা অবস্থায় পড়িয়া যদিও তাহাকে অধীন হইতে হইতেছে, কিন্তু আত্মার অন্তরের ভাব স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতা-সুখই তাহার সকল সুখ,— পরের অধীনতাতেই তাহার সকল দুঃখ; কিন্তু দেখ, ঈশ্বরের অধীনে থাকায় আত্মার কেমন আনন্দ। সে আর কাহারো অধীন হইয়া থাকিতে চাহে না; কিন্তু ঈশ্বরের অধীনতা ব্যতীত থাকিতে পারে না।"

আমাদের দেশের বৈদান্তিক মুক্তির আদর্শের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া জীবব্রহ্মের ঐক্যমতকে একবার তাঁহাকে সজোরে ঘা দিতে হইয়াছিল; কারণ তাহা না হইলে জীবের ব্যক্তিত্বের আর কোনো বিকাশ হওয়ার পথ থাকে না— সংসার

নষ্ট হইয়া যায়। সেইজন্য তিনি বলিলেন, "মুক্তি মধ্যবিন্দু—সমুদায় সংসারের কার্য তাহার পরিধি।" ঐ মধ্যবিন্দু না বলিলে জীবের স্বতন্ত্রত্ব ও স্বাধীন কর্তৃত্বের ভাব একেবারেই লোপ পায়—অদ্বৈতবাদের মুক্তির আদর্শে জীবের স্বাধীন কর্তৃত্বের ভাবের সম্পূর্ণ লয়। সেইজন্য তাঁহাকে একদিকে সংসার, একদিকে ঈশ্বর ও মধ্যে ধর্ম—এই কথা বলিয়া ধর্মনীতির সাধনকে অর্থাৎ ইচ্ছার স্বাধীন কর্তৃত্বের স্ফূর্তিসাধনকে, পরমার্থ সাধনের সোপানের মতো প্রতিষ্ঠিত করিতে হইয়াছিল। ইহার যে কতখানি প্রয়োজন ছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু ইহাকে চরম অবস্থা মনে করিলেই ভুল হয়—তখন নৈতিকতাই আধ্যাত্মিকতার স্থান জুড়িয়া বসে। এই কথা বিশেষভাবে অনুভব করিয়া তিনি এই ব্যাখ্যানে বলিতেছেন, "যদি কেবল দুঃখ ক্লেশ ও সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়ার নামই মুক্তি হয়—যদি সে অবস্থাতে তাঁহার সেবা, তাঁহার উপাসনা, তাঁহার প্রিয়কার্য সাধনে আমারদের অধিকার না হয়; তবে এই উদাসীন অবস্থাতে আমারদের কি হইবে?"

এমন-কি, আমাদের স্বাধীনতার দ্বারাই যে আমরা সম্পূর্ণরূপেই উদ্ধার পাইতে পারি, ইহা দেবেন্দ্রনাথ বলিতে রাজি নহেন। আত্মপ্রভাবের দ্বারা আমরা অনেকদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারি সত্য; আমরা পাপের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া বিষয়সুখ হইতে নিবৃত্ত হইতে পারি এবং ঈশ্বরের অভিমুখেও যাইতে পারি। কিন্তু এ-সকল যত্ন নিতান্ত আবশ্যক হইলেও "দেবপ্রসাদ ভিন্ন কিছুই সিদ্ধ হয় না।" দেবপ্রসাদ আসিলেই সংগ্রামের অবস্থা পার হইয়া যায়। তখন আর অভাবাত্মক অবস্থা থাকে না, ভাবাত্মক অবস্থা দেখা দেয়। সেইজন্য দেবেন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, "তিনি আমারদিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়া আপনার আপনার ক্ষুদ্র বলের উপরেই আমারদের সকল নির্ভর রাখিয়া দেন নাই; তিনি আমারদের নিকট হইতে দূরে চলিয়া যান নাই যে, একবার পতিত হইলে আর আমরা তাঁহাকে ডাকিতে পারিব না। এ প্রকার হইলে এমন স্বাধীনতা আমারদের না হওয়াই ভাল ছিল। এ প্রকার হইলে পাপীর আর আশা থাকিত না; উদ্ধারের আর উপায় থাকিত না। আমারদিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়া আমারদের সঙ্গে থাকিবার তাঁহার আরো অধিক প্রয়োজন। এ হেতু বাস্তবিকও তিনি আমারদের সঙ্গে সঙ্গেই আছেন এবং আমরাও তাহা সময়ে সময়ে অনুভব করিতেছি। পিতা তাঁহার সন্তানকে পদচালনা শিক্ষা দিবার সময় তাহাকে ছাড়িয়া দেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে থাকেন যে একেবারে

পড়িয়া গিয়া মৃত্যুর অভিমুখ না হয়। শিশু যখন আপনার বলেই চলে, তখন ভয়ে ভয়ে থাকে; যখন পিতার হস্ত পায়, তখনই সাহস পায়। ঈশ্বরের সঙ্গে আমারদের সেই প্রকার ভাব।”

‘ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানে’ আত্মার স্বাধীনতার তাই আসল তাৎপর্য হইল এই যে, আত্মা স্বাধীনভাবে আপনাকে ঈশ্বরের নিকটে দান করিবে ও ঈশ্বরের অধীন হইবে। “তাঁহার প্রীতিতে আমারদের প্রীতিতে সম্মিলিত হইতেছে। তাঁহার অধীনে থাকিতে আমারদের আহ্লাদ— আমারদের নেতা হইতে তাঁহার ইচ্ছা।” তিনিই যে স্বাধীনভাবে আমরা তাঁহার অধীন হই, এইটি ইচ্ছা করেন এবং এই ইচ্ছার জন্যই যে তাঁহার সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে মানুষকে তিনি স্বাধীনতা দিয়াছেন, এ কথা এই ব্যাখ্যানে পুনঃপুনঃ নানা জায়গায় বলা হইয়াছে।

ঈশ্বরের স্বরূপ এবং আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বরকে আর বস্তু (substance) বলেন নাই, পুরুষ (person) বলিয়াছেন। “তিনি পরম বস্তু, এবং তাহা হইতেও অধিক, তিনি পরম পুরুষ। বস্তুর সঙ্গে সে প্রকার চেতন ভাব, জীবিত ভাব, স্বতন্ত্র ভাব প্রকাশ পায় না।” তার পরে বলিতেছেন যে, “তাঁহাকে পুরুষরূপে দেখিলেই আত্মার সঙ্গে তাঁহার বিশিষ্টরূপ যোগ দেখিতে পাই। ···তিনি পূর্ণ পুরুষ, আমরাও প্রকৃতি হইতে উচ্চপদে, আমরাও পুরুষ।” অর্থাৎ জীবাত্মাকেও এখানে তিনি পুরুষ (person) বলিয়াই স্বীকার করিলেন, জীবাত্মাকে প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র করিলেন। পুরুষের সঙ্গে পুরুষের যে স্বাধীন যোগ, জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সেই স্বাধীন যোগ। উভয়েই এক; কেবল একজন পূর্ণ একজন অপূর্ণ। পরমাত্মার পূর্ণ পুরুষত্ব কোনো একটি মানব-সম্বন্ধের ভাবের দ্বারা ব্যক্ত হয় না— দেবেন্দ্রনাথ তাই বলিয়াছেন যে, সকল সম্বন্ধে সকল ভাবে তাঁহার সঙ্গে জীবের যোগ হয়— “তিনি আমারদের পিতা, মাতা, গুরু, ভ্রাতা, সখা সকলি।”

কেন ঈশ্বরকে আদিকারণ বা বস্তু বলিলে চলে না, তাঁহাকে পরমপুরুষ কেন বলা প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে তিনি আর-একটি ব্যাখ্যানে ভালো করিয়া আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনা করিতে গিয়া তিনি সৃষ্টির ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বকে গোড়ায় বিচার করিয়াছেন। দার্শনিক হিসাবে সেই বিচারটির খুবই মূল্য আছে। কেবল প্রকৃতি (nature) বা কার্যকারণের নিয়মের (causality) দিক্ হইতে সৃষ্টিতত্ত্বের বিচার চলে না। “বীজ হইতে যেমন যবব্রীহি উৎপন্ন হয়, ঈশ্বর হইতে জগৎ সেইরূপ উৎপন্ন হইয়াছে”— প্রকৃতির এ দৃষ্টান্ত ঈশ্বর

সম্বন্ধে আরোপ করিলে ঈশ্বরকে প্রকৃতির সঙ্গে একাকার করিয়া দেওয়া হয়। তখন বলিতে হয় যে তিনি বাধ্য হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। কিম্বা বলিতে হয়, যে এক অন্ধ শক্তিই এই জগতের আদি কারণ। সুতরাং প্রকৃতি (nature) বা কার্যকারণের নিয়মের (causality) দিক্ হইতে সৃষ্টির মূল পাওয়া যায় না— একমাত্র ইচ্ছার দিক্ হইতে দেখিতে গেলেই, সৃষ্টির মূল পাওয়া যায়। ইচ্ছার সঙ্গে জ্ঞান, কর্তৃত্ব এবং মঙ্গলভাব সমস্তই আছে। কিন্তু ইচ্ছা বলিলেই ঈশ্বরকে আর বস্তুও বলা চলে না, আদিকারণও বলা চলে না— তাঁহাকে পরমপুরুষ বলিতে হয়। বস্তুর সঙ্গে নিয়ন্তৃত্ব, কর্তৃত্ব— এ-সব ভাব নাই। শুধু কারণ বলিলে সে কারণে তাঁহার কর্তৃত্বভাব থাকে।

তিনি যখন পুরুষ এবং আত্মাকেও তিনি যখন পুরুষ করিয়াছেন, স্বাধীন কর্তৃত্ব দিয়াছেন, তখন আত্মার সঙ্গে জগৎসংসারের এক জায়গায় একটা পার্থক্য দেখা যাইতেছে। প্রকৃতির মধ্যে নিয়মের অধীনতা (necessity) ; মানুষের মধ্যে কেবল স্বাধীনতা (freedom)। একটা natural orderএ আছে ; অন্যজন moral orderএ। মানুষ যে প্রকৃতি নয়, তাহা নয় ; কিন্তু মানুষের মধ্যে স্বাধীন কর্তৃত্ব থাকায় মানুষ প্রকৃতিকে অতিক্রম করিতে পারে। দেবেন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে কী বলিতেছেন তাহাই উদ্ধার করা যাক্ : "ঈশ্বর আত্মাতে আপনার সাদৃশ্য প্রদান করিয়াছেন ; সমুদায় জগৎসংসারকে তিনি প্রাকৃতিক নিয়মে বদ্ধ করিয়া আত্মাকে ধর্মের নিয়ম দিয়াছেন। সে নিয়মে বাধ্যতা নাই, কিন্তু সকলই স্বাধীনতা। মনুষ্য যতদূর শরীরী জীব, যতদূর তিনি ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তির এবং পশুপ্রকৃতির অধীন, ততদূর তিনি জড়জগতের নিয়মাধীন। জড়ের উপর তাঁহার যতদূর নির্ভর, ততদূর তিনি বস্তু— আপনার কর্তৃত্বের উপর যত চলিতে পারেন, তাহাতেই তিনি পুরুষ।··· প্রকৃতির মধ্যে কর্তৃত্বভাব, স্বতন্ত্র শক্তি কিছুই দেখা যায় না।"

মোটের উপর সংক্ষেপে বলিতে গেলে জগৎ, আত্মা ও পরমাত্মা এই তিনের যে আত্যন্তিক বিচ্ছেদ আত্মতত্ত্ববিদ্যায় প্রতিপন্ন হইয়াছিল, তাহা ব্যাখ্যানে একেবারেই ঘুচিয়া গিয়াছে। 'ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাসে' আত্মার যে স্বাধীন কর্তৃত্বের কথা নীতিমার্গের সাধনার আলোচনায় আলোচিত হইয়াছিল, অধ্যাত্মযোগ-মার্গের সাধনায় তাহা অন্য আকার ধারণ করিল। এখানে দেখা গেল যে, আত্মার স্বাধীনতার সার্থকতা, স্বাধীনভাবে ঈশ্বরের অধীন হওয়া। তাঁর সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ পুরুষে পুরুষে স্বাধীন সম্বন্ধের মতো। সেই সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই আত্মার ক্রমিক উন্নতি। বোধ হয় এই কথাটাই সমস্ত ব্যাখ্যানের একমাত্র সার কথা।

আত্মপ্রত্যয় ও সহজজ্ঞান

১৮৪৮ খৃস্টাব্দে আত্মপ্রত্যয় সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের মনের কী ভাব ছিল, তাহা আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। তখনো 'সহজজ্ঞান' কথাটা তাঁহার রচনায় কোথাও আসিয়া পড়ে নাই এবং 'আত্মপ্রত্যয়' কথাটা বেদান্তের অর্থেই তিনি ব্যবহার করিয়াছেন। জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তুতং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ— এই বেদান্ত-বাক্যই তার প্রমাণ। ইহার মধ্যে নির্মল জ্ঞান, শুদ্ধসত্ত্ব, এবং মনের আলোচনা— এই তিন অঙ্গকেই তিনি ধর্মের ভিত্তিভূমিস্বরূপ ধরিয়াছেন।

ইহার পরে ১৭৭৭ শকে (১৮৫৫ খৃস্টাব্দে) রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত তাঁহার এক পত্রে আত্মপ্রত্যয় সম্বন্ধে একটু পরিবর্তিত মত দেখা যায়। সেই পত্রে তিনি দুই রকমের আত্মপ্রত্যয়ের কথা বলিয়াছেন: ১. স্বতঃসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয় (uncriticised self-evidence) ২. বিজ্ঞানমূলক আত্মপ্রত্যয় (criticised self-evidence)। এ দুয়ের বিশেষ সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন, "স্বতঃসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয় এবং বিজ্ঞান মূলক আত্মপ্রত্যয়ের বিশেষ এই বোধ হয় যে, আত্মপ্রত্যয়কে প্রত্যয় করা ভ্রম কি না এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত না করিয়া যে ব্যক্তি আত্মপ্রত্যয়ের প্রতি নির্ভর করে সেই স্বতঃসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয়ের উপর নির্ভর করে, আর যাহার বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত হয় যে, স্বতঃসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয় কদাপি ভ্রমমূলক নহে, সেই বিজ্ঞানমূলক আত্মপ্রত্যয়ের প্রতি নির্ভর করে। দুইই আত্মপ্রত্যয়। যদি স্বাভাবিক আত্মপ্রত্যয় না থাকিত, তবে বিজ্ঞান দ্বারা তাহার প্রমাণ কদাপি হইত না। বাহ্য বিষয় আছে, ইহা আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ, যে পর্যন্ত এই সত্যের প্রতি কেহ সংশয় আনে নাই, সে পর্যন্ত কোন বিচার না করিয়াও বাহ্য বিষয়কে প্রত্যয় করিয়া আসিতেছিল। তাহার পরে যখন বাহ্য বিষয়ের প্রতি সংশয় উপস্থিত হইল, তখন সে সংশয় নিরাকরণ করিবার জন্য অনেক প্রমাণ অনুসন্ধান করিতে লাগিল, পরে বহু আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত ব্যতীত আর কিছুই হইল না, যে, এক আত্মপ্রত্যয়ই ইহার প্রমাণ। আমি যে একজন আছি, এ আত্মপ্রত্যয়ের উপর কে সংশয় আনিতে পারে? কিন্তু ইহার পরেও সংশয় উপস্থিত হইয়া শেষে এই সিদ্ধান্ত হইল যে, এক আত্মপ্রত্যয়ই আমার অস্তিত্বের প্রতি প্রমাণ।" তার পরে বলিতেছেন যে, সেইরূপ ঈশ্বরের সম্বন্ধেও সংশয় আসিয়া বিচার করিয়া শেষে স্বতঃসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয়কেই একমাত্র প্রমাণ বলিয়া মানিতে হয়। এই পত্রে আত্মপ্রত্যয় স্পষ্টই self-evidence অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে— এবং এ ক্ষেত্রে লক হইতে হ্যামিল্টন পর্যন্ত দার্শনিকেরা

জগৎ, জীব ও ঈশ্বরের অস্তিত্বের যে প্রমাণ দেন, সেই প্রমাণই এখানে অবলম্বিত হইয়াছে। সে প্রমাণ testimony of consciousness-এর প্রমাণ – আত্ম-চৈতন্যের প্রমাণ। যখন আমাদের বুদ্ধিতে বা চৈতন্যে জগতের অস্তিত্ব, জীবাত্মার অস্তিত্ব এবং পরমাত্মার অস্তিত্ব তিনই প্রকাশ পাইতেছে— তখন ইহার মধ্যে কোনো একটার অস্তিত্বকে অস্বীকার করিলে অপর দুইটির অস্তিত্বকেও অস্বীকার করা হয়। Hamilton তাঁর *Examination of Philosophy*তে ঠিক এই প্রমাণের দ্বারা বিচার করিয়া স্বতঃপ্রামাণ্যের সিদ্ধান্ত যে ভ্রান্ত নয়, ইহা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সুতরাং কি বাহ্যজগতের অস্তিত্ব, কি নিজের অস্তিত্ব, কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব, এই তিনকেই বেশ করিয়া বিচার করিয়া লইলে, তার পরে দেখা যাইবে যে স্বতঃপ্রামাণ্যের সিদ্ধান্তই সত্য। সুতরাং স্বতঃসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয় ও বিজ্ঞানমূলক আত্মপ্রত্যয়ের এই যে প্রভেদ, ইহা খুবই যুক্তিযুক্ত প্রভেদ হইয়াছে —নহিলে স্বতঃসিদ্ধতার কোনো বস্তুপ্রামাণ্য (objective test) একেবারেই থাকে না।

এ পর্যন্ত আত্মপ্রত্যয় কথাটাই ছিল; তা যে অর্থেই তাহা ব্যবহার করা হোক-না— সংশয়রহিত জ্ঞান অর্থেই ব্যবহার করা হোক বা স্বতঃপ্রামাণ্যের অর্থেই ব্যবহার করা হোক। অবশ্য এই দ্বিতীয় অর্থে ইহা যখন হইতে ব্যবহৃত হইয়াছে, তখনো তিনি বেদান্ত ছাড়েন নাই। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, হ্যামিল্‌টন প্রভৃতির testimony of consciousness-এর অনুরূপ কথা বেদান্তের "সংবিৎ" কথাটি। সংবিত্তের স্বতঃপ্রামাণ্য আছে। দুষ্ট কারণের জন্য যদি সংবিৎ বা আত্মচৈতন্য হয়, তাহা হইলে সেটা 'প্রমাণাভাস' হয়, প্রমাণ হয় না। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহার পরীক্ষা হয়, consciousness criticised হয়, ততক্ষণ তাহার প্রামাণ্য নাই। এ মত হ্যামিল্‌টন প্রভৃতির মতের চেয়ে অনেক বেশি পাকা। 'ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাসে' এই দ্বিতীয় অর্থে দুই-তিন জায়গায় আত্মপ্রত্যয় কথাটির ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশে প্রথম ১৮৬৪ সালে 'সহজজ্ঞান' কথাটা 'আত্মপ্রত্যয়ের' সঙ্গে একত্রে ব্যবহৃত হইতে দেখা গিয়াছে। 'ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থে'র দু-এক জায়গায় প্রথম সংস্করণে যেখানে 'সহজজ্ঞান' কথাটা ছিল না, পরবর্তী সংস্করণে, অর্থাৎ এই সময়ের সংস্করণে, সেখানে 'সহজজ্ঞান' কথা সন্নিবেশ করা হইয়াছে, দেখা গেল। 'ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাসে' যে জায়গায় এই দুই কথার উল্লেখ পাওয়া গেল, সেই জায়গাটি নিম্নে উদ্‌ধৃত করিলেই এ দুয়ের তাৎপর্য কি

তাহা আলোচনা করিয়া দেখিবার সুবিধা হইবে। তিনি লিখিতেছেন, "উপনিষদের সময়ে জ্ঞানের আলোচনা আরম্ভ হইয়া এই স্বাভাবিক আত্মপ্রত্যয়ের উপর সংশয় উপস্থিত হইল। তখন উপনিষদের ঋষিরা সহজজ্ঞানের আলোকে নিঃসংশয় হইয়া এই আত্মপ্রত্যয়কে আরো দৃঢ়তর করিলেন।"

এই বৎসরেরই আর-একটি উপদেশে ইহার চেয়ে পূর্ণতর ব্যাখ্যা আছে (ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়— ১৩ই ভাদ্র ১৭৮৬ শক)। প্রথম একাত্মপ্রত্যয়-সারং কথাটি মুণ্ডকোপনিষদের যে জায়গা হইতে লওয়া হইয়াছে, সেই স্থানটি সম্পূর্ণরূপে সেই উপদেশে তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তার পর একাত্মপ্রত্যয়-সারং-এর টীকা তিনি নিজেই দিয়াছেন—'একঃ জগৎকারণং ব্রহ্মাস্তীতি আত্মনঃ প্রত্যয়ঃ সারং প্রমাণং যস্যাধিগমে তৎ একাত্মপ্রত্যয়সারং'। বলা বাহুল্য, এ টীকার সঙ্গে শাঙ্কর টীকা মিলিবে না। কারণ এখন আত্মপ্রত্যয়ের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ কী কী প্রত্যয় বা বিশ্বাস নিহিত আছে তাহা খুলিয়া নির্দেশ করিতেছেন এইরূপ—

ক. "যখন আমি আছি, তখন আমার স্রষ্টা পাতা নিয়ন্তা ব্রহ্ম আছেন, এই আত্মপ্রত্যয়।"

খ. "যিনি আমার স্রষ্টা পাতা নিয়ন্তা পুরুষ, তিনি আমার সুহৃদ্, সখা, আশ্রয় ও প্রভু এই স্বতঃসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয়।"

গ. "যিনি আমার সুহৃদ্, সখা, আশ্রয় ও প্রভু, তিনি সকলেরই সুহৃদ্, সখা, আশ্রয় ও প্রভু; তিনি শান্ত মঙ্গল অদ্বিতীয়; এই আত্মপ্রত্যয়ের সহজ অকাট্য সিদ্ধান্ত।"

অর্থাৎ স্পষ্টই আত্মপ্রত্যয়ের ভিতরকার এই বিশ্বাসগুলিকে teleological argumentsএর দ্বারা পরিপুষ্ট করিয়া আত্মপ্রত্যয়ের স্বতঃসিদ্ধত্বকে প্রামাণ্য বা বিজ্ঞানমূলক স্বতঃসিদ্ধত্ব রূপে দাঁড় করাইবার একটা চেষ্টা, ইহাতে বেশ লক্ষ্য করা যাইতেছে। কিন্তু ইহার পরে ব্রাহ্মধর্মের নবম অধ্যায়ে 'অদৃষ্টমব্যবহার্যম্' ইত্যাদি 'একাত্মপ্রত্যয়সারং' এই শ্রুতিবচনের যে ভাষ্য করা হইয়াছে, তাহাতে সহজজ্ঞান কথাটা আসিয়াছে। সেই সমস্ত ভাষ্যটিও এই উপদেশে দেবেন্দ্রনাথ উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা: "সেই অনন্ত-জ্ঞান-স্বরূপ পরমেশ্বর চক্ষুর গোচর নহেন, তাঁহাকে হস্ত দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, তাঁহাকে মনের দ্বারা কল্পনা করা যায় না, তাঁহাকে পরিমিত বস্তুর ন্যায় বুদ্ধি দ্বারা বিশেষ করিয়া বুঝা যায় না। কেবল নির্মল সহজ জ্ঞানে তিনি প্রকাশিত হয়েন, এবং এক আত্মপ্রত্যয়ের বলে

সেই জ্ঞানগোচর সত্য সুন্দর মঙ্গল পুরুষের অস্তিত্বে আমরা বিশ্বাস করি। জ্ঞান যে অকৃত অমৃত অনন্ত পুরুষকে প্রকাশ করে, আত্মা সেই পূর্ণ পুরুষের অস্তিত্বে প্রত্যয় করে। জ্ঞানেতে সত্য প্রকাশ পায়, এবং সেই সত্যেতে আমারদের আত্মার প্রত্যয় হয়। অতএব সেই স্বভাব-সিদ্ধ আত্মপ্রত্যয়ই তাঁহার অস্তিত্বের প্রামাণ্য-স্থাপনের একমাত্র হেতু। যখন আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ অনন্ত পুরুষ সহজ জ্ঞানে প্রকাশিত হন, তখন বুদ্ধি তাঁহার জগৎ-রচনার কৌশল দেখাইয়া তাঁহার বিজ্ঞানের পরিচয় দেয়, এবং জগতের মঙ্গলোদ্দেশ্য নিয়ম দেখাইয়া সেই নিয়ন্তার মঙ্গল ভাব ব্যক্ত করে। যদিও পরিমিত বুদ্ধি অনন্ত পুরুষকে বুঝিয়া শেষ করিতে পারে না, তথাপি সে সহজ জ্ঞানকে অতিমাত্র পোষণ করে। অতএব ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু মুমুক্ষু ব্যক্তি জগৎ-কার্যের অন্তর্বাহ্যের আলোচনা দ্বারা বুদ্ধিকে মার্জিত করিতে কদাপি অবহেলা করিবেন না। বুদ্ধি সুমার্জিত হইলে সহজ-জ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয়ের অধিকার ও উদ্দেশ্য আমরা বিশেষ রূপে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি।"

এই যে স্থান দুইটি উদ্ধার করা গেল—ইহাদের উভয়ের মধ্যেই একই বক্তব্য দেখা যায়। প্রথম উদ্‌ধৃত স্থানে বলা হইল যে, ঋষিরা সহজজ্ঞানে আত্ম-প্রত্যয়কে দৃঢ়তর করিলেন। দ্বিতীয় উদ্‌ধৃত স্থানে বলা হইল যে, আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ অনন্ত পুরুষ সহজজ্ঞানে প্রকাশিত হন।

এখন বিচারের বিষয় এই যে, এই 'সহজজ্ঞান' কথাটি আনার দরুন আত্ম-প্রত্যয়ের অর্থের কোনো নূতন পরিবর্তন করা হইল কি না এবং সহজজ্ঞান কথাটারই বা অবতারণা করার সার্থকতা কি ?

কথাটা যে রীড্, ডিউগ্যাল্ড স্টুয়ার্ট প্রভৃতি স্কচ দার্শনিকদের common sense দর্শনের কথা সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নাই। কেশবচন্দ্র এই স্কচ দর্শন হইতে এই সহজজ্ঞানবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন—তাহা তাঁহার *The Basis of Brahmoism* নামক পুস্তিকা পড়িলেই বেশ বুঝা যায়। তিনি লিখিয়াছেন : "Intuition denotes those cognitions which our nature immediately apprehends—those truths which we perceive independently of reflection"—সহজজ্ঞান বলিতে সেই-সকল ধারণা বুঝায় যাহা আমাদের প্রকৃতি অব্যবহিত ভাবে ধরিতে পারে—চিন্তার সাহায্য ভিন্ন যে-সকল সত্য আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। যাহাই হোক, কেশবচন্দ্রের অনু-বর্তীরা বলেন যে, এই সহজজ্ঞান কথাটি কেশবই ব্রাহ্মসমাজে প্রথম প্রবর্তিত করেন এবং তার পরে দেবেন্দ্রনাথ তাহা আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে যুক্ত করিয়া ব্যবহার

করিতে থাকেন। সহজজ্ঞান কথা কে সর্বাগ্রে ব্যবহার করেন তাহা জানা নাই —কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে তখন ইংরাজীতেই বক্তৃতা করিতেন এবং ইংরাজী ভাষাতেই রচনা করিতেন। সুতরাং এ কথাটা তাঁহার দ্বারা প্রবর্তিত না হইতেও পারে। তবে এই সহজজ্ঞানবাদ তাঁহার নিকট হইতে দেবেন্দ্রনাথ গ্রহণ করিয়াছিলেন এ কথা কোনোমতেই মানা যায় না। তাঁহার আসিবার বহু পূর্বে দেকার্ত হইতে কুঁজ্যার দর্শন পর্যন্ত সমস্ত দর্শনশাস্ত্রের ধারাটি দেবেন্দ্রনাথ রীতিমত পর্যালোচনা করিয়াছিলেন। সহজজ্ঞান বা intuition বা innate ideasএর তত্ত্ব তাঁহার সবই জানা ছিল।

তিনি যখন স্বতঃসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয় ও বিজ্ঞানমূলক আত্মপ্রত্যয়— এই দুই শ্রেণীর আত্মপ্রত্যয়ে একটা প্রভেদ টানিলেন, তখন আত্মপ্রত্যয় সম্বন্ধে সংশয় হইলে সহজজ্ঞানের আলোকে তাহার মীমাংসা খোঁজার কথা বলার কী প্রয়োজন ছিল? সহজজ্ঞানকে নূতন করিয়া প্রবর্তিত করার একমাত্র কারণ যাহা মনে হয় তাহা এই যে, আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে, তিনি পূর্ব ও পশ্চিম দুই ধারার তত্ত্বজ্ঞানকে ও সাধনাকে এক ধারায় মিলাইয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। এ চেষ্টা সজ্ঞানভাবে মিলাইতে হইবে বলিয়া মিলাইবার ইচ্ছার বশবর্তী কোনো চেষ্টা নয়; এ একেবারে অন্তরঙ্গ অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতার ভিতরকার চেষ্টা। সেইখানে এ-দেশের জিনিস ও-দেশের প্রণালী-পদ্ধতির ভিতর দিয়া নূতন ছাঁচে গড়িয়া উঠিয়াছে, ও-দেশের জিনিস এ-দেশের ভাবের অঙ্গীভূত হইয়া রূপান্তর লাভ করিয়াছে। বোধ হয় এ-দেশের আত্মপ্রত্যয়ের অনুরূপ কোনো ভাব, ও-দেশের শাস্ত্রে পাওয়া যায় কি না তাহারই খোঁজ করিয়া, একটি সাধারণ পত্তন-ভূমি বা সন্ধিস্থান দুয়ের মধ্যে গড়িয়া তুলিবাব জন্য দেবেন্দ্রনাথেব ইচ্ছা হইয়াছিল। এখানে আত্মপ্রত্যয় যেমন আছে, পশ্চিম দেশে Intuition বা Innate ideas ঠিক সেইরূপ— অতএব আত্মপ্রত্যয়ের পূর্ণতাসাধনের জন্য সহজজ্ঞান বা Innate ideas কথাটা যোগ করিয়া দেওয়া তিনি সংগত মনে করিয়াছিলেন। আত্মপ্রত্যয় বা স্বতঃপ্রামাণ্যে সন্দেহ হইলে সহজজ্ঞানে তাহাকে দৃঢ়তর করিয়া দেখা যাইতে পারে। আত্মপ্রত্যয় ও সহজজ্ঞানের প্রভেদ এইরূপ: সহজজ্ঞান বা Innate ideas বা Light of Natureএ প্রকাশিত হইতেছে সত্য। সেই সত্য আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ সত্য অথবা স্বতঃপ্রমাণ সত্য। একটাতে সত্যের প্রকাশ (Revelation); অন্যটাতে সত্যের প্রত্যয় (Belief)।

বোধ হয় জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ—

ইহার মধ্যে জ্ঞানপ্রসাদ বা নির্মল জ্ঞানের সঙ্গে ওদিককার Innate ideas বা সহজজ্ঞানের একটি সাদৃশ্য দেখিয়া সহজজ্ঞান কথাটার চলন করিলেন। সহজজ্ঞানে সত্য প্রকাশ পায়— এই কথা বার বার বলিয়াছেন। সহজজ্ঞান = innate idea, light of nature ইত্যাদি। কিন্তু বিশুদ্ধসত্ত্ব, মনের ধ্যান-ধারণা— এ দুটো অঙ্গ সহজজ্ঞানবাদে একেবারেই বাদ পড়িয়াছে। সুতরাং সহজজ্ঞানের সঙ্গে আত্ম-প্রত্যয়ের ভাবসাদৃশ্য দেখিয়া যদি দেবেন্দ্রনাথ এই দুই তত্ত্বকে মিলাইতে গিয়া থাকেন, তবে সে মেলানোর কাজটি যে অসম্পূর্ণ হইয়াছে তাহা বলিতেই হইবে। শুধু নির্মল জ্ঞান নয়, বিশুদ্ধ হৃদয় দিয়া আমরা তাঁহাকে বুঝি ও পাই। সেই বিশুদ্ধ হৃদয়ের দিক্‌টা এই Intuition-বাদে কোথায় ধরা পড়িয়াছে? তিনি এই ভবানীপুরের এক উপদেশে লিখিয়াছেন— "যেমন জ্ঞানেতে ঈশ্বরের সত্য রূপ প্রকাশ পায়, তেম্‌নি হৃদয় হইতেও সেই প্রত্যয় উত্থিত হয়।" শ্লায়ারমেকার ও শেলিং এই কথাই বলিয়াছেন! 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানে'ও বার বার বুদ্ধি এবং হৃদয় এই দুয়ের সাহায্যে যে আমরা তাঁহাকে পাই এ কথা বলা হইয়াছে। অথচ সহজজ্ঞানের মধ্যে এক দিক্ আছে, অন্য দিক্ নাই। এই অসম্পূর্ণতার জন্য আত্মপ্রত্যয় ও সহজজ্ঞান পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মেলে নাই।

চিরকালই তত্ত্বসাক্ষাতের জন্য দার্শনিকদিগকে স্বতঃপ্রামাণ্যের উপর দাঁড়াইতে হইয়াছে। কথা এই যে critical method অর্থাৎ বিজ্ঞানমূলক পরীক্ষা-প্রণালী থাকিলেই হইল— তাহা না হইলে স্কচ common sense তত্ত্বের মতো স্বতঃপ্রামাণ্যের কোনো ভিত্তি থাকে না। দেবেন্দ্রনাথ সেই প্রণালী গ্রহণ করিয়াছেন তাহা আমরা দেখিয়াছি এবং সে জায়গায় তিনি বেদান্তকেই অনুসরণ করিয়াছেন, পাশ্চাত্ত্য দর্শনশাস্ত্রকে নয়। পাশ্চাত্ত্য Intuition-বাদ যে বেদান্তের স্বতঃপ্রামাণ্যের সঙ্গে মেলে না, অথচ তিনি মিলাইতে গিয়াছেন— এইখানেই তাঁহাকে গোলযোগে পড়িতে হইয়াছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, আধুনিক কালের বার্গসঁ, প্রভৃতিও এই Intuitionকে ছাড়াইয়া যাইতে পারেন নাই। বার্গসঁ বলিতেছেন যে, বুদ্ধি সংবিতের একটা অংশ মাত্র— Intuition বুদ্ধির চেয়ে বড়ো। তাঁহারাও কী করিয়া এই জিনিসটাকে criticism-এর দ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া ইহার স্বতঃসিদ্ধতাকে প্রামাণিক করিতে হইবে, তাহার কোনো প্রণালী এখনো ইঙ্গিত করিতে পারেন নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও হাফেজ

যে গ্রন্থ জ্ঞানলাভের সহায় হয়, মানুষ তাহাকে অধ্যয়নের ও চিন্তার সঙ্গী করে। যে গ্রন্থ হৃদয়ের বিকাশের সহায় হয়, প্রেম বুঝিতে ও প্রেম দিতে শিক্ষা দেয়, মানুষ তাহাকে সারা জীবনের সঙ্গী করিয়া লয়, হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখে। হাফেজের সংগীত এই শেষোক্ত ভাবে ব্যবহার করিবার বস্তু। রাজা রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই ভাবেই ইহার ব্যবহার করিয়াছিলেন।

হাফেজের সংগীত ব্যতীত, ধর্মগ্রন্থ নয় এমন অপর কোনো গ্রন্থকে মানুষ এত অধিক পরিমাণে জীবনের সঙ্গীরূপে ব্যবহার করিয়াছে কি না, ও হৃদয়ে সযত্নে গাঁথিয়া রাখিয়াছে কি না, সন্দেহ।

হাফেজের গভীর ঈশ্বরপ্রীতি, নির্মল চরিত্র, উদার ধর্মমত, বিশাল পাণ্ডিত্য, অতুল কবিত্ব তাঁহার "দীবান" গ্রন্থে (কবিতাসংগ্রহে) প্রতিফলিত। হাফেজের কবিতা জগতের প্রেমসাহিত্যের অমূল্য সম্পৎ, প্রেমধামের যাত্রীর পথের দিব্য আলোক। প্রেমরাজ্যের নিগূঢ় তত্ত্বসকল তাঁহার কবিতার আলোকে উজ্জ্বল হইয়াছে, প্রেমিক-হৃদয়ের কত অব্যক্ত বেদনা তাঁহার সংগীতে ভাষা লাভ করিয়াছে, তাই তাঁহার এক উপাধি "লিসান্-উল্-গয়্ব্" অর্থাৎ অব্যক্তের রসনা। তাঁহার পদবিন্যাস সুললিত, শব্দঝংকার অননুকরণীয়, অথচ ভাষা অনাড়ম্বর। তিনি তাঁহার কবিতায় অজস্র রূপক ও উপমা ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও লঘুতায় নামিয়া আসেন নাই। দর্শনশাস্ত্রের তত্ত্বসকলের প্রতি ও সমসাময়িক ইতিহাসের প্রতি নানারূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার উক্তি অস্পষ্টতা দোষে কলুষিত হয় নাই। তাঁহার সংগীত এমন হৃদয়গ্রাহী যে তাহা ছয় শতাব্দী ধরিয়া অবিচ্ছেদে, দানিয়ুবের তীর হইতে ভাগীরথীর তীর পর্যন্ত, সম্রাটের প্রাসাদে ও দরিদ্রের পর্ণকুটিরে সমভাবে গীত হইয়া আসিতেছে। তাঁহার প্রণয়বেদনার ও আত্মবিসর্জনের শ্লোকগুলি আজও বিরহীর ও প্রেমিকের হৃদয় উদ্‌বেলিত ও চক্ষুকে আর্দ্র করে ; এখনো এই ভারতেরই কত নগরোপকণ্ঠে সুফীদিগের ধর্মসংঘে প্রতি উৎসবরজনীতে তাঁহার অমর সংগীত গীত হইয়া কত ভক্তচিত্ত উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিতেছে !

হাফেজ প্রেমকে সুরার সহিত তুলনা করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার

কবিতাকেও সুরার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। তাঁহার কবিতার এমনি আকর্ষণ, এমনি উন্মাদিনী শক্তি যে, যে-কেহ ইহার রস আস্বাদন করে, সে-ই ইহাতে একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়ে; তাহার চিন্তা, ভাব, ভাষা, রুচি, বহুপরিমাণে, সে কবিতার রসে সিক্ত হইয়া উঠে। একদিকে সে হাফেজের ভাবের ভাবুক হইতে ব্যগ্র হয়, অপর দিকে তাহার নিজের ভাবতরঙ্গে সে হাফেজের সায় পাইতে উৎসুক হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রাণরাজ্যে, ভাব-রাজ্যে, তাঁহার প্রেমভক্তির সাধনায়, হাফেজের প্রভাব এইরূপেই কার্য করিয়াছিল। তাঁহার তত্ত্বচিন্তার প্রধান সহায় ছিল উপনিষৎ, প্রেমভক্তির জীবনে প্রধান সহায় ছিল হাফেজের সংগীত। শুধু কবিত্বের গুণেই নয়, কিন্তু হাফেজের ব্যক্তিত্বের প্রভাবেও তাঁহার কবিতা মানুষের মনকে আকর্ষণ করে। তাঁহার কবিতা শুধু কবিতা নয়, ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতায় প্রদীপ্ত একটি জীবনের ছবি। এইজন্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, একমণ্ডলীভুক্ত লোকেদের মধ্যে হাফেজ-প্রীতি সংক্রামক হইয়া উঠে। রাজা রামমোহন রায় হাফেজের ভক্ত ছিলেন; তাঁহা হইতে মহর্ষিতে এই ভক্তি সংক্রান্ত হইয়াছিল। নিশ্চয় মহর্ষি হাফেজ-চর্চা করিবার সময় নিজের হৃদয়ে রাজা রামমোহনের আধ্যাত্মিক সান্নিধ্য বিশেষভাবে অনুভব করিয়া অনুপ্রাণিত হইতেন। মহর্ষির নিকট হইতে কেশবচন্দ্র উত্তরাধিকারসূত্রে এই হাফেজ-প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন।

হাফেজের রচিত কবিতা নানাবিধ, তন্মধ্যে "গজল"গুলিই প্রধান। গজলের রচনাপ্রণালী মোটামুটি এইরূপ: ১. প্রত্যেক গজলে পাঁচটি হইতে আঠারোটি পর্যন্ত শ্লোক থাকিবে। হাফেজের কোনো কোনো গজলে ২১টি পর্যন্ত আছে। ২. আদ্যন্ত একই ছন্দ থাকিবে। ৩. প্রতি শ্লোকে দুই চরণ। প্রথম শ্লোকের উভয় চরণের ও পরবর্তী শ্লোকগুলির দ্বিতীয় চরণের শেষ অক্ষর অথবা শেষ কয়েকটি অক্ষর এক হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রবন্ধশেষে ৩, ১৪ ও ২৫ সংখ্যক শ্লোক দেখা যাইতে পারে; এই তিনটি একই গজল হইতে গৃহীত। ৪. প্রত্যেক শ্লোকের দুই চরণের মধ্যেই তাহার অর্থ সম্পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। ৫. শেষ শ্লোকে অথবা শেষের কাছাকাছি কোনো শ্লোকে রচয়িতার ভণিতা থাকিবে। —দুই পঙ্‌ক্তির মধ্যে অর্থ সম্পূর্ণ করিতে হইলেই রচনা কিছু আড়ষ্ট ও কৃত্রিম-ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। তাহার উপর যদি আবার এরূপ কতকগুলি অসংলগ্ন শ্লোক, শুধু মিলের খাতিরে একত্র করা হয়, তবে তাহা আরো অস্বাভাবিক হইয়া যায়। অথচ পারস্য কবিদের মধ্যে এই প্রথা বহুলপরিমাণে অনুসৃত

হইয়াছে। তাঁহাদের মতে শ্লোকগুলি মুক্তা, গজলটি মুক্তাহার। মুক্তার মূল্যেই হারের মূল্য, সুতাগাছির মূল্য কিছু নাই, অর্থাৎ সব শ্লোকগুলি একটি ভাবসূত্রে গ্রথিত না হইলেও ক্ষতি নাই। হাফেজের কবিতায় রচনারীতির এই আড়ষ্ট ও অস্বাভাবিক ভাব প্রায় লক্ষিত হয় না। তাঁহার অধিকাংশ গজলে শ্লোকগুলি অর্থদ্বারা পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট না হইলেও, তাহাদের মধ্যে আদ্যন্ত একটি ভাবের আবেশ চলিয়া গিয়াছে। যে গজল-সংগ্রহে বর্ণমালার প্রত্যেক বর্ণই পর্যায়ক্রমে শ্লোকের অন্ত্যবর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম দীবান। হাফেজের দীবানে গজলের সংখ্যা প্রায় ছয় শত।

ভাবরসে যাহার হৃদয় পরিপূর্ণ, এমন মানুষের আত্মনিবেদন যেরূপ হয়, হাফেজের গজলগুলির ভাষা ও ভাব সেইরূপ। তাঁহার কবিতার একমাত্র বিষয় প্রেম; কিন্তু প্রেমের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা কিংবা প্রেমের বিষয়ে উপদেশ দান তাহার লক্ষ্য নহে। প্রেমিকের জীবনের নানা অবস্থার মধ্য দিয়া হাফেজ চলিয়া যাইতেছেন, ও সেই সেই অবস্থায় তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী যে যে সুরে বাজিতেছে তাহাই তাঁহার কবিতায় ধ্বনিত। ভাব হৃদয়কে প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, জ্ঞানবুদ্ধির কূলরেখা লুপ্ত, এমন অবস্থায় রসনায় যেরূপ কথা আসে, অকুণ্ঠিত ভাষায় হাফেজ তাহাই অনর্গল বলিয়া গিয়াছেন। তত্ত্বকথা, শাস্ত্রের বচন, নীতি উপদেশ, মাঝে মাঝে আসিয়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার কবিতার স্রোত ভাবোচ্ছ্বাসেরই স্রোত; ঐ-সকল তাহার উপরে ভাসিতেছে মাত্র।

হাফেজ সুফীসম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার কবিতার মর্মগ্রহণ করিতে হইলে সুফীদিগের মত ও সাধনপ্রণালীর কয়েকটি কথা জানা আবশ্যক। তাঁহাদের মতে ১. জীবাত্মা ও পরমাত্মা স্বরূপতঃ অভিন্ন, ও জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশ। তাহার পরিণাম পরমাত্মার সহিত পুনর্মিলন ও তাঁহাতে লয়। অনাদিকালে যখন সে পরমাত্মা হইতে বিযুক্ত হয়, তখনই পরমাত্মা ও জীবাত্মা পরস্পরের সহিত এক নিগূঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হন। এ লোকে জীবাত্মা নিজের অঙ্গীকার পালন করিলে পরমাত্মার সহিত পুনর্মিলনের ও চিরন্তন আনন্দের অধিকারী হয়। ২. পরমাত্মা পূর্ণ সত্য, পূর্ণ মঙ্গল, পূর্ণ সুন্দর। তাঁহার প্রতি প্রেমই সত্য প্রেম, আর-সকল পদার্থের প্রতি প্রেম অসত্য প্রেম। ৩. পরমাত্মা জগতে ওত-প্রোত, তিনিই জগৎ-সত্তার মূল সত্তা। জড়ের স্বতন্ত্র সত্তা নাই, কেবল চিদ্বস্তুরই তাহা আছে; পরমাত্মা অনন্তকালে অবিরাম জীবাত্মার সম্মুখে ছায়াবাজীর মতো যে বিচিত্র ছবি প্রকাশ করিয়া যাইতেছেন, তাহাই জড়জগৎ-

রূপে প্রতীয়মান। দর্পণের প্রতিবিম্ব যেমন বস্তুর ক্ষীণ ছায়া, তেমনি জগতের সকল সৌন্দর্য পরমাত্মার সৌন্দর্যের অস্পষ্ট ছায়া। সে ছায়াছবিতে আসক্ত না হওয়া, ও পরমাত্মাতে একাগ্র প্রেম সমর্পণ করাই জীবাত্মার অঙ্গীকার পালন। ৪. সংসারে জীবাত্মা সত্য প্রেমাস্পদ (পরমাত্মা) হইতে বিচ্ছিন্ন ও ছায়া-জগতে বেষ্টিত; কিন্তু তাহার স্মৃতি হইতে পরমাত্মার আকর্ষণ ও অনাদিকালে আত্মকৃত সেই অঙ্গীকার লুপ্ত হইয়া যায় নাই। এ লোকে সংগীত, সমীরণ, সৌরভ প্রভৃতি জীবাত্মার অন্তরে সেই আদিম অঙ্গীকারের ক্ষীণ স্মৃতিকে উজ্জ্বল করিয়া দেয়, ও তাহাকে পরমাত্মার নিগূঢ় প্রেমের আকর্ষণে আকুল করিয়া তোলে। ৫. এই প্রেমের অনুভবকে নিত্য সতেজ রাখা, পরমাত্মার সহিত পূর্ণ মিলনের জন্য নিত্য প্রস্তুত থাকা ও অপেক্ষা করাই এ লোকে জীবাত্মার কর্তব্য। ৬. সংসার-ত্যাগ, বৈরাগ্য, শুদ্ধাচার, দীক্ষাগুরুর নিকটে আত্মসমর্পণ, রূপে বা গুণে সুন্দর কোনো ব্যক্তির সহিত গভীর ও নিষ্কাম (Platonic) প্রণয়স্থাপন, প্রভৃতি ধর্মসাধনের অঙ্গ। যে অনন্ত ঈশ্বরকে শুষ্ক জ্ঞান নির্গুণ, নিরুপাধি ও প্রায় অচিন্ত্য করিয়া তোলে, সূফী সাধক এইরূপে তাঁহাকে পরম সুন্দর ও চিত্তহারীরূপে পূজা করিয়া হৃদয়কে তৃপ্ত করেন।

পরমাত্মা যখন জীবাত্মাকে নিজের আকর্ষণে আকুল করেন, তখন জীবাত্মাতে কী কী ভাবের উদয় হয়, তাহাকে কোন্ কোন্ অবস্থা অতিক্রম করিতে হয়, তাহার ইতিহাস হাফেজ তাঁহার দীবান গ্রন্থে নিজের অবস্থা বর্ণনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। প্রেমের পথের সংগ্রাম, সংসারের কুহকজাল, প্রেমাস্পদের সৌন্দর্য, তাঁহার আকর্ষণ-প্রণালী, তাঁহার আকর্ষণে প্রেমিকের হৃদয়বেদনা, দর্শনের আনন্দ, বিরহের ক্লেশ, এ-সকল তিনি নিজের কথায়, কখনো সখাকে, কখনো সমসাধক বন্ধুজনকে, কখনো উপদেষ্টা গুরুকে, কখনো পাঠককে সম্বোধন করিয়া অপূর্ব কবিত্বপূর্ণ ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সকল কবিতাই রূপক। তাঁহার ভাষায় পরমাত্মা জীবাত্মার সখা। তিনি পরমসুন্দর, তাই মনোমোহন। তাঁহার একমাত্র কাজ জীবাত্মার হৃদয়হরণ। তাই জীবাত্মা পরমাত্মার প্রেমিক ও তাঁহার প্রেমের আকর্ষণে আকুল। আবার হাফেজের ভাষায় প্রেমের নাম সুরা, প্রেমিকমণ্ডলীর নাম সুরাপানসভা, প্রেম-সাধনের দীক্ষাগুরুর নাম সুরাপাত্রদাতা সাকী। ধার্মিক মহাজনগণ রূপবান পুরুষ; সখা রূপবানদিগের রাজা। জড়জগতের ও অধ্যাত্মজগতের সকল সৌন্দর্য সখার মুখজ্যোতির ছটা মাত্র। যাহা-কিছুর মধ্য দিয়া পরমাত্মা

জীবাত্মার অনুরাগকে উদ্দীপ্ত করেন, তাহার হৃদয়কে নিজ অভিমুখে সবলে আকর্ষণ করিয়া ব্যাকুলতায় অধীর ও ব্যথিত করিয়া তোলেন, হাফেজের ভাষায় তাহা প্রেমাস্পদের সুরভি কেশপাশ, অথবা কপোলের ঈষদুদ্‌গত রোমরেখা, অথবা কৃষ্ণ তিল, অথবা লোহিত অধর অথবা চিবুক-কূপ, অথবা তাঁহার নয়নভঙ্গী অথবা লীলাময়ী গতি। এ-সকলের দ্বারা সখা প্রেমিকের হৃদয় লুণ্ঠন করেন, তাই তিনি হৃদয়লুণ্ঠনকারী দস্যু। তাঁহার মদির-আঁখির ইঙ্গিত প্রেমিকের প্রাণকে কখনো ভাবে উন্মত্ত করে, কখনো বিদ্ধ করিয়া হত্যা করে, কখনো মধুর আহ্বানে আশ্বস্ত করে। প্রভাতসমীরণ তাঁহার অলকগন্ধ বহন করিয়া আনে, তাই সে সখার দূত; বিরহের দিনে সে বড়ো প্রিয় বন্ধু। এ-সকল হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, হাফেজের কবিতায় পরমাত্মার জন্য জীবাত্মার কাতরতাকে পুরুষ-নারীর প্রণয়ের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধ পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ নয়, দুই সখার সম্বন্ধ। কিরূপ আকুল ভালোবাসায় সখা সখাকে ভালোবাসিতে পারে, সুফী কবিগণের রচনায় তাহার অতি উচ্চ আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়।

হাফেজ স্বয়ং এইরূপ আকুল প্রেমিক। সখার প্রেমে তিনি আত্মহারা উদ্‌ভ্রান্ত, বিষয়বুদ্ধিবর্জিত। সখার প্রসন্নতা লাভ করিয়া যে সময়ে তিনি সুখী তখন তাঁহার কাছে সমরকন্দ ও বোখারার সমগ্র সম্পৎ সখার একটি কৃষ্ণ তিলের সমান মূল্যবান নয়; এমন দিনে সম্রাটকেও তিনি নিজের ক্রীতদাস বলিয়া গণনা করেন। ধর্মের বাহিরের নিয়ম, আচার, অনুষ্ঠান এ-সকল তাঁহার কাছে অতি তুচ্ছ; প্রেমই একমাত্র মূল্যবান ধন। তিনি আপনাকে স্বধর্মচ্যুত পৌত্তলিক, অগ্নিপূজক, দুর্নীতি-পরায়ণ ও মাতাল বলিয়া গৌরব অনুভব করেন। হাফেজের কবিতায় বর্ণিত প্রেম অতল, অকূল, উদ্দাম, অথচ স্বচ্ছ। সখার খাতিরে সে-সব বাধা ভাঙিয়াছে, সব সীমা হারাইয়াছে, সব নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছে, সব সম্পৎ পায়ে ঠেলিয়াছে; কিন্তু তাহাতে লালসা নাই, ইন্দ্রিয়বিকারের গন্ধ নাই।

এদেশের বৈষ্ণব কবিতা ও হাফেজের সংগীত, দুইই রূপক। অধ্যাত্মতত্ত্বের ও বাহ্য বর্ণনার দ্বিবিধ মাধুর্যের সমাবেশে ভক্তের কাছে উভয়ই অপূর্ব, অমূল্য। উভয়েরই পারমার্থিক ও পার্থিব দ্বিবিধ ব্যবহার হয়, এবং ইন্দ্রিয়সীমার মধ্যে আবদ্ধ সংসারের লোক উভয়েরই প্রভূত অপব্যবহার করিয়াছে।

হাফেজের সহিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সম্বন্ধ কোন্ কোন্ ভাবের ও

আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল, জীবনের কোন্ কোন্ দিক দিয়া মহর্ষি হাফেজকে স্পর্শ করিয়াছিলেন তাহা চিন্তা করা যাক।

মহর্ষি প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে অনন্ত ঈশ্বরের করুণা ও মহিমা দেখিতে ভালোবাসিতেন। তিনি যে শুধু 'সৃষ্টি-কৌশলে স্রষ্টার পরিচয়' গ্রহণ করিতেন, তা নয়; কিন্তু নদী, পর্বত, বন, আকাশ, চন্দ্রমা, এ-সকলে সেই প্রেমময়ের প্রেমের প্রকাশ অনুভব করিতে করিতে তন্ময় হইয়া যাইতেন। দেশভ্রমণের দ্বারা ও নির্জন প্রকৃতির সঙ্গ-সম্ভোগের দ্বারা তিনি তাঁহার এই পবিত্র আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি-সাধন করিয়া গিয়াছেন। হাফেজ এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ সহায় হইয়াছিলেন। জগতের সকল সৌন্দর্য, ইহ ও পরলোকের সকল শোভা, হাফেজের মতে সেই পরমসুন্দরের মুখজ্যোতি। তিনি বলিয়াছেন, "এ উভয় লোক তাঁহার মুখ-জ্যোতির এক ঝলকমাত্র; এই এক কথায় প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সকল তত্ত্ব তোমাকে বলা হইয়া গেল।"[১] কী সুন্দর ভাব ও কেমন সুন্দর ভাষায় বলা হইয়াছে! মহর্ষির উপদেশে কত স্থানে ইহার অনুরূপ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। হাফেজের মতে ভগবান জগতের সকল সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া আসিয়া ভক্তের চিত্ত হরণ করেন, তাই তিনি বলিতেছেন, "আমার চিত্তহারী সখা আমারই জন্য নিত্যসরস ও নিত্যনবীন নানা শোভা, নানা বেশ, নানা বর্ণ ও নানা গন্ধ বিস্তার করিতেছেন।"[২] মহর্ষি যে চাঁদ দেখিতে এত ভালোবাসিতেন, কত রাত্রি যে তিনি শুধু চাঁদের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়াই কাটাইয়া দিয়াছেন, সে কথা ভাবিলে মনে পড়ে হাফেজও চাঁদের মধ্যে প্রেমাস্পদের মুখশোভা দেখিয়া উচ্ছ্বসিত হইতেন। হাফেজ বলিতেছেন, "ওহে সুন্দর, সুন্দর চন্দ্রমার যে দীপ্তি তাহা তোমারি উজ্জ্বল মুখের দীপ্তি; জগতে যাহা কিছু সুন্দর, তোমার মুখ-শোভাই তাহার সৌন্দর্যের উৎস।"[৩] মহর্ষি যখন হিমালয়ে ছিলেন, যে রাত্রিতে ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ সহবাস অনুভব করিতেন, মত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হাফেজের এই বচন আবৃত্তি করিতেন (আত্মজীবনী, পৃ ২২০)—"বলিয়া দাও, আজিকার এ সভাতে দীপ আনিও না, কারণ আমাদের আজিকার সভাতে সখার মুখই পূর্ণচন্দ্ররূপে উদয় হইয়াছে।"[৪]

ঈশ্বরপ্রীতি বিষয়বুদ্ধিকে হৃদয় হইতে নির্বাসিত করে। ইহা মহর্ষির জীবনের একটি বিশেষ শিক্ষা; তাঁহার উপদেশেও তিনি এই ভাবের কথা বহু স্থানে আবেগের সহিত বলিয়া গিয়াছেন। বিষয়বুদ্ধিতে প্রবীণ হওয়া প্রেমিকের পক্ষে অসম্ভব। সর্বস্ব যায় যাক্, তাহাতেও ক্ষতি নাই; প্রেমিক বরং এই চাহেন যে,

যেন সংসারের সব হারাইয়া শুধু ঈশ্বরকে লইয়া থাকিতে পান। তাই হাফেজ বলিয়াছিলেন, "(তোমার প্রেমিক হইয়া) প্রার্থনাতে আমি বিদ্যুৎ ভিন্ন কিছু চাহি নাই ; সেই প্রার্থনার ফলে বিদ্যুৎ পড়িয়া আমার ধনধান্য জ্বলিয়া যাইবে, ইহা আর বিচিত্র কি ?"[৫] যেদিন দেবেন্দ্রনাথ সমুদয় ট্রস্ট সম্পত্তি উত্তমর্ণদের হাতে সমর্পণ করিয়া রিক্ত হইলেন, সেদিনের বর্ণনায় (আত্মজীবনী, পৃ ১০৬) এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার তখনকার মনের অবস্থা হাফেজের কথায় বেশ বলিতে পারা যায়—"পৃথিবীর রাজা ও ফকির, দুইয়েরই সম্পর্ক হইতে মুক্ত হইলাম ; ভগবান ধন্য। এখন হইতে, সখার দ্বারের ধূলির ভিখারী যে, সেই আমার রাজা !"[৬])

(প্রেমিকের চরম অবস্থা পাগল হওয়া। মহর্ষি, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে লিখিতেছেন (আত্মজীবনী, ১ম সংস্করণ, ১৮৯৮। পরিশিষ্ট, পৃ ২৫), "হাফেজ্ আফ্শোষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। 'কাহাকেও এমন পাই না যে আমার কথায় সায় দেয়,'[৭] তোমাকে সে পাগলা যদি পাইত, তবে তাহার প্রতি কথায় সায় পেয়ে সে মত্ত হয়ে উঠ্‌ত আর খুসি হয়ে বল্‌তে থাকিত—'কি মস্তি জানি না যে, আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল।' "[৮] হাফেজ বলেন, শুধু আমি নই, প্রেমধামের মানুষ সবাই পাগল। "আমি তো মাতাল, আমার মাথা ঘুরে গিয়েছে, আমি নীতির ধার ধারি না, চোখের চাহনি নিয়েই আমার খেলা ; কিন্তু এ নগরে (প্রেমধামে) আমার মত নয় কে দেখাও দেখি !"[৯] আবার কথার চমৎকার চাতুরী খেলিয়া বলিতেছেন, "আমার লজ্জার কথা আর কেন বল ? লজ্জা হতেই আমার নাম (খ্যাতি)। আমার নাম আর কেন জিজ্ঞাসা কর ? নাম হ'তেই লজ্জা, (অর্থাৎ লোকে আমার নাম এত বলে ব'লেই আমার লজ্জা বোধ হয়)।"[১০]

প্রেমাস্পদের দর্শন হইতে বঞ্চিত হইলে প্রেমিকের হৃদয় কিরূপ অধীর হয় মহর্ষি নিজ জীবনে তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন। হাফেজের অনেক সংগীতে এই অদর্শনের কাতরতা মর্মস্পর্শী ভাষায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার একটি শ্লোকের দ্বারা মহর্ষি এক সময়ে (আত্মজীবনী, পৃ ২২০) নিজের মনের কথা বলিয়াছেন "যে দীপ রজনীকে উদ্ভাসিত করে তাহা, (অর্থাৎ সখা) আজ কাহার (হৃদয়-) ঘরে উদিত ? সে দীপ আমার হৃদয় দগ্ধ করিয়া গিয়াছে, (আমার হৃদয় তাঁহাকে হারাইয়া আজ সন্তপ্ত)। জানিয়া এস, সে দীপ কাহার প্রিয় হইল, (সেই ভাগ্যবান্ কে, যিনি প্রেমের দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিয়াছেন)।"[১১] হাফেজ অদর্শনের ক্লেশ সহিতে না পারিয়া বলিতেছেন, "তোমার যে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ছুরিকার

ন্যায় (আমার মর্ম বিদ্ধ করে), আজ আমি তাহারই কৃপা-প্রার্থী ; তাহা দ্বারা আমার শোণিত প্রবাহিত কর, (আমার প্রাণ লও), ও আমাকে বিরহ-বেদনা হইতে মুক্তি দাও।"[১২] বিরহের অবিরল অশ্রুধারা বর্ণনা করিতেছেন, "আমি নয়ন হইতে শত জলধারা হৃদয়ক্ষেত্রে প্রবাহিত রাখিয়াছি ; এই আশা যে তোমার প্রতি প্রেমের একটি বীজ হৃদয়ে বপন করিব।"[১৩] সখার অদর্শনে জীবনধারণ অসম্ভব অনুভব করিয়া বলিতেছেন, "তোমার দর্শন-পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠ পর্যন্ত আগত হইয়াছে ; সে কি দেহে ফিরিয়া যাইবে, না বাহির হইয়া আসিবে ? তোমার আদেশ কি ?"[১৪]

আর-একটি বিষয়ে মহর্ষি হাফেজের গানে নিজের ভাবের সায় পাইয়াছিলেন। হাফেজ প্রেমাস্পদের হাত হইতে বেদনার দান লইতে সর্বদা প্রস্তুত। তাঁহার কবিতায় দুঃখ বিলাপ আছে, সত্য ; পূর্বদেশীয় কবিদিগের প্রথানুযায়ী সংসারের অনিত্যতা ও করাল কালের নিষ্ঠুরতা বর্ণনাও যথেষ্ট আছে। কিন্তু তাঁহার প্রেম নির্ভরে সবল ; একটি আনন্দের (optimistio) সুর তাঁহার সকল দুঃখবেদনাকে অতিক্রম করিয়া জাগিতেছে। এজন্য তাঁহার সংগীত শুধু প্রেমভক্তির উচ্ছ্বাসের মুহূর্তেই উপভোগ্য নয়, জীবনের দুঃখ ও অশান্তির মধ্যেও উপভোগ্য। হাফেজ বলিতেছেন, "যদি দয়া করিয়া কাছে ডাকিয়া লও, বলিব, তোমার করুণা ধন্য ; যদি ক্রোধভরে দূর করিয়া দাও, আমার হৃদয় অভিযোগে কলুষিত হইবে না।"[১৫] হাফেজ দুঃখের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না, তাই বলিতেছেন—"তাঁহার ভক্ত কে এমন আছেন, যাঁহার অবস্থার প্রতি তিনি করুণার দৃষ্টি করেন নাই ? হে ভদ্র, ব্যথা বলিয়া কিছু নাই ; যদিই বা থাকে, তবে তাহার চিকিৎসকও তো আছেন।"[১৬]

মহর্ষি যেমন একাকী ব্রহ্মসহবাসে নিমগ্ন থাকিতে ভালোবাসিতেন, তেমনি বন্ধুসঙ্গে তাঁহার অর্চনা ও প্রসঙ্গ করিয়া সুখী হইতেন। উপাসকমণ্ডলী গঠনে তাঁহার কী উৎসাহ ও আগ্রহ ছিল! তাঁহার এ উভয় আকাঙ্ক্ষায় তিনি হাফেজের নিকট হইতে সহায়তা লাভ করিতেন। হাফেজ কখনো নির্জনে একাকী দর্শনপ্রার্থী, আবার কখনো সখাকে প্রেমিকমণ্ডলীর মধ্যবিন্দুরূপে দেখিয়া সুখী। হাফেজের কবিতায় যে উদার অসাম্প্রদায়িক ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় তাহাও মহর্ষিকে আকৃষ্ট করিত, সন্দেহ নাই। হাফেজ বলিতেছেন, "কি সতর্ক (জ্ঞানী), কি প্রমত্ত (প্রেমিক), সকলেই সখার ভিখারী ; কি মস্‌জিদ, কি প্রতিমা-মন্দির, সকল স্থানই প্রেমনিকেতন।"[১৭]

জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনায় ও পরিবর্তনে মহর্ষি হাফেজের ভাষায় নিজের মনের কথা প্রকাশ করিতে ভালোবাসিতেন। ষ্টীমারে পড়িয়া গিয়া অল্পের জন্ম মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া হাফেজের কথায় মৃত্যুর অবশুম্ভাবিতা স্মরণ করিতেছেন, (আত্মজীবনী, পৃ ২৪০) "সংসারের ডাকাত ঘুমায় নাই; তাহা হইতে নির্ভয় হইও না। কারণ যদি আজ সে না লইয়া গিয়া থাকে, কাল লইয়া যাইবে।"[১৮] আত্মতত্ত্ব এখনো অধিগত হইল না, সময় বৃথা যাইতেছে, বলিয়া হাফেজের ভাষায় (আত্মজীবনী, পৃ ১৭১ ৭২ ও ১৭৪) খেদ করিতেছেন— "(আমার কাছে) এখনও প্রকাশ হইল না যে, কেন এখানে আসিলাম, কোথায় ছিলাম; কি দুঃখ, কি পরিতাপ, যে আপনার কাজ আপনি ভুলিয়া রহিয়াছি।"[১৯] "স্বর্গের উচ্চতম তল হইতে তোমার আহ্বান আসিতেছে; জানি না কেন তুমি এই পাশ-সঙ্কুল সংসারে আবদ্ধ রহিয়াছ।"[২০] এবং দীর্ঘকাল হিমালয়ে বাসের পর গভীর চিন্তা ও ধ্যানের ফলে যখন আত্মা ও পরমাত্মার বিষয়ে বিমল জ্ঞানলাভ করিলেন, তখনকার আনন্দোচ্ছ্বাস, প্রথমত উপনিষদের সেই অমৃতময় 'বেদাহমেতং' বচনের ও তৎপরে হাফেজের সেই উক্তির দ্বারা প্রকাশ করিলেন, (আত্মজীবনী, পৃ ২২৩) "এখন অবধি আমি আমার হৃদয় হইতে পৃথিবীতে জ্যোতি বিস্তার করিব, কারণ আমি সূর্যলোকে পহুঁছিয়াছি, ও দুঃখের অবসান হইয়াছে।"[২১]

বস্তুত হাফেজের কবিতা মহর্ষির স্মৃতিতে এমন ভাবে গ্রথিত হইয়া গিয়াছিল যে, সামান্য সামান্য ব্যাপারেও উপযোগী বচন সকল উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার বাক্যালাপকে স্বাদযুক্ত করিতে পারিতেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পঞ্জাবনিবাসী স্বর্গীয় প্রকাশদেবজী মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থের ও ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানের উর্দু অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। ইহার ব্যয়নির্বাহের জন্য তিনি মহর্ষির নিকটে আনুকূল্য প্রার্থনা করেন, ও মহর্ষির অর্থসাহায্য প্রাপ্ত হন। এই অর্থসাহায্যবিষয়ক কথাবার্তা হইবার পুর্বে মহর্ষি সংকল্প করিয়াছিলেন যে, নিজের সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার আর নিজের হাতে রাখিবেন না; তাই হাসিতে হাসিতে হাফেজের কথায় প্রকাশদেবজীকে বলিলেন, "এই দুর্বল (অপর অর্থ বৃদ্ধ) প্রাণের উপর আর সংসারের ভার রাখি নাই; সংসারের সকল কারবার বাঁধিয়া একপাশে সরাইয়া রাখিয়াছি।"[২২] ভ্রমণযাত্রায় বাহির হইবার সময় নৌকায় বসিয়া মহর্ষি হাফেজের কথায় (আত্মজীবনী, পৃ ১৭৫) বলিতেছেন, "আমরা নৌকাতে বসিয়াছি। হে অনুকূল বায়ু, প্রবাহিত হও; হয়ত আবার সেই সখার মুখ দর্শন করিতে পাইব।"[২৩]

হাফেজভক্ত কেহ সাক্ষাৎ করিতে আসিলে মহর্ষির আনন্দের সীমা থাকিত না। কত প্রিয় শ্লোক আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন, ও তাহার অর্থ বলিয়া দিতেন। তাঁহার সে সময়কার ভাবপূর্ণ মুখশ্রী দেখিবার সৌভাগ্য যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা আর তাহা ভুলিতে পারেন নাই। শুনিয়াছি, আত্মজীবনীর ২০৯-১০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত এই কয় পঙ্‌ক্তি তাঁহার অতিশয় প্রিয় ছিল—"তোমার প্রেম আমার হৃদয় ও প্রাণের ফলক হইতে কখনও লুপ্ত হইবে না। তোমার প্রেম আমার হৃদয় ও প্রাণে এরূপ ভাবে স্থান অধিকার করিয়াছে যে যদি আমার মস্তক যায় (অর্থাৎ জীবন যায়), তথাপি প্রাণ হইতে তোমার প্রেম মুছিয়া যাইবে না।"[২০] বোধ হয় হাফেজের সংগীতাবলীর মধ্যে মহর্ষির সর্বাপেক্ষা প্রিয়বচন এইটিই ছিল। এই বচনটি মহর্ষির সমগ্র জীবনের ভাবকে যেমন প্রকাশ করে, আর কোনো উক্তি বোধ হয় তেমন করে না। স্বর্গীয় প্রকাশদেবজীর মুখে শুনিয়াছি, একদিন মহর্ষি বাষ্পগদগদ কণ্ঠে জলভারাক্রান্ত নয়নে ঐ কয় পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করিয়াছিলেন; নিকটে যাঁহারা ছিলেন, সকলের হৃদয়ে এক স্বর্গীয় ভাবের বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইয়াছিল। প্রকাশদেবজী সেই দিন হইতে ঐ উক্তিটিকে জীবনসম্বলরূপে গ্রহণ করিলেন; তদবধি আমরণ রোগে, শোকে, আনন্দে তিনি নিয়ত ঐ বচনটি গান করিতেন, ও বন্ধুজনের কাছে মহর্ষি-তীর্থের সেই দিনের দৃশ্য বর্ণনা করিতেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রেমভক্তির সাধনায় হাফেজকে এমন সঙ্গী করিয়াছিলেন, ইহা ভাবিলে স্বতঃই এই প্রশ্ন মনে উদয় হয়, যে তিনি বাংলার বৈষ্ণব কবিদিগের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার সময়ে বাংলার শিষ্টসমাজে বৈষ্ণবকবিতার তেমন আদর হয় নাই। ইহা ব্যতীত, আরো কোনো কোনো কারণে হয়তো তাঁহার মন বৈষ্ণবকবিতা অপেক্ষা হাফেজের সংগীতের দিকে অধিক আকৃষ্ট হইয়াছিল। প্রেমিকের আকুলতা অথবা প্রেমময়ের লীলা বর্ণনা করিতে গিয়া কোনোরূপে গাম্ভীর্যের হানি করা অথবা শারীরিক উপমার অত্যধিক ব্যবহার করা মহর্ষির কাছে অপ্রীতিকর ছিল। এমন-কি, তাঁহার প্রিয় হাফেজের কবিতা ব্যবহার করিতে গিয়াও তিনি সতর্ক হইয়া চলিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, আত্মজীবনীর ২১০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত কথাগুলি হাফেজের একটি কবিতার প্রথম তৃতীয় ও চতুর্থ পঙ্‌ক্তি। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিটি মহর্ষি পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাহাতে পারস্য কবিদিগের রীতি অনুসারে, ঋজু ও উন্নত তরুবিশেষের সহিত প্রেমাস্পদের দীর্ঘ দেহের তুলনা, ও তাঁহার লীলাময় গমনভঙ্গীর উল্লেখ ছিল।

দ্বিতীয়ত, মহর্ষি ঈশ্বরের অনন্তত্ব ও মহিমা কখনো ভুলিতে ভালোবাসিতেন

না। অবতারবাদের গন্ধ পর্যন্ত তাঁহার অসহ্য ছিল। একবার তিনি কথাপ্রসঙ্গে শুনিলেন, পঞ্জাবে শি— ঈশ্বরের মহিমা খর্ব করিয়া নিজেকে পরিত্রাণদাতা বলিয়া প্রচার করিতেছেন। শুনিবামাত্র তিনি একেবারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্তভাব ধারণ করিল, ও উত্তেজনাপূর্ণ কণ্ঠস্বরে বলিতে লাগিলেন, "কি! এত বড় স্পর্ধা! যাঁহার সিংহাসনতলে চন্দ্রসূর্য লুণ্ঠিত, ঐ উচ্চ আকাশ যাঁহার চরণতলে মস্তক নত করিয়া আছে, সেই মহান্ ঈশ্বরের সম্মুখে মানুষের এত দম্ভ!" এই বলিয়া হাফেজের একটি শ্লোক বলিলেন, তাহার মর্ম এই, "হে অত্যুন্নত, হে রাজরাজেশ্বর, তোমার কাছে আমার এই কাতর ভিক্ষা, যেন ঐ আকাশের মত আমিও তোমার রাজমন্দিরের ধূলি চুম্বন করিতে পারি।"[২৫] হাফেজ তাঁহার প্রেমসংগীতে ঈশ্বরের অনন্তত্ব ও মহিমা বৈষ্ণব-কবিদের অপেক্ষা অনেক অধিক মনে রাখিয়াছেন। কি বিরহের কাতরতায়, কি সঙ্গলাভের প্রগল্‌ভ আনন্দে, কি অভিমানে, কি বিলাপে, কোনো অবস্থায় হাফেজ অধিক ক্ষণের জন্য এ কথা বিস্মৃত হন নাই যে তাঁহার প্রেমাস্পদ অনন্ত ঈশ্বর।

সামান্য মানবীয় প্রেম যাহার প্রাণকে বিদ্ধ করিয়াছে, এমন মানুষের হৃদয়ের ইতিহাস হইতেও প্রেমিক কবির উক্তিসকল কত গভীর অর্থ লাভ করে! ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান ও ব্রহ্মানন্দরসপানে নিত্য নিরত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মহৎ হৃদয়ে প্রেমিকশ্রেষ্ঠ জগদ্বরেণ্য মহাকবি হাফেজের ভাবগুলি কী গভীর অর্থ লাভ করিয়াছিল, কী মহান্ উচ্ছ্বাস উদয় করিয়াছিল, আমরা তাহার ধারণা কিরূপে করিব! আমরা হাফেজকে দেখি নাই ও তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনি নাই; কিন্তু মহর্ষি যখন আবেগসহকারে তাঁহার শ্লোক আবৃত্তি করিতেন, তাঁহার সে অবস্থার ভাস্বর মুখশ্রীতে ও গম্ভীর কণ্ঠস্বরে যেন হাফেজের আবির্ভাব অনুভব করিতাম।

উদ্‌ধৃত বাক্যাবলীর মূল

উচ্চারণ-সংকেত

ফারসীর সব উচ্চারণ বাংলা অক্ষরে প্রকাশ করা যায় না। তাই কয়েকটি চিহ্ন ব্যবহার করিতে হইল।

ব্যঞ্জনবর্ণ

অ̣ জিহ্বামূলের চেয়ে ও আরো নীচে হইতে উচ্চারণ করিতে হইবে। এটি ব্যঞ্জন বলিয়া গণনা করা হয়, ও ইহাতে অন্য স্বর যুক্ত হইতে পারে। ১১ ও ১৬ সংখ্যক শ্লোক দেখ।

ক় জিহ্বামূলের চেয়ে আরো নীচে হইতে উচ্চারণ করিতে হইবে।

খ় বাংলা খ—য়ের "ঘষা" উচ্চারণ।

গ় বাংলা গ—য়ের "ঘষা" উচ্চারণ।

জ় বাংলা জ—য়ের "ঘষা" উচ্চারণ। ঠিক ইংরাজী Z

ফ় বাংলা ফ—য়ের "ঘষা" উচ্চারণ। ঠিক ইংরাজী f

স= ইংরাজী S, অথবা সংস্কৃত দন্ত্য স। কোথাও বাংলা স নহে।

ব= ইংরাজী W; কোথাও বাংলা ব নহে। সংস্কৃত অন্তঃস্থ ব-ও নহে; তাহাতে উপরের দাঁত একবার নীচের ঠোঁটে ছোঁয়াইতে হয়। ফারসী ব-য়ে ও ইংরাজী W তে শুধু দুই ঠোঁট ছুঁচোলো করিতে হয়: দাঁতের সম্পর্ক নাই।

ব় বাংলা ব, সংস্কৃত বর্গীয় ব, ইংরাজী b

স্বরবর্ণ

অ—হ্রস্ব আ। সমস্ত অকারান্ত ব্যঞ্জন হ্রস্ব আকারান্ত বুঝিতে হইবে। বাংলা অ ফারসীতে নাই।

এ় অথবা ব্যঞ্জনবর্ণের গায়ে "ে"=হ্রস্ব এ-কার।

ও় অথবা ব্যঞ্জনবর্ণের গায়ে "ো"=হ্রস্ব ও-কার।

ফারসীতে হ্রস্ব এ-কার ও হ্রস্ব ও-কারের ব্যবহার খুব বেশি।

ফারসীর ভারতীয় উচ্চারণ

ফারসী জীবিত ভাষা বলিয়া উহাতে কালক্রমে উচ্চারণের পরিবর্তন হইতেছে। ভারতবর্ষে ফারসীর যে উচ্চারণ প্রচলিত, ইরানে সেরূপ নয়। বর্তমান ইরানীদের ঝোঁক মুখ বোজা উচ্চারণের দিকে। এজন্য তাঁহাদের মুখে এ-কার ও ও-কার প্রায় লুপ্ত হইয়াছে; তৎপরিবর্তে ঈ-কার ও উ-কার শুনিতে পাওয়া যায়। (দীর্ঘ) আ-কারের বদলে কতকটা বাংলা 'চুপ রও'-এর 'অও'-এর মতো একটা ধ্বনি শোনা যায়। নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকগুলিতে ভারতীয় উচ্চারণ বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

ছন্দ রাখিয়া পদ্য পড়িতে হইলে কোথাও কোথাও লঘু স্বরকে গুরু, গুরু স্বরকে লঘু ও হসন্ত ব্যঞ্জনকে অকারান্ত করিয়া পড়িতে হয়।

শ্লোকগুলির আদিতে যে অঙ্ক রহিয়াছে তাহা দ্বারা প্রবন্ধের কোন্ স্থানে অনুবাদ উদ্ধৃত, তাহা সূচিত করা গেল।

কলিকাতা, লখনউ, কানপুর, প্রভৃতি স্থানে যে লিথোগ্রাফে ছাপা 'দীবান-হাফেজ' গ্রন্থ বিক্রয় হয়, তাহার কোন্ সংগীতের কোন্ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, প্রত্যেক শ্লোকের শেষে সংখ্যা দ্বারা তাহা নির্দেশ করা গেল।

১. হর্ দো আলম্ য়ক্ ফরোগে ব়ুএ উস্ত্,
গুফ্তমৎ পয়্দা ও পিন্ হাঁ নীজ্ হম্। ৩৯৬।৩।

২. শাহিদে দিল্ব়ুবাএ মন মীকুনদ্ অজ় বরায়ে মন,
নক্শও নিগার্ও রঙ্গ্‌ওব়ু তাজা ব-তাজা নও ব-নও। ৪৮৯।৫

৩. অয়্ ফরোগে মাহে হুস্ন্ অজ্ ব়ুএ রখ্শানে শুমা,
আব ব়ু এ খ়ুবী অজ্ চাহে জনখ্দানে শুমা। ২।১।

প্রবন্ধে ভাবানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। আক্ষরিক অনুবাদ এইরূপ : ওহে সেই জন, যাহার উজ্জ্বল মুখ হইতে সৌন্দর্যচন্দ্রমার ঝলক, তোমার চিবুক-কূপ হইতেই (সকল) সৌন্দর্যের দীপ্তি।

দীপ্তি কথাটির মূল আবব়ু। আব্ কথার এক অর্থ জল, অপর অর্থ উজ্জ্বলতা ; ব়ু=মুখ। দুইয়ে মিলিয়া আব্ব়ু কথার অর্থ মুখের উজ্জ্বলতা ; অপর এক অর্থ সম্মান।

সুন্দর মুখের চিবুকের গর্ত (টোল) ফারসী কবিরা বর্ণনা করিতে বড়ো ভালোবাসেন। এখানে আব্র়ু কথায় জলের ও চাহ্ কথায় কূপের ইঙ্গিত আছে বলিয়া তুলনাটি আরো মিষ্ট হইয়াছে।

৪. গো শম্অ্ ম-য়ারেদ্ দরীঁ জম্অ, কে ইম্শব্,
দর্ মজ্লিসে মা মাহ ব়ুখে দোস্ত-তমাম্ অস্ত্। ৫৬।২।

জম্অ্ এই পাঠ মহর্ষি কোন্ পুস্তক হইতে লইয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা গেল না। বাজারে প্রচলিত সকল পুস্তকে বজ্ম্ রহিয়াছে।

৫. দর্ আঁ হবা, কে জুজ্ বরক অন্দর্ তলব ন বাশদ্,
গর্ খির্মনে বেসোজদ্, চন্দে অজব্ ন বাশদ্। ১৮১।১।

৬. জে পাদ্‌শাহ ও গদা ফারিগম্‌, বে হম্‌দ্‌ ইল্লাহ্‌!
গদা এ খাকে দরে দোস্ত্‌ পাদ্‌শাহে মন অস্ত্‌। ৪০।৩।

৭. মহ্‌রমে রাজে দিলে শয়্‌দা এ খেশ্‌
কস্‌ ন মী বীনম্‌ জে খাস্‌ ও আম্‌ রা। ১৩।৬।

মহর্ষির পত্রে ইহার ভাবমাত্র গ্রহণ করা হইয়াছে। অনুবাদ এই: আমার আকুল হৃদয়ের গোপন কথা যাহার কাছে মন খুলিয়া বলিতে পারি এমন বন্ধু, উচ্চশ্রেণীর মধ্যে বা সাধারণ লোকের মধ্যে, কাহাকেও দেখিতেছি না।

৮. চে মস্তী অস্ত্‌ ন দানম্‌, কে ব্‌ ব-মা আবুর্দ,
কে বূদ্‌ সাকী ও ঈঁ বাদা অজ্‌ কুজা আবুর্দ। ১৫৬।১।

মহর্ষি পত্রে এক পঙ্‌ক্তির অর্থ দিয়াছেন। সম্পূর্ণ অনুবাদ এই: জানি না এ কি মত্ততা আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। সুরাপাত্রদাতাই বা কে? ও তিনি এ সুরা কোথা হইতে আনিলেন?

৯. ময়খারা ও সর্‌গশ্‌তা ও রিন্দ্‌ এম্‌ ও নজর্‌বাজ্‌,
বাঁ কস্‌ কে চো মা নীস্ত্‌ দরীঁ শহ্‌র্‌ কুদাম্‌ অস্ত্‌? ৫৬।৯।

১০. অজ্‌ নঙ্গ্‌ চে গোয়ী, কে মরা নাম্‌ জে নঙ্গ্‌ অস্ত্‌।
বজ্‌ নাম্‌ চে পুর্‌সী, কে মরা নঙ্গ্‌ জে নাম্‌ অস্ত্‌। ৫৬।৮।

১১. য়া রব্‌ আঁ শম্‌অে শব অফরোজ্‌ জে কাশানা এ কীস্ত্‌?
জানে মা সোখ্‌ৎ, বে পুরসীদ্‌ কে জানানা এ কীস্ত্‌। ৬১।১

১২. খূনম্‌ বেরেজ্‌ ও অজ্‌ গমে হিজ্‌রম্‌ খলাস্‌ কুন্‌।
মিন্নৎ পজীরে গম্‌জয়ে খঞ্জর্‌ গুজারমৎ। ৪৯।৭।

১৩. সদ্‌ জূয়ে আব্‌ বস্তা অম্‌ অজ্‌ দীদা দর্‌ কিনার্‌,
বর্‌ বূয়ে তুখ্‌মে মেহ্‌র্‌ কে দর্‌ দিল্‌ বেকারমৎ। ৪৯।৬।

১৪. অজ্‌মে দীদারে তো দারদ্‌ জান্‌ বর্‌ লব্‌ আমদহ্‌,
বাজ্‌ গর্‌দদ্‌, য়া বর্‌ আয়দ্‌, চীস্ত্‌ ফর্‌মানে শুমা? ২।২।

১৫. অগর্ ব-লুৎফ্ বেখানী, মজীদে অল্তাফ্ অস্ত্,
ও গর্ ব-কহ্র্ বেরানী, দব্নে মা সাফ্ অস্ত্। ৫৭।১।

১৬. আশিক কে শুদ্, কে য়ার্ ব-হালশ্ নজর্ ন কর্দ্?
অয়্ খাজা, দর্দ্ নীস্ত, ওগর্ ন, তবীব্ হস্ত। ৭১।৬।

১৭. হমা কস্ তালিবে য়ার্ অন্দ্, চে হুশয়ার্ ও চে মস্ত্,
হমা জা খানা এ ইশক্ অস্ত্, চে মস্জিদ্ চে কুনিশ্ৎ। ৬৪।৩।

১৮. রহ্জনে দহ্র্ ন খুফ্ৎ অস্ত্, মশও অয়্মন্ অজ্ও,
অগর্ ইম্রোজ্, ন-বুর্দ্ অস্ত, কে ফর্দা বেবরদ্। ২৫৬।৮।

১৯. অয়াঁ ন শুদ্, কে চেরা আমদম্, কুজা বূদম্।
দর্দ্ ও দরেগ্, কে গাফিল্ জে কারে খেশ্তনম্। ৩৮৮।৩।

বাজারে প্রচলিত পুস্তকে 'দরেগ্ ও দর্দ্' এই পাঠ পাওয়া যায়।

২০. তোরা জে কঙ্গুরয়ে অর্শ্ মী জনন্দ্ সফীর,
ন দানমৎ কে দরীঁ দামগহ্ চে উফ্তাদ্ অস্ত্। ২৩।৭।

২১. বাদ অজ্ ঈঁ নূর্ ব-আফাক্ দেহেম্ অজ্ দিলে খেশ্,
কে ব-খুর্শীদ্ রসীদেম্, ও গোবার্ আখির্ শুদ্। ২০০।৩।

২২. ননহাদা এম্ বারে জহাঁ বর্ দিলে জঈফ্,
ঈঁকার্ ওবার্ বস্তা ব-য়কুস্হ নিহাদা এম্। ৪১৪।৬।

২৩. কিশ্তী-নিশস্ত গান্ এম্, অয়্ বাদে শুর্তা বর্খেজ্
বাশদ্ কে বাজ বীনেম্ দীদারে আশনারা। ৩।৩।

পাঠান্তর: "নিশস্ত" স্থানে "শিকস্ত", ও "দীদার" স্থানে "আঁ য়ার"। মহর্ষি যে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়।

২৪. হর্‌গিজম্ মেহ্‌রে তো অজ্‌ লওহে দিল্‌ও জাঁ ন রবদ্‌।

* * * * * *

আঁচুনাঁ মেহ্‌রে তো অম্ দর্ দিল্‌ওজাঁ জাএ গিরিফ্‌ৎ,

কে গর্ অম্ সর্ বেরবদ, মেহ্‌রে তো অজ্‌ জাঁ নরবদ্‌।২৬৬।১,২

২৫. অয়্‌ শহন্‌শাহে ব্‌লন্দ্‌ অখ্‌তর্, খুদারা হিম্মতে,

তা ব-বোসম্, হমেচো গর্দূন্, খাকে অয়্‌বানে শুমা। ২।১২।

উদ্ধৃত শ্লোকগুলির মধ্যে এইগুলি আত্মজীবনীতে (চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৬৮) মুদ্রিত হইয়াছে—

সংখ্যা	আত্মজীবনীর পৃষ্ঠা	সংখ্যা	আত্মজীবনীর পৃষ্ঠা
৪	২২০	২০	১৭৪
৫	১০৬	২১	২২৩
১১	২১৯	২৩	১৭৫
১৮	২৪১	২৪	২১০
১৯	১৭১		

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলা সাহিত্যে দেবেন্দ্রনাথের স্থান

আমাদের মধ্যে এই ধারণা প্রচলিত আছে যে, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্ত, এই দুজনেই সর্বপ্রথমে বাংলা গদ্যের ভাষাকে কলাবন্ধনের দ্বারা সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করিয়া গিয়াছেন। গদ্যরচনারীতির ইঁহারাই প্রথম প্রবর্তক।

এ ধারণার মূল আমাদের মনের মধ্যে যতই গভীর হোক-না কেন, ধারণাটি যে ভুল সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। কেন নাই, তাহা বলিতেছি।

বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষা হইতে উদ্ভূত হইলেও তাহার গঠন এবং প্রকৃতি যে সংস্কৃত ভাষা হইতে ভিন্ন, এ কথাটা চল্লিশ বছর পূর্বে যাঁহারা বাংলা লিখিতেন তাঁহারা স্বীকার না করিলেও, এখন সকলেই স্বীকার করেন। করেন না কেবল তাঁহারাই, যাঁহারা বাংলা ভাষা লেখেন না।

অবশ্য বাংলার আধুনিক সভ্যতার ভাগীরথীর যিনি ভগীরথ, সেই রামমোহন রায় সর্বপ্রথমে বাংলা গদ্য লিখিবার বেলায় এ ভাষার গঠন যে সংস্কৃতের মতো নয়, তাহা মানিয়া গিয়াছেন। ভাষার স্বাতন্ত্র্য তার গঠনের উপর নির্ভর করে জানিয়াই রামমোহন রায় যেমন বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সূচনা করিলেন, তেমনি গৌড়ীয় ব্যাকরণ লিখিতেও প্রবৃত্ত হইলেন। রামমোহন রায়ের বাংলা-রচনায় সন্ধি বা সমাসের শিকলগুলি রীতিমত খুলিয়া ফেলা হইয়াছে, দেখিতে পাই। সমাস সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—এরূপ পদ গৌড়ীয় ভাষাতে বাহুল্যমতে ব্যবহারে আসে না। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার বাংলা ভাষার গঠনের এই স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের মতো সচেতন ছিলেন না। তাঁহারা সংস্কৃতের অলংকারের বোঝা বাংলার গায়ে চাপাইলেন; সংস্কৃত রচনারীতির পোশাক বাংলা ভাষাকে পরাইলেন।

বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের এই সংস্কৃত-বহুল ভাষা যে তখনকার শিক্ষিত সাধারণের পছন্দসই হয় নাই, তাহার প্রধান প্রমাণ তাঁহাদের রচনা-প্রকাশের সমসমকালে টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' এবং কালীসিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা', এ দুখানি বই একেবারে চলিত সহজ সরস বাংলায় লিখিত হইয়াছিল। বিশুদ্ধ সংস্কৃত রীতি ও গম্ভীর সাধু ভাষার প্রতিক্রিয়ায় এই

রূঢ় গ্রাম্যরীতি ও লঘু অসাধু ভাষা বাংলা সাহিত্যে দেখা দিল। অক্ষয়বাবু যখন 'বাহ্যবস্তু ও তাহার সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' লিখিবার সময়ে "জিগীষা" "জুগোপিষা" "জিজীবিষা" প্রভৃতি বিভীষিকাপূর্ণ শব্দের সৃষ্টি করিতেছিলেন, তখন শুনা যায় যে, কলিকাতার শিক্ষিত লোকদের বাড়িতে ঐ-সব শব্দের সঙ্গে 'চিচ্‌টীমিষা' প্রভৃতি শব্দ যোগ করিয়া হাসাহাসি হইত। প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) রাধানাথ শিকদারের সঙ্গে মিলিয়া 'মাসিক পত্রিকা' নাম দিয়া সহজ বাংলায় লিখিত একখানি কাগজও বাহির করেন।

অতএব, বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের সংস্কৃতবহুল ভাষার প্রতিক্রিয়াতেই এই আলালী ভাষা দাঁড়ায়, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। কোনো প্রতিক্রিয়ারই লক্ষণ আপস হইতে পারে না। সেই কারণে আলালী ভাষা সংস্কৃতের কোনো ধার ধারে নাই। সংস্কৃতকে যথাসম্ভব বাদ দিয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছে।

আলালী ভাষার সৃষ্টি হইবার পর পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয় হইল। বঙ্কিমই কলাসৌষ্ঠবপূর্ণ বাংলা গদ্য-রচনারীতির যতদূর সম্ভব উৎকর্ষ সাধন করিলেন। তিনি সংস্কৃতরীতি বা গ্রাম্যরীতি কোনোটাকেই অবলম্বন না করিয়া দুই রীতিকে মিশাইয়া দিলেন। সংস্কৃত শব্দ প্রচুর পরিমাণে লইলেন, কিন্তু সংস্কৃত ভাষার গঠন অনুসারে বাংলাকে গড়িতে গেলেন না। বাংলার নিজস্ব গঠনটি বজায় রাখিয়া সকল রকমের ভাব অবাধে প্রকাশের জন্য এবং ভাষার মধ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণার জন্য, সংস্কৃত শব্দ ও পদ বাংলা শব্দ ও পদের সঙ্গে মিলাইয়া দিয়া তিনি বাংলা ভাষাকে ঐশ্বর্যশালিনী করিলেন। এইজন্য, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ 'সোমপ্রকাশ' কাগজে এই নূতন সাহিত্যিক দলকে "শবপোড়া মড়াদাহের দল" নাম দিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ লোকে বলে শবদাহ কিংবা মড়াপোড়া— শবপোড়া এবং মড়াদাহ কেহই বলে না। এই বিদ্রূপ হইতেই বঙ্কিমী রীতির দিব্য পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু বঙ্কিম এই নূতন রচনারীতির উৎকর্ষ সাধন করিলেও, তাঁহাকে ইহার প্রবর্তক বলা যায় না। এই রচনাপদ্ধতি প্রথম কবে, কাহার দ্বারা প্রবর্তিত হইল তাহা দেখিলেই এই মত খাড়া করা শক্ত হইয়া ওঠে যে, সাধু ও অসাধু ভাষার রচনাপদ্ধতি বহুকাল ধরিয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবেই চর্চা করা হইয়াছিল। অবশ্য সাধুভাষার রচনারীতির নমুনা যদি কেবলমাত্র বিদ্যাসাগর বা অক্ষয়কুমারের লেখা এবং অসাধুভাষার রচনারীতির নমুনা 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র মতো বই হইতে

গ্রহণ করা হয়, তবেই ঐ মত দাঁড়াইতে পারে। কিন্তু এটা ভুলিলে চলিবে না যে, বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমারের সংস্কৃত-বহুল ভাষা ও আলালী ভাষার মাঝামাঝি একটা ভাষা ও রচনাপদ্ধতি বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের বাংলা সাহিত্যে অভ্যুদয়ের পূর্বেও ছিল এবং পরেও ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই মধ্যবর্তী ভাষা ও রচনাপদ্ধতির প্রথম প্রবর্তক। রামমোহন রায়ের গদ্য কোনোমতেই আধুনিক গদ্য হইতে পারে না বলিয়া তাঁহাকে প্রবর্তক বলিলাম না; যদিচ তিনিই সর্বাগ্রে সংস্কৃত ভাষা হইতে গৌড়ীয় ভাষার গঠনের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেন। রামমোহন রায় তাঁহার রচনায় সন্ধি বা সমাসের শিকল খুলিয়া ফেলিলেও প্রাচীন ভাষ্যকারদিগের রচনাপদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার রচনারীতি সাহিত্যে অচল। তাঁহাকে ভাষার শিল্পী বলা যায় না। বাংলা গদ্যের প্রথম শিল্পী দেবেন্দ্রনাথ।

দেবেন্দ্রনাথের রচনার বিস্তর নমুনা আমরা এই জীবনচরিতে দেখিতে পাইয়াছি। সেই-সমস্ত নমুনাগুলিতেই তাঁহার ব্যক্তিত্বের ছাপ এমন সুস্পষ্টরূপে পড়িয়াছে, তাঁহার চিত্তের রূপ লেখার ভিতরে এমন অনায়াসে ধরা দিয়াছে যে, তাঁহার সমসাময়িক আর কারো লেখার কথা দূরে থাকুক, আধুনিক কালেরও অল্প লেখক আছেন যাঁহাদের লেখায় সমস্ত মানুষটার ছাপ এমনিভাবে চোখে পড়ে। ইহাকেই বলে 'স্টাইল'। এই স্টাইল জিনিসটা বাংলায় এত অল্প লেখকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়! দেবেন্দ্রনাথের স্টাইলের বিশেষত্ব কী, তাহা আলোচনা করিবার পূর্বে স্টাইল জিনিসটা কী কী উপাদান-উপকরণে গঠিত হয়, এবং সেই উপাদান-উপকরণগুলি দেবেন্দ্রনাথের লেখায় কী পরিমাণে আছে, তাহার আলোচনা গোড়ায় আবশ্যক। কারণ বাংলা ভাষায় স্টাইল যেমন অল্প, তেমনি স্টাইল সম্বন্ধে ঠিকমত বোধও এ দেশে অল্প লোকেরই মধ্যে উজ্জ্বল।

অবশ্য স্টাইল যখন একটা ভাষার শিল্প, তখন অন্যান্য শিল্পের মতো ইহাকে বিশ্লেষ করিতে যাওয়া গোটা ফুল ছিঁড়িয়া তাহার পাপড়ি, কেশর, পরাগ প্রভৃতি দেখানোর মতো ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। স্টাইলের উৎস একটা সূক্ষ্ম কলা-বোধ বা সৌন্দর্য-বোধ— যে জিনিসটা সকল বিশ্লেষের বাহিরে। শব্দ-নির্বাচন, পদগুলির মধ্যে ধ্বনিসামঞ্জস্য রক্ষা করা, সমস্ত গদ্যপ্রবাহের মধ্যে একটি ছন্দ স্থাপন করা— গদ্য স্টাইলের এই-সকল সৌষ্ঠব-বিধানের মূলে সেই কলাবোধটি থাকা চাই। নহিলে ভাষার শিল্পী হওয়া যায় না।

দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে এই কলাবোধটি যে পরিপূর্ণ মাত্রায় জাগ্রত ছিল,

তাঁহার জীবনচরিত পড়ার পর সে কথা আর আমার পাঠকদিগকে বলিবার কোনো দরকার আছে কি ?

এখন স্টাইলের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলার আলোচনা করিয়া দেখা যাক।

প্রথম ধরা যাক শব্দনির্বাচন। ভাষা জিনিসটা প্রয়োজনের দ্বারা জীর্ণ এবং অর্থের দ্বারা সীমাবদ্ধ বলিয়া তাহাব মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা বা সৌন্দর্য সঞ্চার করা ভাষাশিল্পীর পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। এ তো আর পাথর নয় যে যেমন ইচ্ছা গড়িলাম বা রঙ নয় যে যেমন ইচ্ছা ফুটাইলাম। সেইজন্য ভাষা-শিল্পীকে বাধ্য হইয়া শব্দের মধ্যেও একটা বাছাই করিতে হয়। এমন সকল শব্দ বাছিতে হয় যাহাদের অর্থের অনেক রকমের সূক্ষ্মভেদ আছে, যাহাদের মধ্যে একটা স্বাভাবিক প্রাণ ও সরলতা আছে অথবা যাহাদের মধ্যে একটি সুমিষ্ট ধ্বনি আছে। বিশেষ মানসিক প্রকৃতি অথবা বিশেষ রকমের ভাব প্রকাশ অনুসারে ভাষাশিল্পীর শব্দনির্বাচন প্রণালীও ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়। সূক্ষ্ম সৌন্দর্য উপলব্ধি করিতে গেলে তাহার শব্দনির্বাচন একরকমের হইবে ; তত্ত্ব বা কোনো চিন্তার বিষয় প্রকাশ করিতে গেলে তাহার শব্দনির্বাচন একেবারেই অন্য রকমের হইবে। প্রথমটিতে, সেই-সকল শব্দ চাই যাহাদের অর্থের অনেক রকমের সূক্ষ্মভেদ আছে বা যাহাদের ধ্বনি মধুর। দ্বিতীয়টিতে এমন সকল শব্দ চাই যাহাদের অর্থ একেবারে পরিষ্কার ও সীমাবদ্ধ। দৃষ্টান্তহিসাবে বলা যায়, কবি রবীন্দ্রনাথ ও দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথের গদ্য রচনায় শব্দনির্বাচন প্রণালীর মধ্যে এই তফাত দেখিতে পাওয়া যায়।

দেবেন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে এই দুই প্রণালীরই ব্যবহার আছে। কারণ, তাঁহার রচনার মধ্যে তত্ত্ব এবং রসের অংশ দুইই তুল্য মাত্রায় বিদ্যমান। উদাহরণ দিতেছি। তত্ত্ব রচনার উদাহরণ—

"অসংখ্য পরমাণুর সমষ্টি এই পৃথিবীকে একমাত্র বস্তুরূপে ভাবিয়া এবং তাহা হইতে নানাবিধ বৃক্ষাদি সকল উৎপন্ন হইতে দেখিয়া মনে করি যে এক যে বস্তু সেই নানা হইতেছে ; কিন্তু বাস্তবিক পৃথিবী এক বস্তু নহে ; সে অনেক পরমাণুর সমষ্টি এবং সেই পরমাণু সকল নানা সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নানা আকারে অবস্থিতি করিতেছে। যদি পৃথিবী অংশবিহীন অখণ্ডনীয় এক বস্তু হইত, তবে তাহা আর কখন দুই হইতে পারিত না এবং সুতরাং অন্য সকল বস্তুরূপেও পরিণত হইতে পারিত না।"

রসরচনার উদাহরণ—

"অরুণোদয়ে প্রভাতে আমি যখন সেই বাগানে বেড়াইতাম, যখন আফিমের শ্বেত পীত লোহিত ফুল-সকল শিশিরজলের অশ্রুপাত করিত, যখন ঘাসের রজত কাঞ্চন পুষ্পদল উদ্যানভূমিতে জরির মছনদ বিছাইয়া দিত, যখন স্বর্গ হইতে বায়ু আসিয়া বাগানে মধুবহন করিত,...তখন তাহাকে আমার এক গন্ধর্বপুরী বোধ হইত।"

এই দুই রচনা দুই ভিন্ন লোকের লেখা বলিয়া মনে হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

শব্দনির্বাচন হইতে স্টাইলের আর-একটা বড়ো দিকের কথায় উপনীত হইতে হয়, যেটাকে শব্দবয়ন বা 'গাঁথুনি' নাম দিতে পারি। সংগীতে যেমন সুর তালমানলয়ে গাঁথা হইলে তবেই সেটা সংগীত নামের যোগ্য হয়, গদ্যের ভাষা সম্বন্ধেও তেমনি ভাব বা অর্থস্রোতকে বাক্য ও পদগুলিকে তালমানলয়ের একটি সুনিয়মিত বন্ধনে গাঁথিলে তবেই সেই ভাষা জিনিসটা শিল্প হইয়া উঠে। ঠিক সংগীতেরই মতো গদ্যভাষাশিল্পেও একটা পদ এবং অন্য পদ, একটা বাক্য এবং অন্য বাক্যের মাঝখানে একটি যতি আছে, একটি ধ্বনিসামঞ্জস্যের চেষ্টা আছে। সুতরাং এই যে গাঁথুনিটি, ইহার মধ্যে নৈপুণ্যের লীলা যথেষ্ট। অর্থের সঙ্গে অর্থকে গাঁথিতে গিয়া অর্থপ্রবাহের মধ্যে মধ্যে যে যতিটিকে রক্ষা করিতে হয়, তাহার বৈচিত্র্য অসাধারণ। কারণ গদ্যের পদ এবং বাক্যগুলি যদি পদ্যের মতো মাপসই হইত; অর্থাৎ, ঠিক একটি যত বড়ো আর-একটি তত বড়ো, একটিতে যে পরিমাণ ধ্বনি সঞ্চারিত হইয়াছে অন্যটিতে সেই পরিমাণ ধ্বনি রক্ষিত হইয়াছে, এমন হইত—তবে কোনো গোলই ছিল না। গদ্যে যতি ও ধ্বনিসামঞ্জস্যকে খুব বিচিত্র করিয়া দেওয়া দরকার, যাহাতে পড়িবার কালে ঔৎসুক্যটা কেবলি খাড়া হইয়া জাগিয়া থাকে।

স্টাইল যাহার নাই, এমন কাঁচা লেখক এই যতি রক্ষা করার জন্য এমন জোলো শব্দ বা পদ রচনার মধ্যে গুঁজিয়া দেয় যাহা রচনার অর্থকে উদ্‌ভাসিত করে না কিংবা রচনার রসকে উচ্ছ্বসিত করে না— বরং অর্থে অনর্থ ঘটায় এবং রসের স্রোতকে ভাঁটায়। দেবেন্দ্রনাথের কোনো রচনায় এমন একটি ব্যর্থ শব্দ বা পদ বাহির করিবার জো নাই। তাঁহার ব্যবহৃত শব্দ ও পদগুলি যেমন স্বচ্ছ তেমনি সংক্ষিপ্ত— ঠিক যতটুকুতে পরিষ্কাররূপে ভাব প্রকাশ করা যায় ততটুকু —তার বেশি নয়। অথচ যুক্তির বাঁধন কোথাও এতটুকু আলগা হয় নাই। একদিকে তাই তাঁহার স্টাইলের গাঁথুনিটিকে যুক্তির কড়া গাঁথুনি বলিয়া মনে

হয়। মনের কোথাও অন্যমনস্ক হইবার উপায় নাই। অন্য দিকে যতি এবং ধ্বনিসামঞ্জস্য রক্ষার জন্য রচনার মধ্যে এমনি একটি সংগীত জাগিয়াছে যে, তাহা মন ভুলায়; কারণ তাহা ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি সাধন করে। তাহা চোখে ভালো লাগে, কানে ভালো লাগে। উদাহরণ—

"সেই সনাতন পুরাণই একভাবে চিরকাল রহিয়াছেন,

"আর সকলকেই তিনি উন্নতির মুখে ত্যাগ করিতেছেন।

"তাঁর সৃষ্টিতে কিছুই পুরাতন থাকিতে পারে না;

"সকলই নূতন নূতন ভাব ধারণ করিতেছে।

"আমরা যত্নপূর্বক কিছু নির্মাণ করিলে তাহা ত্যাগ করিতে কত কুণ্ঠিত হই।

"কিন্তু তাঁহার সৌন্দর্যময় রাজ্যে তরুসকল প্রতি বৎসর পুরাতন পত্র ত্যাগ করিয়া নূতন পত্র ধারণ করিতেছে—

"ময়ূরেরা এমন উজ্জ্বলসুন্দর পক্ষসকল ফেলিয়া দিয়া আবার নূতন সজ্জায় সজ্জীভূত হইতেছে।"

উপরে উদ্ধৃত লেখাটিতে যতির বৈচিত্র্য দেখাইবার চেষ্টা করা গেল। ইহার মধ্যে একটি শব্দ বা পদ বাহুল্য বলিয়া দেখানো যায় না— কিংবা কোনো কথা ইহার চেয়ে সংক্ষেপে বা সুন্দর করিয়া বলা যাইত তাহাও দেখানো যায় না। এখানে অর্থ উপমার দ্বারা গতিপ্রাপ্ত হইতেছে; অথচ অর্থের সঙ্গে অর্থের গাঁথুনির সঙ্গে সঙ্গে পদ ও বাক্যের মধ্যে বিচিত্র যতি রক্ষা করার দরুন সমস্ত রচনাটি এমনি সুন্দর ও সুমিষ্ট হইয়াছে যে, অর্থের দ্বারা যেমন মনের তৃপ্তি হয়, ধ্বনির দ্বারা তেমনি কানেরও তৃপ্তি হয়। এই দুই তৃপ্তি একসঙ্গে ঘটানোই সব চেয়ে বড়ো স্টাইলের লক্ষণ।

এই যে পদ ও বাক্যের মধ্যে একটি ছন্দ রক্ষা করা, পদ্যের মতো গদ্য রচনায় ইহার কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নাই; নির্দিষ্ট নিয়ম থাকা সম্ভবও নয়। বোধ হয়

এখানে কানই একমাত্র বিচারক। পদগুলির মধ্যে এই ছন্দ রক্ষা ব্যাপারটি কেমন করিয়া সাধিত হয়, পদগুলির মধ্যে ধ্বনির সমাবেশ কেমন করিয়া ঘটানো যায়— আরো একটু দেখা দরকার। বাংলা ভাষায় পদ বা বাক্যে ধ্বন্যাত্মক শব্দ যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করা এক উপায়। কিন্তু বোধ হয় সব চেয়ে প্রশস্ত উপায় কোনো পদের বা বাক্যের একটি কি দুটি স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণকে (বিশেষ ভাবে ওষ্ঠ্য বর্ণগুলি) পুনরাবৃত্তি করানো। এই পুনরাবৃত্তির কাজে চোখের একটা অলক্ষিত ভাবে তৃপ্তি আছে— ভিন্ন ভিন্ন পদের ভিতর দিয়া একই বর্ণের উপর চোখ বুলাইয়া যাওয়ার তৃপ্তি। সেইসঙ্গে কানের তৃপ্তি, সেও অজ্ঞাতসারে। কারণ ঐ পুনরাবৃত্তিতেই ধ্বনি বাজে। একটা উদাহরণ লওয়া যাক—

ফাল্গুন মাস চলিয়া গেল, চৈত্র মাস মধু মাসের সমাগমে বসন্তের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল এবং অবসর পাইয়া দক্ষিণবায়ু আম্রমুকুলের গন্ধে সদ্য প্রস্ফুটিত লেবু ফুলের গন্ধ মিশ্রিত করিয়া কোমল সুগন্ধের হিল্লোলে দিগ্বিদিক্ আমোদিত করিয়া তুলিল।"

ম, স এবং ল এই তিনটি বর্ণের পুনরাবৃত্তির দ্বারা উপরে যে লেখাটি উদ্ধার করা গেল তাহা ধ্বনিময় হইয়াছে। ম এবং সএর মধ্যেই ধ্বনির বেশি খেলা ; ল মাঝে মাঝে আসিয়া বৈচিত্র্য ঘটাইয়াছে। এটা একবারে কানের ব্যাপার— গানের কান না থাকিলে স্টাইলে এই রকমের ধ্বনিবৈচিত্র্য ফোটানো যায় না।

আর-একটি উদাহরণ দেখা যাইতে পারে—

"যেমন আমার উপরে তাঁহার চক্ষু, সেইরূপ সর্বত্রই তাঁহার চক্ষু, সর্বত্রই তাঁহার হস্ত—বৃক্ষের পত্রে, পক্ষীর পতত্রে; সমুদ্রের গাম্ভীর্যে, পর্বতের উচ্চতায়।"

এখানে প, র, ক্ষ, এবং র'য়ের সঙ্গে সঙ্গে ত্র এই ক'টি বর্ণের দ্বারা উদ্ধৃত লেখাটিতে ধ্বনি বাজিয়াছে। আর-একটি অংশ একবার উদ্ধার করা হইলেও শব্দের ভিতর দিয়া রঙ ফুটাইবার অপূর্ব ক্ষমতা দেখাইবার জন্য পুনরুদ্ধার করা যাইতে পারে—

"যখন আফিমের শ্বেত পীত লোহিত ফুল-সকল শিশিরজলের অশ্রুপাত করিত, যখন ঘাসের রজত কাঞ্চন পুষ্পদল উদ্যানভূমিতে জরির মছনদ বিছাইয়া দিত"…। এখানে শুভ্রবর্ণের প্রতি তাঁহার মনের সমস্ত অনুরাগ শ এবং রজ— ছ এই বর্ণগুলির ধ্বনির দ্বারা ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

আশা করি স্টাইলের এই বিশ্লেষের দ্বারা যেটুকু দেখা গেল, তাহাতে

দেবেন্দ্রনাথ যে বাংলা গদ্যভাষার একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী সে কথা স্বীকার করিতে কাহারো কুণ্ঠা হইবে না। ঠিক যদি এই রকমের পরীক্ষা বিদ্যাসাগর বা অক্ষয়কুমারের রচনার সম্বন্ধে করা যায়— অর্থাৎ যদি দেখিবার চেষ্টা করা যায় যে, তাঁহাদের রচনার মধ্যে শব্দনির্বাচন কী রকমের, শব্দনির্বাচন কিছু আছে কি না— তার পরে শব্দবয়ন প্রণালী কেমনতর, পদ ও বাক্যগুলির মধ্যে যতি রক্ষা ও ধ্বনিসামঞ্জস্য রক্ষার কোনো চেষ্টা আছে কি না— রচনার ভিতর দিয়া অর্থের সুসংগতি ও সুবিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনির সুসংগতি ও সুবিন্যাস থাকিতেছে কি না— তবে সেই দণ্ডেই প্রমাণ হইয়া যায়, কে যথার্থ বাংলার শিল্পী আর কে নয়। সংস্কৃত শব্দ ও পদ সমাসের আড়ম্বরের সঙ্গে প্রচুর ব্যবহার করিলে ভাষাকে স্থূল ও ভাবকে যে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলা হয় এবং তখন ভাষা ভাবের বাহন না হইয়া ভাবের কাঁধে চাপিয়া বসিয়া তাহার প্রাণটুকুকে যে টিপিয়া মারিবার জোগাড় করে, এ কথা যাঁহারা সংস্কৃত রচনারীতি প্রবর্তিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা মনে রাখেন নাই।

অথচ দেবেন্দ্রনাথ সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলাকে মিশাইলেও ভাষার আভিজাত্য রক্ষার দিকে তাঁহার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তাঁহার রুচি এমনি কড়া ছিল যে যেমন তেমন শব্দ, যেমন তেমন পদ ব্যবহার তাঁহার কাছে পাস হইত না। তাঁহার ভাষাশিল্পে সংগীত জিনিসটা যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চারিত হইয়াছে ইহা আমরা দেখিলেও, বোধ হয় সংগীতের চেয়েও ভাস্কর্যের দিকটা তাঁহার ভাষাশিল্পে বেশি প্রতীয়মান। তাঁহার স্টাইলে লঘুতার চেয়ে ভার (massiveness) বেশি ; ভাষাটি যেন অতি যত্নে কুঁদিয়া তোলা মর্মরমূর্তির মতো। চিত্রে মূলরেখা এবং রঙের মধ্যে যেমন অনেক ছায়ারেখা এবং ভাসাভাসা রঙের ব্যঞ্জনা থাকে ; গানে, মূলস্বরের মধ্যে যেমন অনেক সূক্ষ্ম অস্বর স্বরের ইঙ্গিত থাকে ; তেমনি যে ভাষাশিল্পে চিত্র ও গানের অংশ বেশি তাহার গতি এই কারণেই লঘু ও ক্ষিপ্র হয়, তাহার উপরে বিচিত্র অনুভাবের, বিচিত্র হাসিকান্নার আলোছায়া কাঁপিতে থাকে। দেবেন্দ্রনাথের ভাষাশিল্প একেবারেই সে ধরনের নয়— ইহাতে ভাস্কর্যের রস বেশি পাওয়া যায়। ইহার প্রধান লক্ষণ— শান্তি, গাম্ভীর্য ও প্রসাদ। ভাস্কর্যের উপকরণ প্রধানত পাথর, সকলের চেয়ে ভারী উপকরণ। দেবেন্দ্রনাথের ভাষার মধ্যেও সেইজন্য সংস্কৃত শব্দের প্রাধান্য আছে— সংস্কৃত পদ বা সংস্কৃত রীতির নয়। বাংলার বাংলাত্বকে বজায় রাখিয়া তাহার সঙ্গে সংস্কৃতকে তিনি এমন করিয়া মিশাইয়াছেন, যাহাতে বাংলা শব্দ বা পদগুলি এবং সমস্ত ভাষাটাই

সংস্কৃতের মতো একটা গাম্ভীর্য লাভ করিয়াছে। যেমন তেমন কড়া দাঁতভাঙা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিলেই এই গাম্ভীর্যটি থাকে না।

একটা ছোটখাটো দৃষ্টান্ত দিই। তাজমহল দেখিয়া তাহার বর্ণনায় তিনি লিখিতেছেন: "আমি তাজের একটা মিনারের উপর উঠিয়া দেখি, পশ্চিম দিক সমুদায় রাঙা করিয়া সূর্য অস্ত যাইতেছে; নীচে নীল যমুনা; মধ্যে শুভ্র স্বচ্ছ তাজ, সৌন্দর্যের ছটা লইয়া যেন চন্দ্রমণ্ডল হইতে পৃথিবীতে খসিয়া পড়িয়াছে।" এই বর্ণনাটুকুর মধ্যে সংস্কৃত শব্দ তিন-চারিটির বেশি নাই। সংস্কৃত রীতিতে যাঁহারা বাংলা লিখিতেন তাঁহারা 'উপর উঠিয়া দেখি' না লিখিয়া 'শীর্ষদেশে আরোহণপূর্বক নিরীক্ষণ করিলাম' লিখিতেন, এবং 'খসিয়া পড়িতেছে' না লিখিয়া 'স্খলিত হইয়াছে' বা ঐ রকমের কিছু লিখিতেন নিশ্চয়। অথচ এই ভাষায় সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার বিশেষ না থাকিলেও, ইহাতে সংস্কৃত ভাষার অনুরূপ গাম্ভীর্য আছে। ভাষার একটা আভিজাত্য আছে, একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। ৩৯১-৯২ পৃষ্ঠায় যে চিঠিখানি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার ভাষাও এমনিতর। যেন বেদমন্ত্রের মতো কিংবা সমুদ্রমন্দ্রের মতো গম্ভীর। নদীর কল্লোলধ্বনি তাহাতে নাই। তাহার গানের মধ্যে গাম্ভীর্য বেশি, তাহার রূপের মধ্যে শান্তি বা প্রসাদ বেশি। এ ধরনের ভাষা বাংলায় আর নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি, স্টাইল ব্যক্তিত্বের ছাপ বহন করে। দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের মধ্যে যেমন একদিকে একটি দ্রঢ়িষ্ঠ কঠোরতা, একটি সুদূর নির্লিপ্ততা ছিল এবং অন্য দিকে একটি চিন্তার বেগ ও সৌন্দর্যরসানুভূতি ছিল, তাঁহার স্টাইলেও এই দুয়ের ছাপ পড়ায় তাহার মধ্যেও একদিকে ভাস্কর্যের কাঠিন্য ও ভার, অন্য দিকে সংগীতের বেদনা ও বেগ, দুইই জাগিয়াছে। তাহা বাস্তবিকই 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি।' ম্যাথ্যু আরনল্ড যে Attic Prose-এর কথা বলিয়াছেন, আমার মনে হয় দেবেন্দ্রনাথের গদ্য তাহার উদাহরণ। তাহার মধ্যে বেগ ও আবেগের চেয়ে শান্তি ও সংযম বেশি। মেকলের রচনার সঙ্গে ম্যাথ্যু আরনল্ডের রচনার যে তফাত— একজনের মধ্যে ভাবাবেগ কেবলি বাক্যের ফেনা ফেনাইয়াছে এবং অন্যজনের মধ্যে তাহা সংযত ভাষা ও মার্জিত রুচির ভিতর দিয়া বিশুদ্ধ ও সংহত আকারে দেখা দিয়াছে— আমার মনে হয় অনেক বাংলা লেখকের রচনারীতির সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের রচনারীতির সেই তফাত। অবশ্য তাই বলিয়া ম্যাথ্যু আরনল্ডের স্টাইল সর্বাংশে দেবেন্দ্রনাথের স্টাইলের সঙ্গে কোনোমতেই তুলনীয় নয়। আমাদের অধিকাংশ লেখকদের ভাবও যেমন

দুর্বল ও বিক্ষিপ্ত, ভাষাও তেমনি অত্যন্ত শিথিল। তাঁহাদের চিন্তার জোর নাই, প্রকাশেরও তাই শৈথিল্য হয়। কী অর্থে কী শব্দ ব্যবহার করেন তাহার ঠিকানা নাই— ইংরাজী কথার যেমন-তেমন তর্জমা করিয়া চালাইতেছেন। ভাষার মধ্যে যুক্তির বাঁধন আলগা হইলেই ছন্দের বাঁধনও আলগা হয়। বাক্যগুলি সুসম্বদ্ধ হয় না, পদগুলিও তাই ছন্দোবদ্ধ হয় না।

রামমোহন রায়ের পর দেবেন্দ্রনাথ নানা তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা ও বিচার বাংলা ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন—'আত্মতত্ত্ববিদ্যা' 'ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস' 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' পড়িলেই তাহা দেখা যায়। 'জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি' বইটিতে বিজ্ঞানের অনেক কথা তাঁহাকে ব্যবহার করিতে হইয়াছে। পশ্চিম মহাদেশের কত তত্ত্বকে তিনি আত্মসাৎ করিয়াছেন, অথচ ইংরাজী কোনো শব্দকে গ্রহণ করিতে তাঁহাকে দেখা যায় নাই। ইংরাজী দুরূহ কথাগুলির পরিভাষা এমন সহজে তিনি করিয়া গিয়াছেন যে এ সম্বন্ধে তাঁহার যে কোনো রকমের কৃতিত্ব আছে তাহা মনে করাই শক্ত।

ক্রম-অভিব্যক্তি (Evolution), আপেক্ষিক সত্য (Relative Truth) প্রভৃতি কত কথা আমরা এখন ব্যবহার করিতেছি, অথচ এগুলি প্রথম তাঁহার দ্বারাই উদ্‌ভাবিত হয়। সংস্কৃত ভাষা খুব ভালো রকম জানার দরুন, নূতন নূতন শব্দ তৈরি করিতে গিয়া ইংরাজী শব্দের কষ্টকল্পিত যো-শো-গোচের তর্জমা করিয়া তাঁহাকে কাজ সারিতে হয় নাই। অক্ষয়বাবুর যে-সকল রচনা তত্ত্ববোধিনীতে বাহির হইত, তাহা আগাগোড়া দেবেন্দ্রনাথ সংশোধন করিয়া সরল করিয়া দিতেন। তবু যথেষ্ট সরল করিয়াও তিনি শেষ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন না শুনিয়াছি। রাজনারায়ণবাবু যে সংস্কৃতের বন্ধন হইতে বাংলাকে মুক্ত করিয়া সহজ সরল বাংলায় সব ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেন, তাহার মূলেও দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব স্পষ্টই রহিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার লেখাও রীতিমত সংশোধন করিয়া দিতেন। তাঁহার পুত্রদের মধ্যে বাংলায় দর্শনের আলোচনা করিয়া যে মনীষী বিখ্যাত হইয়াছেন, সেই প্রবীণ সাহিত্যিক দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রথম পুস্তক 'তত্ত্ববিদ্যা' যখন বাহির হয়, তখন তাঁহার পিতা দেবেন্দ্রনাথ সে বই আগাগোড়া দেখিয়া শুনিয়া সংশোধন করিয়া দেন। বাংলা গদ্যসাহিত্যে উৎকৃষ্ট রচনারীতির তিনি যেমন প্রবর্তক তেমনি পথপ্রদর্শক।

তাঁহার সমস্ত রচনাবলীর মধ্যে ভাষা ও স্টাইলের উৎকর্ষের দিক হইতে দেখিতে গেলে তাঁহার 'আত্মজীবনী' ও 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

আত্মজীবনীতে তাঁহার নানা জায়গায় ভ্রমণের যে-সকল চমৎকার ছবি আছে, তাহাতে দু-চারিটি রেখায় ছবি আঁকিবার প্রতিভা যেমন ফুটিয়াছে, সমস্ত আশপাশ খুঁটিনাটিগুলাকে চিত্রপটে পরিষ্কার দেখিয়া ঠিকমত সাজাইয়া তুলিবার নৈপুণ্যও কম প্রকাশ পায় নাই! ছবির রস এক 'জীবনস্মৃতি' এবং 'পালামৌ' ছাড়া অন্য কোনো বাংলা বইয়ে এমন করিয়া জমিয়া ওঠে নাই। যেমন বাহিরের দৃশ্যছবি, তেমনি অন্তরের অদৃশ্য অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতার ছবি, দুই ছবিরই রস তুল্যমাত্রায় আত্মজীবনীতে পূর্ণ হইয়া দেখা দিয়াছে।

'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানে' ব্যাখ্যান অংশই সব চেয়ে কম— উপলব্ধির কথাই বেশি। সেই উপলব্ধির পিছনে সুদীর্ঘকালের জ্ঞানের সাধনা ও তপস্যা আছে, নানা সঞ্চয় আছে। সেই পলিতা, তেল, দীপাধার, প্রভৃতি সঞ্চয় ও সংগ্রহের ঠিক মুখে জ্বলিতেছে একটি শিখা, অধ্যাত্ম উপলব্ধির শিখা। সুতরাং তাহার আলোকে সমস্ত লেখা এমন অপূর্বরূপে উদ্‌ভাসিত হইয়াছে যে, স্টাইল কোথাও টিমটিমে বা নিষ্প্রভ বা দুর্বল হইতে পারে নাই। অধ্যাত্ম উপলব্ধি কোথাও নূতন তত্ত্বের আকারে, কোথাও সৌন্দর্য-উপলব্ধির আকারে, কোথাও ভক্তির মধুর উচ্ছ্বাসের আকারে, কোথাও দেশপ্রীতি-উদ্‌বেলিত স্বদেশের কল্যাণপ্রার্থনার আকারে— নানা আকারে প্রকাশ পাইয়াছে।

তত্ত্বরচনার দিক দিয়া বোধ হয় ফরাসী দার্শনিকদের রচনার সৌষ্ঠবের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের রচনার সৌষ্ঠব কতকটা মেলে। মূল ফরাসী আমি জানি না, অনুবাদেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ফরাসী রচনার যে স্বচ্ছতা, সংক্ষিপ্ততা, স্বাদ, সরসতা, সজীবতা প্রভৃতি গুণ আছে অন্যদেশীয় রচনার সে গুণ নাই। ফরাসী দার্শনিক কুজ্যাঁর লেখা দেবেন্দ্রনাথের যে ভালো লাগিত সে শুধু তত্ত্বের জন্য নয়, রচনার সৌন্দর্যের জন্যও বটে। তবে তত্ত্বরচনা তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না— তাঁহার অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতায় যে তত্ত্ব আপনি আসিয়া পড়িত তাহাকে অধ্যাত্ম উপলব্ধির প্রকাশের হিসাবেই তিনি ব্যক্ত করিতেন। এ জায়গায় কতকটা মার্টিনোর কোনো কোনো রচনার সঙ্গে তাঁহার রচনার বরং সাদৃশ্য পাওয়া যায়। মার্টিনোর ভাষাটিও যেমন স্বচ্ছসুন্দর, দেবেন্দ্রনাথের ভাষাও তেমনি।

সৌন্দর্য-উপলব্ধির রচনা নানা জায়গায় পাওয়া যায়। তাঁহার সৌন্দর্য-উপলব্ধির কতগুলি বিশেষত্ব ছিল। আলো কিংবা উজ্জ্বলতার প্রতি বৈদিক ঋষিদের মতো —কিংবা মিল্‌টন বা দান্তের মতো একটা অদ্ভুত টান তাঁহার মধ্যে দেখি। আত্ম-জীবনীতে পিতৃশ্রাদ্ধের সময়ে তিনি যে মৃত্যুস্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহা ইহার

একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ব্যাখ্যানেও নানা জায়গায় ইহার উদাহরণ মিলে, একটা স্থান উদ্ধার করিতেছি: "অন্ধকার চন্দ্রমার মহিমা দেখ, তাহার অমৃত কিরণ সহস্রধারে বর্ষিত হইতেছে; অন্য রজত-রঞ্জনে পৃথিবী রঞ্জিত হইয়াছে, বৃক্ষেরা হরিৎবর্ণ পরিত্যাগ করিয়া রৌপ্যবর্ণে শোভিত হইয়াছে··· তোমারদিগকে জিজ্ঞাসা করি— তোমারদের মধ্যে যাহারা গঙ্গাতীরের শুভ্র চড়ার উপরে চন্দ্র-কিরণ ভোগ করিয়াছ, তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, গঙ্গাতীরে একাকী কি দুই চারি বন্ধুর সঙ্গে ভ্রমণ করিতে করিতে গঙ্গার স্নিগ্ধ মারুতে শরীর যখন শীতল হইল, সকল জগৎ শুদ্ধ পুলকে চন্দ্রের অমৃত কিরণ পান করিতেছে দেখিয়া মন যখন আর্দ্র হইল, এমন সময়ে কি কাহারও মনে অনন্তের মহিমা উদয় হয় নাই?"

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রকৃতির বাহ্য সুন্দর দৃশ্যের ভিতর দিয়া সেই অনন্তের মহিমার ভাবে উত্তীর্ণ হইতেন— উপরে উদ্‌ধৃত ছত্রগুলি অনায়াসে তাঁহার কোনো কবিতায় তিনি গাঁথিয়া লইতে পারিতেন।

"It is a beautious evening, calm and free,

...

The gentleness of heaven is on the sea :
Listen ! the mighty Being is awake,
And doth with his eternal motion make
A sound like thunder everlastingly."

অথচ আত্মজীবনীতে যে-সকল ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে বা এই জীবনচরিতে ৩৮৭-৯০ পৃষ্ঠায় তাঁহার কাশ্মীর-ভ্রমণের বৃত্তান্তের যে টুকরাগুলি আছে তাহাদের মধ্যে খুঁটিনাটি (details) পর্যবেক্ষণের একটি বিশেষ ঔৎসুক্য ও আনন্দ আছে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের রচনায় তাহা নাই। দেবেন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-উপলব্ধি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মতো কেবলি অতীন্দ্রিয় রহস্যলোকেই বিচরণ করিত না; রূপ-রস-গন্ধময় লোকেও বিচিত্রতার স্বাদ লাভ করিয়া আনন্দিত হইত। কীট্‌স বা রসেটির প্রকৃতির যে বিশেষত্ব দেখিতে পাই, সৌন্দর্য-সম্ভোগের সে বিশেষত্ব তাঁহার ছিল; আবার মিল্‌টন কিংবা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মতো প্রকৃতির গাম্ভীর্যে ও রহস্যে নিমগ্ন হইবার যে দিক, সে দিকও তাঁহার ছিল।

"চৈত্রমাসের সংক্রান্তিতে দেখি যে, আমার বাসার সংলগ্ন জলাশয়ে কোথা হইতে অপ্সরারা আসিয়া রাজহংসীর ন্যায় উল্লাসের কোলাহলে জলক্রীড়া করিতেছে।"

"বৃহৎ পক্ষীর পক্ষের ন্যায় প্রসারিত ও ঘন পত্রাবৃত শাখা।"

"হঠাৎ উপরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি যে, "পর্বতোবহ্নিমান্" পর্বতের উপরে দীপমালা শোভা পাইতেছে।"

"তারকাগণ এই নিদ্রিত জগতের প্রহরীরূপে বিরাজ করিতে থাকে।"

"তীর হইতে জলগর্ভে দশহাত পর্যন্ত স্থান লইয়া পদ্মবন— কাশ্মীরী শালের পাড়ের ন্যায় সমস্ত সরোবরকে অলঙ্কৃত করিয়া বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।"

"একটি ছোট বালিকা নৌকার গুণ টানিয়া চলিয়াছে। প্রতিমার দেবীমূর্তির ন্যায় তাহার চুলগুলি বিনান, মস্তকে টুপি, গৌরবর্ণের উপর সূর্যকিরণ পড়িয়াছে। বোধ হইল যেন সৌন্দর্যস্নাত দেবীপ্রতিমা।"

এ-সকল অনায়াস ও সুন্দর উপমা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থে পাওয়া শক্ত, বরং কীট্‌সের রচনায় পাওয়া যাইতে পারে।

নিজের জীবনের কোনো অভিজ্ঞতাকে সাধারণ মানবপ্রকৃতির একটা ব্যাপার বলিয়া কতকটা বস্তুগত (objective) ভাবে দেখিয়া সেই অভিজ্ঞতার অন্তর্গত সংগ্রাম বা দ্বন্দ্বজনিত নাট্যরসকে ভাষায় জমাইয়া তুলিবার ক্ষমতাও কোথাও কোথাও দেবেন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। কার্লাইলের সার্টার রিসার্টাসের Everlasting No এবং Everlasting Yea অধ্যায়ের মধ্যে মানসিক অভিজ্ঞতার যে দ্বন্দ্ব, যে আত্মবিরোধ এবং বিরোধের অবসানে যে শান্তি এবং আনন্দের উচ্ছ্বাস জাগিয়াছে, দেবেন্দ্রনাথের পঞ্চবিংশ ব্যাখ্যানে সেই একই রস জাগিয়াছে। আমাদের হৃদয়ে শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ের সংগ্রামের একটি চিত্র সেই ব্যাখ্যানে তিনি দিয়াছেন।

পরিশেষে দেশপ্রীতি হইতে উচ্ছ্বসিত একটি প্রার্থনা উদ্ধার করিয়া শেষ করি। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের দেশপ্রীতি-অনুরঞ্জিত Sonnetsগুলির সঙ্গে ইহার তুলনা চলে। বাংলাদেশের জন্য এই মহৎ হৃদয়ের কী সুগভীর একটি বেদনা এবং প্রেম সঞ্চিত ছিল এবং কী আশ্চর্য ভাষায় তাহা প্রকাশ পাইয়াছে—

"হে পরমাত্মন্! আমারদের এই বঙ্গভূমিকে উজ্জ্বল কর। তোমার এই সকল দুর্বল সন্তানের প্রতি কৃপা-দৃষ্টি প্রদান কর। এই হীন পরাধীন দেশের আর কেহই সহায় নাই— ইহা নানা ক্লেশ নানা বিপত্তিতে দিন দিন আবৃত হইতেছে— দিনরাত্রি ইহার ক্রন্দন-ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। তুমি এ দেশকে উদ্ধার কর। পরমাত্মন্! ধর্মকে প্রেরণ করিয়া ইহার সকল সন্তাপ হরণ কর। তোমার করুণা-বারি প্রতি আত্মাতে প্রেরণ কর— পিতা-মাতার মত তুমি

আপনাকে প্রকাশ কর; আর আমরা সকলে তোমার আরাধনা করি। এমন দিন কবে উপস্থিত হইবে যে বঙ্গভূমির সকল সন্তানেরা এক-আত্মা হইয়া তোমার উপাসনা করিতে থাকিবে। আমারদের ক্ষুদ্র যত্নে ইহার কিছুই সিদ্ধ হয় না; হে সিদ্ধিদাতা! তোমার প্রসাদ বিতরণ কর।"

দেবেন্দ্রনাথ যে কেমন করিয়া বাংলা ভাষার প্রথম শিল্পী হইতে পারিয়াছিলেন, বাংলা ভাষায় একটা অভিনব স্টাইল দাঁড় করাইয়া গিয়াছিলেন, এই প্রার্থনাটিই তাহার ভিতরকার রহস্যকথা আমাদিগকে নিঃসংশয়ে জানাইয়া দেয়। ঈশ্বরপ্রীতি এবং দেশপ্রীতি এই দুই প্রীতি ছিল তাঁহার সমস্ত রচনার উৎস, তাহাই তাঁহার স্টাইলকে উৎপন্ন করিয়াছে। তাহার সঙ্গে তাঁহার তত্ত্বদৃষ্টি, তাঁহার সৌন্দর্যানুভূতি, প্রভৃতি মানস শক্তিগুলি মিলিয়া স্টাইলকে সুন্দর সংহত ও সুদৃঢ় করিয়াছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার প্রথম বয়সের সমসাময়িকদিগের মধ্যে তাঁহার স্থান যে সর্বোচ্চ, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ মাত্র নাই।